ভারতের আধুনিক শিল্পে বিনিয়োগ ও উৎপাদন

১৯০০-১৯৩৯

অমিয় কুমার বাগচী

কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী
কলকাতা

সূচীপত্র

সারণি তালিকা

চিত্র তালিকা

ইংরেজি সংস্করণের ভূমিকা

ভারতবর্ষে ১৯০০ থেকে ১৯৩৯ সালের পর্বে ব্যক্তিগত মালিকানার আওতায় যে লগ্নী সম্পন্ন হয়েছিল তার পরিমাণাদি সংক্রান্ত পরিসংখ্যানেব একটা কাঠামো তৈরি করা এবং সেই কাঠামো-বিধৃত পরিসংখ্যানের বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করা এই বইয়ের লক্ষ্য। কোনও কোনও পাঠকেব মনে হতে পাবে যে কিছু অর্থবহ সিদ্ধান্তে পৌছানোর তাড়ায় পরিসংখ্যান সারণিগুলি যাতে সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন হতে পাবে সে বিষয়ে আমি যথেষ্ট মনোযোগ দিই নি। কৈফিয়ৎ হিসেবে আমি শুধু একথাই বলব যে আহৃত পবিসংখ্যানগুলোর গুরুত্ব আমাব কাছে ততটুকুই ছিল যতটুকু তাবা আমার প্রশ্নগুলির উত্তব দিতে সাহায্য করতে পাবে। আমি সেইজন্যে ওই সাবণিগুলির পরিস্রবণ সেখানে থামিয়ে দিয়েছি যার পবে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে আরও শুদ্ধিপ্রচেষ্টা কাজে লাগবে না বলে মনে হয়েছে। আর তা ছাড়া বইটা যদি এখন শেষ না হয় তবে কখনই এই বই লিখতে পারব না এই আশংকাও ছিল।

এই ধরণের উদ্যোগে যারা প্রয়াসী হয় তাদের সবার মতোই আমি পূর্বসূরী, অন্য গবেষক এবং বহু বন্ধুর কাছে ঋণবদ্ধ হয়ে পড়েছি। আমি আমার পূর্বসূরীদের কাজ বইয়ের বিভিন্ন অংশে উল্লেখ করেছি। সুতরাং তাঁদের কয়েকজনের নাম পৃথকভাবে বলার প্রয়োজন বোধ হয় নেই এবং সেরূপ উল্লেখ সমীচীনও হবে না। বৌদ্ধিক দিক থেকে আমার সবচেয়ে বড় ঋণ জোন ববিনসনের কাছে। তিনি বইয়ের শেষতম বয়ানের আগের বয়ানটি যত্ন করে পড়ে তার তাত্ত্বিক কাঠামো সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান মন্তব্য করেছিলেন। কৃষ্ণা ভরদ্বাজও শিল্পের সামগ্রিক বিকাশ সংক্রান্ত প্রথম ছটি অধ্যায় যত্ন করে পড়ে যুক্তি এবং বাঁধুনির অনেক ত্রুটি শোধরাতে সাহায্য করেছেন।

বইয়ের এক বা একাধিক অধ্যায়ের উপরে তাঁদের অভিমত দিয়ে আমার নিম্নলিখিত শিক্ষক এবং বন্ধুগণ আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন ঃ এজরা বেন্নেথান, ধীরেশ ভট্টাচার্য, প্রনিত চৌধুরী, অশীন দাশগুপ্ত, অশোক দেশাই, মোজেস ফিনলী, রিচার্ড গুডউইন, এডমানড্ লীচ, মাইকেল পজনার, কে. এন. রাজ, ব্রায়ান রেড্অ্যাওয়ে, অমর্ত্য সেন এবং ড্যানিয়েল থর্নার। অতীশ দাশগুপ্ত এবং এণা দেশাইও এই গবেষণার গোড়ার দিকে আমার সহায়ক হিসেবে কাজ করেছিলেন; তাঁদের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাই পশ্চিমবাংলা সবকারকে যাঁরা আমাকে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এই গবেষণা চলার সময় ছুটি দিয়েছিলেন এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ও কেম্ব্রিজের জিসাস কলেজকে যেখানে আমি বিদ্যাচর্চার অনুকূল পরিবেশ ও সুযোগসুবিধা পেয়েছিলাম এবং যার ফলে এই বই লেখা শেষ করতে পেরেছিলাম। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক তাপস মজুমদার আমার নানাবিধ উৎপাত

হাসিমুখে সহ্য করেছেন এবং কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া চর্চা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ বেন ফার্মার আমাকে ক্রমাগত তাড়া দিয়ে বই লেখা শেষ করিয়েছেন। তাঁরা উভয়েই আমার বহুল কৃতজ্ঞতাভাজন। সুনন্দা সেন আমার বইয়ের অনুক্রমণিকা প্রণয়নে সাহায্য করেছেন আর শ্রীমতী লেনার্ড এবং শ্রীমতী ভাইস আমার হাতখসড়া টাইপ করে দিয়েছেন। তাঁদের সকলকেই কৃতজ্ঞতা জানাই। কেম্‌ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেসের বিভিন্ন কার্যনির্বাহক আমাকে বহু প্রশ্ন করে এবং আমার পাণ্ডুলিপির বহু ত্রুটি সংশোধন করে আমার কৃতজ্ঞতার দাবিদার হয়েছেন।

আমার তথ্যাদির জন্যে আমি নিম্নলিখিত গ্রন্থাগার ও মহাফেজখানার দ্বারস্থ হয়েছিঃ কলকাতার বেঙ্গল চেম্বার অভ্‌ কমার্সের গ্রন্থাগার, বোম্বাইতে বোম্বাই শেয়ারহোল্‌ডার্‌স্‌ অ্যাসোসিয়েশনের পুঁথিশালা, লান্‌ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম, কেম্‌ব্রিজ ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি, লান্‌ডনের ইণ্ডিয়া হাউস লাইব্রেরি, অক্‌স্‌ফোর্ডের ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট লাইব্রেরি, লান্‌ডন স্কুল অভ্‌ ইকনমিক্‌স্‌ অ্যাণ্ড পোলিটিক্যাল সায়েন্সের গ্রন্থাগার, নয়াদিল্লীতে ভারতের জাতীয় মহাফেজখানা, কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগার এবং কলকাতায় জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর রেজিস্ট্রারের অফিস। এই সব পুস্তক ভাণ্ডারের গ্রন্থাগারিক, অধ্যক্ষ ও কর্মীবৃন্দের প্রতি— বিশেষ করে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির উইনিফ্রেড থর্ন ও মার্গারেট ট্রেভিস এবং কেম্‌ব্রিজ ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরির সরকারী পুস্তক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত আগারিক শ্রী ভিক্‌রের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। কয়েকটি ব্যবসায়ীসংস্থার কর্তাব্যক্তিরা আমাকে তাঁদের কোম্পানির ইতিহাস দেখতে দিয়েছিলেন—তাঁদেরও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। এস. ডি. মেহ্‌তা ভারতীয় তুলাশিল্প বিষয়ে তাঁর দুটি বই রচনার সময় যে সব পুঁথি বা পত্রিকা সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলি আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

এই বই লেখার সময় আমার স্ত্রী (যশোধরা) তাঁর ডক্‌টরেটের গবেষণাপত্র রচনা, বাড়ি সামলানো এবং আমাদের কন্যার রক্ষণাবেক্ষণে ব্যাপৃত ছিলেন, তৎসত্ত্বেও আমার 'যৌদ্ধিক' পৃষ্ঠরক্ষার কাজে তিনি কুণ্ঠাপ্রদর্শন করেন নি। প্রাচীনপন্থী ভারতীয় পরিবারে নিজের অতিনিকট পরিজনকে ধন্যবাদ দেওয়া ধৃষ্টতা বলে গণ্য হয়। আমি সেই প্রথা অনুসরণ করে যশোধরাকে কোনও বাহ্যিক কৃতজ্ঞতা জানানো থেকে বিরত থাকছি।

বলা বাহুল্য আমার উল্লিখিত উৎমর্ণরা এ বইয়ের কোনও দোষত্রুটির জন্য দায়ী নন ; তার জন্য সমস্ত গঞ্জনা আমারই প্রাপ্য।

অমিয় কুমার বাগচী
প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলকাতা

মুখবন্ধ

ঔপনিবেশিক ভারতের আধুনিক শিল্পে বিকাশ পৃথিবীর উন্নত অথবা সত্যিকারের উন্নয়নশীল দেশগুলির তুলনায় যে কম হয়েছে সেকথা এক ভেরা আনস্টে বা লিলিয়ান লোল্‌সের মতো কট্টর সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিক ছাড়া প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন। জাতীয়তাবাদী ভারতীয় মনীষীরা আরও বলেছিলেন যে, ব্রিটিশ শাসনের ফলে প্রচুর দেশীয় হস্তশিল্প ধ্বংস হয়েছে অথবা টিমটিম করে বেঁচে থেকেছে কিন্তু তার জায়গায় আধুনিক শিল্প যথেষ্ট দ্রুত গড়ে উঠে তাঁত-হারানো তাঁতীর বা হাপরশালাচ্যুত কামারের জীবিকার সংস্থান করে দেয় নি।

যে সব ঐতিহাসিক বা অর্থনীতিবিদ বাঁধা গতে ইতিহাস লিখেছেন তাঁরা যখন স্বীকার করেছেন যে পরাধীন ভারতে শিল্পায়ন শ্লথগতিতে ঘটেছে তখন তার মধ্যে তাঁরা ঔপনিবেশিকতা বা সাম্রাজ্যবাদের প্রায় কোনও দোষ দেখতে পান নি, তাঁরা দোষ দেখেছেন ভারতবাসীর সংস্কৃতিতে, ভারতীয়দের অতি-প্রজনন প্রবণতায়, ভারতীয় ব্যবসায়ীর উদ্যোগ-বিমুখ ব্যবহারে, ভারতীয় শ্রমিকের শ্রমবিমুখতায়, ভারতীয় চাষীর রক্ষণশীল মানসিকতায়। এই ধরনের অভিযোগগুলি যদি সত্যিও হয় সেগুলি যে রোগলক্ষণ, সেগুলি যে রোগের কাবণ নাও হতে পারে সেই অনুসন্ধানে ১৯৬০-এর দশকের আগে খুব বেশি সমাজবিজ্ঞানী অগ্রসর হন নি।

আমার এই বইটি লেখার একটি উদ্দেশ্য ছিল প্রথমত বাস্তব অবস্থার উদ্‌ঘাটন। ধরা যাক, ঔপনিবেশিক ভারতে অতিবিক্ত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এই অভিযোগের ভিত্তি কী সেই প্রশ্নই আমরা করি। সেদিকে তাকালে দেখতে পাব যে ১৯২১ সালের আগে পর্যন্ত ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে দুর্ভিক্ষ মহামারী ও দৈনন্দিন রোগতাপের শিকার হয়ে এত লোক মারা যেত যে, জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার প্রায়ই শূন্য বা তার নীচে চলে যেত। সেই জায়গায় ইয়োরোপের অধিকাংশ দেশে উনিশ শতকে জনসংখ্যা প্রতি দশকে শতকরা দশভাগের বেশি হারে বেড়ে চলেছিল। এছাড়াও জনসংখ্যাবৃদ্ধি হলেই দারিদ্র্য-দুর্দশা বাড়বে এই তত্ত্বেরও ভিত্তি খুব দুর্বল। বরং একথা এখন বলা হয় যে ইংল্যান্ডের শিল্পায়ন অষ্টাদশ শতকে যে ত্বরান্বিত হয়েছিল তার একটা কারণ এই যে, সেখানে সতের শতকের শেষ দিক থেকে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ত্বরান্বিত হয়েছিল। রিগ্‌লী ও স্কোফিল্‌ডের প্রামাণ্য বই *Population History of England* (১৯৮১)-তে এই বক্তব্যের পক্ষে সাক্ষ্য মেলে।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আরেকটি 'তথ্য' এবার ধরা যাক। ভারতীয় চাষী অত্যন্ত রক্ষণশীল এবং বাজারের ওঠানামার সঙ্গে সে তাল রেখে চলতে শেখে নি বহু গতানুগতিক ইতিহাসে ও অর্থশাস্ত্রের বইতে এই দাবি করা হত। রক্ষণশীলতার একটা প্রমাণ হতে পারে যে চাষী যে ফসল থেকে বেশি দাম পাবে সে ফসল না ফলিয়ে তার বাপ-ঠাকুর্দারা যে ফসল জমিতে ফলাতেন সেই ফসলই উৎপন্ন করত। সৌভাগ্যক্রমে আমার এই বই লেখার আগেই

রাজ কৃষ্ণ, ভেঙ্কটরামানন, ধর্ম নারায়ণ ইত্যাদি অর্থশাস্ত্রীরা দেখিয়েছিলেন যে বিশেষ বিশেষ ফসলের আনুপাতিক মূল্যের ওঠানামার সঙ্গে কোন ফসল কত পরিমাণ জমিতে ফলাবে সেই অনুপাতও ভারতীয় চাষীর লাঙ্গলকোদালের ঘায়ে বদলে যেত। কিন্তু গরীব চাষী ততটাই রক্ষণশীল যতটা না হলে সে টিকে থাকতে পারবে না। আর দারিদ্র্য এবং তার তথাকথিত রক্ষণশীলতার জন্যেও দায়ী ঔপনিবেশিক ভারতের সমাজব্যবস্থা যার সর্বপ্রধান ধারক ও রক্ষক হল বিদেশী শাসককুল এবং বিদেশী পুঁজিপতির দল।

ঔপনিবেশিকতার এক অনিবার্য ফল হল শাসিত দেশের সম্পদশোষণ এবং সেই শোষণের নির্মম পদ্ধতি ও তার বিশাল ভারের অবশ্যম্ভাবি পরিণতি হল পরশাসিত দেশের দারিদ্র্য। একথা শুধু যে দাদাভাই নাওরোজি, রমেশচন্দ্র দত্ত বা মহাদেব গোবিন্দ রানাডে জানতেন তাই নয়, একথা এডমান্ড্ বার্ক, অ্যান্টনি ল্যাম্বার্ট, লর্ড লভারডেল বা ইরেস হেম্যান উইলসনের মতো ব্রিটিশ শাসককুলের সভ্যরাও জানতেন। আমার চেষ্টা ছিল এই ক্রমান্বয় শোষণ এবং দারিদ্র্যের ফল ঔপনিবেশিক ভারতের আভ্যন্তরীণ বাজারের উপর কীভাবে পড়েছিল তার বিশ্লেষণ এবং তার ফলে আধুনিক শিল্পে বিনিয়োগ ও উৎপাদন কীভাবে প্রভাবিত হয় তার ব্যাখ্যা। এই দিক থেকে সমস্যাগুলো দেখতে গেলে তথাকথিত সরবরাহঘটিত ব্যাখ্যার প্রবক্তারা যা বলেছেন তার অসারতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তন্নিষ্ঠ বিশ্লেষককে তখন দেখাতে হয় কীভাবে ঔপনিবেশিক ভারতের সমাজব্যবস্থা এবং ব্রিটিশ শাসকদের অনুসৃত আর্থিক নীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে সারাক্ষণ সংশ্লিষ্ট থেকেছে।

আভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদার বিশ্লেষণ করতে গেলে স্বভাবতই অর্থনীতির ছাত্রকে এই শতকের সবচেয়ে বড় অর্থশাস্ত্রবিৎ জন মেনার্ড কেইন্‌সের দ্বারস্থ হতে হয়। আর সমাজব্যবস্থার বিশ্লেষণের জন্যে তাকে নির্ভর করতে হয় ভারতীয় মনীষীদের গবেষণার উপর আর উনিশ শতকের দিকপাল বিপ্লবী দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্কসের লেখার উপর। কেইন্‌স্ এবং মার্কস্ দুজনেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বেশ কিছু জায়গায় লিখে গেছেন। কেইন্‌সের প্রথম বই হল ভারতবর্ষের অর্থ ও রাজস্ব ব্যবস্থা সম্বন্ধে। তিনি তাঁর জীবন আরম্ভ করেছিলেন ব্রিটিশতনয়ের অতিকাঙ্ক্ষিত ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের সভ্য হিসাবে। তাঁর প্রথম বইতে যে দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পেয়েছে তা নিতান্তই লন্ডনে অবস্থিত ইণ্ডিয়া অফিসের জানালা থেকে দেখা পৃথিবীর আকারপ্রকার। সেই বইয়ের দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেছি আমি আমার *Presidency Banks and the Indian Economy 1876-1914* (অক্‌স্‌ফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৯)—নামধেয় বইতে ও অন্যান্য প্রবন্ধে। বৈষয়িক ব্যবস্থার ছাত্রের কাছে কেইন্‌সের আসল গুরুত্ব তাঁর *General Theory of Employment, Interest and Money* (লান্ডন, ম্যাকমিলান, ১৯৩৬)—বইটির জন্যে। বর্তমান শতাব্দীর ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বোঝার পক্ষে এই বইটি প্রায় অপরিহার্য বলা চলে। কেইন্‌সের এই বই বেরোনোর আগেই মিখাল কালেস্কি নামে এক পোলিশ সাংবাদিক (তিনি পোল্যান্ডের কয়লা বিষয়ক পত্রিকায় সাংবাদিকের কাজ করতেন) কেইন্‌সীয় অর্থনীতির অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্ত নানা কারণে—এক প্রধান কারণ তো নিশ্চয়ই এই যে অস্তায়মান কিন্তু আপাতদীপ্যমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চিন্তাবলয়ের কেন্দ্রস্থলে কেইন্‌সের অবস্থান—কালেস্কির তত্ত্ব কেইন্‌সীয় তত্ত্বের একটি বিশেষ প্রকাশ হিসাবেই অর্থশাস্ত্রের বিবর্তনে স্থান পেয়েছে।

যখন আমার অর্থশাস্ত্রে হাতেখরি হচ্ছে তখন একটা কথা প্রায়ই বলা হত যে ভারতবর্ষের মত অনুন্নত দেশে কেইন্‌সীয় অর্থনীতির প্রয়োগ অর্থহীন। আমার কাছে এই প্রতিপাদ্যটি ক্রমশ ভ্রান্ত বলে মনে হতে থাকল। যে দেশে টাকা পয়সার লেনদেনের মাধ্যমে পণ্য বিনিময় হয়, যে দেশে লোকের আয়ব্যয় নির্ণীত হয় টাকার হিসাবে, যেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোকের প্রতিপত্তির ও দুর্ভোগের ভিত্তি হল ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সম্পত্তি অথবা তার দুর্লভ্যতা, সেদেশে ধনতান্ত্রিক অর্থশাস্ত্রের মূলকথাগুলি একেবারেই অপ্রযোজ্য হবে একথা আমাব কাছে গ্রহণীয় বোধ হয় নি।

কিন্তু কেইন্‌সীয় অর্থনীতিতে জৈবশক্তি বা জৈবপ্রবৃত্তি ছাড়া দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের কোনও ব্যাখা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় নি। কেইন্‌স্ তাঁর *Treatise on Money* (১৯৩০)'র, দ্বিতীয খন্ডে ইযোরোপের মূলবিপ্লব সম্বন্ধে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর সেই লেখা থেকে এবং আর্ল হ্যামিল্‌টনের গবেষণা থেকে কেইন্‌স্-হ্যামিল্‌টন অনুমানের জন্ম হয়। তার মূল কথা হল যে পশ্চিম গোলার্ধে সাম্রাজ্য বিস্তার করে স্পেন যে প্রভূত পরিমাণ রূপো আমদানি করেছিল তাতে ষোল শতকের গোটা পশ্চিম ইয়োরোপে মূল্যস্তর প্রচন্ডভাবে উর্ধ্বগামী হয় এবং ব্যবসায়ীশ্রেণী প্রচুর মুনাফা অর্জন করে। এর ফলে ধনতন্ত্রীশ্রেণীর শক্তি বৃদ্ধি পায এবং ইয়োরোপে শিল্পবিপ্লব ঘটে। কেইন্‌স্ ধনতন্ত্রীশ্রেণীর জন্মকালের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সমাজ পরিবর্তনের উপর আলোকপাত করেন নি। কীভাবে সামন্ততন্ত্র অবক্ষীণ হল অথবা কোন্ বিপ্লবে তার মূলোৎপাটন হল এসব কথার আলোচনা কেইন্‌সের বা হ্যামিল্‌টনের লেখায় পাওয়া যাবে না। কেইন্‌সের ইতিহাসবোধ ছিল না, একথা বলা পুরোপুরি ঠিক হবে না। কিন্তু সেই ইতিহাস সম্পূর্নভাবে ইংবেজ মধ্যবিত্তশ্রেণীর চোখ দিয়ে দেখা। বিনিয়োগের স্বল্পমেয়াদী উত্থানপতনের ফলে ধনতন্ত্রী অর্থব্যবস্থায় কী ধবনের চড়ামন্দার অবস্থা হয় কেইন্‌স্ প্রধানত তারই বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু শিল্পায়নের দীর্ঘকালীন গতিপ্রকৃতি জানতে হলে বিনিয়োগের ইতিহাস এবং স্বল্পকালীন ওঠানামার মধ্যে দিয়ে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ কীভাবে প্রভাবিত হয় এ সবের বিশ্লেষণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। আমার বইতে সেজন্যে ধনতন্ত্রী বা আধা-ধনতান্ত্রিক, ঔপনিবেশিক সমাজে ধনতন্ত্রীশ্রেণী, কৃষকশ্রেণী এবং শ্রমিকশ্রেণীর ইতিহাস অনিবার্যভাবে এসে গেছে। এই সব শ্রেণীর পরিপূর্ণ ইতিহাস প্রণয়ন আমার উদ্দেশ্যও ছিল না, একটিমাত্র বইয়ের পরিসরে সেই ইতিহাস উদঘাটন সম্ভবও ছিল না। সে ইতিহাস ততটুকু এসেছে যতটুকু আমি আধুনিক শিল্পে বিনিয়োগের উত্থানপতনের ব্যাখ্যার জন্যে অবশ্য প্রয়োজনীয় বোধ করেছি।

বাজার ও ব্যক্তিগতমালিকানাধীন সম্পত্তির তাড়নায় যে সমাজ প্রচালিত হয় এবং যে দেশ থেকে সম্পদ আহরণ করে বিদেশী শাসক বিদেশে পাচার করে, সেই অর্থব্যবস্থায় কিছু ব্যতিক্রমী ঘটনাপুঞ্জ ছাড়া চাহিদার অপ্রতুলতা এক প্রধান সমস্যা হয়ে দেখা দেবে এবং সেই অপ্রতুলতা শিল্পের গতিকে ব্যাহত করবে এই কথা ছিল আমার বইয়ের এক প্রধান প্রতিপাদ্য। কেইন্‌স্, কালেস্কি ছাড়াও কার্ল মার্কসের মতো মনীষী ধনতন্ত্রী সমাজে চাহিদার অপ্রতুলতা জনিত মন্দা অবস্থার সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করেছিলেন। কেইন্‌স্ ধরেই নিয়েছিলেন যে ধনতন্ত্রীসমাজে ধনতন্ত্রীশ্রেণী থাকবে এবং তারা বিনিয়োগে লিপ্ত হবে। দু-এক বছরের সময়সীমার মধ্যে সেই বিনিয়োগ কীভাবে ওঠানামা করবে তার উপরে

আলোকপাত করলেও দীর্ঘসময় ধরে কেন বিত্তবান শ্রেণী শিল্পবিনিয়োগে পরাঙ্মুখ থাকবে, কখনই বা কেইন্‌স্ কথিত জৈবশক্তি তাদের প্রবল হয়ে উঠবে তার বিশ্লেষণের দিকে তিনি যান নি।

দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ শ্লথতার উপর আলোকপাত করতে গেলে সমাজবিন্যাসের চরিত্র অনুধাবন করা অপরিহার্য। শিল্পের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে ভারতের নিজস্ব সমাজের অসাম্য ও সংঘাতও কাজ করবে এই ধারণা আমার যুক্তির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। সমাজের অসাম্যের উদ্‌ঘাটনে এবং আধা-ধনতন্ত্রী পরশাসিত রাষ্ট্রের গঠন বুঝতে অবশ্যই সব চেয়ে সাহায্য পেয়েছি মার্কসের লেখাপত্র থেকে। কেইন্‌সের মতই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মার্কসের লেখা সম্পূর্ণভাবে গ্রাহ্য নয়। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে নথিপত্র তিনি দেখেছিলেন, তা প্রায়ই শাসকশ্রেণীর চোখ দিয়ে দেখার ফসল। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় অপ্রকাশিত এবং তাঁর সারাজীবনের সহকর্মী ফ্রেডারিক এংগেল্‌স্ সম্পাদিত তৃতীয় খন্ড *Capital*-এ প্রমাণ আছে যে জীবনের শেষদিকে ব্রিটিশ শাসনের বৈপ্লবিক ফল সম্বন্ধে তিনি সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন।

আমার এবং আমার মত আরও অনেক সমাজবিজ্ঞানীর কাছে মার্কস্ এবং এংগেল্‌সের গুরুত্ব তাঁদের লেখায় কী মত প্রকাশ পেয়েছে তাতেই সীমাবদ্ধ নয় বা সেই মতের ওজনই সবচেয়ে গুরু বলে মনে হয় না। তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে তাঁদের প্রশ্নগুলি এবং সেই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে যে পদ্ধতি তাঁরা ব্যবহার করেছেন সেই পদ্ধতিপুঞ্জ। ঔপনিবেশিক ভারতে শিল্পের গতিপ্রকৃতি বিচারে যেমন একটি প্রধান প্রশ্ন ছিল যে সেই শিল্পের নির্ণায়ক কারা। বিদেশী নির্ণায়কদের ব্যবসায়ের গন্ডী কী ছিল, তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল কী? কী কী কৌশল ব্যবহার করে তারা সেই লক্ষ্যের দিকে পৌছতে চেষ্টা করতো? সমান্তরালভাবে ভারতীয় পুঁজিপতিদের শ্রেণীর অবস্থান নির্ধারণ করে আমি বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম কেন তাদের মধ্যে কিছু অংশ প্রথমে শিল্পবিনিয়োগে অনগ্রসর ছিল এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক পটপরিবর্তনের কোন অঙ্কে তারা বিনিয়োগে অগ্রসর হয়েছিল। সেই বিশ্লেষণে কতটা আমি সক্ষম হয়েছিলাম তার উপর অনেক গবেষক তাঁদের রায় দিয়েছেন এবং এই বাংলা সংস্করণের পাঠকগণ তাঁদের সুচিন্তিত রায় দেবেন বলে আমি আশা করি।

আমার এই বই বেরোনোর পর রজতকান্ত রায়, ক্রিস বেকার, ওঙ্কার গোস্বামী, রাজনারায়ণ চন্দাবারকার, দীপেশ চক্রবর্তী, ক্লোদ মার্কোভিৎস্, কিয়োকাওয়া, রণজিৎ দাশগুপ্ত, নাসির তায়েবজী, কলিন সিমন্স, পার্থসারথি গুপ্ত, নবেন্দু সেন, সুনন্দা সেন, সুদীপ চৌধুরী, বিনয় বাল, সুমিত গুহ এবং আরও অনেক গবেষক ভারতের আধুনিক শিল্পে উৎপাদনের গতি-প্রকৃতির বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করেছেন। তাঁদের গবেষণার ফলে অনেক নতুন তথ্য আমরা পেয়েছি এবং অনেক যুক্তি ও তত্ত্বের বাঁধুনি আরও দৃঢ় হয়েছে। আমি নিজেও কিছু নতুন সময়সীমা ও নতুন তথ্যের সাহায্যে ঔপনিবেশিক শিল্পায়নের গতিপ্রকৃতি এবং তার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বুঝতে চেষ্টা করেছি। ভরসার কথা এই যে নতুন গবেষণার ফলে আমার ১৯৭২-এ লেখা বইয়ের মূল বক্তব্যগুলো পরিবর্তন করার প্রয়োজন বোধ করি নি।

এই বইয়ের বাঙলা সংস্করণ প্রকাশের জন্যে সবচেয়ে প্রথমে ধন্যবাদার্হ প্রকাশক কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী। তাঁদের আন্তরিক উৎসাহ ছাড়া এ কাজে আমি অগ্রসব হতাম কি না সন্দেহ। আর প্রধান অনুবাদক এবং সম্পাদক স্নেহভাজন অধ্যাপক মনোজ কুমাব সান্যালেব আন্তবিক ও অনলস পরিশ্রম ছাড়া এই অনুবাদ কর্ম সম্পন্ন হত না। তাঁকে একাজে প্রচন্ডভাবে সহাযতা কবেছেন তাঁর সহধর্মিনী অধ্যাপিকা মন্দিরা সান্যাল এবং সহযোগী সম্পাদক ও অনুবাদক অধ্যাপক জয়ন্ত আচার্য। তাঁরা সকলেই এই অনুবাদকে 'ভালোবাসার শ্রম' হিসাবে গ্রহণ কবেছেন গ্রন্থকারের পক্ষে এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য খুব কমই থাকতে পাবে। তাঁদের এই কাজকে শুকনো ধন্যবাদ দিয়ে খাটো কবতে চাই না।

সংক্ষেপীকরণ

CISD	(Government of India) Commercial Intelligence and Statistics Department
IFLC	Indian Factory Labour Commission
IIC	Indian Industrial Commission 1916-18
IISCO	Indian Iron and Steel Company Limited
IIYB	*Investor's India Year-Book*
IJMA	Indian Jute Mills Association
ILO	International Labour Organization
IPG	Indian Provincial Government
ITB	Indian Tariff Board
ITJ	*Indian Textile Journal*
JPE	*Journal of Political Economy*
JRSA	*Journal of the Royal Society of Arts*
JRSS	*Journal of the Royal Statistical Society*
JSA	*Journal of the Society of Arts* (*JSA* became *JRSA* in the first decade of the twentieth century)
PP	U.K. Parliamentary Papers
RC	Royal Commission
SCOB	Steel Corporation of Bengal
TISCO	Tata Iron and Steel Company Limited
UP	United Provinces of Agra and Oudh

১

ভূমিকা

খ্রিষ্টীয় ১৯০০ সালে 'ব্রিটিশ রাজমুকুটের উজ্জ্বলতম রত্ন' ভারত ছিল পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলির একটি। ব্রিটিশ শাসনের সমালোচকদের উত্তরে তৎকালীন বড়লাট ও সাম্রাজ্যের মহাক্ষত্রপ কার্জন সাহেব ১৯০১-২ সালের বাজেট বিতর্কের সময় ঘোষণা করেছিলেন যে ভারতবাসীর মাথা পিছু বার্ষিক আয় ৩০ টাকা বা ২ পাউন্ড, অতএব ভারত একটি সমৃদ্ধ দেশ।[১]

বড়লাটের এই বিবৃতির প্রতিবাদ করেছিলেন উইলিয়ম ডিগবি। বহু তথ্য সংবলিত তাঁর সমালোচনায় তিনি দাবি করেছিলেন যে কার্জন সাহেবের হিসাব মতো একজন ভারতবাসী যা আয় করত তার প্রকৃত আয় তার থেকেও কম ছিল। তদুপরি, ইংরেজ শাসনের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতিতে সে বছরে বছরে আরও দরিদ্র হচ্ছিল।[২] কার্জন সাহেবের সমর্থনে এফ্ জে অ্যাটকিন্‌সন্ অনুপুঙ্খ এক হিসাব দাখিল করেন এবং তাতে তিনি দেখান যে ব্রিটিশ ভারতে ১৮৯৫ সালে সাধারণ একজন প্রজার গড়পড়তা বার্ষিক আয় ছিল ৩৯.৫ টাকা বা ২ পাউন্ড ১৩ শিলিং।[৩] তুলনীয়ভাবে, সবচেয়ে প্রামাণ্য হিসাব অনুসারে ১৯০১-এ গ্রেট ব্রিটেনের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ছিল ৫২ পাউন্ড।[৪]

শিবসুব্রামনিয়নের গবেষণায় অ্যাটকিন্‌সনের হিসাবের সমর্থন মেলে। তিনি দেখান যে, তৎকালীন দেশীয় রাজ্যসহ ভারতের মাথাপিছু আয় ছিল ১৯০০-১ সালে ৪২.১ টাকা এবং ১৯০১-২-এ ৪১.৫ টাকা।[৫] অ্যাটকিন্‌সনের দাবি ছিল যে, ১৮৭৫ ও ১৮৯৫-এর মধ্যে সাধারণ ভারতবাসীর জীবনযাত্রার মানের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। তাঁর হিসাব মতো মাথা-পিছু আয় ১৮৭৫-এ ছিল ৩০.৫ টাকা আর ১৮৯৫-এ তা বেড়ে হয় ৩৯.৫ টাকা। যে অনুমানের ভিত্তিতে এই দাবি করা হয়েছিল তা প্রশ্নাতীত নয়। ১৮৯৫-এর তুলনায় ১৮৭৫-এর তথ্যগুলি ছিল অনেক বেশি অসংলগ্ন। দুই তারিখের মধ্যে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হিসাব করতে গিয়ে অ্যাটকিন্‌সন্ ধরে নিয়েছিলেন যে সেচব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উৎপাদন কৌশলের উন্নয়নের ফলে (ধান সহ) মুখ্য সব ফসলের একরপিছু উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি ঘটেছিল। ১৮৭৫-৯৫ কালপর্বে উৎপাদন ক্ষমতার পরিবর্তনের কোনো পরিমাপ কেউ এখনও করেননি। কিন্তু তার পরের সময়ের জন্যে উৎপাদিকা শক্তির পরিবর্তনের যে সব তথ্য পাওয়া যায় তাতে অ্যাটকিন্‌সনের এই দাবি ধোপে টেঁকে না যে ১৮৯৫-এ একজন ভারতবাসী গরিব হলেও সে উত্তরোত্তর সচ্ছল অবস্থায় উঠে যাচ্ছিল।[৬]

পরবর্তী চল্লিশ বছর বা তার কিছু কম-বেশি সময়ে ভারতে জাতীয় আয়ের বিকাশের নক্সা যে সব গবেষক এঁকেছেন, তাঁদের অধিকাংশেরই সিদ্ধান্ত হলো যে মাথাপিছু প্রকৃত

জাতীয় আয়, হয় নিম্নগতি ছিল, নয়তো তা অতি সামান্যই বেড়েছিল।[৭] আধুনিক মান অনুসারে এই কালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি মাত্রাতিরিক্ত ছিল না : ১৯০১ সালে জনসংখ্যা ছিল ২৮৫ মিলিয়ন আর ১৯৪১-এ তা ছিল ৩৮৯ মিলিয়ন। অর্থাৎ এই পর্বে জনসংখ্যাব বার্ষিক বৃদ্ধি ১%-এরও কম ছিল।[৮] অতএব, আয়ের আপেক্ষিক শ্লথগতির জন্যে জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধিকে দায়ী করা চলে না। এই বছরগুলিতে মোট কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধির হাব ও শিল্পোৎপাদনের বৃদ্ধির হার উভয়ই ছিল স্বল্প। শিল্পায়ণেব অত্যল্প হারের ছাপ প্রতিফলিত হয়েছে বৃত্তিভিত্তিক নিয়োগ কাঠামোর অনড় অবস্থার উপর। পেশাগত সুমারীর নিরিখে ১৯০১ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমজীবী মানুষের অনুপাত প্রায় অপরিবর্তিত ছিল। ১৯৪১ সালের জন্যে সুগ্রথিত পেশাগত সুমারী না থাকলেও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের ইঙ্গিত হলো যে তিরিশেব দশকে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমজীবী মানুষের অংশ বিশেষ বৃদ্ধি পায়নি।[৯] কিংস্‌লি ডেভিসেব বয়ানে, এ এক বিবাট প্রহেলিকা যে "প্রাচ্য দেশগুলির মধ্যে ভারতই শিল্পায়নের প্রভাব প্রথম অনুভব করেছে", তথাপি সে কোনো দিনই উত্তরণ সম্পূর্ণ করেনি। অন্যদিকে অনেক কম সম্পদ নিয়ে এবং অনেক পরে আরম্ভ করে জাপান এ-পর্ব সম্পূর্ণ করেছে।"[১০]

ভারতে বৈষয়িক উন্নতির ধীরগতির এক প্রধান হেতুর, অর্থাৎ বেসরকারি বিনিয়োগের মন্থরতার মৌল কারণগুলির, তথ্যভিত্তিক ব্যাখ্যা করাই এই গ্রন্থের লক্ষ্য। কয়েকটি প্রতিরক্ষার সরঞ্জাম তৈরির কারখানা ও কিছু সরকারি প্রদর্শনী কারখানা বাদ দিলে ব্রিটিশ ভারতে আধুনিক শিল্প বলতে বোঝাত বেসরকারি শিল্পকে। সে কারণে শিল্প বিনিয়োগের গতিপ্রকৃতিব অনুসন্ধান আর বেসরকারি শিল্প বিনিয়োগের গতিপ্রকৃতির অনুসন্ধান সমার্থবাচক। এই বইতে দুটি স্তরে অনুসন্ধান পরিচালনা করা হয়েছে : প্রথমত, বেসরকারি বিনিয়োগের হ্রাসবৃদ্ধির উপর সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলের প্রভাবের মূল্যায়ন করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, একে একে প্রধান আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পগুলিকে ধরে নির্ণয় করার চেষ্টা হয়েছে ঐ সব শিল্পের ক্ষেত্রে কোন কোন উৎপাদন বিশেষ করে সেই শিল্পকে প্রভাবিত করেছে আর কোন উৎপাদনের প্রভাব অল্পবিস্তর সবার উপর পড়েছে।

যে কোনো দেশের বেসরকারি বিনিয়োগের উপর যে সব কার্যকারণ কাজ করে তার একটি প্রধান উপাদান হলো আধুনিক শিল্পের প্রতি সে দেশের সরকারের মনোভাব ও শিল্প সম্বন্ধে কার্যকরী সরকারি নীতি। একটি দেশ যখন আধুনিক শিল্পায়নের দিকে সবে অগ্রসর হচ্ছে, আর সেই শিল্পায়ন ঘটছে প্রধানত বেসরকারি উদ্যোগের আওতায়, তখন সেখানকার সরকারি নীতির সারবস্তু হয়ে দাঁড়ায় সরকারের শুল্কনীতি। ভারতের বেসরকারি শিল্পোদ্যোগকে এই দিক থেকে দেখলে প্রতীয়মান হবে যে ১৯০১ থেকে ১৯৩৯-এর মধ্যেকার বছরগুলি দুটি যুগে বিভক্ত। ১৯১৪ পর্যন্ত অন্যদেশ থেকে ভারতে আমদানির ব্যাপারে প্রকৃতই চল-ছিল অবাধ বাণিজ্য নীতি। প্রথম মহাযুদ্ধ কালে আমদানি শুল্ক কিছু বেড়েছিল এবং মালবাহী জাহাজের অপ্রতুলতা দেখা দিয়েছিল। এতে ভারত ও অবশিষ্ট পৃথিবীর মধ্যে বাণিজ্য আগের তুলনায় কিছুটা বাধাগ্রস্ত হয়। তারপর ১৯২৩ থেকে ভারত সরকার শিল্পক্ষেত্রে বিভেদমূলক সংরক্ষণী শুল্কনীতি প্রয়োগ করে। এই পদক্ষেপে অবাধ বাণিজ্যের কাল শেষ হলো এবং শুরু হলো বহিঃশুল্ক সংরক্ষিত শিল্পোন্নয়নের যুগ।

সেইহেতু এই অধ্যায়ে দুই যুগে ভারতে বেসরকারি বিনিয়োগের উপর যে প্রভাবগুলি পড়েছিল, তাদের বিশিষ্টতার দিকে নজর দিয়ে আলোচনা করেছি। মূলধন বা অন্যান্য উপাদানগুলির যোগানের বাধা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত প্রভাব হিসাবে কাজ করে নি—এই অনুমানের ভিত্তিতেই আমরা এগিয়েছি। বিশ্লেষণের মূল সূত্রগুলিকে পরিষ্কার করার জন্যে এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলিকে এক সূত্রে গাঁথার সুবিধার জন্যে আমরা প্রধানত তত্ত্বগত আলোচনার উপর এই অধ্যায়ে জোর দিয়েছি। কিন্তু যেখানেই প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত বা বাস্তব সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে তত্ত্বের যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছি।

১.১ রপ্তানি শিল্পে বিনিয়োগ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ভারতীয় অর্থব্যবস্থার চেয়ে উন্মুক্ত অর্থনীতি ব্যবস্থা পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনো দেশেই ছিল না বলা চলে। ভারত রপ্তানি করত কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য এবং পাটজাত দ্রব্য, তুলোজাত সুতো ও মোটা সুতিবস্ত্র এবং বাগিচাজাত দ্রব্য—প্রধানত চা।[১১] আর তার প্রধান আমদানি ছিল শিল্পদ্রব্য। দেশে ব্যবহৃত শিল্প পণ্যের বড় অংশটি আসত বিদেশ থেকে।

বৃহদাকারে মূলধন নিয়োগ করা হতো যে-সব শিল্পে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তুলো ও পাট শিল্প, কয়লা ও চা। খনি ও চা যদি আমরা বাদ দিয়ে প্রকৃত অর্থে শিল্পের কথা বলি তবে বলা যায় যে ; সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ছিল পাট ও তুলোজাত দ্রব্য। বোম্বাই প্রেসিডেন্সি অর্থাৎ পশ্চিম ভারতে কেন্দ্রীভূত ছিল তুলো শিল্প। অন্যদিকে পূর্ব ভারতে কলকাতা ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলেই উল্লেখযোগ্য সব পাটকল গড়ে উঠেছিল। এই দুই শিল্পের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই অমিল ছিল। তুলোজাত পণ্যের শিল্প ভারতীয়রাই নিয়ন্ত্রণ করত, কিন্তু পাটশিল্প ছিল পুরোপুরি ভাবেই ইয়োরোপীয় (প্রধানত ইংরেজ) ব্যবসায়ীর দখলে। কাঁচা পাট উৎপাদনে একচেটিয়া অধিকার ছিল ভারতের, কিন্তু কাঁচা তুলোর প্রধান উৎপাদকদের মধ্যে ভারত ছিল মাত্র একটি দেশ। এই জন্যে পাটের দাম নির্ধারণে ভারতীয় কাঁচা পাটের যোগান ছিল একটি বড় উপাদান, কিন্তু তুলোর দামে ভারতীয় যোগানের ভূমিকা ছিল নগণ্য। কারণ, তুলোর যোগানের উপর সবথেকে বেশি প্রভাব ফেলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তুলোর ফলন। পাটজাত পণ্য প্রধানত অন্য পণ্যের উৎপাদনে উপাদান সামগ্রীর কাজ করত। কিন্তু তুলোজাত দ্রব্য প্রথমত ছিল উৎপাদনের স্বল্পমেয়াদী, মধ্যবর্তী দ্রব্য (অর্থাৎ কাপড় বোনার সুতো) অথবা ভোগ্যদ্রব্য। সহজেই এমন এক ভবিষ্যতের কথা ভাবা যেত যখন শুধু আভ্যন্তরীণ বাজারের প্রয়োজন মিটিয়ে ভারতের তুলোশিল্প টিকে থাকছে। কিন্তু মৌলিক শিল্পায়ন না ঘটার ফলে ভারতের পাটশিল্পের জন্যে এমন একটি ভবিষ্যতের কল্পনা করা যেত না।

কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে দুটি শিল্পের মধ্যে বেশ কিছু সাদৃশ্য ছিল। পাটদ্রব্য উৎপাদনের ৯০ শতাংশের বেশি বিক্রি করা হতো বিদেশে। একইভাবে, তুলোকলগুলির ক্ষেত্রে বোম্বাই নগর ও দ্বীপ মিলে উৎপন্ন সুতোর বড় অংশই রপ্তানি করা হতো। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতে অবস্থিত তাঁত ও মাকুর মোট সংখ্যার ৫০ শতাংশ ছিল বোম্বাই

নগর ও দ্বীপে। এই শিল্পের তৎকালীন ছবিটি আরেকটু জটিল ছিল। কারণ দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্যেও বোম্বাইয়ের কলগুলি সুতো ও কাপড় সরবরাহ করত এবং তুলোশিল্পের অন্য কেন্দ্রগুলি ভারতে হস্তচালিত তাঁতের কারিগরদের ব্যবহারের জন্যে উৎপাদন করত সুতো এবং জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য তৈরি করত কাপড়। শেযোক্ত কেন্দ্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল আমেদাবাদের শিল্প। কিন্তু শিল্পের প্রধান কেন্দ্র অর্থাৎ বোম্বাই নগর ও দ্বীপের পক্ষে রপ্তানি বাজার ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও দেশীয় তুলো ও পাট উভয় শিল্পই দেশে উৎপন্ন কাঁচামাল ব্যবহার করত, কাঁচা তুলো ও পাটের অধিকাংশই বিদেশের বাজারে চলে যেত। ফলে জাতীয় আয়ের উপর তুলো ও পাট শিল্পের উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি যে প্রভাব ফেলত তার চেয়ে প্রবলতর প্রভাব ফেলত কাঁচাতুলো ও পাটের রপ্তানির হ্রাসবৃদ্ধি। উভয় শিল্পই প্রায় পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিল বিদেশে, বিশেষ করে ইংল্যান্ডে, তৈরি যন্ত্রপাতি আমদানির উপর। যদিও আধুনিক শিল্পক্ষেত্রে এই দুই শিল্প ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের তুলনায়, আরও বিশেষ করে কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য রপ্তানির তুলনায়, মোট জাতীয় আয়ে বা জাতীয় আয়বৃদ্ধিতে তাদের অবদান ছিল নগণ্য। অন্যভাবে বলা যায় যে, যোগানদার শিল্প অথবা ক্রেতাস্থানীয় শিল্প ও জনসাধারণের আয়েব উপর পাট ও তুলো শিল্পের প্রভাব ছিল দুর্বল।

এই যোগানদার ও ক্রেতাস্থানীয় শিল্পের সঙ্গে শিথিল সম্পর্ক ছিল বলে দু'টি শিল্পে বিনিয়োগের ধারা আলাদা করে চিহ্নিত করা সম্ভব। কারণ, এই দুই শিল্পের উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধিতে জাতীয় আয়, কাঁচামালের সরবরাহ অথবা তাদের পণ্যের চাহিদা কীভাবে প্রভাবিত হচ্ছে তা নিয়ে আমাদের সারাক্ষণ ভাবতে হয় না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে যন্ত্রপাতি ও মিলের সরঞ্জামের অর্ধেকেরও বেশি আমদানি হতো এই পাট ও তুলো শিল্প বাবদ। সুতরাং এই দুই শিল্পে বিনিয়োগের হিসাব একবার করতে পারলে জাতীয় শিল্প-বিনিয়োগের অধিকাংশের খতিয়ান আমরা পেয়ে যাব। শিল্পে বিনিয়োগের ছবি সম্পূর্ণ করতে গেলে চিনি, কাগজ, লোহা ও ইস্পাত এবং সিমেন্ট শিল্পের উন্নয়নও আমাদের বিচার করতে হবে। প্থম বিশ্বযুদ্ধের আগে এই সব শিল্পের উত্থানের কাহিনী একেবারেই পারস্পরিক সম্পর্কহীন আখ্যান। এই গ্রন্থে শিল্পসংক্রান্ত অধ্যায়গুলিতে অনুরূপভাবেই তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বিদেশের বাজারে পাটজাত দ্রব্যের বিক্রির ধারা অনুসরণ করে পাটশিল্পের বিনিময় কাঠামোর বৃহদাংশ ব্যাখ্যা করা যাবে। চীনে সুতো বিক্রির ধারা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে বোম্বাইয়ের বয়নকলগুলির উৎপাদন। কিন্তু পাটজাত দ্রব্য ও তুলোজাত সুতোর বিক্রিকে শিল্পদ্বয়ের বার্ষিক বিনিয়োগের সঙ্গে মিলিয়ে একটি সরল নক্সা রচনা করা বেশ দুরূহ।

ধরা যাক, মুনাফা অর্জনের সুযোগ সম্পর্কে সব উদ্যোক্তা একই ধারণা পোযণ করেন, অর্থাৎ সাম্প্রতিক অতীতে বিক্রি ও ব্যয় সম্পর্কে তাঁরা কমবেশি একই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন এবং তাঁরা এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একইভাবে ভবিষ্যৎ-প্রত্যাশা স্থির করেন। এক্ষেত্রে, সব উদ্যোক্তার পরিকল্পনা যদি সমন্বিত না করা হয় তবে যে কোনো পরিবর্তনের, বিশেষ করে, অনুকূল পরিবর্তনের ধারণা অতিরঞ্জিত আকার ধারণ করবে। কোনো উদ্যোগী সংস্থার অতিরঞ্জনের মাত্রা কতটা হবে তা বলতে গেলে প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক অবস্থার

অনুপুঙ্খ তথ্য জানা চাই, আরও জানা চাই যে অনুকূল পরিবর্তনের উদ্দীপণায় কত নতুন প্রতিষ্ঠান সেই শিল্পে বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসবে। ধরা যাক, সব সংস্থা শিল্পের গোটা বাজারের একই অংশ নিজেদের জন্যে বজায় রাখতে চায় এবং তারা সেই শিল্পে চাহিদার মোট পরিবর্তনের সঠিক অনুমান করতে পারে। এই অনুমানের ভিত্তিতে এ-কথা বলা যেতে পারে যে মোট বিনিয়োগ কতটা বদলাবে তা নির্ভর করবে সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিক্রি কতটা বেড়েছে তার উপর। পূর্ব পরিকল্পিতভাবে সমন্বয় না ঘটলেও এ রকম পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে (এখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, সব সংস্থাই ন্যায্য মুনাফা পাচ্ছে)। এই যুক্তি পরম্পরায় বিক্রি বা মুনাফার বৃদ্ধির খুব অতিরঞ্জিত প্রতিক্রিয়া বিনিয়োগের উপর পড়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু এখানে এও ধরা হচ্ছে যে নতুন প্রতিষ্ঠান শিল্পে প্রবেশ করে পুরনোদের বাজারে ভাগ বসাবে না। এ দেশের পাটশিল্প নিয়ন্ত্রণ করত ব্রিটিশ ম্যানেজিং এজেন্সি সংস্থাগুলি। তাদের সামাজিক ও ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরস্পরের মধ্যে প্রচুর মিল ছিল, তেমনই ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট তথ্য, অর্থ সামর্থ ও শিল্পের বাজারে আদান প্রদানের ক্ষমতাতেও তাদের মধ্যে মিল ছিল। এ সব কারণে পাটশিল্পে যোগান-চাহিদার পরিবর্তন অনুসারে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তাদের ছিল। কিন্তু কোনো একটি ম্যানেজিং এজেন্সি সংস্থা গোটা শিল্পের উপর কর্তৃত্ব করবার অবস্থায় ছিল না এবং কয়েকটি বড় বড় ম্যানেজিং এজেন্সি পাটজাতদ্রব্যের দ্রুত সম্প্রসারণশীল বাজারের সিংহভাগ দখলের চেষ্টা করছিল উঁচুহারে বিনিয়োগের মাধ্যমে। কয়েকটি নতুন ম্যানেজিং এজেন্সিও মাঠে নেমে পড়েছিল। ফলত, সমগ্র শিল্পের 'কাম্য' উৎপাদন ক্ষমতার সঙ্গে বিনিয়োগের নিকট সঙ্গতি সাধনের নিশ্চয়তা দানের জন্যে প্রয়োজনীয় যে দুটি শর্ত আমরা উল্লেখ করেছি তার কোনোটিই পাটশিল্পের ক্ষেত্রে বলবৎ ছিল না।

আরও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখলে আমাদের মানতে হবে যে বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংস্থার অভিজ্ঞতা, প্রত্যাশা ও আর্থিক অবস্থা এক নয়। কীভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রত্যাশা রূপায়িত হয় সে সম্পর্কে গভীর জ্ঞান না থাকলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হয় না। যাই হোক, ব্যবসায়ীদের প্রত্যাশা যদি কতকগুলি সরল নিয়ম অনুসরণ করে এবং যদি আমরা বলতে পারি গড় প্রত্যাশার উপরে বা নিচে বিভিন্ন বিনিয়োগকারীর প্রত্যাশা কীরকম অনুপাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে, তা হলে আমরা যদিও ঠিক কোন্ ব্যবসায়ী সংস্থা কতটা বিনিয়োগ করবে বলতে পারি না, কিন্তু মোট বিনিয়োগ কতটা হবে তার সম্পর্কে একটা মোটা দাগের ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি।[১২]

বিদেশের বাজারে পাটজাত দ্রব্যের মোট বিক্রয়ের মতো সমষ্টিগত চলনরাশির পরিবর্তনে দেশীয় উৎপাদকদের ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া এবং তার পরিসংখ্যানগত বিস্তার কোন্ সূত্রের দ্বারা চালিত হচ্ছে তা এমনকি আন্দাজ করার মতো সংখ্যাতথ্যও আমাদের সংগ্রহে নেই। তার ফলে পাট বিক্রয়ের পরিমাণের পরিবর্তনকে 'মজুত মূলধনের কাম্য পরিমাণের' সঙ্গে স্থূলভাবে সম্পর্ক-যুক্ত করার চেষ্টায় সন্তুষ্ট থাকতে হয়। গোটা শিল্পের কাম্য মজুত মূলধনের পরিমাণের একটি কাছাকাছি অঙ্ক পাওয়া যাবে প্রত্যাশিত বিক্রয়কে প্রান্তিক মূলধন ও উৎপাদনের অনুপাত (marginal capital-output ratio) দিয়ে গুণ করে। বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ব্যষ্টিভিত্তিক পরিকল্পনার সমষ্টিগত ফল স্বভাবত এমন কাম্য মজুত

মূলধনের পরিমাণের বেশি বা কম হবে। কারণ দুটি—প্রথমত, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ; দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তিগত অবস্থার পার্থক্য, এবং তজ্জনিত কাঙ্খিত বিনিয়োগের পরিমাণের পার্থক্য।

কিন্তু ভারতের পাট শিল্প কতকগুলি বিশেষ সুবিধার অধিকারী ছিল। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ডাণ্ডির পাটশিল্প থেকে ভারতের উৎপাদন ব্যয় অনেক কম ছিল এবং তার ফলে বিশ্বের বাজারে ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের বিক্রি আনুপাতিকভাবে বেড়ে যাচ্ছিল। পাটকলগুলি একজোট হয়ে ইণ্ডিয়ান জুট ম্যানুফ্যাক্চারার্স অ্যাসোসিয়েশন (যার পরে নাম হয় ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্) গঠন করেছিল। তা ছাড়া, এই শিল্প কার্যত নিয়ন্ত্রণ করত ডজনখানেক ব্রিটিশ ম্যানেজিং এজেন্সি সংস্থা। বিশ্ববাজারে পাটদ্রব্যের দামের উপর কলকাতার মিলগুলির উৎপাদনের যথেষ্ট প্রভাব পড়ত। সেইজন্য কলকাতায় শিল্পপতিরা যখন বিনিয়োগের পরিকল্পনা স্থির করত, তখন তারা নিজেদের কলের বিক্রি কত বাড়ছে তার দিকে সঙ্গতভাবেই নজর দিত। অন্য দেশের প্রতিযোগী হঠাৎ করে ভারতের পাটকলের বাজার দখল করে ফেলবে, এই ভয় যেমন অমূলক ছিল তেমনই অন্য দেশে অবস্থিত পাট শিল্পের বাজাবের উপর ভারতীয় পাটজাত দ্রব্য চড়াও হলে তার প্রতিফল ভোগ করতে হতো এবং ভারতীয় পাটপণ্যের আমদানির উপর শুল্ক বেড়ে যেত।

বিশ্বে পাট বিক্রয়ে ভারতের পাটশিল্পের অতিরিক্ত অংশ বৃদ্ধির কয়েকটি অন্তরায় ছিল। (১) অন্যদেশে পাট শিল্প যেখানে ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছিল সেখানে কলে উৎপাদনের চলতি অথবা পরিবর্তনশীল (variable) ব্যয় উঠে গেলেই কল চালানো যেত কারণ স্থায়ী উৎপাদন সামগ্রী (প্রধানত বাড়ি, যন্ত্রপাতি) তো তার আগেই কেনা হয়ে গেছে। মিলে উৎপাদনের ওঠানামার সঙ্গে তো ঐ স্থায়ী উৎপাদন সামগ্রী বাবদ ব্যয়ের হেরফের হবে না। (২) ভারতীয় পাটকলগুলি যদি তাদের উৎপন্ন সামগ্রীর দাম কমিয়ে তাদের বাজার বাড়াতে চাইত, তা হলেই যে-দেশে ইতিমধ্যে পাটশিল্প গড়ে উঠেছিল তাদের কাছ থেকে প্রত্যাঘাত নেমে আসার ভয় ছিল। আর তাদের নিজেদের শিল্প—বিশেষ করে কমজোরি অযথা ব্যয়ভারাক্রান্ত শিল্প—বাঁচাবার জন্যে পাটকলের উৎপন্ন জিনিসের আমদানির উপর শুল্কহার বাড়িয়ে দিত। (৩) তাছাড়াও, ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ ম্যানেজিং এজেন্সিগুলি বোধ হয় ডাণ্ডির শিল্পের বাজার খুব তাড়াতাড়ি দখল করে নিতে চায়নি। পাটশিল্পে নিযুক্ত কোম্পানিগুলির ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা খুব সমধর্মী ছিল। এর কারণ মিল মালিক ও ম্যানেজারদের রাজনৈতিক বা সামাজিক পটভূমি ছিল খুব একরকম আর বিদেশী বাজারের সঙ্গে তাদের যোগসূত্রও ছিল একই ধরনের (পাটজাত দ্রব্যের বাজার ছিল প্রধানত অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ আমেরিকায়)। তাই বিক্রয়ের ও মুনাফার অনুকূল পরিবর্তনে প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশের প্রতিক্রিয়া ছিল একই রকম। এতে এক কালে বিনিয়োগ গুচ্ছবদ্ধ হতো, পরবর্তী কালে চলতি দামে উৎপাদনের থেকে বিক্রি হতো কম এবং মুনাফা হ্রাস পেত ও মজুত যেত বেড়ে। ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ অ্যাসোসিয়েশন তখন কাজের সময় সীমিত করতে সাধারণত সফল হতো। পাটদ্রব্যের সম্প্রসারণশীল বিশ্ববাজার ও ভারতের পাটকল শিল্পের অনুকূল অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে উৎপাদন-ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে বিক্রি বেড়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া আবার শুরু হতো।

ভারতের যে প্রধান শিল্পগুলিতে বড় রকমের বিনিয়োগ আকৃষ্ট হচ্ছিল তার মধ্যে বস্ত্রশিল্প ছিল অন্যতম। আগেই বলা হয়েছে, রপ্তানিযোগ্য সুতো উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র ছিল বোম্বাই, এবং বোম্বাইয়ের সুতোকলগুলি মূলত নির্ভর করত চীন দেশে সুতো রপ্তানির উপর। গত শতাব্দীর নব্বই-এর দশকে চীনে বৈদেশিক মুদ্রাসংক্রান্ত সমস্যা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা থাকা সত্ত্বেও, পাকানো এবং ও অন্য সুতোর ভারতীয় রপ্তানি ১৮৮৯-৯০ থেকে ১৮৯৯-১৯০০-র মধ্যে ১৪৩.২ মিলিয়ন পাউন্ড থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ২৪২.৬ মিলিয়ন পাউন্ড। ১৯০০-০১-এ বোম্বাইতে প্লেগ মহামারীর ফলে ভারতের মোট রপ্তানি কমে দাঁড়িয়েছিল ১১৯.৩ মিলিয়ন পাউন্ড। পাকানো সুতো ও অন্য সুতোর মোট রপ্তানির উন্নতি ঘটল এবং ১৯০৫-৬-এ তার পরিমাণ দাঁড়াল ২৯৮.৫ মিলিয়ন পাউন্ডে। কিন্তু পরবর্তীকালে মন্দা দেখা দিল : পাকানো সুতো ও অন্য সুতোর ভারতীয় রপ্তানির পরিমাণ ১৯১১-১২-য় ছিল ১৫২.৩ মিলিয়ন পাউন্ড এবং ১৯১৩-১৪-য় ১৯৮.৯ মিলিয়ন পাউন্ড।

বিপরীত দিকে ভারতে তুলোজাত দ্রব্যের দেশীয় চাহিদা দৃঢ়ভাবে বেড়ে চলেছিল। ব্যতিক্রম মাত্র ১৮৯৬-৯৭ ও ১৮৯৯-১৯০০-এর দুর্ভিক্ষের কাল। তুলোজাত দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ উৎপাদনও বাড়ছিল। দেশীয় বাজারের দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়ার পক্ষে বোম্বাইয়ের মিলগুলির উৎসাহের যথেষ্ট কারণ ছিল। ১৯০০-০১ ও ১৯১৩-১৪-র[১৩] মধ্যে পণ্য আমদানির মোট পরিমাণের মধ্যে ৩৬%-এর বেশি ছিল তুলোজাত দ্রব্য এবং এই দ্রব্যের মোট আভ্যন্তরীণ ভোগের মাত্র ৩৪% যোগান দিত তুলোর কল ও হস্তচালিত তাঁত।[১৪] তাই, আমদানির পরিবর্তে দেশীয় উৎপাদনের বিরাট সুযোগ ছিল। ভারতীয় মিলে উৎপন্ন সুতোর দ্বারা গ্রেট ব্রিটেন থেকে সমজাতীয় পণ্যের আমদানি অপসারণের সুযোগও ছিল যথেষ্ট। অতএব, ভারতীয় সুতোকলগুলিতে সম্ভাব্য নতুন বিনিয়োগ নির্ভর করত তিনটি বিষয়ের উপর। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল, থানকাপড়ের আমদানি অপসারণ, দ্বিতীয়ত, চীন ও জাপানের প্রতিযোগিতা থেকে চীনে গড়ে ওঠা ভারতীয় সুতোর বাজারকে রক্ষা করা, তৃতীয়ত, ভারতীয় হস্তচালিত তাঁতের প্রয়োজনে আমদানি করা সুতোর পরিবর্তে ভারতীয় মিলে উৎপন্ন সুতোর যোগান দেওয়া। সম্ভাব্য বিনিয়োগ নির্ধারণ তিনটি বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভারতীয় মিলগুলিতে এক ধরনের বিশেষীকরণের উন্মেষ ঘটেছিল। চীনের বাজারে বোম্বাইয়ের রপ্তানি অব্যাহত থাকল এবং সেখানকার শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করতে থাকল চীনের বাজারে সুতো রপ্তানির হারের উপর। হস্তচালিত তাঁত শিল্পের মোটা সুতোর চাহিদা প্রধানত মেটাত পশ্চিম ভারত থেকে দূরে অবস্থিত কেন্দ্রগুলি ; বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত আমেদাবাদ ভারতীয় বাজারে থান কাপড়ের যোগান দিত। কিন্তু এই তিন ধরনের কেন্দ্রে উৎপাদন মূলত নির্ভর করত থান কাপড়ের দেশীয় বাজারের উপর।

থান কাপড় আমদানির একটি বড় অংশকে সমজাতীয় দেশীয় পণ্যের যোগানের মাধ্যমে যে অপসারণ করা যায় তার সম্ভাবনা সম্পর্কে শিল্পপতি ও রাজনীতিবিদরা যথেষ্ট সজাগ ছিলেন।[১৫] কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ভারতীয় মিলের মালিকরা থান কাপড়ের আভ্যন্তরীণ চাহিদার সর্বাংশ উৎপন্ন করার লক্ষ্য গ্রহণ করেননি কিছু সঙ্গত কারণে : (ক) মিহি সুতো বয়নে ও মিহি কাপড় উৎপাদনে ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলগুলি অনেক বেশি নিপুণ ছিল।

(খ) শিল্পজাত পণ্যের বাণিজ্যিক জাল ম্যাঞ্চেস্টারে উৎপাদিত থান কাপড় আমদানির সঙ্গে বাঁধা ছিল। ভারতীয় মিলের কাপড় সম্বন্ধে ব্যবসায়ীদের ও ক্রেতাদের যে নাক-উঁচু ভাব ছিল তাতেই ম্যাঞ্চেস্টার মিলের কাপড়ের বাজার সংরক্ষিত হতো ; সেই সংরক্ষণের বাধা অতিক্রম করা খুবই প্রয়াসসাধ্য ছিল। কলকাতা যোগান দিত যে বাজারে, বিশেষ করে সে ক্ষেত্রেই এই বাধার প্রাচীরটি ছিল দুর্লঙ্ঘ্য। কলকাতা ছিল প্রাচ্যের বৃহত্তম একক থান কাপড়ের বাজার এবং এই বাজারটির উপরে ব্রিটেনের যোগসাজসে চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল ব্রিটিশ ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসগুলি। (গ) ভারতে উৎপন্ন তুলো প্রধানত ক্ষুদ্র-আঁশ প্রকৃতির এবং মিহি সুতো বয়নের পক্ষে এই ধরনের তুলো উপযুক্ত ছিল না।

এই সব প্রতিবন্ধকের মধ্যে শেষটি ছিল সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ। মোটা সুতো ও কাপড়ের ক্ষেত্রে শ্রম-ব্যয়ের প্রভেদাত্মক সুযোগই ল্যাঙ্কাশায়ারের তুলনায় ভারতীয় শিল্পকে সুবিধা দিয়েছিল। মিশর থেকে ভারতে অথবা গ্রেট ব্রিটেনে পাঠানো দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলোর পরিবহন ব্যয়ের খুব বেশি কিছু পার্থক্য থাকবে না। পরিবহন ব্যয়ের দিক থেকে মার্কিনী তুলোর আমদানিতে গ্রেট ব্রিটেনের একটা সুবিধা ছিল। কাঁচা তুলোর দামের তুলনায় তার পরিবহন-ব্যয় ছিল অতি সামান্য। ভারতীয় শ্রমিকরা মোটা সুতো কাটায় দক্ষ হয়ে উঠেছিল। মিহি সুতো উৎপাদনেও যে তারা সমান দক্ষতা অর্জন করতে পারে, এরকম কোনো আস্থা ভারতীয় মিল মালিকদের ছিল না। এই কারণে আঁশযুক্ত তুলো আমদানি করা এবং দেশীয় কারখানায় তা থেকে বস্ত্র বয়নের কাজ চালানো তখন সম্ভব হয়নি। তুলোর সুতো বা থান কাপড়ের উপর কোনো শুল্ক সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না। তাছাড়া, ক্রেতারা নিশ্চিতভাবে এই ধারণা ঘোষণা করতেন যে ল্যাঙ্কাশায়ারে উৎপাদিত মিহি থানকাপড়ের তুলনায় ভারতীয় পণ্য নিকৃষ্ট। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় মিলগুলির উন্নয়নে সতর্ক পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল। কিছু শুল্ক সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেই পরিস্থিতি বদলে যেত। তখন ভারতীয় মিলে নতুন ধরনের সুতো ও থান কাপড় ব্যাপক হারে উৎপাদন সম্ভবপর হতো। দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলোজাত বস্ত্রের বাজার অপেক্ষাকৃত বেশি লাভজনক থাকায় ভারতীয় কার্পাস-উৎপাদনকারীদের উৎসাহিত করা যেত ঐ ধরনের তুলোর বৃহদাকারে চাষে। শুল্ক সংরক্ষণের সুযোগ ছাড়াও শুধুমাত্র আমেদাবাদের মিলগুলি এবং বিচ্ছিন্নভাবে বোম্বাইয়ের দুই-একটি মিল মিহি সুতোর থান কাপড় উৎপাদনের প্রয়াস নিয়েছিল।[১৬]

১৯০০-০১ থেকে ১৯১৩-১৪ পর্যন্ত ভারতে থানকাপড়ের মোট আমদানি বেড়েছিল প্রায় ৫০ শতাংশ। এই তথ্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে ভারতীয় মিলগুলির উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় বাজারে চাহিদার প্রান্তিক বৃদ্ধি অনুসারে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা ; অর্থাৎ অনুমান করা হতো ভারতের বাজারে ম্যাঞ্চেস্টার থেকে আমদানি করা পণ্যের সরবরাহ অব্যাহত থাকবে এবং বাজারের এই অংশটিতে দেশীয় শিল্প ভাগ বসাতে পারবে না। যাই হোক, এই সময়ে মোট আমদানিতে উন্নতমানের পণ্যের ভাগ যথেষ্ট বেড়েছিল এবং ভারতীয় মিলগুলিও অপেক্ষাকৃত মিহি সুতো (২০ সুতোর বেশি) উৎপাদনে পারদর্শী হয়ে উঠছিল। দেশীয় মিলগুলি বস্ত্র বয়নে এই সুতোর ব্যাপক ব্যবহারও আরম্ভ করে, কিন্তু মোট সুতো উৎপাদনে ৪০ বা তদোর্ধ্ব কাউন্টের সুতোর ভাগ বেশ কম থেকে গিয়েছিল। ভারতীয় মিলগুলি ৪০ কাউন্ট পর্যন্ত সুতো থেকে বয়নের প্রযুক্তি আয়ত্ত করে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির

করছিল—এই অনুমানের যৌক্তিকতা স্বীকার করলে দেশীয় বস্ত্র শিল্পে নতুন বিনিয়োগের তৎকালীন ইতিহাস পুনর্লিখনের প্রয়োজন দেখা দেবে। দেশীয় পণ্য উৎপাদনের মানোন্নয়ন কত দ্রুত ঘটবে তা নির্ভর করত নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর—ম্যাঞ্চেস্টারের উৎপাদক ও ভারতে তাদের বন্টনকারীদের প্রতিরোধের তীব্রতা, চীনে সুতো বিক্রিতে নিয়োজিত বোম্বাইয়ের বৃহৎ কোম্পানিগুলির ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা এবং মিহি সুতো ও থান কাপড় উৎপাদনে মিলগুলির দক্ষতা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি থেকে প্রধান প্রধান ভোগ্যদ্রব্যের উপব এবং কিছু কিছু উৎপাদক দ্রব্যের উপর আমদানি শুল্ক বসানো হয়েছিল। যুদ্ধের পরের কয়েকবছব কাটল অনিশ্চয়তায়, এবং তার পরে প্রভেদাত্মক সংরক্ষণের নীতির ভিত্তিতে শিশু-শিল্প সংরক্ষণের ব্যবস্থাকে শর্তাধীন সরকারি অনুমোদন দেওয়া হলো। সরকাবের আর্থিক প্রয়োজনে তিরিশের দশকের গোড়া থেকে এই অনুমোদন আরও কার্যকর করা হয়েছিল। বেসরকারি পণ্য-প্রস্তুতকারী শিল্পের দক্ষতা ও অগ্রগতির হারের উপর শুল্ক-সংরক্ষণের ফলাফলগুলি বিশ্লেষণ কবা সে কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায়ের পরবর্তী অনুচ্ছেদে এবং পরিশিষ্টে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।

১.২ শুল্ক-সংরক্ষণ ও অনগ্রসর দেশের শিল্পের দক্ষতা

শুল্ক-সংরক্ষণের তাত্ত্বিক আলোচনায় এই অনুমানগুলি করা হয়ে থাকে—বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা, সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার এবং নিশ্চল বিনিযোগ। তুলনা করা হয় সংরক্ষণের আগের ও পরের ভারসাম্য অবস্থানের মধ্যে। বিশ্লেষণটি থেকে যে সিদ্ধান্তে আসা যায় তা কোনো ভাবাদর্শের আভাস দিতে পারে, কিন্তু অনগ্রসর দেশের পক্ষে উপযুক্ত কোনো বাস্তবসম্মত নীতি নির্দেশ কবে না।

এই ধরনের নিশ্চল বা গতিহীন বিশ্লেষণ থেকে আর যে-সব সিদ্ধান্ত করা যায় তার মধ্যে একটি উল্লেখ্য : প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনের সমস্ত শর্তগুলি যদি কিছু শিল্প মেনে চলে তাহলে অবশিষ্ট শিল্পের ক্ষেত্রে সংরক্ষণের মাত্রা যত বাড়বে সমগ্র অর্থনীতির পক্ষে প্যারেটো বর্ণিত সব চেয়ে অনুকূল অবস্থা থেকে তত বিচ্যুতি ঘটবে। এই সিদ্ধান্তে আসতে গেলে অনুমান করতে হয় যে ভোগকারীদের পছন্দ সঙ্গতিপূর্ণ এবং তা কখনো পূর্ণ তৃপ্তির বিন্দুতে পৌঁছাবে না। তাছাড়া, ধরে নেওয়া হচ্ছে যে সংরক্ষণ তাদের পছন্দ-অপছন্দের কোনো তারতম্য ঘটাবে না। যাই হোক, অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে নীতি-প্রণেতারা যদি সংশ্লিষ্ট না'ও হন এবং যদি অর্থনীতিটির সমস্ত অপর্যাপ্ত সম্পদের পূর্ণ নিয়োগ ঘটেও থাকে, এ ধরনের সিদ্ধান্ত অবাধ বাণিজ্য নীতির পক্ষে কোনো তাৎক্ষণিক নির্দেশ দেয় না। কারণ, এক বা একাধিক আমদানি-করা পণ্যের উপর শুল্ক বসিয়ে একটি দেশ লাভবান হতে পারে। ১৯০৬ সালেই বিকারডাইক তা দেখিয়েছিলেন।[১৭] যখন আমরা অর্থনৈতিক প্রসারকে একটি ঘোষিত লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করি এবং অনিয়োজিত সম্পদের অস্তিত্ব বিবেচনা করি তখন অবাধ বাণিজ্যের অনুকূলে নিওক্লাসিক্যাল যুক্তির প্রাসঙ্গিকতা আরও তীব্রভাবে হ্রাস পায়। প্রথমত, সমহার উৎপন্ন বিধি কার্যকর হচ্ছে এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে উৎপাদনশীলতা বাড়ছে না—এরকম কোনো

পরিস্থিতিতে শুল্ক সংরক্ষণের স্তরোন্নয়নের ফলে সংশ্লিষ্ট শিল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়তে পারে। তাছাড়া, এইভাবে সম্ভাব্য সঞ্চয় যদি প্রকৃত বা নতুন সঞ্চয়ে পরিণত হয়, তবে মোট মূলধনের মজুতে এটি হবে একটি সংযোজনা। মূলধনই যদি শিল্পের নৈপূণ্যকে সীমায়িত করছে ধরে নেওয়া হয় তবে জাতীয় আয়ের নীট সংযোজনা হবে সংরক্ষণপ্রাপ্ত শিল্পের উৎপাদনের নীট বৃদ্ধির সমান। বিভিন্ন শুল্ক-হারের বৃদ্ধিতে ক্রেতারা অবশ্যই সাড়া দেবে এবং তাদের মোট ব্যয়ের পুনর্বিন্যাস ঘটাবে। তার ফলে বিভিন্ন পণ্যের দাম বাড়তে পারে—সংরক্ষিত পণ্যেরও। এই বিষয়টি বিবেচিত না হলে জাতীয় আয়ের সংযোজনার সঙ্গে প্রদত্ত শিল্পের বর্দ্ধিত উৎপাদনের সম্পর্কের সূত্রটি অর্থবহ হবে না।

দ্বিতীয়ত, হাতে কলমে কাজ শেখা ও তার প্রয়োগ সংরক্ষিত শিল্পের উৎপাদনের উৎকর্ষ যে কতটা বাড়াবে তার উপর নির্ভর করবে শুল্ক সংরক্ষণের চূড়ান্ত ফলাফল। যোগানের দিক থেকে যেসব শিল্প সংরক্ষিত শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত তাদের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। শুল্কের হার যথেষ্ট চড়া হলে ঐ সব শিল্পগুলিতে দক্ষতা বৃদ্ধির অনুকূল বাতাবরণ দ্রুত সৃষ্টি হবে এবং অর্জিত কারিগরী কুশলতার প্রসার ঘটবে। ক্রমবর্দ্ধমান উৎপন্নবিধি প্রবলভাবে কার্যকর হচ্ছে এমন কোনো বিশেষ শিল্পের উৎপাদনের মাত্রার উপর হাতে কলমে কাজ শেখার ফল যে-ভাবে বর্তাবে তা থেকে উৎসারিত হবে বাহ্যিক ব্যয় সংক্ষেপের সুবিধা। এর অন্তত কিছু অংশ আত্তীভূত করতে পারে বৃহত্তর ফার্মগুলি। উৎপাদনের কারিগরি দক্ষতার এই উন্নতির ফলে ভোগ্যপণ্যের দাম কতটা কমবে বা আদৌ কমবে কিনা তা নির্ভর করবে অন্তত দেশে ও বিদেশে সেই শিল্পের বাজারে প্রতিযোগিতার তীব্রতার উপর। কিন্তু এসব সত্ত্বেও জাতীয় উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটতে পারে, এমনকি পণ্যের দাম না-কমলেও।

কোনো সংরক্ষিত শিল্পে নৈপূণ্য ও উৎপাদন বাড়লে জাতীয় আয়ের প্রকৃত মূল্য কতটা বাড়বে তা নির্ভর করবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর : (ক) সম্ভাব্য সঞ্চয়[১৮] ও উৎপাদনের পরিপূরক উপকরণ নিয়োগের মাত্রা ; (খ) সংরক্ষণপ্রাপ্ত শিল্পটির নতুন প্রতিযোগিতা প্রতিহত করার ক্ষমতা (যা নির্ধারিত হবে শিল্পের প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও প্রাকৃতিক সম্পদের বিশিষ্টতা এবং অর্থনীতিটিতে বিভিন্ন পণ্যের মোট চাহিদার সাপেক্ষে শিল্পটির অন্তর্গত কোনো যোগ্য ফার্মের ন্যূনতম আয়তনের দ্বারা) এবং (গ) সংরক্ষিত শিল্পে এবং যোগানের দিক থেকে তার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য শিল্পে আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপের ও হাতে কলমে কাজ শেখার প্রক্রিয়াটির কার্যকারিতা।

১.৩ সংরক্ষিত দেশীয় বাজারের প্রয়োজনে উৎপাদনরত শিল্পে বিনিয়োগ

যদি শুল্ক-সংরক্ষণ বিদেশী উৎপাদনকারীদের একটি বড় অংশকে দেশের বাজারে অনুপ্রবেশের পথ রোধ করতে সমর্থ হয় এবং যদি অনুমান করা হয় যে সঞ্চয়ের স্বল্পতায় ও ব্যবস্থাপনার শৈথিল্যে বিনিয়োগ সীমায়িত হবে না তাহলে আমদানি-শুল্ক আরোপের পূর্ববর্তী মোট দেশীয় চাহিদাকে শিল্পপতিরা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে গ্রহণ করতে

পারে। সংরক্ষণমূলক শুল্ক আরোপের ফলে পণ্যটির দাম বৃদ্ধি এবং তজ্জনিত চাহিদা হ্রাসের সম্ভাবনাকে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ণয়ে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।

সংরক্ষিত শিল্পে সময়ের সাথে বিনিয়োগ কীভাবে পরিবর্তিত হবে তা ১.১ রেখাচিত্রে দেখানো হয়েছে দুটি অনুমানের ভিত্তিতে। প্রথমত, সংরক্ষিত শিল্পে বিনিয়োগ কাম্য ও প্রকৃত মজুত মূলধনের পার্থক্যের সমানুপাতিক হবে (দেশীয় ভোগ্যব্যয়ের পরিমাণকে প্রান্তিক মূলধন/উৎপাদনের অনুপাত দিয়ে গুণ করে কাম্য মজুত মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়)। দ্বিতীয়ত, শিল্পটিতে সংরক্ষণ ও নতুন বিনিয়োগের মধ্যে সময়ের দিক থেকে ছেদ থাকবে। এই ছেদের মাত্রা নির্ধারণে অনুমান করে নিতে হবে মূলধন দ্রব্যের সরবরাহ, নির্মাণের (construction) কাজ এবং মুনাফার নতুন ক্ষেত্র সন্ধান সংক্রান্ত প্রক্রিয়াটি অভিন্ন সময় জুড়ে চলবে না, বরং তাতে ছেদ পড়বে অনিয়মিত সময়ের ব্যবধানে। ১.১ রেখা চিত্রের বিনিয়োগ রেখাটির আকৃতি ১৯৩০-৩৯ সময়কালের ভারতের চিনি শিল্পে বিনিয়োগের গতিপথের অনুরূপ (তালিকা ১ দ্রষ্টব্য)। ঐ রেখা অঙ্কনের যৌক্তিকতা অনেকটা এরকম : সংরক্ষণ দেশীয় উৎপাদনের মাধ্যমে আমদানি অপসারণের যে সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে তার

রেখা-চিত্র ১.১
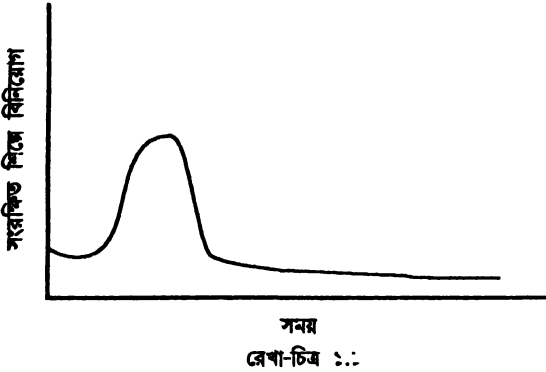
ফলে শিল্পটিতে বিনিয়োগ দ্রুত বাড়বে। কারখানার স্থান নির্বাচন ও তার পরিকল্পনা, যন্ত্রপাতি নির্বাচন এবং বিদেশ থেকে (ভারতের ক্ষেত্রে গ্রেট ব্রিটেন) কেনা যন্ত্রপাতি পরিবহন সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। অতএব বিনিয়োগের নতুন সুযোগ আসার সঙ্গে সঙ্গে নয়, কিছুকাল পরে, যন্ত্রপাতির আমদানি সর্বোচ্চ মাত্রায় ঘটতে থাকবে (পুরনো যন্ত্রপাতি অপসারণের প্রয়োজনে অথবা প্রতিষ্ঠিত ফার্মের সম্প্রসারণের জন্যে কিছু পরিমাণ আমদানি আগে থেকেই হতে থাকবে, সুতরাং বিনিয়োগের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার পরে যেসব যন্ত্রপাতির বরাত দেওয়া হবে তা দেশে পৌঁছনোর আগেও ঐ খাতে বিনিয়োগ শূন্য হবে না)। কিছুকাল পরে, সম্ভবত বিনিয়োগ সর্বোচ্চ হওয়ার আগেই বিনিয়োগকারীরা বুঝতে আরম্ভ করে যে তাদের হিসাবের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণ বিনিয়োগ ঘটতে চলেছে। কারখানা স্থাপনের ভাল জায়গা তখন ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য ও ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে, বিনিয়োগের প্রত্যাশিত প্রতিদান কমে যায় এবং বিনিয়োগ নিম্নগামী হয়। কিন্তু সুপরিচালিত কিছু ফার্ম স্বাভাবিকের থেকে বেশি মুনাফা অর্জন করে এবং পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধার উন্নততর ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যয় কমবে

আশায় তারা বিনিয়োগ অব্যাহত রাখে। ফলে নতুন বিনিয়োগ আকস্মিকভাবে কমে না, ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে যায়। যেহেতু নতুন বিনিয়োগের প্রধান অংশ সংঘটনের পরে মজুত মূলধনের পরিমাণ আগের তুলনায় বেড়ে যায়, যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন ও তার ক্ষয়ক্ষতি পূরণের প্রয়োজন মেটাতে স্বাভাবিক মোট বিনিয়োগ সংরক্ষণ-পূর্ববর্তী বিনিয়োগের স্তরকে অতিক্রম করে যায়। এই কারণে ভারতীয় চিনি শিল্পের বিনিয়োগ-রেখাটির (তালিকা ১) ডানদিকের প্রান্তদেশ বামদিকের তুলনায় উচ্চতর।
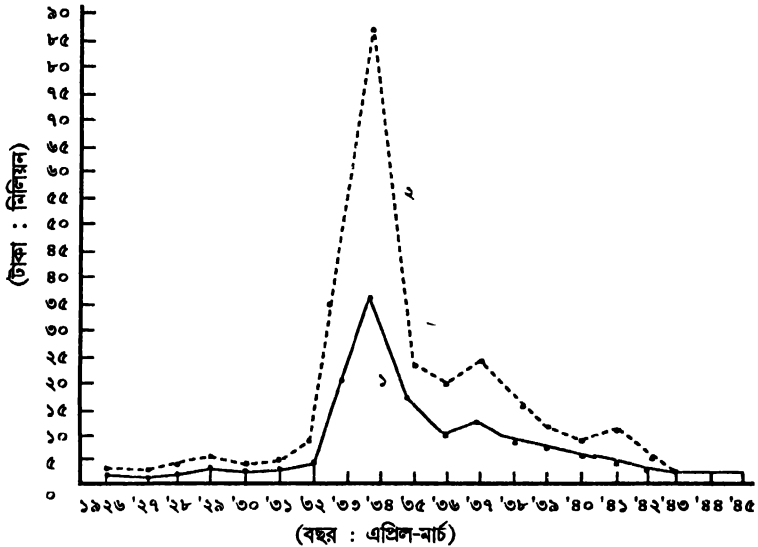
তালিকা চিত্র ১

তালিকা : ভারতে চিনিশিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানির আর্থিক (রেখা ১) ও প্রকৃত (রেখা ২)মূল্য

সমস্ত শিল্পের বিনিয়োগ বস্তুত ১.১ চিত্রের অনুরূপ কিনা তা অংশত নির্ভর করে উদ্যোক্তাদের 'জৈব শক্তির'[১১] উপর। এরকম যুক্তি দেওয়া যায় যে বিনিয়োগ ও তার বৃদ্ধির হার বেশি হলে আয় বৃদ্ধিব হারও বেশি হবে, তার ফলে সমস্ত শিল্প পণ্যের চাহিদা প্রসারের হারও চড়া থাকবে। এই যুক্তি উদ্যোক্তাদের আশাবাদকে সমর্থন করে। কোন নির্দিষ্ট দ্রব্যের দেশীয় চাহিদা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগকারীদের সাড়া দেওয়ার ধরন ১.১ রেখা চিত্রের বর্ণনার মতো হতে পারে। কিন্তু পণ্যটির দেশীয় চাহিদা অবিচল সমানুপাতিক হারে বাড়লে মোট বিনিয়োগেরও ঐ রকমভাবে বাড়ার ঝোঁক থাকবে। একটি নির্দিষ্ট সময়ে সংঘটিত প্রকৃত বিনিয়োগ হবে বিনিয়োগের নানা ধারার সমষ্টি। অতীতের বিভিন্ন কালপর্বে দ্রব্যের প্রত্যাশিত দেশীয় চাহিদার বৃদ্ধি বিনিয়োগের ধারাকে অব্যাহত রাখে। সংরক্ষণের সুযোগপ্রাপ্ত সমস্ত শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যগুলির দেশীয় চাহিদার বিভিন্ন স্তর যদি অবিচলভাবে সমানুপাতিক হারে বাড়ে

তাহলে বিশেষ বিশেষ শিল্পের ক্ষেত্রে অথবা সংরক্ষণপ্রাপ্ত সমস্ত শিল্পের ক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ সমানপাতিক হারে বাড়বে (যদিও ঐ বৃদ্ধির হার অবিচল নাও হতে পারে)। তাহলে বিশেষ বিশেষ শিল্পে এবং সংরক্ষণ প্রাপ্ত শিল্পগুলির ক্ষেত্রে বিনিয়োগের প্রবণতা অনেকটা ১ ২ রেখাচিত্রের বর্ণনার সঙ্গে মিলবে (যদিও রেখাটি কোনো অবিচল ও বিশেষ সূচকেব প্রবণতা (exponential trend) নির্দেশ করছে, এটি অনেকগুলি সম্ভাবনার মধ্যে একটি মাত্র বিনিযোগের ক্রমাগত বৃদ্ধি যা ১.১ রেখাচিত্রের বর্ণনা থেকে ভিন্ন।
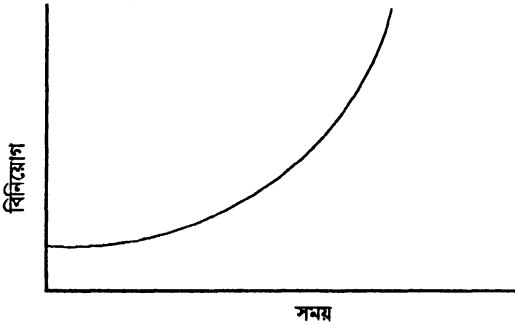
রেখাচিত্র: ১.২

যুক্তির দিক থেকে বলা চলে যে বিভিন্ন শিল্পে বিনিযোগের হাব যদি যথেষ্ট বেশি থাকে এবং তার বৃদ্ধি যদি দীর্ঘস্থাযী হয়, তাহলে চাহিদার সবল ইতিবাচক বৃদ্ধি ঘটবে। কিন্তু অনগ্রসব অর্থনীতির প্রসঙ্গে এ ধরনের যুক্তি যথেষ্ট অর্থবহ নয়। কোনো অনগ্রসর দেশে বড়, মধ্যবর্তী পণ্যশিল্প অথবা মূলধনগঠনশিল্প যদি না থাকে অথবা ঐ সব শিল্প গড়ে তোলার যদি কোনো বিশেষ ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে সে দেশের সংরক্ষিত ভোগ্যপণ্যের শিল্পে প্রাথমিক ব্যয়ের অনেকটাই বিদেশে নির্গমিত হয়ে যাবে। মোট জাতীয় আয়ের তুলনায় সংরক্ষিত ভোগ্যপণ্য শিল্পের মোট চাহিদা যদি সামান্য হয়, এবং/অথবা নির্দিষ্ট শিল্পে মূলধন-শ্রমেব অনুপাত যদি উচুঁ হয়, এবং/অথবা সৃষ্ট অতিরিক্ত আযে পুঁজিপতির অংশ এবং সঞ্চয়ের প্রান্তিক প্রবণতা যদি বেশি হয়, তাহলে মোট জাতীয় আয়ের উপর সংরক্ষিত শিল্পের বৃদ্ধি সামান্য লক্ষণীয় প্রভাব ফেলবে। গুণক প্রতিক্রিয়ার স্বল্পতাই এর কারণ। কোনো অনগ্রসর অর্থনীতিতে জাতীয় আয়ের অর্ধাংশ বা তার কিছু বেশি প্রত্যক্ষভাবে আসে কৃষি থেকে। কাঁচামাল বা ভোগ্যপণ্য পরিবহনের ও বাণিজ্যের মতো অনেক কাজকর্ম নির্ভর করে কৃষির সমৃদ্ধির উপর।তাই আন্তর্জাতিক বা প্রাকৃতিক কারণে কৃষিতে মন্দা দেখা দিলে জাতীয় আয়ের স্তর হ্রাস পায়। কৃষির মন্দার কালে (লেনদেনের হিসাবে (Balance of payments) ঘাটতি বা প্রাথমিক পণ্যের বিক্রি থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব হ্রাসে সরকারের বাজেট ঘাটতির প্রতিরোধে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবে) প্রবর্তিত হলে আয় ও সংরক্ষিত পণ্যের চাহিদার প্রবাহ হবে গতিহীন। এরকম অবস্থায়, শিল্পের স্বনির্ভর অগ্রগতির উপযুক্ত কোনো বিনিয়োগের বিশেষ একটি হার রক্ষা করতে হলে উদ্যোক্তাদের যে শুধুমাত্র উচ্ছল জৈব শক্তিরই প্রয়োজন হয়, তা নয়। প্রয়োজন থাকে এক ধরনের হঠকারিতার যার সঙ্গে সংরক্ষিত শিল্পের যুক্তিসঙ্গত পরিচালনার সম্পর্ক সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আরও বলা যায়, অনুন্নত অর্থনীতিতে শিল্পের তুলনায় কৃষিতে বিনিয়োগে বাধা অনেক বেশি। কিন্তু, বাণিজ্য শর্তের ঝোঁক প্রবলভাবে শিল্পের বিরুদ্ধে গেলে সেক্ষেত্রেও বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রয়াস নিষ্ফল হয়ে যেতে পারে।

সংরক্ষিত দ্রব্যের চাহিদাকে চাঙ্গা করে রাখতে পারে সম্প্রসারণশীল সরকারি ক্ষেত্র। অর্থনীতিকে যদি কেউ আবদ্ধ (closed) বলে মনে করেন এবং চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে যদি সব দ্রব্যের যোগান বাড়ানো সম্ভব হয়, তবে ব্যক্তিগত উদ্যোগাধীন শিল্পক্ষেত্র বৃদ্ধির মৌল উদ্দীপণা আসতে পারে সরকারি ব্যয়ের বারংবার সম্প্রসারণে। অনগ্রসর অর্থনীতির ভোগের প্রান্তিক প্রবণতা অনুমিত স্তরের মতো উঁচু হলে সরকারি ব্যয়ের এক একক বৃদ্ধিতে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটবে কয়েক একক। ব্যক্তিগত উদ্যোগাধীন কোনো জনবহুল অনুন্নত অর্থনীতিতে মূলধনদ্রব্য ও প্রযুক্তিগত দক্ষতার মতো উপাদানের ঘাটতি থাকলে প্রকৃত আয়ের প্রসার ব্যাহত হয় এবং যদি শিল্প ও কৃষি পণ্যের যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি হয় তবে দেখা দেবে মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা। আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে মন্দা এলে তীব্র সঙ্কট দেখা দেবে লেনদেনের হিসাবে এবং অর্থনীতির অগ্রগতি থমকে দাঁড়াবে।

যাই হোক ; বাস্তবে স্বাধীনতার আগে ভারত সরকার চিরন্তন ভারসাম্যের বাজেট নীতি[২০] নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করত। সরকার ভীষণভাবে পরোক্ষ কর অর্থাৎ কৃষি আয়ের (যেহেতু করদাতাদের বেশির ভাগ কৃষক বা কৃষি-নির্ভর) উপর নির্ভরশীল ছিল। তিরিশের দশকে কৃষি আয় সঙ্কোচনের ফলে সরকারের রাজস্বও কমে গিয়েছিল। সরকার স্বভাবতই ব্যয় সঙ্কোচনের নীতি গ্রহণ করে। এমন কোনো নজির নেই যে সরকারি ব্যয়-সম্প্রসারণ বেসরকারি শিল্পের প্রসার ঘটিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত বৈদেশিক লেনদেনের হিসাবে (Balance of payments) সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। তিরিশের দশকে বস্তুত ভারতে সরকারি ও বেসরকারি ব্যয়ের মধ্যে উচ্চমাত্রায় সমান্তরলতা দেখতে পাওয়া যায় (সারণি ১.১ দ্রষ্টব্য)। সরকারি ব্যয় প্রণোদিত জাতীয় আয় বৃদ্ধির হারে ত্বরণের প্রসঙ্গে সরকারি ও

সারণি ১.১ ব্যক্তিগত ভোগ ও সরকারি ব্যয়ের পরিবর্তন, ১৯৩১-২ থেকে ১৯৩৭-৮

	মোট সরকারি বিনিয়োগ (টাকা : মিলিয়ন)	মোট সরকারি ব্যয় (টাকা : মিলিয়ন)	মোট ভোগব্যয় (টাকা : মিলিয়ন)
	(১)	(২)	(৩)
১৯৩১-২	৪৮৮.০	২৭৮৩.৬	২৮০৮৮
১৯৩২-৩	৩৩৭.৬	২৪৮৭.৬	২৫৯৪৭
১৯৩৩-৪	৩৩৪.০	২৫০৩.৩	২৪৮৪৯
১৯৩৪-৫	৩৪০.৪	২৫১৯.১	২৪৪৩৪
১৯৩৫-৬	৪৩৫.৯	২৬৩০.৬	২৪১৩৫
১৯৩৬-৭	৩৫৮.৮	২৫২৩.৫	২৫১৭১
১৯৩৭-৮	৩৫৮.০	২৪৭৮.২	২৫৭৫৬

উৎস : স্তম্ভ (১) ও (২)-এর M. K. J. Thavaraj, 'Capital Formation in the Public Sector in India : A Historical Study, 1898-1938', in V. K. R. Rao, *et al* : *Papers on National Income and Allied Topics,* খণ্ড ১ (বোম্বাই, ১৯৬০), পৃ. ২১৫-৩০, স্তম্ভ (৩)-এর সূত্র : R. C. Desai, *Standard of Living in India and Pakistan, 1931-2 to 1940-41* (বোম্বাই, ১৯৩৫), অধ্যায় ১৬, সারনি ১০৯।

ভোগকারীর ব্যয়ের অনুপাত বৃদ্ধির বিষয়টি লক্ষ্য করা উচিত। যাইহোক কৃষি আয়ের বিপুল হ্রাসের মুখে মোট সরকারি ব্যয়ের নিম্নাভিমুখী আপেক্ষিক স্থিতিস্থাপকতায় জাতীয় আয় কিছু পরিমাণ স্থিতিশীলতা পেয়েছিল। এই যুক্তি একজন দিতেই পারেন। আরও বলা যায়, বিশের দশকের তুলনায় তিরিশের দশকে সরকারি বিনিয়োগ ও ব্যয়ের অনুপাত নির্দেশ করে যে অর্থনীতির উপর সরকারি ব্যয়ের গুণক প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল যেহেতু ঐ ব্যয়ের সামান্য অংশই বিদেশে খরচ হতো (ভারতে মূলধন-দ্রব্যের ক্ষেত্র অত্যন্ত ছোট থাকায়)। কিন্তু ভারতের সে সময়েব একমাত্র মূলধন-দ্রব্যের শিল্প—যেমন, লোহা ও ইস্পাত শিল্প, সরকারি ব্যয়ের পতনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

বেসরকারি শিল্পে বিনিয়োগের সঙ্গে যুক্ত বিষয়গুলি দ্বিতীয় অধ্যায়ে আরও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের পরিশিষ্টে আমাদের বিনিয়োগ-মডেলের (কোনো বিশেষ দ্রব্যের চাহিদাকে যেখানে মূল চলনরাশি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে) তাৎপর্যকে আরও কঠোরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শিল্পগত বাজারের কাঠামো এবং বিশেষ শিল্পে নতুন প্রতিযোগিতা প্রতিরোধের ক্ষমতা (অবিভাজ্যতা, ব্যয়সংক্ষেপ, বাজারের আয়তন এবং আরও কিছু এই রকমের উপাদান) বিশেষ বিশেষ শিল্পে বিনিয়োগের ধারাকে কতটা প্রভাবিত করেছে তা জানার চেষ্টাও হয়েছে।

১.৪ নিম্ন বিনিয়োগ-হারের ব্যাখ্যায় যোগানধর্মী অনুকল্প

উপরের অনুচ্ছেদগুলিতে ভারতবর্ষের আধুনিক শিল্পে সামগ্রিক ও ক্ষেত্রগত বিনিয়োগের প্রবণতার ব্যাখ্যায় চাহিদার দিক থেকে কার্যকরী বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে প্রমাণ করার চেষ্টা হবে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে সরকারের অবাধ বাণিজ্য নীতি, যুদ্ধ-পরবর্তীকালে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যাপক মন্দা ভারত সরকারকৃত শুল্ক-সংরক্ষণের টুকরো টুকরো (piecemeal) ও খণ্ডনীতি আধুনিক শিল্পে বিনিয়োগের হারকে সীমায়িত করেছিল।

১৯০০ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোনো সাধারণ নক্সা বা মডেল প্রাসঙ্গিক সাহিত্যে পাওয়া যায় না।[২১] ভারতের অর্থনীতি সম্পর্কে প্রায় যুক্তি-বর্জিত কিছু সূত্র বিভিন্ন সময়ে গ্রন্থিত হয়েছে এবং তা থেকে একগুচ্ছ অনুকল্প প্রস্তাব করাও অসম্ভব নয়। অর্থনীতির ইতিহাসবিদ ও বিবরণদাতারা সেসব অনুকল্পকে সমর্থনও করেছেন। বৈষয়িক প্রসারের মন্থর গতির কারণ ব্যাখ্যায় শুধুমাত্র যোগানের দিকটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে প্রস্তাবিত এই অনুকল্পগুচ্ছটিতে। সীমায়িতকরণের প্রধান বিষয় হিসাবে ধরা হয়েছে মূলধনের স্বল্পতাকে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং ব্যাখ্যাটিকে জোরালো করেছে উদ্যোগ প্রতিভার অভাব। কিছু ব্যাখ্যাকাব জোর দিয়েছেন মূলধনের চরম স্বল্পতার উপর। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অতি নিম্নস্তরের আয় এবং মুষ্টিমেয় ধনীজনের প্রদর্শনী ভোগের (Conspicuous consumption) উপর অপচয়মূলক ব্যয় মূলধনের স্বল্পতার কারণ হিসাবে তাঁরা চিহ্নিত করেছেন। আর কয়েকটি ব্যাখ্যায় মূলধনের একান্ত দুষ্প্রাপ্যতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না। শুধুমাত্র আধুনিক শিল্পোদ্যোগে বিনিয়োগের ক্ষেত্রেই মূলধন 'লাজুক' ছিল। উন্নয়নের

অর্থনীতির অনেক ভারতীয় ছাত্র এবং ভারতের শিল্পায়নের পক্ষে সহানুভূতিশীল অনেক ব্রিটিশ প্রচারকদের এরকমই ধারণা ছিল। ১৯৫৬-তে প্রকাশিত প্রবন্ধে[২২] জি সি অ্যালেন লিখেছেন · ভারতের শিল্পায়নের শ্লথগতির জন্যে সম্ভবত শেষ এবং সব থেকে প্রবল যুক্তি এটি যে সামাজিক ঐতিহ্য ও প্রতিষ্ঠান আধুনিক বৃহদায়তন শিল্প গঠনে দেশীয় উদ্যোগের পরিপন্থী ছিল এবং ভারতীয় মূলধন ও প্রতিভা সম্পূর্ণ আলাদা পথে আকৃষ্ট হয়েছিল—এই মতের উগ্রতম প্রকাশ ঘটেছে এল সি নোয়েল্সের একটি বইতে।[২৩] এ ধরনের যুক্তির উদাহরণ হিসাবে দুটি উদ্ধৃতি দেওয়া যাক : 'ভারতীয় জনসমাজের মূল্যবোধের অনুরূপ কিছু ইংরেজদের কোনো কালেই ছিল না, ভারতীয়দের জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি মূলত বিষয়বিমুখ।'[২৩] আবার বলেছেন, 'ভারতের অর্থনৈতিক প্রসারকে ত্বরান্বিত করতে আরও কিছু করা যেত, যদি-না ইংল্যান্ড দেশের ও বিদেশের ক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপ না-করার নীতিতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত। কিন্তু উন্নয়নের সরকারি নীতি ব্যয়সাধ্য এবং তা অনুসৃত হলে কৃষকদেব করভার বাড়ত। সন্দেহ হয়, আরও বেশি সক্রিয় গঠনমূলক নীতি আর্থিক চাপ সৃষ্টির দিক থেকে উপযুক্ত কিনা।'[২৫] দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখব কীভাবে অবাধ বাণিজ্য ও আর্থিক গোঁড়ামির দ্বিবিধ নীতি আধুনিক শিল্পক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগকে শ্বাসরোধ কবতে ব্যবহার করা হয়েছিল। নোয়েল্সের প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল উভয় নীতির প্রতি। অধিকাংশ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মূলধনকে 'লাজুক' হিসাবে চিহ্নিত করার উপায় যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। মূলধনকে 'লাজুক' তখনই বলা যেতে পারে যখন কোনো উদ্যোগে যুক্তিসঙ্গত হারে মুনাফার প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও মূলধন আকৃষ্ট হয় না। এরকম কোনো দৃষ্টান্ত কদাচিৎ দিতে পেরেছেন সমালোচকরা, যাঁরা অভিযোগ করতেন ভারতীয় পুঁজিপতিদের মধ্যে উদ্যোগেব অভাব ছিল।

দেশীয় মূলধনের বিনিয়োগে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে কতটা দ্বিধা ছিল তার সঠিক মাত্রা নির্ণয়ের সঙ্গে জড়িত ছিল নানান রকম সমস্যা। কিন্তু সমস্যাগুলি সাধারণত এড়িয়ে যাওয়া হতো। ভাবতের অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে মুনাফার কোন্ হারকে 'যথার্থ' বলা হবে, প্রথমে এই প্রশ্নটি করা যায। ভারতীয় পুঁজিপতিরা আধুনিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি থেকে বড় বেশি মুনাফা লাভের আশা করছে, এই দাবির উত্তরে বলা যেতে পারে যে সমতুল্য মুনাফা অর্জিত হচ্ছে বাণিজ্য, সুদের কারবার, ব্যাঙ্ক পরিষেবা, এমনকি কিছু আধুনিক শিল্প থেকে—যেমন সুতো কাটা এবং রপ্তানি বা দেশীয় ভোগের জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণের প্রস্তুত-প্রণালী। এরকমও কেউ দাবি করতে পারেন যে মুনাফার অতিরিক্ত প্রত্যাশা শিল্পের অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছিল, অতএব ভারতীয় শিল্পপতিদের আচরণ সেদিক থেকে ন্যায়সঙ্গত ছিল না। তাহলে তিনি অবশ্যই অনুমান করছেন যে ভারতীয় পুঁজিপতিদের আচরণ পদ্ধতিগতভাবে যুক্তিবর্জিত। প্রতিশ্রুত গড় প্রতিদানের হার সবথেকে বেশি এমন কোনো কাজকর্ম স্বভাবতই ব্যবস্থাপকদের আকর্ষণ করবে। সুদের কারবারের বা বাণিজ্যে প্রতিদানের উঁচু হার বজায় রাখতে পারার কিছু বিশেষ কারণ থাকে। সেই কারণগুলির সঙ্গে অবশ্যই জড়িত থাকবে কোনো সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো যা একটি নির্দিষ্ট ধরনের আয়, সম্পদ ও ভোগের বণ্টন প্রক্রিয়াকে চালু রাখে।

আধুনিক শিল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ভারতীয় উদ্যোক্তাদের বড় রকমে অংশ নিতে ব্যর্থ হওয়ার ব্যাখ্যায় দেশীয় সমাজ-কাঠামোর গভীরে প্রবেশ করার প্রয়োজন নেই। কারণ,

ভারতে আধুনিক শিল্পের বেশির ভাগ শাখায় বিনিয়োগের প্রতিদানের হার যেকোনো বিকল্প বিনিয়োগের তুলনায় যে শুধু কম ছিল, তাই নয়, উন্নত দেশের উদ্যোক্তাদের প্রত্যাশার তুলনায়ও কম ছিল। প্রধান প্রধান ব্রিটিশ ম্যানেজিং এজেন্সি হাউস ও বড় বড ভারতীয ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর হাতে পর্যাপ্ত মূলধন ছিল।[২৬] কিন্তু অভাব ছিল দ্রুত সম্প্রসারণশীল বাজারের। সমস্ত অঞ্চলের ছোট ছোট ব্যবসাযী প্রতিষ্ঠানেব ক্ষেত্রে এবং পশ্চিম ভাবত বাদে যে কোনো অঞ্চলের অন্যান্য ব্যবসাব ক্ষেত্রেও একটি বিশেষ রকমেব অসুবিধা ছিল—সংগঠিত ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার সুযোগ এদেব কারও কাছে সহজলভ্য ছিল না। অথচ ব্রিটিশ ম্যানেজিং হাউসের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম সুদে সংগঠিত অর্থের বাজার থেকে ঋণপুঁজি সংগ্রহ কবা সম্ভব ছিল এবং ঐ কারণে তারা তুলনামূলকভাবে কম প্রতিদানে ব্যবসা চালাতে পাবত। রপ্তানি শিল্পের ক্ষেত্রে ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীরা সাধারণত অনেক বেশি ফয়দা তুলতে পারত, যেহেতু খবরাখবর, যোগাযোগ, জাহাজে পরিবহণ ও ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থাব সুযোগ ইত্যাদি সূত্রে তাদের সুবিধা অনেক বেশি ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ ও ভারতীয় উভয় ব্যবস্থাপক গোষ্ঠীব সামনে আধুনিক শিল্পের বহু ক্ষেত্রে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত ছিল না কেননা ঐ সব এলাকা থেকে যে প্রতিদান যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রত্যাশা করা যায় তার হার অত্যন্ত কম ছিল। আধুনিক শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের দেশীয় চাহিদার পরিমাণ সম্পর্কে প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে তুলতেই হয়। শুধু তাই নয়, ঐ পণ্যের দেশীয় চাহিদা ও আমদানি-পরিবর্ত উৎপাদনের উপব সরকাবি নীতির প্রভাবের বিষয়টিও এই আলোচনায় অপরিহার্য। দ্বিতীয় অধ্যাযে এবং বিশেষ বিশেষ শিল্প সংক্রান্ত অধ্যায়গুলিতে অনুসন্ধানের এই দিকটি স্থান পেয়েছে।

ভাবতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাধারণ বিবরণে ভারতীয়দের ব্যবসায় নৈপুণ্যেব অভাবের উপরও জোর দেওয়া হয়। উদ্যোক্তার প্রতিভার প্রকৃতিটিই এমন যে তাকে আগে থেকে আঁচ করা যায় না। পর্যাপ্ত মূলধনের সহযোগে দূরদর্শিতা ও ভাগ্যের সমন্বয় একজন সফল উদ্যোক্তাকে সৃষ্টি করে। তাদের পেতে হয় সঠিক তথ্য এবং বাজারে প্রবেশের সুযোগ যা সবকারি আনুকূল্যের উপর অনেকটাই নির্ভর করে। এ কথা প্রায়ই অস্বীকার করা হয যে ভারত সরকারের অবাধ বাণিজ্য নীতি বিশেষ এক ধরনের উদ্যোগকে প্রশ্রয় দিত, যেমন বৈদেশিক বাণিজ্য এবং রপ্তানি পণ্যের উৎপাদন—যেক্ষেত্রে ভারতীয়দের তুলনায় ইযোবোপীয়দের কিছু স্বাভাবিক সুবিধা ছিল। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়াই ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় নীতি গ্রহণ করতে পারবে, ১৯১৯ নাগাদ এই প্রথা চালু হওয়ার আগে ভারতেব বেশির ভাগ শিল্প ও বাণিজ্য চলত বিদেশের বাজারকে কেন্দ্র করে। লন্ডন ছিল অর্থের বিশ্ববাজারের কেন্দ্র এবং ব্রিটেনের ছিল বৃহত্তম বাণিজ্যিক নৌবহর। স্বভাবতই ঋণপুঁজির যোগান ও আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের উপযুক্ত পরিবহণ ব্যবস্থার দিক থেকে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা ভারতীয়দের তুলনায় অনেক বেশি সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। তাছাড়া, ভারতের রেলপথ নির্মাণে প্রাধান্য পেয়েছিল বন্দরমুখী পরিবহণ ব্যবস্থা এবং তার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ব্রিটিশ অফিসাররা। সেদিক থেকেও ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীরা ভারতীয়দের তুলনায় অনেক বেশি সুবিধা ভোগ করত। তার কারণ, রেলের বড় কর্তাদের সঙ্গে তাদের মেলামেশা ছিল এবং আমদানি-রপ্তানি পণ্যের বন্দরমুখী পরিবহণে রেল মাশুল দেশের ভেতরে একটি রেল-স্টেশন থেকে অপরটির মধ্যে পরিবহণের ব্যয়ের তুলনায় অনেক কম ছিল।

মূলধনের স্বল্পতা এবং ব্যবস্থাপনাগত নৈপুণ্যের অভাবকে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাধা হিসাবে চিহ্নিত করার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আরও দুটি অভিযোগ। যেমন শ্রমের অচলনশীলতা এবং বিভিন্ন ফসলের মুনাফালভ্যতার পরিবর্তনের সঙ্গে অথবা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে তাদের মানিয়ে চলতে না-পারা।[২৭] আমি অবশ্য বলব যে শ্রমের যোগান এবং কৃষি-পণ্যের উৎপাদন চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে পেরেছিল। চাহিদার সামান্য কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল ১৯০০ থেকে ১৯৩৯-এর মধ্যে সীমিত মাত্রায় শিল্পায়নের ফলে। যে প্রক্রিয়ার শ্রম ও কৃষিজাত পণ্যের কাঁচামালের যোগান চাহিদার পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া হতো (সরকারি নীতির মাধ্যমে) তা কিছুটা বিস্তৃতভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে যথাক্রমে পঞ্চম ও চতুর্থ অধ্যায়ে।

শ্রমের সীমাহীন যোগান আছে ধরে নিয়ে আর্থার লুইস উন্নয়নের যে মডেলটি গঠন করেন, অনেকটা সেই ধাঁচে তৈরি শিল্পে অবনতির যোগানধর্মী তত্ত্বের আরও একটি পরিশীলিত সংস্করণ আছে।[২৮] সেখানে অনুমিত হয়েছে, প্রকৃত মজুরির কোনো নির্দিষ্ট হারে শিল্প-শ্রমের দীর্ঘকালীন যোগান সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক। শিল্পে (এবং কৃষির অগ্রসর ক্ষেত্রে) বিনিয়োগের পরিমাণ সঞ্চয়ের যোগানের উপর নির্ভরশীল। জাতীয় আয়ে পুঁজিপতিদের অংশ এবং তাদের সঞ্চয় প্রবণতা এই যোগানকে নির্ধারণ করে দেয়। সমগ্র সঞ্চয় বিনিয়োজিত হয়, এবং চাহিদায় ঘাটতি—সামগ্রিকভাবে অথবা শিল্পের প্রধান এলাকায়—কোনোক্রমেই উন্নয়নকে সীমিত করে না। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী, জাতীয় আয়ে ভারতীয় পুঁজিপতিদের অংশ কম থাকায় বিনিয়োগের হারও নিচু ছিল। যাই হোক, জাতীয় আয়ে পুঁজিপতিদের অংশ কম হলেও, বিনিয়োগ আরও বেশি হারে বাড়তে পারত যদি ইয়োরোপীয় পুঁজিপতিদের মুনাফা-পুনর্বিনিয়োগের হার অপেক্ষাকৃত বেশি হতো। অন্তত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পরিস্থিতি সেরকমই ছিল। ইয়োরোপীয়রা তখন আধুনিক শিল্প, বৈদেশিক বাণিজ্য এবং সংগঠিত অর্থের বাজারের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছিল। অতএব এরকম ধনতান্ত্রিক ধাঁচের উন্নয়ন-মডেলেও উপেক্ষা করা যায় না যে আধুনিক শিল্পে ভারতীয় পুঁজিপতিদের অনুপ্রবেশে এবং ইয়োরোপীয় পুঁজিপতিদের উদ্বৃত্তের পুনর্বিনিয়োগে বাধা দিয়েছে রাজনৈতিক শক্তিগুলি।

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য—অর্থনীতির ইতিহাসবিদরা যেগুলি আগেই উল্লেখ করেছেন—অন্তর্ভুক্ত করা যায় যোগানধর্মী তত্ত্বের এই পরিশীলিত সংস্করণে। উদ্যোগী প্রতিভার বিকাশ উদ্যোক্তাদের মূলধনের উপর নিয়ন্ত্রণের মাত্রা ও তাদের শিক্ষানবীশকালের দৈর্ঘ্যের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির তথাকথিত উঁচু হার আলোচ্য সময়ে[২৯] ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন রোধ করছে বলে প্রায়শই অভিযোগ করা হয়। অর্থনীতিতে বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত হ্রাসের কারণ হিসাবে বিষয়টিকে উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যগুলি মডেলটির গঠন পদ্ধতির কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটাবে না।

এই মডেলের মৌল সীমাবদ্ধতা আগের আলোচনার যোগানভিত্তিক অনুকল্পগুলির সীমাবদ্ধতার অনুরূপ। মডেলটি ব্যাখ্যা করতে পারে না, আধুনিক শিল্পের বেশির ভাগ শাখায় বিনিয়োগ সীমিত হয়েছিল সঞ্চয়ের যোগানের দ্বারা নয়, ঐ ধরনের দেশীয় বিনিয়োগে মুনাফার অভাবে—সেই বিনিয়োগ ভারতীয় পুঁজিপতিরাই করুক বা ইয়োরোপীয়রাই করুক।

এই অভিযোগের সমর্থনে আমরা কিছু ব্যষ্টিভিত্তিক সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতে পারি ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় পুঁজিপতিদের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে। টাটা আয়রন এ্যান্ড স্টিল কোম্পানির মূলধন সংগ্রহের অভিজ্ঞতা এবং ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির তিরিশের দশকে বৈদেশিক ঋণ নেওয়া প্রকৃতপক্ষে বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনাও এই অভিযোগের সমর্থনে তুলে ধরা যায়। ব্যষ্টিভিত্তিক সাক্ষ্য বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে। শিল্পের প্রসার মূলধনের অভাবে স্তিমিত হয়ে গেলে তার প্রতিফলন ঘটবে লেনদেনের হিসাবজনিত সঙ্কটে এবং দেশের ভেতরে মুদ্রাস্ফীতিতে। তখন কোনো বহিরাগত উপাদান সমস্যাগুলির প্রাথমিক কারণ হয়ে দাঁড়াবে না। এ ধরণের কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব আমাদের আলোচ্য সময়ে ঘটেনি। আন্তর্জাতিক স্তরে লেনদেন প্রক্রিয়া কোনো কোনো বছরে অচল হয়ে গিয়েছিল এবং তার ফল বর্তেছিল ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা-পরিস্থিতির উপর। তাছাড়া, ভারত সরকারের অর্থনীতি সংক্রান্ত অদূরদর্শী নীতিও ঐ সময়ে সংকট সৃষ্টি করেছে। যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালের বছরগুলি ছেড়ে দিলে, বৈদেশিক পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এমন মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে অল্পই। এই সমস্ত সমষ্টিগত বিষয়গুলির আরও বিস্তৃত আলোচনা আছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে।

যোগান-ধর্মী অনুকল্প-ভিত্তিক অধিকাংশ মডেলের মধ্যেই স্বয়ংক্রিয়তার প্রচ্ছন্ন দাবি আছে। যুক্তিবিন্যাসের ধরন অনেকটা এই রকম: সঞ্চয়ের যোগান অপ্রতুল ছিল কেননা জাতীয় আয়ে পুঁজিপতিদের ভাগ কম ছিল, জনঘনত্ব ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি ছিল, অতএব শিল্পে মজুরির হারও নিচু থাকবে ; কাঁচামালের যোগান তার চাহিদা বৃদ্ধিতে সাড়া দিয়েছিল যেহেতু কৃষকরা বাজারের ওঠানামায় সাড়া দিচ্ছিল (যোগান-ভিত্তিক অনুকল্পের পরিশীলিত সংস্করণ অনুযায়ী)। কিন্তু জাতীয় আয়ে ভারতীয় পুঁজিপতিদের ভাগ কেন এত কম ছিল তার সম্ভাব্য কারণগুলির কোনো ধারাবাহিক অনুসন্ধান হয়নি। ইয়োরোপীয়দের প্রাধান্যের ফলে বাণিজ্যে ও শিল্পে ভারতীয়দের অনুপ্রবেশের পথে অনেক বাধা আরোপিত হয়েছিল। আরও বাধা এসেছিল অংশত প্রাক-পুঁজিবাদী সংগঠনের রূপ টিকিয়ে রাখার সাম্রাজ্যবাদী নীতি থেকে এবং অংশত ভারতীয় সমাজের দেশজ কিছু শক্তির ক্রিয়াশীলতা থেকে। জনসংখ্যার চাপে বেঁচে থাকার মতো জীবনযাপনের একই স্তরে পড়ে থাকা মানুষের সংখ্যার শুধুমাত্র উত্তরোত্তর বৃদ্ধির কারণেই[৩০] শ্রমের যোগান সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক থেকে গেল, এরকম কোনো ব্যাখ্যাও ঠিক নয় (১৯০১ থেকে ১৯২১-এর মধ্যে ভারতের জনসংখ্যার গড় বৃদ্ধি পশ্চিম ইয়োরোপের ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উনিশ শতকের বৃদ্ধির তুলনায় কম ছিল)[৩১]। সবশেষে, কৃষিতে কিছু প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টায় ভারতে সরকার যে গবেষণার প্রকল্প নিয়েছিল তার ফলে কৃষকদের কাঁচামালের বর্ধিত চাহিদায় সাড়া দেওয়া সম্ভবপর হয়েছিল এই বিষয়টি সামান্যই বিবেচিত হয়েছে।

এই বইতে প্রস্তাবিত অনুকল্পগুলিতে সমস্যাটিকে অন্য দিক থেকে উত্থাপন করা হয়েছে। মুনাফালভ্যতা এবং ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় পুঁজিপতিদের কাছে শিল্পের বিভিন্ন শাখায় প্রবেশ কতটা স্বচ্ছন্দ ছিল তা দেখা হয়েছে বিনিয়োগের স্তর এবং ধরনে পরিবর্তন ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে। বিষয়গুলির গতিশীল, পারম্পর্যের ক্ষেত্রে কোনো একটি উপাদান-সমষ্টিকে অপরটির তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা যায় না। সমষ্টিগত অর্থনীতির

পরিভাষায় বলা হয়, ভারতে শিল্পায়নের উপযুক্ত সম্পদ সংগ্রহে শিথিলতা ছিল—এই পর্যবেক্ষণ করা বিষয়টি আমাদের বিবরণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। একথাও স্বীকার করা হয়েছে বিনিয়োগ থেকেই বিনিয়োগের জন্ম হয়, বিশেষ করে যখন উপকরণ অনিয়োজিত অবস্থায় থাকে। ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় পুঁজিপতিদের বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত একত্র করলে অথবা ভারতীয় পুঁজিপতিদের পৃথক করে দেখলে কোনো একটি সময়কালে তাকে কম বলে মনে হবে যেহেতু বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের সুযোগসমূহ পূর্ববর্তী কালগুলিতে সঙ্কুচিত ছিল। বিষয়টিকে অন্যভাবে বললে এরকম দাঁড়ায়, প্রাশিয়া , জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো সুচিন্তিত সরকারি নীতি থাকলে ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় পুঁজিপতিদের বিনিয়োগের প্রসার অব্যাহত থাকত। বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক প্রসারের সুফল যদি না শুধুমাত্র উচ্চবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত তাহলে বিভিন্ন ধরনের ভোগ্যপণ্যের বাজারের আরও দ্রুত হারে সম্প্রসারণ হতো এবং শেষ পর্যন্ত বিনিয়োগ বৃদ্ধির হারকেও বর্ধিত করত, অবশ্য যদি উপযুক্ত নীতি অনুসরণ করে চলা হতো।

যদি বলা হয় যে এসব সম্ভাবনার কথা নিছক অনুমানের পর্যায়ে পড়ে তাহলে একই যুক্তির ভিত্তিতে বিনিয়োগের নিশ্চল অবস্থার যোগানধর্মী মডেলগুলির যাথার্থ সম্পর্কে প্রশ্ন করা যায়। কারণ, ভারতীয় অভিজ্ঞতাকে সাধারণীকরণের উদ্দেশ্যে এবং পর্যবেক্ষণলব্ধ বিষয়গুলির বিশেষ কোনো দিককে সাময়িক উপাদান হিসাবে পৃথকভাবে দেখার জন্যে একজনের মনে কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্বগত ধারণা থাকবেই। এই ধারণাও গড়ে ওঠে দ্রুত সম্প্রসারণশীল অর্থনীতির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। অতএব ভারতের সমাজ-অর্থনীতির দৃশ্যপট থেকে সেইসব দিকগুলিকেই বেছে নেওয়া সঙ্গত যেগুলি ব্রিটিশ সামাজিক ব্যবস্থার বাইরে অবস্থিত দেশগুলির তুলনায় তাকে স্বকীয়তা দান করে। মোটামুটিভাবে ১৮৮০ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত ভারতবর্ষেরই ছিল কার্যত একমাত্র বড় অর্থনীতি যাকে বাধ্য করা হয়েছিল শিল্পের ক্ষেত্রে অবাধ বাণিজ্য ও হস্তক্ষেপনাকরার নীতি অনুসরণ করতে।[৩১] ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে তার বিশেষ স্থানকে উপেক্ষা করে শিল্প-বিনিয়োগে নিশ্চলতা ও দারিদ্র্যের স্থায়ীত্বের মতো প্রক্রিয়ালব্ধ ফলাফলকে কারণ হিসাবে চিহ্নিত করার মধ্যে ভ্রান্তি আছে। এ যেন রোগের লক্ষণকে রোগের কারণ হিসাবে দেখা।

অনুবাদক : মনোজ কুমার সান্যাল ও সত্যেন সাহা

পরিশিষ্ট

অনুচ্ছেদ ১.৩-এ উত্থাপিত বিষয়গুলির আরও শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সম্প্রসারিত বিশ্লেষণের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে এই পরিশিষ্টে। ঐ অনুচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় ছিল, 'শুল্ক-সংরক্ষণপ্রাপ্ত শিল্পগুলিতে বিনিয়োগ'।

আমাদের অনুমান হলো, বাণিজ্য-শুল্ক বলবৎ করার পর আভ্যন্তরীণ বাজারে সংরক্ষিত দ্রব্যের দাম ভারসাম্যে পৌঁছেছিল। এই ভারসাম্য মূলত দেশীয় উৎপাদনের বাজারেব গঠন

ও আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যটির যোগানের অবস্থার দ্বারা নির্ধারিত হয় (যখন অন্যান্য সব দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থাকে। এই-ভাবে সংরক্ষণোত্তর দামে সংরক্ষিত দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ নির্ধারিত হয়। t-সময়ে সংরক্ষিত শিল্পে বিনিয়োগের মূল মডেলটি হবে এই রকম :

$$I(t) = \frac{dK(t)}{dt} = \lambda\,(\bar{K}(t) - K(t))$$

$$= \lambda\,(v\,\bar{\gamma}(t) - v\gamma(t)), \qquad (১.১)$$

যেখানে $I(t)$, $K(t)$, $\gamma(t)$, $\bar{\gamma}(t)$, v, এবং λ হল যথাক্রমে t-সময়ের বিনিয়োগ, মজুত মূলধনের পরিমাণ, আভ্যন্তরীণ ভোগের জন্যে দেশীয় উৎপাদন, মোট আভ্যন্তরীণ চাহিদা, প্রান্তিক (=গড়) মূলধন-উৎপাদনের অনুপাত এবং সংরক্ষিত শিল্পে বিনিয়োগের সাড়ার গতিবেগ (speed of response)। সুতরাং বিনিয়োগের হার হলো, কাম্য মূলধনের পরিমাণ $\bar{K}(t)$ এবং প্রকৃত মূলধনের পরিমাণের $(K(t))$ পার্থক্যের আনুপাতিক। যদি মোট আভ্যন্তরীণ বা দেশীয় চাহিদা এবং ফলত, কাম্য মূলধন-মজুতের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে, অর্থাৎ যখন বলা যায় $\bar{K}(t) = \bar{K}$ (যা সময়-নিরপেক্ষ একটি ধ্রুবক), সমীকরণ ১.১-এর সমাধান হবে এই রকম :

$$K(t) = \bar{K} - (\bar{K} - K(o))e^{-\lambda t}$$

$$= K(o)e^{-\lambda t} + (1 - e^{-\lambda t})\bar{K}, \qquad (১.২)$$

যেখানে $K(o)$ হলো সংরক্ষিত শিল্পে প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ। সমীকরণ ১.২ থেকে স্পষ্টতই প্রকাশ পায় যে সংরক্ষিত শিল্পে বিনিয়োগ চলনরাশির শক্তি-চিহ্নিত সূচকের হারে বা exponentially কমে আসে (স্বভাবতই অনুমেয় $\bar{K} > K(o)$)।

যদি আমরা অনুমান করি সংরক্ষিত দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ চাহিদা সময়ের সঙ্গে (over time) আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ $\bar{K}(t) = \bar{K}(o)e^{\alpha t}$ তা হলে সংরক্ষিত শিল্পে মজুত মূলধনের বৃদ্ধির ধাঁচ হবে এই রকম ঃ

$$K(t) = \frac{\lambda}{\alpha+\lambda}\bar{K}(o)e^{\alpha t} + (K(o) - \frac{\lambda}{\alpha+\lambda}\bar{K}(o))\,e^{-\lambda t} \qquad (১.৩)$$

$$= \frac{\lambda}{\alpha+\lambda}\bar{K}(o)\,(e^{\alpha t} - e^{-\lambda t}) + \bar{K}(o)^{-\lambda t}$$

এক্ষেত্রে বিনিয়োগের দীর্ঘকালীন বৃদ্ধির হার এবং আভ্যন্তরীণ বাজারে সংরক্ষিত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির হার সমান। এই মডেলটি থেকে সংশ্লিষ্ট যে অর্থটি বেরিয়ে আসে তা হলো, 'কাম্য' ও প্রকৃত মজুত মূলধনের পার্থক্য (আনুপাতিক না-হলেও) সময়ের সঙ্গে exponentially বা সূচকের হা[illegible] বদ্ধি পায় এবং ১.৩ সমীকরণের সাহায্যে $\bar{K}(t) - K(t) = \bar{K}(o)e^{\alpha t} - K(t)$ সমীকরণটি[illegible] ধান করলে এই একই ফল পাওয়া যায়। প্রথমে মনে হয় যে এই ধারণার মধ্যে অসঙ্গতি আছে, কিন্তু আসলে তা নয়। কারণ, একটি অবিচলভাবে প্রসারণশীল অর্থনীতিতে, আশা করা যায়, শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্ট চাহিদার অংশ-বিশেষের বৃদ্ধি সমহারে ঘটবে, এবং পরবর্তীকালে মূলধনী দ্রব্য-উৎপাদনের অবিচল প্রসারের শর্ত অনুসারে কাম্য ও প্রকৃত মূলধনের মজুত বৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্য বিস্তারের হার অর্থনীতির প্রসারের হারের সমান হবে।

অবশ্য এক্ষেত্রে এই রকম আপত্তি উঠতে পারে, অর্থনীতির অবিচল প্রসারের হার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে যে আচরণ-বিধিরই প্রয়োজন হোক না কেন, উদ্যোক্তারা বর্ধিত চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদন বৃদ্ধির শিক্ষা বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে লাভ করে, এবং কাম্য মজুত মূলধন অর্জনের প্রয়াস অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বিলম্বিত হয় না। কিন্তু এই যুক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না যে উদ্যোক্তারা স্বাধীনভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে অথচ একই সঙ্গে দ্রব্যের প্রকৃত চাহিদার মাত্রায় উৎপাদনে সক্ষম হয় না। তার কারণ, একজন উদ্যোক্তা মোট চাহিদার দিক থেকে বাজারের একটি ছোট অংশের সঙ্গে পরিচিত থাকে। যদি সব উদ্যোক্তারা আগের মতো একই অনুপাতে উৎপাদন বৃদ্ধি করে এবং নতুন কোনো উদ্যোগের প্রবেশ না ঘটে, মোট চাহিদা ও প্রকৃত উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য বৃদ্ধি পাবে মোট চাহিদা বৃদ্ধির হারে।

এখানে যে বিনিয়োগ-অপেক্ষক (investment function) ব্যবহার করা হয়েছে তার প্রয়োগ একটি কার্যকরী শুল্ক-সংরক্ষণপ্রাপ্ত শিল্পের ক্ষেত্রেই হয়ত বেশি স্বাভাবিক, অবশ্য এই অপেক্ষককে অন্য ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যায়। যেমন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভারতে তুলো বস্ত্র শিল্পের বয়ন বিভাগে বিনিয়োগের ধারা ব্যাখ্যা করতে এই বিনিয়োগ অপেক্ষককে ব্যবহার করা যায়। ভারতের মিল-মালিকরা কোনো কোনো পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে (যেমন মাঝারি মানের ছাপা কাপড় ও কোরা কাপড়) কাম্য উৎপাদন-ক্ষমতার লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করতে সচেষ্ট ছিল। উৎপাদনের এই ক্ষেত্রগুলিকে তাঁরা নিজস্ব বলে মনে করত। জনসংখ্যা ও গড় মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির এবং (সম্ভবত) রুচি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাম্য উৎপাদন-ক্ষমতাও উর্দ্ধমুখী হচ্ছিল যার ফলে প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতা কাম্য উৎপাদন-ক্ষমতার সমান হতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে এ রকম আশা করা অসঙ্গত নয় যে থান কাপড়ের (Cotton piecegoods) আমদানি ও দেশীয় উৎপাদন উভয়ই একই সঙ্গে বৃদ্ধি পাবে। দেশীয় উৎপাদনের অপেক্ষাকৃত উঁচু হারে বৃদ্ধিকে দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় : (ক) ভারতীয় মিল-মালিকদের শিক্ষা সূক্ষ্ম সুতিবস্ত্র বয়নের কাজে পারদর্শিতা অর্জনে কালক্রমে সহায়ক হয়েছিল এবং (খ) মাঝারি ধরনের সুতির কাপড়ের চাহিদা বৃদ্ধির হার সম্ভবত উঁচু ছিল। তুলোকল-শিল্পে মোট বিনিয়োগের ওঠানামা (যেমন প্রথম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে) মূলত সুতো রপ্তানি বন্ধ হওয়ার সূত্রে ব্যাখ্যা করা যায়।

রেখা-চিত্র ১.৩
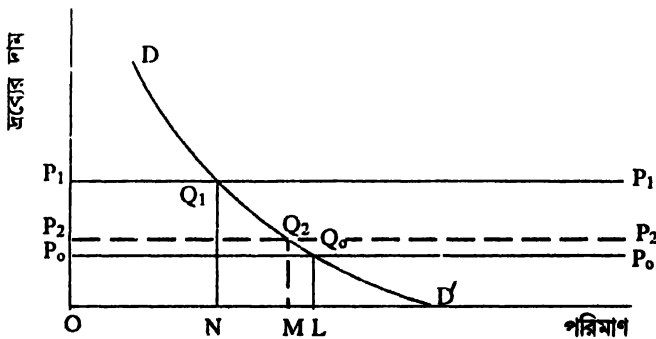
বাণিজ্য চক্র ও মোট উৎপাদনের চক্রাকার বৃদ্ধি সংক্রান্ত অর্থনীতির তাত্ত্বিক আলোচনায় আর এম গুডউইন[৩] এবং এ ডব্লু ফিলিপস্[৩৩]এ ধরনের অপেক্ষক (adjustment function) ব্যবহার করেছেন। এই অপেক্ষককে বিভিন্নভাবে যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলা যায়। প্রথমত, 'কাম্য উৎপাদন ক্ষমতা' এবং প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য যত বেশি থাকবে স্বল্প মেয়াদে মুনাফার প্রত্যাশা তত উজ্জ্বল হবে। ফলে বর্তমান শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি ও নতুন প্রবেশকারী প্রতিষ্ঠানগুলি বেশি পরিমাণে বিনিয়োগ করবে। বিষয়টি পরিস্ফুট হবে যদি আমরা একটি সহজ রেখাচিত্রের (১ ৩) সাহায্যে দেখাই কোনো দ্রব্যের উপর আরোপিত সংরক্ষণমূলক বাণিজ্যশুল্কের ফলাফল তার চাহিদার উপর কীভাবে বর্তাবে। ধরা যাক বাণিজ্য-শুল্ক আরোপের আগে দ্রব্যের দাম P_0P_0 রেখা দ্বারা সূচিত হয় এবং শুল্ক আরোপের অব্যবহিত পরে দ্রব্যের দাম বেড়ে দাঁড়াবে P_1P_1 স্তরে। দাম বেড়ে যাওয়ার ফলে নতুন সংস্থাগুলি ঐ শিল্পে প্রবেশ করতে থাকবে। কিন্তু উৎপাদন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যটির দাম কমতে থাকবে (যদি ধরে নেওয়া হয় বাজারটিতে বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতার অবস্থা বর্তমান)। দাম হ্রাসের প্রক্রিয়া শুরু হলে অদক্ষ সংস্থাগুলির বিনিয়োগ কমবে এবং এদের মধ্যে কিছু অপেক্ষাকৃত অদক্ষ সংস্থা উৎপাদন বন্ধ করতে বাধ্য হবে। P_2P_2-তে দাম নেমে এলে শুধুমাত্র দক্ষ দেশীয় উৎপাদনকারীরাই টিকে থাকবে। P_2P_2 দামে কোনো আমদানি হবে না (কারণ, আমদানিকারীরা দীর্ঘমেয়াদে যে সর্বনিম্ন দামে যোগান দিতে পারে তা হলো P_1P_1) এবং নতুন বিনিয়োগও বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের বিনিয়োগ-অপেক্ষকের নিহিত ধারণা অনুসারে সময় যত দীর্ঘ হবে দেশীয় বিক্রয় (আমদানিকারী ও উৎপাদক কর্তৃক) Q_1 বিন্দু থেকে Q_2 বিন্দুর দিকে অগ্রসর হবে তত ধীর গতিতে।

এই বিনিয়োগ-অপেক্ষকের সপক্ষে দ্বিতীয় যুক্তিটি ব্যাখ্যা করা যায় প্রকৃত বিনিয়োগ প্রক্রিয়ার অন্তর্গত সময়ের ব্যবধানের মাধ্যমে। অনুমান করা যাক, সংরক্ষণমূলক শুল্ক আরোপের পরে মোট দেশীয় চাহিদার পরিমাণ কত হবে তা নির্ণয়ের ভিত্তিতে দেশীয় উৎপাদকরা উৎপাদনের সঠিক লক্ষ্যমাত্রা স্থির করতে সক্ষম। কিন্তু প্রকৃত বিনিয়োগ সময়ের সাথে সাথে জ্যামিতিক প্রগতিতে কমতে থাকে এবং প্রতিটি সময়কালের বিনিয়োগ হবে তার ঠিক আগের সময়কালের বিনিয়োগের ধ্রুবক ভগ্নাংশ। বিনিয়োগ প্রক্রিয়াটিতে সময়ের এই ব্যবধান থাকার কারণ প্রযুক্তিগত ও আর্থিক হতে পারে।

আমাদের বিনিয়োগ-অপেক্ষকের আরও একটি ব্যাখ্যা হিসাবে বলা যায় যে দেশীয় উৎপাদকদের বিক্রয় সম্পর্কে প্রত্যাশা নিম্নলিখিত উপায়ে গঠিত হবে : যদি t বছরে প্রত্যাশিত বিক্রয়ের পরিমাণ S_t^* এবং প্রকৃত বিক্রয় S_t, হয় তাহলে

$S_t^*-S_{t-1}^* = \beta\ (S_{t-1}-S_{t-1}^*)$, যেখানে β হল প্রকৃত ও প্রত্যাশিত বিক্রয়ের সামঞ্জস্যবিধানকারী একটি সহগ। অতএব $S_t^* = \beta S_{t-1}+(1-\beta)\ \beta S_{t-2}+\ .\ \ldots\ .$

যদি বিনিয়োগকারীরা S_t^* পরিমাণ উৎপাদন করার জন্যে বিনিয়োগ করে তাহলে আমরা প্রকৃত ও কাম্য উৎপাদন ক্ষমতার সমন্বয়ে একটি বিনিয়োগ-অপেক্ষক পাব (সরলীকরণের উদ্দেশ্যে আমরা অবিচ্ছিন্ন বিনিয়োগ-অপেক্ষকের ধারণা করেছি)। এই শেষ ব্যাখ্যাটি সম্ভবত স্বাভাবিক মনে হবে বিশেষ করে যখন আমদানি-পরিবর্ত উৎপাদন শুল্ক-সংরক্ষণের পরে ঘটবে না, ঘটবে যখন দেশীয় উৎপাদকরা বিদেশী-যোগানদারদের তুলনায় ব্যয়-হ্রাস ও

বিপণন সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা বেশি পাবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তীকালে তুলোবস্ত্র শিল্পের বয়ন বিভাগে বিনিয়োগের ধারার সঙ্গে এই ব্যাখ্যাটি সামঞ্জস্যপূর্ণ।[৩৫]

আমরা যদি অনুমান করি যে বিভিন্ন শিল্পগুলি একই সময়ে আমদানি-পরিবর্ত দ্রব্য উৎপাদন করছে এবং যোগানের দিক থেকে একটি শিল্পের সঙ্গে অপরটির বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই তাহলে সমস্ত শিল্পগুলিতে বিনিয়োগের সমষ্টি থেকে দেশের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ণয় কবা যাবে :

অর্থাৎ

$$\sum_{i=1}^{m} I_i(t) = \sum_{i=1}^{m} \lambda i(\bar{K}_i(t) - K_i(t)).$$

এই সমীকরণে i নির্দেশ করে i-তম শিল্প এবং m সংশ্লিষ্ট শিল্পের সংখ্যা। যদি প্রতিটি শিল্পের কাম্য উৎপাদন-ক্ষমতা একই থাকে তাহলে বিনিয়োগ ক্রমশ কমে আসবে। যদি i শিল্পে (i=1,. .m) দ্রব্যের চাহিদা αi(i=1,...m) হারে বৃদ্ধি পায় তবে ঐ শিল্পে বিনিয়োগও αi হারে বৃদ্ধি পাবে এবং আমদানি-পরিবর্ত শিল্পগুলিতে মোট বিনিয়োগ সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ αi'র অর্থাৎ αi's (i=1...m) মধ্যবর্তী কোনো একটি হারে বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

আবার যদি দ্রব্যের যোগানের দিক দিয়ে বিভিন্ন শিল্পগুলির মধ্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকে তাহলে মোট বিনিয়োগ বৃদ্ধির যে হার পাওয়া যাবে তা পৃথক পৃথক ভাবে বিবেচিত প্রতিটি শিল্পে আমদানি-পরিবর্ত উৎপাদনে বিনিয়োগের যোগসমষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধির হারেব তুলনায় বেশি হবে। সম্পর্কযুক্ত শিল্পের সংখ্যা যত বাড়বে শিল্পক্ষেত্র থেকে আয়ও তত সৃষ্টি হবে (যদি অন্যান্য অবস্থা অপবিবর্তিত থাকে)। অবশ্য এই কথাও বলা যায়, শুধুমাত্র কাঁচামাল যোগানের দিক থেকে শিল্পগুলির সম্পর্ক থাকলেই মূলধনী দ্রব্য ও মধ্যবর্তী দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পের প্রসার ঘটবে না। দাম সংক্রান্ত সম্পর্কগুলি এমনই হওযা চাই যে আমদানিকৃত দ্রব্যের তুলনায় দেশীয় মূলধনী দ্রব্য ও মধ্যবর্তী দ্রব্যের ব্যবহার বেশি লাভজনক হয়। মূলধনী দ্রব্য বা মধ্যবর্তী দ্রব্য উৎপাদনকাবী শিল্পক্ষেত্রের প্রসারে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের গুরুত্ব নির্ভব করবে তিনটি বিষয়ের উপর : ব্যয়-সংকোচের সুযোগ-সুবিধা, ঐ দ্রব্যগুলি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা এবং শিল্পগুলিতে কারিগরী দক্ষতার স্তরোন্নয়নের মাত্রা। ইতিহাস বলে, উন্নত দেশে মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে-সব উদ্ভাবন ঘটেছিল তা থেকে অন্য সমস্ত শিল্পে কারিগরী দক্ষতার স্তর উন্নত হয়েছে। কিন্তু মূলধনী শিল্পের জন্যে সাধারণত প্রয়োজন হয় বিশাল বাজারের, যা ভোগ্যদ্রব্যের বাজারের তুলনায় বড়। আমরা যদি যন্ত্রনির্মাণকারী শিল্পের উৎপাদনগত দক্ষতা অর্জনের কার্যাবলীর সঙ্গে সুতির কাপড়, চিনি ও কাগজের মতো অস্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য প্রস্তুতকারী শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তগুলির তুলনা করি তাহলে বক্তব্যটির যাথার্থ্য আরও পরিস্ফুট হবে। মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পের স্থাপন ও প্রসার ঘটাতে হলে অন্যান্য সমস্ত শিল্পেই অবিচ্ছিন্ন ধারায় বিনিয়োগ ক্রমশ বাড়াতে হবে এবং তা সম্ভবপর হতে পারে উন্নত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অথবা দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে গৃহীত অর্থনৈতিক প্রসারের রাষ্ট্রীয় নীতির মাধ্যমে। মন্দার সময়ে দেশীয়

শিল্পকে কেবলমাত্র সংরক্ষণের সুযোগ দিলেই উন্নতমানের মূলধনী দ্রব্য প্রস্তুতকারী শিল্পের প্রসার ঘটবে না।[৩৬]

এই আলোচনা শেষ করার আগে আমরা দুটি সমস্যা উল্লেখ করব। প্রথমত, সমীকরণ ১.১-এ উল্লিখিত অপেক্ষকটি (adjustment function) নির্দেশ করে যে শুরু থেকেই বিনিয়োগ সূচকের হারে কমবে। বিনিয়োগের নতুন সুযোগসুবিধা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই শিল্পপতিরা তাতে সাড়া দেয় না। তারা নতুন বিনিয়োগ আরম্ভ করে তার কিছুকাল পর থেকে। এই প্রক্রিয়াটি প্রদর্শিত হয়েছে রেখাচিত্র ১.১-এ।[৩৭]

দ্রব্যের বাজারে বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা থাকবে, এই অনুমানটি নিহিত আছে আমাদের আলোচনায়। উল্লিখিত অনুমানটির পরিবর্তে সম্পূর্ণ বিপরীত একটি সম্ভাবনা অনুমান করা যাক : *i* দ্রব্যের শুধুমাত্র একজনই দেশীয় উৎপাদক আছে এবং বাজারে অন্য কোনো উৎপাদকের অনুপ্রবেশের আশঙ্কা নেই। এ ক্ষেত্রে ঐ উৎপাদক যে দামে দ্রব্যটি সরবরাহ করবে তার উপর একটি মাত্র বাধাই কার্যকর হবে ঃ দামটি আমদানি-পরিবর্ত দ্রব্যের দামের (রেখাচিত্র ১.৩-এর P_1P_1) সমান বা কম হবে। ১.৪ রেখাচিত্র অনুযায়ী দ্রব্যটির আন্তর্জাতিক বাজারের দাম P_oP_oএবং বাণিজ্য-শুল্ক আরোপিত হওয়ার পরবর্তীকালের আমদানিজাত দ্রব্যেব দাম P_1P_1।
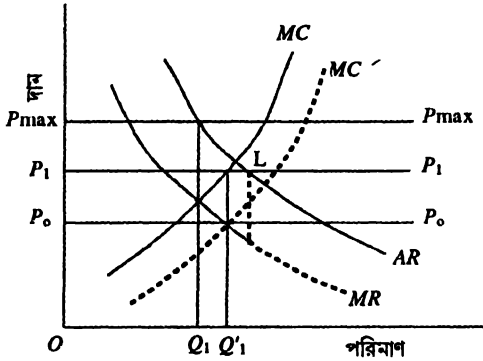
রেখা-চিত্র ১.৪

AR দ্রব্যটির চাহিদা রেখা এবং *MR* প্রান্তিক রেভিনিউ রেখা। ধরা যাক, একমাত্র দেশীয় উৎপাদকের প্রান্তিক ব্যয়-রেখা *MC*। যদি এই উৎপাদক সংরক্ষিত বাজারে একচেটিয়া কারবারী হিসাবে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে এবং অন্য কোন উৎপাদকের বাজারে অনুপ্রবেশের আশঙ্কা না থাকে, তা হলে তার পক্ষে মুনাফা সর্বোচ্চকারী দাম হবে *P*max। এই দামের মানানসই উৎপাদনের স্তরে *MR* রেখা *MC* রেখাকে ছেদ করবে। শুল্ক-সংরক্ষণের পরে দাম যদি *P*max-এর থেকে বেশি হয়ে যায়, একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে শ্রেষ্ঠ স্বল্পকালীন নীতি হবে *P*max দামটি ধার্য করা। অবশ্য একচেটিয়া কারবারী দাম পৃথকীকরণের নীতিও অনুসরণ করতে পারে, অর্থাৎ সে সংরক্ষিত দেশীয় বাজারে উচ্চতর দামে এবং বিদেশের বাজারে নিম্নতর দামে দ্রব্যটি বিক্রয় করতে পারে। যদি সংরক্ষণোত্তর কালে দাম *Pmax*-এর নিচে থাকে, এই 'একচেটিয়া কারবারী'র ক্ষেত্রে *AR* রেখাকে চাহিদা-

রেখা হিসাবে আর গণ্য করা হবে না। বরং এক্ষেত্রে তার চাহিদা-রেখা সংরক্ষণোত্তর কালের দামে (P_1P_1) সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক থাকবে দাম-রেখা AR রেখাকে ছেদ করার বিন্দু পর্যন্ত। এই প্রসঙ্গে অনুমান করা হচ্ছে যে উৎপাদকদের মধ্যে কোনো Collusion বা বিশেষ রকমের সমঝোতা অথবা সীমাবদ্ধ নির্ভরতা (oligopolistic interdependence) নেই। এই একক উৎপাদক দ্রব্য উৎপন্ন করতে থাকবে সেই পরিমাণ পর্যন্ত যেখানে MC বা প্রান্তিক ব্যয়-রেখা দাম-রেখাকে ছেদ করবে। একক কারবারীর মোট বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারিত হবে প্রারম্ভিক ও সংরক্ষণোত্তব কালের পণ্য বিক্রয়ের পরিমাণের অন্তর্গত পার্থক্যের দ্বারা।

দেশীয় উৎপাদকের প্রান্তিক ব্যয়-রেখা AR রেখাকে P_1P_1(সংরক্ষণোত্তর কালের দাম-রেখা) থেকে নিচু দাম-স্তরে ছেদ করতে পারে। সেক্ষেত্রে দেশীয় উৎপাদকের MR রেখা বিচ্ছিন্ন হবে এবং দুটি ভাগে বিভক্ত থাকবে। প্রথমত MR রেখা P_1P_1 রেখার উপর সমপতিত হবে এবং P_1P_1 রেখা AR রেখাকে ছেদ করার বিন্দু (চিত্রানুযায়ী L বিন্দু) পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। দ্বিতীয় অংশটি L· বিন্দু থেকে AR রেখার সাথে জড়িত MR রেখার স্বাভাবিক অংশটি। সুতরাং এক্ষেত্রে কার্যকর MR রেখার মধ্যে একটি বিরাট বিচ্ছিন্ন অংশ থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত MC রেখা কার্যকর MR রেখার বিচ্ছিন্ন অংশের মধ্যে দিয়ে যাবে (যেমন MC' বেখা দ্বাবা ১.৪ চিত্রে এইরকম একটি সম্ভাবনা তুলে ধরা হয়েছে) ততক্ষণ পর্যন্ত সংরক্ষণোত্তর দামই দেশীয় উৎপাদকের পক্ষে সবচেয়ে লাভজনক হবে। সংরক্ষণের পরে সব থেকে লাভজনক উৎপাদনের পরিমাণ প্রতিযোগিতামূলক শর্তাবলী ও উৎপাদন-ব্যয়ের গঠনের উপর নির্ভর করবে। এই বিশ্লেষণটি ঠিক ততক্ষণই সঠিক বলে গণ্য হবে যতক্ষণ পর্যন্ত দেশীয় উৎপাদক 'স্বাভাবিক' মুনাফা অর্জন করবে।

যদি আমরা উৎপাদনকারীর সংখ্যা একের বেশি ধরি তাহলে আন্দাজ করা যায় যে কোনো শিল্পে লাভজনক কারখানার সম্ভাব্য সংখ্যাটি নির্ভর করবে তিনটি বিষয়ের উপর : সংরক্ষণোত্তর দাম ($>Pmax$), আভ্যন্তরীণ চাহিদা, বৃহৎ পরিসরে উৎপাদনেব সুযোগসুবিধা এবং সংরক্ষিত বাজার সৃষ্টিতে বিনিয়োগকারীদের সাড়ার মাত্রা। সংরক্ষণোত্তর দামস্তর সমস্ত উৎপাদকদের জন্যে যদি একই হয় এবং যদি MC রেখা তাদের ক্ষেত্রে একই ধরনে উর্দ্ধমুখী হয় তাহলে শিল্পটির অন্তর্গত লাভজনক কারখানার সংখ্যা নির্ণয় করা যাবে মোট দেশীয় চাহিদাকে একটি কারখানার সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনকারী দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করে। একটি ফার্ম বা সংস্থা অবশ্যই অনেকগুলি কারখানা চালাতে পারে। সংরক্ষিত বাজার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যদি বিনিয়োগ দ্রুত বৃদ্ধি পায় তাহলে ঐ শিল্পে বাড়তি বিনিয়োগেব সম্ভাবনা থাকবে। তখন হয়ত কিছু সংখ্যক সংস্থা উৎপাদন বন্ধ করতে বাধ্য হবে। আবার বাজারে দাম ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে এমনভাবে ভারসাম্য আসতে পারে যেখানে সংরক্ষণ-পূর্ব দাম সংরক্ষণোত্তর দামের থেকে কম থাকবে এবং শুল্ক আরোপ করার পর আভ্যন্তরীণ বাজারে যতটা পরিমাণ বিক্রি সম্ভবপর তার তুলনায় উৎপাদন বেশি হতে পারে। এই অবস্থায় সমস্ত আমদানি বন্ধ হবে। তার কারণ কোন বিদেশী উৎপাদকের পক্ষে নতুন দামে বিক্রয় অসম্ভব হয়ে পড়বে। উৎপাদন ব্যয় ও শুল্ক উভয়ই বহন করতে হবে বলে ঐ নতুন দাম তার পক্ষে লাভজনক হবে না। কোন দেশীয় শিল্প ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের বা উৎপাদন—কাজের মাধ্যমে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে যথেষ্ট বঞ্চিত থাকা সত্ত্বেও সংরক্ষণের ফলে

দাম বৃদ্ধির ও তজ্জনিত ভোগের পরিমাণ হ্রসের সম্ভাবনা অতএব অনেকটাই দূরীভূত হবে। যদি বিনিয়োগ—প্রতিক্রিয়া খুব দ্রুত হয় এবং তা যদি সংরক্ষণেব মাত্রাব সমানুপাতিক হয এবং উৎপাদন-ব্যয়ের ও পুনর্বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মূলধনের অবচয় সংক্রান্ত স্থিতিমাপগুলিব মান ঠিক থাকে তাহলে শুল্ক-সংরক্ষণের মন্দ প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার শ্রেষ্ঠ উপায হলো প্রথম থেকেই চড়া হারে শুল্ক ধার্য করা।

এরকমও হতে পাবে, বাণিজ্য-শুল্ক আবোপের আগেও কিছু উৎপাদক দ্রব্যটি প্রস্তুত করছে। একটি অর্থনৈতিক আযতনের কারখানা স্থাপনের জন্যে প্রযোজনীয় প্রারম্ভিক বিনিয়োগের পরিমাণ যথেষ্ট বেশি হলে অধিকাংশ বিনিয়োগ সংঘটিত হবে প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলির সম্প্রসারণের মাধ্যমে এবং সংরক্ষিত দ্রব্যটির দাম নির্ধারিত হবে বিশ্ববাজাবের দাম ও আমদানি শুল্কের উপর বাড়তি কিছু সংযোজনের যোগফল দ্বাবা। সংরক্ষণমূলক শুল্কের হার বেশি হলে নতুন উদ্যোক্তারা বেশি উৎপাদন-ক্ষমতা সম্পন্ন কারখানা স্থাপনে উৎসাহিত হবে। ধরে নেওযা যায়, এই সব নতুন কাবখানাগুলি প্রযুক্তির দিক থেকে উন্নতমানের হবে এবং এদের উৎপাদন-ব্যয় পুবনো ও প্রতিষ্ঠিত কারখানাগুলির তুলনায় কম হবে। নতুন উৎপাদনকারীরা যদি শেয পর্যন্ত পুবনো উৎপাদকদের তুলনায কম ব্যযে উৎপাদনে সক্ষম হয় তাহলে তারা এমনকি শুল্ক সংবক্ষণেব সুযোগ ছাড়াই পুরনো উৎপাদকদের বাজার থেকে হটিয়ে দিতে পাবে অথবা তাদেব কম দামে বিক্রয় বাধ্য কবতে পারে। কিন্তু এই রকম যুক্তি গ্রহণযোগ্য হবে না যদি (ক) প্রাবম্ভিক বিনিযোগের প্রয়োজনীয় পরিমাণ বেশি হয় এবং যদি (খ) নতুন উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে আধুনিক কাবখানায় উৎপাদনের ব্যয় বেশি হতে থাকে।

উপরের যে কোনো একটি অথবা উভয় কারণে পুরনো বা ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত উৎপাদনকারীরা প্রাথমিক ক্ষতি অথবা বিদেশী প্রস্তুতকাবকদেব সঙ্গে প্রতিযোগিতায হেরে যাওয়ার আশঙ্কায় শুল্ক-সংরক্ষণের সুযোগ বা অন্য ধরনের সবকাবি সাহায্য প্রত্যাশা করবে। সমগ্র বিষয়টি বেশ জটিল আকার ধাবণ করে যখন প্রতিষ্ঠিত উৎপাদকবা স্বেচ্ছাকৃতভাবে নতুন সংস্থাগুলিকে শিল্পে প্রবেশের পথে বাধা দেওযার নীতি গ্রহণ কবে। যদি দ্রব্যটি সমজাতীয় হয়, প্রতিষ্ঠিত উৎপাদকরা P_1P_1 অপেক্ষা বেশি দাম ধার্য কবতে পারে না। বিশ্ববাজারের দামের সঙ্গে প্রতি একক আমদানি দ্রব্যের উপব ধার্য শুল্ক যুক্ত কবে P_1P_1 দাম পাওয়া গেছে। প্রতিষ্ঠিত উৎপাদকরা P_1P_1 থেকে সামান্য কম দাম ধার্য কবতে পারে এবং ইত্যবসরে উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়িয়ে ব্যয়-সংকোচেব সুবিধাও পেতে পাবে। আর্থিক সংস্থানের সীমাবদ্ধতা বা ভৌগলিক কারণে প্রতিষ্ঠিত উৎপাদকবা দেশীয় বাজাবের সমস্ত চাহিদা মেটাতে অক্ষম হতে পারে এবং নতুন সংস্থার প্রবেশে বাধা দিতে পারে। তাছাড়া, তারা নতুন সংস্থার সঙ্গে দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনো সমঝোতায় আসতে পাবে অথবা বাজারের অংশ ভাগ করে নেওয়ার কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে। এইভাবে একটি বিশেষ স্তরের নিচে দাম নেমে যাওয়ার প্রবণতাকে তারা রোধ করার চেষ্টা করতে পারে। প্রারম্ভিক বিনিয়োগের প্রয়োজন, মূলধনের বাজারে অপূর্ণতার মাত্রা, ব্যয় সংকোচের গুরুত্ব এবং উৎপাদন ক্ষমতাকে পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহারের ও হাতে-কলমে কাজ শেখার ব্যয় যত বেশি হবে উপরোক্ত কৌশলগুলি ততই কার্যকর হবে।[৩৮]

চিনি ও কাগজ শিল্প থেকে উদাহরণ পাওয়া যায় আধুনিকতম যন্ত্রপাতির ব্যবহারে সক্ষম নতুন সংস্থাগুলির অনুপ্রবেশে শিল্পোৎপাদনে ব্যয় হ্রাসের সম্ভাবনা কত বৃদ্ধি পায়। বস্ত্রশিল্পের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় কীভাবে নতুন অঞ্চলের স্থানীয় পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন ও নতুন সংস্থাগুলির তুলনামূলক দক্ষতার মাত্রাকে পরিবর্তন করতে পারে। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এবং সিমেণ্ট ও কাগজ শিল্পগুলি থেকে উদাহরণ পাওয়া যায়, কীভাবে প্রতিষ্ঠিত উৎপাদকরা দাম বেঁধে দেওয়া ও বাজার ভাগ করে নেওয়ার চুক্তির মাধ্যমে নিজেদের মুনাফাকে নিশ্চিত করতে পারে। নতুন সংস্থাগুলির পক্ষে ঐ সব সুযোগ লাভ করা যে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে তার উদাহরণও পাওয়া যায়। শুল্ক-সংরক্ষণের মাত্রা বৃদ্ধি এবং পরবর্তীকালে তুলোর কাপড়ের জাপানি রপ্তানির উপর পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ তুলোকল শিল্পে স্বয়ংক্রিয় তাঁত চালু করার মাধ্যমে প্রযুক্তিগত উন্নতি সাধনের প্রক্রিয়াকে স্তিমিত করেছিল।[৩১] কার্যকরী শুল্ক-সংরক্ষণের প্রারম্ভিক কালে উৎপাদন-ব্যয় সংক্রান্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করে সংরক্ষণজনিত ব্যয়ের হিসাব এবং আন্তর্জাতিক বাজারেব দামের সঙ্গে তার তুলনা থেকে প্রায় নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে সমস্ত ক্ষেত্রেই ভোগকারীদের দিকে থেকে শুল্ক-সংরক্ষণের চূড়ান্ত ব্যয়ের পরিমাপ অতিরঞ্জিত হবে, যদি অবশ্য এহেন তুলনার প্রাসঙ্গিকতা সঠিক নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বীকৃত হয়।

এই আলোচনার শেষ কটি অংশে আমি প্রধানত উল্লেখ করেছি, কি পরিস্থিতিতে একটি সংরক্ষণপ্রাপ্ত শিল্প প্রগতিশীল দক্ষতা অর্জন করতে পারে। বাজারের আয়তন যত বড় হবে, নতুন উৎপাদকদের অনুপ্রবেশ যত বাধামুক্ত হবে, সংরক্ষণোত্তরকালে অর্থের বাজার যত কম দমিত থাকবে এবং লাভজনক সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে চাহিদার অবিচ্ছিন্ন প্রসারের উপর শিল্পের নির্ভরতা যত কম হবে সংরক্ষিত শিল্পটির প্রগতিশীল দক্ষতার মাত্রা, ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের অর্থে, তত বেশি হবে। শুল্ক-সংরক্ষণ কার্যত এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে যার ফলে নতুন বিনিয়োগ উৎপাদনের সেকেলে পদ্ধতির অপসারণ এবং অনিপুণভাবে পরিচালিত সংস্থাগুলির বহিষ্কার সম্ভবপর করে তুলবে। কিন্তু শুধুমাত্র ভোগপণ্যের শিল্পগুলির উদ্দেশ্যে গৃহীত শুল্ক-সংরক্ষণের নীতি ভারতের মতো অনুন্নত ও দবিদ্র অর্থনীতিকে অবিচ্ছিন্ন প্রসারের অঙ্গীকার দেয় না এবং প্রতিষ্ঠিত ও নবীন শিল্পগুলিকে উন্নত দেশের শিল্পগুলির সমকক্ষ করে তোলে না।

অনুবাদক : মনোজ কুমার সান্যাল ও সৌমেন নন্দী

উৎস ও টীকা

১। অন্য কোনো ইঙ্গিত না থাকলে এই গ্রন্থে দেশ বিভাগের পূর্ববর্তী 'ভারত ও পাকিস্তান'-এর সংক্ষিপ্ত প্রকাশ হিসাবে 'ভারত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

২। William Digby, *'Prosperous' British India* (লন্ডন ১৯০১), বিশেষ করে দ্বিতীয় অধ্যায়।

৩। F. J. Atkinson. 'A statistical review of the income and wealth of British India.' *JRSS,* ৬৫, অংশ ২, পৃ. ২০৯-৭২

৪। Phyllis Deane ও W. A. Cole, *British Economic Growth 1688-1959* (কেম্ব্রিজ ১৯৬৭), পৃ. ২৮২। তৎকালীন মূল্যস্তরকে ধরে করা হয়েছে।

৫। দ্রষ্টব্য S. Sivasubramonian, *National Income of India. 1900-01 to 1946-47* (মিমিওগ্র্যাফড্, দিল্লী স্কুল অব ইকনমিক্স, দিল্লী, ১৯৬৫), সারণি ৬.১।

৬। অ্যাটকিন্সনের পরিমাপের সমসাময়িক সমালোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য William Digby, 'Statistical review', *JRSS,* ৬৫, অংশ ২ জুন ১৯০২, পৃ. ২৭২-৫। আয় ও জমির উৎপাদনশীলতার পরবর্তীকালের প্রবণতা সম্পর্কে আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য এই গ্রন্থের অধ্যায় ৩ ও ৪।

৭। Daniel Thorner, 'Long-term trends in output' in Daniel and Alice Thorner ; *Land and Labour in India* (লন্ডন, ১৯৬২), পৃ. ৮২-১১২ ; S. J. Patel ; 'Long-term changes in output and income in India' in S. J. Patel, *Essays on Economic Transition* (লন্ডন, ১৯৬৫), পৃ. ৩৩-৫০ ; এবং Sivasubramonian ; *National Income of India, 1900-01 to 1946-47*-এর পরিমাপ সব থেকে ব্যাপক যা আজ পর্যন্ত হয়নি। এই পরিমাপ অনুযায়ী সমগ্র ভারতের মাথা পিছু আয় ১৯০০-০১-এ ছিল ৪৯.৪ টাকা, এবং ১৯৩৯-৪০-এ ৬১ টাকা, ১৯৩৮-৩৯-এর দামস্তর ধরে। বৃদ্ধির হার ছিল বছরে ০.৫ শতাংশের কম। প্যাটেল ও থর্নার উভয়ই অঙ্কটিকে আরও কম দেখাতে চান।

৮। Kingsley Davis, *The Population of India and Pakistan* (প্রিন্সটন, এন জে, ১৯৫১), পৃ. ২৭।

৯। Daniel ও Alice Thorner, ' "De-industrialisation" in India', Daniel and Alice Thorner ; *Land and Labour in India,* পৃ. ৭০-৮১।

১০। Davis, *Population of India and Pakistan,* পৃ. ২১৪। উদ্ধৃতির ভিতরের উদ্ধৃতিটির সূত্র : Hebert Heaton, 'Industrial revolution', *Encylopaedia of the Social Sciences,* খণ্ড ৮ (নিউইয়র্ক, ১৯৩৫), পৃ. ৩-১৩, পৃ. ৯।

১১। H. Venkatasubbiah, *The Foreign Trade of India : 1900-1940* (নিউ দিল্লী, ১৯৪৬), পৃ. ৩১-৯ এবং P. K. Ray ; *India's Foreign Trade since 1870* (লন্ডন, ১৯৩৪), অধ্যায় ৪।

১২। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য R. Ferber, 'The anatomy and structure of industry expectations in relation to those industrial firms', *Journal of the American Statistical Association,* খণ্ড ৫৩, জুন ১৯৫৮, পৃ. ৩১৭-৩৫ ; এবং Earl O. Heady and Donald R. Kaldor, 'Expections and errors

in forecasting agricultural prices', *Journal of Political Economy,* খণ্ড ৬২, ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪, পৃ. ৩৪-৪৭।

১৩। Venkatasubbiah. *Foreign Trade of India,* পৃ. ২৮।

১৪। দ্রষ্টব্য সারণি ৭.১, পৃ. ২২৬-৭ (এই গ্রন্থ)।

১৫। দাদাভাই নৌরজী ও এম জি রানাডে, এই দুই বিশিষ্ট জনপ্রিয় নেতা, ভারতীয় পণ্যের দ্বারা দেশের বাজার থেকে বিদেশী থানকাপড় বিতাড়নের সপক্ষে প্রচার করেন। দ্রষ্টব্য M. G. Ranade, *Essays on Indian Economics* (দ্বিতীয় সংস্করণ : মাদ্রাজ, ১৯০৬) এবং S. D. Mehta ; *The Cotton Mills of India : 1854-1954* (বোম্বাই, ১৯৫৪), অধ্যায় ৭। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গের পরবর্তীকালে স্বদেশী আন্দোলন বিদেশী দ্রব্য বিতাড়ণের সমর্থনকে রাজনৈতিক চরিত্র প্রদান করে। বেশি কাউন্টের সুতো উৎপাদন ও সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নের সম্ভাবনা সম্পর্কে ভারতীয় মিল মালিকরা অন্ততপক্ষে ১৯০১ সালেও সচেতন ছিলেন। দ্রষ্টব্য : Speeches of the Chairman and of Bomonjee D. Petit in Mill-owner's Association, Bombay, *Annual Report 1901* (বোম্বাই, ১৯০২), পৃ. ৭২-৩। ১৯০৩-এ বম্বে মিলওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান হিসাবে বমনজি ডি পেটিট একই বিষয়ের উপর আবার গুরুত্ব দেন : 'গত তিন-চার বছর ধরে আমি আমার অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে ক্রমাগত বলে চলেছি দেশের বাজারে মিহি কাপড়ের যে চাহিদা আছে তা মেটানোর চেষ্টা আমাদের মিলের উৎপাদন থেকেই করতে হবে। এই বাজার শুধু বড়ই নয় লাভজনকও।' Millowners' Association, Bombay : *Annual Report 1903* (বোম্বাই, ১৯০৪), পৃ. ১৭০।

১৬। প্রামাণিক তথ্য ও এ বিষয়ে আরও আলোচনার জন্যে এই গ্রন্থের অধ্যায় ৭ দ্রষ্টব্য।

১৭। C. F. Bickerdike, 'The theory of incipient taxes', *Economic Journal,* ১৬(৪), ডিসেম্বর ১৯০৬, পৃ. ৫২৯-৩৫।

১৮। শুধুমাত্র কিছু পণ্যের ভোগ হ্রাস করে সম্ভাব্য সঞ্চয়কে প্রকৃত সঞ্চয়ে পরিণত করার ধারণায় আপত্তি তোলা যেতে পারে। অনিয়োজিত সম্পদসম্পন্ন অর্থনীতিতে এ রকম কিছু যে ঘটতে পারে না তা ভালভাবেই জানা আছে। সমস্যাটির সঙ্গে যা কিছু সংশ্লিষ্ট তা হলো কেন্দ্রীয় সঞ্চয়-বিনিয়োগ তালিকার আড়াআড়ি বিন্যাসের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ তালিকাকে উত্তোলিত করা। আরও কথা হলো, সোনা অথবা বিলাস দ্রব্যের আমদানি অনেক সময়ে সঞ্চয়ের নির্গমনের পথ করে দেয়, কিন্তু তা বিনিয়োগে পরিণত হয় না লাভজনক ক্ষেত্রের অভাবে। শুল্ক-সংরক্ষণ শুধুমাত্র এই সমস্ত পণ্যের খাতে ব্যয় রোধ করে এবং বিনিয়োগ ঘটায় দেশীয় শিল্পে।

১৯। এই বিশিষ্টার্থক শব্দসমষ্টির উদ্ভাবক J. M Keynes, *The General Theory of Employment, Interest and Money* (লন্ডন, ১৯৪৯), পৃ. ১৬১।

২০। এই সব নীতির ভাল ব্যাখ্যার জন্যে দ্রষ্টব্য Jesse Burkhead, 'The balanced budget', *Quarterly Journal of Economics,* মে ১৯৫৪, পুনর্মুদ্রিত হয়েছে Arthur Smithies and J. Keith Butters (সম্পাদিত), *Readings in Fiscal Policy* (লন্ডন, ১৯৫৫), পৃ. ৩-২৭।

২১। Vera Anstey, 'Economic development' in L.S.S. O'Malley (ed): *Modern India and the West* (লন্ডন, ১৯৪১), পৃ. ২৫৮-৩০৪ ; p.p. Pillai, *Economic Conditions in India* (লন্ডন, ১৯২৫), অধ্যায় ১০ ; P. S. Lokanethan : *Industrial Organisation in India* (লন্ডন, ১৯৩৫) ; N. Das, *Industrial Enterprise in India* (লন্ডন, ১৯৩৮), অধ্যায় ১ ও ৮ ; Sir Reginald Coupland, *India : A Re-statement* (লন্ডন, ১৯৪৫), পৃ. ৫২-৭০। আধুনিক ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একই রকম মতের জন্যে দ্রষ্টব্য D. K. Rangnekar ; *Poverty and Capital Development in India* (লন্ডন, ১৯৫৮)।

২২। 'The Industrialization of the Far East', *Cambridge Economic History of Europe,* খণ্ড ৬, অংশ ২ (কেমব্রিজ, ১৯৬৫), পৃ. ৯০৯-১০

২৩। *Economic Development of the British Overseas Empire* (লন্ডন, ১৯২৪)।

২৪। ঐ, পৃ. ২৬৭

২৫। ঐ, পৃ. ৪৬৬

২৬। এই গ্রন্থের অধ্যায় ৬ দ্রষ্টব্য

২৭। Coupland, *India : A Restatement,* পৃ. ৫৯-৬৩।

২৮। W. A. Lewis, 'Economic development with unlimited supplies of labour, *The Manchester School,* ২২ (১৯৫৪)।

২৯। Anstey, 'Economic development' and *idem, The Economic Development of India* (লন্ডন, ১৯৫৭)।

৩০। নৈর্ব্যক্তিক বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতার মডেলটি থেকে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক কি-ভাবে বিচ্যুত হতে পারে তার আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য Daniel Thorner, 'Employer-labour relationships in Indian agriculture', Daniel ও Alice Thorner, *Land and Labour in India.*

৩১। ১৮০১ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (প্রতি হাজারে) সমগ্র ইয়োরোপে ছিল ৯.৯, গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ডে ৯.৬ এবং জার্মানিতে ১৩.২। দ্রষ্টব্য D. V. Glass, 'World population 1800-1950', H. J. Habakkuk ও M. Postan (সম্পাদিত), *The Cambridge Economic History of Europe,* খণ্ড ৬, অংশ ১ (কেমব্রিজ, ১৯৬৫), পৃ. ৫৬-১৩৮, পৃ. ৬২।

৩২। সরকার social overhead খাতে ব্যয় করছিল, কিন্তু তার উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্যিক ও সামরিক (কয়েকটি ক্ষেত্রে দুর্ভিক্ষ রোধ করা)।

৩৩। 'Secular and cyclical aspects of the multiplier and the accelerator', *Income, Employment and Public Policy* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৮) ; এবং 'The nonlinear accelerator and the persistence of business cycles', *Econometrica,* খণ্ড ১৯, ১৯৫১, পৃ. ১-১৭।

৩৪। 'Stabilisation policy in a closed economy', Economic Journal, ৬৪, জুন ১৯৫৪ ; এবং 'A simple model of employment, money and prices in a growing economy', *Economica,* খণ্ড ২৮, নভেম্বর ১৯৬১।

৩৫। A.R. Bergstrom, *The Construction and Use of Economic Models* (লন্ডন, ১৯৬৭), পৃ. ২৭-৮

আমাদের বিনিয়োগ-অপেক্ষক যে ধরনের সামঞ্জস্যবিধানকাবী অপেক্ষকের পর্যায়ভুক্ত তার আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য : Marc Nerlove, 'Time-series analysis of the supply of agricultural products', E. O. Heady and others (eds.), *Agricultural Supply Functions—Estimating Techniques and Interpretation* (Ames, Iowa, 1961)।

৩৬। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে উদ্ভাবন ও অর্থনৈতিক প্রসারের ক্ষেত্রে মূলধনী দ্রব্য শিল্পগুলির ভূমিকার জন্যে দ্রষ্টব্য Karl Marx, *Capital : A Critical Analysis of Capitalist Production,* Samuel Moore ও Edward Aveling অনূদিত এবং Frederick Engels সম্পাদিত (লন্ডন, ১৯৫৭), অংশ ৪, অধ্যায় ১৫, 'Machinery and Modern Industry'। অনগ্রসর দেশে বিশেষীকরণ ও উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি থেকে ব্যয়-সংকোচের সুযোগ-সুবিধার যথোপযুক্ত ব্যবহারের উপায়গুলি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য : Nathan Rosenberg, 'Capital goods, technology and economic growth', *Oxford Economic Papers,* N. S. , খণ্ড ১৫, ১৯৬৩, পৃ. ২১৬-২৭ এবং J. R. Hicks, S. Kuznets ও G. Stigler এর Rosenberg উল্লিখিত প্রবন্ধগুলি। মূলধনী উৎপাদনকারী শিল্পগুলির উপর যথোপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন পরিমাপ করার একটি প্রয়াসের জন্যে দ্রষ্টব্য : L. L. Pasinetti, 'On Concepts and measures of changes in productivity', *Review of Economics and Statistics,* খণ্ড ৪১, ১৯৫৯, পৃ. ২৭০-৮৬।

৩৭। দ্রষ্টব্য A. W. Phillips, 'Stabilization Policy and the Time-Form of Lagged Responses', *Economic Journal,* ৬৭, জুন ১৯৫৭।

৩৮। উপরের প্যারাগুলিতে এমন অনেক বিষয় উত্থাপিত হয়েছে যেগুলির আরও বেশি তাত্ত্বিক আলোচনা পাওয়া যায় F. Modigliani' প্রবন্ধে : 'New Developments on the oligopoly front', *J P E,* ৬৬, জুন ১৯৫৮, পৃ. ২১৫-৩২। আরও দ্রষ্টব্য : *J P E*-তে (৬৭, অগাস্ট ১৯৫৯, পৃ. ৪১০-১৯) প্রকাশিত F. M. Fisher, D. E. Farrar এবং C.F. Phillips, Jr,-এর Bain-Sylos-Modigliani model'-এর উপর সমালোচনা, এবং Modigliani'র উত্তর।

৩৯। এই গ্রন্থের অধ্যায় ৭, শেষ অনুচ্ছেদ।

অনুবাদক : মনোজ কুমার সান্যাল

২

ভারত সরকারের বৈষয়িক নীতি

বেসরকারি বিনিয়োগের আচরণ যেমন নির্ভর করে মানুষের সাধারণ অবস্থা ও উৎপাদন কৌশলের উপর, তেমনি নির্ভর কবে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে গৃহীত সরকারি নীতিগুলির উপর। কিন্তু ভারতে অর্থব্যবস্থার কয়েকটি মাত্র ক্ষেত্রেই সবকারি আমলাদের দৃষ্টি আবদ্ধ থাকায় সামগ্রিকভাবে সেই ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার সচেতন প্রয়াস কোনো সময়েই সরকারি নীতিগুলির মধ্যে প্রতিফলিত হয়নি। বৈষয়িক নীতি এ ভাবে খণ্ডিত হওয়ার একটি প্রধান কারণ ছিল সবকারের কাছে তথ্যেব অভাব। তবে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রকে মনে রেখে প্রবর্তিত এই নীতি অন্যান্য ক্ষেত্রের উপরেও প্রভাব ফেলেছিল। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ কবা যেতে পাবে বৈদেশিক বাণিজ্য বাড়ানোর লক্ষ্য কিংবা লন্ডনের টাকার বাজারে নিজেদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার নীতি ভারতে আধুনিক শিল্পকে উৎসাহদানের পক্ষে অন্তরায় ছিল। সরকারি নীতির বিভিন্ন দিকের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কোন্ কোন্ নিয়ন্ত্রণলক্ষ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে সেই অনুসারে আমরা নীতিগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করেছি। যেমন, বলা যায় সরকাবের আয়ব্যয় নীতির ক্ষেত্রে আমাদের আলোচনার বিষয় হবে সরকারি ব্যয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ; সরকারের বাণিজ্য ও শিল্পনীতির ক্ষেত্রে আমরা আলোচনা করব শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে আমদানি-শুল্ক ও ভরতুকির সম্পর্ক এবং নিদ্ধ নীতির (monetary policy) আলোচনায় থাকবে ভারতের ব্যাঙ্কিং সংগঠন ও মুদ্রা ব্যবস্থার বিশ্লেষণ (ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা এবং মুদ্রা ব্যবস্থা এই দুটি বেশ ভালোভাবেই সরকারি নীতির দ্বারা প্রভাবিত হতো)। আমরা আলোচনার কালসীমাকে দুভাগে ভাগ কবার চেষ্টা করেছি—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবধি প্রথম পর্ব ও দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময় দ্বিতীয় পর্ব। তবে আলোচনার সর্বত্র যে এই ভেদরেখা তীক্ষ্ণভাবে বজায় থেকেছে এমন নয়। বর্তমান অধ্যায়ে যেভাবে সরকারি নীতিগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা নিয়েও দু-এক কথা বলা দরকার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে সরকারের বাণিজ্য-নীতি ও রাজস্ব-নীতি এত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল যে এদের আলোচনা একই সাথে করতে হয়েছে। আবার যুদ্ধের পরে ভারত সরকারের শিল্পনীতি ও তথাকথিত স্বশাসিত রাজ্যগুলির সামগ্রিক বাণিজ্যনীতি কমবেশি সমার্থক হয়ে যাওয়ায় পূর্বোক্ত বিষয়টি আর আলাদা করে আলোচনা করা হয়নি। এর থেকে অবশ্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না সরকারি নীতিগুলির বিভিন্ন দিককে সুবিধামতো একত্রিত করা সম্ভব। সম্ভব হতে পারে যখন নীতিগুলি এক সুতোয় গাঁথা থাকে, যেমন, টাকাকে স্বর্ণ বিনিময় মানে (gold exchange standard) বেঁধে রাখা, টাকার বৈদেশিক দাম সমান রাখা এবং আর্থিক রক্ষণশীলতার নীতি অনমনীয়ভাবে মেনে চলা। সরকারি নীতির এই শ্রেণীবিন্যাস বেছে নেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র ব্যাখার সুবিধার জন্যে।

২.১ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবধি সরকারের রাজস্ব নীতি

এই সময়ে সরকারি বাজেটে চলতি বছরের আয়ব্যয়ের সমতা রাখাই ছিল অর্থমন্ত্রকের মূল লক্ষ্য। ১৯২৪-২৫ সাল পর্যন্ত রেলের ও সেচের আয়-ব্যয় মূল হিসাবের মধ্যে ধরে সাধারণ বাজেটে আয়-ব্যয়ের সমতা রাখা হতো। উনবিংশ শতাব্দীর নয়ের দশকে এই সমতা রক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে মূলত চারটি কারণে—(১) রেলের ক্ষেত্রে ক্রমাগত ঘাটতি (২) টাকার বৈদেশিক বিনিময় মূল্যের ওঠানামা (টাকার দাম কমে যাওয়ায় *home charge*-এর খরচ টাকার অঙ্কে বেড়ে যাওয়া) (৩) আফিম থেকে সংগৃহীত রাজস্বের ক্রমাগত হ্রাস এবং (৪) সরকারি আয়-ব্যয়ের উপরে ১৮৯৬-৯৭ সালের দুর্ভিক্ষের প্রভাব।[১] ১৮৯০-৯১ থেকে ১৮৯৭-৯৮ এই আটটি আর্থিক বছরের মধ্যে চার বছরে বাজেট উদ্বৃত্ত হয় এবং অন্য চারটি ছিল ঘাটতির বছর। আর চার বছরের মোট ঘাটতি অন্য চার বছরের মোট উদ্বৃত্ত অংশের তুলনায় বেশি ছিল। করের হার বাড়িয়ে, সুতি বস্ত্রের উপর আমদানি শুল্ক বসিয়ে এবং এর দ্বারা ব্রিটিশ সুতি বস্ত্রের আমদানি যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্যে সুতি বস্ত্রের উপর অন্তঃশুল্ক (Countervailing excise duty) আরোপ করে এই বাজেট ঘাটতি বাড়তে দেওয়া হয়নি।

এই ঘাটতির ধারার সম্পূর্ণ বিপরীত পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায় ১৮৯৮-৯৯ থেকে ১৯১৩-১৪-র মধ্যে। এই ষোল বছর কালসীমার মধ্যে একমাত্র ১৯০৮-০৯ আর্থিক বছরটিই ছিল ঘাটতির। বিভিন্ন প্রদেশে আঞ্চলিক উন্নয়নের (রাস্তা তৈরি, স্কুল ও চিকিৎসালয় রক্ষণাবেক্ষণ, ইত্যাদি) জন্যে জমির খাজনার উপরে অতিরিক্ত কর ধার্য করে যে রাজস্ব আদায় হতো, ১৯০৮-০৯ সালে তার সিংহভাগই চলে যায় আঞ্চলিক শাসন সংস্থাগুলির হাতে, যদিও বহু কাজেরই ব্যয় বহন করতে হতো ভারত সরকারকেই। প্রধানত এই কারণেই ১৯০৮-০৯ বছরটিতে ঘাটতির সম্মুখীন হতে হয়।

সমস্ত বিশ্বে বিশেষত ধনী দেশগুলিতে বাণিজ্য ও উৎপাদনের সম্প্রসারণ ছিল এই সময়ের অর্থব্যবস্থায় তেজীভাবের প্রধান কারণ। এ সময় ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য (আমদানি ও রপ্তানি দুই-ই) বৃদ্ধি পায় ও ভারত সরকারের রাজস্বের বৃদ্ধি ঘটে। ক্রমাগত রপ্তানি বৃদ্ধি, ভারতের বহির্বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত অবস্থা ও সরকারি খাতে ভারতে প্রচুর বৈদেশিক বিনিয়োগ, ইত্যাদির ফলে স্বর্ণ বিনিময় মানে বাধা ভারতীয় টাকার বৈদেশিক বিনিময় মূল্য স্থিরতা লাভ করে।[২]

ক্রমাগত উদ্বৃত্ত বাজেট ও টাকার মূল্যের স্থিরতা সরকারের কাছে মূলত তিনটি বিকল্প পথ খুলে দেয় — (১) কর হ্রাস ; (২) সামাজিক সেবামূলক কাজ, বিশেষত স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি ; (৩) রেলপথ সম্প্রসারণ ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ইত্যাদি খাতে সরকারি খরচ বাড়ানো। এই তিন নীতির স্বপক্ষেই সমর্থক দল ছিল। মূলত কিছু রাজকর্মচারী, জাতীয়তাবাদী প্রবক্তা ও তাঁদের সমর্থকরা ভূমি রাজস্বের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি বলে মনে করতেন।[৩] অন্য দলের ভূমিরাজস্বের মোট পরিমাণ সম্বন্ধে আপত্তি না থাকলেও, তাঁরা রাজস্ব ব্যবস্থা আপত্তিজনক ভাবে অনমনীয় মনে করতেন। বস্তুত সরকারি কর্মচারীদের শ্রীবৃদ্ধি অথবা সরকারের প্রধান প্রধান ব্যয়ের সঙ্গে সাধারণ মানুষের শ্রীবৃদ্ধির কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। এর প্রধান কারণ ছিল অনমনীয় ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা, — দুর্ভিক্ষের বছরগুলিতেও স্বাভাবিক

বছরের মতোই ভূমিরাজস্ব দিতে হতো কৃষকদের (অবশ্য কখনও কখনও বিশেষ কারণে রাজস্ব মাপ করা হতো অথবা বকেয়া দেওয়া হতো)।[৪]

একজন সাধারণ ভারতবাসীর উপরে আপেক্ষিক করভারেব প্রশ্ন না তুলেও বলা যায় বিংশ শতাব্দীর শুরুতে করব্যবস্থা ছিল গরিবের প্রতি কঠোব ও ১৯০০ সালের ৩১শে মার্চ যে আর্থিক বছর শেষ হয়, সেই বছরে মোট সংগৃহীত রাজস্বের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি এসেছিল ভূমিরাজস্ব থেকে, আব মোটামুটি ১৪ শতাংশ এসেছিল আমদানি শুল্ক ও কেন্দ্রীয শুল্ক মিলিয়ে। অকৃষিজ আয়ের উপরে করের হার বেশ কমই ছিল। বার্ষিক পাঁচশো টাকা আযেব উপরে ধার্য কর থেকে সরকারি রাজস্বের ২-৩ শতাংশ সংগৃহীত হযেছিল। কৃষিজাত আয করমুক্ত ছিল। ভূমিরাজস্বের পরিমাণ নির্ধারিত হতো জমির মালিকের আয অনুসারে নয়, জমিব পরিমাণ অনুসারে। এই সব কারণে করব্যবস্থা নিশ্চিতভাবেই ছিল ধনপক্ষপাতী বিত্তবানেব প্রতি সদয় (regressive)।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে সরকার কিছু কিছু ক্ষেত্রে কর ছাড় দেওয়া শুরু করে। ১৮৯৬-৯৭ ও ১৮৯৯-১৯০০ সালের দুর্ভিক্ষের পবে ভূমিরাজস্বের পরিমাণ দুবাবই প্রচুর পরিমাণে কমানো হয়। ১৯০৩-০৪ সালে আয়করের ছাড়ের সীমা বার্ষিক ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০০ টাকা করা হয়। এতে অবশ্য ৩০ টাকার (লর্ড কার্জনেব হিসাব অনুযায়ী) গড় আয় সম্পন্ন একজন সাধারণ ভারতীয়ের অবস্থার বিশেষ হেরফের হয়নি। লাভ হয়েছিল কেবল বৃহৎ ব্যবসায়ী, আইনজীবী ও শিল্পোদ্যোগীদের। লবণের উপবে শুল্কও ১৯০৩-০৪ থেকে ১৯০৭-০৮ সালের মধ্যে ক্রমাগত কমিয়ে প্রতি মণ ২১/২টাকা থেকে ১ টাকা করা হয়।[৫]

শিক্ষা এবং অন্যান্য জনকল্যাণমূলক ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় এ সময় সামান্য বাড়ানো হয়েছিল। শিক্ষার গুণগত এবং পরিমাণগত প্রসারের জন্যে যে প্রচুর অর্থ প্রয়োজন, একথা লর্ড কার্জন উপলব্ধি করলেও, শিক্ষাব্যয় প্রকৃতপক্ষে ছিল সামান্যই। ১৯০৩-০৪, ১৯০৪-০৫ ও ১৯০৫-০৬ নাগাদ সরকারি ব্যয় ৮৪০০ লক্ষ টাকা অতিক্রম করলেও, ঐ তিনটি বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় ছিল যথাক্রমে ২০৪˙৬, ২২১˙২ ও ২৪৪˙৯ লক্ষ টাকা।[৬] আইনসভায় ও তার বাইরে উচ্চ শিক্ষাসংক্রান্ত দাবিগুলি উত্থিত হলেও, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার দাবি কখনই জোরদার হয়নি। এ সত্ত্বেও সরকারি বদান্যতার মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক বিরোধীদের (মূলত আইনজীবী কর্মহীন অথবা স্বল্প চেতনাভোগী কলা স্নাতকদের) সংখ্যা বৃদ্ধি রদ করা। শিল্পোন্নয়নের অভাব ইয়োরোপীয় নিয়ন্ত্রিত শিল্পসংস্থায় ও ভারত সরকারের পূর্ত বিভাগে (পি. ডব্লু. ডি) ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ নিয়োগের প্রতি অনীহা এমনিতেই এই ধরনের কাজের সুযোগকে সংকুচিত রেখেছিল, তাই প্রযুক্তি-শিক্ষার সুযোগ বাড়িয়ে সরকার আর বিক্ষুব্ধ প্রযুক্তিবিদের সংখ্যা বাড়াতে চায়নি।[৭]

রেলের ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি নিয়ে ভারত এবং ব্রিটেন স্থিত ব্রিটিশ বণিক সমাজ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে পরিষ্কার মতপার্থক্য ছিল। উনিশ শতকের শেষ ভাগ অবধি রেল পথ নির্মাণে ভারত সরকারের অর্থব্যয় বাড়ানো ছিল ব্রিটিশ বণিকদের এক প্রধান দাবি।[৮] ১৮৯৫ সালে ভারত-পাকিস্তান ও ব্রহ্মদেশ মিলিয়ে মোট নির্মিত রেলপথের পরিমাণ ছিল মাত্র ২০,০০০ মাইল, যা ১৯০০ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ২৪,৭৫২ মাইলে।

দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কোনরকম রেল ব্যবস্থা চালু ছিল না। বিশেষত সমুদ্র-বন্দর থেকে দূরস্থিত অঞ্চলে রেলব্যবস্থার অভাব ১৮৯৬-৯৭ ও ১৮৯৯-১৯০০ সালের দুর্ভিক্ষের ক্ষয়ক্ষতি বাড়িয়ে দিয়েছিল। ১৮৯৯-১৯০০ অবধি রেলের যে ক্ষতি হচ্ছিল তার প্রধান কারণ ছিল দুটি। পুরনো 'গ্যারান্টি' প্রথা অনুযায়ী সমস্ত রকম ক্ষতি সরকারকেই বহন করতে হতো এবং এর ফলে রেলেব সঙ্গে যুক্ত সমস্ত সংস্থা শুধু যে নিজেদের ক্ষতি বাড়িয়ে দেখাত তা নয় লাভ করার কোনো প্রয়াসও তাদের ছিল না। দ্বিতীয়ত, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গড়া রেলপথের একটি বড় অংশই ছিল সেনাবাহিনীর যাতায়াতের উপযোগী।[৯] রেলপথে বাণিজ্য বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে পুরনো কিছু রেল কোম্পানির অংশ সরকার কিনে নেওয়ায় রেলের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলো।[১০] ১৮৯৯-১৯০০ ও ১৯০০-১ সালের দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও রেলের আয় বেড়েছিল। তার কারণ ছিল ভারতের এক অংশ থেকে অন্য অংশে শস্যের চলাচল ও বিদেশ থেকে ভারতের দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে রেলপথে শস্যের আমদানি। স্বভাবতই, রেলের এই আর্থিক উন্নতি ও রেলপথে বাণিজ্য বৃদ্ধির সাথে সাথে রেলব্যবস্থার উন্নতির দাবিও জোরাল হলো। সরকার-নিযুক্ত কমিশনার টমাস রবার্টসনেব সুপারিশ[১১] অনুযায়ী রেল ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নতির জন্যে রেল বোর্ড গঠিত হলো। পরবর্তীকালে রেলের জন্যে অর্থের যোগান ও সাধারণ প্রশাসনিক বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্যে স্যার জেমস এল. ম্যাকে-র (উত্তরকালে লর্ড ইন্‌চ্‌কেপ) নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির প্রধান সুপারিশ ছিল সামনের বছরগুলিতে রেলপথ নির্মাণে বার্ষিক ১২৪ লক্ষ পাউন্ড ব্যয় করা।[১২] রেলপথ বসানো, ইত্যাদি কাজ ১৯০৭-০৮ সাল থেকে ত্বরান্বিত হলেও ব্যয়বরাদ্দ কিন্তু ১৮৯৮-৯৯ থেকেই বাড়তিব দিকে ছিল।[১৩] তবে পরবর্তী বছরগুলিব বেশিরভাগই ব্যয় ১২৫ লক্ষ পাউন্ডের (বা ১৮৭৫ লক্ষ টাকার) মাত্রা অতিক্রম করেনি।

সারণি ২.১ ভারতীয রেলে বরাদ্দ পুঁজির পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)

১৯০৮-০৯	১৫০০	১৯১৫-১৬	১২০০
১৯০৯-১০	১৫০০	১৯১৬-১৭	৪৫০
১৯১০-১১	১৬৩০	১৯১৭-১৮	৫৪০
১৯১১-১২	১৪২৫	১৯১৮-১৯	৬৩০
১৯১২-১৩	১৩৫০	১৯১৯-২০	২৬৫৫
১৯১৩-১৪	১৪০০	১৯২০-২১	২১৯৮
১৯১৪-১৫	১৪০০	১৯২১-২২	১৭৮২*

* টাকার বৈদেশিক বিনিময় হারে পরিবর্তনজনিত ক্ষতিপূরণের জন্যে বরাদ্দ ২৮২ লক্ষ টাকার অঙ্ক শুদ্ধ।

সূত্র: ভারত সরকার নিযুক্ত রেলব্যবস্থা সম্পর্কিত কমিটির রিপোর্ট (১৯২১, ১০), পৃ. ২১।

রেলের এই ব্যয় বৃদ্ধির ফলে ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থাগুলি কতটা লাভবান হয়েছিল সেকথা সরকারি তথ্য থেকে বলা কঠিন। কোনো কোনো বছরে রেল ইঞ্জিন, কামরা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির আমদানির পরিমাণ ছিল মোট ব্যয়ের অর্ধেকেরও কম (১৯১৩ - ১৪)। আবার কখনও ঐ পরিমাণ মোট সরকারি পুঁজি ব্যয়ের অর্ধেকের বেশি তো ছিলই এমনকি মোট

বিনিয়োগেরও অর্ধেকের বেশি ছিল। পুরনো ইঞ্জিন ও কামরাগুলির নতুন যন্ত্রপাতি কেনা এবং ইঞ্জিন, ইত্যাদির মজুত গড়ে তোলাই ছিল সম্ভবত এই অনুপাতের পরিবর্তনশীলতার প্রধান কারণ। এর থেকে অবশ্য এই সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে মোট বিনিয়োগ থেকে আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিন ও কামরার মূল্য বাদ দিলেই ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থা রেলকে যে যন্ত্রাদি সরবরাহ করত তার মূল্য নিরূপণ করা যাবে। কারণ রেলেব মোট বিনিয়োগের মধ্যে সিমেন্ট, লোহা ও ইস্পাতের খরচও ধরে নেওয়া হতো। এ ছাড়াও প্রয়োজনীয় নির্মাণ কার্যের একটি বড় অংশ রেলের কোম্পানিগুলির নিজস্ব কারখানাতেই বানানো হতো (১৯১১ সালে, বেলের কর্মশালাগুলিতে নিযুক্ত কর্মী সংখ্যা ছিল ৯৮,৭২৩ জন, সেখানে অন্যান্য ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থাগুলিতে মোট ২৩১৪৭ জন কর্মী নিযুক্ত ছিল)।[১৪]

তবে বিভিন্ন ইঞ্জিনীযারিং সংস্থাগুলি যে রেলের বরাতের উপবে বহুলাংশে নির্ভর করত সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। রেল কোম্পানিগুলি যাতে আরো বেশি বেশি কবে ভারতীয় পণ্য কেনে এ বিষয়ে সবকারের উপরে চাপও ক্রমবর্ধমান ছিল।[১৫] ১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রেল বোর্ড রাষ্ট্রায়ত্ত রেল সংস্থাকে তাদের মোট ক্রয়ের (যন্ত্রপাতি মজুতের) ২৫ শতাংশ ভারত থেকে কেনবার জন্যে এক নির্দেশ জারি করে, তার একটি প্রধান শর্ত ছিল এই যে সেই যন্ত্রগুলিকে প্রকৃত অর্থেই ভারতীয় হতে হবে অর্থাৎ আমদানি কবা যন্ত্রাংশ জুড়ে তৈরি করা হলে চলবে না।[১৬] বিশ্বযুদ্ধ লাগার আগে ভারতীয় পণ্যের এই খাতে বিক্রি বেশি বাড়ে নি। তবে ভারতের ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থাগুলি রেলের নির্মাণ কর্মের দরুন কিছু বরাত পেয়ে লাভবান হয়েছিল।[১৭]

বিভিন্ন কারণে রেলব্যবস্থার প্রতি আগ্রহ ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের তুলনায় সাধারণ ভারতীয়দের বেশ কমই ছিল। প্রথমত, রেলের মোট ব্যয়ের একটি ক্ষুদ্র অংশই ভারতে খরচ করা হতো ও দ্বিতীয়ত, যে সমস্ত ভারতীয় সংস্থা রেলের বরাত পেত তাদের অধিকাংশই ছিল ইয়োরোপীয মালিকানাধীন। অন্যদিকে সেচ ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত জরুরি অথচ অবহেলিত, যদিও তার থেকে সরকারের নীট রাজস্ব লাভ হতো। তার পুঁজি বরাদ্দ রেলের তুলনায় অত্যন্ত কম ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ অবধি রেলেব সামগ্রিক লোকসান সত্ত্বেও বেলের ক্ষেত্রে ব্যয় ছিল সেচ ব্যবস্থার চার গুণ, কখনো বা তার চাইতেও বেশি। ব্যয়ের এই ফারাক কিন্তু সবকারের উদ্বৃত্ত বছরগুলিতে কমার বদলে আরও বেড়ে যেত। সেই সমস্ত বছরগুলিতে রেলের ক্ষেত্রে ব্যয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেলেও সেচ ব্যয় কদাচিৎ বাড়ত , এবং বাড়লে, সামান্যই বাড়ত। ১৮৯৬-৯৭ ও ১৮৯৯-১৯০০ সালের দুর্ভিক্ষের আগে সরকার শুধু সেই সেচব্যবস্থায় উৎসাহ দেখিয়েছিল যেগুলি অর্থকরী ছিল। অন্য কোনো সেচপ্রকল্পে অর্থ ব্যয় করতে সরকার অনিচ্ছুক ছিল। যে সেচ প্রকল্পে তার কাজ চালাবার খরচ ও পুঁজির উপরে সুদের খরচ সেচব্যবস্থা চালু হওয়ার দশ বছরের মধ্যেই উঠে আসত তাকেই productive অথবা অর্থকরী বলা হতো। কিন্তু রেলপথ নির্মাণের ক্ষেত্রে এই কঠোর শর্ত আরোপিত হয়নি। কোনো রেল সংস্থাই উপরিকথিত অর্থকরী সংজ্ঞা অর্জন করতে পারত না।[১৮]

দুর্ভিক্ষ হলে রেলপথের সাহায্যে খাদ্যশস্য চলাচল সুগম করার চাইতে দুর্ভিক্ষের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর উদ্দেশ্যে সেচ ব্যবস্থার (বিশেষত, মধ্য ভারত ও বোম্বাইয়ের সন্নিহিত দাক্ষিণাত্যের স্বল্পবর্ষণ অঞ্চলে) উন্নতির জন্যে ব্যয় করার দিকেই ছিল ভারতীয় জনমত, নামত,

সরকারি মতও একই দিকে ঝুঁকেছিল।[১৯] ১৯০১-০৩ সালের মধ্যে এক সেচ কমিশন অনেক অনুসন্ধানের পর ৪৪০০ লক্ষ টাকার এক সেচকর্ম-যজ্ঞের প্রস্তাব দেন। পরবর্তী কুড়ি বছরের মধ্যে কিছু প্রধান সেচ ব্যবস্থা তৈরি করে ফেলাই ছিল এর লক্ষ্য। এছাড়াও রক্ষণমূলক ব্যবস্থা হিসাবে কম বৃষ্টির অঞ্চলগুলিতে এবং যে সব নদী দিয়ে সারা বছর ধরে সেচের খালগুলিতে পর্যাপ্ত জল সরববাহ করা যায় না, তাদের উপরের দিকে জলাধার তৈরির সুপারিশও এই কমিশনের রিপোর্টে করা হয়।[২০] সেচ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পরে সেচের ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ বেড়েছিল, কিন্তু ১৯০০-০১ থেকে ১৯১৩-১৪ র মধ্যে সেই বৃদ্ধির হার রেলপথের নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধিব চেয়ে কম ছিল।[২১]

মোট বিনিয়োগ (লক্ষ টাকায)

	রেলপথ	সরকারি সেচ ব্যবস্থা
১৯০০-০১	৮৩৭	২৪১
১৯১৩-১৪	২৩০৬	৪৮৪

বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে আমরা সরকারের আয়-ব্যয়নীতি যে নিরিখেই বিচার করি না কেন—সে রাষ্ট্রের আয় বাড়ানোর দিক থেকেই হোক, অথবা কৃষি ও বাণিজ্য প্রসারে সরকারি অর্থ যোগানের দিক থেকেই হোক, ব্রিটিশ সরকাবের ব্যয় নীতি বেশি মাত্রায় রক্ষণশীল ছিল। যেখানে বৃহৎ সেচ প্রকল্পগুলি থেকে নীট শতকরা ৭ হারে আয় হতো, আর সেখানে লন্ডনের বাজারে মাত্র শতকরা ৩ থেকে ৪ সুদে এই প্রকল্পগুলির জন্যে ঋণ সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল (ভারতের বাজারে তুলনীয় সুদের হার ছিল শতকরা ৩.৫ থেকে ৪.৫)। ১৯০৮ সালে ম্যাকে কমিটি সরকারি ঋণের প্রশ্নে অনুসন্ধান করে নিজেদের মত ব্যক্ত করে। তাদের মতে, সাধারণ বছবগুলিতে ভারত সরকার লন্ডনের বাজার থেকে ৯০ লক্ষ পাউন্ড ধার করতে পারত[২২] কিন্তু সরকারকৃত ঋণ ও বিভিন্ন রেল সংস্থার ঋণ মিলিয়েও ১৯০০ থেকে ১৯১৪ অবধি গড়ে বাৎসরিক ঋণ সংগ্রহের পরিমাণ ছিল মাত্র ৬,৩০৩,২৩৩ পাউন্ড।[২৩]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে রেল ও সেচ ব্যবস্থায় অত্যাধিক বিনিয়োগ মূল্যস্ফীতির সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারত এরকম একটি যুক্তি হয়ত দেওয়া যায়। কিন্তু মূলত দুটি কারণে যুক্তিটি খুব একটা জোরালো হয় না। প্রথমত, ভারতে মূল্যস্তর বৃদ্ধির প্রধান কারণ ছিল ভারতীয় রপ্তানি-পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি। ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যয় কীভাবে রপ্তানি-মূল্যকে প্রভাবিত করত তা স্পষ্ট নয়। দ্বিতীয়ত, বিদেশী (প্রধানত ব্রিটিশ) প্রাযুক্তিকরা তাঁদের মাইনের বড় অংশই নিজেদের দেশে পাঠিয়ে দিতেন। এর ফলে বর্ধিত সরকারি ব্যয়ের কমপক্ষে ৫০ শতাংশই বিলেতে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ঠিক এই কারণেই রেল ও সেচ ব্যবস্থায় বর্ধিত সরকারি পুঁজি বিনিয়োগ ভারতে শিল্প প্রসারের উপরে খুব বেশি প্রভাব ফেলতে পারত না। তবে সেই ব্যয় থেকে যাদের আয় বাড়ত তাদের প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা যদি বেশি হতো তবে সরকারি ব্যয়ের গুণকের (multiplier) মান উল্লেখযোগ্য হতে পারত। কিন্তু ভারতীয় শিল্পের পশ্চাৎপদ অবস্থা ও সরকার অনুসৃত মুক্ত বাণিজ্য নীতি চালু থাকার ফলে সরকারি বিনিয়োগ নতুন বেসরকারি বিনিয়োগকে বেশি উদ্দীপিত করতে পারত না।[২৪]

ভারতে শিল্প প্রসারের জন্যে আমদানি-শুল্ক প্রবর্তন করার যুক্তি হিসাবে এই কারণটিকে সহজেই তুলে ধরা যায়।[২৫]

২.২ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে তিরিশের দশকের অর্থনৈতিক মন্দা অবধি ভারত সরকারের আয়ব্যয় নীতি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ স্বল্পস্থায়ী হবে এরকম একটি ধারণা প্রথমে চালু ছিল। একমাত্র দীর্ঘস্থায়ী ব্যয় বর্ধনের খরচ মেটাতেই যে কর বৃদ্ধিব প্রয়োজন হয় এরকম একটি বিশ্বাসও তখন ছিল। সুতবাং যুদ্ধজনিত বর্ধিত ব্যয় মেটাতে সরকাব প্রথমেই কর বৃদ্ধি ঘটাযনি। কিন্তু ১৯১৬-১৭ সালেব বাজেট অধিবেশনের সময় এই বিষয়টি পরিষ্কার হযে যায় যে যুদ্ধ আরও কিছুদিন চলবে আর সমস্যা জর্জরিত ইংল্যান্ড থেকে সরকারের ধার করার সুযোগও সংকুচিত হযে যাবে।

এর ফলে আমদানি মূল্যের উপরে (ad valorem) ১৯১৬ সালে সাধারণ শুল্ক ৫ শতাংশ থেকে ৭^১/_২ শতাংশ (ad valorem) করা হয়। দেশীয় চিনি কলগুলির স্বার্থে চিনির উপর আমদানি-শুল্ক ১০ শতাংশ করা হয়। এছাড়া বস্ত্রশিল্প, রেল ও জাহাজ মেরামতিব জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বাদে অন্যান্য যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ সহ অন্য বেশ কিছু দ্রব্যের উপরেও ২^১/_২ শতাংশ আমদানি-শুল্ক বসানো হয়। এমন বেশ কয়েকটি দ্রব্যের উপরে নতুন ৭^১/_২ শতাংশ হারের সাধারণ শুল্ক বসান হয় যেগুলি আগে শুল্কের আওতার বাইরে ছিল। লোহা ও ইস্পাত সহ অন্যান্য ধাতুর উপর ধার্য শুল্কেরও বৃদ্ধি ঘটে। চা, কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানির উপরেও কর ধার্য করা হয়। উচ্চতর আয় সম্পন্ন করদাতাদের ক্ষেত্রে আয়-করের হারেরও সামান্য বৃদ্ধি ঘটে। এর পরের বছরেই কাঁচাপাট ও পাটজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে রপ্তানি-কর আরও বাড়ানো হয়, আর ১৮৯৪ সালের পর সর্বপ্রথম সুতি কাপড়কে সাড়ে সাত শতাংশ সাধারণ শুল্কের আওতার মধ্যে আনা হয়। এই ভাবেই স্থাপিত হয় বিভেদমূলক সংরক্ষণ নীতির ভিত।

ইতিমধ্যে সরকার বাজাব থেকে ঋণ তোলার ফলে মোট সরকারি ঋণ ও সেই ঋণের উপরে প্রদেয় সুদ উভয়ই বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধ চলাকালীন দেশের ভিতরে ও অংশত বাইরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যয় মেটাতে ও ব্রিটেনকে যুদ্ধ সাহায্য হিসাবে ১৯১৭ সালে ১০ কোটি পাউন্ড এবং যুদ্ধের শেষ মাসে ৪.৫ কোটি পাউন্ড দিতেই ঐ ঋণের প্রয়োজন হয়।[২৬]যুদ্ধের ফলে সরকারকে বাড়তি ১০ কোটি টাকা সুদ হিসাবে গুণতে হয় ও প্রতিরক্ষাখাতেও স্থায়ী ব্যয় ২৫ কোটি টাকা পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটে। ভারতীয় টাকা ও পাউন্ডের বিনিময় হার ১ শিলিং ৪ পেন্সে ধরে রাখার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার স্টার্লিং লগ্নিপত্রে (recurities) প্রচুর পরিমাণ বিনিয়োগ করে। এছাড়া সুদের হার বৃদ্ধি ও ১৯১৮ - ১৯২০ সালের মধ্যে ভারতীয় মুদ্রামানের বৃদ্ধির ফলে ভারত সরকারকে বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে চলতি হিসাবের (current account) খাতে সরকারি ব্যয় প্রচুর বৃদ্ধি পেলেও রাজস্ব আদায় সেই অনুযায়ী বাড়েনি। ফলে ১৯১৮-১৯ থেকে ১৯২৩-২৪-এর মধ্যে সরকারি ঋণ খুব বেড়ে যায়। আর এই ঋণের বেশির ভাগটাই তোলা হয়েছিল ভারতবর্ষ থেকে।[২৭] এই সময়ে, বিশেষত অর্থ ব্যবস্থার তেজী ভাব ভেঙ্গে পড়ার পরে, মুদ্রামানের অনিশ্চয়তা ও মুদ্রাস্ফীতির কারণে সরকার তার ঋণ শোধ দিতে পারবে কিনা এ নিয়ে

বেসরকারি ব্যবসায়ী মহলে গভীর সন্দেহ দেখা দেয়। মূলত ব্যবসায়ীদের নিয়েই সরকার ১৯২২ সালে রিট্রেন্চ্মেন্ট কমিটি (Retrenchment Committee) গঠন করে।[২৮] এই কমিটি প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়সহ অন্যান্য সরকারি ব্যয় সংকোচের সুপারিশ করে। এছাড়া সেচ ব্যবস্থায় ও তার আগের সাত আট বছরে অত্যধিক ব্যবহারে ক্ষতিগ্রস্ত রেলব্যবস্থার উন্নতিকল্পে পুঁজি বরাদ্দের পরিমাণ কমিয়ে রাখার সুপারিশ করে এই কমিটি।[২৯]

সরকারি বর্ধিত ব্যয় যেখানে ব্যবসায়ীদের লাভের অঙ্ক সাধারণত বাড়িয়ে দেয় সেখানে সেই ব্যবসায়ীদেরই এক কমিটি সরকারের ব্যয় কমাতে পরামর্শ দিয়েছিল এই ঘটনা বেশ আশ্চর্যজনক। তার বেশ কিছু কারণ ছিল, প্রথমত, সরকারি আমলাদের মতো পুঁজিপতিরাও ঘাটতিহীন সরকারি বাজেটে বিশ্বাসী ছিল। দ্বিতীয়ত, প্রতিরক্ষা ও রেলের ক্ষেত্রে বর্ধিত সরকারি ব্যয় থেকে ভারতীয় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা খুব একটা লাভ করতে পারত না। তৃতীয়ত, ঋণ তোলার ক্ষেত্রে সুদের হার বাড়িয়ে সরকার বৃহৎ শিল্পপতিদের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। চতুর্থত, সরকার ব্যয়ের যোগান দিতে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ করের হার প্রচুর বাড়িয়ে দিতে পারে, এরকম একটা আশঙ্কা ছিল। স্বভাবতই, প্রত্যক্ষ হার বাড়ার ভয়ে অনেক বেশি ভীত ছিল এই ধর্মী ব্যবসায়ী শ্রেণী। এছাড়া অধিকাংশ পণ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রেই সরবরাহের রেখা অস্থিতিস্থাপক হওয়ার জন্যে এরকম একটি ধারণা ছিল যে ক্রমবর্ধমান সরকারি ব্যয় মুদ্রাস্ফীতি বাড়িয়ে দেবে। কিন্তু অর্থব্যবস্থার সাধারণ অবস্থার উন্নতি হওয়ার ফলেই ১৯২৩-২৪ সাল থেকে সরকার আবার চলতি হিসাবের খাতে উদ্বৃত্ত লাভ করতে সক্ষম হয়, তবুও যুদ্ধ পরবর্তী বছরগুলির অভিজ্ঞতার ফলে সরকার সাবধানতার নীতি অবলম্বন করে।[৩০] সরকারের এই অতি সাবধানী ঋণ নীতি এবং কুড়ির দশকের কয়েকটি বছরে, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, লন্ডনের টাকার বাজার থেকে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা ধার না করা পরবর্তী কালে সমালোচিত হয়। বস্তুত তিরিশের দশকে রাজনৈতিক গোলযোগ ও রেলের দুটি সর্ববৃহৎ সংস্থা ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ও গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিন্সুলা রেলওয়ের রাষ্ট্রীয়করণ সত্ত্বেও লন্ডনের টাকার বাজারে ভারত সরকারের সুনাম বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয়নি।[৩১] এই তিরিশের দশকেই অবশ্য সরকার সংরক্ষণশীল আয়ব্যয়নীতি (sound finance) বজায় রাখতে অত্যুৎসাহী হয়ে পড়ে।

১৯২৩ সালে গৃহীত বিভেদমূলক সংরক্ষণের (discriminating protection) সরকারি নীতিটি ছিল নেহাতই বিষয়গুলিকে খণ্ড খণ্ড করে দেখার (piecemeal) চেষ্টার নিদর্শন — সরকারের কোনো সার্বিক শিল্পনীতির পরিচয় এতে ছিল না।[৩২] কুড়ির দশকেও ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধির হার কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইত্যাদি উন্নত দেশের তুলনায় কম ছিল।[৩৩] এছাড়া শিল্পজাত ও কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে বিনিময় হার (terms of trade) প্রচণ্ডভাবে কৃষিজাত দ্রব্যের বিপক্ষে ছিল।[৩৪] এই দুটি ব্যাপারই উচ্চপদস্থ সরকারি আমলাদের নজর এড়ায়নি। কিছুটা বোঝা গিয়েছিল যে শিল্প প্রসারের জন্যে একান্ত জরুরি ছিল বাজারের প্রসার যা কৃষির উৎপাদিকা শক্তির স্বল্পতায় ব্যাহত হচ্ছিল। এত সমস্যার সম্মুখীন হয়ে কুড়ির দশকে সরকারের একমাত্র প্রতিক্রিয়া ছিল বিভেদমূলক শুল্ক সংরক্ষণ নীতির প্রবর্তন। তিন ধরনের ক্ষেত্রে এই নীতি চালু ছিল : (ক) যে সমস্ত শিল্পে প্রকৃতিদত্ত (natural) সুবিধা ছিল, (খ) সংরক্ষণ ছাড়া যে সব শিল্প একেবারেই গড়ে উঠত না অথবা অতি শ্লথগতিতে বাড়ত এবং (গ) সংরক্ষণের সাহায্যে যে সব শিল্প কালক্রমে বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে পারত।

বিভেদমূলক সংরক্ষণ নীতি যেভাবে প্রয়োগ করা হতো তাতে এর কার্যকারিতা বহুলাংশে ব্যাহত হয়েছিল। প্রথমত, সংরক্ষণের জন্যে আবেদন পত্রকে ট্যারিফ বোর্ডের কাছে পাঠানো হবে কি হবে না তা ছিল সরকারের মর্জিমাফিক। দ্বিতীয়ত, আবেদনপত্র গ্রহণ কবাব পব তার উপব প্রতিবেদন সবকাবের কাছে ট্যারিফ বোর্ড যে কবে পাঠাবে তাব কোনো নির্ধারিত সময়সীমাব ঠিক ছিল না।[৩৫] ট্যারিফ বোর্ড ও কেন্দ্রীয় আইনসভার সুপারিশ মনোমতো না হলে সরকাব সেগুলিকে অগ্রাহ্য করতে পারত।[৩৬] এছাড়া বহু ক্ষেত্রে অনুমোদিত সংরক্ষণেব কাল খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল, ফলে কোনো নতুন শিল্প বিদেশী প্রতিযোগিতায বিপন্ন হলে সবকার যে তাদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে এমন ভরসা শিল্পোদ্যোগীদের ছিল না।

বাস্তবপক্ষে কুড়ির দশকে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্প সংরক্ষণেব আওতায় এসেছিল সেগুলি হলো ইস্পাত, কয়েক ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, কাগজ ও দেশলাই। যদিও চিনিব উপবে উঁচু হাবে আমদানি-শুল্ক ছিল, কিন্তু তাকে ঠিক সংরক্ষণ-শুল্ক বলা যায় না। এই ধবনেব দুর্বল সংরক্ষণ নীতি ছাড়া, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেব সরকারি আযব্যয নীতি ও শিল্পনীতি ভারত সরকার কুড়ির দশকেও বজায় বেখেছিল।[৩৭]

তিরিশের দশকের মন্দা যখন ধনতান্ত্রিক বিশ্ব ও তাব উপনিবেশগুলিকে পুরোপুরি কব্জা করে ফেলেছে, তখন ভারত সরকার আযব্যয় সমতাব (sound finance) নীতিকে আবও আঁকড়ে ধরল। সরকারি নীতির একটি চিত্র আমরা পাই ১৯২৯ থেকে ১৯৩৪ অবধি ভারত সরকারের অর্থদপ্তবের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার জর্জ শুস্টারের বাজেট বক্তৃতা থেকে। তাঁর বক্তৃতাবই একটি নমুনার অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি : 'সারা পৃথিবীতে আমাদেব যে সুনাম দেনাদার হিসেবে আছে তার দিকে নজর রেখে আমাদের চেষ্টা করা উচিত যাতে আমাদের নতুন ঋণ না নিতে হয় অথবা যাতে আমরা ঋণভার কমাতে পারি। যে খাতে সবকার দেনা শোধ করার জন্যে টাকা জমায় তাতে যাতে হাত না পড়ে তার জন্যে সব বকমের প্রয়াস চালানো দরকার।'[৩৮] আরেকটি নমুনা-'আতঙ্কিত হয়ে বেপরোয়া পদক্ষেপ নেওয়ার সময় এখনো আসেনি। এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমাদের ঘোর অনিশ্চয়তাব মধ্যে ঠেলে দেবে এবং সমগ্র সরকারি কর্মদক্ষতাকে বিপন্ন করে তুলবে। আমাদের বর্তমান কর্তব্য হলো কাজের খুঁটিনাটির প্রতি অবিরাম নজর রাখা, আয়ব্যয় সমতা (Sound finance) নীতি বজায় রাখা এবং একত্রিত হয়ে অবিচলিত ভাবে কঠোর পরিশ্রম করা। আয়ব্যয় সমতার নীতিকে সর্বাগ্রে রাখা দরকার।'[৩৯] বিভিন্ন উপায়ে সরকারি ব্যয় কমানোর চেষ্টা হয়েছিল এই সময়ে — সরকারি কর্মচারীদের মাইনে কমিয়ে, প্রতিরক্ষাখাতে ব্যয় হ্রাস করে ও বহিঃশুল্ক (custom duty) বাড়িয়ে। তবে ব্যয় হ্রাসের প্রধান ধাক্কা পড়েছিল রেল ও সেচে সরকারি পুঁজি বিনিয়োগে। এই ব্যয় সঙ্কোচের (deflationary) নীতি এত কঠোরভাবে পালিত হয়েছিল যে কেবলমাত্র ১৯৩০-৩১ ও ১৯৩১-৩২ সালে সরকারের রাজস্ব খাতে ঘাটতি দেখা যায়। বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতির জন্যে এই ব্যয়সংকোচ হয়েছিল তা বলা যাবে না। কারণ সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী ১৯৩২-৩৩ ব্যতীত তিরিশের দশকের সমস্ত বছরেই ভারতের বহির্বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত ছিল।[৪০] সোনারুপোর আন্তর্জাতিক লেনদেন ধরেও এই উদ্বৃত্ত গোটা তিরিশের দশকেই বজায় ছিল।[৪১] বস্তুত, এই উদ্বৃত্তের সাহায্যেই ভারত সরকার স্টার্লিং দেনার একটি বড় অংশ এই সময় শোধ করে দেয়। দেশীয় পুঁজির বাজার থেকে ঋণ না নেওয়ার সরকারের অতি সাবধানী আর্থিক

নীতির ব্যাখ্যা সহজসাধ্য নয়। দেশীয় পুঁজির বাজার এত ভালো অবস্থায় ছিল যে ভারত সরকার যদি লন্ডনের বাজার থেকে ঋণ নিতে না চাইত, তাহলে দেশের বাজার থেকেই অত্যন্ত কম সুদে যথেষ্ট পরিমাণে ঋণ সংগ্রহ করতে পারত। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে ১৯৩৬ সালের মে মাসেই ১৯৪৮-৫২ সালের মধ্যে দেয় শতকরা ২$^{৩}/_{৪}$ হারে ১২ কোটি টাকা ঋণ সংগ্রহ করে।[৪২] সুতরাং নিরাপদ আর্থিক নীতির নির্ণায়ক ব্যবহার করেও বলতে হয় যে সরকারি নীতি একটু বেশি পরিমাণেই রক্ষণশীল ছিল।

অথচ, বেশ কিছু উচ্চপদস্থ আমলা ভারতের দীর্ঘস্থায়ী আর্থিক উন্নতির জন্যে অন্য নীতির প্রয়োজন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। যে জর্জ শুস্টার সরকারি নীতির সাফাই গেয়েছিলেন, তিনিই অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সভ্যের পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর সম্পূর্ণ অন্য কথা বলেন। ভারতের দীর্ঘস্থায়ী আর্থিক উন্নতির জন্যে একটি দীর্ঘকালীন সামগ্রিক পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে এই ছিল শুস্টারের মত। তাঁর এই সামগ্রিক নীতির মধ্যে ছিল বিভিন্ন অঞ্চলের আর্থিক প্রগতির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা এবং গ্রাম থেকে মানুষ যাতে শহরে গিয়ে ভিড় না করে তার জন্যে গ্রামাঞ্চলেই শিল্পের প্রসার ঘটানোর চেষ্টা। সরকারি আমলাদের চিন্তা এবং কাজের এই ফারাকের কারণ অনুসন্ধান বর্তমানে আমার আলোচ্য নয়। তবে একটি কথা পরিষ্কার যে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বহু আগেই অর্থনীতির ক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ আমলাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে এক ধরনের পক্ষপাত ছিল।

২.৩ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবধি ভারত সরকারের বাণিজ্য-নীতি ও শিল্প-নীতি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে সরকার মূলত মুক্ত বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করত। খনিজ তেল ও লবণের উপর অবশ্য স্বল্প হারে বহিঃশুল্ক ছিল, এছাড়া ১৮৯৪ সালে সুতি বস্ত্রের উপরেও কম হারে বহিঃশুল্ক ধার্য করা হয়। তবে সুতি বস্ত্র এবং লবণ, উভয় ক্ষেত্রেই আমদানি বজায় রাখার জন্যে অন্তঃশুল্কও ধার্য করা হয়েছিল। ১৮৯৯ সালে যে চিনি বিদেশী সরকারের ভরতুকি পেত তার আমদানির উপর শুল্ক বসানো হয় এবং ১৯০২-০৩ সালে ইয়োরোপ থেকে আসা বীট চিনির বিক্রি নিয়ন্ত্রণ করতে এই কর আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ১৯০৩ সালের চিনি বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের পরে অবশ্য এই করের হার কিছুটা কমানো হয়। সব মিলিয়ে একটি কথা বলা যায়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগের এমন কোনো আমদানি-শুল্ক বসানো হয়নি যা ভারতীয় শিল্পকে বিদেশী প্রতিযোগিতা থেকে আড়াল করে রাখে। এ ধরনের সংরক্ষণহীনতা তখন ব্যতিক্রমের পর্যায়ে পড়ত। কিন্তু সেই সময়ে সারা বিশ্বে, এমনকি ব্রিটিশ স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশগুলিতেও, এর বিপরীত প্রথাই চালু ছিল। যে সব দেশে আধুনিক শিল্প বেশ কিছুটা গড়ে উঠেছিল সেখানেই ছিল আমদানি রুখবার আমদানি শুল্কের প্রাচীর। ব্রিটেনের রপ্তানি শিল্প-দ্রব্য ছিল এই ধরনের শুল্কের এক প্রধান লক্ষ্য, বিশেষ করে ব্রিটেনে প্রস্তুত সুতির কাপড় যার সবচেয়ে বড় বাজার ছিল ভারতবর্ষ।[৪৪] ফলত সুতি বস্ত্রের উপরে আমদানি-শুল্ক ধার্যের প্রস্তাব ল্যাঙ্কাশায়ারের পক্ষে উদ্বেগের কারণ ছিল। ভারতে আমদানিকৃত শিল্প দ্রব্যের প্রধান উৎস ছিল ব্রিটেন। ১৯০১ থেকে ১৯১৪-র মধ্যে ভারতে বেসরকারি খাতে আমদানির শতকরা ৬১ থেকে ৬৬.৭ ভাগ পণ্যের যোগানদার ছিল ব্রিটেন।[৪৫] এর সঙ্গে পরিষেবা সংশ্লিষ্ট (invisible trade)

আমদানির পরিমাণ যোগ করলে ভারতের আমদানিতে ব্রিটেনের ভাগ আরও বৃদ্ধি পাবে। আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচল এবং উপকূলবাহী জাহাজ চলাচলেব প্রায় পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করত ব্রিটিশ কোম্পানি। এছাড়া প্রধান বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি ও বীমা ব্যবস্থাব একটি বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ কবত ব্রিটিশ সংস্থাগুলি। সর্বোপরি, সরকার যে সব পণ্য কিনত (government stores) তার সমস্তটাই ব্রিটেন থেকে আমদানি করা হতো। অপরপক্ষে, ভারতের রপ্তানি পণ্যের প্রধান ক্রেতা ছিল ব্রিটেন। কিন্তু ১৯০১ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে যেখানে ভারতের বেসরকারি পণ্য আমদানির শতকরা ৬০ ভাগ আসত ব্রিটেন থেকে (সরকারি খাতে আমদানি ও পরিষেবা সংশ্লিষ্ট আমদানি ধবলে এই ভাগ আবও বাড়বে)। সেখানে ভাবতের মোট রপ্তানির মাত্র শতকবা ২৩.৪ থেকে ৩০ ভাগ যেত ব্রিটেনে। সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধবলেও রপ্তানির এই পরিমাণ ১৯০১ সাল ছাড়া প্রায় কখনোই শতকবা ৫০ ভাগ ছাড়ায় নি। ১৯১৪ সালে আবার এই ভাগ কমে গিয়ে হয় ৩৭.৭ শতাংশ।[৪৬] এই ধরনের বাণিজ্য ব্রিটেনেব স্বার্থ রক্ষায় বিশেষ সহায়ক ছিল। বিশ্বের অন্যান্য দেশেব বাজারের পথ যেখানে ব্রিটেনেব কাছে ক্রমশ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল সেখানে ভারত ছিল ব্রিটিশ দ্রব্যের কাছে এক বিরাট শুল্ক-মুক্ত বাজার। আবার ভারতের প্রধান প্রধান পণ্য, অর্থাৎ হরেকবকম কাঁচা মাল ও পাটজাত পণ্য, প্রচুব পবিমাণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেব বহিঃস্থ দেশগুলিতে রপ্তানি হওয়ার ফলে অন্যান্য ইয়োবোপীয় দেশগুলি ও আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যে ভারতের উদ্বৃত্ত থাকত। উক্ত দেশগুলির সাথে বাণিজ্যে ব্রিটেনের বিরাট ঘাটতি থাকত আর সেই ঘাটতি পূরণ করত ভারতের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত।[৪৭]

ভারত সরকারের মুক্ত বাণিজ্য নীতির ফলে শুধু যে ব্রিটেন লাভবান হচ্ছিল তা নয়, গোটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরই স্বার্থ রক্ষা হচ্ছিল এতে। অতএব ব্রিটিশ ও ভারতীয় ব্যবসায়ীরা এবং ভারতে স্থিত ব্রিটিশ আমলারা ভারতের জন্যে সরকারি আয়ব্যয় বিষয়ে যে স্বশাসনের আবেদন জানাচ্ছিলেন তা হোয়াইট-হল বারবার নামঞ্জুর করছিল।[৪৮]

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতের অর্থনৈতিক গুরুত্ব কী ধরনের ছিল এবং ফিসক্যাল রিফর্মের প্রশ্নের ক্ষেত্রে তার প্রাসঙ্গিকতা, এই বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে শতাব্দীর শুরুতে যে বিতর্ক ওঠে তা উপস্থাপিত হয় *Journal of the Society of Arts*-এর[৪৯] ১৯০৩ সালের একটি সংখ্যায়। জে. এম. ম্যাকলিন ব্রিটেন ও ভারতের মুক্ত বাণিজ্যের নীতি বজায় রাখার পক্ষে সওয়াল করেন। রাজকীয় প্রতিরক্ষায় ভারতের বিশেষ গুরুত্ব এবং চীন ও পূর্ব আফ্রিকা সহ সমগ্র প্রাচ্যে ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষার জন্যে ভারতীয় সেনার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। বহুসংখ্যক ইংরেজ যে ভারতে এসে সম্মানজনক ও স্বাধীন কাজ পেয়েছেন তার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে, সারা বিশ্বে ভারতই ছিল একমাত্র সম্পূর্ণ মুক্ত বাজার এবং ল্যাঙ্কাশায়ারের সুতি বস্ত্রের সব চাইতে বড় ক্রেতা।[৫০] ব্রিটেন কিংবা ভারত আমদানি-শুল্ক ধার্য করলে অন্যান্য দেশগুলিও একই পথ নেবে ম্যাকলিন এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তাঁর প্রবন্ধের উপর বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন স্যার চার্লস এলিয়ট, স্যার এডওয়ার্ড স্যাসুন, স্যার হেনরি ফাউলার, স্যার রিচার্ড টেম্পল্ এবং স্যার ফ্রেডরিক ইয়ং। সকলেই একথা স্বীকার করেন যে রাজকোষ সংক্রান্ত সংস্কারের যাবতীয় বিতর্কে ভারতের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয় না, কারণ ভারত ব্রিটিশ পার্লামেন্ট দ্বারা গৃহীত যে কোনো নীতি মেনে নিতে বাধ্য। বস্তুত ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল তাতে ভারতের দিক থেকে পাল্টা প্রতিশোধের কোনো জায়গাই ছিল না, বরং ব্রিটেনই ভারতের মতামতের অপেক্ষা না করে যে কোনো নীতি গ্রহণে

সক্ষম ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চা ও কফির উপরে শুল্ক ধার্য করার সময় ব্রিটেন ভারতের অনুমতি নেয়নি। ব্রিটেন ও ভারত উভয়েই লাভবান হতে পারে এরকম কোনো শুল্ক নীতি নির্ধারণ করা কঠিন ছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এরকম বহু ক্ষেত্র ছিল (রাশিয়া থেকে পেট্রোলিয়াম আমদানির উদাহরণ বিতর্কে দেওয়া হয়েছিল) যেখানে আমদানি-শুল্ক ধার্য করে ভারত অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যে লাভবান হতে পারত। ১৯০৩ সালের এই আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুক্ত বাণিজ্যের পথ পরিহার করলে অন্যান্য দেশগুলির প্রতিক্রিয়ার ফলে ব্রিটেনের ও ভারতের দড় মুদ্রা (hard-currency) সম্বলিত দেশের বাণিজ্য হারানোর ভয় ছিল এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ব্রিটিশ সবকার দ্বারা অনুসৃত মুক্ত বাণিজ্যের নীতিব একটি প্রধান কারণ ছিল এই শঙ্কা।

অবশ্য আরও একটি মত চালু ছিল সে সময়ে : অন্যান্য দেশ যাই করুক না কেন ব্রিটেন ও তার তত্ত্বাবধানে ভারত মুক্ত বাণিজ্য ও তার পুরস্কার স্বরূপ স্থায়ী আর্থিক উন্নতির লক্ষ্যই মেনে চলবে। এই মতের বাহকরা দাবি করত যে, ভারতেব বহির্বাণিজ্যের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই প্রমাণ কবে যে কাঁচা মাল ও খাদ্য শস্যের রপ্তানি ও ব্রিটেন থেকে শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানির নীতি ভারতের পক্ষে ভালো। স্যার থিয়েডোর মরিসন দাবি করলেন, শিল্প বিপ্লবের আগে ইংল্যান্ডে বৈষয়িক বিবর্তনের যে লক্ষণগুলি দেখা গিয়েছিল ভারতে ঠিক সেই সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল। তার মত সমালোচনা করে কেইনস্ তখন লিখলেন যে শিল্পায়নের নীতি অনুসরণ করলে ভারতের উন্নতি না হয়ে অধোগতি হবে।[৫১]

এ থেকে অবশ্য একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে রেল ও সেচ ব্যবস্থায় বিনিয়োগ ছাড়া, অন্য সব ক্ষেত্রেই ভারত সরকার সম্পূর্ণ মুক্ত বাজারের (lassez-faire) নীতিতে বিশ্বাস করত।[৫২] ১৯০৫ সালে ভাইসরয়ের কাউনসিলের একজন সদস্যের অধীনে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর তৈরি হলো। বাণিজ্য বিষয়ক তথ্য (Commercial intelligence) বিভাগ স্থাপন করে একজন ডিরেক্টর বা নির্দেশক নিয়োগ করা হলো। তাঁর পরিচালনায় *ইন্ডিয়ান ট্রেড জার্নাল* প্রকাশ করা শুরু হলো। এই দপ্তরটি প্রত্যক্ষ ভাবে ভারতে শিল্প প্রসারে কতখানি কাজে এসেছিল তা তর্ক সাপেক্ষ। শিল্পে সরকারি সহযোগিতা দানের কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি গৃহীত হয়নি, এমনকি দপ্তরটির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের পদ অনেক কষ্টে পূরণ করতে হয়েছিল।[৫৩]

এই বিষয়ে অনেক বেশি উল্লেখযোগ্য হলো মাদ্রাজ ও যুক্ত প্রদেশের সরকারের পদক্ষেপ। মাদ্রাজে স্কুল অব্ আর্টসের সুপারিনটেনডেন্ট নিযুক্ত হন আলফ্রেড চ্যাটারটন। তিনি তখন অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র উৎপাদন করার বিষয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। এই পরীক্ষার সাফল্যে আশান্বিত হয়ে মাদ্রাজ সরকার চ্যাটারটনকে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে শিল্প এবং প্রাযুক্তিক শিক্ষার প্রসারের জন্যে নিয়োগ করার প্রস্তাব উপস্থাপন করে।

ব্রিটিশ সরকারের ভারত বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত সচিব ঐ প্রস্তাব মঞ্জুর করেন। ইতিমধ্যে চ্যাটারটন অ্যালুমিনিয়ামের পিণ্ড ও চাদর আমদানি করে তা দিয়ে বাসনপত্র বানাতে আরম্ভ করেন। অতঃপর ১৯০৬ সালের অগাস্ট মাসে বকলমে একটি শিল্প-দপ্তর খোলা হয় এবং চ্যাটারটনকে শিল্প ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত অনুসন্ধানের নির্দেশক পদে নিযুক্ত করে ঐ দপ্তরের ভার দেওয়া হয়। এরপরে চ্যাটারটন বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে কাজ শুরু করেন—(ক) অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের একটি পথপ্রদর্শক কারখানা শুরু হয়। সেটি তারপর চালু অবস্থায় আর্ডলি নর্টন নামে এক ইয়োরোপীয় ব্যারিস্টারের হাতে তুলে দেওয়া হয়, আর যৌতুক সহ

দেওয়া হয় ঐ কারখানার নীট আয়ের অর্ধাংশ—৬০,০০০ টাকা, (খ) ক্রোম পদ্ধতিতে কাঁচা চামড়া পাকা করার কৌশলও চ্যাটারটন প্রবর্তন করেন। চ্যাটারটন আরও যে কাজগুলি করেন তা হলো, (গ) হস্তচালিত তাঁতের কাপড় তৈরির উন্নত প্রযুক্তির প্রবর্তন, (ঘ) সেচ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তৈল চালিত ইঞ্জিনের প্রয়োগ, (ঙ) উপরোক্ত ইঞ্জিন কাজে লাগাবার জন্যে যে গভীর কূপ প্রয়োজন সেগুলি খননের জন্যে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার। তাঁতিদের উন্নত প্রক্রিয়া প্রশিক্ষণের জন্যে একটি কারখানা শুরু করা হয সালেমে। চ্যাটারটন পেনসিল তৈরি উদ্যোগেও প্রচেষ্ট হন, তবে এই প্রকল্পটি সাফল্য পায়নি। কারণ, যথেষ্ট বড় মাত্রায় উৎপাদন শুরু করা যায়নি। উৎপাদন শুরু করার আগে স্থানীয় বাজারে চাহিদার ও কাঁচা মালের যোগানের ব্যাপারে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি এবং উৎপাদনে পারদর্শী প্রযুক্তিবিদ পাওয়া যায়নি। শেষোক্ত এই অক্ষমতার অবশ্য কারণ ছিল : যে পদ এবং মাইনে প্রযুক্তিবিদকে দেওয়া হতো তাতে কোনো যোগ্য ব্যক্তি আসতে রাজি ছিলেন না। সেচব্যবস্থার ইন্সপেক্টর জেনারেলের আপত্তিতে মাদ্রাজে শিল্প প্রসারের জন্যে পেরিয়ার থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রস্তুতি তখন গৃহীত হয় নি । বিষয়টিরও অগ্রগতি হয নি। বড় বড় কারখানা গড়ে সরকার অহেতুক বেসরকারি ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করছে—এক বেসরকারি কমিটি এই আপত্তি তোলায় গাছ থেকে অ্যালকোহল (wood distillation) তৈরির কারখানা গড়ার প্রস্তাবটিও রূপ পায়নি।

এই একই আপত্তির ফলে মাদ্রাজ সরকারের নতুন নতুন ক্ষেত্রে কলকারখানা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা (এবং ভারতে এই ধরনের অন্য সব সরকারি প্রচেষ্টা) নাকচ হয়ে যায় তৎকালীন ভারত সচিব লর্ড মরলি-র ২৯শে জুলাই, ১৯১০ সালের লিখিত এক ফরমানে। এর আগে উটাকামন্ডে মাদ্রাজ সরকারের আহূত শিল্প বিষয়ক এক সম্মেলনে শিল্প প্রসারের সম্পর্কে কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৫৪] কিন্তু ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীদের সংস্থা, মাদ্রাজ চেম্বার অব্ কমার্স, সেই প্রস্তাবগুচ্ছের বিরুদ্ধে আপত্তি জানায়। লর্ড মরলি-র উদারনীতিমূলক মতাদর্শ ও ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীদের বিরোধিতা, উভয় শক্তিই লর্ড মরলি-কে সরকারি প্রচেষ্টা নাকচ করতে প্রণোদিত করেছিল।

মাদ্রাজ সরকারের প্রচেষ্টার কিছুকাল পরে যুক্তপ্রদেশ সরকারও এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৯০৭ সালে নৈনীতালে সরকার আহূত এক শিল্প বিষয়ক সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব গুচ্ছের উপর ভিত্তি করে সরকার কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়। এই প্রস্তাবগুলির মধ্যে একটি ছিল একজন শিল্পের ভারপ্রাপ্ত নির্দেশক নিয়োগ। প্রথম দিকে এই পদাধিকারীকে একটি প্রযুক্তি শিক্ষা কেন্দ্রের প্রধানের পদও অলংকৃত করতে হতো। পরবর্তী কালে অবশ্য এই পদটিকে আলাদা করে দেওয়া হয় এবং শেষোক্ত পদটিতে একজন বিজ্ঞানী নিযুক্ত হন। সরকার কয়েকটি সংস্থাকে ঋণ মঞ্জুর করে ও চিনিকলগুলিকে প্রাযুক্তিক সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে একজন শর্করা-প্রযুক্তিবিদ নিয়োগ করে। তবে এই সমস্ত প্রচেষ্টাই বিফলে যায় দুটি কারণে—প্রথমত, পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্যে যে আকারের কারখানা তৈরি করা হয়েছিল তা ছিল বেশি ছোট আয়তনের, দ্বিতীয়ত, যে সমস্ত সংস্থা সরকারের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিল তারা সরকারি প্রযুক্তিবিদের সাহায্য নিতে বাধ্য ছিল না, এমনকি তাঁর সঙ্গে তারা যথেষ্ট সহযোগিতাও করেনি। একটি ইয়োরোপীয় ব্যবসায় সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীনে কানপুরে কার্পাস তেল উৎপাদনের একটি কারখানা স্থাপন করে সরকার। কিন্তু এই কারখানাটি কোনো ফল প্রসবের সুযোগ পায়নি কারণ তার আগেই লর্ড মরলির পূর্বোক্ত ফতোয়ায় তা বন্ধ করে দিতে হয়।[৫৫]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে প্রতিরক্ষার জন্যে পণ্যের চাহিদা বেড়ে যায়। সেই বাড়তি চাহিদা মেটানোর জন্যে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে সরকারের বহু পুরনো উদ্যোগ পুনরুজ্জীবিত হয়। তবে সরকারের কাজকর্ম ক্ষুদ্র শিল্পের পরিসরেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগীকে নির্দেশ দেওয়াই সরকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল। বৃহৎ শিল্প সংস্থার সাহায্যের জন্যে বড় রকমের আর্থিক অনুদান বা সাহায্যদান এই সরকারি নীতির মধ্যে ছিল না। প্রাদেশিক সরকারের শিল্প দপ্তরগুলির অর্থ সম্বলও ছিল খুবই সামান্য। ১৯১৩-১৪ সালে এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রণী মাদ্রাজ সরকারের শিল্পদপ্তরের আয়ত্তাধীন অর্থের পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ টাকা।[৫৬] এর কয়েক বছর পরে বোম্বাই প্রদেশে তাঁতিদের কাপড় বোনা সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়ার জন্যে একটি সরকারি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব যখন ওঠে তখন তার বিরোধিতা করেন বোম্বাই সরকারের শিল্প ডিরেক্টর স্বয়ং। এই কেন্দ্র চালাতে ৬০০ টাকার যে বার্ষিক ব্যয় শুরুতে ধার্য হয়েছিল তা বেড়ে ১৫০০ টাকায় দাঁড়িয়েছিল—এটাই ছিল তাঁর আপত্তির কারণ।[৫৭] কিন্তু পি. জে. মীড নামধারী এই ডিরেকটর এই দপ্তরের ভার নেওয়ার সময় বোম্বাইয়ের একজন প্রধান কালেক্টরেব পদাধিকারী ছিলেন এবং পদানুযায়ী তাঁর নিজের বেতনই ছিল বার্ষিক ২৭,৯০০ টাকা (অর্থাৎ মাসিক ২২৫০ টাকারও বেশি)[৫৮] ব্যয়সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে মীড প্রস্তাব দেন যে তাঁত বোনা শেখানোর জন্যে শুধু পার্ট-টাইম প্রশিক্ষক নিয়োগ করা হোক। পরবর্তী আধিকারিক ১৯১৮-১৯ সালের রিপোর্টে এই ধরনের পার্ট-টাইম শিক্ষক নিয়োগের বিরোধিতা করেন। তিনি লেখেন যে নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে গিয়ে কোনো বাধার সম্মুখীন হলেই তাঁতিরা ঐ প্রযুক্তি পরিত্যাগ করতেন। সুতরাং পার্ট-টাইম প্রশিক্ষক নিয়োগের ফলাফল কোন অঞ্চলেই সন্তোষজনক হয়নি। পুরো সময়ের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বরং অনেক ভালোভাবে শিক্ষা দিতে সক্ষম হবে এই ছিল তাঁর মত। শিল্পের ক্ষেত্রে সরকার যে শুধুমাত্র স্বল্পমাত্রায় কাজ করছিল তার পেছনে একটা যুক্তি ছিল — সরকারের কাজ হলো একমাত্র ছোট ছোট শিল্পের ক্ষেত্রেই বেসরকারি পুঁজি টেনে আনা এবং শিল্পোদ্যোগীদের প্রথম পদক্ষেপে সাহায্য করা। বিভিন্ন শিল্পকে আর্থিক সহায়তা প্রদান অথবা তাদের জন্যে বাজার সুনিশ্চিত করার কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি সরকারের ছিল না।

শিল্পের প্রসার এবং উন্নতির ক্ষেত্রে সরকারি সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কথা সব চাইতে জোরালো ভাবে পেশ করেছিলেন বকলমে মাদ্রাজ সরকারের শিল্প দপ্তরের প্রথম নির্দেশক আলফ্রেড চ্যাটারটন। শিল্পোন্নতির উৎস বিষয়ে তাঁর মত ছিল স্যামুয়েল স্মাইলিসের মতো, কিন্তু তিনি অভিভাবকসুলভ প্রতিপালনেও বিশ্বাস করতেন।[৫৯] ১৯১৬ অবধি শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ যে অতি দুর্বল ছিল এই মত শুধু ভারতীয়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতীয় শিল্প কমিশনের কাছে সাক্ষ্য প্রদানে ব্যাঙ্ক অব্ মাদ্রাজের তৎকালীন সেক্রেটারি ও ট্রেজারার, স্যার ডব্লু. বি. হাণ্টার বলেন, 'আমার মতে এই (মাদ্রাজ) প্রেসিডেন্সিতে সরকারের উচিত নতুন নতুন শিল্প স্থাপন করা এবং বেসরকারি ক্ষেত্রকে হাতে কলমে প্রদর্শনের জন্যে কারখানা তৈরি করা ... আমার মনে হয় আমাদের সমস্ত শক্তি এখন বৃহৎ কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত করার সময় এসে গেছে। ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের দায়িত্ব বেসরকারি মালিকানার উপর ছেড়ে দেওয়া যায়। প্রতিষ্ঠিত বহির্বাণিজ্যের সঙ্গে ভারতীয় শিল্প প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে পারে এই যুক্তিতে সরকারি সাহায্য কোনো মতেই সীমিত করা উচিত নয়।'[৬০]

২.৪ ভারতের প্রাদেশিক সরকারের শিল্প-নীতি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ভারতের বহু প্রদেশেই শিল্প-দপ্তর গঠিত হয়। এই দপ্তরগুলির পর্যাপ্ত সংখ্যায় কর্মচারীর অভাব ঘটায় এবং (খুব সম্ভবত) সরকারের যথেষ্ট মনোযোগ না থাকায় দপ্তরগুলি জন্মলগ্ন থেকেই রুগ্ন ছিল। বোম্বাইয়ের শিল্প-দপ্তরের ইতিহাস এর এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ১৯১৭ সালের ৩১শে অক্টোবর প্রবীন সরকারি আমলা পি. জে মীডকে প্রধান করে গঠিত এই দপ্তরে কর্মচারী ছিলেন একজন করণিক ও একজন তকমা-পরা চাপরাশি। উত্তরপ্রদেশ ও মাদ্রাজ সরকারের শিল্প-দপ্তরের কাজকর্ম পরিদর্শন করতে ও নিজেদের জন্যে একটি অফিস তৈরি করতেই তাদের প্রথম সাত মাস কেটে যায়। এর পরে তন্তুবয়নের বিষয়টি এই দপ্তর সমবায় সংস্থার রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে অধিগ্রহণ করে।[৬১] ১৯১৯ সালের ১৮ই এপ্রিল এই দপ্তরের একজন ডিরেক্টর নিযুক্ত হন এবং মে মাসে তিনি বোম্বাই সার্কেলের কনট্রোলার অব্ মিউনিশন্সের কার্যভারও গ্রহণ করেন। ফলে পুরো সময়ের জন্যে কোনো প্রধানকে শিল্প-দপ্তরে পাওয়া যায়নি। কাজকর্মের জন্যে দপ্তরটিকে নির্ভর করতে হতো বাইরের বিশেষজ্ঞদের মতামতের উপর। তাদের মধ্যে ছিলেন সরকারের অন্য দপ্তরের আমলারা (এঁরা আংশিক সময়ের জন্যে শিল্প-দপ্তরের কাজ করতেন), প্রযুক্তি শিক্ষাকেন্দ্র ও কলেজগুলির অধ্যাপকরা। ভিক্টোরিয়া জুবিলী ইন্স্টিটিউটের বস্ত্র বিভাগের প্রধান শিল্প-দপ্তরে তন্তুবয়নের পার্ট-টাইম বিশেষজ্ঞের কাজ করতেন। ১৯১৯ সালের শুরুতে তিনি অবসর গ্রহণ করায় শিল্প দপ্তর এঁর মতামত পাওয়ার সুযোগ হারায়। ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই দপ্তরের আধিকারিক ছুটিতে যান। তাঁর জায়গায় একজন কাজ চালানোর মতো অফিসার আসেন। কিন্তু তিনি ব্যস্ত থাকেন বোম্বাই অঞ্চলে অস্ত্রশস্ত্র বানানোর কাজকর্ম গুটিয়ে ফেলার দায়িত্ব পালনে। একজন নতুন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার দপ্তরে যোগ দেন, কিন্তু তাঁকে এর পরেই বোম্বাইয়ের উত্তর বিভাগে আমেদাবাদে সহকারী শিল্প ডিরেক্টর হিসাবে নিয়োগ করা হয়।[৬২] ১৯২০-র শেষ দিকে স্থায়ী আধিকারিক, আর. ডি. বেল আবার কাজে যোগ দেন এবং অস্থায়ী আধিকারিক ডিরেকটরের জি. এইচ. থিসেলটন্-ডায়ার, তাঁর নিজস্ব ডেপুটি ডিরেক্টরের পদে যোগ দেওয়ার বদলে ছুটিতে চলে যান। ১৯২১ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত উত্তর বিভাগের শিল্প সহ-আধিকারিকের সমস্ত সময় যায় ভাঙাচোরা সরকারি চোলাই (distillary) কারখানাটিকে মেরামত করতে।[৬৩] এই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে ছুটি থেকে ফিরে এসে জি. এইচ. থিসেলটন-ডায়ার ডেপুটি ডিরেক্টর হিসাবে তাঁর কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৯২১-২২ সালে শিল্প-দপ্তরের আমলাদের এমন সমস্ত কাজ করতে হতো শিল্পের সঙ্গে যেগুলির কোনো যোগ ছিল না।[৬৪] মৎস্য ও কৃষি মন্ত্রকের একজন সামুদ্রিক জীব বিজ্ঞানীর (marine biologist) সাহায্য শিল্প-দপ্তরের কাছে লভ্য হলেও, দপ্তরের নিজস্ব দুটি পদ—মৎস্য বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট ও সহকারী সামুদ্রিক জীববিজ্ঞানী, ১৯২১-২২ সালেই তুলে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পদটি অবশ্য কখনও পূরণই করা হয়নি। ১৯২৩ সালের মে মাসে নতুন ডিরেক্টর নিযুক্ত হন, কিন্তু এ ছাড়া ১৯২২-২৩ সালে কোনো নতুন নিয়োগ হয়নি। সরকারি ব্যয় সঙ্কোচের পদক্ষেপ হিসাবে শিল্প-দপ্তরের আমেদাবাদ অফিসটিও বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শিল্প-দপ্তরের আমলারা শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কহীন কাজে ব্যাপৃত থাকেন।

এই সময় শিল্প সরকারি দপ্তরের কার্যকলাপ খুবই সীমিত ছিল। তাছাড়া ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে প্রাদেশিক আইনসভা ব্যয় সংকোচন পদক্ষেপ হিসাবে শিল্প আধিকারিক পদটি লোপ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলত ১৯২৪ সালে দপ্তরটিই লোপ পায়। যে সমস্ত দায়দায়িত্ব শিল্প-দপ্তর বহন করত সেগুলি অন্যান্য দপ্তরের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হলো। দাপুরি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাটি আগে পূর্ত বিভাগের হাতে ছিল এবং তাকে যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করা হতো। ১৯২১-২২ সালে এই কারখানাটি শিল্প-দপ্তরের অধীনে আসে। তারপর ১৯২৪-এ আবার হাত বদল হয়ে ডেপুটি ডিরেক্টবের পদটি সহ কারখানাটি চলে আসে পূর্ত বিভাগের আওতায়।[৬৫] এই কারখানার কাজকর্ম এমনিতেই বিধি নিষেধের নিগড়ে ব্যাহত হতো, তাই এটি পূর্ত বিভাগের হাতে চলে যাওয়ায় সরকারি শিল্পোদ্যোগ খুব একটা নতুন করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। বরং সরকারের নির্মাণ কার্যের সাথে সংযোগ পুনঃস্থাপিত হওয়ায় কাবখানাটির একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছিল। অন্যান্য অনেক বেসবকারি সংস্থার মতো দাপুরি সংস্থাটিকেও ১৯২০-২১ ও ১৯২১-২২ সালে প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করতে হয়।[৬৬] শিল্প-দপ্তর বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে খারাঘোড়ায় ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ও আনন্দ-এ কেসিন উৎপাদনের সরকাবি কারখানা দুটিকেও অলাভজনক বিবেচনা করে বন্ধ করে দেওয়া হয়।[৬৭]

১৯২৫ সালের জুলাই মাসে শিল্প-দপ্তর পুনঃস্থাপিত হয় এবং মোটামুটি অন্যান্য প্রদেশের শিল্প-দপ্তরের পথ ধরেই এর কাজকর্ম শুরু হয়। দপ্তরটির প্রধান কাজগুলি ছিল :

১। বেসরকারি সংস্থাগুলিকে শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করা।

২। ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে পেশাদারী ও প্রাযুক্তিক পরামর্শ দেওয়া।

৩। কুটির শিল্প, বিশেষত তাঁত শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নত উৎপাদন পন্থার হাতে কলমে প্রয়োগ প্রদর্শন।[৬৮]

কয়েক বছব পরে (১৯৩১ সালের ১লা এপ্রিল) প্রযুক্তি শিক্ষার বিষয়টি লোক শিক্ষাধিকারিকের হাত থেকে শিল্প-দপ্তরের অধীনে চলে যায়। কিন্তু কুড়ির ও তিরিশের দশক জুড়ে শিল্প-দপ্তরের কাজের ধারার কোনো বড় রকমের পরিবর্তন ঘটেনি।

বোম্বাইয়ের শিল্প-দপ্তরের বর্ণনা থেকেই অন্যান্য অঞ্চলের শিল্প-দপ্তরের সমস্যাবলী সম্পর্কে ধারণা করা যায়। মাদ্রাজ ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলির শিল্প-দপ্তর ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে সাহায্য দানের ব্যাপারে বেশ কিছুটা এগিয়ে থাকলেও বৃহৎ শিল্পের উন্নতিসাধনে তাদের ভূমিকা ছিল খুবই নগণ্য। বৃহৎ শিল্পের উন্নয়নে যথেষ্ট গতি আনার মতো আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ করার মতো যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ কোনোটাই তাদের ছিল না।

প্রযুক্তিশিক্ষা এবং তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নতুন শিল্প স্থাপনে এবং শিল্প প্রসারে প্রাদেশিক শিল্প-দপ্তরগুলির প্রচেষ্টা প্রায়শই বিফলে গিয়েছিল। মাদ্রাজের শিল্প দপ্তরের অভিজ্ঞতা থেকেই অসাফল্যের কারণগুলি বোঝা যায় : (১) সংস্থাগুলি প্রায়শ কাজ করত অতি অল্প পরিসরে। উদাহরণস্বরূপ মাদ্রাজে স্থাপিত আঠা কারখানাটি ধরা যেতে পারে। ১৯২৩-২৪ সালে মাদ্রাজে আমদানি করা আঠার দাম ছিল প্রতি হন্দর ৩৮ টাকা। সেখানে অবচয় ও স্থির ব্যয় (পরিবর্তনশীল ব্যয়ের কথা রিপোর্টে বলা ছিল না তবে তা ৩৮ টাকার কম হওয়া সম্ভব ছিল না) ধরে আঠা উৎপাদনের খরচ ছিল ৫১ টাকা ১২ আনা, অর্থাৎ হন্দর প্রতি ১৩ টাকা ১২ আনা লোকসান দিয়ে আঠা বেচতে হতো সরকারি সংস্থাটিকে। সব দিকে খতিয়ে দেখে

রিট্রেনচ্‌মেণ্ট কমিটি (Retrenchment Committee) কয়েকটি প্রস্তাব নেয়—'আঠা কারখানাটিকে বন্ধ করে দেওয়া উচিত। কারখানাটিকে লাভজনক করে তোলবার জন্যে সব পরীক্ষা নিরীক্ষার ছেদ টানা প্রয়োজন। কারণ, সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে কমিটি নিশ্চিত হয়েছে যে বর্তমানের ক্ষুদ্র উৎপাদন মাত্রা বজায় রেখে বাজারের প্রতিযোগীদের তুল্য ব্যয়ে উৎপাদন এবং তজ্জন্য বাজারের সংস্থান পরীক্ষা-নিরীক্ষা দিয়ে সম্ভব হবে না।[৬৯]

(২) নতুন যে সমস্ত শিল্প সরকারি সংস্থাগুলি স্থাপন করত তাদের বাজার প্রায়শ খুব সীমিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কুন্নুরের ফল সংরক্ষণ কারখানাটি ১৯২৩-২৪ সালে চাহিদার অভাবে ধুঁকতে থাকে। এই সময়ে কিন্তু জ্যাম তৈরি বা সংরক্ষণের উপযোগী ফলের যোগানের কোনো অভাব ছিল না। ফলে পরিচালনার ব্যয় বাবদ ৫০০ টাকা ধরে কারখানাটির ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৩,১৫৮ টাকা ৮ আনা ৫ পয়সা।[৭০]

প্রযুক্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে একই ধরনের সমস্যা ছিল। ১৯২২-২৩ সালে মাদ্রাজের লেদার ট্রেডস্‌ ইনস্টিটিউট থেকে যে ১৩ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা শেষ করেন তাঁদের মধ্যে ৩ জন চাকরি পান নি। একজন উচ্চশিক্ষা লাভ করতে ইংল্যান্ড চলে যান এবং অন্য একজন তাঁর সংস্থায় ব্যয় সঙ্কোচের নীতি গ্রহণের ফলে চাকরি খোয়ান। স্বভাবত, ১৯২৩-২৪ সালে ইনস্টিটিউটের ছাত্র সংখ্যা কমে যায়।[৭১]

কুড়ির দশকের প্রথম কয়েক বছর ছাড়া কোনো প্রাদেশিক সরকারই কোথাও নতুন দ্রব্য উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করেনি। ক্ষুদ্র শিল্পকে এবং কোথাও কোথাও (বিশেষত যেখানে শিল্পে সরকারি সাহায্যের আইন পাশ হয়েছিল) বৃহৎ শিল্পকেও আর্থিক সাহায্য দেওয়া হতো। কিন্তু বড় বড় শিল্পগুলির স্থান নির্বাচন খারাপ হওয়ায় এবং পরিচালনগত ত্রুটির কারণ সরকারি সাহায্য প্রায়শই ফলপ্রসূ হয়নি। সরকার যদি আরও দীর্ঘমেয়াদী সহায়তা দিয়ে শিল্প সংস্থাগুলিকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করত, সেক্ষেত্রে বহু সংস্থাই হয়ত টিকে যেতে পারত।[৭২]

একটি মূল সমস্যা ছিল এই যে, নতুন শিল্পগুলির স্থান নির্বাচন বিষয়ে সারা ভারতব্যাপী কোনো নীতি চালু ছিল না। অল্প সুদে সরকার থেকে ঋণদান, এবং জমি, বিদ্যুৎ ও জল ব্যবহারের জন্যে অল্প মূল্য ধার্য করা, ইত্যাদি থেকে সংস্থাগুলি যে সুবিধা পেত, তা দিয়ে স্থানজনিত অসুবিধা, যেমন বেশি দামে কাঁচামাল কেনা সীমিত স্থানীয় চাহিদা, ইত্যাদির ফলে যে ক্ষতি হতো, তা পূরণ হতো না। কোনো জায়গা যদি বিশেষ কোনো শিল্পের পক্ষে অনুকূল হতো এবং তৎকালীন অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পটির লাভ করার সম্ভাবনা বর্তমান থাকত তবে, সরকারি আর্থিক সহায়তা থাক্‌ না থাক্‌, মূলধন সমৃদ্ধ শিল্পোদ্যোক্তারা নিজেরাই সাগ্রহে এগিয়ে আসতেন। সাধারণভাবে বলা যায় যে সুনিশ্চিত বাজার, নিকটবর্তী বন্দর এবং যন্ত্রপাতি ও বিদ্যুৎ যোগানের সুবিধা—এইসব আকর্ষণেই বেসরকারি মালিকানাধীন শিল্প গড়ে উঠছিল এমন সব জায়গায় যেখানে ইতিপূর্বেই শিল্পের প্রসার ঘটেছে। এই সহজ সত্যটা সরকার উপলব্ধি করতে শুরু করে ১৯৩৮ সালে এবং সেই সময়েই জাতীয় কংগ্রেস বেসরকারিভাবে জাতীয় যোজনা কমিটি গঠন করে।[৭৩]

জাতীয় কংগ্রেসের এই প্রচেষ্টার আগে যে বিভিন্ন প্রাদেশিক শিল্প-নীতির মধ্যে সংযোগ সূত্র স্থাপন করার চেষ্টা হয়নি এমন নয়। মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার অনুযায়ী শিল্পনীতি প্রাদেশিক বিষয় হিসাবে গণ্য হলেও স্যার টমাস হল্যান্ডের পরিচালনায় ভারত সরকার ১৯২০,

১৯২১ ও ১৯২২ সালে শিল্প-বিষয়ক যে সম্মেলনের আহ্বান করে সেখানে প্রাদেশিক শিল্প-দপ্তরগুলির আধিকারিকরাও নিমন্ত্রিত ছিলেন।

ভারতীয় শিল্প-কমিশনের সুপারিশগুলিকে কার্যকরী করার জন্যে, বিভিন্ন প্রদেশের শিল্পনীতির মধ্যে ও ভারত সরকারের ও প্রাদেশিক সরকারগুলির শিল্পনীতির মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলার জন্যে এই সম্মেলনে বিশেষ ভাবনা চিন্তা করা হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এ বিষয়ে কোনো অগ্রগতি হয়নি। যেসব প্রস্তাব এই সম্মেলনে পাশ হয় সেগুলিকে কার্যকরী করার কোনো পদক্ষেপও নেওয়া হয়নি। পরবর্তী এগারো বছরে এই ধরনের সম্মেলনও আর অনুষ্ঠিত হয়নি। লীগ অব্ নেশন্‌স-এর বৈষয়িক ও আর্থিক বিভাগের তৎকালীন ডিরেক্টর স্যার আর্থার সল্টার ভারত সরকারের জন্যে তৈরি একটি রিপোর্টে লেখেন — 'যে সমস্ত দেশে শাসনযন্ত্র কেন্দ্রীভূত, তাদের তুলনায় ভারতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি নীতিগুলির মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা সর্বাধিক প্রয়োজন। অন্যদিকে এই সমন্বয় সাধন আবার ভারতের ক্ষেত্রেই সবচেয়ে দুরূহ। শুধুমাত্র একটি প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরগুলির মধ্যেই নয়, সমন্বয় প্রয়োজন —

(ক) কেন্দ্রীয় সরকাবের বিভিন্ন দপ্তরগুলির মধ্যে
(খ) প্রতিটি প্রাদেশিক প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরগুলির মধ্যে
(গ) কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে
(ঘ) প্রাদেশিক সরকারগুলির নিজেদের মধ্যে এবং
(ঙ) ব্রিটিশ ভারত ও ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে।

সুতরাং, সমন্বয় সমস্যা একটি নয়, সেটি পঞ্চমুখী।'[৭৪]

১৯৩৩ সাল থেকেই আবার নিয়মিত ভাবে শিল্প সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়া শুরু হয়, তবে তাঁত-শিল্প ও রেশম-শিল্পের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারি অনুদান কীভাবে রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টিত হবে তার নির্ধারণ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্য ও অভিজ্ঞতার আদান প্রদান এই দুটি কাজ ছাড়া এই সম্মেলনগুলি থেকে বিশেষ কিছু লাভ হয়নি। কোনো দীর্ঘমেয়াদী যোজনা এবং নীতি না থাকায় প্রাদেশিক সরকারগুলির কাজকর্ম ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্য কোনো কোনো সরকার জলবিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হয়েছিল এবং তাতে কৃষি এবং ক্ষুদ্র শিল্প উপকৃত হয়েছিল।[৭৫]

২.৫ ১৯১৪ অবধি ভারত সরকারের আর্থিক নীতি

১৯৩৫ সালে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে এদেশে প্রকৃতপক্ষে কোনো কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ছিল না। তিনটি প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কের সংযুক্তিকরণ হয়ে ১৯২১ সালে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক গঠিত হয়। কিন্তু প্রকৃত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের তুলনায় তার ক্ষমতা এবং কার্যকলাপ ছিল সীমিত। প্রধানত একটি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক হিসাবেই এটি কাজ করত। অন্যান্য ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক হিসাবেও এর ভূমিকা ছিল গৌণ। নতুন সরকারি নোট প্রচলন করার কোনো ক্ষমতা এই ব্যাঙ্কের ছিল না। ১৯৩৫ পর্যন্ত নোট ছাপা ছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সমস্ত রকম ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ছিল। তবে টাকার বাজারে সুদের হার নিয়ন্ত্রণ করতে যে ধরনের পদক্ষেপ বর্তমানের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি গ্রহণ করে সেরকম কোনো পদক্ষেপই তৎকালীন ভারত সরকার সচেতন ভাবে গ্রহণ করেনি।

সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কগুলি কিছু কিছু সুবিধা ভোগ করত। সেগুলিব মধ্যে প্রধান ছিল সরকারের উদ্বৃত্ত টাকা বিনা সুদে ব্যবহার করার অধিকার। দেশের অভ্যন্তরের টাকার বাজারের উপরে সরকারের যেটুকু নিয়ন্ত্রণ ছিল তা এই প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমেই প্রয়োগ করা হতো। নতুন নোট ও রৌপ্য মুদ্রা প্রচলনের অধিকার সরকারের কুক্ষিগত হওয়ার ফলে টাকার যোগানের উপরে সরকারেরই সবচেয়ে বেশি প্রভাব ছিল। ১৮৯৮-৯৯ থেকে ১৯১৯-২০ সালের মধ্যে সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় টাকার বহির্মূল্য ১ শিলিং ৪ পেনিতে স্থিব রাখা। এই বহির্মূল্য দুভাবে বজায় রাখা হতো— স্বাভাবিক বছরগুলিতে যখন ভারতের বহির্বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত থাকত এবং টাকার মান দড় (strong) থাকত তখন লন্ডনে ভারত সচিবের অফিস কাউনসিল বিল বিক্রি করত এবং যখন টাকার মান দুর্বল হয়ে পড়ত তখন কাউনসিল বিল ভারত সরকার বিপরীতমুখী বিক্রি করত (অর্থাৎ টাকা নিয়ে পাউন্ড বা সোনা বিক্রি করত)। টাকার স্বর্ণ বিনিময় মান বজায় রাখার নীতি সরকার এই ভাবে সাফল্যের সঙ্গে অনুসরণ করত।

কেইন্‌সের মতে, স্বর্ণ বিনিময় মান ব্যবস্থার মূল কথা ছিল—আভ্যন্তরীণ বিনিময়ের ক্ষেত্রে সোনার মুদ্রার বদলে অন্য বিনিময় মাধ্যমের ব্যবহার ; দেশের বাজারে মুদ্রার বদলে সোনা সাধারণত সরকারিভাবে বিক্রি না করা ; উঁচু দামে স্থানীয় মুদ্রার বিনিময়ে বিদেশী মুদ্রা বিক্রি করার প্রবণতা, এবং দরকার পড়লে তার জন্যে বিদেশী ঋণকে ব্যবহারে ইচ্ছুক থাকা।[৭৬] ১৯১৩ সালেই কেইন্‌স্ বলেন, অন্যান্য বহু দেশের মতো ভারতও স্বর্ণ বিনিময় মান গ্রহণ করেছে। পরবর্তী কালে এই মতটি প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য হয়।[৭৭] ১৯১৪ সালের আগে লন্ডনই ছিল বিশ্বের সব চাইতে বড় টাকার বাজার। তবে ভারতের ক্ষেত্রে স্বর্ণ বিনিময় মান যে নির্বাধে কাজ করছিল তার কারণ শুধু লন্ডনের সাথে সংযোগ নয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ভারত নিয়মিত ভাবে আমদানির চাইতে রপ্তানি বেশি করত এবং খানিকটা আর্থিক প্রগতির ফলে চাহিদা বৃদ্ধি পেলেও আমদানি বিস্ফোরক গতিতে বাড়েনি।

ভারতের অভ্যন্তরে টাকার যোগান মূলত নির্ধারিত হতো কাগজের নোটের যোগান দ্বারা। সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর থেকে টাকা এবং ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রার বদলে এই নোট অবারিত ভাবে যোগান দেওয়া হতো এবং সরকারি ট্রেজারিতে এই নোটগুলি টাকায় ভাঙিয়ে দেওয়া হতো। সুতরাং, বাজারে কাগজের নোট কত পরিমাণে চালু থাকত তা নির্ভর করত বাণিজ্যের জন্যে এই নোটের চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধির উপর। সরকারি ট্রেজারিতে নোট ভাঙানোর এই রীতি বছরের শেষে সরকারের পক্ষে কিছু জটিলতার সৃষ্টি করত। এক অঞ্চলে যে নোট ছাড়া হতো তার প্রচলন যে শুধু ঐ অঞ্চলেই সীমিত থাকবে এই নিয়ম ধার্য করার যুক্তিও ঐ নোট ভাঙানোর ব্যবস্থা থেকেই পাওয়া যায়। ১৯১০ অবধি ভারতবর্ষকে নোট চালানো ও ভাঙানোর ব্যবস্থার দিক থেকে চারটি বৃহৎ মুদ্রাঞ্চল ও চারটি উপমুদ্রাঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছিল। (কোনো currency circle-এর বা মুদ্রাঞ্চলের নোট সাধারণভাবে শুধু সেই অঞ্চলের মধ্যেই সরকারিভাবে চালু ছিল এবং শুধু সেই অঞ্চলের সদর বা বড় ট্রেজারিগুলিতেই সেই নোট ভাঙানো যেত।) ১৯১০ থেকে মুদ্রাঞ্চলের সংখ্যা সাত করে দেওয়া হয়। গোটা দেশকে বিভিন্ন কার্যকরী মুদ্রাঞ্চলের মধ্যে ভাগ করার প্রশাসনিক যৌক্তিকতা থাকতে পারে।[৭৮] কিন্তু এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক সংহতি ব্যাহত হয়েছিল। দেশের অভ্যন্তরে লেনদেনের জন্যে কাগজের নোটের বহুল ব্যবহার থেকে ভারত সরকারের অহেতুক ভীরুতার প্রমাণ মেলে।

সরকারি নীতির এই দোটানা ভাবের জন্যে হয়ত দায়ী ছিল আরও একটি ঘটনা পরম্পরা। ভারতে সোনা ও রুপোর আমদানি (১৮৯৮-৯৯ থেকে ১৯১৩-১৪ অবধি মূলত সোনার বার ও স্বর্ণ মুদ্রা) ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সোনা আমদানিতে যে ওঠানামা হতো তার জন্যে সর্বভারতীয় প্রভাবগুলি ছাড়াও কিছু আঞ্চলিক কারণ দায়ী ছিল।[৭৯] সোনা ও রুপোর আমদানির এই উত্তেরোত্তর বৃদ্ধি দেখে ভারতের মানুষ কাগজের নোট ব্যবহারে সত্যিই আগ্রহী হবে কিনা সে বিষয়ে সরকারি নীতি নির্ধারকরা ধন্ধে পড়ে গিয়েছিল। স্বর্ণখণ্ড হিসাবে আমদানি সোনা মূলত গহনা আকারে মজুত করা হতো। কিন্তু আমদানিকৃত সভরেন (soverign) (অতীতের ব্রিটিশ স্বর্ণ মুদ্রা) পাঞ্জাব এবং উত্তর ভারতে মুদ্রা হিসাবে চালু ছিল। চালু মুদ্রার মধ্যে সভরেনের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে অগ্রণী ছিল পাঞ্জাব ও তার পরেই ছিল বোম্বাই এবং বাংলা।[৮০] ১৯১০-১১ অবধি ভারতে সভরেনের ব্যবহার বাড়ছে কিনা এ নিয়ে কিছু মতপার্থক্য ছিল। তবে পাঞ্জাবের অ্যাকাউন্টেন্ট জেনাবেল বিশদ অনুসন্ধান করে দেখান যে সভরেনের জনপ্রিয়তা ক্রমশ বাড়ছিল।[৮১] সুতরাং কিছু অর্থনীতিবিদ ও সবকারি প্রবক্তাদের মত খণ্ডন করে বলা যায়, এই সম্পদের আমদানি কিছুটা পরিমাণে দেশের বিনিময় মাধ্যমের যোগানকে পুষ্ট করেছিল। তৎকালীন ভারতীয় অর্থব্যবস্থায় ব্যাঙ্ক, ইত্যাদিব ভূমিকা এত প্রবল হয়ে ওঠেনি। যদি বিনিময় মাধ্যমের যোগান ও মূল্যমানের বৃদ্ধির মধ্যে কোনো রকম প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে এই অনুমান সত্য ১৯১৪ সালের আগে ভারতে মূল্যমানের বৃদ্ধিতে এই মুদ্রাস্ফীতির অবদান ছিল বলা যায়।[৮২]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত (এবং সম্ভবত বিশ্বব্যাপী মন্দার কাল অবধি যখন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল) ভারতের মুদ্রা ব্যবস্থার একটা পীড়াদায়ক বৈশিষ্ট ছিল তার পরাধীনতা। বিশেষত খাদ্য শস্য, তুলো, কাঁচাপাট এবং পাটজাত দ্রব্যের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রয়োজনের সঙ্গে এই মুদ্রাব্যবস্থা বাঁধা ছিল। বাণিজ্যের ব্যাপ্তির তুলনায় শিল্পের প্রসার এত কম ছিল যে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির সুদের হার বাণিজ্যের তারতম্যের সাথেই ওঠানামা করত, শিল্প পরিস্থিতির সঙ্গে তাল রেখে নয়। বছরের খানিকটা অংশে টাকার চাহিদা থাকত তেজি এবং অপরাংশে টাকার চাহিদায় থাকত মন্দা—সাধারণত নভেম্বর মাসে শুরু হয়ে তেজির সময় শেষ হতো এপ্রিল অথবা মে মাসে, উনিশ শতকের শেষ দশকে ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল ও ব্যাঙ্ক অব বম্বের সুদের হার সবচেয়ে বেশি ওঠানামা করেছিল (কোনো কোনো মাসে সুদের হার বছরে শতকরা ১২ অবধি পৌঁছে গিয়েছিল)। ১৯০০-১৪-এর মধ্যে এই ধরনের দ্রুত পরিবর্তনশীলতা এড়ানোর চেষ্টা হলেও সে সময়েও প্রায়শ এক মাসের মধ্যেই সুদের হার শতকরা ৪ থেকে ৭ অথবা শতকরা ৬ থেকে ৯ পর্যন্ত ওঠানামা করত।[৮৩]

ভারতে সেইসময়ে কোনো শিল্পমুখীন ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা চালু ছিল না। তখন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি একমাত্র স্বল্পমেয়াদি ঋণই দিতে পারত। ফলে স্বল্পমেয়াদী ঋণের জন্যে প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক ধার্য সুদের চরম পরিবর্তনশীলতার প্রভাব শিল্পে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের উপর কতখানি পড়েছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। তবে এর ফলে পাট ও সুতিবস্ত্র শিল্পের মতো প্রধান প্রধান শিল্পে কার্যনির্বাহী মূলধনের (working capital) অভাব বেড়ে গিয়েছিল। অতি সতর্কতার পথ ধরে চলে প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কগুলি তাদের ঋণ মূলত বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখত এবং সেই ঋণও তারা দিত নামী প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যবসায় সংস্থাকে (বাংলা এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে সুনাম সম্পন্ন সংস্থা বলতে কেবল ইয়োরোপীয় বাণিজ্য সংস্থাগুলিকেই বোঝাত)। এই নীতির

প্রভাব দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের উপরে কিছুটা পড়ে থাকতে পারে। কারণ, নামী সংস্থার বাজার থেকে যারা বিনিয়োগে উদ্যত হতে পারত, তারা যদি-বা ন্যূনতম দীর্ঘমেয়াদী পুঁজি সংগ্রহে সক্ষম হতো, কার্যনির্বাহী পুঁজি (working capital) সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত ব্যয়বহুল হতো।[৮৪]

এই সময়ে কিছু ভারতীয় ব্যাঙ্ক অবশ্য স্বল্পমেয়াদী ঋণের পরিশোধের সময়সীমা ক্রমাগত বাড়িয়ে দিয়ে নতুন বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদী পুঁজির যোগান দিচ্ছিল। ১৯১৩-১৫ সময়কালে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় যে সঙ্কট দেখা দেয় তার ফলে এই ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির বেশ কয়েকটি, যেমন : পিপলস্ ব্যাঙ্ক, ইন্ডিয়ান স্পিসি ব্যাঙ্ক ও ক্রেডিট ব্যাঙ্ক অব্ ইন্ডিয়া, ইত্যাদি বন্ধ হয়ে যায়। এতে মনে হতে পারে যে, প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কগুলির অতি সাবধানী নীতিই যথার্থ ছিল।[৮৫] তবে, প্রকৃতপক্ষে সেরকম যুক্তির সপক্ষে এই ঘটনাকে সাক্ষ্য হিসাবে দাঁড় করানো যায় না। বরং বলা যায় যে অগ্রণী ব্যাঙ্কগুলি (সঙ্কটের সময় যাদের উপর নির্ভর করা স্বাভাবিক) ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে সাহায্য করতে অস্বীকার করায় ছোট ব্যাঙ্কগুলি দেউলিয়া হয়েছিল। ১৯১৩-১৫-র ঘটনাবলী তাই প্রমাণ করে। বিশেষত, যখন কোনো কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ছিল না যা স্বল্পস্থায়ী সঙ্কট মোকাবিলা করতে অথবা সাধারণভাবে নীতি নির্ধারণে সাহায্য করতে পারত তখন সঙ্কটের মুখে সাহায্যের অভাবে এই ছোট ব্যাঙ্কগুলির বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রায় নিশ্চিত ছিল। এই ঘটনাই প্রমাণ করে যে শিল্পমুখীন ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সাফল্যের জন্যে দুটি হচ্ছে প্রয়োজনীয় শর্ত—প্রথমত, স্বল্পমেয়াদী ঋণের সুদের হারের তুলনায় বেশি হারে মুনাফা দিতে পারবে এমন অনেক শিল্পোদ্যোগের অস্তিত্ব এবং দ্বিতীয়ত শিল্পে সরকারি সাহায্যের সম্ভাবনা। ভারতে সেই সময় এই দুটি শর্তেরই অভাব ছিল। ১৯১৭ সালে স্থাপিত হয় টাটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক। ১৯২৩ সালেই তাকে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইন্ডিয়ার সঙ্গে মিশে যেতে হয়—এর পিছনেও একই রকম কারণ ছিল। দেখা গেল যে শিল্পস্থাপনের প্রস্তাব ঠিকমতো যাচাই করার জন্যে একটি পরীক্ষক শ্রেণী তৈরি করা অতি ব্যয়সাপেক্ষ। তাছাড়া সাধারণ মূলধনী-বাজারে পাত্তা পাবে না অথচ শিল্পমুখীন ব্যাঙ্ক তাকে ধার দিয়ে লাভ করতে পারবে এমন শিল্পোদ্যোগের সংখ্যা অতি নগণ্য।[৮৬]

যুদ্ধপূর্বকালে এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি যে তাদের ভারতে সংগৃহীত আমানত বিদেশে বিনিয়োগ করত তার প্রমাণ আছে। তা ছাড়া সঙ্কটের সময় তারা লন্ডনের টাকার বাজার থেকে টাকা সংগ্রহ করত না, তারা ভারত সচিব টেলিগ্রাফ করে যে টাকা ভারতে পাঠাতেন, এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি তার উপরেই নির্ভর করত।[৮৭] সুতরাং, ভারতে সংগঠিত ব্যাঙ্কগুলির ব্যবস্থার আয়ত্তে যে সম্পদ ছিল, এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি কতটা তাকে বাড়াতে সাহায্য করেছিল—সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। ১৯২১ সালের আগে ভারতে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার অপ্রতুলতার অন্য একটি কারণ ছিল তিনটি স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কের উপস্থিতি। প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কগুলির সংযুক্তীকরণ হলে ব্যাঙ্কগুলির থেকে শিল্প ক্ষেত্রে দেওয়া স্বল্পমেয়াদী ঋণের পরিমাণ সম্ভবত বেড়ে যেত এবং সে ক্ষেত্রে সম্পদের আরেকটি সুষম বণ্টন সম্ভব হতো।[৮৮] কিন্তু তিনটি ব্যাঙ্ক নিজেদের অঞ্চল ভাগ করে নেওয়ায় তা সম্ভব হয়নি। কখনও কোন অঞ্চলে অতিরিক্ত পুঁজির সরবরাহ থাকলেও অন্যান্য অঞ্চলে তার পর্যাপ্ত যোগান থাকত না। বিশেষত, ব্যাঙ্ক অব্ মাদ্রাজের ক্ষেত্রে আমানতের পরিমাণে বারংবার উদ্বৃত্ত হয়। ফলে এই ব্যাঙ্কের দ্বারা ধার্য সুদের হার এবং তার মূলধনের উপর ডিভিডেণ্ড (dividend) অন্য দুটি ব্যাঙ্কের তুলনায় কম ছিল।

২.৬ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ভারত সরকারের আর্থিক নীতি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধেব শেষদিকে এবং যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ভারতেব মুদ্রাব্যবস্থার ইতিহাসের অদ্ভুত কিছু ঘটনা ঘটে এবং ভারতীয় অর্থব্যবস্থার উপর তাব দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব থেকে যায়। যুদ্ধের আগে ভারতীয় টাকার বহির্মূল্য স্টার্লিংয়ের গাঁট ছড়ায বাঁধা ছিল। এবং মূলত কাউনসিল বিল ও রিভার্স কাউনসিল বিল কেনা-বেচার মাধ্যমেই এই মান বজায রাখা হতো। ভারতে টাকা পাঠানো সহজ করতে এবং ইন্ডিয়া অফিসের মাধ্যমে ভারত সরকারকৃত ব্যয়ের জন্যে টাকা যোগাতে লন্ডনে ভারত সচিব কাউন্সিল বিল বিক্রি করতেন। এই বিল বিক্রি ভারতে সরকারি নোট ছাড়ার জন্যে গচ্ছিত স্বর্ণ অথবা স্টার্লিংয়ের ভিত্তিকে আরও প্রসারিত করত। ভারতে টাকা পাঠানোর চাহিদার পবিবর্তনের সাথে তাল রেখে কাউনসিল বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ বদলানো হতো। টাকাব বিনিময মূল্য ১ শিলিং ৪ পেনির নিচে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলে ভারতে বিপরীতমুখী কাউনসিল বিল (যেগুলি লন্ডনে সোনা অথবা স্টার্লিংয়ের বিনিময়ে বদলে নেওয়া যেত) বিক্রির মাধ্যমে তা ঠেকানো হতো।

সোনা ও রুপোব নীট আমদানির ওঠানামাও টাকার বহির্মূল্যে সমতা বজায় রাখতে সাহায্য করত। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ কবা যেতে পারে যে, ১৯০৯-১০ থেকে ১৯১৩-১৪ অবধি পাঁচ বছরে ভারতে মোট ১২০, ২৪২,০০০ পাউন্ড মূল্যের সোনারুপো আমদানি হয়েছিল এবং সেই পাঁচ বছরে কাউনসিল বিলের নীট বিক্রির পরিমাণ ছিল ১৩৮,২০২,২০০ পাউন্ড।[১৯]

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে প্রথমদিকে টাকার বহির্মূল্য পড়তির দিকে ছিল এবং সে সময় বিপরীতমুখী কাউনসিল বিল বিক্রি করে টাকার মান আবার তুলে ধরা হয়। এর অব্যবহিত পরেই মধ্য ও পূর্ব ইয়োবোপ থেকে আমদানি প্রায় বন্ধ হয়ে যায়, ব্রিটেন থেকে আমদানিতে ছাঁটাই হয় এবং ব্রিটিশ সরকারের হয়ে ভাবত সরকার বিশাল পরিমাণ ব্যয় নির্বাহ করে (১৯১৪ থেকে ১৯১৯-এর মধ্যে এর পরিমাণ ছিল ২৪ কোটি পাউন্ড)।[২০] এ সকল কারণে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রচুর উদ্বৃত্ত জমে। বিদেশে এই সময়ে সোনা ও রুপোর যোগান বিশেষভাবে হ্রাস পাওয়ায় ভারতে সোনা-রুপোর আমদানি কমিয়ে দেওয়া হয়। এদিকে ভারত সরকার আবার সরকারি (কাগজের) নোটের পরিবর্তে রুপোর টাকা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। ফলত এক অদ্ভুত অবস্থা হয়—ভারত সরকারের পক্ষে ঐ উদ্বৃত্তের জন্যে টাকা যোগান দেওয়া সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে এই সংকটের দুটি কারণ ছিল। প্রথমত, যুদ্ধপূর্ব কালের আন্তর্জাতিক সম্পদ সঞ্চালন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে। দ্বিতীয়ত, রৌপ্য মুদ্রার জায়গায় কাগজের নোট যথেষ্ট পরিমাণে প্রচলন করতে ভারত সরকার অপারগ হয়।[২১] আন্তর্জাতিক সঞ্চালন ব্যবস্থার পরিবর্তনের ধাক্কা ভারত সরকার নিজেই বহন করতে এগিয়ে আসে। ১৯১৭ সালের অগাস্ট মাসে রুপোর দাম আউন্স প্রতি ৪৩ পেনি অতিক্রম করে যায়। বস্তুত, এই মুহূর্তে টাকার বিনিময় হার ও টাকার ধাতব মান সমান হয়ে যায়।[২২] এর পরে ভারত সরকার ঘোষণা করে, ভবিষ্যতে যে দামে কাউনসিল বিল বিক্রি করা হবে তা মোটামুটিভাবে রুপোর দাম দিয়ে নির্ণীত হবে। এই ভাবেই টাকার বহির্মূল্য ক্রমশ বর্ধমান রুপোর দামের সঙ্গে বাঁধা পড়ে যায়। ১৯১৭ সালে টাকার মান ১ শিলিং ৪ পেনি থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ১ শিলিং ৪½ পেনি এবং তারপরে ১ শিলিং ৫ পেনি। ১৯১৮ সালে এই মান বেড়ে ১ শিলিং ৬ পেনি হয়। ১৯১৯

সালের ১৩ই মে অবধি টাকার মান আর বাড়েনি। কিন্তু তারপর রুপোর দাম আবার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে টাকার মূল্য হয়ে যায় ১ শিলিং ৮ পেনি। ১৯১৯ সালের ১২ই ডিসেম্বর টাকার মূল্য দাঁড়িয়ে যায় ২ শিলিং ৪ পেনি।[২৩]

যুদ্ধোত্তর ব্যারিংটন স্মিথ কমিটি টাকার মান ২ শিলিং সোনার মূল্যে বেঁধে দেওয়ার সুপারিশ করে। কিন্তু এই সুপারিশের সময় যুদ্ধোত্তর কালে বিশালভাবে আমদানির বৃদ্ধি, পৃথিবীব্যাপী দ্রব্যমূল্যের নিম্নগতি এবং ভারতে রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি বেড়ে যাওয়ায় এই সব ব্যাপার কমিটির নজরে আসেনি। সুতরাং, তাদের সুপারিশ মত টাকার উঁচু বহির্মূল্য বজায় রাখতে সরকারকে বিশেষ সমস্যায় পড়তে হয়। অবশেষে ১৯২০ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর টাকার মান ২ শিলিং স্টার্লিংয়ে বেঁধে রাখার চেষ্টা সরকার ত্যাগ করে। ১৯২১ সালে টাকার মান ১ শিলিং ৩ পেনি স্টার্লিং থেকে কমে যায় এবং ১ শিলিং সোনার দামের নিচে চলে আসে। ১৯২৩ সালের জানুয়ারি থেকে টাকার মান আবার উর্ধ্বগতি হয়ে প্রথমে ১ শিলিং ৪ পেনি স্টার্লিং ও তারপরে ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে ১ শিলিং ৬ পেনি স্টার্লিং হয়। সরকার টাকার এই মান বজায় রাখতে সচেষ্ট হয় এবং রয়্যাল কমিশন অন ইন্ডিয়ান কারেন্সি এ্যান্ড ফিনান্স (১৯২৬) টাকার মান ১ শিলিং ৬ পেনি যে বেঁধে দেওয়ার সুপারিশ করলে সেই মানই আইন করে বেঁধে দেওয়া হয়। এই সুপারিশের কারণ হিসাবে হিলটন ইয়ং কমিশন বলে, 'তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে তখনকার টাকার মান ১ শিলিং ৬ পেনিতেই ভারতের আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর বহির্জগতের মূল্যস্তরের সঙ্গে প্রায় ভারসাম্যের জায়গায় এসে গিয়েছে। সুতরাং, টাকার বহির্মূল্য আবার বদলালে আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরে তোলপাড় হবে। অর্থব্যবস্থাও টাল মাটাল হবে, উল্টো দিকে উপকার কিছুই হবে না। সুতরাং টাকার মান বদলানো উচিত হবে না।'[২৪]

১৯১৭-২৪ সময়সীমার মধ্যে টাকার বিনিময় হারের যে অস্থিরগতি দেখা দেয় তার পুনরাবৃত্তি এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কারও দ্বিমত ছিল না। ভারতের মতো মুক্ত বাণিজ্যের দেশে এই প্রকার অস্থিরতা অসহ্য অনিশ্চয়তার জন্ম দিত। বিদেশী দ্রব্য এবং যন্ত্রপাতি আমদানির উপরে ভারতীয় শিল্পপতিরা অতিমাত্রায় নির্ভরশীল ছিল। সুতরাং তারা ইয়োরোপে যে মুদ্রার অবমূল্যায়নের মড়ক চলছিল তার সহজ শিকার ছিল। অতি মাত্রায় অনিশ্চয়তা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও ১৯২০-২১ থেকে ১৯২৩-২৪-এর মধ্যে শিল্পে যে অতটা বিনিয়োগ ঘটেছিল, এই ঘটনাটি বিস্ময়কর।[২৫]

ভারতীয় ব্যবসায়ী মহল টাকার বিনিময় হার ১ শিলিং ৬ পেনি রাখার বিরুদ্ধে প্রায় একমত ছিল। তাদের মতে যুদ্ধপূর্ব ১ শিলিং ৪ পেনি বিনিময় হারই টাকার 'প্রকৃত' মান। হিলটন ইয়ং কমিশনে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি হিসাবে স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস ১ শিলিং ৪ পেনিকে টাকার বিনিময় হার হিসাবে গ্রহণ করার জন্যে লিখিতভাবে সুপারিশ করেন এবং কমিশনের অধিকাংশ সদস্যের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য লিপিবদ্ধ করেন।[২৬]

দুই পক্ষের মতের সপক্ষেই বিভিন্ন ঘোলাটে যুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু এই বিতর্কের মূলত তিনটি বিষয় বিশেষ মাত্রা পায়। প্রথমত, টাকার মান ১ শিলিং ৬ পেনি থেকে কমিয়ে ১ শিলিং ৪ পেনি (প্রকৃতপক্ষে ১১ শতাংশ অবমূল্যায়ন) করা হলে আমদানিকৃত বিদেশী শিল্পপণ্যের তুলনায় ভারতীয় শিল্পপণ্য বিশেষ সুবিধা পেত। বিশেষত কুড়ির দশকের মধ্যভাগে ভারতীয় বস্ত্র-শিল্প যখন কঠিন বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন, তখন এই ধরনের সুবিধা অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত

ছিল। অপরপক্ষে বিদেশে ভারতীয় রপ্তানি পণ্যের চাহিদা, বিশেষত কাঁচামালের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হওয়ায় বণিকের লাভ বিচার করলে টাকার উচ্চ বিনিময়মূল্য স্বাগত ছিল। দ্বিতীয়ত, টাকার মান ১ শিলিং ৬ পেনি ধরে রাখতে সরকার মন্দা সৃষ্টির (deflationary) নীতি প্রয়োগ করেছিল এই অভিযোগের মধ্যেও কিছু পরিমাণ সত্যতা ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে বেশ কয়েক বছর ঘাটতি বাজেট পেশ করতে বাধ্য হওয়ার পর সরকার যে চলতি খাতে ব্যয় ও লগ্নীখাতে ব্যয়, এই দুটি ক্ষেত্রেই প্রভূত সংকোচন এনেছিল তা আমরা আগেই দেখেছি। ব্যয় সংকোচনের এই নীতি বাজেটে আয়-ব্যয়ের সমতা না আসা পর্যন্ত (১৯২৩-২৪ সাল থেকে সেই সমতা আয়ত্ত হয়েছিল) চালু ছিল। সরকারি খাতে এই ব্যয় সংকোচের সাথে সাথে সারা দেশে চালু মুদ্রার পরিমাণ হ্রাসের পদক্ষেপও গৃহীত হয়েছিল।[৯৭] এই সময়ে, বিশেষত ১৯২২ সালেব পরে, মুদ্রার ও নোটের প্রচলন বৃদ্ধির হাব অত্যন্ত কমে যায়। ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯২৬ সালের ডিসেম্ববের মধ্যে কাগজের নোটের পরিমাণ ১৭,২৪৮ লক্ষ টাকা থেকে কমে দাঁড়ায় ১৬,৫৬০ লক্ষ টাকায়।[৯৮] নোটেব পরিমাণ হ্রাসের এই ঘটনা সম্ভবত কিছুটা ছিল সরকারি ব্যয় সংকোচন নীতির ফল, কিন্তু আবার অনেকটাই মুদ্রাপ্রচলন কর্তাদের গৃহীত নীতির ফসল—উদাহরণস্বরূপ ইম্পিবিয়্যাল ব্যাঙ্কের ধার্য সুদের হার বৃদ্ধির কথা বলা যায়।[৯৯] সংগঠিত টাকার বাজারের দিকে তাকালে দেখা যায়, ১৯২১ থেকে ১৯২৭-এর মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিতে আমানতেব পরিমাণ ২২৯৯৩ লক্ষ টাকা থেকে কমে দাঁড়ায় ২১২৪৩ লক্ষ টাকায়। আমানতের মোট বৃদ্ধি এবং তার আপেক্ষিক বৃদ্ধি, এই দুইয়েরই বার্ষিক গড় হার যুদ্ধেব আগে বেশি ছিল।[১০০] যদিও মূল্যস্তর অথবা জাতীয় আয়কে প্রত্যক্ষভাবে টাকার যোগানের এই পরিমাপের সঙ্গে যুক্ত করা যায় না, এমনকি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে বিশেব দশকের মধ্যভাগে শিল্পে বিনিয়োগের জন্যে পুঁজির বিশেষ অভাব ছিল। কিন্তু আভ্যন্তরীণ অর্থ ব্যবস্থার এই নিদারুণ মন্দা এবং তার সঙ্গে প্রবল বিদেশী প্রতিযোগিতা, এই সব মিলে একমাত্র 'প্রকৃতিনির্মিত' বাঁধা দ্বারা সংরক্ষিত শিল্প ছাড়া অন্য শিল্পে বিনিয়োগ থেকে লাভের আশা তিরোহিত হয়। টাকার বিনিময় হার সম্পর্কিত বিতর্কের লেখমালা থেকে তৃতীয় একটি বিষয়ে ধরা পড়ে তা হলো সরকার ব্যগ্র ছিল স্ট্যর্লিং-এ বাঁধা খাতে টাকার খরচ কমিয়ে রাখতে এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীদের চোখে নির্ভরযোগ্য অধমর্ণ হিসাবে নিজেদের ভাবমূর্তি বজায় রাখতে।[১০১] টাকার অবমূল্যায়ন হলেই রেল ব্যবস্থার জন্যে প্রয়োজনীয় পণ্যের (যা ব্রিটেন থেকে কেনা হতো) খরচ বৃদ্ধি পেত, ফলত বাজেটে আয়ব্যয়ের সমতা রক্ষা দুরূহ হতে পারত। সেই সমতা রক্ষা না হলে ভারত সরকারের সুনাম ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা ছিল।

তিরিশের দশকের মন্দার সময়ে যে ভাবত সরকার আবার মন্দা সৃষ্টির (defletionary) নীতি গ্রহণ করেছিলেন সে কথা রাজকোষের আয়ব্যয় নীতি সম্বন্ধীয় আলোচনার সময় উল্লেখ করা হয়েছে। টাকার বাজারে চাহিদার তুলনায় যোগানের অপ্রতুলতা প্রতিফলিত হয় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ধার্য সুদের চড়া হারে এবং ভারত সরকারের ট্রেজারি বিলের অন্তর্নিহিত চড়া হারের সুদে। ১৯৩০ সালের ১০ই জুলাই ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সুদের হার কমে ৫ শতাংশ হলো। ১৯৩১ সালের ৬ই অগাস্টে তা বেড়ে ৭ শতাংশ হয়েছিল। তারপর ব্রিটেন পাউন্ডের সঙ্গে সোনার গাঁটছড়া খুলে ফেললে সেই বছরের এই হার আরও বেড়ে ৮ শতাংশ হয়ে যায়। ১৯৩২ সালের ২৮শে এপ্রিল থেকেই প্রকৃতপক্ষে ব্যাঙ্কের হার পড়তে শুরু

করে। সেই দিন সুদের হার ৫ শতাংশ নেমে যায়।[১০২] ট্রেজারি বিলের জন্যে যে সব টেন্ডার কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণযোগ্য বিচার করেছিল তাদের উপর দেয় সুদের হার ১৯৩১ সালের পুরো সময়টাই ৫.৫ শতাংশের উপরে ছিল এবং সেই বছরেরই ২রা অক্টোবর তা বেড়ে ৭.২৫ শতাংশ হয়। তারপর ১৯৩২ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ দিক থেকে সরকারি ঋণপত্রের উপর দেয় সুদ কমতে শুরু করে।[১০৩] সরকারি ঋণপত্রের উপর বেশি মাত্রায় মুনাফা দিয়ে বেসরকারি ক্ষেত্রে বিনিয়োগযোগ্য পুঁজির একটি বড় অংশ সরকার কুক্ষিগত করছিল—এমন একটি অভিযোগও শিল্পপতিদের মধ্যে ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পাবে, ভারত সরকার ১৯৩২ সালের প্রথমদিকে শতকরা ১০০ টাকায় ৯৮ টাকা দরে ৫.৫ শতাংশ সুদবাহী ঋণপত্র বাজারে ছাড়ে যদিও সাধারণ মত ছিল যে, ১০০ টাকায় ৯৫ টাকা দরে ৫ শতাংশ সুদবাহী কাগজ থেকেও সরকার সম পরিমাণ টাকা ঘরে তুলে রাখত।[১০৪] পুঁজির বাজারের এই টলটলায়মান অবস্থা কিছুটা তিরিশের দশকের মন্দার ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল একথা ঠিক। কিন্তু সরকারের মন্দাসৃষ্টিমুখীন নীতির ফলে এই সঙ্কট আরও ঘনীভূত হয়েছিল। বিশেষত স্টার্লিং ঋণ আংশিকভাবে মেটানোর জন্যে সরকার এই অদ্ভুত সময়টিকেই বেছে নিয়েছিল। সরকারের ব্যয় সংকোচ ও মুদ্রাহ্রাসের নীতি যে ১৯৩০ এবং ১৯৩১ সালে গৃহীত (আমদানি শুল্ক দ্বারা) সংরক্ষণের কার্যকারিতা বহুলাংশে খর্ব করেছিল এমন একটি যুক্তিও দেখানো যায়। ১৯৩৩-৩৪ সাল অবধি যে ভারতের যন্ত্রপাতি ও মিলের যন্ত্রাংশের আমদানির আর্থিক মূল্য ও 'প্রকৃত' মূল্য, উভয়ই যে বাড়েনি এর থেকেই উপরোক্ত যুক্তিটির স্বপক্ষে প্রমাণ মেলে। ১৯৩৩-৩৪ সাল থেকে যন্ত্রপাতি আমদানির মূল্য যে বৃদ্ধি পেয়েছিল তার জন্যে অবশ্য বিশ্বের অর্থব্যবস্থার সার্বিক উর্ধ্বগতিও কিছুটা দায়ী।[১০৫]

লন্ডনের টাকার বাজারে ঋণগ্রহীতা হিসাবে নিজেদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার বিষয়ে ভারত সরকারের যে প্রচেষ্টা ছিল তা তাদের অদূরদর্শিতার পরিচায়ক ছিল ; ১৯৩৫ সালের পরে লন্ডনের টাকার বাজার থেকে ভারত সরকার আর ঋণ গ্রহণ করেইনি।

আর্থিক সংস্থাবিন্যাস ও আর্থিক নীতি বিষয়ে ভারত সরকার অন্যান্য যে সমস্ত পদক্ষেপ এই সময়ে গ্রহণ করে তার মধ্যে ছিল ১৯২১ সালে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ও ১৯৩৫ সালে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপন। এই পদক্ষেপের ফলে সংগঠিত টাকার বাজারের কাজকর্মের উন্নতি ঘটলেও, শিল্পক্ষেত্রে ঋণ দেওয়ার বিষয়ে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির নীতির কোন ইতরবিশেষ ঘটেনি। গুদামজাত জিনিসপত্র রেহান রেখে স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেওয়াই ব্যাঙ্কগুলির কাজ ছিল। অবশ্য এ ছাড়াও যথেষ্ট নামী সংস্থাগুলির স্থায়ী সম্পদের (fixed capital) উপরে ভিত্তি করেও স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেওয়া হতো। এই ধরনের ঋণকে বলা হতো 'ক্যাশ ক্রেডিট'।[১০৬] ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক মূলত ইয়োরোপীয়দের দ্বারাই পরিচালিত হতো। এই ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার করার অভিযোগ ছিল, বিশেষত ১৯৩৫ পর্যন্ত, যে সময়ে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করা ছাড়াও অন্যান্য ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক হিসাবে তার কাজ করার কথা ছিল। তবে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অথবা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উভয়েরই আর্থিক নীতির উপরে এতখানি নিয়ন্ত্রণ ছিল না যাতে সরকারের থেকে আলাদা নীতি নির্ধারক হিসাবে তারা গণ্য হতে পারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়ার আগেই অল্প সুদের টাকায় বাজার দেশে চলতে থাকে কারণ সেই জমানা এসে যায় ১৯৩২ সালে। এই সস্তা সুদের ঋণের জমানাকে শিল্পে বিনিয়োগের বৃদ্ধির কারণ বলা যায় না, সেই জমানাই ছিল অন্যান্য ঘটনা সঙ্গমের ফসল।[১০৭]

শিল্প-সহায়ক ব্যাঙ্ক স্থাপন করার ব্যাপক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও দৃশ্যমান কোনো ফল তার থেকে পাওয়া যায়নি। ১৯১৭ সালে টাটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু তার কাছে এমন লাভজনক বিনিয়োগের প্রস্তাব খুব কম আসে যেগুলিতে পুঁজিসমৃদ্ধ অন্য ব্যক্তি টাকা লগ্নী করছিলেন না। সুতরাং, ১৯২৩ সালে এই ব্যাঙ্ক সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইন্ডিয়াতে লীন হয়ে যায়।

অনুবাদক: দেবাশিস বিশ্বাস (অমিয় কুমার বাগচী সম্পাদিত)

উৎস ও টীকা

১। দ্রষ্টব্য : P. J. Thomas, *The Growth of Federal Finance in India* (Oxford University Press, Indian Branch, 1939), Part V; *Banking and monetary statistics of India* (Reserve Bank of India, Bombay, 1954), পৃ. ৮৭২-৭; G.K. Gokhale-র বক্তৃতা, দ্রষ্টব্য : *Indian financial statement for 1904-05 and the proceedings of the Legislative Council of the Governor-General thereon* (PP. 1904, LXIII, পৃ. ২৫৬-৯)।

২। স্বর্ণ-বিনিময় সম্পর্কে J.M. Keynes-এর ক্লাসিক আলোচনা : *Indian Currency and Finance* (লন্ডন, ১৯১৩), অধ্যায় ২; স্বর্ণ বিনিময় মান ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের Balance of Payments নিয়ন্ত্রণ-প্রক্রিয়ার সব থেকে ভালো আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য : Y. S. Pandit, *India's Balance of Indebtedness, 1898-1913* (লন্ডন, ১৯৩৭), অংশ ২।

৩। এই বিষয়ে সবচেয়ে উত্তেজক আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য : Digby, *'Prosperous' British India*, বিশেষত অধ্যায় ৪; আরও তথ্যপূর্ণ একই রকম বক্তব্যের জন্যে দেখুন : R.C. Dutt, *The Economic History of India in the Victorian Age* (লন্ডন, ১৯০৪), মুখবন্ধ, অংশ ২ ও ৩। এ ছাড়া, E. Thompson ও G.T. Garratt, *Rise and Fulfilment of British Rule in India* (লন্ডন, ১৯৩৪), পৃ. ৫৬৫-৭, ৫৯৩-৫ দ্রষ্টব্য।

৪। নতুন বন্দোবস্তের পর ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এবং নমনীয় ভূমি-রাজস্বের স্বপক্ষে যুক্তির জন্যে দ্রষ্টব্য : Note of Rai Bahadur B.K. Bose (Official representative of the Central Provinces in the Imperial Legislative Council), *Indian financial statement for 1902-3 and proceedings* (PP 1902, LXX, Appendix I, পৃ. ২৯৯-৩০৬)।

৫। লবণ কর জনপ্রিয় না হওয়া সত্ত্বেও সরকার বড় যুদ্ধের অজুহাতে তা বহাল রাখতে চায়। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : Lovat Fraser, India under Curzon and After (লন্ডন, ১৯১১), পৃ. ৩৫৭। ভারতের জাতীয়তাবাদী মতামতের জন্যে ১৯০৭-৮ সালের বাজেট প্রসঙ্গে Imperial Legislative Council-এ গোখেলের বক্তৃতা : R.P. Patwardhan and D.V. Ambekar (eds.), *Speeches and writings of Gopal Krishna Gokhale* (পুণা ও লন্ডন, ১৯৬২), পৃ. ১০৯।

ভারতে (ব্রহ্মদেশ সমেত) লবণের ভোগ (মণের ওজনে) :

১৯০২-৩	১৯০৩-৪	১৯০৪-৫	১৯০৫-৬	১৯০৬-৭
৩৬,৬৬,৪০৯	৩৭,৬০২,৯৪৫	৩৯,১৩১,৬০৭	৪০,৭২৯,১৭৩	৪৩,০৮৬,০০০

উৎস : Gov. India, Commercial Intelligence and Statistics Department (CISD), *Financial and Commercial Statistics of British India* (কলকাতা, ১৯০০-৭)।

৬। লর্ড কার্জন ও তাঁর পরবর্তীকালের (১৯২১ পর্যন্ত) ভাইসরয়দের আমলে গৃহীত সরকারি শিক্ষানীতি নীতির জন্যে দ্রষ্টব্য : Thompson and Garratt, *Rise of British Rule*, পৃ. ৫৭১-৪; Fraser, *India Under Curzon*, পৃ. ১৭৫-২০০; ভারত সরকারের শিক্ষানীতির উৎকৃষ্ট সারাংশের জন্যে দ্রষ্টব্য : J.R. Cunningham, 'Education', in L.S.S, O'Malley : *Modern Indian and the West* (লন্ডন, ১৯৪১)।

৭। দ্রষ্টব্য : ১৮৮৯-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত Lord Lansdowne-এর ভাষণ এবং ভারত সরকারের *Review of Education in India* (1886), উদ্ধৃত হয়েছে Cunningham-এর 'Education'-এ, (পৃ. ১৬৪-৫)।

৮। ম্যানচেস্টারের বণিকদের মতামতের জন্যে দ্রষ্টব্য : A Redford, *Manchester Merchants and Foreign Trade*, Vol II : *1850-1939* (ম্যানচেস্টার, ১৯৫৬), অধ্যায় ৩ ও ৪; Bombay Chamber of Commerce-এর (সংস্থাটি বোম্বাইয়ের ব্রিটিশ ব্যবসার প্রধান প্রতিনিধি, কিন্তু একমাত্র নয়) মতামতের জন্যে দ্রষ্টব্য : R.J.F. Sulivan, *One Hundred Years of Bombay* (Bombay c. 1937), অধ্যায় ২২ ও ২৩; Bengal Chamber of Commerce-এর (পূর্ব ভারতের ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি) মতামতের জন্যে দ্রষ্টব্য : G.W. Tyson, *The Bengal Chamber of Commerce and Industry, 1853-1953 : A Centenary Survey* (কলকাতা, ১৯৫৩), পৃ. ১১০; Karachi Chamber of Commerce-এর (সিন্ধুপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি) মতামতের জন্যে দেখুন Herbert Feldman, *Karachi through a Hundred years* (করাচি, ১৯৬০), অধ্যায় ৫।

৯। ১৯২১ পর্যন্ত ভারতীয় রেলের অর্থ-সংস্থানের ইতিহাসের জন্যে দ্রষ্টব্য : *Report of the Committee appointed by the Secretary of State for India to enquire into the administration and working of Indian Railways* (PP. 1921, X), অধ্যায় ৭।

১০। উপরোক্ত রিপোর্টের পরিশিষ্ট ৩-এ দেখুন যে ভারতীয় রেলে অর্থ-সংস্থানের ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটেছিল প্রতিশ্রুত সুদের পরিমাণ হ্রাসের দরুন। সুদের পরিমাণে হ্রাস ঘটেছিল সরকার কর্তৃক বেসরকারি সংস্থাগুলি ক্রয়ের ফলে : ১৮৯৪-৫-এ প্রতিশ্রুত সুদের পরিমাণ ছিল ৫,২৩৩,০৬৪ পাউন্ড; ১৯০০-১-এ এটি কমে দাঁড়ায় ২,৫৩২,৪৩০ পাউন্ডে।

১১। Thomas Robertson (Special Commissioner for Indian Railways) : *Report on the administration and working of Indian Railways* (PP. 1903, XLVII, পৃ. ৪৮৩-৭০২)।

১২। *Report of the Committee on Indian Railways finance and administration* (PP. 1908, LXXV, পৃ. ১৪)।

১৩। রেলের খাতে মোট মূলধন ব্যয়ের পরিমাপের জন্যে দেখুন : M.J.K Thavaraj, 'Capital Formation in the Public Sector in India : A Historical Study, V K.R.V. Rao *et al* (eds.), *Papers on National Income and Allied Topics*, খণ্ড ১ (লন্ডন, ১৯৬০), পৃ. ২১৫-৩০।

১৪। *Census of India, 1911*, Vol. I, Part I : *Report* (কলকাতা, ১৯১৩), পৃ. ৪৪৪।

১৫। A. A. Apear-এর Imperial Legislative Council-এ প্রদত্ত ভাষণ (মার্চ ২৭, ১৯০৭) : *Indian financial statement for 1907-8 and proceedings* (PP. 1907, L VII) পৃ. ১৯৬-৯।

১৬। বক্তৃতা : J.F. Finlay, *Indian financial statement for 1907-8 and proceedings* (PP. 1907, L VIII), পৃ. ২১৭; W.L. Harvey, *Indian financial statement for 1908-9 and proceedings* (PP. 1908, LXXIV), পৃ. ২০৭।

১৭। এই গ্রন্থের অধ্যায় ৯ ও ১০ দ্রষ্টব্য।

১৮। K.T. Shah . *Sixty years of Indian Finance* (লন্ডন, ১৯২৭), পৃ. ৩২৩ (n)। ব্রিটিশ ভারতের সেচব্যবস্থার ইতিহাস এবং রাজস্বের জন্যে দেখুন : Sir Bernard Darley : 'Irrigation and its Possibilities, Radhakamal Mukherjee (ed.), *Economic Problems of Modern India*, খণ্ড ১ (লন্ডন, ১৯৩৯), পৃ. ১৪৮-৬৭; Shah : *Sixty years of Indian Finance*, পৃ. ৩১৮-৩০; *Report of the Indian Irrigation Commission, 1901-03*, Part I : *General* (PP. 1904, LXVI), পৃ. ১১-২৩।

১৯। ভাষণ : Rai Bahadur B.K. Bose (মধ্য প্রদেশের সরকারি প্রতিনিধি), *Indian financial statement and proceedings* for the years 1900-1 and 1901-2 (PP. 1900, LVII, পৃ. ২০০-৩; এবং PP. 1901 XLIX, পৃ. ২৪৬-৫২)।

২০। *Report of the Indian Irrigation Commission, 1901-03*, Part I : *General* and Part II : *Provincial* (PP 1904, LXVI)।

২১। উৎস : Thavaraj : 'Capital Formation in the Public Sector in India, পৃ. ২২৪।

২২। *Report of the Committee on Indian Railways finance and administation* (PP. 1908, LXXXV), পৃ. ১৪।

২৩। *Report of the Committee on the administration and working of Indian Railways* (pp. 1921, X), পৃ. ৩০ (n)।

২৪। যে দেশগুলিতে রেলপথের বিস্তার ঘটেছে তাদের তুলনায় ভারতীয় রেল-ব্যবস্থার নৈরাশ্যজনক উন্নয়নের ফলাফল ও তার কারণ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য : Daniel Thorner, 'The Pattern of Railway Development in India', *The Far Eastern Quarterly*, XIV (2), ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫, পৃ. ২০১-১৬।

২৫। ভারতে যে সামান্য কয়েকটি শিল্প ছিল সেগুলির উপর ইয়োরোপীয় প্রতিযোগিতাব প্রভাব সম্পর্কে উদ্বেগ শুধুমাত্র ভারতীয়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কাগজ ও চিনি শোধনের শিল্পকে মূলত ব্রিটিশরাই নিয়ন্ত্রণ করতেন। স্বভাবতই ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরাও তাদের ভাগ্য সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ছিল।
ভাষণ : Sir Montagu Turner, *Indian Finncial statement for 1903 4 and proceedings*, পৃ. ১৬৭ (PP. 1903, XLVI), এবং E.Cable (পরবর্তীকালে Lord Cable), *Indian financial statement for 1904-5 and proceedings*. পৃ. ১৯৩ (PP. 1904, LXIII)।

২৬। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ভারত সরকারের অর্থসংস্থানের বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য : Shah, *Sixty years of Indian Finance*, পৃ. ৪১৫-৩৯।

২৭। ১৯১৭-১৮ থেকে ১৯২২-২৩ পর্যন্ত মোট ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৯৮০ মিলিয়ন টাকা। দ্রষ্টব্য : G.F. Shirras, 'Public Finance in India', *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, খণ্ড ১৪৫, ১৯২৯, অংশ ২, পৃ. ১১৭।

২৮। ইন্ডিয়ান রিট্রেন্‌চ্‌মেন্ট কমিটির (১৯২২-৩) সভ্যরা ছিলেন Lord Inchcape (ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি), Sir Thomas S. Catto (পরবর্তীকালে Lord Catto, অ্যান্ড্রু ইয়ুল অ্যান্ড কোম্পানির অংশীদার), Dadiba Merwanji Dalal, Sir R.N. Mookerjee (মার্টিন বার্ন), Sir Alexander R. Murray (চেয়ারম্যান, বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স), Purshotamdas Thakurdas, এবং H. F. Howard (সেক্রেটারি)।

২৯। *Report of the Indian Retrenchment Committee* (দিল্লী, ১৯২৩)। এই কমিটি ১৯৩ মিলিয়ন টাকার পরিমাণের সঞ্চয় সুপারিশ করে। সব থেকে বেশি ব্যয়-সংকোচ কার্যকর হয়েছিল মিলিটারি, রেল, এবং ডাক ও তার বিভাগের ক্ষেত্রে।

৩০। Shirras ('Public finance in India') লিখেছিলেন : '১৯১৭-১৮ ও তার অব্যবহিত পরের বছরগুলি ছিল 'Unbalanced budgets'-এর বছর এবং ভারতের আয়-ব্যয়ের ইতিহাসে ঐ সময়টি ছিল মসীলিপ্ত (পৃ. ১১৭)।

৩১। লন্ডনের রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের ভারত সরকারের ঋণগ্রহণের নীতি সম্পর্কে মতামতের জন্যে পাঠযোগ্য বিষয় : রয়্যাল সোসাইটি অব্ আর্টসের সভায় George Pilcher এবং Sir Campbell Rhodes প্রদত্ত ভাষণ। এই সভায় Sir Basil Blackett (Finance Member, Viceroy's Executive Council) উপস্থাপন করেন নিম্নোক্ত প্রবন্ধটি : 'The Economic Progress of India' *JRSA*, ৭৮, সংখ্যা ৪,০২৮, ৩১শে জানুয়ারি ১৯৩০, পৃ. ৩১২-৩৬।

৩২। Pillai, *Economic Conditions in India*, অধ্যায় ১১; H.R. Soni, *Indian Industry and Its Problems*, খণ্ড ১ (লন্ডন, ১৯৩২), অধ্যায় ৮ ও ৯; এবং Anstey, *Economic Development of India*, পৃ. ৩৫০-১।

৩৩। উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য Blackett, The Economic Progress of India', পৃ. ৩১৮।

৩৪। H.A.F. Lindsay (Indian Trade Commissioner in London), 'World Tendencies Reflected in India's Trade', *JRSA*, ৭৫, সংখ্যা ৩,৮৭৬, ৪ঠা মার্চ ১৯২৭, পৃ. ৩৯১-৩।

৩৫। কোনো বিশেষ শিল্পকে সংরক্ষণের সুযোগ দেওয়া হবে কি হবেনা, এই রকম কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ভারত সরকার সাধারণত অত্যন্ত বেশি সময় নিতেন। সুতিবস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে সময় লেগেছিল একত্রিশ মাস। দ্রষ্টব্য : *Report of the Fiscal Commission, 1949-50* (দিল্লী, ১৯৫০), পৃ. ৫০-১।

৩৬। ১৯২৭ পর্যন্ত বিভেদমূলক সংরক্ষণের নীতির প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণার জন্যে দ্রষ্টব্য : Sir David T. Chadwick (Member, Indian Fiscal Commission of 1922) : 'The work of the Indian Tariff Board' *JRSA* ৭৬, সংখ্যা ৩৯২১, জানুয়ারি ১৩, ১৯২৮।

৩৭। Indian Fiscal Commission-এর রিপোর্টে সংরক্ষণের মাধ্যমে দ্রুত শিল্পায়নের নীতি সুপারিশ করা হয়। কিন্তু এই সুপারিশের বিরুদ্ধতাও করা হয় একটি Minute of Dissent-এ।

৩৮। দ্রষ্টব্য : *Indian financial statement and budget of the Governor-General of India in Council for 1930-31* (PP. 1929-30, XXIII), ১৯৩০-৩১ সালের বাজেট সম্পর্কে Finance Member-এর ভাষণ।

৩৯। *Indian financial statement and budget for 1931-2* (PP 1930-1, XXII), অংশ ২, পৃ. ২।

৪০। A.K. Banerjee, *India's Balance of Payments* (লন্ডন, ১৯৬৩), অধ্যায় ৭।

৪১। *ঐ,* অধ্যায় ৫।

৪২। Reserve Bank of India, *Report on Currency and Finance for the Years 1935-6 and 1936-7* (বোম্বাই, ১৯৩৭), পৃ. ৩।

৪৩। Sir George Schuster, 'Indian Econnomic Life : Past Trends and Future Prospects' *JRSA* ৮৩, সংখ্যা ৪৩০৬, মে ৩১ ১৯৩৫, পৃ. ৬৪১-৬৯। আরও দেখুন Blackett, 'The Economic Progress of India', পৃ. ৩১৩-২৭।

৪৪। S.B. Saul, *Studies in British Overseas Trade, 1870-1914* (লিভারপুল, ১৯৬০), অধ্যায় ৮। ১৯০০-১ থেকে ১৯০৪-৫, ১৯০৫-৬ থেকে ১৯০৯-১০ এবং ১৯১০-১১ থেকে ১৯১৩-১৪ সময়কালে থান কাপড়ের আমদানি-মূল্য (ভারতীয় আমদানির শতাংশে যথাক্রমে ৩৮.৮, ৩৬.০ এবং ৩৬.২। দ্রষ্টব্য : Venkatasubbiah, *Foreign Trade*, পৃ. ২৮

৪৫। Venkatasubbiah, *Foreign Trade,* পৃ. ৩২।

৪৬। *ঐ,* পৃ. ৩৩।

৪৭। Saul, Studies in British Overseas Trade, অধ্যায় ৩, বিশেষত পৃ. ৬২-৩।

৪৮। সংরক্ষণের বিষয়টি সম্পর্কে ভারতীয় জনমতের সমীক্ষার জন্যে দ্রষ্টব্য : Bipan Chandra, *The Rise and Growth of Economic Nationalism in India.* (নয়া দিল্লী, ১৯৬৬) অধ্যায় ২,৩,৬।

৪৯। J. M. Maclean, 'Indias Place in an Imperial Federation', *JSA,* ৫২, সংখ্যা ২, ৬৬৫, ১৮ই ডিসেম্বর ১৯০৩, পৃ. ৮১-৯০, এবং প্রবন্ধটির উপর আলোচনা : *ঐ,* পৃ. ৯০-৫।

৫০। ঐ, পৃ. ৮৫।

৫১। Sir Theodore Morison, *The Econimic Transition in India* (লন্ডন, ১৯১১), অধ্যায় ৭। Morison ভারতের দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রুশিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। Keynes গ্রন্থটি রিভিউ করেন *Economic Journal*-এ ২১, সেপ্টেম্বর ১৯১১, পৃ. ৪২৬-৩১)।

৫২। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ না করার নীতি থেকে যে বিচ্যুত হন তার উদাহরণের জন্যে দেখুন : S. Bhattacharya, 'Laissez Faire in India', *The Indian Economic and Social History Review* ২(১), জানুয়ারি ১৯৬৫, পৃ. ১-২২।

৫৩। দ্রষ্টব্য : Fraser, *India Under Curzon and After* পৃ. ৩০৭-৮।

৫৪। ১৯১৬ পর্যন্ত মাদ্রাজে শিল্প দপ্তরের কাজকর্মের বর্ণনার জন্যে দ্রষ্টব্য : *Report of IIC* (PP. 1919, XVII), Appendix J; Pillai, *Economic Conditions in India,* পৃ. ৩১১-১২।

৫৫। উত্তর প্রদেশে শিল্প দপ্তরের কাজকর্মের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার জন্যে দেখুন : *Report of IIC* (PP. 1919, XVII), পৃ. ৬৮-৯। Nawabganj Factory-র ইতিহাস জানার উদ্দেশ্যে দ্রষ্টব্য : *Report of the Indian Sugar Committee* (সিমলা, ১৯২০), পৃ. ২৬৯-২৭৩।

৫৬। K. Tressler, Director of Industries, Madras : 'Industries' in S. Playne (Compiler) and A. Wright (ed.), *Southern India* (লন্ডন, ১৯১৫), পৃ. ৬২৬।

৫৭। Department of Industries, Bombay, *Annual Report, 1917-18,* পৃ. ২।

৫৮। *India Office List for 1920* (লন্ডন, ১৯২০), পৃ. ২১৩ ও ৬৫৪।

৫৯। A. Chatterton, *Note on Industrioal Work in India* (মাদ্রাজ, ১৯০৫), পৃ. ৮। Tressler : 'Industries', পৃ. ৬২২-৪।

৬০। *Evidence (Report of IIC*), Vol. III (PP. 1919, XIX), পৃ. ২৭৬।

৬১। *Department of Industries, Bombay : Annual Report, 1917-18* (বোম্বাই, ১৯১৯), পৃ. ১-২।

৬২। *Idem, Annual Report, 1918-19* (বোম্বাই, ১৯২০), পৃ. ১-২।

৬৩। *Idem, Annual Report, 1920-21* (বোম্বাই, ১৯২১), পৃ. ৩।

৬৪। *Idem, Annual Report, 1921-22* (বোম্বাই, ১৯২২), পৃ. ৪।

৬৫। ১৯২২-৩ সালে কারখানা স্থানান্তরিত হয়েছিল। দ্রষ্টব্য : *Idem, Annual Report, 1922-23* (বোম্বাই, ১৯২৩), পৃ. ৪।

৬৬। *Idem, Annual Report*, 1921-22, পৃ. ৩২-৪

৬৭। *Bombay, 1923-24, a review of the administration of the Presidency* (বোম্বাই, ১৯২৫), পৃ. ৮৫-৬।

৬৮। *Bombay, 1924-25, a review of the administration of the Presidency* (বোম্বাই, ১৯২৬), পৃ. ১০০।

৬৯। *Report of the Department of Industries, Madras, for the year ended 31st March 1924* (মাদ্রাজ, ১৯২৫), পৃ. ৩৩-৪।

৭০। 'নিজের কাজ নিজে করো এবং প্রতিবেশীদের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করো', এই ধরনের উৎসাহী মনোভাব নিয়ে যে সমস্ত কারখানা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল তাদের মধ্যে Coonoor-এ অবস্থিত ফল-সংরক্ষণের কারখানার দৃষ্টান্ত সযত্নে উপস্থাপিত হয়েছে নিম্নোক্ত রিপোর্টে : *Report of the Department of Industries, Madras for the year ended 31st March 1920* (মাদ্রাজ, ১৯২১), পৃ. ২৯ ও ৩০।

৭১। *Report of the Department of Industries, Madras, for the year ended 31st March, 1924* (মাদ্রাজ, ১৯২৫), পৃ. ৬০।

৭২। ১৯৩১ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার যে সমস্ত বৃহদায়তন শিল্পোদ্যোগকে সাহায্য করেছিল তাদের তালিকা দিয়েছেন Soni। কিন্তু এদের মধ্যে কোনো উদ্যোগই সাফল্য লাভ করেনি। দ্রষ্টব্য : Soni, *Indian Industry*, পৃ. ৩৯৫-৬।

৭৩। শিল্পের কেন্দ্রীভবণের প্রবণতার সরকারি স্বীকৃতির দৃষ্টান্তের জন্যে দেখুন : *Report of the Department of Industries, Madras, for the year ending 31st March, 1938* (মাদ্রাজ, ১৯৩৯) পৃ. ১২-১৩। সরকারি নীতি অনুসরণ করে সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্পের (এবং কৃষির) উন্নয়ন সম্ভবপর হয়েছে, এই তথ্যটি সমর্থিত হয়েছে উপরোক্ত রিপোর্টে।

৭৪। উদ্‌ধৃত করেছেন S. Lall, 'Industrial development in the Indian Provinces' *JRSA* ৮৯, সংখ্যা ৪,৫৭৯, জানুয়ারি ২৪ ১৯৪১, পৃ. ১৪২-৩।

৭৫। শিল্পের ক্ষেত্রে প্রদেশ-ভেদে সাফল্য বা তা অর্জনে বিভিন্ন বাধার সংক্ষিপ্ত বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য : Lall, 'Industrial development', পৃ. ১৩৪-৪৫ এবং প্রবন্ধটি সম্পর্কে আলোচনা : *ঐ*, একই খণ্ড ও সংখ্যা, পৃ. ১৪৫-৭।

৭৬। Keynes, *Indian Currency*, পৃ. ২৯।

৭৭। League of Nations (Ragnar Nurkse and William Adams Brown, Jr.), *International Currency Experience* (১৯৪৪), অধ্যায় ২।

৭৮। Keynes, *Indian Currency*, অধ্যায় ৩, পৃ. ৪৩।

৭৯। ১৮৯৮-৯ থেকে ১৯১৩-১৪ পর্যন্ত মূল্যবান ধাতব মুদ্রার আমদানি সম্পর্কে তথ্যের জন্যে দ্রষ্টব্য : Pandit, India's Balance of Indebtedness, পৃ. ৩৪-৫; G. F. Shirras, *Indian Finance and Banking* (লন্ডন, ১৯২০), সারণি ৮-১১।

৮০। Gov. India, Finance Department : *Report of the operations of the Currency Department during the year 1911-12* (কলকাতা, ১৯১২), পৃ. ১৪।

৮১। ঐ, পৃ. ১৪; ১৯১০-১১ পর্যন্ত সাক্ষ্যের জন্যে দেখুন : *idem, Report upon the operations of the Paper Currency Department during the year 1910-11* (কলকাতা, ১৯১১), পৃ. ১২-১৫।

৮২। দ্রষ্টব্য : Keynes, *Indian Currency*, অধ্যায় ৪। দাম বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করেছেন K. L. Dutta, *Report on the enquiry into the rise of prices in*

India, খণ্ড ১, কলকাতা, ১৯১৪, অধ্যায় ৫-৯ এবং 'A Resolution of the Government of India reviewing the Report', একই খণ্ড, PP. i-xiv। দাম বৃদ্ধির কারণ হিসাবে ভারত সরকার দত্তের তুলনায় বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির উপর।

৮৩। প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা আরোপিত বিভিন্ন সুদের হারের তথ্যের জন্যে দ্রষ্টব্য : Reserve Bank of India, *Banking and Monetary Statistics of India* (বোম্বাই, ১৯৫৪) পৃ. ৬৯০-৩।

৮৪। Bank of Madras অনুসৃত ঋণ-দান নীতির জন্যে দ্রষ্টব্য Sir W.B. Hunter-এর Indian Industrial Commission-কে দেওয়া সাক্ষ্য : *Evidence (Report of IIC)*, Vol. III (PP. 1919. XIX), পৃ. ২৭৫-৯৫।

৮৫। সমস্যাটি সম্পর্কে ভারতীয় মতের (কিছুটা আবেগপ্রবণ) জন্যে দেখুন : Shirras, *Indian Finance and Banking*, পৃ. ৩৬৫-৭; S. V. Doraiswami, *Indian Finance, Currency and Banking* (মাদ্রাজ, ১৯১৫), অধ্যায় ৭।

৮৬। স্বাধীনতা-পূর্ববর্তীকালে শিল্পে স্থির মূলধনের দরুন আর্থিক সংস্থানের বিভিন্ন সমস্যা এবং শিল্পে ঋণ সরবরাহকারী বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্যে দ্রষ্টব্য : S. K. Muranjan, *Modern Banking in India* (বোম্বাই, ১৯৪০), পৃ. ৩০৩-৮। Tata Industrial Bank-এর সমস্যার জন্যে জ্ঞাতব্য ঐ ব্যাঙ্কের বার্ষিক সাধারণ সভায় Sir D J. Tata প্রদত্ত ভাষণ : *Capital* (কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯, পৃ. ৪৮৩-৭); এবং Sir Alfred Catterton-এর ভাষণ : *JRSA*, ৭৩, ২৬শে জুন ১৯২৫, পৃ. ৭৪৫। ব্যাঙ্কের পতনের কারণ হিসাবে উল্লেখ্য, ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি হাতে থাকা নগদ ও আমানতের অত্যন্ত কম অনুপাত রক্ষা করত। Keynes-ও এই পরিস্থিতিকে আশংকাজনক মনে করেছিলেন : *Indian Currency*, পৃ. ২২৪-৭।

৮৭। প্রথম বিষয়টির জন্যে দ্রষ্টব্য : Keynes, *Indian Currency*, পৃ. ২১৫-১৬; দ্বিতীয়টির জন্যে R C on Indian Finance and Currency, *Minutes of Evidence*, Vol. I (PP 1914, XX), পৃ. ১৩০-১; এবং একই উৎস : *Appendices to the Interim Report of the Commissioners* (PP. 1914, XX), Appendix XV।

৮৮। Sir Edward Law-এর (Member in charge of Finance, Viceroys Council) পরিমাপ অনুসারে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত ব্যাঙ্কের মূলধনের পরিমাণ ছিল ১০ মিলিয়ন পাউন্ড। বিভিন্ন এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের নিয়োজিত মূলধনের শেয়ারের (যা বিদেশে রাখা হতো) পরিমাণ এই হিসাবটিতে ধরা হয় নি। পরিমাপ অনুযায়ী ঐ উদ্দেশ্যে মূলধনের প্রয়োজন ছিল ১২ মিলিয়ন পাউন্ড। দ্রষ্টব্য : *Statement exhibiting the moral and material progress and condition of India during the year 1901-02, and the nine preceding years* (PP. 1903, XLVI), পৃ. ১৪৬-৮।

৮৯। 'Report of Comitted on Indian Exchange and Currency, 1919' (Babington Smith Committee), Para 8, Gov. India, *Reports of Currency Committees* (কলকাতা, ১৯৩১), পৃ. ২৪০।

৯০। *ঐ*, পৃ. ২৪৪।

৯১। আভ্যন্তরীণ প্রচলনের উদ্দেশ্যে কাগজীমুদ্রা চালু রাখার ক্ষেত্রে সরকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা অতিরিক্ত সাবধানী ছিল এবং Keynes এই দৃষ্টিভঙ্গিকে নিন্দা করেছিলেন। ১৮৩৬ সালে C. N. Cooke (Deputy Secretary and Treasurer of the Bank of Bengal) কাগজী মুদ্রার সপক্ষে মত দেন। তাঁর যুক্তি ছিল এই রকম, রাশিয়া ও জাভার নিরক্ষর জনসাধারণ কাগজী মুদ্রা যথেষ্ট ব্যবহার করে এবং Bank of Bengal প্রচলিত নোটের বিস্তৃত প্রচলন ছিল, শুধুমাত্র কলকাতাতেই নয় বারাণসীর মতো সুদূর অঞ্চলেও। C. N. Cooke, *The Rise,Progress and Present Conditions of Banking in India* (কলকাতা, ১৮৬৩), পৃ. ৩৭।

৯২। 'Report of the Committee on Indian Exchange and Currency 1919', para 18, Gov India, *Reports of Currency Committees*, পৃ. ২৪৬-৭।

৯৩। *ঐ*, পৃ. ২৫০-১।

৯৪। RC on Indian Currency and Finance, Vol. I, *Report* (লন্ডন, ১৯২৬), Para. 176 (p.68)।

৯৫। ১৯১৪ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত মুদ্রা-ব্যবস্থার সমস্যা পর্যালোচনাব জন্যে দ্রষ্টব্য : Ray, *Indian Foreign Trade since 1870*, অধ্যায় ৫,৬ ও ৯, Anstey, *Economic Development of India*, পৃ. ৪০৯-৩২।

৯৬। RC on Indian Currency and Finance, Vol. I, *Report* (লন্ডন, ১৯২৬), পৃ. ১২০-৪৪। Sri Maneckji Byramji Dadabhoy আরও একজন ভারতীয় সভ্য। তিনি ছিলেন শিল্পপতি, কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ভাইসরয় কাউনসিলের অতিরিক্ত সভ্য হিসাবে তাঁর যোগাযোগ ছিল সরকারের সঙ্গে। তাঁর কর্মজীবন প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : *Debratt's Peerage*, ১৯৩০, পৃ. ২৭৮।

৯৭। দ্রষ্টব্য Sir J.C. Coyajee, 'Money Reconstruction in India (1925-7)'*Annals of the American Academy of Political and Social Science*, খণ্ড ১৪৫, অংশ ২, ১৯২৯, পৃ. ১০১-১৪, বিশেষত পৃ. ১০৬-৮।

৯৮। Reserve Bank of India, *Banking and Monetary Statistics of India*, পৃ. ৬৫৭।

৯৯। দ্রষ্টব্য : Appendix 98, 'Extracts etc., from telegraphic correspondence between the Secretary of State for India and the Government of India, Finance Department,' RC on Indian Currency and Finance, Vol. III, *Appendices* (লন্ডন, ১৯২৬), পৃ. ৬২৪-৩০।

১০০। Reserve Bank of India, *Banking and Monetary Statistics of India*, পৃ. ৭।

১০১। উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য : RC on Indian Currency and Finance, Vol. I, *Report* (লন্ডন, ১৯২৬), পৃ. ৮১-৩।

১০২। Reserve Bank of India, *Banking and Monetary Statistics of India*, পৃ. ৬৯৩।

১০৩। *ঐ*, পৃ. ৭১৬।

১০৪। Bengal National Chamber of Commerce and Industry, *Report of the Committee for the year 1932* (কলকাতা, ১৯৩৩) (৬) পৃ. ৪০৫-৬ (ভাষণ : Kumar S. N. Law, Chairman, first quarterly general meeting)

১০৫। এই গ্রন্থের সারণি ৩.১, পৃ. ৭১।

১০৬। N. G. Hunt, 'Banks and the Indian Cotton Industry', *The Indian Textile Journal Jubilee Souvenir, 1890-1940* বোম্বাই, ১৯৪১), পৃ. ৩৯ ও ২৩৩। আরও দ্রষ্টব্য : ITB, Special Tariff Board, *Written Evidence recorded during enquiry regarding the level of duties necessary to afford adequate protection to the Indian Cotton textile industry*, খণ্ড ২ (দিল্লী, ১৯৩৭), পৃ. ৩১১, স্পেশ্যাল ট্যারিফ বোর্ডের উদ্দেশ্যে ইমপিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া লিখিত বিধি (১৬ই জানুয়ারি, ১৯৩৬) : '১৯৩৪-এ পাশ-করা সংশোধনী আইনটি ভারতীয় সুতিবস্ত্র উৎপাদনকারী মিলগুলিকে আমাদের ঋণ-প্রদানের ক্ষমতার উপর পূর্বে আরোপিত নিয়ন্ত্রণের মাত্রা যথেষ্ট পরিমাণে অপসারণ করেনি। ....আমরা এখন প্রস্তুত থাকব ঐ মিলগুলিকে তাদের হস্তান্তরযোগ্য ডিবেঞ্চারের ভিত্তিতে স্বল্পকালীন ঋণ প্রদানে, কিন্তু এখনও আমরা চাইছি আইনসঙ্গত পদ্ধতি অনুসরণ করে শেয়ারের জামিনের ভিত্তিতে ঋণ প্রদানে। দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুযায়ী আমাদের প্রদেয় ঋণের মার্জিন থাকবে ২৫ শতাংশ, কিন্তু আমরা বিশেষ পরিস্থিতিতে মার্জিনের পরিমাণ হ্রাসের বিষয়টি বিবেচনায় সব সময়ে প্রস্তুত।

১০৭। বিশের ও তিরিশের দশকে অনুসৃত ভারতের অর্থ ও রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় সংক্রান্ত নীতির বিভিন্ন দিকের বিশ্লেষণী আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য : Radhakamal Mukherjee and H. L. Dey (eds.), *Economic Problems of Modern India*, খণ্ড ২ (লন্ডন, ১৯৪১), অধ্যায় ২৭, ২৯, ৩০, ৩২ ও ৩৫। দ্রষ্টব্য Muranjan, *Modern Banking* অধ্যায় ৪ এবং ৮।

১০৮। দ্রষ্টব্য : Muranjan, *Modern Banking*, পৃ. ৩০৬-৭; এবং এই গ্রন্থের অনুচ্ছেদ ২.৫-এ উল্লিখিত নজিরাদি।

অনুবাদক : মনোজ কুমার সান্যাল ও নবকিশোর সাহা

৩

ভারতের শিল্পক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগের বিবরণ ১৯০০-১৯৩৯

এই অধ্যায়ের মূল বিষয় হলো, ভাবতে বৃহৎ শিল্পে ব্যক্তিগত বিনিযোগের সামগ্রিক ইতিহাসেব অনুসন্ধান। সেই সঙ্গে জাতীয় উৎপাদন বিন্যাসের পরিবর্তন ও তার উপর বর্হির্দেশীয় ঘটনাবলীব প্রভাবও এ পরিচ্ছেদে আলোচিত হবে। খনি ও বাগিচা শিল্পে বিনিযোগের প্রশ্নটি অবশ্য এই আলোচনা থেকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া দেশেব বৃহৎ শিল্পে বিনিয়োগের গতিপ্রকৃতিই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়, ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগ নয়। অবশ্য বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে কোনো বিভেদরেখা কঠোরভাবে অনুসৃত হয় নি কাবণ অনেক ক্ষেত্রেই প্রাপ্ত পরিসংখ্যান এই ধরনের বিভাজন মেনে চলার পক্ষে যথেষ্ট পর্যাপ্ত নয়।

আলোচ্য পর্বের শুরুতে এ দেশে ছিল মাত্র দুটি বড় মাপেব শিল্প,—সুতিবস্ত্র ও পাট শিল্প—এই দুই শিল্পেই ২০০০০ এব বেশি লোক নিযুক্ত ছিল। এই পর্বেব শেষ ভাগে বৃহৎ শিল্পেব তালিকায যুক্ত হযেছে আবও কয়েকটি নাম। এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য লোহা ও ইস্পাত, চিনি এবং সিমেন্ট। এই শতাব্দীব দ্বিতীয় দশকেব শেষ বছ্বগুলি পর্যন্ত ভাবতের শিল্পক্ষেত্রে প্রাধান্য ছিল মূলত সুতিবস্ত্র ও পাট শিল্পেরই। এমনকি পঞ্চাশের দশকেও এই প্রাধান্য বজায় ছিল যদিও তা আগের চেয়ে স্তিমিত হয়ে এসেছিল। উৎপাদনেব অন্যান্য ক্ষেত্রে নানা গুরুত্বপূর্ণ শিল্প এই সময়ে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল।

শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির বিভিন্ন কার্যকলাপের উপর পরিসংখ্যান যখন সুসংবদ্ধভাবে সংগ্রহ করা হয় তখনও সেগুলিতে বিনিযোগের পরিমাপ করা জটিল হয়ে দাঁড়ায়।[১] শিল্প সংস্থাগুলির মূলধনের বিভিন্ন উপাদানের দামের পরিবর্তন, পণ্য সাধারণের মূলস্তবের পরিবর্তন এবং সুদের হারের ওঠানামা—এগুলি থেকেই বিনিয়োগ পরিমাপের সমস্যার উদ্ভব হয়। ভারতের ক্ষেত্রে আলোচ্য পর্বে এই সমস্যা আরও দুরূহ হয়ে উঠেছে কারণ *ইনভেস্টর্স ইন্ডিয়া ইয়ার বুক (I I Y B)* প্রকাশিত হওয়ার আগে পর্যন্ত অধিকাংশ শিল্পের পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা খুবই শক্ত। তাছাড়া *I I Y B*-তেও সব শিল্পের তথ্য প্রকাশিত হতো না। কলকাতায় যে সব কোম্পানির সদর দপ্তর ছিল বা কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জে সেসব কোম্পানির শেয়ারের দর নথিভুক্ত হতো, একমাত্র সেসব কোম্পানির পরিসংখ্যান *I I Y B*-তে পাওয়া যেত। ফলে সুতিবস্ত্র শিল্প সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য এতে থাকত না। ভারত সরকারের বার্ষিক পরিসংখ্যানের সংক্ষিপ্তসার (স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাবস্ট্র্যাক্ট) থেকে বিভিন্ন কোম্পানির পেইড্-আপ ক্যাপিটাল, কখনও কখনও বা অথরাইজ্‌ড ক্যাপিটাল সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু পেইড্-আপ ক্যাপিটালের পরিমাণ থেকে বিভিন্ন শিল্পের স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ সম্পর্কে প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায় না। তাছাড়া, সবকারি পরিসংখ্যানের পেইড্-আপ ক্যাপিটালের যোগফল থেকে যৌথ

মূলধন কোম্পানির মোট মূলধনের সবসময় হিসাব পাওয়া যেত না আর তাছাড়া ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থার মূলধন এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতো না। সুতরাং কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সরকারি *I I Y B*-র পরিসংখ্যান থেকে শিল্পে বিনিয়োগের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য ছবি পাওয়া যায় না।

এই সমস্ত ত্রুটির কথা মনে রেখে আমি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি আমদানি সংক্রান্ত তথ্যকে নিশ্চল (fixed) পুঁজি নির্মাণে বিনিয়োগের সূচক হিসাবে ব্যবহার করেছি। এই সব তথ্যও অনেক ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ, সেসব ক্ষেত্রে আমাকে অনুমানভিত্তিক হিসাব করতে হয়েছে। মোট বিনিয়োগের সূচক হিসাবে এই হিসাব স্পষ্টতই ত্রুটিহীন নয়—যেমন, দামের ওঠাপড়ার সঙ্গে এই সূচকের সামঞ্জস্য খুবই মোটাদাগের হিসাবে রাখা যায়। তাছাড়া, উৎপাদন প্রক্রিয়ার গুণগত পরিবর্তনের সঙ্গে এই সূচকের সঙ্গতিপূর্ণ পরিবর্তন করার উপায় নেই ; নতুন এবং ব্যবহৃত পুরনো যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগেব মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করাও এই পদ্ধতিতে সম্ভব নয়। কিন্তু আলোচ্য পর্বের শেষ পর্যন্ত সুতিবস্ত্র এবং পাট—এই দুটি শিল্পে উৎপাদন পদ্ধতির মৌলিক পরিবর্তন খুব সামান্যই ঘটেছিল। ভাবতে অল্পবিস্তর গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য শিল্পেও উৎপাদন পদ্ধতিতে এই সময় কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে নি। এই পবিচ্ছেদে যেখানে সম্ভব সেখানে মূলধন কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। এখানে একথাও স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন যে যদিও আমরা কেবলমাত্র নিশ্চল মূলধন গঠনে মোট বিনিয়োগ কত সেই প্রশ্ন বিবেচনা করছি কিন্তু কোম্পানির উৎপাদন সামগ্রী বা উৎপাদিত পণ্য মজুতেব খাতে যে লগ্নী দরকার হয় তার গুরুত্ব অস্বীকার করা হচ্ছে না। নিয়ত চলমান মূলধনের লগ্নীব ওঠানামার হিসাব বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে সেই শ্রেণীর বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য আবও বেশি দুষ্প্রাপ্য। তাছাড়া নিয়ত চলমান (Working) উৎপাদন সামগ্রীর লগ্নীব হিসাব মূল্যস্তব পরিবর্তনেব সঙ্গে সঙ্গে বদলায আর সেই মূল্য অনেকখানি ঋতুভেদ বা ক্ষণস্থায়ী প্রভাবে প্রভাবিত হয়। মূল্যমাত্র পরিবর্তন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান এত নিখুঁতভাবে পাওয়া যায় না যাতে সেগুলির মধ্য থেকে ঋতুগত, বাণিজ্যচক্রজনিত এবং দীর্ঘকালীন উপাদান পরিষ্কার ছেঁকে বের করে ফেলা যায়।

আলোচনার সুবিধার জন্য এই পরিচ্ছেদে আলোচিত সময় কালকে আমরা দুটি পর্বে ভাগ করে নেব—(ক) ১৯১৪ পর্যন্ত একটি পর্ব এবং (খ) ১৯১৫ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত আর একটি পর্ব।

৩.১ ১৯১৪ সাল পর্যন্ত শিল্পে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ

উনিশ শতকের শেষ বছরগুলিতে ভারতে দুটি বিধ্বংসী দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। একটি ১৮৯৬-৯৭ এবং অন্যটি ১৮৯৯-১৯০০ সালে। এই দুটি দুর্ভিক্ষের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মহামারী প্লেগের আক্রমণ যার ফলে কার্পাসবস্ত্র শিল্পের অগ্রগতি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, বিশেষ করে বোম্বাই ও সন্নিহিত অঞ্চলে। ১৮৯৬ সালে যেখানে নয়টি নতুন মিল চালু হয়েছিল সেখানে ১৯০০ থেকে ১৯০৪—এই কয় বছরে একটিও নতুন কারখানা গড়ে ওঠে নি।[২] কিন্তু প্লেগ ও দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া দেশের সমস্ত জায়গায় সমানভাবে পৌঁছয় নি। আমেদাবাদ, যুক্তপ্রদেশ, বাংলা ও

মাদ্রাজ, ইত্যাদি কয়েকটি শিল্পকেন্দ্রে অগ্রগতি ঘটছিল আগের মতোই। তাছাড়া বোম্বাই-এর তুলোকলগুলির ভাগ্য শুধুমাত্র দুর্ভিক্ষের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বললে ভুল হবে; এই শিল্পে, বিশেষ করে সুতো উৎপাদনের ক্ষেত্রে মন্দভাগ্যের সূচনা হয়েছিল চীনের বাজারে সুতোর প্রাচুর্য এবং চীন ও জাপানের মিলগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে।

সে তুলনায় বাংলার পাটশিল্পের উপর এই দুটি দুর্ভিক্ষের প্রভাব খুব সামান্যই পড়েছিল। এর কারণ বোম্বাই ও বাংলা প্রেসিডেন্সির এলাকাগুলিতে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ও তীব্রতা ছিল ভিন্ন ধরনের। যেমন, বাংলা প্রেসিডেন্সির এলাকায় দুর্ভিক্ষের বছরে আমন ধানের ফলন ছিল স্বাভাবিকের তুলনায় শতকরা ৫ ভাগ কম, ভাদই ও রবি ধানের ফলন ছিল স্বাভাবিকের থেকে যথাক্রমে শতকরা ৩০ ও ১৩ ভাগ কম।[৩] কিন্তু বোম্বাই প্রেসিডেন্সি অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের ফলে ফসল হানি ঘটেছিল অনেক বেশি—১৮৯৯-১৯০০ এই বছরে আগের বছরের তুলনায় (যা ফলনের বিচারে ছিল স্বাভাবিক) আমন ও রবি দুটি ফসলের উৎপাদন ভীষণভাবে কমে গিয়েছিল—পাঁচমহল জেলায় ফলন ছিল স্বাভাবিকের শতকরা ৯০ ভাগের কম এবং কোলাবায় শতকরা ৫২.৪ ভাগের কম।[৪] দুর্ভিক্ষের ফলে বোম্বাইয়ে তুলোর চাষ দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কিন্তু বাংলায় পাটের চাষ সেভাবে হয় নি। তাছাড়া দুটি শিল্পের মধ্যে আরও একটি বড় পার্থক্য ছিল—তা হলো তাদের বাজারের পার্থক্য। পাটশিল্পের উৎপাদিত সামগ্রীর সিংহভাগ চলে যেত বিদেশের বাজারে, তুলোকল শিল্পের বাজার ছিল মূলত আভ্যন্তরীণ। একথা অবশ্য ঠিক যে বোম্বাইয়ে উৎপন্ন সুতোর একটি বড় অংশ বিদেশে বিক্রি হতো কিন্তু ইতিমধ্যেই বোম্বাইয়ের মিলগুলিতে উৎপাদনের ধরন বদল হতে শুরু করেছিল—সেখানে সুতোর পরিবর্তে সুতিকাপড়ের উৎপাদন বাড়ছিল। বোম্বাই ছাড়া অন্যান্য কেন্দ্রগুলিতে অবশ্য দেশীয় বাজারের দিকে তাকিয়েই উৎপাদন হতো।

এই পর্বে শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ কতটা দীর্ঘকালীন প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিল অথবা কতটা দেশীয় বাজারের প্রভাব তার উপর পড়েছিল তা বিচার করা খুবই শক্ত। বস্ত্রশিল্পে বিনিয়োগ যে ক্ষণস্থায়ী ঘটনাবলীর দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হতো তার অনেক নজির আছে। যেমন চীনের বাজারে সুতোর চাহিদা হঠাৎই বেড়ে যাওয়ায় মিলগুলোতে মাকুর সংখ্যা বাড়িয়ে উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা হয়েছিল—যদিও একথা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে চীনে যেভাবে সুতোর কল গড়ে উঠছে বা জাপান যেভাবে তুলোশিল্পে আন্তর্জাতিক বাজারে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে উঠে আসছে তার ফলে ভারত থেকে সুতো রপ্তানীর ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল নয়। অবশ্য প্রায় একই সময়ে ভারতীয় মিলগুলিতে বস্ত্র বয়নের ক্ষমতা সুতো তৈরির ক্ষমতার তুলনায় কয়েকগুণ গতিতে বেড়ে উঠছিল। তাছাড়া সূক্ষ্ম কাউন্টের সুতো এদেশেও উৎপন্ন হচ্ছিল এবং এ জাতীয় সুতো থেকে তৈরি মিহি ও রঙীন কাপড় উৎপাদনে বোম্বাই অগ্রণী ছিল। কিন্তু ভারতের বাজারে উন্নত মানের বস্ত্রের বেশির ভাগ যোগান তখনও আসত ল্যাংকাশায়ার থেকে।[৫]

একই ভাবে ভারতের শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের উপর জাতীয় ও স্থানীয় ঘটনার প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। ভারতে উন্নতও সূক্ষ্মমানের সুতিকাপড়ের উৎপাদনের অন্যতম বাধা ছিল এখানকার উৎপন্ন তুলোর নিচু মান। বিশ শতকের শুরুতে যে তুলো এখানে উৎপন্ন হতো তার প্রায় সবটাই ছিল ছোট আঁশ বিশিষ্ট। তাছাড়া বোম্বাইয়ের মিল মালিকরা বোম্বাই থেকে দূরবর্তী দেশীয় বাজারের সম্পর্কে আশ্চর্যজনকভাবে অজ্ঞ ছিলেন।[৬] তবে দেশে রেল

যোগাযোগ বেড়ে ওঠার সাথে সাথে এবং মোটা সুতো ও মোটা কাপড় উৎপাদনে ভারতীয় মিলগুলির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুতিবস্ত্রের চাহিদা ও যোগানে এতদ্দেশীয় শিল্প যে নিজে জায়গা করে নিচ্ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ৩.১ নং সারণি এ বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করবে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কথা এই যে বোম্বাই যদিও বস্ত্রশিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল তবুও বোম্বাই এবং করাচিতে সুতো ও সুতিকাপড়ের আমদানি দেশের অন্য দুটি প্রধান বন্দরের তুলনায় অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে বোম্বাই শুধুমাত্র পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের চাহিদা মেটাত এই তত্ত্বে সংশয় জাগে। বরং সুতিবস্ত্রের চাহিদা ও যোগানের যে একটা সর্বভারতীয় কাঠামো গড়ে উঠেছিল সে বিষযে আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করে।[৭] তুলো-কাপড়ের তুলনায় সুতো ও নাচিসুতোর (twist) আমদানি এই শতাব্দীব প্রথম তের চোদ্দ বছরে বেশি দ্রুতহারে বাড়ছিল। তার কারণ হলো এই পর্বের গোড়াতেই অর্থাৎ গত শতাব্দীর শেষে দুর্ভিক্ষে হস্ত-চালিত তাঁতগুলি—যেগুলি ছিল মিলে তৈরি সুতোব প্রধান ক্রেতা—বেশিরকম মাব খেয়ে ছিল। আর অন্যদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে দেশে যে সমৃদ্ধির সূচনা হয়েছিল তার ফলে

সারণি ৩.১ বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সুতিকাপড়, ট্যুইস্ট এবং সুতো আমদানি

	১৯০১-২ থেকে ১৯০৩-৪ পর্যন্ত মোট আমদানি (হাজার টাকায়)			১৯১১-১২ থেকে ১৯১৩-১৪ পর্যন্ত মোট আমদানি (হাজাব টাকায়)			প্রথম পর্বেব তুলনায় দ্বিতীয় পর্বে পরিবর্তনের শতকরা হিসাব (%)		
	বাংলা	বোম্বাই ও সিন্ধুপ্রদেশ	মাদ্রাজ	বাংলা	বোম্বাই ও সিন্ধুপ্রদেশ	মাদ্রাজ	বাংলা	বোম্বাই ও সিন্ধুপ্রদেশ	মাদ্রাজ
সুতোব ট্যুইষ্ট ও সুতো									
সুতি	১৯,০৮৫	১৭,৭০৯	২১,৮২৫	৩১,৮৬০	৪৭,৮৩৫	৩৩,৮৭০	+৬৭	+১৭০	+৫৫
কাপড়	৪৪০,১৮৩	২৯৮,১৪১	৬২,৫৫১	৭৭৪,৭৩৫	৫৯১,৯৪৫	১০৮,২২৫	+৬৯	+৯৯	+৭৩

উৎস : ভারত সরকার, *CISD : Annual statement of the seaborne trade of British India.*

সূক্ষ্ম ও উন্নত মানের কাপড়ের চাহিদা বেড়ে গিয়েছিল। উপরোক্ত সারণি থেকে এটাও স্পষ্ট যে আগের তুলনায় দেশে সুতোর চাহিদার একটা বড় অংশ পূরণ করছিল মাদ্রাজের মিলগুলি।[৮]

পাটশিল্পে বিনিয়োগের ইতিহাস এক নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতির সাক্ষ্য দেয়। ১৮৯৬ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে ৯টি নতুন পাটকল স্থাপিত হয়। তারপর কোনো নতুন মিল স্থাপিত হয় নি কিন্তু চালু মিলগুলির উৎপাদনক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং হয়েছিল। চার বছর পর আরও ৯টি নতুন চটকল তৈরি হয়েছিল। ১৯১০ থেকে ১৯১২—এই ক' বছরে চট শিল্পের ধারাবাহিক শ্রীবৃদ্ধিতে সাময়িক ছেদ ঘটলেও ১৯১০ থেকে ১৯১৪-এর মধ্যে আরও তিনটি পাটকল গড়ে উঠল।[৯] বস্ত্রশিল্পের তুলনায় পাটশিল্পে নিযুক্ত তাঁত ও মাকুর সংখ্যা অনেক বেশি দ্রুতহারে বেড়েছিল। পাটশিল্পে আরও একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়—এসময় বস্তা উৎপাদনের চেয়ে চট উৎপাদনের দিকে ঝোঁক বেশি দেখা যাচ্ছিল। পাটশিল্পের এই প্রসারের পেছনে মূল তাগিদ এসেছিল রপ্তানি বাজারের দিক থেকে। নতুন গড়ে ওঠা পাটকলগুলির সিংহভাগের মালিকানা

ছিল ব্রিটিশ শিল্পপতিদের হাতে। তাছাড়া এই পর্বেই দেখা গেল যে বার্ড অ্যান্ড কোং, অ্যানড্রু ইউল অ্যান্ড কোং প্রমুখ ম্যানেজিং এজেন্টগুলি অনেক বেশি শক্তিশালী ও সুসংবদ্ধ হয়ে উঠছে। ম্যানেজিং এজেন্টদের মধ্যে নতুন কোনো নাম এসময় পাওয়া যায় না বললেই চলে বরং ১৯১০-১২-এর সংকটের সময় দুর্বলতর কিছু প্রতিষ্ঠানের অবলুপ্তি ঘটেছিল।

এই পর্বে প্রযুক্তিগত যে উন্নতি বিদেশে ঘটেছিল তার ফলে ভারতে কাগজ শিল্পের অবস্থা খারাপ হয়েছিল। ইয়োরোপে কাঠের মণ্ড থেকে কাগজ উৎপাদনের পদ্ধতি চালু হওয়ার পর ভারতে কাগজ শিল্পের বিকাশের গতি অনেক শ্লথ হয়ে পড়ল। ১৮৯৯ থেকে ১৯১৩—এই ১৫ বছরে ভারতে তৈরি কাগজেব মূল্য ৬ ২৪১ মিলিয়ন টাকা থেকে বেড়ে ৮.০৩৭ মিলিয়ন টাকায় গিয়ে দাঁড়ায়।[১০] কিন্তু এ সময়ে ভারতে আমদানি কাগজ ও পেস্ট বোর্ডের মূল্য বহু গুণ বৃদ্ধি পেল—১৮৯৯-এ ৪.১১৩ মিলিয়ন টাকা থেকে ১৯১২-১৩-তে তা হলো ১৪.৯৬৭ মিলিয়ন এবং ১৯১৩-১৪-য় ১৬.৬৮৩ মিলিয়ন টাকা। এই সময়ে কাগজ শিল্পে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ বা সামগ্রিক কোনো অগ্রগতি ঘটে নি। তবে এই শিল্প আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতো যদি না তার উৎপাদনের একটি অংশ সরকার কিনত।[১১] ১৮৯২-৯৩ থেকে শুরু করে ভারতে চিনি—মাঝের দু-এক বছর বাদ দিলে—আমদানির পরিমাণ ক্রমাগত বেড়েই চলছিল। কুড়ি বছবেব মধ্যে চিনি আমদানির পরিমাণ প্রায় সাতগুণ বেড়ে গিয়েছিল। এর প্রধান কারণ ছিল অস্ট্রিয়া প্রভৃতি ইয়োরোপীয় দেশে বীটের উৎপাদন এবং জাভা, মরিশাস প্রভৃতি দেশে আখের উৎপাদনে এবং তা থেকে চিনি তৈবির কৌশলগত উন্নতি। আলোচ্য পর্বেব শেষদিকে দেশের সম্পন্ন শ্রেণীর মানুষের আয় বেড়ে যাওয়ায় গুড়ের তুলনায় চিনিব চাহিদা বেড়েছিল এবং ফলে তাতেও আমদানির প্রবাহ বেগবতী হয়েছিল। বিদেশের বাজার থেকে চিনি আমদানির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিয়ে দেশে চিনি শিল্প গডে ওঠার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল।[১২]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত ভারতের অর্থব্যবস্থা ছিল মূলত মুক্ত বাজারের অর্থব্যবস্থা। অত্যল্প কয়েকটি আমদানি দ্রব্যেব উপর খুব কম হারে আমদানি শুল্ক বসানো হতো যা প্রধানত ব্রিটেনের স্বার্থকেই পুষ্ট করত। পাশাপাশি ভারত থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল অবাধে রপ্তানি হতো। এর ফলে ব্রিটেনকে কেন্দ্র করে যে *স্টার্লিং এলাকা* গড়ে উঠেছিল, তার ভাণ্ডারে ভারত মূল্যবান ডলারেব যোগান দিয়ে যেত।[১৩] পাট, চা এবং কয়লা শিল্পে—যেগুলিতে ব্রিটিশ মালিকানাই ছিল প্রধান—যে বিনিয়োগ হচ্ছিল তার পেছনে কাজ করছিল ক্রমবর্ধমান রপ্তানি বাজারের প্রেরণা। ১৯০০ থেকে ১৯১৩—এই সময়ের মধ্যে ভারতের মোট আমদানি ও রপ্তানি দুটোই বেড়ে গিয়েছিল শতকরা ১০০ ভাগেরও বেশি এবং বিনিময় হারও ভারতের অনুকূলে উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে গিয়েছিল।[১৪] এই সময়কালে মাত্র একবারই ধারাবাহিক অগ্রগতিতে ছেদ এসেছিল—এবং তা হয়েছিল ১৯০৮-৯ সালের খারাপ মৌসুমী আবহাওয়ার বছরে যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পৃথিবীব্যাপী মন্দার প্রভাব। এই সময়ে ভারতে বৈদেশিক মূলধনেরও যথেষ্ট অনুপ্রবেশ ঘটেছিল এবং তা এসেছিল রেলপথ নির্মাণ ও অন্যান্য সামাজিক মূলধন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সরকারি বিনিয়োগের খাতে।[১৫]

এই সময়ে ভারতের জাতীয় আয়ের বা সাধারণ ভারতীয়ের ক্রয়-ক্ষমতার বৃদ্ধি কতটা হয়েছিল তা বিচার করা শক্ত। যে পর্বের ইতিহাস নিয়ে আমরা এখন অনুসন্ধান করছি, সে সময়ের কিছু শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন এবং সরকারি কর্মনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত আয়ের তথ্য ছাড়া আর কোনো নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। কৃষি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ

করা হতো ঠিকই কিন্তু বছরে বছরে পরিসংখ্যানের বিষয়বস্তু বদলে যেত এমনকি কোনো কোনো বছরের সংগৃহীত তথ্য একেবারেই নির্ভরযোগ্য ছিল না। অবশ্য অনেক বছরের পরিসংখ্যান থেকে একটা দীর্ঘকালীন প্রবণতা অনুমান করা সম্ভব। যাই হোক, পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের যে তথ্য পাওয়া যায় যথা, যন্ত্রচালিত শিল্প, বাগিচা শিল্প, খনি এবং কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদিত দ্রব্য সংক্রান্ত তথ্য তা দিয়ে আমরা আমাদের বিশ্লেষণ শুরু করতে পারি। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের কৃষি উৎপাদন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সযত্নে সংগ্রহ করেছেন জর্জ ব্লিন।[১৬] তাছাড়াও সারা ভারতের কৃষি উৎপাদন বিষয়ে এস. শিবসুব্রামনিয়ন সংকলিত তথ্যও আছে।[১৭] উৎপাদনের এই সমস্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করেই ভারতের জাতীয় আয়ের দুটি হিসাব প্রস্তুত করেছেন এস. জে. প্যাটেল[১৮] এবং এস. শিবসুব্রানিয়ন।[১৯]

ব্লিনের গবেষণা থেকে জানা যায় যে ১৯০৭-৮ সালে মোট খাদ্যশস্যের যোগান (হাজার টনের ইউনিটে প্রকাশিত) উল্লেখযোগ্য হারে কমে গিয়েছিল। এমনকি দুর্ভিক্ষের বছর ১৮৯৯-১৯০০ সালের থেকেও তা কমে গিয়েছিল, যদিও তা ১৮৯৬-৯৭-এর উৎপাদনের থেকে উপরে ছিল। ১৯০৪-৫ এবং ১৯০৫-৬ সালেও খাদ্যশস্যের মোট যোগানের পরিমাণ কম ছিল। অবশ্য এই বছরগুলিতেও ভারত থেকে খাদ্যশস্যের রপ্তানি হচ্ছিল।[২০] শিবসুব্রামনিয়নের অনুসন্ধান (১৯৬০) থেকে দেখা যায় যে খাদ্যশস্যের মোট মূল্য (১৯৩৮-৩৯ এর দাম স্তরে) ১৯০৪-৫ থেকে ১৯০৮-৯—এই কয় বছরে কমে গিয়েছিল এবং ১৯০৮-৯-এ তা নিম্নতম সীমায় গিয়ে পৌঁছেছিল। ভারতে মূল্যস্তর বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধানে কে. এল. দত্ত তাঁর অবিস্মরণীয় গবেষণায়[২১] যে সিদ্ধান্তে এসেছেন তার মধ্যে অনেক সত্যতা আছে তা উপরের তথ্যগুলি থেকে প্রমাণিত হচ্ছে। অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে খাদ্যশস্যের চাহিদা বৃদ্ধির তুলনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদনে ঘাটতি মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ। খাদ্যশস্যের উৎপাদন কোনো কোনো বছরে যদি বা জনসংখ্যা বৃদ্ধির (১৯০১-১১ এই দশকে শতকরা ৬ হারে বেড়েছিল)[২২] হারের তুলনায় বেড়েছিল খাদ্যশস্যের ক্রমাগত ঘাটতির ফলে দামের উপর একটি ঊর্ধ্বমুখী চাপ অব্যাহত ছিল এবং এর ফলে বিভিন্ন সময়ে খাদ্যশস্যের দাম কমে এক নিম্ন সীমার নিচে যেতে পারছিল না। মূল্যস্তর বৃদ্ধির আর একটি কারণ ছিল রপ্তানি পণ্যের দাম বৃদ্ধি এবং বিপুল পরিমাণে সরকারি বিনিয়োগ। মূল্যবৃদ্ধির ফলে যেহেতু দরিদ্রতর অংশের মানুষ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, সেহেতু তাদের ক্রয়ক্ষমতাও আনুপাতিক হারে কমে গিয়েছিল।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের নাম ও প্রকৃত মজুরির বিস্তৃত পরিসংখ্যান কে-এল-দত্ত প্রস্তুত করেছেন। ('প্রকৃত' মজুরি নির্ণীত হয় টাকার অঙ্কে মজুরি দিয়ে কতটা ভোগ্যদ্রব্য কেনা যাবে তার সূচক দিয়ে)। তাঁর হিসাবে, কলকাতার চটকলগুলির শ্রমিকদের গড় প্রকৃত মজুরির সূচক ১৮৯০-এ ১০১ থেকে বেড়ে ১৯০৪-এ ১১৬ হয়েছিল এবং ১৯০৪-এ তা আরও বেড়ে হলো ১১৯। কিন্তু ১৯১২ সালে মজুরিসূচক কমে হয়েছিল ১০৭। অন্যদিকে বোম্বাইয়ের সুতিবস্ত্র শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের গড় প্রকৃত মজুরির সূচক ১৮৯০-এ যেখানে ছিল ১০৫, সেখানে ১৯০০ সালে তা কমে হলো ৯১ এবং পরে বেড়ে হলো ৯৮।[২৩] সাম্প্রতিক কালে অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন মুখোপাধ্যায় সুতি ও পাট শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি বিষয়ে যে তথ্য প্রস্তুত করেছেন তার সঙ্গে উপরোক্ত তথ্যের যথেষ্ট সঙ্গতি আছে। বর্তমান গ্রন্থের পঞ্চম পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। অবশ্য কে. এল. দত্তের হিসাব থেকে দেখা যায় যে অসংগঠিত শিল্পের শ্রমিকদের যথা কারিগর,

কাঠমিস্ত্রী, রাজমিস্ত্রী, কামার ইত্যাদি—এদের প্রকৃত মজুরি সংগঠিত শিল্পের প্রকৃত মজুরির তুলনায় অনেক বেশি বেড়েছিল।[২৪] মনে হয় যে কামার, ছুতোর বা সাধারণ শ্রমিকদের মজুরি ১৯০৫ থেকে ১৯০৮—এই কয় বছরে সরকারি ব্যয়ের আকস্মিক বৃদ্ধির[২৫] ফলে উর্ধ্বমুখী হয়ে থাকতে পারে, তাছাড়া আধা দক্ষ শ্রমিকের ঘাটতি তো ছিলই। সংগঠিত শিল্পের শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরির তথ্য বিশ্লেষণ করলে অনুমান হয় যে সাধারণ শিল্পশ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানে মাঝারি গোছের উন্নতি ঘটেছিল।

অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রে আরও কিছু গোষ্ঠী ছিল যারা কাঁচা পাট, কাঁচা তুলো, তৈলবীজ, ইত্যাদি পণ্যের ক্রমবর্ধমান রপ্তানি ও মূল্যস্তরের উর্ধ্বগতির ফলে উপকৃত হয়েছিল। আবার আরও কিছু গোষ্ঠী পাটশিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি এবং নির্মাণকার্যের ব্যাপকতার ফলে লাভবান হয়েছিল। সুতিবস্ত্র ও পাট কলগুলিতে নতুন বিনিয়োগের পরোক্ষ ফলও অনুভূত হচ্ছিল। সুরেন্দ্র প্যাটেল যে পরিসংখ্যান তৈরি করেছেন তাতে দেখা যায় যে, ১৯০৫ থেকে ১৯১৫ এই দশকে পূর্ববর্তী দশকের তুলনায় মাথাপিছু আয়ের স্তরে খুব সামান্যই উন্নতি ঘটেছিল। আলোচ্য সময়ের মধ্যে ১৯০০ থেকে ১৯০৫ এবং ১৯১০ থেকে ১৯১৪ এই দুটি পর্ব ছিল যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব থেকে মুক্ত। অথচ এই দুই পর্বের প্রকৃত অগ্রগতির ছবি সুরেন্দ্র প্যাটেলের হিসাবে ঢাকা পড়ে গেছে। শিবসুব্রামনিয়ন (১৯৬৫) যে হিসাব দিয়েছেন তাতে দেখা যায় মাথাপিছু আয়ের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছিল—১৯০০-০১ সালে ৪৯.৪ টাকা থেকে ১৯১৩-১৪ সালে ৫৫.৭ টাকা (১৯৩৮-৩৯ সালের মূল্যস্তরের ভিত্তিতে)।[২৬] অবশ্য প্যাটেলের তুলনায় শিবসুব্রামনিয়নের হিসাব অনেক বেশি অনুমানভিত্তিক। সে জন্য দুজনের হিসাবে এই পার্থক্যকে খুব গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তুলোর কাপড়ে সর্বভারতীয় ব্যবহারের হিসাব নিলে দেখা যায় যে ১৯০০-১ সালে ২৮৩.১ কোটি গজ থেকে বেড়ে ১৯১৩-১৪ সালে তা হয়েছিল ৫১০.১ কোটি গজ। যেহেতু ঐ সময়ের ব্যবধানে জনসংখ্যা শতকরা ১০ ভাগ বেড়েছিল অতএব এটা পরিষ্কার যে মাথাপিছু ভোগ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে লোকের পছন্দ বা রুচি যদি আকস্মিকভাবে সুতিবস্ত্রের অনুকূলে পরিবর্তিত না হয়ে থাকে বা দামের হেরফেরের কোনো বড় ধরনের প্রভাব চাষীদের চাহিদাকে প্রবল না করে থাকে তাহলে ধরে নেওয়া যায় সেই সময়কালে মাথাপিছু আয় অবশ্যই বৃদ্ধি পেয়েছিল। আয়ের এই বৃদ্ধির উপর ভিত্তি করেই কাপাস শিল্পে নতুন বিনিয়োগ ঘটছিল। এই সময়ে অবশ্য সুতিবস্ত্রের ক্ষেত্রে অন্তর্দেশীয় উৎপাদন আমদানির প্রতিকল্পের কাজ করছিল কারণ ভারতে সুতিবস্ত্রের মোট উৎপাদন মোট সরবরাহের অনুপাতে এই সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

এই পর্বে শিল্প বিকাশের উপর সরকারি নীতির প্রভাব ছিল সীমিত। সরকারি নীতি টাকা ও স্টার্লিং-এর মধ্যে বিনিময় হারে স্থিরতা বজায় রেখে দেশের মধ্যে একটা পরিবেশ তৈরি করতে পেরেছিল যেখানে ইয়োরোপীয় শিল্পপতিরা ভারতে তাদের অর্জিত মুনাফার একটা অংশ নির্ভয়ে পুনর্বিনিয়োগ করতে পারত। কাগজ শিল্পের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কাগজ কিনে নেওয়ার গ্যারান্টি দেওয়ার মাধ্যমে সরকার ঐ শিল্পের জন্যে একটি ন্যূনতম বাজারও তৈরি করে দিতে পেরেছে। তৎসত্ত্বেও ঐ শিল্পের বিকাশ তেমন সম্ভব হয় নি। তাছাড়া হস্তশিল্পের ব্যাপারে সরকারের ভূমিকা ভালোই ছিল কারণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন ও উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি চালু করার জন্যে সরকার উদ্যোগ নিয়েছিল। তবে এর সুফল মাত্র

কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই পর্বে ভারতে শিল্প বিনিয়োগের পরিমাণ ও ধরনের ওপর সবচেয়ে প্রভাবিত হয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাঠামোয় ভারতের অবস্থান দ্বারা—তা হলো, ভারতের ভূমিকা ছিল কৃষিজ দ্রব্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা এবং এই সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ ব্রিটেনকে তার শিল্পজাত পণ্য বিক্রি করার জন্যে একটি মুক্ত বাজার উপহার দেওয়া। এর মধ্যে ব্যতিক্রমী ঘটনা ছিল যে ভারতে দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর জন্যে সুতিবস্ত্র শিল্পের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব লাভ এবং চীনের বাজারে ভারতীয় কারখানায় প্রস্তুত সুতো রপ্তানি। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে ব্রিটেন, চীন ও ভারতের মধ্যে টাকাপয়সা লেনদেনের ত্রিপক্ষীয় ব্যবস্থাতেও এই ব্যতিক্রমী বিবর্তন কাজে লেগেছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই ভারতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে ওঠা দুটি সবচেয়ে বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্ম হলো। এই দুটি সংস্থারই পরিকল্পনা করেছিলেন জে. এন. টাটা কিন্তু সেগুলি সম্পূর্ণ হয় তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁর পরিবার ও অন্যান্য সহযোগী ব্যবসায়ীদের প্রচেষ্টায়। উনিশ শতকের শেষ ভাগে ভারতে সাফল্যের সঙ্গে পিণ্ডাকার লৌহ (pig iron) উৎপাদন করছিল বেঙ্গল আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি। কিন্তু এই কোম্পানির ইস্পাত তৈরির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি ১৯১২ সালে অনেক বেশি উৎপাদনক্ষম কারখানায় এবং অনেক উন্নত মানের লৌহ-আকর যোগানের নিশ্চিতি পেয়ে ইস্পাত উৎপাদন শুরু করল। টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানির উদ্যোক্তাদের অনেক বছর লেগেছিল কয়লার উৎস ও উৎপন্ন দ্রব্যের বাজারের অল্প দূরত্বের মধ্যে ভালো লোহার খনির খোঁজ পেতে। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাতকে কাজে লাগিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র চালু করে, বোম্বাই শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার ব্যাপারেও টাটা গোষ্ঠী পথিকৃৎ। টাটা গোষ্ঠীর এই দুটি প্রতিষ্ঠানের পুঁজির সম্পূর্ণ অংশই সংগৃহীত হয়েছিল ভারতের মধ্য থেকেই এবং ঐ সময় পর্যন্ত ভারতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক মূলধনের সবচেয়ে বৃহৎ প্রতিভূও হচ্ছে ঐ দুটি শিল্পসংস্থা (টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানির প্রাথমিক শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ছিল ১,৬৩০,০০০ পাউন্ড এবং ডিবেঞ্চার থেকে সংগৃহীত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৪০০,০০০ পাউণ্ড। জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের প্রাথমিক মূলধন ছিল ২ কোটি টাকা)। লোহা ও ইস্পাত উৎপাদনের দুটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই সরকার উৎপাদিত সামগ্রীর একটি অংশ কিনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং তার মাধ্যমে সরকার গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। আবার রেলপথের বিস্তার ঘটিয়ে অথবা জমি কেনার ব্যাপারে সাহায্য করে —এইসব ভাবেও সরকার এই শিল্পোদ্যমের সহায়কের ভূমিকা পালন করেছিল।[১৭]।

উনিশ শতকের শেষ এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরু—এই দুয়ের মধ্যবর্তী বছরগুলি এক অর্থে ঔপনিবেশকতার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় শিল্পের পক্ষে খুব আশাপ্রদ ছিল। এই সময়ে দেখা যায় ভারতে বসবাসকারী ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা তাঁদের মুনাফার একটি অংশ পুনরায় বিনিয়োগ করছেন ভারতের ব্যবসা ও শিল্পের বিকাশে। শিল্পায়নের বিষয়ে সরকারের আগ্রহ ছিল খামখেয়ালী ধরনের এবং তা সুপরিচালিতও ছিল না। মাদ্রাজের দৃষ্টান্ত বাদ দিলে দেখা যায় যে কারখানা চালু করার ব্যাপারে সরকারের অনীহা ছিল প্রবল। সরকারের তখনও পর্যন্ত আস্থা ছিল স্বনির্ভরতার উপর এবং ক্ষুদ্র আয়তনের শিল্পের উপর। কোনো বৃহৎ শিল্প গড়ে তোলার ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে সরকার খুবই অনাগ্রহী ছিল। অবশ্য কোনো সাহসী পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে ব্রিটেন এবং ভারত উভয় দেশেই সরকারের উপর বেশ চাপ ছিল। কোনো কোনো

ক্ষেত্রে ভারত সরকারের সচিবের সাহায্যও পাওয়া গিয়েছিল (যেমন জে. এন. টাটা পেয়েছিলেন)। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত না সংশ্লিষ্ট লোকজন অর্থনীতির চলতি অবস্থা সম্পর্কে একেবারে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট না হয়ে উঠছে ততক্ষণ পর্যন্ত সরকার একটি নির্লিপ্ত ভূমিকা নিতেই পছন্দ করত।[২৮] কিছু কিছু দেশীয় রাজ্য যেমন, মহীশুর এবং, কিছুটা কম হলেও, ত্রিবাঙ্কুর ও বরোদা—শিল্পায়নের প্রশ্নে খুব আগ্রহী ও সচেতন ছিল। কিন্তু এদের সম্পদ ছিল খুবই সীমিত এবং তাদের শক্তি ও উদ্যোগ আরও নানা খাতে বহুধা বিভক্ত হয়ে ব্যয়িত হতো এমনভাবে যে তাতে বৃহৎ আয়তনের শিল্প গড়ে তোলা সম্ভবপর ছিল না।[২৯]

৩.২ প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন ও যুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ের কাহিনী

ক্রমবর্ধমান রপ্তানি, কৃষি পণ্যের আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের বৃদ্ধি এবং তুলো, চিনি ও কাপড়ের মতো অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ব্যবহার বাড়ার ফলে দেশে সীমিত হলেও যে সমৃদ্ধির সূচনা হয়েছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে তার অবসান ঘটে। সুতি কাপড়ের ব্যবহারের পরিমাণ ১৯১৩-১৪ সালে ৫১০.২ কোটি গজ থেকে ভীষণভাবে কমে গিয়ে ১৯১৯-২০ সালে হয় ২৮৯.৯ কোটি গজ।[৩০] একই ভাবে ভারতে চিনির আমদানি ১৯১৭-১৮ সালে ৮৯৬,৮৫০ টন থেকে কমে ১৯১৯-২০-তে এসে দাঁড়াল ৪৮১,৯৭১ টনে[৩১] (এই সময়ে দেশে আভ্যন্তরীণ উৎপাদন কিছুটা বাড়লেও দেশের মধ্যে চিনির আমদানি ও আভ্যন্তরীণ ভাগ প্রায় সমপরিমাণ ছিল)। ভারত সরকারের বাণিজ্যিক অনুসন্ধান ও পরিসংখ্যান দপ্তর ১৯১৯-২০ সালে *রিভিউ অব্ দি ট্রেড অব্ ইন্ডিয়া*-যে হিসাব প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যায় যে ঐ বছরে ১৯১৮-১৯ সালের তুলনায় রপ্তানির ও আমদানির পরিমাণ বেড়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের পরবর্তী দুই বছরে আমদানি ও রপ্তানির প্রকৃত পরিমাণ ১৯১৩-১৪-র তুলনায় কমে গিয়েছিল। ১৯১৩-১৪ সালে রপ্তানি ও আমদানির মূল্য ছিল যথাক্রমে ২,৪৪২,০১৫,০০০ টাকা ও ১,৮৩২,৪৭৯,০০০ টাকা। ১৯১৩-১৪ সালের মূল্যস্তরে হিসাব করলে দেখা যায়, ১৯১৯-২০ সালে এগুলির মূল্য কমে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১,৯৭৬,১৯৬,০০০ টাকা ও ১,০১২,৮৬৪,০০০ টাকা। মেশিনারি ও কারখানার অন্যান্য যন্ত্রাংশ আমদানির মূল্য ১৯১৩-১৪ সালে যেখানে ছিল ৮২,৬২৬,০০০ টাকা সেখানে ১৯১৯-২০-তে তা কমে হলো ৪২,৫৫৩,০০০ টাকা (১৯১৩-১৪-র মূল্যস্তরে)। যন্ত্রপাতির আমদানি মূল্য অবশ্য (১৯১৮-১৯-এর মূল্যস্তরের হিসাবে) ১৯১৯-২০ সালে আগের বছরের তুলনায় ছিল দ্বিগুণেরও বেশি। যন্ত্রপাতির এই আমদানি বৃদ্ধিকে যদি আমরা ভারতে ব্যক্তিগত মূলধন বিনিয়োগের সূচক হিসাবে দেখি, তাহলে বোঝা যাবে যে যুদ্ধ বেধে যাওয়ায় ভারতে সমস্ত ধরনের বিনিয়োগ লোপ পেয়েছিল। শুধু কারখানা চালু রাখার জন্যে যতটুকু পুরনো যন্ত্রের জায়গায় নতুন সরঞ্জাম প্রয়োজন শুধু সেটুকুই বিনিযুক্ত হয়েছিল। ১৯২০-২১ পর্যন্ত অবস্থা এ রকমই ছিল।[৩২]

যুদ্ধের সময় রেলপথ নির্মাণ ও সেচব্যবস্থার জন্যে বিনিয়োগের পরিমাণও প্রায় শূন্যে এসে ঠেকেছিল। সুতরাং বলা যায় যে যুদ্ধের বছরগুলিতে ভারতের শিল্প উৎপাদনে ক্ষমতা চূড়ান্ত মাত্রায় ব্যবহার করা হলেও এর ফলে যন্ত্রপাতির ও সামাজিক পরিকাঠামোর যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তা পূরণ করার ব্যাপারে বিশেষ কিছু করা সম্ভব হয় নি।[৩৩] অবশ্য যুদ্ধের সময়ে

ভারতের প্রধান প্রধান শিল্পগুলিতে বিপুল পরিমাণ মুনাফা হয়েছে। মালিকের মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে পাটশিল্প অন্য সব শিল্পকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল—ভারতের অর্থনীতিতে পাটের বিশেষ অবস্থানই এর কারণ। যুদ্ধের আগে ভারতে উৎপাদিত কাঁচা পাটের অর্ধেকেরও বেশি বিদেশে, বিশেষ করে ইয়োরোপের দেশগুলিতে রপ্তানি করা হতো। জার্মানি ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে এবং ইয়োরোপগামী জাহাজের অপ্রতুলতার ফলে কাঁচা পাটের রপ্তানি বস্তুত একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এতে হুগলীর তীরবর্তী পাটকলগুলিতে কাঁচা পাটের মজুত বেড়ে গেল। এই পাটকলগুলি পাটজাত পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে একচেটিয়া ক্ষমতাও ভোগ করত। কাঁচা পাটের রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গুণচট ইত্যাদির চাহিদা বজায় থাকায় কাঁচা পাটের তুলনায় পাটজাত পণ্যের দাম অনেক বেড়ে গেল এবং পাটশিল্পে অভূতপূর্ব মুনাফার সৃষ্টি হলো।[৩৪] বোম্বাইয়ের সুতো ও কাপড়ের কলগুলিতেও বিপুল পরিমাণ মুনাফা হতে লাগল। তবে তার কারণ ছিল ইংল্যান্ড থেকে আমদানির পরিমাণ আকস্মিকভাবে হ্রাস পাওয়া। পাট শিল্প থেকে সুতিবস্ত্র শিল্পের অবস্থা কিছুটা ভিন্ন ধরনের ছিল। প্রথমত, তুলোর দাম নির্ধারিত হতো বিশ্বের বাজারের দামের প্রভাবে, ভারতের আভ্যন্তরীণ চাহিদার দ্বারা নয়। যুদ্ধের আগেও ভারতের তুলোর সর্ববৃহৎ বিদেশী ক্রেতা ছিল জাপান—যুদ্ধের পরেও ভারত থেকে জাপানের আমদানি অব্যাহত ছিল। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধের পর ইংল্যান্ড থেকে সুতি কাপড়ের আমদানি, আগের তুলনায় অনেক কম মাত্রায় হলেও চলছিল। তদুপরি, জাপান ভারতের বাজারে ভালো পরিমাণ সুতিকাপড় রপ্তানি করতে শুরু করেছিল (১৯১৫-১৬ থেকে ১৯১৯-২০ এই কয়েক বছরে জাপান থেকে সুতি কাপড়ের গড় বাৎসরিক আমদানির পরিমাণ ছিল ১০-৯৬ কোটি গজ যেখানে ১৯১০-১১ থেকে ১৯১৪-১৫—এই কয় বছরে গড় আমদানি ছিল মাত্র ৬৪ লক্ষ গজ)।[৩৫]

ফলে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আধুনিক শিল্পক্ষেত্রের অধিকাংশ কোম্পানির হাতে প্রচুর নগদ পুঁজি জমে গিয়েছিল যা শিল্প সম্প্রসারণের কাজে লগ্নী করা যেত—কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই মুনাফার একটি বড় অংশ লভ্যাংশ হিসাবে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছিল এবং শিল্পে তার পুনর্বিনিয়োগ ঘটে নি। যুদ্ধের সময় যে বিপুল পরিমাণ চাহিদা অতৃপ্ত থেকে গিয়েছিল তার কথাও মনে রাখতে হবে। ভোগ ও চাহিদার একটি অংশ ১৯১৮-১৯-এর দুর্ভিক্ষ ও ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এতদসত্ত্বেও, ১৯১৯-২০ থেকে ১৯২১-২২ পর্যন্ত বেসরকারি শিল্প পুঁজির ক্ষেত্রে যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির একটি পর্ব চলেছিল তার স্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় রেজিস্ট্রিকৃত যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং সেগুলির বিনিয়োগকৃত মূলধনের পরিমাণের মধ্যে।[৩৬] সমৃদ্ধির প্রকৃত সূচক হচ্ছে আধুনিক শিল্পে কী পরিমাণে পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়েছিল। ১৯১৯-২০ থেকে ১৯২৩-২৪ এই কয়েক বছরে যন্ত্রপাতি ও কারখানার সাজসরঞ্জামের বাৎসরিক আমদানির ঘোষিত মূল্য ১৯১৩-১৪ সালের আমদানির অর্থমূল্যের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি ছিল (এবং ১৯২১-২২ এ চারগুণেরও বেশি)। কিন্তু প্রকৃত মূল্যের বিচারে তা যুদ্ধ-পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় বেশ কম ছিল। প্রকৃত মূল্য কত তা স্থির করার জন্যে আমরা (ব্রহ্মদেশ বাদ দিয়ে) ব্রিটিশ ভারতে যন্ত্রপাতি ও কারখানার সাজসরঞ্জাম আমদানির মোট মূল্যকে সমগ্র সুতো কাপড় শিল্পের যন্ত্রপাতির (textile machinery) মূল্যসূচক দিয়ে ভাগ করে নিয়েছি। সারণি ৩.২-এ এর ফলাফল দেওয়া হয়েছে। এই পরিসংখ্যানে যুদ্ধ-পরবর্তী কালে আমদানির মূল্য হয়ত কিছুটা কম করে দেখানো হয়েছে—বিশেষ করে ১৯১৯-২০ থেকে

১৯২৩-২৪-এর মধ্যে। ১৯১৯-২০ সালে *রিভিউ অব্ দি ট্রেড অব্ ইন্ডিয়া*-তে যে হিসাব দেওয়া হয়েছে সেখানে ১৯১৩-১৪-র দামের সঙ্গে ১৯১৯-২০-র দামের অনুপাত হলো ২২৫.২১ ; তুলনায় ১৯১৪ কে ভিত্তি বৎসর হিসাবে ধরে উপরের সারণিতে প্রদত্ত সুতো-কাপড় শিল্পের যন্ত্রপাতির গড় মূল্যসূচক হলো ২৬৫.৪২। দ্বিতীয়ত, অন্য তথ্য থেকে দেখা যায় (১২.২নং সারণি দ্রষ্টব্য) যে ১৯২০ থেকে ১৯৩৩ এর মধ্যে সুতোকাপড় শিল্পের যন্ত্রপাতির তুলনায় চিনি শিল্পের যন্ত্রপাতির দাম অনেক বেশি দ্রুতহারে হ্রাস পেয়েছিল। যুদ্ধ পূর্ববর্তী বছরগুলিতে চিনির যন্ত্রপাতির জন্যে কোনো মূল্যসূচক প্রস্তুত করা সম্ভব নয় এবং যুদ্ধ-পূর্ববর্তী ও যুদ্ধোত্তর বছরগুলির মধ্যে কোনো বৈধ তুলনাও সম্ভব নয়। তবুও এটা স্পষ্ট যে,১৯৩০-এর

সারণি ৩.২ ভারতে শিল্প যন্ত্রপাতি ও কারখানার সরঞ্জাম আমদানি : ১৯০০-৪০

বৎসর	কৃষিযন্ত্রপাতি ব্যতীত অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও কারখানার সরঞ্জাম আমদানির মূল্য (হাজার টাকায়)	সুতিবস্ত্র শিল্পের যন্ত্রপাতির মূল্য সূচক (বিভিন্ন প্যানেলের মধ্যে তুলনীয় নয়)।	সুতিবস্ত্র শিল্পের যন্ত্রপাতির মূল্য সূচক (বিভিন্ন প্যানেলের মধ্যে তুলনার ভিত্তিতে) (১৯০৪=১০০)	ভারতের আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের প্রকৃত মূল্য (হাজার টাকায়)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১৮৯৯-১৯০০	২৪,০৯৪			
১৯০০-০১	২০,৫৫৪			
১৯০১-০২	২৭,৩০৫			
১৯০২-০৩	৩০,১৩০			
১৯০৪-০৫	৩৬,৪২৯	১০০.০	১০০.০	৩৬,৪২৯
১৯০৫-০৬	৪৫,৯১৯	৯৮.২৯	৯৮.২৯	৪৬,৭১৮
১৯০৬-০৭	৫৩,৪৪৫	৯৩.৫১	৯৩.৫১	৫৭,৪৫৪
১৯০৭-০৮	৬২,৯৪০	৯৫.৪১	৯৫.৪১	৬৫,৯৬৮
১৯০৮-০৯	৬১,২২৩	১০২.০৯	১০২.০৯	৫৯,৯৭০
১৯০৯-১০	৪৪,৯০১	১০০.৬৮	১০০.৬৮	৪৪,৫৯৮
১৯১০-১১	৪১,৭৮৪	১০৯.২৯	১০৯.২৯	৩৮,২৩২
১৯১১-১২	৪১,০২১	১০৭.৫৪	১০৭.৫৪	৩৮,১৪৫
১৯১২-১৩	৫০,৬২৭	১০৭.৩৪	১০৭.৩৪	৪৭,১৬৫
১৯১৩-১৪	৭২,৫২৪	১০৩.৬৭	১০৩.৬৭	৬৯,৯৫৭
১৯১৪-১৫	৫৫,৮৮৬	১০০.০	১০৯.১০	৫১,২২৫
১৯১৫-১৬	৪৩,৯২৬	১১০.১৪	১২০.১৬	৩৬,৫৫৬
১৯১৬-১৭	৫০,৭২৮	১৫৮.৩০	১৭২.৭১	২৯,৩৭২
১৯১৭-১৮	৪১,০৩৭	২১৮.২৮	২৩৮.১৪	১৭,২৩২
১৯১৮-১৯	৪৬,৮৭৯	২৭৭.৯০	৩০৩.১৯	১৫,৪৬২
১৯১৯-২০	৮৪,১৫৫	২৬৫.৪২	২৮৯.৫৭	২৯,০৬২
১৯২০-১	২০২,৩২২	৩০০.২৯	৩২৭.৬২	৬১,৭৫৫
১৯২১-২	৩১৫,২০৫	৩৩৯.২৩	৩৭০.১০	৮৫,১৬৮
১৯২২-৩	২১৮,১৭২	২৮৯.৪৫	৩১৫.৭৯	৬৯,০৮৮

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১৯২৩-৪	১৭১,৮১৬	২২৩.৯৬	২৪৪.৩৪	৭০,৩১৮
১৯২৪-৫	১২৬,৪৪৮	২১০.২৮	২২৯.৪২	৫৫,১১৬
১৯২৫-৬	১২৬,৭৭৬	১৯৪.৪০	২১২.০৯	৫৯,৭৭৫
১৯২৬-৭	১১৬,৪৫৩	২১০.৬১	২২৯.৭৮	৫০,৬৮০
১৯২৭-৮	১৩১,৭৩৮	২২২.০৫	২৪২.২৬	৫৪,৩৭৯
১৯২৮-৯	১৬৩,৭৬১	১৮৪.৭০	২০১.৫১	৮১,২৩৭
১৯২৯-৩০	১৬১,৬৭৭	১৮০.৮৮	১৯৭.৩৪	৮১,৯২৮
১৯৩০-৩১	১২৬,৬৭৬	১৮৬.৫২	২০৩.২৮	৬২,৩১৬
১৯৩১-৩২	৯৫,৮৮৮	১০০.০	২১৬.৬৮	৪৪,২৫৩
১৯৩২-৩৩	৯৮,২১৩	৮৭.৮২	১৯০.২৯	৫১,৬১২
১৯৩৩-৩৪	১১৯,৯৪৮	৮৪.৭০	১৮৩.৫৩	৬৫,৩৫৬
১৯৩৪-৩৫	১১৩,৯১৫	৮৩.৩৮	১৮০.৬৭	৬৩,০৫১
১৯৩৫-৩৬	১২৫,৩১১	৯৮.৬৪	২১৩.৭৩	৫৮,৬৩১
১৯৩৬-৩৭	১২৬,২৮১	১১১.৯২	২৪২.৫১	৫২,০৭২
১৯৩৭-৩৮	১৭০,৪১৪	১১২.৪৭	২৪৩.৭০	৬৯,৯২৮
১৯৩৮-৩৯	১৮৯,০৮৩	১২১.৬৭	২৬৩.৬৩	৭১,৭২৩
১৯৩৯-৪০	১৪৪,৭৬১	১৩৬.৪৪	২৯৫.৬৪	৪৮,৯৬৩

উৎস : ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সমুদ্রবাহিত বাণিজ্য সংক্রান্ত হিসাব।

পরের বছরগুলিতে চিনি শিল্পের যন্ত্রপাতির আমদানি বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সেই নিরিখে আমাদের পরিসংখ্যানে তিরিশ দশকের মন্দার বছরগুলিতে বিনিয়োগের প্রকৃত মূল্যের চেয়ে কম করে দেখানো হয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে একথা অনস্বীকার্য যে আলোচ্য সব বছরেই সুতিবস্ত্র শিল্পের যন্ত্রপাতি ছিল শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি আমাদানির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এই পণ্য আমদানিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া সমীচীন।

এই সময়ে পাট বা তুলো শিল্পের প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন ঘটে নি।[৩৭] তবে ইস্পাত ইত্যাদি ধাতু শিল্পে, এবং চিনি, কাগজ, ইত্যাদি রাসায়নিক শিল্পের প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির আকৃতি, বিন্যাস ও কার্যকারিতায়, অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছিল। কিন্তু এই সব শিল্পে বিনিয়োগের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, কেবলমাত্র বিশের দশকের শেষ দিকে, বিশেষ করে তিরিশের দশকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মন্দার সময়ে শিল্পবিনিয়োগ সংক্রান্ত যে পরিসংখ্যান সারণি ২.৩-এ দেওয়া হয়েছে বিনিয়োগের প্রকৃত মাত্রা তার থেকে বেশ খানিকটা বেশি ছিল। একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে আধুনিক শিল্পের স্বার্থে যে যন্ত্রপাতি ভারতে আমদানি করতে হয়েছে তা আগের সময়ের তুলনায় মন্দার পর্বে মোট আমদানির আরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছিল। ১৯২৯-৩০-এর পর থেকে কৃষি ভীষণভাবে মন্দার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল—সুতরাং সঙ্গতভাবেই অনুমান করা যায় যে এই সময় কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির—যেমন চাষের জন্যে ব্যবহৃত ডিজেল ইঞ্জিন—আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছিল। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাগুলি বিদ্যুৎসংযোগ বা অন্যান্য নির্মাণ কাজের জন্যে যে সব যন্ত্রপাতির চাহিদা করতেন, সেগুলিরও আমদানি খুব কমে

গিয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। অন্য দিকে, আমরা নিশ্চিতভাবেই জানি যে তিরিশের দশকের প্রথম থেকেই চিনি ও কাগজ শিল্পে বিনিয়োগ ব্যাপক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সমস্ত কারণে আমরা মনে করি যে, যন্ত্রপাতি ও কারখানার সাজসরঞ্জাম-এর আমদানি সম্পর্কে যে মোট পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে, তার মধ্যে আগের বছরগুলির তুলনায় মন্দার বছরগুলিতে বিনিয়োগের প্রকৃত মাত্রাকে অনেক লঘু করে দেখানো হয়েছে।

আলোচ্য পরিসংখ্যান-সিরিজে অবশ্য অনেক ধরনের যন্ত্রপাতির হিসাব ধরা হয়েছে যেমন, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, রেলওয়ের জন্যে ব্যবহৃত ইঞ্জিন ছাড়া নানা ধরনের ইঞ্জিন এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ব্যবহৃত নানা ধরনের যন্ত্রপাতি—যেমন, জুতো তৈরির যন্ত্রপাতি, চালকলের সাজসরঞ্জাম, সেলাই-এর যন্ত্র ইত্যাদি। আসলে, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিন বা অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়েই সমস্যা। কারণ, এগুলির একটি বড় অংশ আধুনিক শিল্প ক্ষেত্রের অন্তর্গত, কিন্তু কতটা অংশ সে সম্পর্কে ধারণা করা খুব শক্ত। অবশ্য 'শিল্প সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির' আমদানির পরিসংখ্যান নিয়ে আমরা একটি সিরিজ তৈরি করতে পারি। কিন্তু তা খুব নির্ভরযোগ্য হবে না। কারণ, তার মধ্যে কাগজ শিল্পের যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত হলেও ঐ শিল্পে বিনিয়োগের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয়িত হয়, ডাইজেস্টার, বীটার, ইত্যাদি যন্ত্রপাতির জন্যে যে ব্যয় হিসাবের মধ্যে আসবে না। এমনকি পাট বা সুতো কাপড় শিল্পে নানা উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় এমন যন্ত্রপাতি যেমন, বয়লার বা বাষ্পীয় ইঞ্জিনও এ সিরিজের অন্তর্ভুক্ত হবে না। সুতরাং আপাতত যন্ত্রপাতি ও কারখানার সাজসরঞ্জাম আমদানি সংক্রান্ত সিরিজটি কোনো রকম সংশোধন ছাড়াই অক্ষত রেখে দিচ্ছি।

উপরোক্ত পরিসংখ্যান সিরিজটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, ১৯১৯-২০ থেকে ১৯৩৮-৩৯ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় জুড়ে কোনো লক্ষণীয় প্রবণতা অনুপস্থিত। ১৯১৯-২০ থেকে ১৯২০-২৪-এর মধ্যে বিনিয়োগ যা বেড়েছে তা প্রধানত স্থায়ী উৎপাদন সামগ্রীর দাম বেড়ে যাওয়ার ফলেই ঘটেছে, ফলে ১৯১৩-১৪ সালের তুলনায় প্রকৃত বিনিযোগ বেড়েছে সামান্যই। ১৯২৪-২৫ থেকে ১৯২৭-২৮ এই চার বছর বিনিয়োগে মন্দা এসেছে আবার ১৯২৯-৩০ ও ১৯৩০-৩১ এই দু বছরে যন্ত্রপাতির আমদানি প্রকৃত অর্থেই বিস্ময়কর ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মন্দার বছরগুলিতে যন্ত্রপাতি আমদানির যে হিসাব পাওয়া যাচ্ছে তা আশাতীত ভাবেই বেশি—অন্তত শিল্পোন্নত দেশগুলির ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে এ কথা বলাই যায়।

সুতরাং শিল্পোন্নত দেশগুলির অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে হয় যে মন্দার বছরগুলিতে ভারতে শিল্পে বিনিয়োগ তেমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ন। কিন্তু বর্তমান সময়ে শিল্পোন্নত দেশে যে ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তারও কোনো জোরালো প্রমাণ আলোচ্য সময়ে ভারতের ক্ষেত্রে নেই।

আধুনিক শিল্পের উৎপাদনে ব্যক্তিগত বিনিয়োগের উপাদান ও গঠনের দিক থেকে দেখলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই বিনিয়োগের পুরনো ধরন বদলে যেতে শুরু করে। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে সুতি বস্ত্র শিল্পে বিনিয়োগের মাত্রা পাট শিল্পের তুলনায় অনেক বেড়ে যায়। একই ভাবে পূর্ব ভারতের তুলনায় পশ্চিম ভারতে বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়ে যায়। সারণি : ৭.১০ এবং ৭.১১-তে পশ্চিম ভারতে সুতিবস্ত্র শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ এবং ভারতে সুতি-বস্ত্র শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানির প্রকৃত মূল্য দেওয়া হয়েছে। বাংলায় পাট শিল্পে বিনিয়োগের প্রকৃত মূল্য কি ছিল তা দেওয়া হয়েছে সারণি ৮.১-এ। ভারতে পাট শিল্পে মোট যা বিনিয়োগ

হতো তার শতকরা ৯৫ ভাগ হতো বাংলাতেই ; সারণি ৭.১১-এর ৩নং কলাম এবং সারণি ৮.১ এর ২নং কলাম দ্রষ্টব্য।

৭.১১নং সারণির ৩ ও ৪ নং কলাম তুলনা করলে দেখা যায় যে সুতিবস্ত্র শিল্পে যন্ত্রপাতির আমদানির ও পাট শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানির আর্থিক মূল্যের অনুপাত ১৯১৪ সালের তুলনায় ১৯১৮ সালের পরে উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে যায়। এই দুই শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানির সমষ্টির অনুপাত ১৯০৫-৬ থেকে ১৯১৩-১৪ পর্যন্ত ছিল ১.৩৭ এবং ১৯১৯-২০ থেকে ১৯৩০-৩১ পর্যন্ত ২.২১। সুতোকাপড় শিল্প ও পাট শিল্পের যন্ত্রপাতির আপেক্ষিক দাম বেড়ে যাওয়ার জন্যে যে এই পরিবর্তন ঘটেছিল তা নয় (৭.১১নং সারণির ৬নং কলামে এবং ৮.১ নং সারণির ৩নং কলাম দ্রষ্টব্য)। এই পরিবর্তন ঘটেছিল সুতিবস্ত্র ও পাট শিল্পে প্রকৃত বিনিয়োগের মাত্রার আপেক্ষিক তারতম্যের জন্যে। বিনিয়োগের উপাদানের এই পরিবর্তনের সাথে সাথে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে বিনিয়োগের পরিমাণের আপেক্ষিক তারতম্যও ঘটেছিল। কারণ পশ্চিম ভারত থেকে সুতিবস্ত্র শিল্পের প্রসার দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে উল্লেখযোগ্য ভাবে ঘটলেও সামগ্রিকভাবে ভারতের এই শিল্পে পশ্চিম ভারতেরই অপ্রতিহত প্রাধান্য বজায় ছিল। কিন্তু অন্য দিকে বাংলা থেকে পাট শিল্পের প্রসার ভারতের অন্যত্র কোথাও ঘটেই নি। তবে পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের প্রধান শিল্প উৎপাদন হিসাবে যথাক্রমে সুতিবস্ত্র ও পাট শিল্পের গুরুত্ব অব্যাহত থেকে গেল।

সারণি ৭.১০ এবং সরণি ৮.১ এর ৫নং কলাম দুটি তুলনা করলে দেখা যায় যে, পশ্চিম ভারতে সুতিবস্ত্র শিল্পে প্রকৃত বিনিয়োগের মোট মূল্য এবং বাংলায় পাট শিল্পে প্রকৃত বিনিয়োগের মোটমূল্যের অনুপাত ১৯০৫-৬ থেকে ১৯১৩-১৪ পর্যন্ত ছিল ১.১৬ এবং ১৯১৯-২০ থেকে ১৯৩০-৩১ পর্যন্ত ছিল ১.৪১। সুতিবস্ত্র শিল্পে বিনিয়োগের তুলনায় পাটশিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ বিস্ময়কর ভাবে কমে গিয়েছিল ১৯৩০-৩১-এর পরবর্তী সময়ে। সারণি ৭.১০ ও ৮.১ এর ১নং কলাম দুটি তুলনা করলে দেখতে পাই যে, ১৯৩১-৩২ থেকে ১৯৩৮-৩৯ এই সময়ের মধ্যে বোম্বাইয়ে সুতিবস্ত্র শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানি ও বাংলায় পাট শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানির অনুপাত বেড়ে হয়েছিল ২.৩৪। (উক্ত সারণির পাদটীকায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে কেন সুতোকাপড ও পাট শিল্পে এই সময়ের জন্য বিনিয়োগের প্রকৃত মূল্যের পরিসংখ্যান সিরিজ প্রস্তুত করা সম্ভব হয় নি) যদি ধরেও নেওয়া যায় যে পাট শিল্পের জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির কিছু অংশ স্থানীয়ভাবে তৈরি করে নেওয়া হচ্ছিল তবুও উপরোক্ত অনুপাতমূল্য পাট শিল্পের প্রতিকূলে এত বেশি চলে যাওয়ার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

বাংলার অগ্রণী উৎপাদন ক্ষেত্র পাট শিল্পে অগ্রগতি হ্রাস পাওয়ায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বাংলার শিল্প বিকাশের হার বেশ কমে গলে। যুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলিতে এবং মন্দার সময়ে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিল্প বিকাশের এই অবক্ষয়ের সম্পর্ক আছে। বাংলার অন্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলিও যেমন, কয়লা ও চা-পাটের মতোই বিদেশের বাজারের উপর নির্ভরশীল ছিল। স্বভাবতই বিশের দশকের নিস্তেজ সময় ও তিরিশের দশকের তীব্র ও গভীর মন্দা এই সমস্ত শিল্পকেও ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। সুতিবস্ত্রের অবস্থাটা ছিল পাট শিল্পের একেবারে বিপরীত—সুতি কাপড়ের উৎপাদন হতো মূলত দেশে আভ্যন্তরীণ ভোগের জন্যে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতে সুতি কাপড়ের মোট ব্যবহারের পরিমাণ ধারাবাহিকভাবে না হলেও বাড়তে শুরু করেছিল। তাছাড়া দেশের মোট উৎপাদনের মধ্যে

ভারতীয় সুতো ও কাপড়গুলির উৎপাদনের অনুপাতও ঐ সময়ে বেড়ে গিয়েছিল। যদিও পশ্চিম ভারত, বিশেষ করে, বোম্বাই শহর থেকে সুতো কাপড় শিল্পের প্রসার দেশের অন্যত্র ঘটছিল, তবুও সুতিবস্ত্রের ক্রমবর্ধমান বাজারের সিংহভাগ পশ্চিম ভারতের দখলে ছিল। সুতিবস্ত্র শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেল এবং এই শিল্পের বিকাশের ফলে যে বাহ্যিক ব্যয় সংকোচের সুবিধা সৃষ্টি হলো তার সুফল অন্যান্য ছোট শিল্পগুলিও ভোগ করল।

তুলো, চিনি, ইস্পাত ও কাগজ শিল্পের জন্যে যে শুল্ক-সংরক্ষণ নীতি চালু হলো তা বাংলায় শিল্প বিকাশে প্রভূত সাহায্য করেছিল। কিন্তু শ্রম ও পুঁজি নিয়োগের পরিমাণের দিক থেকে সুতিবস্ত্র ও পাট শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অন্য কোনো শিল্পই এঁটে উঠতে পারত না। তিরিশের দশকের প্রথম দিকে এক বা দু বছরের জন্যে চিনি শিল্পে বেশ বড় ধরনের বিনিয়োগ হয়েছিল। নতুন চিনি কলগুলির অধিকাংশই বিহার ও যুক্তপ্রদেশে অবস্থিত ছিল। যদিও বাংলায় কিছু নতুন সুতো বা কাপড়ের কল স্থাপিত হয়েছিল তবু এই শিল্পের প্রসার ঘটছিল মূলত দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে—পূর্ব ভারতে সে তুলনায় এর বিকাশ ছিল খুব নগণ্য।[৩৮] পশ্চিম ভারতেও কিছু নতুন চিনিকল গড়ে উঠছিল।[৩৯] সুতরাং পাট ও অন্যান্য রপ্তানি-কেন্দ্রিক শিল্পের গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ার ফলে পশ্চিম ভারতের (আধুনিক মহারাষ্ট্র ও গুজরাটকে অন্তর্ভুক্ত করে) তুলনায় শিল্পোন্নত রাজ্য হিসাবে বাংলার যে গুরুত্ব ছিল তা আপেক্ষিক ভাবে হ্রাস পেতে শুরু করেছিল এবং পূর্ব ভারতে অন্যান্য কিছু শিল্প গড়ে উঠলেও এই অবনমনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে রোধ করা সম্ভব হয় নি।

৩.৩ দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ব্যক্তিগত মোট বিনিয়োগের গতি প্রকৃতির বিশ্লেষণ

আধুনিক শিল্পে ব্যক্তিগত বিনিয়োগের অচলাবস্থার মূল ব্যাখ্যা তিনটি বিষয়ের মধ্যে নিহিত। প্রথম, ভারতবর্ষ একটি বিশ্বব্যাপী সংকটের আবর্তে পড়েছিল যে সংকট দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ধনতান্ত্রিক দেশগুলি থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে বিশের দশক ছিল সমৃদ্ধির সময়। কিন্তু বেশিরভাগ ইয়োরোপীয় দেশ, বিশেষ করে, ইংল্যান্ডের পক্ষে—যে দেশ এককভাবে ভারত থেকে সবচেয়ে বেশি পণ্য আমদানি করত এবং যে দেশ থেকে ভারতে সবচেয়ে বেশি পণ্য রপ্তানি করা হতো —বিশের দশক ছিল খাপছাড়া সমৃদ্ধির সময়।[৪০] এই দশকের প্রথম কয়েক বছর ধরে চলল জাতীয় মুদ্রার ব্যাপক অবমূল্যায়ন, বিশেষ করে, পশ্চিম ইয়োরোপে। এর ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন ভারতে যে কয়েকটি নতুন শিল্প ছোট আকারে গড়ে উঠছিল সেগুলির জন্যে শুরু হলো তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ঐ দশকের শেষ বছরগুলিতে পশ্চিম ইয়োরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলিতে ও উত্তর আমেরিকায় তুলনামূলকভাবে সমৃদ্ধির সূচনা হলো। কিন্তু ১৯২৬-এর মধ্যেই বিশ্বের কৃষি অর্থনীতিতে মন্দার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে ভারতের রপ্তানির পরিমাণ—যা ১৯২৪-২৫ পর্যন্ত বেড়ে চলছিল, ঐ বছর থেকে কমতে শুরু করে এবং ১৯২৮-২৯ পর্যন্ত তা একই স্তরে থেকে যায়। ১৯২৮-২৯-এর পর রপ্তানি দ্রুত কমতে থাকে।[৪১] তাছাড়া ১৯২৬-এর পর থেকে কৃষিপণ্যের দাম কমতে শুরু করে, ফলে ভারত তার প্রধান কৃষি-রপ্তানি যেমন, কাঁচা পাট, কাঁচা তুলো এবং গমের

জন্যে বিশ্বের বাজারে অনেক কম দাম পায়। যদি ভারত সবকার প্রকাশিত রপ্তানি ও আমদানি মূল্যের সূচক গ্রহণ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, যুদ্ধেব ও যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে ১৯২৪ পর্যন্ত এই দুই মূল্যের অনুপাত। প্রাক যুদ্ধকালীন অনুপাতমূল্য থেকে অনেক নিচে নেমে

সারণি ৩.৩ ভারতেব বৈদেশিক বাণিজ্যেব বিনিময়-হাব, ১৮৯৯-১৯৪০

বৎসব	রপ্তানি পণ্যেব মূল্যসূচক (১৮৭৩=১০০)	আমদানি পণ্যেব মূল্যসূচক (১৮৭৩=১০০)	গড় বিনিময়-হাব (১৮৭৩=১০০)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১৮৯৯	১০০	৮৭	১১৫
১৯০০	১২৪	৯৬	১২৯
১৯০১	১১৬	৯৬	১২১
১৯০২	১১৩	৮৬	১৩১
১৯০৩	১০৩	৮৮	১১৭
১৯০৪	১০৪	৯৩	১১২
১৯০৫	১১৬	৯৬	১২১
১৯০৬	১৩৯	১০৫	১৩২
১৯০৭	১৪৫	১১৬	১২৫
১৯০৮	১৫১	১০৬	১৪২
১৯০৯	১৩৩	৯৯	১৩৪
১৯১০	১২৭	১০৯	১১৭
১৯১১	১৩৬	১১৩	১২০
১৯১২	১৪৫	১১৭	১২৪
১৯১৩	১৫৪	১১৭	১৩২
১৯১৪	১৬০	১১৭	১৪০
১৯১৫	১৫৫	১৪৬	১০৬
১৯১৬	১৬৩	২৩৬	৬৯
১৯১৭	১৭০	২৬২	৬৯
১৯১৮	১৯৯	২৮৯	৬৯
১৯১৯	২৭৭	২৭৪	১০১
১৯২০	২৮১	২৮০	১০০
১৯২১	২৩৯	২২৮	১০৫
১৯২২	২৪৫	২০১	১২২
১৯২৩	২২৪	১৯৩	১১৬
১৯২৪	২২২	২১৭	১০২
১৯২৫	২৩৩	২১১	১১০
১৯২৬	২২৫	১৯৫	১১৫
১৯২৭	২০৯	১৮৫	১১৩
১৯২৮	২১২	১৭১	১২৪
১৯২৯	২১৬	১৭০	১২৭
১৯৩০	১৭৭	১৫৭	১১৩

(১)	(২)	(৩)	(৪)
১৯৩১	১২৫	১৩৪	৯৩
১৯৩২	১২০	১৩৯	৮৬
১৯৩৩	১১৮	১২৮	৯২
১৯৩৪	১১৭	১২২	৯৬
১৯৩৫	১২৮	১২২	১০৫
১৯৩৬	১২৭	১২২	১০৪
১৯৩৭	১৩৩	১৪৪	৯২
১৯৩৮	১২৮	১৪২	৯০
১৯৩৯	১৩৩	১৩৭	৯৭
১৯৪০	১৬৪	১৮১	৯১

উৎস : Gov. India : CISD, *Index numbers of Indian Prices,* 1861–1931 এবং প্রাসঙ্গিক বছরগুলির *Statistical Abstract for British India.* (কলকাতা, বার্ষিক সংখ্যা)।

গিয়েছিল। বিশের দশকের শেষভাগে এই অনুপাতের সামান্য উন্নতি ঘটলেও কখনই তা ১৯১৪-র স্তরে পৌঁছতে পারে নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এবং দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বিনিময় হারে দ্রুত অবনতি লক্ষ্য করা যায়। বিনিময়-হার ১৯১৪ এমনকি ১৮৯৯ সালেরও তুলনায় কমে গিয়েছিল এবং একথা মনে রাখতে হবে যে ১৮৯৯-এ বিনিময় হার ১৯১৪ সালের তুলনায় অনেক কম ছিল। সারণি ৩.৩-এ প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি দেওয়া হলো।[৪২] বিনিময়-হারের যে সূচক দেওয়া হয়েছে তা খুবই স্থূল, কারণ এর অন্তর্নিহিত মূল্যসূচকগুলি প্রস্তুত করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যগুলির জন্যে গুরুত্ব আরোপ না করেই শুধুমাত্র দামের গড়ের উপর ভিত্তি করে। তবুও এই সূচকগুলি একটি পরিবর্তনের অভিমুখের সংকেত দেয়। বিনিময়ের হারের উন্নতি বা অবনতি দুটোকেই লঘু করে দেখানোর একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় (পণ্ডিত মোট ও নীট দ্রব্য বিনিময় হারের যে হিসাব করেছেন তার সঙ্গে আমাদের উল্লিখিত স্থূল বিনিময় সূচকের তুলনা করলে এই প্রবণতা স্পষ্ট হয়)। তার কারণ অবশ্য এই যে রপ্তানির পরিমাণ ও রপ্তানি পণ্যের দাম প্রায়ই একই সময় পরিবর্তিত হতো। দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন সময়ে বৈদেশিক বিনিময় হারের অবনতি যে ঘটেছিল তার প্রমাণ বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের দামের পরিসংখ্যানের বিস্তৃত বিশ্লেষণ করলেও পাওয়া যায়।[৪৩]

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্রব্যগত গঠন যদিও অপরিবর্তিত থেকে গিয়েছিল, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্কের কথা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, তার বৈদেশিক বাণিজ্যের কাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল। ভারতের বাজারে তখনও পর্যন্ত সর্বাংশে সর্ববৃহৎ রপ্তানিকারী দেশ হলেও বিশের দশকে ভারতের আমদানি বাণিজ্যে ইংল্যান্ডের শতকরা অংশ কমে গিয়েছিল এবং তিরিশের দশকেও এই কমে যাওয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল যদিও অটাওয়া চুক্তির ফলে অবস্থার সামান্য পরিবর্তন হয়েছিল। ভারতের আমদানিতে আমেরিকা ও জাপানের অংশ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ভারত থেকে রপ্তানির ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে, জাপান

ও আমেরিকার অংশ ক্রমবর্ধমান। অবশ্য মন্দা ও অটাওয়া চুক্তির ফলে এই দুই দেশের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছিল এবং ইংল্যান্ড ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অন্য দেশগুলি পুনরায় ভারতের রপ্তানি পণ্যের গুরুত্বপূর্ণ ক্রেতা হয়ে উঠল। ১৯২৬ থেকে ১৯৩১ এই বছরগুলিতেই ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে ইংল্যান্ডের অংশ ছিল সবচেয়ে কম।[৪৪] আমেরিকা বা জাপানের মতো গতিশীল অর্থনীতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হবার সুবাদে ভারত যে কিছু বাড়তি সুবিধা ভোগ করেছিল এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। সাধারণভাবে এই সব উন্নত দেশগুলিতে ভারত যে ধরনের কাঁচামাল রপ্তানি করত তার উপর অনেক কম পবিমাণে নির্ভরশীল ছিল। নিচু মানের তুলোব উপর জাপানের নির্ভরতা ছিল খুবই স্বল্পস্থায়ী এবং উন্নতমানের সুতিবস্ত্র উৎপাদনে জাপান অন্য দেশগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামার সাথে সাথে জাপানের দিক থেকে এই ধরনের তুলোর চাহিদা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। মন্দার পরিস্থিতিতেও ভাবতের কিছুটা লাভ সম্ভব হয়েছিল ইংল্যান্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার জন্যে। কারণ মন্দাব আঘাতে ইংল্যান্ডের অর্থনীতিই ছিল সবচেয়ে কম বিপর্যস্ত। কিন্তু এর পাশাপাশি দেখতে হবে যে জাপানেব সঙ্গে ভাবতের বাণিজ্য সম্পর্কে ক্রমশই অবনতি ঘটছিল এবং এই অবনতিব পেছনে ছিল ব্রিটিশ রাজের *ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স* ও জাপানি দ্রব্যেব বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের নীতি।[৪৫] তবে স্টার্লিং অঞ্চলে প্রধান ডলার উপার্জনকারী হিসাবে ভারতের ভূমিকা অব্যাহত থাকল এবং এমনও প্রস্তাব উঠেছিল যে ভারত ও ইংল্যান্ডকে নিয়ে একটি ইম্পিবিয়াল ফেডারেশন গঠন কবা হোক—অবশ্য সে প্রস্তাব গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয নি।[৪৬] প্রাথমিক কৃষি দ্রব্যের রপ্তানিকারক দেশ হিসাবে ভারতের অবস্থান মন্দার পরিস্থিতিতে খুবই সংবেদনশীল ছিল। যে মন্দাব আঘাতে পুঁজিবাদী দেশগুলি আক্রান্ত হয়েছিল ব্যাপকভাবে তার প্রভাব প্রতিহত করার জন্যে ভারত সরকারের অনুসৃত নীতিব কার্যকাবিতা ছিল খুব সামান্যই।

ভারতে আধুনিক শিল্পে ব্যক্তিগত বিনিযোগের আপেক্ষিক বন্ধ্যাত্বেব দ্বিতীয় কারণ হলো, কিছু পরিমাণে শিল্পাযন হলেও বিশ ও তিরিশের দশকে ভাবত মূলত কৃষি প্রধান অর্থনীতি থেকে গিযেছিল। স্বাভাবিক বছরে মোট জাতীয় আযে ফ্যাক্টরি শিল্পের আয়ের অংশ কদাচিৎ ৬ ভাগের বেশি হতো। সাধারণত মোট জাতীয় আয়ে কৃষিক্ষেত্রের অবদান হতো শতকরা ৬০ ভাগ বা তারও বেশি।[৪৭] কিন্তু মন্দার বছরগুলিতে প্রাথনিক ক্ষেত্রের অবদান কমে গিযে দাঁড়াল শতকরা ৫০ ভাগের মতো। মন্দার ফলে কৃষি উৎপাদনেব মোট মূল্য ভীষণভাবে কমে গিয়েছিল। এমনকি ১৯৩৮-৩৯ সালের মূল্যস্তরে প্রকাশ করলেও কৃষি উৎপাদনের মোট মূল্য মোটামুটি একই স্তরে থেকে গিয়েছিল। মোট মূল্য ১৯১৯-২০ থেকে ১৯৩০-৪০ পর্যন্ত ৭৮০ কোটি টাকা থেকে ৮৪০ কোটি টাকার মধ্যে ওঠানামা করছিল এবং কোনওরকম উর্ধ্বগামী বা নিম্নগামী প্রবণতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না।[৪৮] যদি সমস্ত ধরনের ভোগ্যপণ্যকে দুই যুদ্ধের মধ্যকালীন সময়ে শুল্ক সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়া হতো এবং ভোগ্যপণ্যের চাহিদা যদি কেবলমাত্র মোট জাতীয় আয়ের দ্বারাই নির্ধারিত হতো তাহলে দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ হওয়ার পর আধুনিক শিল্পে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ক্রমশঃ একজায়গায় স্থির হয়ে থেমে যেত।[৪৯] গুরুত্বপূর্ণ ভোগ্যপণ্যের শিল্পগুলি প্রকৃতপক্ষে শুল্ক সংরক্ষণের সুবিধা ভোগ করছিল তবে তা মূলত ১৯২৯-৩০ এর পর থেকে। লোহা ও ইস্পাত এবং কিছু সময়ের জন্যে ভারি রাসায়নিক—এই শিল্পগুলি বাদে মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পে কোনো রকম শুল্ক সংরক্ষণ দেওয়া হয় নি। এই ধরনের শিল্প গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সরকারের দিক থেকে কোনো উৎসাহ

দেওয়ার স্পষ্ট নীতিও ছিল না। সে কারণে দেখি ভারতের জাতীয় আয়ের গঠন ও গতিশীলতার উপর আবহাওয়া ও বিশ্ববাজারের কিছু ঘটনার প্রভাব—যার সঙ্গে প্রাথমিক কৃষিদ্রব্যের চাহিদার সম্পর্ক আছে। আধুনিক শিল্পে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ প্রতিকূল বিশ্ববাজারের প্রভাব থেকে আংশিক সুরক্ষা পেয়েছিল।

তৃতীয়ত, দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা যেমন লক্ষ্য করেছি, ভারত সরকার একটি অতিমাত্রায় সাবধানী অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করছিল। যুদ্ধের আগেকার নীতি থেকে একটি ক্ষেত্রেই সরে যাওয়া হয়েছিল এবং তা হচ্ছে বিভেদমূলক সংরক্ষণ দেওয়ার নীতি। ব্যক্তিগত বিনিয়োগের উপর এর তেমন উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ে নি যতদিন পর্যন্ত না মন্দার সূচনা হলো। মন্দার প্রভাবে ভারত সরকারের বাজেটের ভারসাম্য, ভারতের প্রচলিত শিল্পগুলি এবং ভারতীয় বাজারে গ্রেট ব্রিটেনের অবস্থান সব কিছুই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। যে কোনো ধরনের সংকটের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ভারত সরকারের প্রতিক্রিয়া ছিল বেশি করে শুল্ক চাপানো—কিন্তু অবশ্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশ থেকে আগত আমদানি দ্রব্যের প্রতি আনুকূল্য ও পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে। ভারত সরকারের আয়ের পরিমাণ ভারতের কৃষির অবস্থার উপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল ছিল।[৫০] ভারত সরকার কোনো রকম ঘাটতি ব্যয়ের পক্ষপাতী ছিল না কারণ তা অযোগ্যতার নিশ্চিত নিদর্শক হিসাবে গণ্য হতো। সরকারের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেন উদ্বৃত্তের অবস্থা কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত না এবং ১৯২২-২৩-এর পর ভারতের লেনদেন উদ্বৃত্ত সংক্রান্ত কোনো সমস্যাও ছিল না। তিরিশের দশকেও চলতি খাতে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ভারতের অনুকূলে ছিল। কিন্তু ঐ সময়ে বিপুল পরিমাণ ব্রিটিশ পুঁজি পুনঃপ্রেরণ করার (repatriation) ফলে যে বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রতিবিধান সম্ভব হয়েছিল ভারত থেকে সোনা রপ্তানির মাধ্যমে।[৫১] ভারত সরকার তিরিশের দশকে দেশের অভ্যন্তরেই খুব কম সুদে যথেচ্ছ ঋণ করতে পারত, কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা যেমন দেখেছি, ভারত সরকার সেই সুযোগ নিতে অস্বীকার করে।

তিরিশের দশকে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিল্প উৎপাদনের প্রবণতাকে ঘিরে একটা সমস্যা আছে। মন্দার কয়েক বছরে মোট ব্যক্তিগত বিনিয়োগের পরিমাণ বিশের দশকের মাঝামাঝি বিনিয়োগ যা হতো তার থেকেও বেশি ছিল এবং চিনি, সুতিকাপড় এই জাতীয় কয়েকটি দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ চাহিদার পরিমাণও মন্দার কয়েক বছর বিস্ময়করভাবে একই স্তরে অব্যাহত ছিল। এই ঘটনার ব্যাখ্যা অনেকটা এরকম—বিশের দশকের শেষ দিকে কৃষিতে মন্দা শুরু হয়ে গেছে এবং বিদেশী প্রতিযোগিতার ফলে দেশে আভ্যন্তরীণ শিল্প উৎপাদনও ক্ষতিগ্রস্ত। ফলে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন—দুই ক্ষেত্রেই মন্দার প্রতিকূল প্রভাব পড়েছিল।[৫২] মন্দার সময়ে শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের বিনিময় হার শিল্পজাত পণ্যের অনুকূলে অনেকখানি চলে গিয়েছিল দুটি কারণে। প্রথমত, বিশ্বের বাজারে সামগ্রিকভাবে কৃষিপণ্যের মতো শিল্পজাত পণ্যের দাম তীব্রভাবে হ্রাস পায় নি।[৫৩] দ্বিতীয়ত, শিল্পজাত পণ্য চড়া হারে আমদানি শুল্কের মাধ্যমে সংরক্ষণের সুবিধা পেত কিন্তু কৃষিদ্রব্যের ক্ষেত্রে গমের উপর আমদানি শুল্ক বসানো ছাড়া এ ধরনের কোনো সুবিধা ছিল না। শুল্ক প্রাচীরের নিরাপত্তার ঘোরাটোপে আধুনিক শিল্পে ভালো পরিমাণ বিনিয়োগ যেমন সম্ভব হয়েছিল, তেমনই আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক লেনদেনের পরিমাণও বেড়ে উঠেছিল। আয়ের বণ্টনেও যে পরিবর্তন এসেছিল তা সম্ভবত শহরের মানুষের অনুকূলেই ঝুঁকেছিল। শিল্পজাত পণ্যের আয়গত চাহিদা অপেক্ষাকৃত বেশি

হওয়ার জন্যে শহরে এই সব পণ্যের চাহিদা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। অন্য দিকে ভারতের কৃষিপণ্য বলতে যেহেতু প্রধানত খাদ্যশস্যকেই বোঝাত এবং খাদ্যশস্যের বেশিরভাগ অংশ যেহেতু গ্রামেই ভোগ করা হতো,[৫৪] সেহেতু কৃষিপণ্যের দাম কমে যাওয়ার জন্যে যতখানি আশঙ্কা করা হয় কৃষকের আয় ততখানি কমে নি। অধিকাংশ কৃষকের ক্ষেত্রে সুতিকাপড় ও আখ যদি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বলে বিবেচিত হয় তাহলে সঙ্গতভাবেই ধরে নিতে হবে যে এই দুই পণ্যের চাহিদা দাম ও আয় উভয়ের প্রেক্ষিতেই অস্থিতিস্থাপক। অবশ্য কৃষকদের ভোগের স্তর একই জায়গায় বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল শুধুমাত্র কৃষকদের চলতি আয়ের উপর ভিত্তি করে তা নয়। মন্দার সময়ে কৃষকদের ঋণগ্রস্ততা যে অনেক বেড়ে গিয়েছিল তার অনেক সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে। অত্যাবশ্যক পণ্যের ভোগের মাত্রা আগের মতো বজায় রাখতে কৃষকদের সোনা বিক্রিব প্রয়োজনও হয়েছে। শেযত, সবকারি ব্যয়ের আপেক্ষিক অস্থিতিস্থাপকতাও একটি অন্যতম কাবণ যা ভাবতে আর্থিক আযের মাত্রা কিছু পরিমাণে আগেকাব স্তরে বজায় রাখতে সাহায্য করেছিল (দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

১৯৩০-এব পর থেকে গ্রেট ব্রিটেনেব সঙ্গে ভারতেব যোগাযোগ দুভাবে লাভজনক হয়েছিল অবশ্য সেক্ষেত্রে অনুমান কবে নিতে হবে যে ভারতে ধনতান্ত্রিক অবস্থা চালু ছিল এবং বিশ্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাব সঙ্গে ভারতকে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলতে হতো। প্রথমত, বিশ্বের ধনতান্ত্রিক দেশগুলিব মধ্যে গ্রেট ব্রিটেন ছিল মন্দার ফলে সবচেযে কম ক্ষতিগ্রস্ত দেশ। অন্য দেশগুলির তুলনায় গ্রেট ব্রিটেনে ভারতের রপ্তানিব পবিমাণ এই সময়ে হ্রাস পাওযার মাত্রা ছিল অনেক কম। ১৯৩০ ও ১৯৩১-এ ভারতের রপ্তানিতে গ্রেট ব্রিটেনের অংশ অন্য দেশগুলির তুলনায় অনেক বেশি—এই তথ্যেই একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ কমনওয়েল্থ অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে স্বাক্ষরিত অটাওয়া চুক্তির ফলে শেষপর্যন্ত ভারতের রপ্তানিতে ব্রিটিশদের অংশ আরও বেড়ে যায়। প্রাথমিকভাবে অটাওয়া চুক্তিব প্রয়োজন হয়েছিল ব্রিটেন অবাধ বাণিজ্যের নীতি থেকে বিদায় নেওয়ার ফলে। এই সময় ইম্পোর্ট ডিউটিজ্ অ্যাক্ট অনুসাবে ভারত থেকে আমদানি কবা নানা দ্রব্যের উপর ব্রিটেনকে শুল্ক আরোপ করতে হয়েছিল। ব্রিটিশ পণ্যেব প্রতি ভারতের পছন্দ ও পক্ষপাতিত্ব নানাবিধ সংরক্ষণমূলক শুল্কের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছিল। মন্দার ফলে শিল্পের তুলনায় কৃষি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ভারতের দরাদরি করার ক্ষমতাও ছিল খুব সীমাবদ্ধ যদি ধরেও নেওয়া যায় যে সরকারিভাবে যে প্রতিনিধি দল তখন ব্রিটেনে গিয়েছিল তাদের এ ব্যাপারে নীতি নির্ধারণ করার যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। প্রায় ৫.৫ কোটি পাউন্ড মূল্যের আমদানির জন্যে ভারতের বিশেষ পছন্দের সুবিধা প্রসারিত করা হয়েছিল (১৯২৯-৩০ এর মূল্যস্তরে)। এর বিনিময়ে ব্রিটেনে রপ্তানি করা প্রায় ৪.৭ কোটি পাউন্ড মূল্যের পণ্যের উপর ভারত ব্রিটেন থেকে বিশেষ পছন্দের সুবিধা পেয়েছিল।[৫৫]

এই চুক্তি সম্পর্কে ও তার ফলাফল নিযে ভারতে যথেষ্ট সন্দেহ ও শঙ্কা ছিল। সংরক্ষণের যে সুবিধা ভারতীয় পণ্যের জন্যে দেওয়া হচ্ছে তা ব্রিটিশ পণ্যের প্রতি বিশেষ পছন্দের সুবিধার বিনিময়ে নাকচ হয়ে যেতে পারে এরকম আশঙ্কা ছিল। এও আশঙ্কা ছিল যে ভারতীয় পণ্য বয়কট করে জাপান এর বদলা নিতে পারে (মনে রাখতে হবে যে কাঁচা তুলো ও লোহার মণ্ড যা ভারত থেকে রপ্তানি হতো তার বৃহত্তম ক্রেতা ছিল জাপান)। শেযোক্ত আশঙ্কাটি সত্যে পরিণত হয়েছিল, ফলে ১৯৩৪-এ ভারতকে জাপানের সঙ্গে একটি আলাদা চুক্তি করতে হয়।

কিন্তু ভারতের বাজার দখল করে নেওয়ার জাপানি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় দুটি কারণে—(১) ভারতের সুতিবস্ত্র শিল্পের পরবর্তী ঘটনাবলী এবং (২) ব্রিটেনের সাথে নানাবিধ আনুষ্ঠানিক ও মৌখিক চুক্তি। ব্রিটেনে ভারতীয় কাঁচাতুলোর বাজার এবং ভারতে ব্রিটেনে উৎপাদিত সুতিবস্ত্রের বাজার অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে যে দুটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়—অটাওয়া চুক্তি ও মোদি-লীজ চুক্তি—সেগুলি গ্রেট ব্রিটেনে ভারতীয় কৃষিপণ্য রপ্তানি বাড়াতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্য দেশগুলিতেও ভারতের রপ্তানি বাড়াতে অটাওয়া চুক্তি সাহায্য করেছিল। এই ঘটনাগুলি ভারতীয় কৃষকদের আয় সুরক্ষিত রাখতে যতখানি সাহায্য করেছিল শুল্ক সংরক্ষণের ছত্রছায়ায় গড়ে ওঠা আধুনিক শিল্পগুলিকেও ততখানি সাহায্য করেছিল।[৫৬]

এটা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার যে, এই পর্বে ভারত থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ব্রিটিশ পুঁজি ব্রিটেনে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। যোগান ও উৎপাদনের উপর এর প্রতিকূল প্রভাব অনেক বেশি পরিমাণে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল কারণ *ইম্পিরিয়াল্ প্রেফারেন্স্* এবং আরও নানা ধরনের দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ চুক্তির মাধ্যমে ভারতীয় পণ্যের জন্যে চাহিদার একটি ন্যূনতম সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল।

অনুবাদক : জয়ন্ত আচার্য

উৎস ও টীকা

১। এ প্রসঙ্গে F. A. Lutz এবং D. C. Hague (সম্পাদিত), *The Theory of Capital* (লন্ডন, ১৯৬১) গ্রন্থের অন্তর্গত Tibor Barna-র 'On Measuring Capital' দ্রষ্টব্য।

২। S.M. Rutnagur. *Bombay Industries : The Cotton Mills* (বোম্বাই, ১৯২৭), পৃ. ২০-২১ দ্রষ্টব্য।

৩। *Report on the administration of Bengal, 1899-1900* (কলকাতা, ১৯০০), পৃ. ১২২।

৪। *Report on the administration of the Bombay Presidency* (বোম্বাই, ১৯০১), প্রথম খণ্ড, পৃ. iii।

৫। S.D. Mehta, *The Cotton Mills of India : 1854-1954* (বোম্বাই, ১৯৫৪), পৃ. ৮০-১।

৬। ভারত সরকার, ডিপার্টমেন্ট অফ্ স্ট্যাটিসটিক্স্, *Review of the trade of India, 1899-1900* (কলকাতা, ১৯০০), পৃ. ২৩-৪।

৭। এ প্রসঙ্গে, ভারত সরকার, CISD : *Statistical abstract for British India* (সপ্তম সংখ্যা), ১ম খণ্ড, *Commercial Statistics* (কলকাতা, ১৯১৫), পৃ. iii-v দ্রষ্টব্য।

৮। A. C. Chatterjee র মতে, ১৯০৫-৬ সালে বোম্বাই প্রদেশ ও বন্দর থেকে যুক্তপ্রদেশে ভারতীয় সুতো এসেছিল ১২১,০০০ মণ, অন্যদিকে মূলত কলকাতা বন্দরের মাধ্যমে ইয়োরোপ থেকে আমদানি করা বোনা ও পাকানো সুতো এসেছিল ১৯,০০০ মণ। ঐ বছরই যুক্তপ্রদেশে ইয়োরোপ থেকে সুতিবস্ত্র আমদানি হয়েছিল ৭৭৫,০০০ মণ ও ভারতীয় বস্ত্রের পরিমাণ ছিল ১১১,০০০ মণ (যার বেশির ভাগই

ছিল মেশিনে তৈরি কাপড়)। A. C. Chatterjee [I P G প্রকাশিত], *Notes on the industries of the United Provinces* (এলাহবাদ, ১৯০৮), পৃ. ৫-৬।

৯। D. R. Wallace, *The Romance of Jute* (লন্ডন, ১৯২৮), পৃ. ৬৩-৯।

১০। ভারত সরকার, CISD, *Statistical abstract for British India* (সপ্তম সংখ্যা), ১ম খণ্ড (কলকাতা, ১৯১৫), পৃ. vii এবং ৭৬।

১১। এ প্রসঙ্গে, *Evidence (Report on IIC)*, ২য় খণ্ড (পৃঃ, ১৯১৯, xviii), পৃ. ১৪০-১-এ প্রকাশিত Bengal Paper Mill Co. Ltd, কলকাতার প্রতিনিধি H. W. Carr -এর সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য।

১২। F. Noel-Paton [ভারত সরকার প্রকাশিত], *Notes on Sugar in India* (তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯১৯) পৃ. ১০-১৪, ও পৃ. ৩২-৪০ দ্রষ্টব্য। এ শতাব্দীর সূচনাপর্বে ভারতে চিনি তৈরির প্রচলিত বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে জানতে এছাড়াও H. H. Ghosh : *The Advancement of Industry* (কলকাতা, ১৯১০), পৃ. ৯৩-১১৬ দ্রষ্টব্য।

১৩। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় ভারতের অবস্থান সম্বন্ধে আলোচনাব জন্যে S. B. Saul -এর *Studies in British Overseas Trade*, 1870-1914 (লিভারপুল, ১৯৬০), তৃতীয়, চতুর্থ এবং অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৪। Y. S. Pandit, *India's Balance of Indebtedness, 1898-1913* (লন্ডন, ১৯৩৭)। ১৮৯৮-৯৯ কে ভিত্তিবর্ষ হিসাবে ধরলে দ্রব্য বিনিময় হারের নীট অনুপাত (আমদানি মূল্যসূচক/রপ্তানি মূল্যসূচক) ১৯১৩-১৪ সালে ৭৫-এ নেমে যায়। এ প্রসঙ্গে আরও দ্রষ্টব্য Ray, *India's Foreign Trade Since 1870*, চতুর্থ অধ্যায়।

১৫। *Pandit, India's Balance*, ৫ম অধ্যায়।

১৬। George Blyn, *Agricultural Trends in India 1891-1947 : Output, Availability, and Productivity* (ফিলাডেলফিয়া, ১৯৬৬)।

১৭। V. K. R. V. Rao ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *Papers On National Income and Allied Topics*, প্রথম খণ্ড (লন্ডন, ১৯৬০) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত S. Sivasubramonian-এর 'Estimates of gross value of output of agriculture for undivided India, 1900-01 to 1946-7, পৃ. ২৩১-৪৪ দ্রষ্টব্য।

১৮। S. J. Patel. 'Long-term Changes in Output and Income in India : 1896-1900' *Essays on Economic* Transition (লন্ডন, ১৯৬৫), পৃ. ৩৩-৫০। Blyn -এর ১৯৫১ সালের গবেষণার ফলাফল প্যাটেল ব্যবহার করেছেন এবং সমগ্র ভারতের কৃষি উৎপাদনকে দেখিয়েছেন। Blyn-এর ফলাফল Daniel Thorner এর গবেষণাপত্রেও ব্যবহার করা হয়েছে : 'Long Term Trends of Output in India' : Kuznets ও অন্যান্য সম্পাদিত গ্রন্থ : *Economic Growth : Brazil, India and Japan* (Durham, N. C. ১৯৫৫)। অনুন্নত দেশে জাতীয় আয় পরিমাপের প্রাথমিক ভিত্তি হিসাবে বস্তুগত উৎপাদনকে ভিত্তি হিসাবে ধরার যথার্থতা সম্পর্কে জানতে হলে দ্রষ্টব্য Patel, Long Term Changes, পৃ. ৩৮-৯।

১৯। Sivasubramonian, *National Income* ।

২০। Blyn, *Agricultural Trends,* পরিশিষ্ট সারণি 5c।

২১। K. L. Dutta (ভারত সরকার প্রকাশনা) : *Report on the Enquiry into the Rise of Prices in India* (কলকাতা, ১৯১৪), দশম অধ্যায় ও পৃ. i-xiv (শেষোক্ত অংশে পাওয়া যাবে রিপোর্ট সম্পর্কে সরকারি সিদ্ধান্ত যেখানে আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলিকে লঘু করে বাহ্যিক বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

২২। Davis, *Population of India and Pakistan,* পৃ. ২৬-৭।

২৩। Dutta (ভারত সরকার প্রকাশনা) : *Report on the Enquiry into the Rise of Prices,* তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪-৭ ও ১৯৪-৭, এবং এই গ্রন্থের সারণি ৫.২ দ্রষ্টব্য।

২৪। সাধারণভাবে অসন্তোষজনক বেতন পরিসংখ্যান সম্পর্কে জানতে [ভারত সরকার মুদ্রিত] : *Report on the Enquiry into the Rise of Prices,* প্রথম খণ্ড, পরিশিষ্ট G দ্রষ্টব্য।

২৫। Thavaraj. 'Capital formation in the public sector', সারণি ৩ দ্রষ্টব্য।

২৬। Sivasubramonian : *National Income,* পৃ. ৩৩৮।

২৭। টাটা লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নয়ন ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির বিবরণের জন্যে F. R. Harris, *Jamsetji Nusserwanji Tata : A chronicle of his Life* (বোম্বাই, ১৯৫৮) ; দ্রষ্টব্য। ১৯৩১ সাল পর্যন্ত ভারতে লোহা ও ইস্পাত শিল্পের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের জন্যে D. H. Buchanan-এর *The Development of Capitalistic Enterprise in India* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৩৪), ত্রয়োদশ অধ্যায় এবং বর্তমান গ্রন্থের নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২৮। এই গ্রন্থের ২.৪ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২৯। শিল্প ও কৃষির উন্নয়নের জন্যে মহীশূর সরকারের কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে জানতে মহীশূর রাষ্ট্রের শিল্প বিভাগের Assistant Director, C. Ranganatha Rao Sahib-এর সাক্ষ্য, *Evidence (Report of IIC),* তৃতীয় খণ্ড (পৃ. ১৯১৯, XIX), পৃ. ৫৯০-১ দ্রষ্টব্য ; ১৯০১-২ থেকে ১৯১১-১২ পর্যন্ত সব দেশীয় রাজ্যের বার্ষিক রাজস্বের গড় পরিমাণ ছিল ২৭১, ১৫৫, ০০০ টাকা এবং মহীশূর রাজ্যের বার্ষিক রাজস্বের গড় পরিমাণ ছিল প্রায় ২৪,০০০,০০০ টাকা। এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য *Moral and material progress and condition of India, 1911-12* (পৃ. ১৯১৩, XL VI), পৃ. ২৯-৩০। অন্যদিকে ঐ একই সময়ে ব্রিটিশ ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ ৯০ কোটি টাকা অতিক্রম করে যায়। এ প্রসঙ্গে Reserve Bank of India : *Banking and monetary statistics of India* (বোম্বাই, ১৯৫৪), পৃ. ৮৭২-৩ দ্রষ্টব্য। (আমি রেভেনিউ খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের সঙ্গে মূলধনী খাতে রেলওয়ে ইত্যাদি থেকে আয়কে যোগ করেছি)।

৩০। এই পরিসংখ্যানগুলি I T B থেকে প্রাপ্ত : *Reports on the cotton textile industry* (১৯২৭, ১৯৩২ ও ১৯৩৬), এবং প্রাসঙ্গিক বছরগুলি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য ভারত সরকার, CISD, *Statistical abstract for British India* (কলকাতা, বার্ষিক) বিশদ আলোচনার জন্যে এই গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩১। ভারত সরকার, CISD, *Annual statements of the seaborne trade of British India.*

৩২। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় বাণিজ্যের বিপর্যয় সম্পর্কে জানতে দ্রষ্টব্য Ray, *India's Foreign Trade since 1870,* পঞ্চম অধ্যায়।

৩৩। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের সময় কিছু রেলওয়ের যন্ত্রাংশ মেসোপটেমিয়ায় রপ্তানি করা হয়।

৩৪। ভারত সরকার, CISD. *Review of the trade of India for 1917-18* (কলকাতা, ১৯১৮), পৃ. ২১ ; আরও দ্রষ্টব্য *Review of the trade of India for 1915-16* (কলকাতা, ১৯১৬), পৃ. ৪৫-৭।

৩৫। সংশ্লিষ্ট বছরগুলি সম্বন্ধে জানার সূত্র হলো : ভারত সরকার, CISD, *Review of the trade of India* (কলকাতা, বার্ষিক)।

৩৬। ১৯১৯-২০, ১৯২০-২১ ও ১৯২০-২ সালে নতুন করে রেজিস্ট্রিকৃত কোম্পানির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৯৪৮, ১০৩৯ এবং ৭১৭ ; ১৯১৩-১৪ সালে এই সংখ্যা ছিল ৩৫৬। ১৯১৯-২০, ১৯২০-১ ও ১৯২১-২ সালে এই সব কোম্পানিগুলির পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৫,৭৮১,০০০ টাকা, ৩১,৫০৫,০০০ টাকা ও ১৯,০১৩,০০০ টাকা। ১৯১৩ সালে এই পরিমাণ ছিল ৭,৬৯৪,০০০ টাকা। এ প্রসঙ্গে ভারত সরকার, CISD. *Joint Stock Companies in British India and in the Indian States, 1922-23* (কলকাতা, ১৯২৫), পৃ. (i)।

৩৭। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে Indian Jute Mills Association এর নিকট প্রদত্ত প্রতিবেদনে Dr. S. G. Barker পাটশিল্পে ব্যবহৃত কৃৎকৌশলের বন্ধ্যাত্বের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা বর্তমান গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে উদ্‌ধৃত করা হয়েছে। তাছাড়া দ্রষ্টব্য : S. D. Mehta, *The Indian Cotton Textiles Industry : An Economic Analysis (Bombay, 1953),* প্রথম পরিচ্ছেদ।

৩৮। M. M. Mehta, *Structure of Indian Industries* (বোম্বাই, ১৯৫৫), পৃ. ১৫৮।

৩৯। ঐ, পৃ. ১৭৮-৮১

৪০। আমেরিকা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য : J. A. Schumpeter, 'The Decade of the Twenties', *American Economic Review,* Supplement, মে, ১৯৪৬ ; ইংল্যান্ড সম্পর্কে দ্রষ্টব্য : A. C. Pigon, *Aspects of British Economic History. 1918-25* (লন্ডন, ১৯৪৭) ; এবং সমগ্র বিশ্ব সম্বন্ধে জানতে হলে দ্রষ্টব্য : *W.A. Lewis, Economic Survey, 1919-1939* (লন্ডন, ১৯৪৯)

৪১। Banerji, *India's Balance of Payments,* পৃ. ২৪ (সারণি-II)।

৪২। আরও দ্রষ্টব্য : D. N. Gurtoo, India's Balance of Payments (১৯২০-৬০), (দিল্লী, ১৯৬১), পৃ. ১১০-১১।

৪৩। উদাহরণ হিসাবে এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য : H. A. F. Lindsay, 'World Tendencies Reflected in India's Trade', *J. R. S. A,* LXXIV, No. 3876, 4 March 1927, পৃ. ৩৮৪-৯৪।

৪৪। Venkatasubbiah, *Foreign Trade,* দ্বিতীয় খণ্ড।

৪৫। ভারত ও জাপানের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিষয়ে জানতে হলে দ্রষ্টব্য : C. N. Vakil & D. N. Maluste, *Commercial Relations between India and Japan* (কলকাতা, ১৯৩৭)। ভারতের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে প্রধান বিদেশী রাষ্ট্রগুলির অংশ কতখানি ছিল যে বিষয়ে জানতে হলে দ্রষ্টব্য : *Foreign Trade, দ্বিতীয় খণ্ড।*

৪৬। Schuster, *'Indian Economic Life'।*

৪৭। Sivasubramonian তাঁর *National Income* গ্রন্থে চলতি মূল্যস্তরে ক্ষেত্রগত ও জাতীয় আয়ের হিসাব করেছেন। এই হিসাব থেকে (পৃ. ২৫৫ ও ৩৩৭) এটা স্পষ্ট যে, ১৯২০-২১ সালে জাতীয় আয়ে শিল্প উৎপাদনের অংশ ছিল শতকরা ৮ ভাগ ; অন্যান্য বছরগুলিতে তা শতকরা ৭ থেকে শতকরা ৪ ভাগের মধ্যে ওঠানামা করেছে।

৪৮। Sivasubramonian, 'Estimates of gross value of output of agriculture.' Blyn, *Agricultural Trends,* পৃ. ৩৪৯-৫০-তে দেখানো হয়েছে যে ব্রিটিশ ভারতে ১৯২১-২২ থেকে ১৯৪০-৪১ এর মধ্যে সমস্ত কৃষিপণ্যের উৎপাদন ছিল ১০০০ কোটি টাকা মূল্যের কমবেশি (স্থির মূল্যে ধরলে)।

৪৯। এ প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় ও তার পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৫০। নির্ভরশীলতার মাত্রা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্যে Sir John Cumming (সম্পাদিত), *Modern India* (লন্ডন, ১৯৩১), গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত Lord Meston এর প্রবন্ধ 'Public Finance', বিশেষ ভাবে পৃ. ২২০-২১ দ্রষ্টব্য।

৫১। Gurtoo, *India's Balance of Payments,* ষষ্ঠ অধ্যায়, এবং Banerji, *India's Balance of Payments : Estimates,* পৃ. ১৯১-৯৬ দ্রষ্টব্য। Banerji-র হিসাব অনুযায়ী ১৯২১-২ থেকে ১৯৩৮-৯ সালের মধ্যে ভারত সরকারের বৈদেশিক ঋণের প্রায় ১,৪৯২.৩ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করা হয়েছিল। এই পরিমাণের মধ্যে প্রায় ১,০০০ মিলিয়ন টাকা ১৯৩১-২ থেকে ১৯৩৫-৬ পর্যন্ত পাঁচ বছর সময়কালের মধ্যে ফেরৎ দেওয়া হয়।

৫২। ১৯২৩-৪ থেকে ১৯২৫-৬ পর্যন্ত বছরগুলিতে ভারত সরকার মুদ্রসংকোচনের নীতি অনুসরণ করে। তার ফলশ্রুতি হলো ভারত সরকারের সুষম বাজেট এবং টাকার স্থিতিশীল বৈদেশিক বিনিময় মূল্য (১ টাকা=১ শিলিং ৬ পেন্স)। টাকার বর্ধিত বিনিময় (বৈদেশিক) মূল্য সম্ভবত প্রাথমিক দ্রব্য রপ্তানিকারীদের সাহায্য করেছিল এবং ভারতীয় পণ্য-প্রস্তুতকারীদের দেশে ও বিদেশে বৈদেশিক প্রতিযোগিতার মুখে ঠেলে দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ Mysore Iron Works প্রদত্ত লিখিত সাক্ষ্য (অক্টোবর ১৬, ১৯২৮), I T B : *Report on the removal of the revenue duty on pig iron including the evidence recorded during the enquiry* (কলকাতা, ১৯৩০), পৃ. ২৩।

৫৩। League of Nations, *The Causes and Phases of the World Economic Depression* (জেনিভা, ১৯৩১), পৃ. ১৫৬-৭০।

৫৪। উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য : S. A. Husian, *Agricultural Marketing in Northern India* (লন্ডন, ১৯৩৭), অধ্যায় ৪।

৫৫। Sir Padamji P. Ginwala, 'India and the Ottawa Conference', *JRSA*, ৮১, সংখ্যা ৪, ১৭৫, নভেম্বর ২৫, ১৯৩২, পৃ. ৫০।

৫৬। ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে বাণিজ্যের ধরনের উপর অটাওযা চুক্তির ফলাফল বিশ্লেষণের জন্যে দ্রষ্টব্য : B. N. Adarkar, 'The Ottawa Pact', Radhakamal Mukherjee, *Economic Problems of Modern India*, খণ্ড ১ (লন্ডন, ১৯৩৯), পৃ. ৩৭৮-৯৫। অটাওয়া চুক্তি স্থায়ীভাবে ভারতীয় আমদানিতে ব্রিটেনের অংশ হ্রাসের প্রক্রিয়াকে রোধ করতে পারে নি। যেখানে ভারতীয় রপ্তানিতে ব্রিটিশদেব অংশ ১৯৩০-এ ২১ শতাংশ থেকে ১৯৩২-এ ২৭.৫ শতাংশ এবং ১৯৪০-এ ৩৫.৫ শতাংশে দাঁড়ায় সেখানে ভারতীয় আমদানিতে তাদের অংশ পরিবর্তিত হয় এইভাবে : ১৯৩২-এ ৪২.৮, ১৯৩২ -এ ৩৫.৪, ১৯৩৫-এ ৪০.৬ এবং ১৯৪০-এ ২৫.২ শতাংশ। এই ধরনের অসদৃশ বিচলনের কারণগুলি জটিল : যেমন, কিছু কাঁচামাল ও কৃষিপণ্য যুক্তরাজ্যকে রপ্তানি করার ক্ষেত্রে ভারতের প্রায়-একচেটিয়ামূলক অবস্থান যা শক্তিশালী হয়েছিল বিশেষ পছন্দজনিত ব্যবস্থায় এবং ভারতের বাজারে জাপানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় গ্রেট ব্রিটেনের ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির (Imperial Preference-এর সুবিধা থাকা সত্ত্বেও) অক্ষমতা। দ্রষ্টব্য : Venkatasubbiah : *Foreign Trade of India*, পৃ. ৫৪-৭০ (পরিসংখ্যানের জন্যে)। আরও দ্রষ্টব্য : H. A. F. Lindsay, 'Recent Tendencies of Indian Trade', *JRSA*, ৮১, ১৯৩৩, পৃ. ৪৫৭ ; Sir David B. Meek, 'Indian External Trade', *JRSA*, ৮৪, ১৯৩৬, পৃ. ৮৩৫-৬৯, এবং 'World Economic Controls and India's Part in These', *JRSA*, ৮৭, ১৯৩৯, পৃ. ৫৫৪-৬৯ ; B. N. Ganguli, *Reconstruction of India's Foreign Trade* (নিউ দিল্লী, ১৯৪৬), পৃ. ২০-৪।

অনুবাদক : জয়ন্ত আচার্য

৪

জমি ও কাঁচামালের যোগান

উন্নয়নের কোনো কোনো তত্ত্বে অর্থনৈতিক অনুন্নতির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উৎপাদনের উপকরণের অপ্রাচুর্যের উপর প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সব তত্ত্বে সাধারণভাবে উৎপাদনের উপকরণগুলিকে অনুসরণ করে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—জমি, শ্রম ও মূলধন। অবশ্য আধুনিক ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে আরও অতিরিক্ত একটি উপকরণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়—তা হলো 'সংগঠন' (মার্শালের 'প্রিন্সিপিল্‌স্' দ্রষ্টব্য) অথবা 'উদ্যোক্তার ভূমিকা' (শুম্‌পিটারের উন্নয়নতত্ত্বে বিশদভাবে আলোচিত)।[১]

উৎপাদনের উল্লিখিত উপকরণগুলির মধ্যে মুখ্যত জমি নিয়েই বর্তমান অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব। আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, আমরা ১৯৩৯ পর্যন্ত ভারতে সীমিত শিল্প বিকাশের ফলে কাঁচামাল ও খাদ্যশস্যের যে চাহিদা সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রতিক্রিয়ায় ভারতের কৃষিউৎপাদন ও কৃষক সমাজ কীভাবে সাড়া দিয়েছিল বা সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছিল সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। এই আলোচনায় দু ধরনের ভুল সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন। প্রথমত, কেউ কেউ এমন অনুমান করেছেন যে অর্থনৈতিক সুযোগ ও সম্ভাবনা সদ্ব্যবহার করার ব্যাপারে ভারতের কৃষক সমাজের আচরণ ছিল যুক্তিহীন ও অসঙ্গত। এ ধরনের অনুমান কয়েকটি ত্রুটিপূর্ণ আশ্রয়বাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন, একটি অনুন্নত দেশের কৃষক সম্প্রদায় নিরক্ষরতা ও চিরাচরিত মূল্যবোধের কারণে প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সমাজকাঠামোয় বন্দী থাকে। ফলে, নতুন আর্থিক সম্ভাবনা দেখা দিলেও সবচেয়ে লাভজনক উৎপাদন কৌশল কী হবে তা তারা চিনে নিতে পারে না। অথবা, কখনও তা চিনে নিতে পারলেও সেই কৌশল বাস্তবে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে কূপমণ্ডুক সমাজকাঠামো প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এই বিষয়ে ইতিমধ্যে যে তথ্যভিত্তিক গবেষণা হয়েছে তা উপরের অনুমান ও তার আশ্রয়বাক্যকে অসার বলে প্রমাণিত করেছে। কৃষকের চেতনা ও যুক্তিবোধ এতখানি অসঙ্গত বা ভোঁতা হয় না যে অর্থ উপার্জনের ভালো সুযোগ ও সম্ভাবনার গন্ধও সে চিনতে পারে না। পশ্চাৎপদ সমাজব্যবস্থার মধ্যেও আর্থিক লাভ করার সুযোগ এলে তাতে সাড়া দেওয়ার অবকাশ থাকে। অন্যদিকে, কৃষকদের আচরণের মধ্যে বৈষয়িক বুদ্ধির ছাপ দেখে কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ এতটাই প্রভাবিত হয়েছেন যে তাঁরা কৃষকদের দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন উভয় ধরনের আচরণের উপরেই যুক্তিদৃঢ়তা আরোপ করেছেন। দুভাবে তাঁরা এটা করার চেষ্টা করেছেন। প্রথমত, তাঁদের যুক্তিতে স্বল্পকালীন সময়ে সম্পদ ব্যবহারে কৃষকরা যে যুক্তিবাদী মানসিকতার পরিচয় দেন, দীর্ঘস্থায়ী ভাবে জমির উর্বরতা বাড়ানো ও শ্রমসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারেও একই স্তরের বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। দ্বিতীয়ত, এই ধরনের যুক্তির প্রবক্তারা উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করার ক্ষেত্রে সরকার ও সমজাতীয় সংস্থাগুলি যে ভূমিকা পালন করেছে

তাকে অনেক লঘু করে দেখিয়ে থাকেন। দুটি ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট অর্থনীতিবিদ্‌রা যা স্বীকার করেন নি তা হলো এই যে, বহু ক্ষেত্রে, চাষীরা ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণ যুক্তি মেনে চললেও এবং বৈষয়িক উদ্যোগের পরিচয় দিলেও কতকগুলি পরিবর্তন যৌথ সামাজিক উদ্যোগ ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না। কিন্তু যৌথ উদ্যোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় সরকার বা প্রাক্‌-ধনতান্ত্রিক বা ধনতান্ত্রিক সমাজকাঠামো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এ ধরনের যৌথ উদ্যোগের অভাবেই গ্রামাঞ্চলে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা সার্থক হয়ে ওঠেনি। ভারতে শিল্পায়নের অভিঘাতে কৃষির যে বিকাশ ঘটেছিল তার বিবরণ নিচে দেওয়া হলো। ফসল উৎপাদনের রীতি ও ধরনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার ব্যাপারে কৃষকের আচরণে যে বিষয়বুদ্ধির ছাপ পাওয়া যায়, তার পরিচয় এখানে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। অবশ্য ব্যাপক নিরক্ষরতা ও পশ্চাৎপদ কৃষি কাঠামোর চাপে কৃষকদের বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগের ক্ষেত্র সংকীর্ণ হয়ে উঠেছিল, ফলে কৃষকদের একক ও যৌথ উদ্যোগও ব্যাহত হয়েছিল—সে কথাও এই আলোচনায় স্মরণে রাখা হয়েছে।

৪.১ কৃষি-বিকাশের পটভূমি এবং জমির উৎপাদনশীলতার সাধারণ প্রবণতা

যে শিল্পগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তার মধ্যে চারটি শিল্প ছিল কৃষিজাত কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং, কৃষিতে যেটুকু এবং যে ধরনের উন্নতি ঘটেছিল তার প্রত্যক্ষ প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই এই সব শিল্পের উপর পড়েছিল। আমরা মূলত কৃষিজাত যে সব কাঁচামাল শিল্পে সরাসরি ব্যবহার হতো সেগুলি নিয়ে আলোচনা করব। ভারতে শিল্পজাত দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং শিল্প শ্রমিকদের ভোগ্যপণ্যের জন্যে ব্যয়ের মাত্রা কৃষির বিকাশের দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছিল, কিন্তু তার বিস্তারিত আলোচনা এখানে করা হবে না। কৃষিপণ্যের দামের ওঠা-নামা মূলত নির্ভর করত বিশ্বের বাজারের ঘটনাবলীর উপর। শ্রমিকদের ব্যবহৃত ভোগ্যপণ্যের দামও একইভাবে নির্ভর করত বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ও তারপর পাঁচ-ছয় বছর পর্যন্ত শ্রমিকদের ব্যবহার্য খাদ্যশস্যের দাম অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু শিল্পজাত পণ্যের দামও এই সঙ্গে বেড়ে যাওয়ার ফলে খাদ্যশস্যের দামের বৃদ্ধি অনেকাংশে পুষিয়ে গিয়েছিল। খাদ্যের ঘাটতির ফলে মজুরি বেশি রকম বাড়াতে হয়েছে, এরকম কোনো সমস্যার সম্মুখীন শিল্পপতিদের হতে হয়নি।

ভারতীয় কৃষিতে একরপিছু উৎপাদন ও মাথাপিছু আয় অত্যন্ত কম হওয়ার ফলে (যেহেতু মাথাপিছু জমি ছিল খুব কম) অধিকাংশ ভোগ্যপণ্যের বাজার ভীষণভাবে সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল। আবার আয়ের বণ্টনে তীব্র বৈষম্য থাকার জন্যে উন্নতমানের গণভোগের সামগ্রীর বাজার ছিল আরও বেশি সংকীর্ণ ও সীমিত।

সারা ভারতে কৃষিকাজ ছিল পরিবারভিত্তিক। কৃষক পরিবারের বেশির ভাগই ছিল অল্প জমির মালিক এবং তারা যে জমি চাষ করত তার অধিকাংশের মালিকানা ছিল অন্যলোকের। জমিদার বা ধনী চাষীদের একটি ক্ষুদ্র অংশ দেশের সিংহভাগ জমির মালিক ছিল, অন্যদিকে দেশের দরিদ্র কৃষকদের বিশাল গোষ্ঠীর মালিকানায় ছিল মোট জমির অতি নগণ্য অংশ। এই দুই মেরুর মধ্যবর্তী স্তরে ছিল কিছু সম্পন্ন কৃষকের ক্ষীণ স্তর। যদিও জমির উপর মালিকানা স্বত্বের আইনী রূপ ভারতের নানা অঞ্চলে নানা ধরনের ছিল, তবু বলা যায় যে সারা দেশে

সারণি ৪.১ ১৯০০-০১ থেকে ১৯৩৯-৪০ (পাঁচ বছরের গড়) পর্যন্ত ভারতের চাষের এলাকা এবং একর প্রতি গড় উৎপাদন

সময়কাল	খাদ্যশস্য			বানিজ্যিক ফসল			সকল ফসল		
	এলাকা (মিলিয়ন একর)	উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য (মিলিয়ন টাকায়)	একর প্রতি গড় উৎপাদন (টাকায়)	এলাকা (মিলিয়ন একর)	উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য (মিলিয়ন টাকায়)	একর প্রতি গড় উৎপাদন (টাকায়)	এলাকা (মিলিয়ন একর)	উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য (মিলিয়ন টাকায়)	একর প্রতি গড় উৎপাদন (টাকায়)
১৯০০-১—১৯০৪-৫	২২১.০	৫,৬০২.৬	২৫.৪	৫৫.৪	২,০৩৩.৬	৩৬.৭	২৭৬.৪	৭,৬৩৬.২	২৭.৬
১৯০৫-৬ — ১৯০৯-১০	২৩১.০	৫,৫১২.৪	২৩.৯	৬১.৮	২,০৭৯.৪	৩৩.৬	২৯২.৮	৭,৫৯১.৮	২৫.৯
১৯১০-১১ — ১৯১৪-১৫	২৩৮.৩	৫,৯১৮.৬	২৪.৯	৬৬.৫	২,১৯০৬	৩২.৯	৩০৪.৮	৮,১০৯.২	২৬.৬
১৯১৫-১৬ — ১৯১৯-২০	২৩৯.৫	৫,৯৯২.৫	২৫.০	৬২.৮	২,২৭২.৮	৩৬.২	৩০২.৩	৮,২৬৫.৪	২৭.৩
১৯২০-২১— ১৯২৪-২৫	২৩৮.১	৫,৬২৬.০	২৩.৭	৬৩.০	২,৩৫৭.০	৩৬.৮	৩০২.১	৭,৯৯৩.০	২৬.৫
১৯২৫-২৬ — ১৯২৯-৩০	২৩৮.১	৫,৫০৩.২	২৩.১	৭১.৭	২,৪৫৫.৮	৩৪.২	৩০৯.৮	৭,৯৫৯.০	২৫.৭
১৯৩০-৩১ — ১৯৩৪-৩৫	২৪৭.০	৫,৭০২.০	২৩.১	৭১.৮	২,৬০৭.৮	৩৬.৩	৩১৮.৮	৮,৩০৯.৮	২৬.১
১৯৩৫-৩৬ — ১৯৩৯-৪০	২৪৪.৫	৫,৫৫০.০	২২.৭	৭৫.৩	২,৮৫২.০	৩৭.৯	৩১৯.৮	৮,৪০২.০	২৬.৩

সূত্র : Sivasubramonian, 'Estimates of gross value of output of agriculture', পৃ. ২৩১-৪৬, এই সূত্রের ভিত্তিতে উপরোক্ত পরিসংখ্যান নির্ণয় করা হয়েছে।

টীকা : (ক) ১৯৩৮-৯ সালের দামস্তরের ভিত্তিতে মূল্যগুলি পরিমাপ করা হয়েছে।

(খ) খাদ্যশস্য : ধান, গম, জোয়ার, বাজরা, বার্লি, ভুট্টা, রাগি, দানাশস্য ও অন্যান্য খাদ্যশস্য এবং ডাল।

বাণিজ্যিক শস্য : তিসি, তিল, সর্ষে ও রাই সর্ষে, চীনাবাদাম, রেড়ি, অন্যান্য তৈলবীজ, আখ, চা, কফি, তামাক, তুলো, পাট, নীল, আফিম এবং অন্যান্য শস্য।

সারণি ৪.২ ভারতের বিভিন্ন শস্যের একর প্রতি উৎপাদন (১৯৩৮-৯-এর দাম স্তরের ভিত্তিতে নির্ণিত একর প্রতি উৎপাদনের মূল্য)

সময়কালের বার্ষিক গড়	ধান	তুলো	আখ	গম	জোয়ার	পাট
১৯০০-১ — ১৯০৪-৫	৪২.৪৯	১৫.০৪	১৩৭.৩৬	২২.৯২	১১.৯৭	৮৩.২৬
১৯০৫-৬ — ১৯০৯-১০	৩৭.৬৪	১৪.৬৪	১৩২.৩০	২২.৪৫	১৬.৬১	৬৮.৩০
১৯১০-১১ — ১৯১৪-১৫	৪০.৪৮	১৪.৬২	১৫২.৬৫	২৩.৯৮	১৭.০৫	৮১.৮৪
১৯১৫-১৬ — ১৯১৯-২০	৩৯.৭৬	১৫.৭৯	১৬৩.৮১	২৩.২২	২৭.৮৩	৮৪.১০
১৯২০-১ — ১৯২৪-৫	৩৭.৪৪	১৮.৪২	১৬২.৬৪	২৩.১৮	২২.২০	৭৬.৭৬
১৯২৫-৬ — ১৯২৯-৩০	৩৬.৯১	১৮.১৮	১৬৬.০১	২১.৫৬	১৩.৮৯	৮৪.৪৭
১৯৩০-১ — ১৯৩৪-৫	৩৭.৬৫	১৭.০৩	২০৭.০৩	২১.১১	১৩,৩৭	৮৭.৩৪
১৯৩৫-৬ — ১৯৩৯-৪০	৩৫.০৮	১৯.২৮	২০২.৬৯	২৪.৪৫	১৩.৫৩	৮১.৪১

সূত্র : Sivasubramonian, 'Eastimates of gross value of output of agriculture', প্রতিটি শস্যের চাষের এলাকা ও উৎপাদিত পণ্যের মূল্য সম্পর্কিত তথ্যাদি এই সূত্র থেকে প্রাপ্ত এবং সেগুলির ভিত্তিতে উপরোক্ত পরিসংখ্যান নির্ণয় করা হয়েছে।

সাধারণ চাষীদের অবস্থা ছিল একইরকম—দারিদ্র্যপীড়িত, নিরক্ষর এবং সুদখোর মহাজন, উচ্চ শ্রেণীর মানুষ ও ভূস্বামীদের নিপীড়নের শিকার। অধিকাংশ কৃষকের পক্ষেই জমিতে চাষের অধিকার ছিল জমির মালিকের ইচ্ছাধীন। ফলে চাষের কাজে বিনিয়োগের ইচ্ছা ও সামর্থ্য তাদের ছিল অতি ক্ষীণ। অধিকাংশ কৃষকের বিনিয়োগযোগ্য এমন পুঁজি ছিল না যা দিয়ে তারা যন্ত্রপাতি বা সার কিনতে পারত। এ ধরনের বিনিয়োগের জন্যে ঋণ করতে যে হারে সুদ দিতে হতো তার তুলনায় বিনিয়োগ লভ্যাংশের হার ছিল খুব কম।[২]

ভারতীয় কৃষকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ভয়াবহ দারিদ্র্য এবং ভারতে কৃষিজমির বিশাল অংশ খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্যে ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও এটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে, ১৯০০থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত কৃষিজাত কাঁচামালের উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বেড়েই গিয়েছে। কৃষিজাত কাঁচামালের একটা অংশ রপ্তানি হতো এবং বাকি অংশ শিল্প উৎপাদনে ব্যবহৃত হতো। সারণি ৪.১-এ এই ঘটনার প্রমাণ মিলবে।

৪.১নং সারণি থেকে অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। সেগুলি হলো : (১) ১৯১০-১১থেকে ১৯২৯-৩০ এর মধ্যবর্তী বছরগুলিতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের অধীন চাষের এলাকার কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি তেমন ঘটেনি; (২) ১৯২০-২১-এর পর থেকে খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে একর পিছু উৎপাদনশীলতা ক্রমান্বয়ে কমে এসেছে এবং আলোচ্য সময়কালের শেষে পাঁচ বছরে উৎপাদনশীলতার গড় পরিমাণ প্রথম পাঁচ বছরের তুলনায় বেশ কমে গিয়েছিল; মোট চাষযোগ্য জমির তুলনায় বাণিজ্যিক ফসল চাষের এলাকার অনুপাত উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং সেই সঙ্গে কৃষিজাত সামগ্রীর মোট মূল্যের তুলনায় বাণিজ্যিক মূল্যও বেড়ে গিয়েছিল; ১৯১৫-১৬-র পর থেকে ১৯২০-৩০ পর্যন্ত সময়কালে বাণিজ্যিক ফসলের উৎপাদনশীলতার আপেক্ষিক ভাবে স্থায়িত্ব এসেছিল, এমন কি শেষ দশ বছরে উল্লেখযোগ্য উন্নতিও ঘটেছিল।

একরপিছু উৎপাদনশীলতার হ্রাস-বৃদ্ধি আরও ভালোভাবে যাতে বিশ্লেষণ করা যায় তার জন্যে প্রথমে সমগ্র ভারতে এবং পরে কয়েকটি প্রদেশে নির্দিষ্ট কয়েকটি শস্যের একরপিছু উৎপাদনশীলতা কী রকম ছিল তা ৪.২, ৪.৩ ও ৪.৪ নং সারণিতে দেখানো হয়েছে।

এই সারণিগুলি থেকে এটা স্পষ্ট যে ধানের একরপিছু উৎপাদন ক্রমশ কমে গেছে। পাশাপাশি এটাও স্পষ্ট যে ১৯২০-২১ থেকে তুলোর একরপিছু উৎপাদন এবং ১৯২৫-২৬ থেকে আখের একরপিছু উৎপাদন ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আখের উৎপাদনের ক্ষেত্রে ১৯৩০-৩১সালের পর এই বৃদ্ধি আরও নাটকীয় মোড় নিয়েছে।

জর্জ ব্লিন ভারতে একরপিছু উৎপাদনের প্রবণতা সম্পর্কে যে অনুসন্ধান করছেন[৩] তা শিবসুব্রামোনিয়ানের আলোচনার ভিত্তিতে আমরা উপরে যে মতামত দিয়েছি তাকেই সমর্থন করে। সমস্ত ধরনের খাদ্যশস্যকে একত্রে ধরলে এটা স্পষ্ট যে, একরপিছু উৎপাদনের হার ক্রমাগত কমে যাচ্ছিল, বিশেষ করে ১৯১১ সালের পর হ্রাসের এই প্রবণতা নিঃসন্দেহে জোরদার হয়ে উঠেছিল। ধানের একরপিছু উৎপাদন কমে যাওয়ার ফলেই সাধারণভাবে উৎপাদন হ্রাসের প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। যদিও ১৯১১ পর্যন্ত গমের একরপিছু উৎপাদন খুব সামান্য হলেও বাড়ছিল, তবু মোট উৎপাদনের উপর প্রভাব ফেলার ক্ষেত্রে গমের উৎপাদনে সামান্য বৃদ্ধি ধান উৎপাদন কমে যাওয়ার তুলনায় ছিল খুব নগণ্য। এর কারণ হলো ভারতে মোট যা খাদ্যশস্য উৎপন্ন হতো তার অর্ধেক হলো ধান এবং ধানের মোট উৎপাদনের

সারণি ৪.৩ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আখের একর প্রতি উৎপাদন (পাউন্ড), ১৯১২-১৩ থেকে ১৯৩৮-৩৯ পর্যন্ত

বার্ষিক গড়	যুক্তপ্রদেশ	মাদ্রাজ	বিহার এবং উড়িষ্যা*	সিন্ধুসহ বোম্বাই+	পাঞ্জাব	মধ্যপ্রদেশ এবং বেরার	সিন্ধুপ্রদেশ
১৯১২-১৩—১৯১৩-১৪	১,৮১৩.৫	৪,০৮৫.০	২,৪৬৪.০	৫,৩৪৩.০	১,৬৭৯.০	২,৩৮৩.০	n.a
১৯১৪-১৫—১৯১৮-১৯	২,০৯৭.০	৫,১৯২.২	২,৩৩৯.৮	৫,৮৩১.৪	১,৭৬৪.৪	২,৫৯৩.০	n.a
১৯১৯-২০—১৯২৩-৪	২,১৭২.০	৬,০৫৪.২	২,৩৭০০	৫,৪২৯.২	১,৮০১.৬	২,৬৫৪.০	n.a
১৯২৪-২৫—১৯২৮-৯	২,১১১.০	৬,১৫১.৪	২,৩১২.৬	৬,১১৮.৮	১,৭৩৫.২	৩,১১২.৬	n.a
১৯২৯-৩০—১৯৩৩-৪	২,৮৪৮.০	৬,২৯৬.০	২,৫৯২.৪	৬,০৮৮.৪	১,৬৬৮.৬	৩,৫৩৬.৮	n.a
১৯৩৪-৩৫—১৯৩৮-৯	৩,০৫৮.৮	৬,৩৪০.০	২,৫৩৬.২	৫,৫৪৭.২	১,৬৬৪.০	৩,৫২৪.০	৪,৫০৬.৬

সূত্র : Gov. India, CISD: Estimates of area and yield of principal crops in India (কলকাতা, বার্ষিক)।

* ১৯৩৫-৬ থেকে শুধুমাত্র বিহারের তথ্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে : ১৯৩৪-৫ থেকে ১৯৩৮-৯ পর্যন্ত গড় নির্ণয়ে ১৯৩৪-৫-এর ফলনের পরিসংখ্যান বাদ দেওয়া হয়েছে (১৯৩৪-৫সালে বিহার ও উড়িষ্যায় একরপ্রতি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩,৩৮৮) পাউণ্ড।

\+ ১৯৩৩-৪-এর পর থেকে সিন্ধুপ্রদেশ অন্তর্ভুক্ত হয় নি (১৯২৯-৩০ — ১৯৩৩-৪ সময়কালের গড় নির্ণয়ে ১৯৩৩-৪-এর পরিসংখ্যান বাদ দেওয়া হয়েছে।

সারণি ৪.৪ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তুলোর একরপ্রতি উৎপাদন, ১৯১২-১৩থেকে ১৯৩৮-৩৯ পর্যন্ত (সংখ্যাগুলি পাউন্ডে প্রকাশিত)

বার্ষিক গড়	যুক্তপ্রদেশ	মাদ্রাজ	পাঞ্জাব	বোম্বাই*	মধ্যপ্রদেশ এবং বেরার	হায়দ্রাবাদ	সিন্ধুপ্রদেশ+
১৯১২-১৩—১৯১৩-১৪	১৩৫.০	৪৬.০	১০৭.০	৮৭.৫	৮১.০	৪৩.০	১৬২.০
১৯১৪-১৫—১৯১৮-১৯	৯৯.২	৬১.০	১০০.০	৭৯.২	৭৯.০	৬৫.২	১২২.০
১৯১৯-২০—১৯২৩- ৪	১২২.০	৭১.৬	১১৪.২	৮৬.০	৮৫.৮	১০৩.৬	n.a
১৯২৪-২৫—১৯২৮- ৯	১৩০.৮	৭৯.০	১০৯.৬	৭৯ ৮	৪৭.৪	১০২.০	n.a
১৯২৯-৩০—১৯৩৩- ৪	১১৭.৪	৭৯.৮	১২৩.৬	৭২ ০	৭৪.৮	৬০.২	n.a
১৯৩৪-৩৫—১৯৩৮- ৯	১২১.০	৭৯.৪	১৬৬.৮	৬৯.৮	৬৫.৮	৬১ ২	১৭২.২

সূত্র : Gov. India, CISD: *Estimates of area and yield of principal crops in India* (কলকাতা, বার্ষিক)।

* ১৯১৪-১৫ থেকে ১৯২৮-৯ সময়কালে সিন্ধুপ্রদেশকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

\+ একটি দেশীয় রাজ্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তুলনার জন্যে।

পরিমাণ গমের তুলনায় ছিল চারগুণ বেশি। বিপরীত ক্রমে, খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্যান্য কৃষিজাত পণ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একরপিছু উৎপাদনের হারের প্রবণতা ছিল ক্রমবর্ধমান। মূলত চা, তুলো এবং আখের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পাটের ক্ষেত্রে একরপিছু উৎপাদনের তেমন বৃদ্ধি ঘটেনি।

উৎপাদনশীলতার হ্রাসবৃদ্ধির আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গে এলে দেখা যায়যে, ১৯১১ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত সমগ্র পর্ব জুড়ে বৃহত্তর বঙ্গে (অর্থাৎ, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায়) সমস্ত ধরনের ফসলের একরপিছু গড় উৎপাদনের হার স্পষ্টতই ক্রমহ্রাসমান। অবশ্য বৃহত্তর বঙ্গে খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্যান্য শস্যের একরপিছু উৎপাদন বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা গিয়েছিল এবং এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো চা, তৈলবীজ এবং আখ। যুক্তপ্রদেশেও একই ঘটনা — সামগ্রিকভাবে সমস্ত ধরনের শস্যের গড় উৎপাদনের হার ক্রমহ্রাসমান, কিন্তু খাদ্যশস্য ছাড়া অন্যান্য শস্যের একরপিছু উৎপাদনে সামান্য হলেও বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। বৃহত্তর পাঞ্জাব ও মাদ্রাজে খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্যান্য শস্যের উৎপাদনশীলতায় ক্রমবর্ধমান উন্নতির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় যদিও খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে একরপিছু উৎপাদনের হারে স্থিতাবস্থা বজায় ছিল। বোম্বাই ও সিন্ধুপ্রদেশে ১৯১১ সালের পর সমস্ত ধরনের খাদ্যশস্যের উৎপাদনের পরিমাণ স্থির হয়ে এক জায়গায় থেমে গিয়েছিল। এক্ষেত্রে, খাদ্যশস্যের উৎপাদন হ্রাসের গতিকে কার্যকরীভাবে প্রতিরোধ করতে পেরেছিল খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্যান্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির বিপরীতমুখী প্রবণতা, তার ফলে সামগ্রিকভাবে উৎপাদনের পরিমাণে স্থিরতা আসা সম্ভব হয়েছিল।

উৎপাদনের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও একরপিছু উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধির প্রবণতা বিষয়ে যে সব তথ্য পাওয়া যায় তা বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, ফসল চাষের ধরন কী হবে তা স্থির করার ব্যাপারে একরপিছু উৎপাদনের পরিমাণের প্রভাবই ছিল সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। একর পিছু উৎপাদন প্রধানত তিনটি বিষয় দ্বারা নির্ধাবিত হতো : (১) শস্যের মান উন্নয়ন অর্থাৎ যে সব শস্য চাষ করা হচ্ছে সেগুলির উন্নত বা উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবস্থা করা ; (২) জমিতে জলসেচের পরিমাণ বাড়ানো যার ফলে অল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত এলাকাতেও ফসলের উৎপাদন বাড়ত এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক *ইনপুট* ব্যবহারের সুযোগও অনেক বেশি পরিমাণে পাওয়া যেত ; এবং (৩) ব্যক্তিগত উদ্যোগে উৎপাদনেব উপাদানগুলির যোগান বৃদ্ধি করা। আমরা অচিরেই দেখতে পাবো যে ভারত সরকারের নীতির প্রভাব এই তিনটি বিষয়েরই উপর পড়েছিল।

৪.২ সরকারি কৃষিনীতির পরিধি ও সীমাবদ্ধতা ঃ কৃষি গবেষণার ভূমিকা

পুসায় ইম্পিরিয়াল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইন্স্টিটিউট্ স্থাপিত হওয়ার সময় থেকে কৃষি গবেষণার সাথে যুক্ত বিজ্ঞানীদের প্রধান চেষ্টা ছিল ভারতে নানাবিধ শস্যেব উন্নত প্রজাতি উদ্ভাবন করা। স্যার অ্যালবার্ট হাওয়ার্ড উন্নত ধরনের গম, ড. বারবার এবং তাঁর সহযোগীরা উচ্চফলনশীল জাতের আখ এবং বঙ্গদেশে আর. এস. ফিনলো 'কাক্য বোম্বাই' নামের উন্নত ধরনের পাট চাষের কৌশল আবিষ্কার করলেন।[৪]

তুলোর ক্ষেত্রে উনিশ শতকের মধ্যভাগের আগে থেকেই দীর্ঘআঁশ-যুক্ত উন্নত ধরনের তুলো চাষের প্রচলন করার চেষ্টা চলছিল।[৫] এই চেষ্টা আরও বিশেষ প্রেরণা পেল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যখন ইংল্যান্ডের বস্ত্রশিল্পের জন্যে আমেরিকা থেকে দীর্ঘআঁশ-যুক্ত তুলোর যোগানে সংকট দেখা দিল। (আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়েও এইরকম প্রেরণা কাজ করেছিল)।[৬]

শুরু থেকেই সরকারের কৃষি দপ্তরের কর্মী সংখ্যা যথেষ্ট ছিল না। সাধারণ অবস্থায় একটি জেলায় মাত্র একজন কৃষি বিশেষজ্ঞ অফিসার নিযুক্ত করা হতো (কোনো জেলায় তা-ও হতো না)। তাঁর অধীনে কয়েকজন ডেমন্‌স্ট্রেটর কাজ করত। ফলে এঁদের পক্ষে একটি জেলার কৃষকসম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য অংশের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখা সম্ভব হতো না। অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক কলাকৌশলের কিছু কিছু আয়ত্তের মধ্যে থাকলেও চাষবাসের পদ্ধতির সর্বাধুনিক অগ্রগতি সম্পর্কে কৃষকরাও সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে যেতেন। এটা অবশ্যই অনস্বীকার্য যে ভারতীয় কৃষকের পুঁজির পরিমাণ ছিল খুবই কম। সুতরাং, কোনো উদ্ভাবিত উৎপাদনের কৌশলকে গ্রহণযোগ্য করার জন্যে কৃষকদের প্রণোদিত করার প্রয়োজন ছিল। ঐ কৌশল প্রয়োগের জন্যে পুঁজিরও আবশ্যকতা ছিল। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে বিভিন্ন প্রদেশের কৃষিদপ্তরের পক্ষ থেকে ন্যূনতম সংঘর্ষের নীতি নেওয়া হলো এবং এমন ধরনের শস্য জনপ্রিয় করে তোলার প্রয়াস নেওয়া হলো যা ভারতের অনিশ্চিত আবহাওয়ার খেয়ালিপনা সহ্য করতে সক্ষম এবং যা চাষ করলে অতিরিক্ত ব্যয় বহন না করেই অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করা সম্ভব। অবশ্য এই জাতীয় উন্নত প্রজাতির শস্য (বিশেষ করে উচ্চফলনশীল আখ) চাষের জন্যে সেচের কাজে স্বাভাবিকের থেকে অনেক বেশি পরিমাণ শ্রম নিয়োগের প্রয়োজন হতো। তা সত্ত্বেও যে পরিমাণ বিনিয়োগ করা হয়েছিল তার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে উন্নত ধরনের আখ, গম এবং তুলো চাষের দ্রুত প্রসারের এই নীতি অনুসরণ করে বিস্ময়কর ফল পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু যে ক্ষেত্রে কোনো প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ একেবারেই নেওয়া হয়নি তা হলো নতুন কৃত্রিম বা রাসায়নিক সারের প্রচলন করা বা ভারতে ইতিমধ্যেই পুরনো যে কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক সার পাওয়া যেত তার জন্যে চাহিদা সৃষ্টি করা। কৃত্রিম সারের প্রয়োগ সম্পর্কে যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছিল সেগুলির পরিকল্পনা হতো প্রায়শই খারাপ ও অনিয়মিত।[৭] কৃষি দপ্তর বা পুসার কেন্দ্রীয় গবেষণা সংস্থা সমস্ত ধরনের মাটি, বৃষ্টিপাত এবং তাপমাত্রার নানা অবস্থায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করতে পারত না। ফলে, সারের প্রয়োগ সংক্রান্ত গবেষণার ফলাফলগুলি যথেষ্ট প্রত্যয়ের সাথে ব্যবহার করার জন্যে সুপারিশ করা সম্ভব হতো না। কৃষি দপ্তর থেকে রুটিনমাফিক কয়েকটি মাত্র পরীক্ষার ভিত্তিতে এই সব সুপারিশ করা হতো এবং তার ফল হতো বিপর্যয়কর। ফলে কৃষিদপ্তরের দেওয়া পরামর্শ বা সুপারিশের উপর কৃষকদের কোনো আস্থা ছিল না।

ইতিমধ্যে কৃষিদপ্তর থেকে খামারজাত সারের উপযোগিতা এবং ঘুঁটেকে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহারের অপকারিতা সম্পর্কে কিছু মতামত দেওয়া হয়েছিল।[৮] কিন্তু উৎপাদনব্যয় ও দামের সম্পর্কের দিক দিয়ে দেখতে গেলে সে সময় ভারতের বিশাল অঞ্চল জুড়ে জ্বালানি হিসাবে কয়লার চেয়ে ঘুঁটের ব্যবহার ছিল অনেক বেশি লাভজনক। প্রকৃতপক্ষে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভারতীয় কৃষকের কাছে ঘুঁটে ছিল একটি অবাধলভ্য দ্রব্য—কিন্তু কয়লার ক্ষেত্রে সে কথা খাটে না। তাছাড়া সার হিসাবে গোবরের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কৃষকরা নিঃসন্দেহ হলেও ভারতে

গোবরের যোগান এতই অপ্রতুল ছিল যে তা দিয়ে ভারতের জমির নাইট্রোজেনের ঘাটতির ভগ্নাংশও মেটানো সম্ভবপর ছিল না।

তাছাড়া, ভারতের যে সব অঞ্চলে সার হিসাবে সোডিয়াম নাইট্রেট, অস্থিজ সার বা খোলের ব্যবহার চালু ছিল, যে অঞ্চল থেকে এই ধরনের সার স্থানীয়ভাবে ব্যবহারের পরিবর্তে যাতে বিদেশে রপ্তানি না হয় তা দেখার কোনো চেষ্টা সরকার থেকে করা হয়নি। এগুলির দামও যাতে সাধারণ কৃষকের নাগালের বাইরে না চলে যায় সেদিকে নজর দেওয়ারও কোনো উদ্যোগ সরকারের পক্ষ থেকে ছিল না। যদিও এই সমস্ত জিনিস রপ্তানির জন্যে কৃষিদপ্তরের অনুমোদন ছিল না, তবু সরকারের পক্ষ থেকে এমন কোনো সদর্থক পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি যাতে ভারতের কৃষকসম্প্রদায় এগুলি আরও বেশি পরিমাণে ব্যবহার করতে পারে। সরকার এ কাজ নানাভাবে করতে পারত যেমন, সার ব্যবহার করার লাভজনক উপায়গুলি আবিষ্কার করা, সার ব্যবহারের জন্যে অনুদান দেওয়া বা এই সমস্ত সারের রপ্তানিকে উৎসাহ না দিয়ে দেশের মধ্যে সেগুলির উৎপাদন বাড়ানো ইত্যাদি। রয়্যাল কমিশন অন এগ্রিকালচার-এর কাছে মাদ্রাজের কৃষিবিভাগের অধিকর্তা, আর. ডি. অ্যানস্টেডের দেওয়া সাক্ষ্য এ প্রসঙ্গে দেখা যেতে পারে :

> প্রাকৃতিক সারের আরও ব্যাপক ব্যবহারের পথে প্রধান অন্তরায় হলো তার খরচ। সাম্প্রতিক কয়েক বছরে এই খরচ এত বেড়ে গেছে যে অনেক ক্ষেত্রেই তা ব্যবহার করা আর লাভজনক হচ্ছে না। ... এই ঘটনার মূল কারণ হলো যে এই সারগুলি (হাড় ও খোল) প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হচ্ছে এবং বিদেশেও বিশেষ করে সিংহলে যথেষ্ট চাহিদা আছে। ...... যতক্ষণ পর্যন্ত রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই সব দেশজ সারের ব্যবহারের ব্যাপক প্রসার সম্ভবপর নয়।

সারণি ৪.৫ ভারতের আখ উৎপাদনের এলাকা এবং একর প্রতি আখ উৎপাদন, ১৯৩০-১ থেকে ১৯৩৯-৪০ পর্যন্ত (ব্রহ্মদেশ বাদে)

সময়	আখ উৎপাদন এলাকা ('০০০ একরে)	উন্নত ফলনশীল আখ উৎপাদন এলাকা ('০০০ একরে)	আখের একরপ্রতি উৎপাদন (টনে)
১৯৩০-১	২,৯০৫	৮১৭	১২.৩
১৯৩১-২	৩,০৭৭	১,১৭০	১৪.১
১৯৩২-৩	৩,৪২৫	১,৮৪৬	১৪.৬
১৯৩৩-৪	৩,৪২২	২,২৯৫	১৫.১
১৯৩৪-৫	৩,৬০২	২,৪৪৬	১৫.১
১৯৩৫-৬	৪,১৫৪	৩,০৭১	১৫.১
১৯৩৬-৭	৪,৫৮৪	৩,৪৫২	১৪.৭
১৯৩৭-৮	৩,৯১৭	২,৯৬৮	১৪.০
১৯৩৮-৯	৩,২৭০	২,৬৭৩	১১.০
১৯৩৯-৪০	৩,৭৬৭	২,৮৯৩	১২.৮

সূত্র : I T B : *Report on Sugar* (দিল্লী, ১৯৩৮), পৃ. ১৮ ; *Reviews of the Sugar Industry of India* (Supplements to the *Indian Trade Journal*)

কৃত্রিম সারের ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সেখানেও খরচটা বড় প্রশ্ন। সম্প্রতি এগুলির দাম কমানো হয়েছে এবং এই প্রেসিডেন্সিতে অ্যামোনিয়াম সালফেটের ব্যবহার বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃত্রিম সারের প্রয়োগ লাভজনক হতে পারে এমনভাবে যদি দাম কমানো যায় তাহলে চাষীকে সার ব্যবহারে প্রণোদিত করা খুব অসুবিধাজনক হবে না।[৯]

যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে সোরার উৎপাদন খুব বড় আকারেই হতো। কিন্তু এর বেশিরভাগ অংশই রপ্তানি করা হতো। ১৯০৮-এ অতুল চ্যাটার্জ্জী লিখেছিলেন : 'খোলের তুলনায় খরচ অনেক বেশি হওয়ার জন্যে দেশে শোরার ব্যবহার খুবই নগণ্য ছিল।'[৯ক] ১৯৩০-এর দশকের শেষভাগে ভারতে সামগ্রিকভাবে কৃত্রিম সারের প্রচলন ছিল খুবই কম। অ্যামোনিয়াম সালফেট এবং অন্যান্য কৃত্রিম সারের ব্যবহার ছিল যথাক্রমে ৭০০০০ টন এবং ২৫০০০ টন। এর মধ্যে বাগিচা চাষের জন্যে ব্যবহৃত সারের পরিমাণও ধরা আছে।[৯খ] অতএব কৃষিউৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে পৃথিবীতে যে অন্যতম ফলপ্রসূ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে তা ভারতে ১৯২৯ পর্যন্ত ছিল একেবারেই উপেক্ষিত। আর তিরিশের দশকে মহামন্দা শুরু হওয়ার পর চাষবাসের জন্যে কৃষকদের বেশি করে বিনিয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া আরও অর্থহীন হয়ে পড়ল।

৪.৩ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আখ ও তুলোর ফলনে পরিবর্তনের ধারা

আলোচ্য পর্বের সমস্ত সময় জুড়ে দেখা যায় যে, বিভিন্ন শস্যের চাষের অধীন এলাকার পরিমাণ ও সংশ্লিষ্ট শস্যের দাম পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। প্রথম দিকে—এ. আর. সিনহা, এইচ. সি. সিনহা এবং জে. আর গুহঠাকুরতা এবং পরবর্তীকালে ধরম নারায়ণ, রাজকৃষ্ণ এবং রাব্বানির গবেষণা ও অনুসন্ধান থেকে এই সম্পর্কের অস্তিত্বের জোরালো সমর্থন পাওয়া যায়।[১০] যুদ্ধের আগে খাদ্যশস্যের চাষের অধীন এলাকা সঙ্কুচিত হয়ে অন্যান্য শস্যের চাষ-এলাকার পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল। এর প্রধান কারণ হলো, প্রতিযোগী শস্যের তুলনায় তুলো বা কাঁচাপাটের দাম বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে এগুলির বৈদেশিক চাহিদাও বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।[১১]

কিন্তু ১৯২১ সালের আগে অর্থকরী ফসলের একরপিছু উৎপাদনের হারে ঊর্ধ্বমুখী গতি লক্ষ্য করা যায়নি।[১২] ১৯২১-এর পর যে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শুরু হয় তার সঙ্গে উন্নত ফলনশীল বীজের প্রচলনের গভীর সম্পর্ক আছে। সারণি ৪˙৫ এ আখচাষ সম্পর্কে যে পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে তার থেকে এই অনুমানের স্পষ্ট সমর্থন পাওয়া যায়।

অনুরূপভাবে তুলোর ক্ষেত্রেও একরপিছু উৎপাদন বেড়ে যাওয়ার ঘটনা দীর্ঘ তন্তুবিশিষ্ট তুলো (যে ধরনের তুলোর আঁশের দৈর্ঘ্য ৭/৮ ইঞ্চি বা তারও বেশি) চাষের প্রচলন ও প্রসারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। যুদ্ধের আগে যদিও দেশীয় দীর্ঘ আঁশবিশিষ্ট তুলোর (যেমন টিনেভেলি তুলো) উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছিল, প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলোর (বিশেষ করে, আমেরিকার তুলো) উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেল ১৯২৬-এর পর থেকে।[১৩]

১৯২৭-২৮ থেকে ১৯৩১-৩২—এই পর্বে তুলো চাষের মোট এলাকার শতকরা ৭৫ ভাগ অংশেই উৎপন্ন হতো ৭/৮ ইঞ্চি দৈর্ঘ বিশিষ্ট সাধারণ মানের তুলো। বাকি শতকরা ২৫ ভাগ জমিতে যা হতো তা হলো মাঝারি থেকে দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলো ৭/৮ ইঞ্চি থেকে ১ ইঞ্চি

সারণি ৪.৬ ব্রহ্মদেশ বর্জিত ব্রিটিশ ভারতের সেচ এলাকা, ১৯০০-১ থেকে ১৯৩৮-৯ ('০০০ একরে)

প্রদেশ	১৯০০-১		১৯১০-১১		১৯২০-১		১৯৩০-১		১৯৩৮-৯	
	সেচ এলাকা	চাষের মোট এলাকা	সেচ এলাকা	চাষের মোট এলাকা	সেচ এলাকা	চাষের মোট এলাকা	সেচ এলাকা	চাষের মোট এলাকা	সেচ এলাকা	চাষের মোট এলাকা
বাংলা	৭৪৮	৬২,০৯৮	৫,২৭০	৪৩,০৬৯	১,৮২৬	২৮,০৩৭	১,৭৩৫	২৮,৩৯৯	১,৮৯৪	৩০,০২৩
যুক্তপ্রদেশ :										
আগ্রা	৬,৪৭৮	৩০,৪৪৯	৬,৫৩৩	৩৩,০৫৮	৮,৫০১	২৯,৪০৬				
অযোধ্যা	২,২০৩	১১,৫৮৭	২,১৯০	১২,১৩৮	২,৬৯৪	১১,০৪০				
মোট	৮,৬৮১	৪২,০৩৬	৮,৭২৩	৪৫,১৯৬	১১,১৯৫	৪০,৪৪৬	১০,২২৭	৪৩,৭৫০	১১,৯৫৯	৪৪,৯৭১
পাঞ্জাব	৯,৪৪৬	২৮,৫৭০	১০,০৯৪	২৮,৫৯৭	১২,৯৫৪	২৪,৫৬১	১৪,৮১৪	৩০,২৬৫	১৬,৫৪৪	২৮,৮৪৫
মধ্যপ্রদেশ	৪০৩	১৬,২১০	৬১১	১৯,৭৯৪	১,১৫৬	১৭,৪৫৪				
আসাম		৪,৬৭৮	৮৭	৬,০২৮	২০৫	৬,৩৩৯	৫৭৯	৬,৬৪৬	৬৫৫	৭,৪৮৭
মাদ্রাজ	৫,৯৭১	২৭,৮৫০	৯,৯০৬	৩৮,২০২	৯,৩৬৯	৩৭,৬০৬	৯,১৫৩	৩৯,১৯২	৮,৪৪৪	৩৫,৯৫৮
বোম্বাই	৭৭১	২১,৪৪৮	৮৮০	২৬,০৯৮	১,১০৬	২৫,১২৬	৪,১৪৫	৩৪,০১৯	১,১৪৭	২৯,৭৪০
সিন্ধুপ্রদেশ	৩,০৭২	৪,০২১	৩,২৫৯	৪,৫১৪	২,৮৫৭	৩,৮২৩			৪,৪৩৩	৫,৬৩১
বেরার	৬৮	৬,৮২০	৩৬	৭,২১৮	২৭	৬,৬২২				
বিহার									৪,০৩৮	২৩,৩৫২
মধ্যপ্রদেশ এবং বেরার							১.১৩০	২৭,৬৫৮	১,০৬০	২৭,৪৩৮
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ			৮৪৪	২,৭৮৩	৮৮৯	২,০৩৫	৯৭৩	২,৪৩২	১,০৬২	২,৪৫৩
উড়িষ্যা										৭,০২৯
বাংলার পূর্বাঞ্চল			৬৪	১৯,৯৬৬						
বিহার এবং উড়িষ্যা					৬,০১৩	৩০,৯০৩	৫,২৬০	২৯,৭৭৯		
ব্রিটিশ ভারত	২৯,১২৩	২১৪,৩২৮	৩৯,৮৯৬	২৪২,০১৯	৪৭,৭৭৩	২২৩,৬৫৭	৪৮,২২৬	২৪২,৯১৫	৫৩,৭৩০	২৪৩,৫৮৪

সূত্র : *Statistical abstracts relating to British India*

টীকা : ১৯০০-১৯০১ ও ১৯১০-১১ (অংশত) সালের তথ্যে বাংলার মধ্যে বিহার ও উড়িষ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ১৯৩০-৩১ সালের তথ্যে বোম্বাইয়ের মধ্যে সিন্ধুপ্রদেশকে ধরা হয়েছে। ১৯১০-১১ সালের তথ্যে পূর্ববাংলাকে বাংলা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য প্রদেশেব তথ্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ কিছু বিচ্যুতি আছে।

পর্যন্ত)। ১৯৩৮-৩৯ সালে স্বল্প দৈর্ঘ্যের আঁশযুক্ত তুলোর চাষ হতো শতকরা ৬৩ ভাগ জমিতে ; মাঝারি দৈর্ঘ্যের আঁশযুক্ত তুলো হতো শতকরা ৩২.৫ ভাগ জমিতে এবং ১ ইঞ্চি বা তদূর্ধ্ব আঁশযুক্ত তুলোর চাষ হতো শতকরা ৪.৫ ভাগ জমিতে। ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল কটন কমিটির হিসাব অনুসারে ১৯৩২ থেকে ১৯৩৭—এই পাঁচ বছর কালে তুলোর একরপিছু গড় উৎপাদন ছিল ১০৮ পাউন্ড ; তার আগের দুটি পাঁচ বছরের পর্বে এই হার ছিল যথাক্রমে ৯৬ ও ৯৫ পাউন্ড।[১৪]

আখ ও তুলোর উৎপাদনবৃদ্ধির মূল কারণ হিসাবে একমাত্র নতুন ধরনের ফসলের প্রচলনকেই চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। নতুন প্রজাতির শস্যের আবিষ্কারকে তো আরও কম দায়ী করা চলে। প্রকৃতপক্ষে, এক্ষেত্রে সেচের একটি বড় ভূমিকা ছিল। এটা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যখন আমরা বিভিন্ন প্রদেশের তুলো উৎপাদনের পরিবর্তনের হারকে তুলনা করি। মাদ্রাজ, পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশে উৎপাদনের হারে পরিবর্তনের মাত্রা ছিল সর্বাধিক এবং দ্রুত,[১৫] কারণ পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশে সরকারি উদ্যোগে সেচব্যবস্থার সবচেয়ে দ্রুত প্রসার ঘটেছিল। ১৯২৮ সাল নাগাদ ঐ তিনটি প্রদেশে মোট চাষের এলাকা ও মোট সেচসেবিত এলাকার পরিমাণ ছিল শতকরা হিসাবে সর্বাধিক। ক্রম অনুসারে সাজালে সিন্ধুপ্রদেশের স্থান ছিল সর্বাগ্রে এবং তারপর ক্রমান্বয়ে পাঞ্জাব ও মাদ্রাজের স্থান।[১৬] সারণি ৪-৬-এ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সেচের সুবিধা সম্প্রসারণের চিত্র দেওয়া হয়েছে।

সেচের অধীনে কত এলাকা এসেছে—তার স্থূল হিসাবে সেচের গুরুত্ব সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় না। যে সব এলাকায় বেশি বৃষ্টিপাত হয় এবং তা হয় খুব অনিশ্চিতভাবে সে সব এলাকার তুলনায় অল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত এলাকায় সেচের অবদান ও উপকার ছিল অনেক বেশি। সেচের অধীন এলাকা বলতে কোনো একটি বিশেষ উৎস থেকে সেচসেবিত সমগ্র এলাকাকে ধরা হতো। কিন্তু যখন বৃষ্টিপাত যথেষ্ট পরিমাণে বা সময়োচিত হতো না, তখন সেচের ঐ বিশেষ উৎস থেকে জল বস্তুত ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা তা এই হিসাবের মধ্যে বিবেচিত হতো না। সেচের অধীন মোট এলাকা সম্পর্কিত যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তার মধ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকাটির জমি কতখানি অসমান বা সেখানে সেচের সুবিধার মধ্যে এলাকাগত তারতম্য আছে কিনা সে সব কথাও বিবেচিত হয় না। তাছাড়া, এই জাতীয় সরকারি পরিসংখ্যানে আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচিত হয় না। যেমন, ত্রুটিপূর্ণ জলনিকাশ, জল জমে যাওয়া বা লবণাক্ত উপাদানের পরিমাণ অথবা চাষীরা সেচের জল অত্যাধিক মাত্রায় ব্যবহার করার ফলে যে ক্ষতি হয় তার হিসাব, ইত্যাদি।[১৭]

সরকারি উদ্যোগে কত এলাকায় সেচের জল দেওয়া হলো তার হিসাবকে অবশ্যই ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে সেচসেবিত এলাকার প্রকৃত নির্দেশক বলে মনে করা যায় না। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পুকুর বা কূপ সেচের উৎস হিসাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই ধরনের সেচের ব্যবস্থা গড়ে তোলা বা তার সুযোগ নেওয়া নির্ভর করত অনেকগুলি আর্থিক বিবেচনার উপর, যেমন—সেচ দেওয়ার ফলে প্রত্যাশিত উৎপাদনবৃদ্ধির হার, কূপ বা পুকুর খননের ব্যয়, এবং উৎপন্ন শস্যের চলতি বাজার দাম ইত্যাদি। মাদ্রাজ থেকে পাওয়া রিপোর্টে দেখা যায় : 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার আগে কয়েকবছর যাবৎ অধিকাংশ কৃষিপণ্যের যে চড়া দাম দেখা গিয়েছিল কৃষি অর্থনীতিতে তার প্রতিফলন ঘটেছিল সেচের উদ্দেশ্যে কূপের সংখ্যার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে।'[১৮]

সেচভুক্ত এলাকা ও বৃষ্টিপাত ব্যতীত জলের অন্যান্য উৎসের কার্যকারিতা, অথবা সেচভুক্ত এলাকার অনুপাত এবং ফলনের বৃদ্ধির হার অথবা সেচভুক্ত এলাকার সম্প্রসারণ এবং উৎপাদনের হারের বৃদ্ধি—এগুলির মধ্যে কোনো কার্যকারণ বা সহসম্পর্ক আছে তা প্রত্যাশা করা যে সঙ্গত হবে না সে বিষয়ে যথেষ্ট তথ্যসহ উপরে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু চাষের জমির কত অংশে কার্যকরী ভাবে সেচের জল দেওয়া হলো তার সঙ্গে উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে—সে কথা এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যদিও কার্যকরীভাবে সেচ দেওয়া উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে কোনো আবশ্যিক শর্ত নয়।

বিহার ও উড়িষ্যায় সেচভুক্ত জমির অনুপাত অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বেশি হওয়া সত্ত্বেও আখের উৎপাদন কিন্তু এ দুটি রাজ্যে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়নি। আবার যুক্ত প্রদেশেও তুলোর উৎপাদন তেমন বৃদ্ধি পায়নি যদিও সেখানেও সেচভুক্ত চাষের জমির অনুপাত ছিল অনেক বেশি। পাঞ্জাবেও আখের উৎপাদন বাড়েনি। আসলে, পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে সমস্যাটা ছিল বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে আপেক্ষিক ব্যয়ের সুবিধার যে তারতম্য ছিল তার সুযোগ নেওয়া। যুক্তপ্রদেশে উন্নত জাতের আখ উদ্ভাবনের সাথে সাথে তুলো চাষ অপেক্ষা আখের চাষ আপেক্ষিকভাবে বেশি লাভজনক হয়ে ওঠে এবং পাঞ্জাবে লাভজনক হয়ে উঠল আমেরিকার তুলোর চাষ। এর ফলে পাঞ্জাবে ভালো জমিগুলি আখ চাষ থেকে স্থানান্তরিত হলো তুলো চাষে এবং যুক্তপ্রদেশে ভালো জমিগুলি চলে গেল তুলো চাষ থেকে আখ চাষের অধীনে।[১৯]

বিহার, উড়িষ্যা, বোম্বাই, দাক্ষিণাত্য, বাংলা এবং মধ্যপ্রদেশ এই কয়টি রাজ্যে একরপিছু উৎপাদনের গতিপ্রকৃতি অবশ্য কেবলমাত্র বিভিন্ন ফসলের চাষেব পাবস্পরিক পবিবর্তনার প্রক্রিয়ার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এই সমস্ত রাজ্যে জমিতে সেচের ব্যবস্থা ও সুযোগ সম্প্রসারণের ব্যাপারে সরকারি বিনিয়োগ ছিল খুবই অকিঞ্চিৎকব। যুক্তপ্রদেশে, বাংলার পশ্চিম অঞ্চলে, দক্ষিণ বিহারে বা উত্তর উড়িষ্যায় মাটির নিচে সহজলভ্য জলের স্তর পাওযা যেত না যা বেসরকারি উদ্যোগে ব্যবহার করা সম্ভব হতো। এসব অঞ্চলে এমন উপযুক্ত ঢালবিশিষ্ট নদীও ছিল না যার জল আটকে রেখে স্বল্প ব্যয়ে কৃত্রিম জলাধাব সৃষ্টি করে সেচেব ব্যবস্থা করা যায়। অন্যভাবে বলতে গেলে, স্থায়ীভাবে কার্যকরী সেচেব জলের যোগান অব্যাহত বাখতে গেলে প্রযোজন ছিল সরকারি উদ্যোগে বৃহদায়তন সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। কিন্তু ভারত সরকারের নীতি ছিল কেবলমাত্র উৎপাদনশীল কাজেই সরকারি বিনিয়োগ করা, সুতরাং এই জাতীয় সেচব্যবস্থা গড়ে তোলার সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে বাতিল কবা হয়েছিল।

আশা কবা হয় যে উৎপাদনমূলক সেচব্যবস্থা নির্মাণের দশ বছব পব যথেষ্ট পরিমাণ আয় তার থেকে আসবে যা দিয়ে এই ব্যবস্থার ব্যয়নির্বাহ সম্ভব হয় এবং বিনিয়োজিত মূলধনের উপর বার্ষিক শতকরা ৪ ভাগ সুদের হিসাব করে প্রকল্পের লাভযোগ্যতা বিবেচনা করা হয়। কোনো সরকারি কৃত্যক উৎপাদনশীল প্রকল্প হিসাবে অনুমোদন পায় না যতক্ষণ পর্যন্ত সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করা না যাচ্ছে যে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটি উপরোক্ত শর্তগুলি পূরণ করতে সক্ষম।[২০]

১৯০১-২ সালে সেচ কমিশন ৭৪ কোটি টাকার সেচ প্রকল্পের কর্মসূচি গ্রহণের সুপারিশ করলেও যে সমস্ত প্রকল্পে প্রতিদানের হার খুব কম ছিল সেগুলি সরকারি অনুমোদন পায় নি।

একরপিছু উৎপাদনের হারে পরিবর্তনের তথ্য বিচার করলে আমরা দেখি যে সাধারণভাবে কোনো একটি বিশেষ শস্যের একরপিছু উৎপাদন সেই সব প্রদেশেই বৃদ্ধি পেয়েছিল যেখানে মোট উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছিল। মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশে আখের উৎপাদন ও চাষের এলাকায় পরিবর্তনের প্রবণতা থেকে এ কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। দুই যুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ে উন্নত জাতের পাট চাষের প্রবর্তন হলেও পাটের একরপিছু উৎপাদন বৃদ্ধি সংক্রান্ত কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। ১৯৩৭-৩৮ সালে যখন মোট পাট চাষের এলাকা ছিল ২.৮৯ মিলিয়ন একর, তখন কৃষিদপ্তর অনুমোদিত কয়েকটি বিশেষ জাতের পাট চাষের, এলাকার পরিমাণ ছিল ১.৭৬ মিলিয়ন একর।[২১] কিন্তু পাটের একরপিছু উৎপাদনের কোনো উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেনি। অবশ্য এটা হতে পারে যে কৃষিদপ্তর যে জাতের পাট বোনার সুপারিশ করেছিল কৃষকদের বাস্তব অবস্থাব পরিপ্রেক্ষিতে তা উপযুক্ত ছিল না।[২২] উন্নত জাতের পাট চাষের এলাকা সম্প্রসারণ ও এ ধরনের পাটের পরীক্ষামূলক উৎপাদন থেকে সম্ভাব্য মুনাফা সম্পর্কে যে সব তথ্য পাওয়া যায়, সেগুলি বিশ্লেষণ করলে পাট উৎপাদনের শ্লথ গতির অন্য কোনো কারণ অনুসন্ধান প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এমনও হতে পারে যে, ১৯২৭ বিশেষ করে ১৯২৯-এর পর থেকে পাটের বাজারে মন্দা-ই এর কারণ। পাট চাষের জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ বাজার থেকে কিনে কৃষকের পক্ষে এত শ্রম ও যত্ন পাট চাষের জন্যে দেওয়া আর লাভজনক ছিল না—কৃষক হয়ত এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন।

বৃহত্তর বঙ্গে উৎপাদনের হারে সাধারণভাবে যে অবনতি ঘটেছিল তার পেছনে পাটের উৎপাদনের এই প্রবণতার অবদান অবশ্যই বেশি ছিল। কিন্তু জর্জ ব্লিনের যুক্তি হলো বৃহত্তর বঙ্গের উৎপাদন হ্রাসের প্রধান কারণ হলো বিহার ও উড়িষ্যার উৎপাদনের অবনতি।[২৩] এ কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে বিহার ও উড়িষ্যায় ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন হারের সঙ্গে ধান চাষের এলাকা কমে যাওয়ারও সম্পর্ক ছিল।[২৪] তবে বিহার ও উড়িষ্যায় ঠিক কী কারণে উৎপাদনের হার কমে গিয়েছিল তা খুব স্পষ্ট নয়। যাই হোক, মূল কারণগুলির মধ্যে এগুলির কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে, যথা : লাল মাটির আধিক্য, বেশি মাত্রায় ভূমি ক্ষয় এবং ব্যক্তিগত, অথবা সরকারি উদ্যোগে সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টার অভাব।[২৫]

অনিশ্চিত বৃষ্টিপাতের মধ্যেও কৃত্রিম সার ব্যবহার করে ভালো ফলন পাওয়া যায় এমন ধরনের উপযুক্ত ধানবীজ উদ্ভাবনে কৃষি দপ্তরের ব্যর্থতা ধানের একরপিছু উৎপাদন কমে যাওয়ার একটা কারণ হতে পারে। মাদ্রাজের পরিস্থিতি বৃহত্তর বঙ্গ থেকে ভিন্ন ধরনের ছিল—কারণ মাদ্রাজে বছরে দুবার বর্ষা নামত এবং সেখানকার বেশিরভাগ জমি ছিল সেচের অধীন। যার ফলে জলের যোগান সেখানে অনেক বেশি সুনিশ্চিত ছিল। ১৮৯১ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত ধানের উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েছিল যদিও ১৯১১ থেকে ১৯৪১—এই সময়ে উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল স্থির। যুক্তপ্রদেশ ও বৃহত্তর বঙ্গে উৎপাদন হারের প্রবণতা ছিল ক্রমাবনতির দিকে এবং অন্যান্য অঞ্চলে এই হার ছিল এলোমেলো ধরনের—যদিও মূল ধারা ছিল নিম্নাভিমুখী।[২৬]

এই সময়কালে খাদ্য ও খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য শস্যের অধীন চাষের এলাকার পরিমাণেও আন্তঃরাজ্য ভারভম্য লক্ষ্য করা যায় (সারণি ৪.৭ ও ৪.৮ দ্রষ্টব্য)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে বৃহত্তর বঙ্গ ও বৃহত্তর পাঞ্জাব ব্যতীত ভারতের সমস্ত অঞ্চলেই খাদ্যশস্যের অনুপাতে অন্যান্য শস্যের

অধীন চাষের এলাকা বেড়েছিল। পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে অবশ্য অন্যান্য শস্য বলতে বাণিজ্যিক বা অর্থকরী শস্য বোঝাত না কারণ গম উৎপাদনের একটা বড় অংশ রপ্তানি করা হতো। যুদ্ধ চলাকালীন এই গতি কিছুটা রুদ্ধ হলেও যুদ্ধের পর খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য শস্যের চাষ এলাকা বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা আবার স্পষ্ট হয়ে উঠল। ৩০-এর দশকে এই প্রবণতা কিছুটা থমকে গেলেও প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই ১৯৩৩-৩৪ থেকে তা বাড়তে শুরু করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃহত্তর বঙ্গ, যুক্তপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ—এই তিনটি অঞ্চলে খাদ্যশস্যের তুলনায় অন্যান্য শস্যের অধীন চাষের এলাকা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এল। এমনকি ১৯৩৮-৩৯ সালে এর পরিমাণ ১৯১৩-১৪-রও তুলনায় কমে গিয়েছিল। কিন্তু অন্য তিনটি অঞ্চলে অন্যান্য শস্যের চাষের এলাকার অনুপাত বেড়ে গিয়েছিল। সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের হিসাব ধরলে দেখা যায় যে, ১৯৩৮-৩৯ সালে অন্যান্য শস্যের অধীন চাষ এলাকার অনুপাত ১৯১৩-১৪-র তুলনায় সামান্য হলেও বেশি ছিল।[২৭] মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদনের তুলনায় অন্যান্য শস্যের উৎপাদনও ১৯৩৮-৩৯ সালে অবশ্যই অনেক বেশি ছিল। এ কথা মাদ্রাজ, বৃহত্তর পাঞ্জাব ও বোম্বাই-সিন্ধু—এই তিনটি অঞ্চল সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফসল উৎপাদনের ধরন অর্থকরী ফসলের একরপিছু উৎপাদনে যে পরিবর্তন ঘটেছে তার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যে অনিবার্য সিদ্ধান্তে আমাদের আসতেই হয় তা হলো কৃষি অর্থনীতির এই বিশেষ দিকটির উপর আভ্যন্তরীণ বাজারের প্রভাব ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী। তুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সরকারি কৃষিদপ্তরের বিরামহীন চেষ্টা সত্ত্বেও মাঝারি ও দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলো চাষের এলাকার পরিমাণ যুদ্ধের আগে তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়েনি। এর মুখ্য কারণ হলো দেশী জাতের তুলোর চাষ অনেক বেশি লাভজনক ছিল—বিশেষ করে সেই সব এলাকায় যেখানে সেচের সুবিধা ছিল না।[২৮] যুদ্ধের পর, বিশেষত ১৯৩০-এর পর থেকে যখন বস্ত্রশিল্পের অনুকূলে কার্যকরীভাবে সংরক্ষণের নীতি নেওয়া হলো ও ভারতে উৎপাদিত সুতো ও থান কাপড়ের মান অনেক উন্নত হয়ে উঠল, তখন থেকে দেশের মধ্যেই উন্নত প্রজাতির তুলোর চাহিদা উত্তরোত্তর প্রবল হয়ে উঠল।[২৯] এই ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলোর চাষে আরও বেশি অর্থ শ্রম নিয়োগের কাজে কৃষককে অনুপ্রাণিত করল।

অনুরূপভাবে চিনি শিল্পে সংরক্ষণ নীতি চালু হওয়ার সঙ্গে আখের একরপিছু উৎপাদনের হারের বৃদ্ধির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তবে তুলোর ক্ষেত্রে যা ঘটে নি আখের বেলায় তা সম্ভব হয়েছে—তা হলো, সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে আখ চাষের অধীন এলাকার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ও সম্প্রসারণে সরকারি বিনিয়োগ উন্নত জাতের ফসল চাষে উৎসাহ যুগিয়েছিল। পাশাপাশি গবেষণার কাজে সরকারি বিনিয়োগের ফলে কৃষি অর্থনীতি সংক্রান্ত নতুন তথ্য পাওয়াও সম্ভব হচ্ছিল যা উন্নত প্রজাতির নানা ধরনের শস্য সম্পর্কে কৃষকের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে অনেক প্রসারিত করেছিল। তথ্য ও জ্ঞানের প্রসার কোন অঞ্চলে কত দ্রুত ঘটেছিল তা মূলত নির্ভর করত ঐ বিশেষ অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট শস্যের উৎপাদন কতখানি লাভজনক ছিল তার উপর। কৃষি বিভাগের অবিষ্কার বা উদ্ভাবন প্রচেষ্টার ভূমিকা এ ব্যাপারে খুবই গৌণ ছিল।

সারণি ৪.৭ খাদ্য ছাড়া অন্যান্য শস্য চাষের এলাকা (মোট শস্য চাষের এলাকার শতাংশে) ও একর প্রতি উৎপাদন (১৯০১-২ থেকে ১৯৩৯-৪০ পর্যন্ত)

সময়	ব্রিটিশ ভারত			বৃহত্তর বাংলা			যুক্ত প্রদেশ			মাদ্রাজ		
	(১)	(২)	(৩)	(১)	(২)	(৩)	(১)	(২)	(৩)	(১)	(২)	(৩)
১৯০১-২	১৬.২৬	২৪.৫৪	৭৭.২	১৪.৪৭	২৪.২০	১১৬.৪	১৫.৯৭	২৬.৯৪	৮৫.২	১৩.৯১	১৬.৫৪	৬৬.৪
১৯০৬-৭	১৮.৮১	২৬.৩২	৭৩.৫	১৫.৮৩	২৩.৭৮	১০৫.০	১৮.৫৮	৩১.৪৯	৮৫.৭	১৫.২৭	১৮.১২	৬৪.০
১৯১১-১২	১৯.৯৫	২৪.০৮	৬৭.৭	১৪.৪৮	২০.৫০	১১২.৫	২০.৫৫	২৯.২৪	৭৫.০	১৮.১৪	১৭.১৬	৬২.৩
১৯১৩-১৪	১৯.৭৩	২৭.১৮	৭১.৬	১৪.৫১	২২.৬৭	১১৭.৮	২১.২১	৩৩.৬৯	৬৫.১	১৯.৪৭	১৯.৯১	৫৫.৯
১৯১৬-১৭	১৮.২৫	২৪.৭২	৭৮.১	১৩.৮৫	২১.২৪	১২০.৭	১৮.৪১	২৬.১৪	৭৪.০	১৯.৭৮	২১.৫৭	৭৩.০
১৯২১-২	১৬.২৪	২২.৬৫	৭৬.৭	১১.২৮	১৬.৭৩	১১৩.২	১৭.০২	২৪.৫৮	৭৪.২	১৬.৬৩	২১.৮৭	৮১.৫
১৯২৬-৭	২০.১১	৩০.৬৭	৮২.৩	১৫.৫৬	২৯.৫৯	১৩২.০	১৮.৬২	৩০.৬৫	৮৫.৮	২১.৯৫	২৯.১৬	৮১.৫
১৯৩১-২	১৮.৫৯	২৭.৪২	৭৯.২	১১.৪৭	১৯.০৮	১২১.৬	১৯.৩০	৩৫.৫৩	৯৩.৭	২১.৮১	২৮.৩৭	৮৬.০
১৯৩৬-৭	২০.১০	৩৩.৫১	৯৪.৭	১৩.৬১	২৭.৫১	১৫৪.৭	২০.৭৭	৪৫.১৫	১২৫.১	২৫.১০	৩৩.৩০	৮৭.২
১৯৩৮-৯	১৯.৯০	৩২.১৪	৮০.৫	১৩.৭১	২৬.৯৯	১১৮.৯	১৮.৮৭	৩০.৭৫	৭০.৮	২৫.২৫	৩৪.৮৫	৮৩.০
১৯৩৯-৪০	২০.০০	৩৩.৭৫	৯২.৫	১৩.৭৯	২৯.৪০	১৪৫.৬	১৯.০২	৩৩.৬১	৯৪.৮	২৪.৯৫	৩৩.৫২	৯৩.০

সময়	বোম্বাই-সিন্ধুপ্রদেশ			মধ্যপ্রদেশ			বৃহত্তর পাঞ্জাব		
	(১)	(২)	(৩)	(১)	(২)	(৩)	(১)	(২)	(৩)
১৯০১-২	১৮.০৩	২৬.৪২	৩৪.১	২৯.৭৮	৩৭.৯৫	৪৮.৮	১৩.৬৬	২২.৬৪	৫৭.০
১৯০৬-৭	২২.৫৪	৩৬.২৭	৫৮.৪	৩৩.০৪	৩১.৯৩	৩৭.১	১২.৮৪	১৮.০৪	৫৫.৫
১৯১১-১২	২৪.৮৭	৩৩.৫৫	৩৭.৩	৩৫.৮৯	৩২.৩৮	৩৪.৭	১৪.৬৫	১৬.৮২	৪৬.৯
১৯১৩-১৪	২২.৪৮	৩৩.৬৫	৫৬.২	৩৩.২৫	৩৯.৭৫	৩৮.২	১৫.০৪	২৪.৪৫	৬৯.৮
১৯১৬-১৭	২১.৫১	৩২.৫৫	৫২.৯	৩১.০১	২৬.০০	৩১.২	১০.৭৪	২১.৪০	৭০.৪
১৯২১-২	১৬.৪০	২৮.২১	৬১.৪	৩০.৮৭	৩৩.৮৬	৪৯.৪	১২.৫৯	১৯.২০	৬৪.৩
১৯২৬-৭	২২.৭৮	৩৩.৩৩	৫০.৮	৩০.৭১	৩২.১৬	৩৯.৭	১৫.৮২	২৪.১৪	৬১.৩
১৯৩১-২	২২.৮৭	৩৫.৬০	৫৭.৯	২৯.৯১	১২.২৩	২২.৯	১৫.৭২	২৬.৬৫	৬৬.৭
১৯৩৬-৭	২৩.২৫	৪২.০৩	৩৪.৯	২৭.৬৯	৩০.১৭	৪১.৭	১৭.৮৯	৩৬.৭০	১০৪.৬
১৯৩৮-৯	২৪.১৮	৪০.৪৬	৬২.০	২৭.৬২	২৪.৫৬	৩১.০	১৬.৭৮	৩২.৮৮	৮৪.১
১৯৩৯-৪০	২৪.৭৫	৪৩.৩৯	৬০.৬	২৫.৮৪	২৯.৩২	৪০.৬	১৮.১০	৩১.০০	৮২.৫

সূত্র : George Blyn : Agricultural Trends in India, 1891-1947 : Output, Availability and Productivity (ফিলাডেলফিয়া, ১৯৬৬), পরিশিষ্ট 4c।

টীকা : একর প্রতি উৎপাদন পরিমাপ করা হয়েছে স্থির দামে (১৯২৪-৫—১৯২৮-৯ সময়ের দামগুলির গড়)।

স্তম্ভ ১ : মোট চাষের এলাকায় খাদ্য ছাড়া অন্যান্য শস্যের এলাকার শতাংশ।

স্তম্ভ ২ : খাদ্য ছাড়া অন্যান্য শস্যের মোট উৎপাদন সমস্ত শস্যের মোট উৎপাদনেব শতাংশে।

স্তম্ভ ৩ : খাদ্য ছাড়া অন্যান্য শস্যের একর প্রতি উৎপাদন (টাকায়)।

সারণি ৪.৮ খাদ্য ছাড়া অন্যান্য শস্যের ও খাদ্যশস্যের এলাকা ও একর প্রতি উৎপাদনের অনুপাত

সময়	ব্রিটিশ ভারত		বৃহত্তর বাংলা		যুক্তপ্রদেশ		মাদ্রাজ		বৃহত্তর পাঞ্জাব		বোম্বাই-সিন্ধুপ্রদেশ		মধ্যপ্রদেশ	
	এলাকা	একর প্রতি উৎপাদন	এলাকা	একর প্রতি উৎপাদন	এলাকা	একর প্রতি উৎপাদন	এলাকা	একর প্রতি উৎপাদন	এলাকা	একর প্রতি উৎপাদন	এলাকা	একর প্রতি উৎপাদন	এলাকা	একর প্রতি উৎপাদন
১৮৯৬-৭	০.১৭	১.৭৩	০.১৫	২.৪১	০.১৮	১.৬০	০.১৫	১.০১	০.১৪	১.৬৮	০.১৯	১.৬৪	০.২৬	০.৯৪
১৮৯৭-৮	০.১৬	১.৪৫	০.১৪	১.৫০	০.১৬	২.০৫	০.১৫	১.০৬	০.১২	১.৭০	০.১৫	১.৬২	০.২৬	১.০১
১৮৯৮-৯	০.১৬	১.৪৫	০.১৩	১.৪২	০.১৬	২.০৮	০.১৩	১.০০	০.১২	১.৪৭	০.১৭	১.৯০	০.২৭	১.১৫
১৮৯৯-১৯০০	০.১৬	১.৩২	০.১৩	১.৪৪	০.১৭	১.৭২	০.১৪	১.১০	০.১৪	১.৫৪	০.১৫	৪.৩৬	০.২৬	০.৫৯
১৯০০-১	০.১৭	১.৫২	০.১৪	১.৫৮	০.১৬	১.৯৮	০.১৫	০.৯৬	০.১৪	১.৬৩	০.১৬	১.৯৫	০.৩০	১.৪৪
১৯০১-২	০.১৬	১.৬৮	০.১৪	১.৮৯	০.১৬	১.৯৪	০.১৪	১.২৩	০.১৪	১.৮৪	০.১৮	১.৬৩	০.২৮	১.১২
১৯০২-৩	০.১৬	১.৪৪	০.১৩	১.৪৯	০.১৯	১.৪৫	০.১৫	১.১৫	০.১৫	১.৪২	০.১৮	১.৭৭	০.৩০	১.০৮
১৯০৩-৪	০.১৮	১.৩৪	০.১৫	১.৫৯	০.১৮	১.৪৫	০.১৬	১.০৭	০.১৪	১.৪১	০.২২	১.৬৫	০.৩৩	১.০০
১৯০৪-৫	০.১৯	১.৪১	০.১৫	১.৪৫	০.১৯	২.০০	০.১৬	১.১৯	০.১৫	১.৩৯	০.২১	১.৩৯	০.৩৩	১.৩৫
১৯০৫-৬	০.১৮	১.৪৬	০.১৫	১.৫৮	০.১৯	১.৭৫	০.১৫	১.২৮	০.১৪	০.৮৫	০.২২	১.৫৫	০.৩৩	১.০৩
১৯০৬-৭	০.১৯	১.৫৪	০.১৬	১.৬৬	০.১৯	২.০২	০.১৫	১.২৩	০.১৩	১.৫০	০.২৩	১.৯৬	০.৩৩	০.৯৫
১৯০৭-৮	০.১৯	১.৫৭	০.১৬	১.৯০	০.২০	১.৫২	০.১৬	১.১৭	০.১৪	১.৯০	০.২২	১.৬২	০.৩২	১.০৬
১৯০৮-৯	০.১৮	১.৪৭	০.১৫	২.০৩	০.১৯	১.৫৬	০.১৫	১.৩৭	০.১৩	১.৬৩	০.১৯	১.৬৭	০.৩১	০.৯৮
১৯০৯-১০	০.১৮	১.৩৫	০.১৪	১.২৯	০.১৯	১.৫১	০.১৬	১.১৫	০.১৩	১.৭৭	০.২১	২.০২	০.৩০	১.১০
১৯১০-১১	০.১৮	১.৩২	০.১৪	১.৩৯	০.১৯	১.৬৬	০.১৬	১.১৮	০.১২	১.৫৫	০.২৩	১.৬৩	০.৩২	০.৮১
১৯১১-১২	০.২০	১.২৭	০.১৪	১.৫২	০.২১	১.৬০	০.১৮	০.৯৩	০.১৫	১ ১৮	০.২৫	১.৫২	০.৩৬	০.৮৬
১৯১২-১৩	০.১৮	১.৫৭	০.১৪	২.০২	০.১৯	১.৮১	০.১৭	১.১২	০.১৩	১.৮৫	০.২১	১.৭৫	০.৩৩	০.৯৭
১৯১৩-১৪	০.২০	১.৫২	০.১৫	১.৭৩	০.২১	১.৮৯	০.১৯	১.০৩	০.১৫	১.৯৩	০.২২	১.৭৫	০.৩৩	১.৩২
১৯১৪-১৫	০.১৯	১.৬৬	০.১৫	২.২৮	০.২০	১.৭৬	০.১৯	১.০৫	০.১৩	১.৭৭	০.২৩	১.৬৩	০.৩৪	১.০১

সময়	ব্রিটিশ ভারত		বৃহত্তর বাংলা		যুক্তপ্রদেশ		মাদ্রাজ		বৃহত্তর পাঞ্জাব		বোম্বাই-সিন্ধুপ্রদেশ		মধ্যপ্রদেশ	
	এলাকা	একর প্রতি উৎপাদন	এলাকা	একর প্রতি উৎপাদন	এলাকা	একর প্রতি উৎপাদন	এলাকা	একর প্রতি উৎপাদন	এলাকা	একব প্রতি উৎপাদন	এলাকা	একব প্রতি উৎপাদন	এলাকা	একর প্রতি উৎপাদন
১৯১৫-১৬	০.১৭	১.৫৩	০.১৩	১.৬৩	০.১৮	১.৬৩	০.১৬	১.২৭	০.১১	২.০৬	০.১৮	১.৭২	০.২৯	১.০৭
১৯১৬-১৭	০.১৮	১.৪৮	০.১৪	১.৬৮	০.১৮	১.৫৭	০.২০	১.১২	০.১১	২.২৬	০.২২	১.৭৬	০.৩১	০.৭৮
১৯১৭-১৮	০.১৯	১.৪০	০.১৪	১.৬৪	০.১৯	১.৪৪	০.২০	১.২৮	০.১৩	১.৭৪	০.২৩	১.৬৭	০.৩২	০.৭২
১৯১৮-১৯	০.১৮	১.৭৫	০.১৩	২.২২	০.১৯	১.৫৮	০.২০	১.৩৮	০.১৪	২.১৬	০.২২	১.৭৯	০.২৭	১.৫৫
১৯১৯-২০	০.১৯	১.৫৩	০.১৪	১.৮৮	০.১৯	১.৭০	০.১৭	১.২৬	০.১৪	১.৯৬	০.২০	১.৭৫	০.৩১	১.২১
১৯২০-২১	০.১৮	১.৬০	০.১৩	১.৭৯	০.১৯	১.৭৫	০.১৮	১.২৭	০.১৫	২.৪০	০.২০	১.৭৮	০.৩০	১.১৯
১৯২১-২২	০.১৬	১.৫১	০.১১	১.৫৮	০.১৭	১.৫৯	০.১৭	১.৪১	০.১৩	১.৬৫	০.১৬	. ১.৯৯	০.৩১	১.১৪
১৯২২-২৩	০.১৭	১.৫২	০.১১	১.৬৩	০.১৭	১.৭৫	০.১৯	১.৩৯	০.১২	১.৯৯	০.২০	১.৮৩	০.৩২	০.৯৯
১৯২৩-২৪	০.১৯	১.৭০	০.১৪	২.১০	০.১৮	১.৯০	০.২১	১.৩৩	০.১৪	২.০২	০.২৪	১.৮৮	০.৩৩	০.৯৯
১৯২৪-২৫	০.২১	১.৫৪	০.১৩	১.৯৭	০.১৯	১.৫৯	০.২২	১.৩৯	০.১৬	২.৩৭	০.২৫	১.৬৪	০.৩৪	১.০৫
১৯২৫-২৬	০.২০	১.৬৫	০.১৪	২.০২	০.১৯	১.৭৯	০.২৪	১.৩৫	০.১৬	২.১৩	০.২৬	১.৭৯	০.৩৪	০.৯৭
১৯২৬-২৭	০.২০	১.৭৬	০.১৬	২.২৮	০.১৯	১.৯৩	০.২২	১.৪৬	০.১৬	১.৬৯	০.২৩	১.৬৯	০.৩১	১.০৭
১৯২৭-২৮	০.২০	১.৯৪	০.১৫	২.৪১	০.১৯	১.৮০	০.২৪	১.৫৬	০.১৪	২.৩৪	০.২৪	১.৮৪	০.৩০	১.৪৬
১৯২৮-২৯	০.২১	১.৭০	০.১৪	১.৯৬	০.১৯	১.৯৬	০.২৬	১.৪৬	০.১৮	১.৫২	০.২৬	১.৮৫	০.৩২	১.৪৭
১৯২৯-৩০	০.২১	১.৬৬	০.১৪	১.৪১	০.১৯	১.৮৪	০.২৪	১.৪৪	০.১৫	১৪.৭	০.২৫	১.৭৩	০.৩২	১.২৫
১৯৩০-৩১	০.২০	১.৮০	০.১৪	২.০২	০.২০	১.৮৪	০.২৪	১.৫৩	০.১৫	২.০৫	০.২১	১.৯৯	০.৩০	১.৩৭
১৯৩১-৩২	০.১৯	১.৬৫	০.১১	১.৮২	০.১৯	২.৩০	০.২২	১.৪২	০.১৬	১.৯৫	০.২৩	১.৮৬	০.৩০	০.৬৩
১৯৩২-৩৩	০.১৯	১.৯৮	০.১২	২.৩৭	০.২০	২.৮০	০.২৪	১.৫১	০.১৫	২.১০	০.২৩	২.০৩	০.২৮	১.১২
১৯৩৩-৩৪	০.১৯	১.৮৯	০.১৩	২.৫২	০.২০	২.৬৩	০.২৬	১.৪৮	০.১৪	২.৫২	০.২৩	২.১৩	০.২৯	০.৯৯
১৯৩৪-৩৫	০.১৯	২.০০	০.১৩	২.৫৮	০.১৯	২.৬২	০.২১	১.৪৬	০.১৬	২.২৪	০.২২	১.৮৬	০.২৮	০.৮৪

সময়	ব্রিটিশ ভারত		বৃহত্তর বাংলা		যুক্তপ্রদেশ		মাদ্রাজ		বৃহত্তর পাঞ্জাব		বোম্বাই-সিন্ধুপ্রদেশ		মধ্যপ্রদেশ	
	এলাকা	একর প্রতি উৎপাদন	এলাকা	একর প্রতি উৎপাদন	এলাকা	একর প্রতি উৎপাদন	এলাকা	একর প্রতি উৎপাদন	এলাকা	একর প্রতি উৎপাদন	এলাকা	একর প্রতি উৎপাদন	এলাকা	একর প্রতি উৎপাদন
১৯৩৫-৩৬	০.১৮	২.৪৬	০.১২	৩.০৯	০.২০	২.৯৪	০.২৩	১.৪৫	০.১৬	২.৭৭	০.২৪	২.১২	০.২৮	০.৯৬
১৯৩৬-৩৭	০.২০	২.০১	০.১৪	২.৪১	০.২১	৩.১৪	০.২৫	১.৪৯	০.১৮	২.৬৭	০.২৩	১.২৫	০.২৮	১.১২
১৯৩৭-৩৮	০.২১	১.৯৩	০.১৩	২.৩৪	০.১৯	৩.২২	০.২৯	১.৪৩	০.১৮	২.১২	০.২৪	২.২১	০.২৯	০.৯৮
১৯৩৮-৩৯	০.২০	১.৯১	০.১৪	২.৬২	০.১৯	১.৯১	০.২৫	১.৫৮	০.১৭	২.৪২	০.২৪	২.১২	০.২৮	০.৮৫
১৯৩৯-৪০	০.২০	২.০৪	০.১৪	২.৬০	০.১৯	২.১৫	০.২৫	১.৬৬	০.১৮	২.০৩	০.২৫	২.৩৩	০.২৬	১.১৯
১৯৪০-৪১	০.২২	২.৩৫	০.১৯	২.৮৩	০.২১	২.৬৩	০.২৬	১.৫৮	০.১৮	২.৫৪	০.২৫	২.৫৯	০.২৭	১.৫৯

সূত্র : George Blyn, Agricultural Trends, পৃ. ৩১৫-২৫

৪.৪ কৃষিক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং উৎপাদিকা শক্তির পরিবর্তন

সামগ্রিকভাবে ভারতের কৃষিক্ষেত্রে একরপিছু উৎপাদনের হারে এবং ফসল চাষের প্রকৃতিতে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে এবং কেন—সে প্রশ্নের বিশ্লেষণের কোনো চেষ্টা এ পর্যন্ত হয় নি। আলোচনার শুরুতেই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার একটি চিত্র আমরা নির্মাণ করতে পারি দুটি অনুমানের উপর নির্ভর করে : এক, উৎপাদনের পদ্ধতি ছিল স্থবির ও আদিম ধরনের এবং দুই, উৎপাদনের প্রধান উপকরণ হলো জমি এই অর্থে যে, একমাত্র জমির পরিমাণ ও গুণের দ্বারাই শস্য উৎপাদনের ব্যয় নির্ধারিত হয়।[৩০] উৎপাদনের এই ধরনের মডেলে ভারসাম্য আসার শর্ত হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট জমির ফসলের প্রান্তিক মূল্য ঐ জমির সমস্ত সম্ভাব্য ব্যবহারেই সমান হবে। আরও বিশেষভাবে বললে, সর্বোৎকৃষ্ট জমির প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য জমির সমস্ত রকম বিকল্প ব্যবহারেই সমান হবে। সুতরাং, অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকলে এবং নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সম্ভাব্য সমস্ত বিকল্প ব্যবহাবেই ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম সমান ভাবে কার্যকরী থাকলে যদি দুটি প্রধান প্রতিযোগী ফসলের মধ্যে কৃষক কোনো একটি চাষের সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে যে ঐ বিশেষ ফসলের দিক থেকে জমির গড় উৎপাদনশীলতা কমে গেছে। অর্থাৎ, যে ফসলের মোট উৎপাদন বেড়ে যাবে (বা কমে যাবে) সেই ফসলের একরপিছু উৎপাদন কমে যাবে (বা বেড়ে যাবে)।[৩১]

কেউ হয়ত যুক্তি দেখাবেন যে, অত্যন্ত সরল পরিস্থিতিতেও এই মডেল কয়েকটি বিশেষ অনুমানের উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া ১৯০০ থেকে ১৯৩৯ এই সময়কালে ভারতীয় কৃষির যা বাস্তব অবস্থা ছিল তাতে এই মডেল কোনো ভাবেই প্রযোজ্য ছিল না। কারণ প্রথমত, এই সময়ে চাষের অধীন মোট এলাকার পরিমাণ বাড়ছিল খুব ধীরগতিতে এবং দ্বিতীয়ত জনসংখ্যা বাড়ছিল দ্রুতগতিতে। শেষোক্ত ঘটনাটি ভারতীয় কৃষির গড় উৎপাদনশীলতার নিম্নমুখী প্রবণতাকে প্রতিহত করেছিল, কারণ শ্রমজীবী মানুষের মোট সংখ্যা বাড়লেও কৃষিতে নিযুক্ত শ্রমজীবী মানুষের অনুপাত উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়েনি। ১৯২১-এর পর জনসংখ্যা যেমন বেড়েছিল তেমনই ঐ সময়ের পর থেকে খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্যান্য শস্যের উৎপাদনশীলতাও অনেক বেড়েছিল। এ কারণে খাদ্যশস্য ছাড়া অন্যান্য শস্যের গড় উৎপাদনশীলতা শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে বৃদ্ধি পেয়েছিল এই ধারণার কিছু সত্যতা আছে বলে মনে হয়। কিন্তু নিম্নোক্ত বিষয়গুলি উপরোক্ত মতের সত্যতায় সংশয়ের ছায়া ফেলে অবশ্যই। প্রথমত, ১৯১১ থেকে ১৯২১ এই সময়ে উন্নয়নের গতি স্পষ্টতই হ্রাস পেয়েছিল। এটা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে কৃষি উৎপাদন যতই পরিবারভিত্তিক বা স্ত্রীলোক ও শিশুদের শ্রমের উপর নির্ভরশীল হোক না কেন, বয়স্ক পুরুষ শ্রমিকদের সংখ্যাবৃদ্ধির উপর তা মূলত নির্ভর করতে বাধ্য। ১৯২১ থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে প্রক্রিয়া শুরু হয় বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষের অনুপাত বৃদ্ধির উপর তার প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করতে হলে ন্যূনপক্ষে তিরিশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হয়। দ্বিতীয়ত, নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির সুফল যদি খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য শস্যের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করতে হয় তাহলে কোনো মতেই আশা করা সঙ্গত হবে না যে খাদ্যশস্যের একরপিছু উৎপাদন স্থির হয়ে থাকবে বা হ্রাস পাবে। এ কথা অবশ্য কেউ

কেউ বলতে পারেন যে শ্রমজীবী মানুষের অনুপাত বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে কৃষিউৎপাদনে অন্যান্য সহযোগী উপাদানের (যে গুলির অধিকাংশই শ্রমের অনুবর্তী) প্রয়োগের মাত্রাও বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং জনসংখ্যায় শ্রমজীবী মানুষের অনুপাত বৃদ্ধির সুফল সমস্ত ফসলের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হবে না। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন শস্য উৎপাদনের আপেক্ষিক মুনাফা যোগ্যতা বা বিভিন্ন ফসলের চাহিদার পরিবর্তনের মতো মৌলিক বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়া উচিত। তাহলে চাহিদার পরিবর্তন এবং সরকারি বিনিয়োগের ফলে কৃষি কাঠামোয় যে পরিবর্তন এসেছিল তার উপর গুরুত্ব দিয়ে আমরা এমন একটি মডেল নির্মাণ করতে পারি যাতে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাতকে অন্যতম উপাদান হিসাবে ব্যবহার করতে পারি।

তৃতীয়ত, যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাহায্যে একরপিছু উৎপাদন বৃদ্ধির ঘটনা মূলত ব্যাখ্যা করতে হয়, তাহলে যে সব প্রদেশে জনসংখ্যা বেশি হারে বেড়েছিল সে সব প্রদেশে উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধির হারও বেশি হওয়া উচিত। ৪.৯ নং সারণির দিকে তাকালেই দেখা যাবে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চ হার এবং উৎপাদিকা শক্তির অগ্রগতির হারের মধ্যে কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অস্তিত্ব নেই। অবশ্য যদিও বা এ দুয়ের মধ্যে যোগাযোগের কোনো আভাস পাওয়া যেত, তাহলেও তা কখনই এটা প্রমাণ করত না যে জনসংখ্যার শ্রমজীবী অংশের অনুপাত বেড়ে যাওয়ার ফলেই উৎপাদনের বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। এমনও হতে পারে যে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা লক্ষ্য করেই মানুষ এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে চলাচল শুরু করেছে এবং একরপিছু উৎপাদন ও মোট উৎপাদনের বৃদ্ধির ফলেই মৃত্যুহার কমে গিয়ে এবং সামান্য হলেও জন্মহার বেড়ে মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। বস্তুত, এই প্রবণতার সপক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে যে উপরোক্ত কারণেই পাঞ্জাবের সেচের খাল অধ্যুষিত এলাকায় এবং বিশেষ করে আসাম ও বাংলায় জনসংখ্যার একটা ভালো অংশ চলে গিয়েছিল।[৩২]

তাহলে আমরা দেখলাম যে কৃষিক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয় আদিম উৎপাদন পদ্ধতি এবং কেবলমাত্র যোগান সংক্রান্ত বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে যে সাদাসিধে মডেলগুলি নিয়ে আলোচনা হলো, সেগুলি দিয়ে আলোচ্য সময়ে ভারতে একরপিছু উৎপাদন, মোট উৎপাদন ও বিভিন্ন ফসলের অধীন চাষের এলাকার পরিবর্তন সম্বন্ধে যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এবারে এ পর্যন্ত আমরা যে অনুসন্ধান করেছি তার ফলাফলগুলিকে সংক্ষিপ্ত আকারে সূত্রায়িত করার চেষ্টা করতে পারি। ভারতের বিশেষ করে পূর্ব ভারতের ধান উৎপাদনের অর্থনীতি যে ধারাবাহিক অবক্ষয়ের মধ্যে পড়েছিল তার অনেক কারণ ছিল— যথা, ধানের জাতের বৈচিত্র্যের অভাব, সেচের জলের যোগানে অনিশ্চয়তা, সার ব্যবহারে অপ্রতুলতা এবং ভূমিক্ষয় ও নদীবক্ষে পলি জমার ফলে জমির উর্বরতা হ্রাস। খাদ্যশস্যের মধ্যে গম উৎপাদনে সবচেয়ে বেশি সুফল পাওয়া গিয়েছিল মূলত উন্নত জাতের গমের চাষ শুরু হওয়ার ফলে এবং পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশে সেচের সুযোগ সম্প্রসারিত হওয়ার সুবাদে। যোগানের দিকে এই সমস্ত অনুকূল অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে চাহিদার দিক থেকেও কতকগুলি সুবিধা গমের ক্ষেত্রে ছিল। কারণ, গমের ছিল রপ্তানি বাজার এবং অংশত ১৯৩১-এর পর থেকে গমের জন্যে শুল্ক সংরক্ষণের ব্যবস্থা। খাদ্যশস্যের মধ্যে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল—জোয়ার অবশ্য উন্নত জাতের চাষের প্রচলন অথবা সেচের সুযোগের সম্প্রসারণ কোনো সুবিধাই পায়নি।

সারণি ৪.৯ ব্রিটিশ ভারতে প্রদেশ-ভেদে জনসংখ্যার পার্থক্য

প্রদেশ	১৯০১-এর জনসংখ্যা	১৯০১ এবং ১৯১১	১৯১১ এবং ১৯২১	১৯২১ এবং ১৯৩১	১৯৩১ এবং ১৯৪১
মাদ্রাজ	৩৬,২৫৯	+২,৪৭০	+৯৯৭	+৪,০৭৯	+৫,১৩৭
বোম্বাই	১৫,৩১৯	+৪১৭	-১২৪	+১,৯৮০	+২,৮৫৮
বাংলা	৪২,১৪৯	+৩ ৩৪২	+১,২১৩	+৩,৪১২	+১০ ১৯১
যুক্তপ্রদেশ	১৯,৯৪৩	-৫০৬	-১,৪৩২	+৩,০৩৪	+৬,৬১২
পাঞ্জাব	১৯,৯৪৩	-৩৬৪	+১,১০৬	+২,৮৯৫	+৪,৮৩৮
বিহার	২৮,২৫১	+১,০৯৭	-৩২৪	+৩,৩৪৫	+৩,৯৭৪
মধ্যপ্রদেশ এবং বেরার	১১,৮৪৩	+১,৯১৬	-১৭	+১,৫৮১	+১,৪৯১
আসাম	৫,৭২৬	+৮৫৩	+৮৮০	+১,১৬৩	+১,৫৮২
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	২,০৪২	+১৫৫	+৫৪	+১৭৪	+৬১৩
উড়িষ্যা	৭,১২৭	+৪৫৫	-২৩১	+৬৭৪	+৭০৩
সিন্ধুপ্রদেশ	৩,২১১	+৩০৩	-২৩৪	+৬০৮	+৬৪৮

সূত্র : *Census of India* ১৯৪১, খণ্ড ১, ভারত, অংশ ১, (দিল্লী ১৯৪৩) পৃ ৬২-৪।

ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে খাদ্যশস্যের অধীন চাষের এলাকার তুলনায় অন্যান্য শস্যের এলাকা বেড়ে যাওয়ার পিছনে চাহিদাগত কারণগুলির প্রভাব ছিল সর্বাধিক। অবশ্য চাহিদার পরিস্থিতির পরিবর্তন, নতুন ধরনের ও জাতের ফসল চাষের প্রবর্তন ও সেচের সুযোগের সম্প্রসারণ ইত্যাদি ঘটনা বিভিন্ন অর্থকরী ফসলের[৩৩] মুনাফাযোগ্যতার ছবি অনেক বদলে দিয়েছিল এবং এতটাই বদলে দিয়েছিল যে সেচের দিক থেকে অগ্রসর প্রদেশেও সমস্ত অর্থকরী ফসলের চাষ সমান লাভজনক ছিল না। বরং দেখা যাচ্ছে যে একটি প্রদেশে অর্থকরী ফসলের একরপিছু উৎপাদনের হার তখনই বেড়েছে যখন সেখানে ঐ বিশেষ ফসলের মোট উৎপাদনও বেড়েছে। এর একটা ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, কৃষকদের অভিজ্ঞতায় যখন দেখা গেছে যে ঐ বিশেষ অঞ্চলে কোনো নির্দিষ্ট ফসলের চাষ বেশি লাভজনক তখন কৃষকের সবচেয়ে ভালো জমি এবং তার সাথে শ্রম, সার ও সেচের জল এই জাতীয় সমস্ত উপকরণ সেই শস্য উৎপাদনে নিয়োজিত করলেন। এমনকি অন্যান্য শস্যের উৎপাদন কমিয়েই এটা করা হলো। তাছাড়া, কৃষকরা যখন দেখলেন যে সবচেয়ে লাভজনক ফসলের একরপিছু উৎপাদনের হারও উর্ধ্বমুখী, তখন তাঁরা অন্যান্য শস্যের অধীনে যে সব জমি ছিল সেগুলির কিয়দংশ লাভজনক শস্যের চাষের অধীনে নিয়ে এলেন।[৩৪] স্বাভাবিকভাবেই একটি গতিশীল কার্যপরম্পরাযুক্ত কাঠামোর মধ্যে বিস্তৃত বিশ্লেষণ ছাড়া কারণকে কার্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা খুবই দুরূহ।

সুতরাং, অর্থকরী ফসলের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এগুলির চাহিদা নিজেই তার যোগান সৃষ্টি করতে পেরেছে যদিও এ দুয়ের মধ্যে সময়ের কিছু ব্যবধান ছিল। যোগানের উপর চাহিদার প্রভাব কার্যকরী হয়েছিল প্রধানত খাদ্যশস্যের চাষ এলাকা কমিয়ে অন্যান্য শস্যের চাষের এলাকা বাড়ানোর মধ্য দিয়ে এবং যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে অর্থকরী ফসলের একরপিছু উৎপাদন বৃদ্ধির মধ্য দিয়েও। দেশীয় কৃষিজাত কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল যে সব শিল্পের শুল্কসংরক্ষণ থেকে উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সেই সব শিল্প এ ব্যাপারে আশ্বস্ত হয়েছিল যে সাময়িক অসুবিধা হলেও কাঁচামালের যোগানের কোনো ঘাটতি তাদের হবে না। যে সব শিল্প নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি, সেগুলির মধ্যে পাটশিল্প দেশীয় কৃষিজ কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল ছিল এবং শুল্ক সংরক্ষণের সুবিধাভোগের সম্ভাবনাও যার ছিল না। অর্থকরী ফসলের মধ্যে পাট ছিল এমন একটি ফসল যার উৎপাদন ও চাষের এলাকার পরিমাণ কখনই বিশের দশকের মাঝামাঝি স্তরেও পৌঁছতে পারেনি। আবার পাট এমন একটি অর্থকরী ফসল যার একরপিছু উৎপাদনের হারে ব্যাপকভাবে উন্নত জাতের চাষের প্রচলন হওয়া সত্ত্বেও কোনোরকম উন্নতি লক্ষ্য করা যায়নি।

শেষত, আলোচ্য পর্বে খাদ্যশস্যের যোগান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে বৃদ্ধি পায় নি যদিও তা শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় ও প্রকৃত মজুরির বৃদ্ধির মাধ্যমে নতুন গড়ে ওঠা শিল্পগুলির সামনে কোনো সমস্যা উপস্থাপন করতে পারে নি। এ ঘটনার একটি আংশিক ব্যাখ্যা হলো যে খাদ্যদ্রব্যের দিক দিয়ে বিচার করলে ভারত ছিল মূলত একটি অবাধ অর্থনীতি। যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বের বাজারে খাদ্যের যোগান স্থিতিস্থাপক ছিল, ভারতের বাজারে চড়া হারে মূল্যবৃদ্ধির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। অন্য একটি ব্যাখ্যা হতে পারে যে ভারতে শিল্প শ্রমিকের সংখ্যায় যে সামান্য বৃদ্ধি ঘটেছিল তা খাদ্যশস্যের বিপণনযোগ্য উদ্বৃত্ত বাড়ানোর ব্যাপারে কোনো সমস্যা সৃষ্টি করেনি। আবার এও হতে পারে যে সমাজের যে স্তর বা দেশের যে অঞ্চল থেকে শিল্প শ্রমিকরা এসেছিলেন তার মধ্যেই এর কারণ নিহিত ছিল—শিল্পের বিকাশের ফলে আয়ের বণ্টন

উচ্চআয়ভোগী শ্রেণীর মানুষের অনুকূলে ঘটেছে এবং শিল্প শ্রমিকরা ছিলেন নিম্নআয়ভোগী শ্রেণীর মধ্যে সুবিধাভোগী অংশ। অর্থাৎ এই শ্রেণীর বাকি সব মানুষের দুর্দশা বাড়লেও শিল্পশ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি একই স্তরে থেকে গিয়েছিল। অন্যভাবে বলতে গেলে, শিল্প শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি একই স্তরে স্থির রাখা সম্ভব হয়েছিল কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে দেশের মধ্যে খাদ্যের চাহিদা খাদ্যেব অপরিবর্তনীয় যোগানের সীমানার মধ্যে বেঁধে রাখা গিয়েছিল। এটা করা হয়েছিল সেই সব শ্রেণীর মানুষের অনুকূলে আয়ের পুনর্বণ্টন ঘটিয়ে যাদের খাদ্যের জন্যে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মান ছিল এক-এর থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

চতুর্থ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের প্রজাস্বত্তের সাদৃশ্য এবং ভারতের কৃষিব্যবস্থার মৌল সংগঠন বিষয়ে দ্রষ্টব্য : H. H. Mann, 'The Agriculture of India'. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 145(1929). এটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে : H. H. Mann, *The Social Framework of Agriculture : India, Middle East, England* (Bombay, 1966). যুক্ত প্রদেশের অবস্থা সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য : W. H. Moreland, *The Revenue Administration of the United Provinces* (Allahabad, 1911), এবং [IPG প্রকাশিত] *Notes on the Agricultural Conditions and Problems of the U.P. and of its districts* (Allahabad, 1913); H. Martin Leake, *The Foundations of Indian Agriculture* (Cambridge, 1923), বিশেষভাবে এই গ্রন্থের তৃতীয় থেকে পঞ্চম পরিচ্ছেদ ; W. C. Neale, *Economic Change in Rural India : Land Tenure and Reform in Uttar Pradesh 1850-1955* (New Haven, 1962) ; S. Misra এবং B. Singh, *A Study of Land Reform in Uttar Pradesh* (Calcutta, 1964), তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়। বাংলার কৃষকদের অবস্থা ও প্রজাস্বত্ব ব্যবস্থা সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য : M. Azizul Huque, *The Man Behind the Plough* (Calcutta, 1939); K. C. Chaudhuri, *The History and Economics of the Land System in Bengal* (Calcutta, 1927). পাঞ্জাবের কৃষক ও কৃষির অবস্থা সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য : M. L. Darling, *The Peasant in Prosperity and Debt* (London, 1928) এবং H. C. Calvert, *The Wealth and Welfare of the Punjab* (London, 1936), নবম থেকে ত্রয়োদশ অধ্যায়। পশ্চিম ভারতের ভূমিব্যবস্থা সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য : G. Keatinge, *Agricultural Progress in Western India* (London, 1921), তৃতীয় থেকে পঞ্চম অধ্যায় এবং H. H. Mann, 'The Progress of Agriculture' [এই নিবন্ধটির জন্যে দ্রষ্টব্য S. Playne সংকলিত এবং Arnold Wright সম্পাদিত, *The Bombay Presidency, the United Provinces, the Punjab* etc. (London, 1920), পৃ. ৫৪০-৪৭]। ১৯১৭ থেকে ১৯২৬ এর মধ্যে বোম্বাই-দাক্ষিণাত্য এলাকার কয়েকটি গ্রাম সম্পর্কে যে অনুসন্ধান করা হয় তার কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ জানতে হলে দ্রষ্টব্য ভারতে কৃষি বিষয়ক রয়্যাল কমিশনের কাছে Dr. Harold Mann এর দেওয়া

সাক্ষ্য : *Evidence*, Vol. II, Part I : *Evidence taken in the Bombay Presidency* (Calcutta, 1927), পৃ. ১-১৬, ১৬(১)-১৬(৮)। A. Mitra [IPG প্রকাশিত], *An Account of Land Management in West Bengal 1870-1950, Census 1951, West Bengal* (Alipore, 1953)—এটি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে জমির ব্যবহার নির্ধারণকারী বিষয়গুলি সম্পর্কে সরকারি নথিপত্রের মূল্যবান সংকলন। দক্ষিণ ভারত সম্পর্কে দ্রষ্টব্য : S. Srinivasa Raghavaiyangar [IPG প্রকাশিত], *Memorandum on the progress of the Madras Presidency during the last forty years of British administration* (Madras, 1893); G. Slater সম্পাদিত : *Some South Indian Villages* (London 1918); D. T. Chadwick, 'Agricultural Progress' [Playne and Wright সম্পাদিত : *Southern India*, পৃ. ৭৪৫-৫৪ দ্রষ্টব্য]। ১৯৩৮ পর্যন্ত ভূমিসত্ত্বের সংস্কারের নানাবিধ প্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেতে হলে দ্রষ্টব্য : Radhakamal MukherjeeC 'Land Tenures and Legislation' [এটি সংকলিত হয়েছে Mukherjee সম্পাদিত, *Economic Problems of Modern India* গ্রন্থে (পৃ. ২১৮-৪৫)]। এছাড়াও দ্রষ্টব্য : M. B. Nanavati and J. J. Anjaria, *The Indian Rural Problem* (Bombay, 1945), বিশেষভাবে তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অনুবাদক : জয়ন্ত আচার্য

উৎস ও টীকা

১। অধ্যাপক C. P. Kindleberger-কৃত জনপ্রিয় পাঠ্যপুস্তক : *'Economic Development'* গ্রন্থে 'Land', 'Capital', 'Labour' এবং 'Organisation' নামধেয় পরপর চারটি অধ্যায় আছে।

২। এই অধ্যায়ের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৩। Blyn, *Agricultural Trends*, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৪। দ্রষ্টব্য : I. Mac Kenna (ভারত সরকার প্রকাশিত), *Agriculture in India* (কলকাতা, ১৯১৫) ; Louise Howard, *Sir Albert Howard in India* (লন্ডন, ১৯৫৩) ; J. Mac. Kenna, 'Scientific Agriculture in India', *JRSA*, ৬৪ সংখ্যা ৩৩১৬, ৯ই জুন, ১৯১৬, পৃ. ৫৩৭-৫০ ; N. C. Choudhury, *Jute and Substitutes* (কলকাতা, ১৯৩৩)।

৫। *'Economic Development and Cultural Change'*, ৩, সংখ্যা ৪, জুলাই, ১৯৫৫-র অন্তর্গত Seth Leacock and David G. Mandelbaum, 'A Nineteenth Century Developemnt Project in India : the Cotton Improvement Program,' এবং David S. Landes, *Bankers and Pashas : International Finance and Economic Imperialism in Egypt* (লন্ডন ও কেমব্রিজ, ম্যাস্, ১৯৫৮) পৃ. ৭১-৪ দ্রষ্টব্য।

৬। *Report of the Indian Cotton Committee* (কলকাতা, ১৯১৯), প্রথম অধ্যায় ; এবং B. L. Sethi (ভারত সরকার প্রকাশিত) 'History of Cotton' in B. L. Sethi ও অন্যান্য লেখক রচিত, *Cotton in India*, ২য় খণ্ড (বোম্বাই, ১৯৬০) পৃ. ১-৩৯, বিশেষভাবে পৃ. ১৩-১৮ দ্রষ্টব্য।

৭। সার ব্যবহারের অর্থনৈতিক ফলাফল সম্পর্কিত গবেষণার অসন্তোষজনক অবস্থা ও তার কারণ সম্বন্ধে জানতে Royal Commission on Agriculture in India-র নিকট ভূতপূর্ব Imperial Agricultural Bacteriologist এবং ১৯২৬-এর ডিসেম্বরে Chief Scientific Adviser to the Fertilizer Propaganda of India হিসাবে কর্মরত C. M. Hutchinson এর প্রদত্ত সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য : *Evidence*, চতুর্থ খণ্ড, *Evidence taken in the Bengal Presidency* (বোম্বাই, ১৯২৭), পৃ. ২৯৬-৩০১।

৮। উদাহরণ হিসাবে দ্রষ্টব্য : Royal Commission on Agriculture in India নিকট মাদ্রাজের কৃষি অধিকর্তা R. D. Anstead এর প্রদত্ত সাক্ষ্য : *Evidence*, তৃতীয় খণ্ড, *Evidence taken in the Madras Presidency* (কলকাতা, ১৯২৭), পৃ. ৪৩।

৯। ভারতীয় কৃষি সম্বন্ধে Royal Commission এর Report : তৃতীয় খণ্ড, *Evidence taken in the Madras Presidency* (কলকাতা, ১৯২৭), পৃ. ৪১-৩।

৯(ক)। A. C. Chatterjee (IPG প্রকাশিত) : *Notes on Industries in the United Provinces* (এলাহবাদ, ১৯০৮), পৃ. ১৬৪।

৯(খ)। Sir Bryce Burt, 'Agricultural Progress in India during the decade 1929-1939', *JRSA* ৯০, সংখ্যা ৪৬০৭, ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২, পৃ. ২১৪।

১০। Dharm Narain : *The Impact of Price Movement on Areas under Selected Crops in India, 1900-39* (কেম্ব্রিজ, ১৯৬৫) ; Raj Krishna, 'Farm Supply Response in India-Pakistan, *Economic Journal*, ৭৩, সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ ; A. K. M. Ghulam Rabbani, 'Economic Determinants of Jute Production in India and Pakistan', *Pakistan Development Review*, ৫ম খণ্ড (১৯৬৫), পৃ. ১৯১-২২৮ ; A. R. Sinha, H. C. Sinha এবং J. R. Guha Thakurta, 'Indian Cultivators' Response to Prices', *Sankhya : The Indian Journal of Statistics*, ১ম খণ্ড, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ, মে ১৯৩৪ ; A. R. Sinha, 'Interrelation between Supply and Price of Raw Jute', *Sankhya*, চতুর্থ খণ্ড, ১৯৩৮-৪০, পৃ. ৩৯৭-৪০০ ; এবং *idem*, 'A Preliminary Note on the Effect of Price on the Future Supply of Raw Jute', *Sankhya*, ৫ম খণ্ড, ১৯৪০-৪১, পৃ. ৪১৩-১৬।

১১। Narain, *Impact of Price Movements*, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১২। Blyn, Agricultural Trends, বিশেষভাবে রেখাচিত্র ৭.৩ দ্রষ্টব্য।

১৩। ITB, *Report regarding the grant of protection to the cotton textile industry* (কলকাতা, ১৯৩২), অনুচ্ছেদ ৩৪ ; ITB, Special Tariff Board, *Report on the enquiry regarding the level of duties necessary to afford adequate protection to the Indian cotton textile industry* (দিল্লী, ১৯৩৬) অনুচ্ছেদ ৩৬।

১৪। Burt, 'Agricultural Progress', পৃ. ২০৬-৭।

১৫। ১৯১২-১৩ এবং ১৯১৩-১৪ এই বছরগুলির একরপ্রতি উৎপাদনের মূল্যের পরিমাণ (১৬২ পাউন্ড) সম্পর্কিত তথ্যটি খুব নির্ভরযোগ্য নয়। তার কারণ ঐ প্রদেশে উক্ত সময়ে তুলো চাষের মোট এলাকা অপেক্ষাকৃত কম ছিল। ১৯৩২-এ Llyod Barrage Scheme চালু হওয়ার আগের দশকে সিন্ধু প্রদেশে ৩২০,০০০ একর জমিতে তুলো চাষ হতো। এর মধ্যে মার্কিনি তুলো চাষ হতো ২৫৬৫০ একরে। ১৯৩৯-৪০ সালে ঐ প্রদেশে ৯০৪,০০০ একর জমিতে তুলো চাষ হতো যার মধ্যে মার্কিনি তুলো চাষের এলাকা ছিল ৬৬৪,০০০ একর। একই বছরে পাঞ্জাবে মোট তুলো চাষের জমির পরিমাণ ছিল ২,৬৪১,১০৫ একর। এর মধ্যে ৯৩ শতাংশ জমিতে সেচের ব্যবস্থা ছিল এবং ৫৪.২ শতাংশ জমিতে চাষ হতো পাঞ্জাব-মার্কিনি প্রজাতির তুলো। দ্রষ্টব্য : Indian Central Cotton Committee, *Annual Report for the year ending 31st August, 1940* (বোম্বাই, ১৯৪১), পৃ. ৭৫-৬। Sir Bryce Burt-এর মতে ('Agricultural Progress') উন্নত প্রজাতির তুলো চাষের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ সেচসেবিত জমিতে সবচেয়ে বেশি হারে বৃদ্ধি পায়।

১৬। H. H. Mann, 'The Agriculture of India' *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, খণ্ড ১৪৫, ১৯২৯, পৃ. ৭৫।

১৭। সেচের অর্থনৈতিক ফলাফল আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য : H. H. Mann, 'The Economic Results and Possibilities of Irrigation', *Indian Journal of Agricultural Economics*, খণ্ড ১৩(২), ১৯৫৮, পৃ. ১-৬। সেচের পদ্ধতি ও তার বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য : A. V. Williamson, 'Irrigation in the Indo-Gangetic Plain', *Geographical Journal*, খণ্ড ৬৫ (১৯২৫), পৃ. ১৪১-৫৩ ; এবং *idem* : 'Indigenous Irrigation Works in Peninsular India', *Geograpical Review*, খণ্ড ২১, অক্টোবর ১৯৩১, পৃ. ৬১৩-২৬। ভারত সরকারের সেচের কাজের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়নের জন্যে দেখুন : Sir Bernard Darley, 'Irrigation and Its Possibilities', Radhakamal Mukherjee (ed.), *Economic Problems of Modern India*, খণ্ড ১ (লন্ডন, ১৯৩৯) পৃ. ১৪৮-৬৭।

১৮। D. T. Chadwick, 'Agricultural Progress, Playne ও Wright, *Southern India*, পৃ. ৭৪৮।

১৯। Narain, *Impact of Price Movements*, অধ্যায় ৪ ও ৭ এবং Blyn. *Agricultural Trends*, পৃ. ২৮৩-৯৭, এই দুই গ্রন্থে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব এলাকায় আখ ও তুলোর চাষ হয় তার বিবরণ আছে। ১৯২৬-৭ থেকে ১৯৪০-১ সালের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সহ বৃহত্তর পাঞ্জাবে তুলো চাষের অধীন জমির পরিমাণ খুব বৃদ্ধি পেলেও আখের জমির পরিমাণ একই থাকে। ঐ সময়ে যুক্ত প্রদেশে আখ চাষের অধীন জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তুলো চাষের এলাকা দ্রুত কমে আসে—বিশেষ করে ১৯৩৩-৪ সালের পরে। Blyn এই বিষয়টির তাৎপর্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

২০। Gov. India, Public Works Department : *Review of Irrigation in India, 1911-12* (সিমলা, ১৯১৪), পৃ. ১।

২১। Burt, 'Agricultural Progress', পৃ. ২০৭।

২২। ভারতে উন্নত প্রজাতির চাষ প্রবর্তন ও অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে প্রকৃষ্ট বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য : 'The Improvement of Crop Production in India,' *JRSA*, ৬৮, সংখ্যা ৩,৫৩০ ও ৩,৫৩১, ১৬ই জুলাই ও ২৯শে জুলাই, ১৯২০। সেচের জলের যথোপযুক্ত ব্যবহার সম্পর্কিত সমস্যাটির প্রতি এই নিবন্ধ গুরুত্ব দিয়েছে। অনেক সময়ে সেচের জলের যথেচ্ছ ব্যবহার মাটির উপযুক্ত বাতানয়নকে রুদ্ধ করত। ফলে পাকা ফসল নষ্ট হতো। তাছাড়া, জলমগ্ন জমিতে পরবর্তী ফসলও ভালো ফলত না।

২৩। Blyn, *Agricultural Trends*, পৃ. ১৭৪।

২৪। Dharm Narain, 'Agricultural Change in India' (Review of George Blyn, *Agricultural Trends*), : *Economic and Political Weekly*, (বোম্বাই) খণ্ড ২, সংখ্যা ৬, ফেব্রুয়ারি ১১, ১৯৬৭, পৃ. ৩৫৯-৬০।

২৫। দামোদর উপত্যকা অঞ্চলের (যা মূলত বিহারের পূর্বাঞ্চল ও বাংলার পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত) ভূমিক্ষয় বিষয়ে দ্রষ্টব্য : R. Maclagan Gorrie [ভারত সরকার প্রকাশনা], *Forestry Development and Soil Conservation in the Upper Damodar Valley—A 15 years scheme* (Damodar Valley Corporation, Calcutta, c. 1954), পৃ. ১০-১৫। পশ্চিমবঙ্গের ভূমিক্ষয় সম্পর্কে সাক্ষ্য : E. O. Shebbeare, Conservator of Forests, Bengal : R C on Agriculture in India, *Evidence*, খণ্ড ৪, *Evidence taken in the Bengal Presidency* (বোম্বাই, ১৯২৭), পৃ. ২০৬-২৪। বিহার ও উড়িষ্যার ভূমিক্ষয় সম্পর্কে সাক্ষ্য : J. H. Lyalb, Officiating Conservator of Forests, Bihar and Orissa : R C on Agriculture in India, *Evidence*, খণ্ড ১৩, *Evidence taken in Bihar and Orissa* (কলকাতা, ১৯২৮), পৃ. ৪১৬-২৯। গঙ্গার নিম্ন অববাহিকার শাখানদীগুলি পূর্বদিকে সরে যাওয়ায় গাঙ্গের ব-দ্বীপ অঞ্চলে জমির উর্বরতা হ্রাস পায় এবং এর ফলে মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ জেগে ওঠে। নদীর এ হেন গতি পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত সমস্যা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য S. C.

Majumdar, *Rivers of the Bengal Delta* (কলকাতা, ১৯৪১), এবং K. Bagchi : *The Ganges Delta* (কলকাতা, ১৯৪৪)।

২৬। Blyn, *Agricultural Trends,* পরিশিষ্ট সারণি ৩এ এবং রেখাচিত্র ৭.২।

২৭। সারণি ৪.৮, একই সূত্র থেকে গৃহীত, পরিশিষ্ট ৪ সি।

২৮। *Report of the IIC* (PP 1919, XVII), পরিশিষ্ট বি, বিশেষ করে পৃ. ৩২৭-৮ দ্রষ্টব্য। ১৯১৬-১৭তে তুলো চাষের অধীন মোট জমির পরিমাণ ছিল ২১,২১২,০০০ একর। এর মধ্যে মাঝারি ও লম্বা আঁশযুক্ত তুলোর চাষ হতো ২,২৭৪,০০০ একর জমিতে। *ঐ,* পৃ. ৩২৩।

২৯। Mehta, *The Cotton Mills of India, 1854 to 1954,* অধ্যায় ১২ এবং N. S. R. Sastry : *A Statistical Study of India's Industrial Development* (বোম্বাই, ১৯৪৭), পৃ. ৮৩-৫। দুই যুদ্ধের অর্ন্তবর্তীকালে ভারতের কারখানায় উৎপাদিত সুতো ও থানবস্ত্রের মান কতখানি উন্নত হয়েছিল সে সম্বন্ধে জানতে উপরোক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য.।

৩০। একাধিক শস্যের চাষ প্রবর্তিত হলে জমির শ্রেণীবিভাগ আর পণ্য বা উপাদানের দামের প্রভাবমুক্ত থাকতে পারে না, কোনো বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া। বিভিন্ন রকম ফসল উৎপাদন ব্যবস্থায় দাম-নিরপেক্ষভাবে জমির শ্রেণীবিন্যাস করতে গিয়ে আমরা একটা অনুমান করে নিচ্ছি যে প্রান্তিক উৎপাদনের মূল্য অনুসারে জমির শ্রেণীবিন্যাস সমস্ত ধরনের ফসলের ক্ষেত্রে একই ধরনের হবে। এই অনুমান ফসল ও উপাদানের দামের পরিবর্তনশীলতার একটি সম্ভাব্য মাত্রা অবধি প্রযোজ্য এবং বাস্তব ঘটনা ও তথ্য সহযোগে প্রমাণ করাও সম্ভব। অতএব যদি ফসল বা উপাদানগুলির দামের বড় রকমের পরিবর্তনও ঘটে তাহলেও আমাদের এই অনুমানের ফলে জমির শ্রেণীবিন্যাসের বড় রকমের হেরফের ঘটবে না।

৩১। ভারতীয় কৃষির সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনবিধির পরিশীলিত কিন্তু বিভ্রান্তিমূলক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত পেতে হলে দ্রষ্টব্য D. Ghosh, *Pressure of Population and Economic Efficiency in India* (নয়া দিল্লী, ১৯৪৬) অং শ ২, বিশেষ করে পৃ. ৪৫-৯।

৩২। Davis, *Population of India and Pakistan,* পৃ. ১০৯-১১, এবং K. C. Zachariah : *A Historical Study of Internal Migration in the Indian Subcontinent, 1901-1931* (লন্ডন, ১৯৬৪)।

৩৩। এই ব্যাখ্যা কেবলমাত্র শস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কারণ চা, কফি এবং রবার—এই সব বাগিচা শস্যের বিষয়গুলি আমাদের আলোচনার পরিধির অন্তর্গত নয়।

৩৪. Rabbani, 'Economic Determinants', পৃঃ ২০১-২ দ্রষ্টব্য।

অনুবাদক : জয়ন্ত আচার্য

৫

অদক্ষ শ্রমের যোগান

আগেকার আমলে ভারতের অর্থনীতি বিষয়ের বেশির ভাগ লেখকরা মনে করতেন ভারতীয় শ্রমিক অনড়, তাদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ আনা দুঃসাধ্য এবং এই বিপুল জনসংখ্যার দেশেও তারা অনেক সময়ে দুষ্প্রাপ্য।[১] অতএব নিহিত বা প্রকাশিত অর্থে ধরে নেওয়া হচ্ছে সাম্প্রতিক অতীতে শ্রমের যোগান শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায় ছিল। ভারতীয় শ্রমিকরা যুক্তিবোধহীন এবং অবাধ্য এরকম কিছু ধারণা যে এদেশীয় কৃষকদের যুক্তিবোধহীনতা সম্বন্ধীয় অমার্জিত ধারণাটির তুলনায় উন্নত নয় তা ধরা পড়ে যখন সে সব মত পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার সম্মুখীন হয়।[২]

কিন্তু তাতেও ভুল বোঝার আশঙ্কা দূর হয়ে যায় না। কৃষিজীবী কল-শ্রমিকদের সম্পর্কে প্রচলিত মিথের পরিবর্তে স্থান পেতে পারে আরেকটি আজগুবি গল্প। এর উপজীব্য ছিন্নমূল ভারতীয় কলশ্রমিক যাদের স্বাভাবিক যোগান-দাম জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম মজুরি এবং যাদের অবস্থা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত হয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহারের দ্বারা। প্রকৃতপক্ষে, ঠিক অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শ্রম-সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সরকারের হস্তক্ষেপ না করার সূত্রটি কোনো নীতির অভাব বোঝায় না, বরং একেই গণ্য করা চলে এক ধরনের নীতি হিসাবে। ঠিক যেমন শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই নীতি ব্রিটিশদের অথবা কিছু মাত্রায় ইয়োরোপীয় বণিক শিল্পপতিদের অনুকূলে গেছে।[৩] শ্রমের যোগানের ক্ষেত্রে তেমন এই সূত্র থেকে এসেছে ভারতীয় শ্রমের সচলতা সম্পর্কিত নীতি যার লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ-পরিচালিত বাগিচা এবং কারখানা শিল্পে শ্রমকে পরিচালিত করা। অপরদিকে, রাজনৈতিক উপাদান এবং শ্রমিক সঙ্ঘের প্রসারে সহায়ক উপাদানগুলি প্রকৃত মজুরি নির্ধারণে নব্য ম্যালথুসিয়ান তত্ত্বের ভিত্তিতে বিশ্লেষিত সম্ভাব্য ফলাফলের অন্তত কিছু পরিবর্তন ঘটাতে পারত। শ্রমের যোগান সম্পর্কে ভারত সরকারের অনুসৃত নীতি, শ্রমিক আন্দোলনের অসম বিকাশ এবং সেই সময়ের কিছু রাজনৈতিক ঘটনাবলী বিভিন্নভাবে এলাকাগুলিতে শ্রম ব্যয় ও কিছু পরিমাণে শিল্প পণ্যের বাজারকে প্রভাবিত করেছিল। এসব কারণে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে উভয় ধরনের উপাদানের উপর কিছুটা নজর দেওয়া হয়েছে। এই উপাদানসমূহের প্রভাব যথার্থভাবে নির্ণয় করতে হলে কৃষি ও জনসংখ্যার ভিত্তিভূমির সঙ্গে এগুলির সম্পর্ক অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

৫.১ জনসংখ্যাবৃদ্ধির পরিসংখ্যান এবং অদক্ষ শ্রমের যোগান সম্পর্কে মতামত

ভারতের জনসংখ্যা কোটির অঙ্কে ১৮৯১-এ ছিল ২৮.২, ১৯০১-এ ২৮.৫, ১৯১১-য় ৩০.৩, ১৯২১-এ ৩০.৬, ১৯৩১-এ ৩৩.৮ এবং ১৯৪১-এ ৩৮.৯।[৪] ১৯০১ সালকে ভিত্তিবর্ষ

হিসাবে ধরলে ১৯০১ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৩৬%। ১৯০১ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত ভারত থেকে প্রতি বছরে ৬৯৫০০ ব্যক্তি দেশান্তরে যেত। একটি হিসাব অনুযায়ী কৃষি শ্রমের উপর নির্ভরশীল (নিজের জমিতে চাষ অথবা ভাগ চাষ থেকে ভিন্ন—এই ভাবে চিহ্নিত) মানুষের সংখ্যা ছিল ১৯০১-এ ৫ কোটি ২৪ লক্ষ। ১৯৩১-এ সংখ্যাটি দাঁড়িয়েছিল ৯ কোটি ৫৯ লক্ষে।[৫] অপরদিকে সংগঠিত শিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঐ সংখ্যাটি ছিল ১৯১১-য় ২১০৫৮২৪ (বাগিচা শিল্পের ৮১০৪০৭ জন সহ) এবং ১৯২১-এ ২৬৮১১২৫ (বাগিচা শিল্পের ৮২০৮৬৮ জনকে ধরে)।[৬] ১৯৩১-এ বাগিচা ছাড়া বিভিন্ন শিল্পের দৈনিক নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১৬৩০০৩৭।[৭]

শিল্পে শ্রম নিয়োগের এই সংখ্যাতথ্য ব্রহ্মদেশ অন্তর্ভুক্ত ভারত সম্বন্ধীয়, তাছাড়া সংজ্ঞা নিরূপণ ও পরিসংখ্যান সংগ্রহের প্রণালীর ভিন্নতার ফলে এই তথ্যসমূহ যথাযথভাবে তুলনীয় নয়। তা সত্ত্বেও এ-সব সংখ্যাতথ্যের গুরুত্ব আছে। তার কারণ, আমাদের আলোচ্য সময়ের তিনটি ভিত্তি বৎসরে মোট জনসংখ্যা ও কৃষিতে নিযুক্ত শ্রমের তুলনায় শিল্পে কর্মসংস্থানের অনুপাত যে নগণ্য ছিল তা যথেষ্ট স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। এমন কি ভারত থেকে নীট প্রবসনের (emigration) বার্ষিক পরিমাণ শিল্পে কর্মসংস্থানের বার্ষিক বৃদ্ধির তুলনায় অনেক বেশি ছিল। কৃষিকাজে অত্যন্ত কম উৎপাদনশীলতা সহ এই বিষয়গুলিকে বিবেচনা করলে কেউ বলবে না যে শিল্পপতিরা অদক্ষ শ্রমের যোগানকে নিশ্চিত করতে কোনো অসুবিধায় পড়ত।

যাই হোক, ১৯২০-র দশকের গোড়ার দিকে একথা প্রায় সবাই স্বীকার করত যে ভারতে শুধুমাত্র 'সুলভ' শ্রম উৎপাদনশীলতার নিরিখেই দুর্মূল্য ছিল না, শিল্পের প্রয়োজনের তুলনায় তার অপ্রতুলতার জন্যেও।[৮] ভারতীয় শ্রমের ঘাটতি বিষয়ক মতবাদটি 'রিপোর্ট অব দি রয়্যাল কমিশন অন লেবার ইন ইন্ডিয়া'-তে পবিত্র বাণীর মতো লিপিবদ্ধ হয়ে আছে নিম্নোক্ত ভাষায় :

'ভারতের সংগঠিত শিল্প তার ইতিহাসের অ[ধি]কাংশ সময়েই শ্রমের স্বল্পতার সম্মুখীন হয়েছে। এক প্রজন্ম আগে এই স্বল্পতা সময়ে সময়ে জটিল হয়ে উঠত। উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে প্লেগ মহামারীর পরে মালিকদের অসুবিধা তীব্র হয়ে ওঠে, বিশেষত বোম্বাইতে। ১৯০৫-এ বাংলা এবং সংযুক্ত রাজ্যসমূহের অভিযোগের ভিত্তিতে এই স্বল্পতার কারণগুলির সরকারি অনুসন্ধান হয়। তার পর থেকে কারখানা শিল্পগুলিতে পরিস্থিতি অপেক্ষাকৃত সহজ হয়, কিন্তু এ ক্ষেত্রেও যুদ্ধের আগে মাত্র কয়েকজন মালিকই বছরের সব মরশুমে পর্যাপ্ত শ্রমের নিশ্চয়তা পেত।'[৯]

বেশি জনঘনত্ব এবং শ্রমের স্বল্প যোগান-দাম সম্পন্ন কোনো দেশে এ ধরনের কোনো মত কেন বিপুল সমর্থন পেল তার ব্যাখ্যা খুঁজতে হয় নানান রকম উপাদানের সম্মিলনের মধ্যে। প্রথমত, ভারতের কিছু অংশে, বিশেষ করে পূর্ব বঙ্গে ও আসামে, কৃষিকর্মের ক্ষেত্রে শ্রমের স্বল্পতা প্রকৃতই ছিল আমাদের পর্যবেক্ষণের সমগ্র সময় জুড়ে। দেশের এসব অঞ্চলে এই স্বল্পতার প্রতিফলন ঘটত কৃষি শ্রমের অপেক্ষাকৃত উঁচু হারের মজুরিতে, বিশেষত প্রধান শস্য ধান ও পাটের বীজবপন, রোপন এবং ফসল তোলার মরশুমে।[১০] দ্বিতীয়ত, শ্রমের বাজার অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় জর্জরিত ছিল। যেমন, একই কেন্দ্রে একই কাজের জন্যে, ভিন্ন হারের মজুরি চালু ছিল।[১১] যেহেতু শ্রমিক ও নিয়োগকর্তা শ্রমের বাজার সম্পর্কে

সম্পূর্ণ তথ্য পেত না, কর্মসংস্থানের ব্যাপারে উভয়কেই অনেকটাই নির্ভর করতে হতো দালালদের উপর। দালালরা কখনো কখনো, অন্তত স্বল্প কালের জন্যে, এক কারখানা থেকে অপর কারখানায় শ্রমিক বদলি করে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করত এমন-কি যখন শ্রমের যোগান অতিরিক্ত থাকত। তৃতীয়ত, শ্রমের অপ্রতুলতা ছিল স্বল্পকালীন সমস্যা, দীর্ঘকালে শ্রমের যোগান ছিল সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক। বিশাল দেশ ভারতবর্ষের দুটি বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র কলকাতা ও বোম্বাইয়ের মধ্যে দূরত্ব হাজার মাইলের বেশি। যদিও আভ্যন্তরীণ প্রচরণের সংখ্যাতথ্য থেকে দেখা যায় যে বাগিচা ও কারখানা শিল্পের চাহিদায় শ্রমের যোগান সাড়া দিত, বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রের শ্রমের চাহিদার পার্থক্যের সঙ্গে প্রচরণের প্রবাহের সামঞ্জস্য রক্ষায় সময় লাগত যথেষ্ট। শ্রমের অপূর্ণ চলনশীলতা জনিত এই সার্বিক পরিস্থিতি, যা প্রায় প্রতিটি স্থিতিশীল দেশে (Settled Country) লক্ষ্যণীয়, জটিল হয়ে ওঠে দুটি কারণে : (ক) ভারতের কারখানাগুলির অবস্থার তুলনায় খনি ও বাগিচা শিল্পের মজুরি ও কর্মসংস্থানের শর্ত প্রতিকূল ছিল এবং সে কারণে কারখানায় শ্রমিক নিয়োগের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল, (খ) ১৮৯৬ সাল ও তারপর থেকে বোম্বাই ও ভারতীয় গাঙ্গেয় উপত্যকার উত্তরাঞ্চলে বিধ্বংসী প্লেগ রোগের প্রকোপের ফলে শ্রমের যোগান তার উৎস-মুখ থেকে কমে যায় এবং বোম্বাই ও কানপুর কর্মস্থল হিসাবে আকর্ষণ হারাতে থাকে।[১২] আলোচ্য সময়ে ভারতীয় শ্রমের যোগান-রেখা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক ছিল কিনা তা স্থির করার একটি উপায় হিসাবে শিল্প শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি লক্ষ্যণীয়। শ্রমের একটি স্থির প্রকৃত মজুরি থেকে যে অনুমানটি করা যায় তা স্থিতিস্থাপক শ্রমের যোগান ঘটিত অনুকূল পরিস্থিতিতে ভারতীয় শিল্পের গড়ে ওঠার অনুকল্পটিকে সমর্থন করে।

কিন্তু সমগ্র ভারতের প্রকৃত মজুরির একটি শ্রেণী (series of real wages) প্রস্তুত করার অনেক বাধা আছে। বিভিন্ন ধরনের শ্রমের দরুন বিভিন্ন মজুরির প্রাপ্ত সংখ্যাতথ্য যথেষ্ট নয়। তাছাড়া এসব তথ্য এত ছড়িয়ে আছে যে তার উদ্ধারকার্য দুঃসাধ্য মনে হওয়া স্বাভাবিক। নৈপুণ্য ও শারীরিক সক্ষমতার দিক থেকে শ্রমশক্তির গঠন শিল্পের গঠনের (composition of industry) সঙ্গে তাল রেখে পরিবর্তিত হয়েছে। শ্রমের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতাজনিত পরিস্থিতি, শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে মিল মালিকদের দ্বারা জরিমানা আরোপ এবং মজুরিভোগী কর্মচারীদের একটি বড় অংশের ঋণের দরুন উঁচু হারে সুদ দেওয়া—এরকম কিছু সমস্যা একটি নমুনাস্বরূপ মজুরি মালা (wage series) গঠনের কাজটিকে প্রায় অসম্ভব করে তুলেছিল।[১৩] মূল পরিসংখ্যানের এধরনের অনিশ্চয়তা ছাড়াও সমস্ত শ্রমিকদের—এমনকি নির্দিষ্ট শিল্পকেন্দ্রগুলির শ্রমিকদেরও—জীবনযাপনের ব্যয়ের সূচক গঠনের নানা রকমের অসুবিধা আছে। অতএব এহেন কোনো পরিমাপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলকে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করা উচিত।

৫.২ বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রে প্রকৃত মজুরির পার্থক্যমূলক বিচলন

পশ্চিম ভারতের তুলোকলে ও কলকাতার পাটকলে প্রকৃত মজুরির দীর্ঘকালীন প্রবণতা ডঃ কে মুখার্জি সম্প্রতি পরিমাপ করেছেন সরকারি তথ্যের ভিত্তিতে।[১৪] তাঁর দেওয়া সংখ্যাতথ্য

আমাদের বিশ্লেষণের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু তাঁর পরিমাপের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হলে প্রকৃত মজুরির প্রবণতাসমূহের বিশ্লেষণ সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে করা যাবে না।

জীবনযাপনের ব্যয়ের সূচক নির্মাণ, তাকে মূল্যসংকোচক হিসাবে ব্যবহার করে আর্থিক মজুরি থেকে প্রকৃত মজুরি নির্ণয় ও তার ব্যাখ্যা—এরকম কিছু অতি পরিচিত সমস্যা ছাড়াও মুখার্জির পরিমাপের দুর্বলতা নিহিত আছে তার পরিসংখ্যানগত ক্ষুদ্র ভিত্তিতে, বিশেষ করে ১৯০০ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত সময়কালের পরিমাপের ক্ষেত্রে। এই সময়কালের প্রতিটি বছরেব তাঁর ব্যবহৃত তথ্যের ভিত্তি ছিল একটি মাত্র সরকারি প্রকাশনা : *প্রাইসেস্ অ্যান্ড ওয়েজেস ইন ইন্ডিয়া* এই গ্রন্থে পরিবেশিত তথ্যসমূহ বোম্বাইয়ের একটি মাত্র তুলোকল ও বাংলার একটিমাত্র পাটকল থেকে প্রাপ্ত। অথচ সেগুলি প্রযুক্ত হয়েছে সমগ্র বোম্বাই ও বাংলার শিল্প দুটির ক্ষেত্রে। একই অঞ্চলে একই শিল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন কারখানার মধ্যে শ্রমেব শর্ত ও তাব মজুরি ভিন্ন হতে পারত। অতএব কোনো একটি বিশেষ সংস্থাকে সমগ্র শিল্পটির প্রতিনিধি হিসাবে চিত্রিত করার প্রয়াস সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে যুক্তিসঙ্গত নয়। মুখার্জিব পরিসংখ্যানের সারাংশ সারণি ৫.১-এ দেওয়া হলো।

একমাত্র মুখার্জি প্রদত্ত সিরিজে সমস্ত প্রাসঙ্গিক বছরগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু ১৯০০থেকে ১৯১২ পর্যন্ত বছরগুলির জন্যে কে এল দত্তের প্রকৃত মজুরির সিরিজ এখানে অনুসৃত হয়েছে (সারণি ৫.২ দ্রষ্টব্য)। অপর দিকে তুলোকল শিল্পের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বসম্পন্ন কেন্দ্র ছিল কলকাতা। মুখার্জি ও দত্তের সিরিজের অভিন্ন বছরগুলিব ক্ষেত্রে প্রকৃত মজুরির প্রবণতা সংক্রান্ত উভয়ের তথ্যের মধ্যে মিল আছে। বোম্বাই ও আমেদাবাদে (দত্তের সিরিজে গুজরাট) প্রকৃত মজুরি বেড়েছিল এবং তা সামান্য কমেছিল কলকাতার পাটকলে ১৯০০ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত সময়কালে। ৫.১ সারণি অনুসারে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে পাটকল ও তুলোকল উভয় শিল্পেই প্রকৃত মজুরি কমে গিয়েছিল। ১৯২১ থেকে কলকাতার পাটকলে এবং বোম্বাই ও আমেদাবাদের তুলোকলে প্রকৃত মজুরির বিচলনের ধরন ভিন্ন ছিল। ১৯২১ ও ১৯৩০ সালের মধ্যে বোম্বাই ও আমেদাবাদের তুলোকলে প্রকৃত মজুরির দ্রুত বৃদ্ধি ঘটেছিল। অথচ পাটকলে প্রকৃত মজুরির কোনো বৃদ্ধি ঘটেনি।[১৫] মন্দার কালে কৃষি-পণ্যের দামের দ্রুত পতনের সঙ্গে সঙ্গে পাটশিল্পে প্রকৃত মজুরি উন্নত হয়েছিল। কিন্তু ১৯২১ ও ১৯৩৯ সালের মধ্যে বোম্বাই ও আমেদাবাদের তুলোকলের তুলনায় পাটকলে প্রকৃত মজুরির মোট বৃদ্ধির পরিমাণ কম ছিল।

কে. এল. দত্তের অনুসন্ধান এবং বোম্বাইয়ের শ্রম-দপ্তর থেকে প্রকাশিত মজুরি সংক্রান্ত তথ্য ছাড়া আরও অল্প কিছু পরিসংখ্যান পাওয়া যায় যার সঙ্গে মুখার্জিকৃত সিরিজগুলি মিলিয়ে নেওয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে নিরপেক্ষ তথ্যগুলির বেশিরভাগই শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে সেই একই উৎসের উপর নির্ভরশীল—তা হচ্ছে, *প্রাইসেস অ্যান্ড ওয়েজেস ইন ইন্ডিয়া*—যা মুখার্জী নিজেও কাজে লাগিয়েছেন।[১৬] সুতরাং তথ্যের সীমাবদ্ধতা এবং শ্রমিকদের স্বাচ্ছন্দ্যের সূচক হিসাবে প্রকৃত মজুরির পরিমাপের অসম্পূর্ণতার কথা মনে রেখে আমরা ধরে নেব যে আমেদাবাদ ও বোম্বাইয়ের তুলোকলগুলির এবং কলকাতার পাটকলগুলির মধ্যে মজুরির তারতম্যের ছবি মুখার্জির দেওয়া পরিসংখ্যানে প্রতিফলিত হয়েছে।

সারণি ৫.১ ভারতের বস্ত্র ও পাট শিল্পে প্রকৃত মজুরি (১৯০০-৩৯)

	বোম্বাই শহর ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের তুলোকলের গড় মাসিক মজুরির প্রকৃত মূল্যের সূচক (১৯৩৪=১০০)	আমেদাবাদের তুলোকলের প্রকৃত মজুরির সূচক (১৯৫১=১০০)	পাট শিল্পের প্রকৃত মজুরির সূচক (১৯৫১=১০০)
	(১)	(২)	(৩)
১৯০০	৪৩	৩১.৫	৬২.৩
১৯০১	৪৫	৩৬.৪	৬১.২
১৯০২	৪৭	৩৭.৬	৬০.৩
১৯০৩	৪৬	৪২.৯	৬৮.০
১৯০৪	৫১	৪২.৯	৬৮.৪
১৯০৫	৪৪	৩৯.৭	৬৪.৭
১৯০৬	৪৭	৩৬.৬	৫৭.৯
১৯০৭	৫৩	৩৮.৫	৫৩.২
১৯০৮	৫২	৩৪.৫	৪৮.৭
১৯০৯	৫৬	৩৮.৯	৫৩.৬
১৯১০	৫৫	৪২.০	৫৮.৩
১৯১১	৪৮	৪১.৭	৬৩.৩
১৯১২	৫০	৩৮.৫	৫৫.০
১৯১৩	৪৯	৩৮.৫	৫৪.৬
১৯১৪	৫৬	৩৫.৩	৫৫.১
১৯১৫	৫১	৩৩.৪	৫৩.০
১৯১৬	৪৯	৩৩.০	৫২.৭
১৯১৭	৪২	৩২.১	৫৬.০
১৯১৮	৪৯	২৮.৮	৫২.০
১৯১৯	৫২	২৮.১	৪৬.৯
১৯২০	৫৬	২৯.৯	৪৮.৭
১৯২১	৬১	৪৪.৩	৫৩.৬
১৯২২	৭০	৫১.৩	৫৪.৪
১৯২৩	৭৪	৫৭.২	৫৪.৮
১৯২৪	৭০	৫৪.৯	৫৩.৯
১৯২৫	৭৮	৫৩.৮	৫৯.৮
১৯২৬	৮২	৫৭.৫	৬১.৮
১৯২৭	৮২	৬৩.৯	৬০.২
১৯২৮	৮৬	৬৭.২	৫৬.০
১৯২৯	৮৫	৬৫.৮	৫২.৫
১৯৩০	৯৩	৭৩.৪	৫১.০

	(১)	(১)	(১)
১৯৩১	১১৫	৮৯.৯	৬৭.০
১৯৩২	১১৬	৮৮.৭	৬২.০
১৯৩৩	১২৩	৯৩.৭	৬১.৭
১৯৩৪	১০০	৯৫.০	৬৭.৭
১৯৩৫	৯৯	৮৯.১	৬৫.৪
১৯৩৬	৯৯	৮৯.১	৭৮.৬
১৯৩৭	১০২	৭৭.০	৮৩.০
১৯৩৮	১১১	৮৭.৮	৮৬.৮
১৯৩৯	১২৩	৯০.৬	৮৭.৫

উৎস: স্তম্ভ (১) কে মুখার্জি, *Artha Vijnane,* খণ্ড ২, সংখ্যা ১, সারণি ৬ ; স্তম্ভ (২), কে মুখার্জি, *Artha Vijnane,* খণ্ড ৩, সংখ্যা ২, 'Basic Tables' স্তম্ভ (৩) কে, মুখার্জি, *Artha Vijnane,* খণ্ড ২, সংখ্যা ১, 'Basic Tables'।

৫.১ নং সারণি লক্ষ্য করলে আমরা দেখি যে, ১৯০০ থেকে ১৯১৪-র মধ্যে বোম্বাইয়ের তুলোকলগুলিতে প্রকৃত মজুরি বেড়েছিল প্রায় এক-চতুর্থাংশ, তারপর ১৯২০ পর্যন্ত কমে যাওয়ার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। ১৯২০ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত মজুরির বৃদ্ধির হার বেশ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৬ এই ক' বছরে তা কমে যায় এবং তার পর থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত তা আবার বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমেদাবাদের তুলোকলগুলিতে ১৯০০ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত মজুরি বৃদ্ধির হার ছিল সামান্য (শতকরা প্রায় ১২ ভাগ), ১৯২০ পর্যন্ত এই হার কমতে থাকে এবং তার পর থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত তা ক্রমাগত বেড়ে গিয়েছিল। ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৭ এই বছরগুলিতে মজুরি কমে গিয়ে ১৯৩৮ ও ১৯৩৯-এ আবার বেড়ে গিয়েছিল। কলকাতা ও তার আশেপাশের পাটকলগুলিতে প্রকৃত মজুরি ১৯০০ থেকে ১৯১৪-র মধ্যে কিছুটা কমে গিয়েছিল (শতকরা প্রায় ১১.৫ ভাগ)—১৯২০ পর্যন্ত তা আরও কমে গিয়েছিল। তারপর থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত এই হার বাড়ল, পরের চার বছরে অর্থাৎ ১৯৩০ অবধি মজুরি আবার কমে গেল। ১৯৩১-এ প্রকৃত মজুরির সাময়িক বৃদ্ধির তথ্যটি গ্রহণযোগ্য নয়। তার কারণ, প্রকৃত মজুরি পরিমাপ করার পদ্ধতিতে ত্রুটি ছিল। কিন্তু ১৯৩২ ও ১৯৩৩-এ প্রকৃত পক্ষে মজুরি কমে গেল যদিও ১৯৩৪-থেকে ১৯৩৯ এই পর্বে বাড়তে শুরু করেছিল (একমাত্র ১৯৩৫-এ সাময়িকভাবে কমে যাওয়া ছাড়া)। পাটশিল্পের ক্ষেত্রে মজুরি বৃদ্ধির হার ছিল খুবই দুর্বল এবং সন্দেহ হয় যে এই বৃদ্ধির অনেকটাই ঘটেছে মন্দার বছরগুলিতে জীবনযাত্রার যে ব্যয়সূচক ব্যবহৃত হয়েছে তার সঙ্গে আর্থিক মজুরির পরিমাপের তারতম্য থাকার কারণে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে, পাটশিল্পে শ্রমিকরা ১৯৩৩-এ যে মজুরি পেতেন তা প্রকৃত হিসাবে ১৯০০ সালে অর্জিত মজুরির থেকে কম ছিল। এর বিপরীতে দেখা যায় যে বোম্বাই ও আমেদাবাদের মিলগুলিতে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরির বৃদ্ধির হার ছিল অনেক বেশি। এই সিরিজের দুই প্রান্তিক বছরের তুলনা করলে আমরা দেখি যে ১৯০০ থেকে ১৯৩৯ এর মধ্যে বোম্বাইয়ের তুলোকলগুলির

সারণি ৫.২ বিভিন্ন কেন্দ্রে ও শিল্পে মাসিক প্রকৃত মজুরির সূচক-সংখ্যা (১৯০০-১৯১২)

	পাট		তুলো			চা	খনিজ	
	কলকাতা	বাংলা দক্ষিণাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চল	কলকাতা	বোম্বাই	গুজরাট	আসাম	বাংলা দক্ষিণাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চল	ছোট নাগপুর
১৯০০	১১৬	১০১	১১৮	৯১	৭৬	৯২	১০০	১৫৯
১৯০১	১১২	১০১	১১৫	৯৯	৮৫	৯৬	১০৩	২০১
১৯০২	১১৬	১০৮	১২৪	১০১	৮৭	৯৪	১১১	২১০
১৯০৩	১১৭	১১২	১২৯	১০৪	১০০	৯৭	১২০	২২৮
১৯০৪	১১৯	১২২	১৩১	১০৩	৯৯	৯৯	১২৫	২২২
১৯০৫	১১৮	১১৪	১৩১	১০৩	৯১	৯৬	১১৬	২৩২
১৯০৬	১০৭	১০২	১২৩	৯৮	৮৬	৯০	১০৬	২১২
১৯০৭	১০২	৯৬	১১৬	১০৫	৮৯	৮৮	১০৪	১৯২
১৯০৮	৯৯	৯৭	১১২	৯৮	৮০	৮৫	১০৮	১৬৫
১৯০৯	১০৫	১০৬	১২১	১০৫	৮৯	৯২	১২১	২০৭
১৯১০	১০৯	১০৯	১২৯	১০৫	৯৬	৯৮	১৩০	২২৪
১৯১১	১১৩	১১৪	১৩৩	৯৯	৯৮	৯৮	১২৮	২২২
১৯১২	১০৭	১০৪	১৪৮	৯৮	৮৯	৯৫	১২১	২০৭

সূত্র : কে এল দত্ত : *Report on the Enquiry into the Rise of Prices in India*, খণ্ড ৩ (কলকাতা, ১৯১৪), পৃ. ১৯৪-৭।

* দত্ত তাঁর সমীক্ষার প্রয়োজনে সমগ্র ভারতকে কতগুলি অঞ্চলে ভাগ করেছেন। এই অঞ্চলগুলিকেই 'কেন্দ্র' বলা হয়েছে।

শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছিল শতকরা ১৮৬ ভাগ এবং আমেদাবাদের কলগুলির শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১৮৮ ভাগ। বিপরীত ক্রমে পাটকলগুলির শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরির বৃদ্ধির হার এই পর্বে ছিল মাত্র শতকরা ৪০ ভাগ। বোম্বাইয়ের তুলোকলগুলিতে শ্রমিকরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই উল্লেখযোগ্য ভাবে লাভবান হয়েছিলেন এবং ১৯২০ সালেই তাঁদের প্রকৃত মজুরি ১৯১৪ সালের স্তরে ফিরে গিয়েছিল। তবুও বলতে হবে যে তাঁরা সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছিলেন ১৯২১ থেকে ১৯৩৩-এর মধ্যে। আমেদাবাদের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, যদিও ১৯০০ থেকে ১৯১৪-র মধ্যে তাঁরা কিছুটা লাভবান হয়েছিলেন, তবুও যুদ্ধের সময়ে মজুরি ও মূল্যস্তরের ফারাকের জন্যে তাঁদের লাভ অনেক পরিমাণে কমে গিয়েছিল। ১৯৩৯ পর্যন্ত তাঁদের অবস্থার যে উন্নতি হয়েছিল তা ছিল প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধপরবর্তী কালের ঘটনা। বোম্বাই ও আমেদাবাদের শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরির ক্রমাগত বৃদ্ধি এবং কলকাতার পাট শিল্পের শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরির আপেক্ষিক স্থিতাবস্থা—এই দুই ঘটনার মধ্যে বৈপরীত্য খুব স্পষ্ট ও তীব্র—বিশেষ

করে কলকাতায় ১৯২৬ সালে পাটশিল্পের পক্ষে সমৃদ্ধির বছর হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত মজুরির হার ১৯০০ সালের স্তরেও পৌঁছতে পারেনি।

যেহেতু মুখার্জির প্রকৃত মজুরির পরিমাপে ব্যবহৃত পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন থেকে যায়, সেহেতু আমরা বিভিন্ন শিল্প কেন্দ্রের প্রচলিত আর্থিক মজুরিরও তুলনামূলক আলোচনা করব। সারণি ৫.৩-এ এই পরিসংখ্যানগুলি দেওয়া হয়েছে। এই সারণি অনুসারে দেখা যায় যে, বোম্বাইয়ের মিলগুলিতে আর্থিক মজুরি ১৯০০ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত বেড়েছিল শতকরা ১৮৮ ভাগ, আমেদাবাদে শতকরা ২০৮ ভাগ এবং কলকাতায় মাত্র শতকরা ৬৩ ভাগ। সুতরাং এই হিসাব অনুসারে, বোম্বাই ও কলকাতার শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির পার্থক্যের হার আর্থিক হিসাবে অনেক কম ছিল যদিও পার্থক্যের মাত্রা ছিল প্রায় একই রকমের। আর্থিক মজুরির দিক থেকে বিচার করলেও দেখা যায় যে উপরোক্ত বিশ্লেষণে প্রকৃত মজুরির পরিবর্তন সম্পর্কে যে সিদ্ধান্তগুলিতে আমরা পৌঁছেছি সেগুলি প্রায় অপরিবর্তিত থেকে যায়।

বোম্বাই ও আমেদাবাদের মিল গুলির তুলনায় কলকাতার মিলগুলির শ্রমিকদের মজুরিবৃদ্ধি কম হওয়ার একটি কারণ এখানে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এবং তারপর আরও মৌলিক বিষয়ের আলোচনায় আমরা যেতে পারি। তা হচ্ছে এই যে, কলকাতায় প্রকৃত মজুরি অন্য দুটি কেন্দ্রের তুলনায় আরও কম হারে বাড়তে পারত কেননা কলকাতার মিলগুলিতে মজুরির হার তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল এবং বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রের শ্রমিকদের মজুরির হারে কিছুটা সমতা আনার জন্যে বোম্বাই ও আমেদাবাদে মজুরির বৃদ্ধির হার বেশি হওয়ার প্রয়োজন ছিল। আমরা অবশ্য ধরে নিচ্ছি যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে শ্রমের চলাচলের মাত্রা একটি যুক্তিসঙ্গত স্তরে ছিল। অবশ্য যে সীমাবদ্ধ তথ্য প্রমাণ আমাদের হাতে আছে তা থেকে এই যুক্তির সারবত্তা প্রমাণিত হয় না। আর্থিক মজুরি সংক্রান্ত মুখার্জির দেওয়া পরিসংখ্যানে আমরা দেখি যে ১৯০০ সালে আমেদাবাদে গড় মাসিক আর্থিক মজুরি ছিল ১১.৩৫ টাকা, বোম্বাইয়ে ছিল ১২.২৯ টাকা এবং কলকাতায় ছিল ১২.০ টাকা। এই তথ্যগুলির ভিত্তি হলো বোম্বাই ও কলকাতার একটি মিল থেকে দেওয়া হিসাব এবং আমেদাবাদের ক্ষেত্রে কে. এল. দত্তের রিপোর্ট। সাধারণভাবে এই ধারণা স্বীকৃত যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে বোম্বাইয়ের তুলোকলগুলির ও কলকাতার পাটকলগুলির শ্রমিকদের মজুরির তুলনায় অন্যান্য কেন্দ্রগুলিতে শ্রমিকদের মজুরি ছিল কম। তুলোকলগুলির শ্রমিকদের মজুরি পাটকলগুলির শ্রমিকদের মজুরির তুলনায় সামান্য বেশি বা কম হয়ে থাকতে পারে। আমরা খণ্ড খণ্ড আকারে যে সব তথ্য প্রমাণ পাই তার দ্বারা এই ধারণার অসারতা প্রমাণিত হয় না।[১৭] সুতরাং বোম্বাইয়ের তুলোকল ও কলকাতার পাটকলগুলির শ্রমিকদের আর্থিক ও প্রকৃত মজুরির মধ্যে একটি সঙ্গতির প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই দুই ধরনের মজুরির তারতম্যের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।

শেষপর্যন্ত বিভিন্ন কেন্দ্রের প্রকৃত মজুরির স্তর বা হারের পার্থক্য তুলনা করার ক্ষেত্রে একটি সমস্যা থেকে যায় যা প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সমাধান করা সম্ভব নয়। তা হচ্ছে, শ্রমিকদের আবাসন সংক্রান্ত প্রশ্ন। আবাসনের খরচ প্রতিফলিত করতে পারে এমন কোনো সূচক মুখার্জি খুঁজে পাননি—বোম্বাইয়ের ক্ষেত্রে তো নয়ই, এমনকি আমেদাবাদের ক্ষেত্রেও বিশেষ করে ১৯২৭-এর আগের বছরগুলির জীবনযাত্রার ব্যয়সূচক তৈরি করার ব্যাপারে

সারণি ৫.৩ বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রে শ্রমিকদের গড় মাসিক মজুরি, ১৯০০ থেকে ১৯৩৯ (টাকার অঙ্কে)

	বোম্বাইয়ের তুলোকলে শ্রমিকদের গড় মাসিক মজুরি	আমেদাবাদের তুলোকলে শ্রমিকদের গড় মাসিক মজুরি	কলকাতার পাটকলে শ্রমিকদের গড মাসিক মজুরি
১৯০০	১২.২৯	১১.৩৫	১২.০
১৯০১	১২.৫৮	১১.৩৫	১২.০
১৯০২	১২.৫৯	১১.৩৫	১২.০
১৯০৩	১২.৫৯	১১.৩৫	১২.০
১৯০৪	১২.৫৯	১১.৩৫	১২.৭
১৯০৫	১২.৫৯	১১.৮২	১২.৮
১৯০৬	১২.৫৯	১২.৪৪	১২.৮
১৯০৭	১৪.৩৬	১২.৫৯	১২.৮
১৯০৮	১৫.৩৬	১২.৭৬	১৩.৫
১৯০৯	১৫.৪৬	১৩.৩৩	১৩.৫
১৯১০	১৫.৪৬	১৩.৪৫	১৩.৫
১৯১১	১৩.৪০	১৩.৪৫	১৩.৭
১৯১২	১৪.১১	১৩.৪৫	১৩.২
১৯১৩	১৪.২১	১৩.৪৫	১৪.৪
১৯১৪	১৬.৩৭	১৩.৪৫	১৪.৫
১৯১৫	১৬.৭৫	১৩.৪৫	১৪.৬
১৯১৬	১৬.৭৮	১৩.৪৫	১৪.৬
১৯১৭	১৭.০১	১৩.৭০	১৪.৮
১৯১৮	২১.০৮	১৭.৭০	১৪.৮
১৯১৯	২৪.৭৫	২০.০৬	১৬.৪
১৯২০	৩০.৭৫	২২.৭৭	১৮.৪
১৯২১	৩০.৬৩	৩১.৮৯	১৯.৯
১৯২২	৩১.৬৯	৩২.৫৮	১৯.৯
১৯২৩	৩২.৭৫	৩৩.২৭	১৯.৬
১৯২৪	৩২.৭৫	৩৩.৪৪	১৯.৪
১৯২৫	৩২.৭৫	৩৩.৬২	১৯.৮
১৯২৬	৩৪.৫৬	৩৩.৮০	১৯.২
১৯২৭	৩৪.৫৬	৩৩.৮০	১৯.৩
১৯২৮	৩৪.৫৬	৩৩.৮০	১৭.৭
১৯২৯	৩৪.৫৬	৩৩.৮০	১৬.৫
১৯৩০	৩৪.৫৬	৩৩.৮০	১৪.৩
১৯৩১	৩৪.৫৬	৩৩.৮০	১৬.২
১৯৩২	৩৪.৫৬	৩৫.৬৯	১৫.৪
১৯৩৩	৩৪.৫৬	৩৫.৬৯	১৪.৬

	বোম্বাই	আমেদাবাদ	কলকাতা
১৯৩৪	২৭.২৫	৩৫.৬৯	১৪.৬
১৯৩৫	২৭.২৫	৩৩.৪৬	১৪.৬
১৯৩৬	২৭.২৫	৩৩.৪৬	১৬.৯
১৯৩৭	২৮.৪৪	৩০.৯৬	১৮.৩
১৯৩৮	৩২.১৩	৩২.৯৮	১৯.৬
১৯৩৯	৩৫.৩৭	৩৫.০০	১৯.৬

সূত্র : এই গ্রন্থের সারণি ৫.১-এর সূত্র।

আবাসনের খরচ হিসাবের মধ্যে নেওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না। কলকাতার পাটকলগুলির ক্ষেত্রে আবসনের খরচ দেখানোর জন্যে গৃহ- নির্মাণের সামগ্রীর ব্যয় হিসাবের মধ্যে নেওয়া হয়েছিল। জীবনধারণের ব্যয়সূচক তৈরির ক্ষেত্রে আবাসনের খরচ একেবারে বাদ দেওয়ার চেয়ে এই পদ্ধতি অবশ্যই শ্রেয় কিন্তু খুব বেশি নির্ভরযোগ্য নয়, বিশেষ করে যখন গৃহ-নির্মাণের ব্যয়কে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে জমির দামের একটা বড় ভূমিকা থাকে। সুতরাং মুখার্জির পরিসংখ্যানে তুলনামূলক বিশ্লেষণের একটি সমস্যা থেকেই যাচ্ছে।[১৮]

সামান্য যা সাক্ষ্য আছে তা থেকে প্রতীয়মান হয়, প্রারম্ভিক কালে কলকাতার পাটকল শ্রমিকদের বাসস্থানের অবস্থা বোম্বাইয়ের তুলোকল শ্রমিকদের তুলনায় ভালো ছিল।[১৯] এর একটি কারণ বোম্বাইয়ের তুলোকলগুলির বোম্বাই দ্বীপে কেন্দ্রীভূত অবস্থান। ঐ অঞ্চলে জমির দাম অত্যন্ত বেশি থাকায় শ্রমিকদের জন্যে বাসস্থানের জমি সংগ্রহ করা ব্যয়সাধ্য ছিল। কিন্তু কলকাতার পাটকলগুলি গড়ে ওঠে হুগলী নদীর তীরে যেখানে বাসস্থানের উপযুক্ত জমির দাম তুলনামূলকভাবে কম ছিল। বোম্বাই ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট গঠনের আগে কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলের মিল-পরিচালকরা সম্ভবত অপর একটি সুবিধা পেত।[২০] পাটকলের মালিকরা প্রায়শই 'মিল-পৌরসভাগুলির' মাধ্যমে সরকারি অর্থ পেত শ্রমিকদের জন্যে বসত বাড়ি নির্মাণের ব্যয় হিসাবে।[২১] কিন্তু বোম্বাই ও কলকাতার শ্রমিকদের বাসস্থান সম্পর্কিত পরিস্থিতির মধ্যে কোনো তুলনামূলক পর্যালোচনা নেই। জি এম ব্রাউটন ১৯২৪-এ লিখেছিলেন : 'বিশ্বাস করা হয় যে পাটকল শ্রমিকদের এক তৃতীয়াংশ মিলের কোয়ার্টারে বাস করত। আমি এই বিষয়ে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান পেতে সক্ষম হইনি।'[২২]

যাইহোক, কিছু সাক্ষ্য নির্দেশ করে, কালক্রমে বোম্বাইয়ের তুলোকল শ্রমিকদের আবাসন সংক্রান্ত অবস্থার তুলনামূলক উন্নতি ঘটেছিল। কলকাতা ও বোম্বাই উভয় নগরে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ছিল। কলকাতার ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের কাজকর্ম পাটকল শ্রমিকদের জীবনযাপনের মানকে যত না প্রভাবিত করেছিল তার থেকে বেশি মাত্রায় প্রভাব ফেলেছিল বোম্বাইয়ের ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট তুলোকল শ্রমিকদের জীবনযাপনের অবস্থার উপরে। তার কারণ, তুলোকলগুলি কেন্দ্রীভূত ছিল বোম্বাইয়ের ছোট এলাকায়, কিন্তু কলকাতার পাটকলগুলি ছড়ানো ছিল কলকাতার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে।[২৩] যদি আমরা বোম্বাই লেবার অফিসের মজুরি সংক্রান্ত অনুসন্ধানের (১৯৩৪) রিপোর্টের সঙ্গে টেক্সটাইল লেবার এনকোয়ারি কমিটির রিপোর্টের (১৯৩৭-এর পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত) তুলনা করি তাহলে দেখব যে, মালিকদের ভাড়া করা বাড়িতে বসবাসকারী শ্রমিকের সংখ্যা সামান্য বেড়েছিল। ১৯২০-

র পরে বোম্বাইয়ের ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ১৬,০০০ বাড়ি ভাড়ার উদ্দেশ্যে তৈরি করেছিল এবং১৯৩৭-এর বোম্বাইয়ের সরকার পর্যায়ক্রমে ১.০৫ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ে সস্তায় বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল।[২৪]

বাংলার পাটকলে শ্রমিকদের আবাসন সম্পর্কে যে সব তথ্য পাওয়া যায় সেগুলি আরও বেশি অসমবদ্ধ। ১৯৪৬-এর একটি রিপোর্টে লেবার ইনভেস্টিগেশন কমিটি বলে :

> 'ইন্ডিয়ান জুট মিল্‌স্‌ অ্যাসোসিয়েশন তাদের ১৯৩৭-এ করা একটি সমীক্ষার ফলাফল উত্তরে জানায়। এই অ্যাসোসিয়েশন ৬১ টি মিল (১৯৩৭-এ মিলের মোট সংখ্যা ছিল ৯৬) থেকে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছিল তা প্রকাশ করে যে, শ্রমিকদের ৭.৯ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত মিলের কোয়ার্টারে থাকত এবং ঘর ও কোয়ার্টারের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় ৪২,৪৬৬ ।
>
> আবাসনের ব্যবস্থা করে এমন ১৯-টি ইউনিটের অনুসন্ধান থেকে প্রকাশ হয় যে শ্রমিকদের মধ্যে মাত্র ৩৯ শতাংশের বসতবাড়ির ব্যবস্থা মালিকরা করতেন। মিলের আশেপাশে বস্তি গড়ে উঠলে মালিকরা আর আবাসনের ব্যবস্থা করতেন না। কিছু সংখ্যক মিলের অবস্থান ছিল কলকাতার বাইরে। ভাড়া নেওয়ার মতো ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বাড়ি সহজে পাওয়া যেত না বলে ঐ মিলগুলি তাদের প্রায় ৫০ শতাংশ শ্রমিকদের বাসস্থান যোগাতেন।[২৫]
>
> এই কমিটি কলকাতা ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের পাটকল শ্রমিকদের বাসস্থানের সমস্যার সঙ্গে অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রের শ্রমিকদের অবস্থার তুলনা করে :
>
> দি রয়্যল কমিশন অন লেবার ইন ইন্ডিয়া ভারতের অন্যান্য শিল্পাঞ্চলের তুলনায় হাওড়ার কিছু এলাকায় অতিরিক্ত ঘন জনবসতির সমস্যাটি উল্লেখ করে। তখন থেকে এ পর্যন্ত পাটকল শ্রমিকদের বাসস্থানের সমস্যা বাস্তবত কমেনি। ... বোম্বাইয়ের চৌল (Chawl) এবং কানপুরের চাট্টা (Chatta) বাংলার কিছু বস্তির করুণাস্বরূপ।[২৬]

দি লেবার ইন্‌ভেস্টিগেশন কমিটি বাংলার পাটকল শ্রমিকদের ও বোম্বাইয়ের তুলোকল শ্রমিকদের তুলনামূলক জীবনযাপনের মান সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল : বোম্বাইয়ের তুলোকল শ্রমিকদের জীবনযাপনের মানের তুলনায় পাটকল শ্রমিকদের জীবনযাপনের মান যথেষ্ট নিচু ছিল, শেষোক্ত শ্রমিকদের আয়ের চার ভাগের প্রায় তিন ভাগ শুধুমাত্র খাদ্যসামগ্রীর উপর ব্যয় করতে হতো।'[২৭] অতএব অধিকাংশ গুণগত ও পরিমাণগত সাক্ষ্য-প্রমাণ[২৮] থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে ১৯০০ থেকে ১৯৩৯-এর মধ্যে বাংলার পাটকল শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি বোম্বাই ও আমেদাবাদের তুলোকল শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরির তুলনায় হ্রাস পেয়েছিল।

শিল্পের দুটি প্রধান কেন্দ্র বোম্বাই ও কলকাতার মধ্যে প্রকৃত মজুরির বিচলনের মধ্যে পার্থক্যগুলি আমরা এখন ব্যাখ্যার চেষ্টা করব। বোম্বাই ও কলকাতা, অথবা আরও ব্যাপকভাবে দেখলে, পশ্চিম ভারত এবং পূর্ব ও উত্তর ভারতের শিল্প কেন্দ্রগুলির মধ্যে প্রকৃত মজুরির বিচলনের পার্থক্যের তিন ধরনের কারণ ছিল। প্রথম ধরনের কারণগুলি শ্রমের কার্যকরী যোগান এবং বিভিন্ন শিল্পে শ্রমিক নিয়োগের পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট। দ্বিতীয় ধরনের কারণগুলির মধ্যে পড়ে শ্রমিকদের মজুরি হ্রাসের চেষ্টায় বিরোধিতার তীব্রতা এবং তাদের

পেছনে জনসাধারণ ও সরকারের সমর্থনের মাত্রা। তৃতীয় প্রকৃতির কারণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য, শিল্পকেন্দ্র ভেদে বিভিন্ন শিল্পে মুনাফা লভ্যতার মাত্রাগত পার্থক্য যা হয়ত মজুরি বৃদ্ধির দাবি মোকাবিলা করতে নিয়োগকারীদের সহায়তা করেছে।

৫.৩ শ্রমের আভ্যন্তরীণ প্রচরণ ও জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের আঞ্চলিক বিভিন্নতা

শ্রমের কার্যকরী যোগানের বিষয়টি দিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে, এবং সম্ভবত তারও আগে শ্রমের গতিশীলতার দিক থেকে ভারতীয় অর্থনীতি ছিল সুসংবদ্ধ। এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে শ্রমের প্রকৃত গতিশীলতা ছিল, কারণ দেশের কোনো অংশেরই উন্নতি এত দ্রুত হয়নি যে অপর অংশগুলির শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুরাহা হবে। ভারতের জনসংখ্যা ছিল যথেষ্ট বেশি, উপরন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার এত মন্থর ছিল যে বর্ধিষ্ণু শ্রমের যোগানের সঙ্গে শ্রমের চাহিদার সামঞ্জস্যসাধন অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। তার উপর অক্ষর পরিচয়হীন কৃষক ও শ্রমিকদের কাছে অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা সংক্রান্ত সঠিক খবরাখবর সহজে এসে পৌঁছাত না। সবশেষে ছিল এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে চলাচলের উপর আরোপিত কিছু ধর্মীয় ও সামাজিক বিধিনিষেধ। স্থানীয় প্রভাবশালী কিছু মানুষ এইসব বিধি তৈরি করত। তারা এমন ফরমানও জারি করেছিল যার ফলে কোনো কোনো অঞ্চলে প্রায় দাসপ্রথা প্রবর্তনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো। বহু সংখ্যক মানুষ ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে যাতায়াত করত এবং একসঙ্গে ভারতের বাইরেও যেত। দাসত্বপ্রথার অবসান, রেলপথের নির্মাণ এবং আসামের বাগিচায় শ্রমিক নিযুক্তির ক্ষেত্রে সক্রিয় সরকারি সহযোগিতা শ্রমের এই চলমানতাকে সম্ভবপর করে তুলেছিল।[২৯]

এই সময়ে জনস্রোতের মূল অভিমুখগুলি ছিল উত্তর ও মধ্যভারত থেকে বাংলা এবং আসামে। পাঞ্জাবের খাল সন্নিহিত বসত অঞ্চলে এবং উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারতে।[৩০] এই জনস্রোতের গতিসমূহের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিম থেকে গমনের প্রবণতা সংখ্যাগত দিক থেকে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বাগিচা, খনি, কারখানা ও কৃষিতে নতুন চাকুরির সম্ভাবনা পূর্বাঞ্চলের প্রদেশ অভিমুখে শ্রমের প্রচরণকে প্রভাবিত করেছিল। বোম্বাই অভিমুখে শ্রমের প্রচরণ প্রশ্রয় পায় কারখানা শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে। সেখানে কৃষিকাজের নতুন সুযোগসুবিধার উন্মেষও প্রচরণের এই প্রবণতাকে কিছুটা উৎসাহিত করেছিল। শ্রমের কার্যকরী যোগান এবং বোম্বাই, বাংলা ও আসাম অভিমুখী নীট প্রচরণের মধ্যে পার্থক্য নিচের পরিসংখ্যান থেকে ধরা পড়ে :

বাংলা, আসাম এবং বোম্বাইতে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বহিরাগতের (life-time migrants) আনুমানিক নীট সংখ্যা (হাজারে)

	বাংলা	আসাম	বোম্বাই
১৯১১	১২৮৫	৭৫৭	২৭২
১৯২১	১১২৯	১১৪০	৪১৪
১৯৩১	৭৬২	১২৪১	৪২৪

সূত্র : জাকারিয়া, *Historical Study of Internal Migration*, পৃ. ২০৩ ও ২১০।

এই পরিসংখ্যান থেকে আরও জানা যায় যে ১৯১১-র পরে বাংলায় বহিরাগতের নীট সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল (১৯১১-২১ এবং ১৯২১-৩১ উভয় দশকেই), অন্যদিকে এই সময়কালে বোম্বাইতে এদের সংখার নীট বৃদ্ধি ঘটে। বাংলার পাটশিল্পে বিনিয়োগে মন্দা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশে চিনি শিল্পের বিকাশ এবং জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি তিরিশের দশকে এই পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করেছিল।[৩১] (বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্পে যুক্তপ্রদেশ থেকে আসা শ্রমিকের অনুপাত বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৩২]) জীবনধারণের প্রতিকূল ও অনিশ্চিত অবস্থা বহু মানুষকে তাদের মূল বাসভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য কবেছে। বিশেষ করে ভূমিহীন শ্রমিক এবং মধ্য ও পশ্চিম ভারতের আদিবাসী মানুষের মধ্যে প্রচরণের প্রবণতার ক্ষেত্রে এই কারণটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মধ্য ভারত এবং বিহারে অপর্যাপ্ত ও অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত এবং সেচের জলের অভাব দরিদ্র কৃষিজীবী জনগণকে প্রচরণে বাধ্য কবেছে। যুক্তপ্রদেশের দরিদ্র কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিকদের মধ্যে মরশুমী বেকারত্ব ছিল ব্যাপক, এবং খারাপ বছরগুলিতে স্বাভাবিক কাজের মরশুমেও প্রকাশ্য বেকারত্ব দেখা দিত।[৩৩] শ্রমের চাহিদার উপর প্রভাব বিস্তারকারী যে সব উপাদান প্রচরণকে প্রভাবিত করেছিল তাদের সঙ্গে মোটামুটিভাবে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি সঙ্গতিপূর্ণ ছিল বিশেষত ১৯২১ পর্যন্ত। সারণি-তালিকা ৪.৯ সেরকমই আভাস দেয়। জে টি সোয়ার্জবার্গ[৩৪] তাঁর একটি গবেষণা-পত্রে দেখিয়েছেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যেখানে বেশি ছিল সেখানে কৃষি-শ্রমিকদেব সংখ্যাও বেড়েছিল উঁচু হারে। জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন দিকগুলিব অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ থেকে মনে হয় শ্রম-প্রচরণের স্বাভাবিক গতি ছিল উত্তব, মধ্য এবং দক্ষিণ ভাবত থেকে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের শিল্পাঞ্চল অভিমুখী। অতএব শ্রম প্রচরণের উৎস-অঞ্চলগুলি এবং শ্রম আকর্ষক দুটি প্রধান শিল্পোন্নত অঞ্চলের মধ্যে সীমানার সন্ধান মিলতে পারে মধ্য ভারতের মধ্যবর্তী কোনো অঞ্চলে। পশ্চিম ও পূর্ব ভারতে শ্রমের তুলনামূলক ঘাটতি প্রসঙ্গে শ্রমিক নিয়োগের পদ্ধতিগত পার্থক্যের আলোচনা প্রথম নজরে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে।

৫.৪ শ্রমিক নিয়োগে পদ্ধতিগত পার্থক্য এবং সরকারি নীতির আঞ্চলিক বৈসাদৃশ্য

কর্মসংস্থানের পদ্ধতিগুলির মধ্যে পার্থক্য শ্রমের যোগানের পরিস্থিতি ব্যাখ্যায় প্রাসঙ্গিক। তার কারণ : (ক) পূর্ব ভারতে কারখানা, খনি ও বাগিচায় শ্রম-যোগানের কেন্দ্রগুলিব তুলনায় বোম্বাই ও আমেদাবাদের শ্রমিক সংগ্রহের এলাকা সমূহ অনেক বেশি নিয়ন্ত্রিত ছিল। (খ) কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের তুলনায় বোম্বাই, কানপুর অথবা আমেদাবাদের নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে অনেক বেশি পরিমাণে কারখানা-শ্রমিক আসত। (গ) যদিও শেষ পর্যন্ত শিল্পকেন্দ্র বিশেষে মজুরি স্তরের ভিন্নতায় শ্রম প্রচরণ সাড়া দিত, একটি দক্ষ নিয়োগ পদ্ধতি এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারত।

কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পাটকল এবং অন্যান্য কারখানাগুলিতে শ্রম নিয়োগ পদ্ধতি ছিল মোটামুটিভাবে আসামের বাগিচাগুলিতে অনুসৃত নিয়োগ পদ্ধতি থেকে উপজাত। সুতরাং বাগিচা-অঞ্চলে শ্রমিক নিয়োগ ও তাকে কাজে ধরে রাখার উপায়গুলি প্রথমে আলোচনা করা যাক।

ভারত সরকার ১৮৬৯-র পর থেকেই একাধিক আইন প্রণয়ন করেছিল যাতে আসামের বাগিচায় চুক্তিবদ্ধ শ্রমের ভিত্তিতে শ্রম নিয়োগের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এই আইনগুলির মধ্যে ওয়ার্কমেন্‌স্‌ ব্রিচ অব কনট্র্যাক্ট অ্যাক্ট ১৮৬৯ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত আইনগ্রন্থে লিপিবদ্ধ ছিল। বাগিচা-মালিকদের অধিকার ছিল শ্রমিকদের ব্যক্তিগতভাবে অবরুদ্ধ করার। চুক্তি-ভঙ্গের অপরাধে শ্রমিকদের কারাদণ্ড ছিল আইনসিদ্ধ। ১৯০১-এর Act VI -এ চুক্তিবদ্ধ শ্রম প্রথার কঠোরতা হ্রাস করার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু চুক্তিভঙ্গের জন্যে ফৌজদারী দণ্ডবিধি ১৯২৬ পর্যন্ত বাতিল হয়নি। মাদ্রাজে ১৯২৯ পর্যন্ত ১৯০৩-এর মাদ্রাজ প্ল্যানটারস্‌ লেবার অ্যাক্ট বহাল ছিল।[৩৫]

১৯২১-এ আসামের চা-বাগিচায় দাঙ্গার পর নিযুক্ত আসাম লেবার এনকোয়্যারি কমিটি লক্ষ্য করেছিল যে বাগিচা-মালিকরা প্রায়শই আইনবিধি ভঙ্গ করত। ১৯২৯-৩০-এ রয়্যাল কমিশন অন লেবার-এর অনুসন্ধান কালে দেখা যায় যে শ্রমিকরা তখনও বিশ্বাস করে যে বাগিচা থেকে পালালে তাদের শাস্তি পেতে হবে।

দরিদ্র ও নিরক্ষর শ্রমিকরা স্বদেশ থেকে বহুদূরে বাস করত। ব্যক্তি স্বাধীনতা লঙ্ঘন এবং ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করার প্রয়াসের বিরুদ্ধে দাঙ্গা ছাড়া কোনো সংগঠিত প্রতিবাদী আন্দোলনের পথ তাদের সামনে খোলা ছিল না। 'বহিরাগত' কোনো ব্যক্তি বাগিচা শ্রমিকদের সংগঠিত করার চেষ্টা কবলে তার বিরুদ্ধে সরকার ফৌজদারী দণ্ডবিধি প্রয়োগ করত।[৩৬] অনদিকে 'ইণ্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশান'-এ সংগঠিত বাগিচা-মালিকরা বাগিচা-শ্রমের বাজারে ছিল একমাত্র ক্রেতা। এমনকি ১৯২৬ সালের পরেও কোনো শ্রমিকের বাগিচা ছেড়ে যাওয়াকে বলা হতো 'পালানো'। চৌকিদাররা কোনো আগন্তুককে শ্রমিকদের কলোনিতে ঢুকতে বাধা দিতে পারত এবং বিনা অনুমতিতে শ্রমিকদের কলোনি ত্যাগ করতেও বাধা দিত। এই জন্যে চৌকিদাররা কুলিদের বস্তির উপর কড়া নজর রাখত। চা-বাগিচাগুলিতে এক বাগিচা ছেড়ে অন্য কোনো বাগিচায় শ্রমিকদের কাজ করার অনুমতি দেওয়া হতো না। আসামের অন্য কোনো চা-বাগিচা থেকে পালিয়ে এসেছে এমন সন্দেহভাজন কোনো শ্রমিককে নিয়োগ করা হতো না।[৩৭]

'রয়্যাল কমিশন অন লেবার ইন ইন্ডিয়ার' কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল যে, যেহেতু ঠিকাদারদের দ্বারা নিয়োগ কার্যত বিলুপ্ত এবং যেহেতু আইন দ্বারা শ্রমিকদের অধিকার কিছুটা সুরক্ষা করা গেছে, চা-বাগিচায় নিয়ন্ত্রণহীন শ্রম নিয়োগের অনুমতি দেওয়া হোক। কিন্তু বিহার ও উড়িষ্যা সরকার এতে সম্মত হয়নি। প্রসঙ্গত বিহার এবং উড়িষ্যা ছিল শ্রম-নিয়োগের একটি প্রধান অঞ্চল।[৩৮] এমনকি আসাম সরকার বাগিচামালিকদের প্রতি বেশি সহানুভূতিশীল থাকা সত্ত্বেও মুক্ত নিয়োগ প্রথাকে সমর্থন করেনি।[৩৯] ১৯৩২-এর 'টি ডিস্ট্রিক্ট এমিগ্র্যান্ট লেবার ড.,:ষ্ট'-এর দ্বারা শ্রম নিয়োগের উপর নজরদারির মাত্রা কিছুটা কঠোর করা হয়েছিল। ঐ অ্যাক্টের মাধ্যমে এমিগ্র্যান্ট লেবার কনট্রোলারের অফিস স্থাপন করা হয় এবং সর্বপ্রথম শ্রমিকদের দেশে ফেরার অধিকার দেওয়া হয়।

১৯৩০ পর্যন্ত এবং তার পরেও যে শ্রম নিয়োগের প্রথা প্রচলিত ছিল তা বাগিচা সর্দারের উপর নির্ভর করত। সংশ্লিষ্ট বাগিচা থেকে সর্দারকে নতুন শ্রমিক যোগানের জন্যে দেশে পাঠানো হতো। বাগিচা সর্দারদের প্রমাণপত্রের মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগের দায়িত্ব দেওয়া হতো। জেলাগুলিতে এইসব সর্দারদের কাজ তদারক করতেন স্থানীয় প্রতিনিধিরা যাদের

অধিকাংশ ছিলেন 'টি ডিস্ট্রিক্ট লেবার অ্যাসোসিয়েশানের' অধীনস্থ। সরকার-নিযুক্ত আসাম লেবার বোর্ড সাধারণত নিয়োগব্যবস্থা পরিদর্শন করত।[৪০] বোম্বাই ছাড়া সারা ভারতবর্ষে এই আইন কার্যকর ছিল। এমনকি বোম্বাইতেও দেশান্তরী ব্যক্তিদের সরকার নিয়োগের অনুমতি দিতেন কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তাদের হাজির হওয়ার শর্ত সাপেক্ষে।[৪১]

এই নিয়োগপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হতো চা-ব্যবসায় জড়িত কিছু ব্রিটিশ ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসের মাধ্যমে। ১৮৯৯-এ ঠিকাদারেব মারফৎ শ্রম নিয়োগের ভারপ্রাপ্ত প্রায় সমস্ত স্থানীয় প্রতিনিধিই ছিল কলকাতার ব্রিটিশ ম্যানেজিং এজেন্সি হাউস। অন্যান্য শিল্প ও বাণিজ্যের মধ্যে চা, কয়লা ও পাট শিল্পে ও বাণিজ্যে এই হাউসগুলির স্বার্থ নিহিত ছিল।[৪২] খনি বা পাটশিল্পের কারখানায় কোনো বিশেষ নিয়োগ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না। ১৮৯৫-এ দ্রুত হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া কয়লাখনিগুলিতে শ্রম যোগানের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা অনুসন্ধানেব জন্যে বাংলার সরকার একটি কমিশন নিয়োগ করে। কমিশন লক্ষ্য করে যে, বাংলার খনি শ্রমিকদের মজুরি ছোটনাগপুব এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের তুলনায় বেশি ছিল। বর্ধমান জেলার একজন সক্ষম শ্রমিকের মজুরি সাধারণত তারও বেশি হতো। ঐ জেলাতেই বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কয়লাখনিগুলি অবস্থিত ছিল।[৪৩] কমিশনের সুপারিশ ছিল, বাগিচা শ্রমিকদের মতো খনি শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও একটি বিশেষ নিয়োগ পদ্ধতি গ্রহণ করার। কিন্তু প্রয়োজন না-হওয়ায় এই ধরনের কোনো আইন প্রণয়ন করা হয়নি। সাঁওতাল পরগণা, ছোটনাগপুর এবং পশ্চিমবঙ্গের বাউরিদের মধ্যে থেকে শ্রমের যোগান ছিল যথেষ্ট। অপেক্ষাকৃত কম উৎপাদনশীল কয়লাখনি এবং ম্যাঙ্গানিজ ও অভ্র খনিগুলিতে মাঝে মাঝে শ্রমের যোগানে ঘাটতি দেখা দিত। অবশ্য ঐ সব খনিতে প্রচলিত মজুরির হার খনিশিল্পের গড় মজুরির তুলনায় কম ছিল।[৪৪] হুগলী নদীর তীরবর্তী পাটশিল্পে শ্রমের যে যোগান অব্যাহত ছিল তা পূর্ব ভারতের কয়লাখনি, বাগিচা এবং কলকারখানা অভিমুখী বিভিন্ন প্রদেশ থেকে উৎসারিত বৃহত্তর 'শ্রমস্রোতের' একটি অংশ। আসামের চা বাগিচায় নিয়োগেব পদ্ধতি থেকে পাটশিল্পের পরিচালকরা শ্রম যোগানের উৎস সম্পর্কে তথ্য পেতেন। খনি ও বাগিচাগুলিতে যে সমস্ত শ্রমিকেরা বাইরে থেকে নিয়মিত আসতেন তাঁরাই ছিলেন ইচ্ছুক প্রচরণকারীদের সঙ্গে সংযোগেব সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। যেহেতু পাটকলগুলিতে কাজের শর্তাবলী খনি এবং আবাদগুলির তুলনায় ভালো ছিল এবং মজুরি ছিল বেশি (বিশেষত দক্ষ শ্রমিকদের), শ্রম নিয়োগের জন্যে কোনো বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ পাটকলগুলির পক্ষে অপ্রয়োজনীয় ছিল। শুধুমাত্র প্রয়োজন ছিল শ্রমের পূর্বমুখী প্রচরণকে আকর্ষণীয় রাখা। ১৮৯৫-এ শ্রম অনুসন্ধানের সময় পাটকলগুলি শ্রম নিয়োগের জন্যে কোনো বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করতে চায়নি। ১৯০৫-এ যখন বাংলায় ও যুক্তপ্রদেশে শ্রমযোগানের সমস্যার জন্যে আর একটি অনুসন্ধান করা হয়, তখন ইন্ডিয়ান জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশানের (IJMA) সভাপতি সরকারি অফিসারদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অনুধাবন করলেন, গ্রীষ্মকালীন মাসগুলিতে সমস্ত শিল্পেই শ্রমের যোগানে ঘাটতি থাকে এবং পাটশিল্পের ক্ষেত্রে বছরে অন্তত তিন মাস শ্রমের এই ঘাটতির সমস্যা খুবই তীব্র হয়ে ওঠে।[৪৫]

আসাম ও বাংলার স্থানীয় শ্রম যোগানের সীমাবদ্ধতা বাংলার শিল্পোন্নয়নে বাধা হয়ে ওঠে নি। প্রথম দিকে বাংলার পাটকলগুলিতে মূলত বাঙালি শ্রমিকরা নিযুক্ত ছিল। কিন্তু শিল্প প্রসারের সাথে সাথে, বিশেষত কলকাতা ও কলকাতার উত্তরের কল-কারখানাগুলির শ্রমিকদের একটি

বৃহৎ অংশ বাংলার বাইরে থেকে আসতে থাকে। 'বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রিজ কমিটির' সদস্য এবং পরবর্তী কালে আই. জে. এম. এর চেয়ারম্যান এ. আর. মুরে চারটি মিলে (যার মধ্যে দুটি ছিল শ্যামনগরের গাড়ুলিয়ায়, এবং টিটাগড় ও ভদ্রেশ্বরে একটি করে) ১৯০২ ও ১৯১৬-র প্রদেশভিত্তিক শ্রমের যোগানের হিসাব এই ভাবে দিয়েছেন :[৪৬]

	১৯০২	১৯১৬
মোট শ্রমিক সংখ্যা	১৭,১০০	৩১,৮৪১
মোট শ্রমিকের মধ্যে বাঙালি শ্রমিকদের শতকরা অংশ	২৮	১০
মোট শ্রমিকের মধ্যে স্থানীয় বাঙালি শ্রমিকের শতকরা অংশ	২২	৭

১৯২১ সালের জনগণনা অনুসারে বাংলার পাটকলে শ্রমশক্তির গঠন ছিল নিম্নরূপ :[৫৭]

	মোট শ্রমিক-সংখ্যা	বাংলায় জন্ম এমন শ্রমিকের সংখ্যা
দক্ষ শ্রমিক	১২৪,২২১	৩৮,৮৯০
অদক্ষ শ্রমিক	১৫৫,৬৩৩	২৬৫৫৮

সুতরাং অদক্ষ শ্রমিকদের তুলনায় দক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে বাঙালিদের অনুপাত স্পষ্টতই অনেক বেশি ছিল: অদক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে ১৭ শতাংশ এবং দক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে ৩১ শতাংশ। কলকারখানাগুলিতে বাঙালি শ্রমিকদের আপেক্ষিক স্বল্পতার প্রধান কারণ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলায় কৃষিক্ষেত্রে মজুরির হার কারখানার মজুরির তুলনায় অনেক বেশি আকর্ষণীয় ছিল, তার ফলে কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে বাঙালি শ্রমিকের সংখ্যা স্পষ্টতই কম ছিল। কিন্তু বিহাব, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজ থেকে আগত শ্রমিকদের কাছে কারখানার কাজ অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হতো।[৪৮] বোম্বাই-এর অবস্থাটি ছিল পূর্বভারতের বিপবীত। ১৯২১ পর্যন্ত বোম্বাই-এর কারখানাগুলিতে শ্রমিক নিয়োগ করা হতো বোম্বাই সন্নিহিত এলাকা থেকে। ১৯২১ অবধি বোম্বাই-এ নিযুক্ত শিল্প-শ্রমিকদের মধ্যে ৫৫ শতাংশেরও বেশি শ্রমিকদের জন্মস্থান ছিল ঐ মহানগরের ২০০ মাইল দূরত্বের মধ্যে।[৪৯] আমেদাবাদেও অধিকাংশ শ্রমিক আসত গুজরাটের জেলাগুলি এবং কাথিয়াবাড় থেকে।[৫০] প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে বোম্বাই-এর মিল-মালিকরা ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে শ্রমিক নিয়োগের জন্যে কোনো সংগঠিত ব্যবস্থা গড়ে তোলেননি।[৫১] প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তাঁরা এমন সব সমস্যায় জড়িয়ে পড়লেন যেগুলি ছিল শ্রম-যোগান সম্পর্কিত সমস্যার তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, বোম্বাই প্রদেশে এমন কোনো বাগিচা ও খনি ছিল না যেখানে পূর্ব ভারতের কলকারখানার তুলনায় অনেক বেশি শ্রমিক নিযুক্ত করা যেত। এই প্রদেশে কৃষিকর্মও এমন কিছু শ্রম-আকর্ষক ছিল না।[৫২]

বিভিন্ন শিল্প-কেন্দ্রগুলির মধ্যে প্রকৃত মজুরির পার্থক্য ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অপর উপাদানগুলি এই রকম : শ্রমিক সংগঠনগুলির বিকাশের স্তরগত বৈষম্য এবং মজুরি হ্রাসের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের প্রতিরোধ শক্তির অন্তর্গত তারতম্য। এই উপাদানসমূহ আলোচনার আগে বাংলায় এবং বোম্বাই-এ জনসংখ্যার বৃদ্ধির স্বাভাবিক হারের মধ্যে পার্থক্যগুলি উল্লেখ করা উচিত। শতাব্দীর শেষে প্লেগ ও দুর্ভিক্ষ এবং ১৯১৮-১৯ সালে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী এবং

দুর্ভিক্ষ বাংলার তুলনায় বোম্বাইয়ের জনসংখ্যা-বৃদ্ধির স্বাভাবিক হারের উপর বেশি প্রভাব ফেলেছিল। সুতরাং অন্যান্য প্রদেশ থেকে শ্রম প্রচরণ এবং শ্রমের চাহিদার একই ধরনের বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান করা যায়, বাংলাব তুলনায় বোম্বাইতে মজুরির উর্ধ্বমুখী হওয়ার প্রবণতা আরও জোরালো ছিল। অবশ্য আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি না যে, কেবলমাত্র এই পার্থক্যগুলিই বোম্বাই ও কলকাতার প্রকৃত মজুরির মধ্যে বৈষম্য ব্যাখ্যার পক্ষে যথেষ্ট। অঞ্চলে অঞ্চলে প্রকৃত মজুরির পার্থক্য সময়ের সাথে সাথে হ্রাস পেয়েছিল শ্রমের প্রচরণের ফলে। দক্ষতার স্তর অথবা প্রশিক্ষণের মাত্রা মজুরির বৈষম্যের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। অতএব বিষয়টি ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রমের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতার দিকে নজর দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা-মহামারী ও ১৯১৮-১৯ সালের দুর্ভিক্ষ শ্রমের সম্ভাব্য যোগানে বৃদ্ধির বিপরীতে কাজ করেছিল। একদিকে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যু হলো (বিশেষত উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম ভারতে) অন্যদিকে ১৯১৮-১৯ সালের দুর্ভিক্ষ এবং পরবর্তীকালে বিশের দশকে কৃষি উৎপাদনে বিপর্যয় দরিদ্র জনগণকে আরও ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়েছিল। দরিদ্র মানুষের দল বাগিচা, খনি এবং কলকারখানায় অথবা সমৃদ্ধ কৃষি-অঞ্চলে কাজ খুঁজে বেড়াত।[৫৩] অতি স্বল্পকালেব জন্যে চা-বাগিচায় শ্রমিকদের যোগানে ঘাটতির আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছিল। তার কারণ, যুদ্ধের সময়ে জীবনযাপনের ব্যয় বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে বাগিচায় মজুরি বৃদ্ধি পায় নি। এর ফলে চা বাগান থেকে কিছু পরিমাণে শ্রমের বহির্গমন ঘটে। কিন্তু বিশের দশকে আসামের চা বাগানে শ্রম-যোগানের পরিস্থিতি আবার সহজ হয়ে ওঠে।[৫৪] যদিও বোম্বাই আসামেব তুলনায় মধ্যপ্রদেশের নিকটবর্তী, তবুও সেখান থেকে বিশাল সংখ্যক বাগিচা-শ্রমিক আসামে এসেছিল। কাজেই শুধুমাত্র জনসংখ্যাগত কারণ প্রকৃত মজুরির হ্রাস-বৃদ্ধির বৈষম্যমূলক হারের ব্যাখ্যার (বিশেষত, বিশের দশকে) পক্ষে যথেষ্ট নয়।[৫৫]

৫.৫ শ্রমিক সংগঠন এবং প্রকৃত মজুরি ওঠানামায় প্রবণতার তারতম্য নির্ণয়ে পার্থক্যের রাজনৈতিক উপাদানগুলির ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে অথবা ১৯১৮-১৯ সালের ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী এবং দুর্ভিক্ষের কয়েক বছর পরে অবস্থা যাই থাক না কেন, ১৯২০ সালের মাঝামাঝি সময়ের পর থেকে ভারতবর্ষের কোনো প্রধান শিল্পকেন্দ্রেই শ্রমের যোগানে ঘাটতি ছিল না।[৫৬] এমনকি কোনো স্বল্পকালীন সময়েও শ্রমের ঘাটতি হয়নি। এর ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের প্রকৃত মজুরির পরিবর্তনের হারের পার্থক্য (বিশেষত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে) ব্যাখ্যা করার জন্যে আমাদের প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতিতে শ্রমের সম্ভাব্য যোগানের বিষয়টি ছাড়াও অন্যান্য কারণ খুঁজতে হবে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে : দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে কলকাতার তুলনায় বোম্বাই শ্রমিক সংগঠনের অধিকতর শরিক কি শেষোক্ত অঞ্চলের বস্ত্রশিল্প-কারখানায় এবং কলকাতার পাটকলে প্রকৃত মজুরির প্রবণতার মধ্যে বিভেদ ঘটিয়েছিল? এই দুই শিল্পকেন্দ্রে শ্রমিক সংগঠনের 'শক্তি' সম্পর্কিত আলোচনার কিছু সমস্যা আছে। কারণ ১৯২৬-এর

আগে শ্রমিক সংগঠনগুলির আইনগত সুরক্ষা খুব একটা ছিল না। তাছাড়া, তালিকাভুক্ত শ্রমিক সংগঠনগুলির ভূমিকা ছিল অনেকটা শ্রমিক বন্ধুসভা বা শ্রমিক কল্যাণসভার মতো। সঠিক শ্রমিক সংগঠনের অভাব সত্ত্বেও ১৯১৮ সালের পর থেকে সারা ভারত জুড়ে ধর্মঘটের সংখ্যা আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পায়। শ্রমিকদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্যে গড়ে ওঠে শ্রমিক সংগঠন। এগুলি ছিল মূলত ধর্মঘট কমিটি। বোম্বাইতে সংগঠিত শ্রমিক সংগঠনগুলির কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করা হয়। এই জন্যে এফ. জে. জিনওয়ালা এবং এম. এইচ. ঝাবওয়ালা 'সেন্ট্রাল লেবার বোর্ড' গড়ে তোলেন। প্রথম দিকে শ্রমিক সংঘের সংগঠন যে সমস্ত 'বহিরাগত' ব্যক্তি গড়ে তোলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন চিনওয়ালা এবং ঝাবওয়ালা।[৫৭] 'কামগড় হিতবর্ধক সভা' নামে একটি সংগঠন ১৯১৯ সালে গঠিত হলেও ১৯২৬ পর্যন্ত বোম্বাই শহরে বস্ত্রশিল্প-শ্রমিকদের কোনো স্থায়ী এবং কার্যকরী সংগঠন ছিল না। ১৯২৬-এ 'সার্ভেন্ট্স্ অফ ইন্ডিয়া সোসাইটির' এন. এন. যোশী এবং আর. আর. বাখালে 'বম্বে টেক্সটাইল লেবার ইউনিয়ন' গঠন করেন।[৫৮]

শ্রমিক সংগঠনের দিক থেকে দেখতে গেলে বাংলার পাটকলগুলিতে পরিস্থিতি ছিল আরও খারাপ। রয়্যাল কমিশন অন লেবারের অনুসন্ধানের সময় পাটকল শ্রমিকদের একমাত্র তালিকাভুক্ত সংগঠন ছিল কাঁকিনাড়া লেবার ইউনিয়ন। এই সংগঠনটি খিলাফৎ আন্দোলনকারীরা প্রতিষ্ঠা করে। মৌলবী লতাফৎ হোসেন এর প্রথম সম্পাদক এবং আব্দুল মজিদ প্রথম সভাপতি ছিলেন।[৫৯] যদিও এই সংগঠনট ভাটপাড়া পৌর অঞ্চলের ৫০,০০০ পাটকল শ্রমিকের প্রতিনিধিত্বের দাবীদার ছিল, ১৯৩০ সালে এর সদস্যসংখ্যা ছিল ১,০০০।[৬০] ১৯২৯ সালের বৃহৎ চটকল ধর্মঘটটির নেতৃত্ব দিয়েছিল বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। এই সংগঠনটি সমস্ত চটকল শ্রমিকদের প্রতিনিধি বলে দাবি করত। কিন্তু ধর্মঘটের সময়েও এই দাবি সমর্থিত হয়নি এবং ঐ সময়েই সংগঠনটি ভেঙে দু-টুকরো হয়ে গেল।[৬১] বড় জোড় ৪ শতাংশ চটকল শ্রমিক কোনো স্থায়ী ধরনের শ্রমিক সংঘের সভ্য ছিল। এর বিপরীতে বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্পের ইউনিয়নগুলিতে সংঘবদ্ধ হয়েছিল ৪২.৫০ শতাংশ শ্রমিক। আমেদাবাদে এই অনুপাত কমে দাঁড়িয়েছিল ২৮.৫২ শতাংশে এবং শোলাপুরে ৫ শতাংশেরও নিচে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বস্ত্রশিল্প কারখানায় বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়ন স্থাপনের তারিখ ও সদস্য-সংখ্যার বিবরণ সাধারণ ৫.৪-এ দেওয়া হলো।

দিল্লীতে বস্ত্রশিল্প কারখানাগুলিতে কোনো শ্রমিকদের ইউনিয়নই ছিল না।[৬২] কানপুরে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা 'মজদুর সভা' নাম দিয়ে একটি ফেডারেশন গড়ে তোলে যদিও সেটি সুসংবদ্ধ ছিল না। কানপুরে কারখানাগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ১৯২৯-৩০এ ছিল ৩২,১৪২। সেখানে মজদুর সভার সদস্যসংখ্যা ছিল মাত্র ৩,০০০।[৬৩] মাদ্রাজে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয় মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন গঠনের মাধ্যমে। কিন্তু শ্রমের প্রাচুর্য শিল্পবিকাশে মন্থরতা এবং শ্রমিক সংগঠনের দাবি দাওয়ার প্রতি যে কোনো ধরনের সুযোগ সুবিধার প্রতি শিল্প-মালিকদের উদাসীনতা—এই সমস্ত কারণে মাদ্রাজে শ্রমিক আন্দোলন শক্তিশালী বিকাশ হয়ে ওঠেনি। সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশে ও শিল্প-বিরোধের পৌনপুনিকতা ও তীব্রতার পেছনে অবশ্যই কিছু রাজনৈতিক উপাদান কাজ করেছে। এই সব উপাদানের মধ্যে জাতি ও বর্ণগত বৈশিষ্ট্য, শ্রমিকদের মধ্যে সমজাতীয়তার মাত্রা, শিল্পাঞ্চলের অন্যান্য মানুষদের সঙ্গে শ্রমিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং শ্রমিক

সারণি ৫.৪ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বস্ত্রশিল্পকারখানায় শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার তারিখ ও সদস্য সংখ্যা

	গঠনের তারিখ		১লা মার্চ, ১৯২৯ তারিখের সদস্য সংখ্যা
বোম্বাই শহর			
গিরণি কামগড় মহামণ্ডল	ডিসেম্বর	১৯২৩	১২০০
বম্বে গিরণি টেক্সটাইল লেবার কামগড় ইউনিয়ন	মার্চ	১৯২৬	৬৭৪৯
বম্বে মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন	মার্চ	১৯২৮	৯৮৪
বম্বে গিরণি কামগড় ইউনিয়ন	মার্চ	১৯২৮	৫৪০০০
আমেদাবাদ			
উইভার্স ইউনিয়ন	ফেব্রুয়ারি	১৯২০	৮২৫
থ্রস্ল্ ইউনিয়ন	ফেব্রুয়ারি	১৯২০	১১১৮০
ওয়াইন্ডার্স ইউনিয়ন	জুন	১৯২০	১২০
কার্ড রুম, ব্লোরুম অ্যাণ্ড ফ্রেম ডিপার্টমেন্ট ইউনিয়ন	অগাস্ট	১৯২০	৩৭২৫
ড্রাইভার্স অয়েলমেন্স অ্যাণ্ড ফায়ারমেন্স ইউনিয়ন	সেপ্টেম্বর	১৯২০	৫২৫
জবার্স অ্যাণ্ড মুকাডাম্স ইউনিয়ন*	মার্চ	১৯২৬	৭০০
শোলাপুর			
বোম্বাই টেক্সটাইল লেবার ইউনিয়ন শোলাপুর শাখা			৮০০

* ১৯২২ সালে এই ইউনিয়নটি বিলুপ্ত হয় এবং ১৯২৬ সালে পুনর্গঠিত হয়।

সূত্র : Royal Commission on Labour in India

ইউনিয়নের নেতাদের মতাদর্শ। মোটের ওপর বলা যায়, ইয়োরোপীয় মালিকরা প্রাধান্য লাভ করেছিল এমন কিছু শিল্পে বা শিল্পকেন্দ্রে যেখানে শ্রমিক সংগঠনগুলি দুর্বল ছিল। তার কারণ, এই সব শিল্পে মালিকদের মধ্যে সমজাতীয়তার মাত্রা অনেক বেশি ছিল এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাদের শ্রমিকদের ভাষায় কথা বলার প্রয়োজন হতো না। এর অর্থ এমন নয় যে ধর্মঘট বা শিল্প-বিবাদের কারণে শিল্পের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হওয়াব পরিস্থিতি ইয়োরোপীয় মালিকরা রোধ করতে পারত। একটি সুষ্ঠু উদাহরণ দেওযা যাক। চট শিল্পের একমাত্র সংগঠিত শ্রমিক সংঘ কাঁকিনাড়া লেবার ইউনিযন সম্ভাব্য গোলযোগ বিষয়ে মালিকদের সতর্ক করেছিল। তা সত্ত্বেও মালিকরা নির্লিপ্ত ছিল এবং তাদেব এই মনোভাব ১৯২৯-এ পাট শিল্পের প্রধান ধর্মঘটটির বড় কারণ হযে দাঁড়ায়। মালিকরা শ্রমিকদের মজুরি অপরিবর্তিত রেখে সপ্তাহ পিছু শ্রম-ঘণ্টা ৪৫ থেকে ৬০-এ বৃদ্ধি করল। তারা শ্রমিক-প্রতিনিধিদের সাথে এই বিষয়ে আলোচনা পর্যন্ত করতে চায় নি।[৬৪] আবার মাদ্রাজের বাকিংহাম ও কর্ণাটিক মিলদুটিতে বেশ ক'টি ধর্মঘটের আংশিক কারণ ছিল শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকারদানে মালিকদের অনীহা।[৬৫]

আমেদাবাদে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক ছিল নজিরবিহীন। টেক্সটাইল লেবার অ্যাসোসিয়েশন শিল্পের কয়েকটি হস্তশিল্পী-সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করত এবং মালিকদের সাথে মজুরি বৃদ্ধি বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করত। মহাত্মা গান্ধীর মধ্যস্থতায় ১৯১৮-এ বড়মাপের শ্রমিক-

মালিক বিবাদটির মীমাংসা হয়। তারপর থেকে আমেদাবাদে কার্পাস-বস্ত্রশিল্পে মধ্যস্থতার মাধ্যমে মীমাংসার নীতিটি স্বীকৃতি পেল। টেক্সটাইল লেবার অ্যাসোসিয়েশন শিল্প ধর্মঘট প্রতিরোধে মোটামুটি সক্ষম ছিল। আমেদাবাদে শিল্প-বিবাদ মীমাংসার এই পদ্ধতিটির সাফল্যের ব্যাখ্যায় গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের অবদানকে সঙ্গতভাবেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়।[৬৬] এ ক্ষেত্রে অবশ্য আমেদাবাদের শিল্পের কয়েকটি বিশেষ সুবিধা ছিল: (ক) বিশের দশকে বস্ত্রশিল্পে মজুরি হ্রাসের সাথে সাথে শ্রমিক নিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং (খ) ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে শ্রমিক ও তাঁদের নিয়োগকর্তারা অনেকাংশে একই গোষ্ঠীভুক্ত ছিল। বৃহত্তর রাজনৈতিক সংগ্রামের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি বিষয়ে উভয় পক্ষ সম্ভবত একই রকম অভিমত পোষণ করত।

যেখানে উদ্দেশ্য বিষয়ে ঐকমত্য ছিল না এবং যেখানে মজুরি হ্রাসের সাথে সাথে শ্রমিক-ছাঁটাই হয়েছে, সেখানেই বড় ধর্মঘট হয়েছে। বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্পে ধর্মঘটের তীব্রতা ছিল সবচেয়ে বেশি। বিশেষভাবে ১৯২৮-এ এই তীব্রতা লক্ষ্য করা যায়। ৫.৫ এবং ৫.৬ সারণি থেকে বোম্বাই ও বাংলার মধ্যে শিল্পবিবাদের তীব্রতার পার্থক্য বোঝা যায়। পূর্বে উল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়াও চটকল শ্রমিকদের মধ্যে ভাষাগত অসমতা এবং পার্শ্ববর্তী বাঙালি সমাজের সঙ্গে অধিকাংশ শ্রমিকদের ভাষাগত প্রভেদ বাংলার শ্রমিক আন্দোলনকে দুর্বল করেছিল। এই দুর্বলতা শ্রমিকদের ইউনিয়ন গড়ে তোলা এবং ধর্মঘট করার ক্ষমতার অভাবে প্রকটিত।[৬৭]

সারণি ৫.৫ বাংলার চটশিল্পে শিল্পবিবাদ—১৯২১ থেকে ১৯২৯

	চটকলে ধর্মঘটের সংখ্যা	ধর্মঘটে জড়িত শ্রমিক-সংখ্যা	নষ্ট শ্রমদিবসের সংখ্যা
১৯২১	৩৯	১৮৬,৪৭৯	৭০৬,২২৯
১৯২২	৪০	১৭৩,৯৫৭	১,০৭৯,৬২৭
১৯২৩	২৯	৯০,৬৬৪	৬৪৪,৮০৪
১৯২৪	১৮	৬৯,৪৮৮	৩৪৬,৭৫৬
১৯২৫	১৪	৪৪,৯৪০	২৪২,৯০৬
১৯২৬	২৯	৬৮,০৪২	৭৯৪,৩৮৪
১৯২৭	৯	৩৪,৯০০	২১৮,০০০
১৯২৮	১৮	৫৬,৫২৪	১,৫০৮,৭০৮
১৯২৯	৫	১৮,২৮৫	১০৬,৭৮৫
৩০ শে জুন পর্যন্ত			
সর্বমোট	২০১	৭১৩,২৭৯	৫,৬৪৮,১৯৯
১লা জুলাই ১৯২৯ থেকে			
৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯২৯		২৭২,০০০	২,৮৯৬,০০০

সূত্র : Royal Commission on Labour in India, *Evidence* খণ্ড ৫, অংশ ১, *Bengal* (লন্ডন, ১৯৩১), পৃ: ১২৬।

টিকা : বাংলায় শিল্প-বিবাদের ফলে নষ্ট শ্রমদিবসের মোটসংখ্যা (১৯২১ থেকে ১৯২৯) ছিল ১৬,৫১০,৬৬৯, *ঐ,* পৃ: ১২১।

তিরিশের দশকে মন্দার সময় শ্রমিকদের দরকষাকষির ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। প্রায় সব শিল্পকেন্দ্রেই মজুরি হ্রাস করা হয়। কিন্তু জীবনযাত্রাব ব্যয় ভীষণভাবে কমে যাওয়ার ফলে অধিকাংশ শিল্পকেন্দ্রেই প্রকৃত মজুরি হ্রাস পায়নি। শ্রমের অতিরিক্ত যোগান যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তার ফলে শ্রমিক সংগঠনগুলির পক্ষে যৌথভাবে কাজ করা বেশ

সারণি ৫.৬ বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে শিল্প-বিবাদ (১৯২১ থেকে ১৯২৯)

	বিরোধের সংখ্যা	জড়িত শ্রমিকের সংখ্যা	নষ্ট শ্রমদিবসের সংখ্যা
১৯২১*	১০৪	১৩১,১৯৯	১,২৭২,৩৬২
১৯২২	১৪৩	১৭৩,৩৮৬	৭৫৬,৭৪৭
১৯২৩	১০৯	১০৯,৩৩২	২,৮৩৬,০০০
১৯২৪	৫০	১৭৯,৫২২	৭,৫৫৯,৪০১
১৯২৫	৬৯	১৭৫,৬৩১	১১,৩৮৭,৭৯৭
১৯২৬	৫৭	২৯,৩১৪	৭৮,১১৩
১৯২৭	৫৪	২৮,০৭৮	১৬৫,০৬১
১৯২৮	১১৪	৩২৬,১৯৬	২৪,৬২৯,৭১৫
১৯২৯+	৩৮	১৬১,৫৮৭	৫,২৪৯,০৯৬
মোট	৭৩৮	১,৩১৫,০৪৫	৫৩,৯৩৪,২৯২
প্রেসিডেন্সি	৬১২	১,২৩৩,১৭০	৫২,৪৫০,৮১৪
বম্বে সিটি	-	-	৪৮,২৫৯,৭৩৭
আমেদাবাদ			২,৬০৪,৭৩৭
শোলাপুর			১,২১৪,৪৩৪

* ১লা এপ্রিল থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯২১
\+ ১লা জানুয়ারি থেকে ৩০শে জুন, ১৯২৯
সূত্র : Royal Commission on Labour in India

শক্ত ছিল। তার উপর ১৯২৯-এর 'ট্রেড ডিস্‌পিউট্‌স্‌ অ্যাক্ট'-এ বলা হয়, উপযুক্ত কারণ ছাড়া এবং জনসাধারণের অসুবিধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ধর্মঘট করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ১৯৩৭-এ শিল্প পুনরুজ্জীবন এবং আটটি প্রদেশে কংগ্রেস সরকার গঠিত হওয়ার অব্যবহিত পরে সারা ভারত জুড়ে ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে। শ্রমিকদের মূল দাবি ছিল—আগের কয়েক বছরে কমানো মজুরির হার বাতিল করা এবং শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করা। শ্রমিকদেব জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্যে এবং শ্রম-পরিস্থিতি বিষয়ে পরিসংখ্যান সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যুক্তপ্রদেশ সরকার কানপুর লেবার এনকোয়ারি কমিটি নিয়োগ করে। কানপুরের কয়েকটি বস্ত্রশিল্প কারখানায় ধর্মঘট শুরু হওয়ার পরে এই কমিটি নিযুক্ত হয়। তথ্য-সরবরাহের ব্যাপারে মালিকদের তরফ থেকে সহযোগিতার অভাব এবং একমাত্র সংগঠিত শ্রমিক-সংঘ মজদুর

সভার বিরুদ্ধে তাদের জেহাদ কমিটির নজরে পড়ে। কমিটি আরও লক্ষ্য করে যে ভারতের অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রের তুলনায় কানপুরে শ্রমিকদের মজুরি অনেক কম। কমিটির মতে কানপুরের অধিকাংশ কারখানায় উচ্চ মুনাফার পাশাপাশি শ্রমিকদের স্বল্প মজুরি ন্যায়-সঙ্গত নয়। যে-সব শ্রমিকদের মজুরি প্রতিমাসে ১৩ থেকে ১৯ টাকার মধ্যে তাদের প্রতি টাকায় ২½ আনা বৃদ্ধি এবং যে-সব শ্রমিকদের মজুরি প্রতিমাসে ৪০ থেকে ৫৯ টাকা তাদের প্রতি টাকায় ½ আনা বৃদ্ধির প্রস্তাবও কমিটি করে।[৬৮] মালিকরা অবশ্য কমিটির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল। শ্রমিকরা একটি সাধারণ ধর্মঘটে সামিল হয়। এই ধর্মঘট ছিল কানপুরের ইতিহাসে বৃহত্তম। পরবর্তী কালে শিল্পবিরোধগুলিতে মালিকরা সরকারের মধ্যস্থতা গ্রহণ করেনি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা শ্রমিকদের অধিকাংশ দাবি স্বীকার করতে বাধ্য হয়।[৬৯]

বোম্বাইতে ১৯২৮ সালের ধর্মঘটের পর থেকেই শ্রমিক সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে। প্রধান শিল্পে কর্মসংস্থানও হ্রাস পায় এবং এই পরিস্থিতিতে শ্রমিক সংগঠনগুলি মজুরি হ্রাসের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। একদিকে ছিল উদ্বৃত্ত শ্রম যোগানের চাপ,[৭০] অন্যদিকে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে গঠিত জয়ী শ্রমিক সংগঠনের বিকাশে সরকারের সক্রিয় বাধা। ক্রমাগত শ্রমিক ছাঁটাই এবং মজুরি হ্রাসের বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে বস্ত্র শিল্পশ্রমিকরা ১৯৩৪ সালে ধর্মঘট করে। এরপরেই বোম্বাই সরকার 'দি ট্রেড ডিসপিউট্স্ কনসিলিয়েশন অ্যাক্ট' পাশ করে। এই আইনে একজন সরকারি লেবার অফিসার নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। ইউনিয়নের বহু কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করার উদ্দেশ্য এই নিয়োগের পেছনে কাজ করেছে। লেবার অফিসার প্রয়োজনে সালিসির মাধ্যমে শিল্প বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। আবার ১৯৩৭-এ বোম্বাইতে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠা এবং বস্ত্রশিল্পে সমৃদ্ধি পুনরায় ফিরে আসার পরে অনেকগুলি ধর্মঘট হয়। বহু সংখ্যক শ্রমিক এই ধর্মঘটগুলিতে জড়িত ছিল। বোম্বাই সরকার একটি টেক্সটাইল লেবার এনকোয়ারি কমিটি গঠন করে। কমিটির অন্তর্বর্তী রিপোর্টে মজুরির ২১.৯ শতাংশ বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়। একই সঙ্গে সরকার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটস্ অ্যাক্ট পাশ করে। এই অ্যাক্টে শিল্পবিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা বাধ্যতামূলক করা হয় এবং সাথে সাথে যৌথ দরকষাকষির ওপর কিছু শর্ত আরোপ করে শ্রমিক সংগঠনগুলির হাতকে শক্তিশালী করা হয়।[৭১] একই ভাবে ১৯৩৭-৮-এর ধর্মঘটের পিছনের কারণগুলি চিহ্নিত করার এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করার জন্যে বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার এবং মাদ্রাজে প্রাদেশিক সরকারগুলি শ্রম-অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করে। বাংলায় অবশ্য ধর্মঘটী শ্রমিকদের প্রতি সরকারের মনোভাব খুব একটা সহানুভূতিশীল ছিল না। চটকল শিল্পে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক (১,৩০,০০) ১৯২৯ সালে মন্দা শুরু হওয়ার সময়ে কাজ হারিয়েছিল। মালিকরা মজুরি হ্রাস প্রত্যাহারের দাবি অগ্রাহ্য করায় ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। ধর্মঘট চলে মে মাস পর্যন্ত। শ্রমিকদের কিছু দাবি মেনে নিতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়। এর মধ্যে ছিল শ্রমিক ইউনিয়নের স্বীকৃতি। ১৯৩৮ সালে শ্রমিকরা আবার ধর্মঘট করে। কিন্তু আই. জে. এম. এ. সুপরিকল্পিতভাবে শ্রমিকদের দাবিদাওয়া নস্যাৎ করে দিতে অনেকটাই সফল হয়। এই সমস্ত শিল্প-বিরোধের সময় সরকার মোটামুটিভাবে শ্রমিকদের তুলনায় কর্তৃপক্ষের প্রতি বেশি সহানুভূতিশীল ছিল।[৭২]

৫.৬ বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রে মুনাফা ও মজুরি সংক্রান্ত পরিস্থিতি

কখনো কখনো দাবি করা হয়, অনুন্নত দেশের কারখানা শ্রমিকরা হলো একটি বিশেষ সুবিধাভোগী গোষ্ঠী এবং তাদের জীবনযাত্রার মান ছিল কৃষক, কৃষিশ্রমিক এবং অন্যান্য সাধারণ মানুষের তুলনায় উন্নত। শুধু তাই নয় মালিকরা তাদের প্রচুর মুনাফা শ্রমিকদের সাথে ভাগ করে নিত। মোটামুটি ভাবে ১৯২০ পর্যন্ত বস্ত্র এবং পাট শিল্পে এই ধরনেব মুনাফা ভাগ কবে নেওয়াব কোনো সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে অধিকাংশ মজুরি বৃদ্ধির পেছনে ছিল জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি। বোম্বাইয়ের তুলনায় আমেদাবাদের বস্ত্রশিল্পে প্রকৃত মজুরি বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল। তার কাবণ আমেদাবাদের বস্ত্রশিল্প বেশি সমৃদ্ধ ছিল। বিশের দশকে বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্প-শ্রমিকদের মজুরি আমেদাবাদের তুলনায় বেশি ছিল। ১৯৩৪ সালে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। সারণি ৫.৭ থেকে তা পরিষ্কার হয়।

সারণি ৫.৭ বস্ত্রশিল্প কারখানায় দৈনিক মজুরি এবং শ্রমনিয়োগ, ১৯৩৪ এবং ১৯৩৭

		বোম্বাই টাকা-আনা-পাই	আমেদাবাদ টাকা-আনা-পাই	শোলাপুর টাকা-আনা-পাই
প্রসেস অপারেটিভ্স্	১৯৩৪	১-১-৯ (১১৬,৯৮৯)	১-৫-১১ (৭৪,১৮৫)	০-১১-৬ (১৪,৪৩৫)
	১৯৩৭	১-১-৪ (৯৭,১৪৩)	১-৩-০ (৬০,১৩৯)	০-১১-৩ (১৫,১৪৮)
ইঞ্জিনিয়ারিং অপারেটিভ্স্	১৯৩৪	১-২-৯ (১১,৪২৯)	১-৩-১১ (৭,৯০১)	০-১২-৬ (১,৮৮৯)
	১৯৩৭	১-২-৮ (১০,৪৫৭)	১-২-৩ (৬,৪৫৯)	০-১১-৬ (২,১১০)
সমস্ত শ্রমিক	১৯৩৪	১-১-১০ (১২৮,৪১৮)	১-৫-৭ (৮২,০৮৬)	০-১১-৮ (১৬,৩২৪)
	১৯৩৭	১-১-৫ (১০৭,৬০০)	১-২-১১ (৬৬,৫৯৮)	০-১১-৪ (১৭,২৫৮)

সূত্র: 'Report of the Textile Labour Enquiry Committee', খণ্ড ২, *Final Report* (বোম্বাই, ১৯৪০) পৃ. ৫৭।
(বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যাগুলি নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা দেখাচ্ছে)

কিন্তু শিল্পের সমৃদ্ধির উচ্চতর মাত্রা আমেদাবাদে মজুরি বেশি হওয়ার একমাত্র কারণ ছিল না। প্রথমত, ১৯২৩-৩০ সময়ের মন্দার বছরগুলিতে আমেদাবাদের কারখানাগুলি যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, আমেদাবাদে মজুরি সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনার জন্যে একটি কার্যকরী সংগঠন ছিল। আমরা আগেই দেখেছি যে কানপুরের বস্ত্রশিল্প লাভজনক হলেও সেখানে মজুরি ছিল যথেষ্ট কম। বিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে বস্ত্রশিল্পের দ্রুত বিকাশ ঘটে। কিন্তু মাদ্রাজ ও কোয়েম্বাটুরের কারখানা-শ্রমিকদের মজুরি ছিল দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন।[৭৩]

সারণি ৫.৮ টাটা আয়রণ অ্যান্ড স্টিল কোম্পানির ভারতীয় কর্মচারীদের বার্ষিক মাথাপিছু মজুরি (১৯১২-১৩ থেকে ১৯২২-২৩)

	কোক ওভেনস্		ব্লাস্ট ফারনেসেস্		ওপেন হার্থ		ব্লুমিং মিল		২৮ ইঞ্চি মিল		বার মিলস্		সমস্ত দপ্তর	
	সংখ্যা	মজুরি	সংখ্যা	মজুরি	সংখ্যা	মজুরি	সংখ্যা	মজুরি	সংখ্যা	মজুরি	সংখ্যা	মজুরি	সংখ্যা	মজুরি
১৯১২-১৩	৬৫৭	১৮৫.৯২	৮৪৬	৩৭৬.৯৩	৯০০	১৮২.৪৯	২১৭	৩৯১.৪৫	৭৩০	১৭৯.২৫	৫৬৭	৭৪.২০	৩,৯১৭	২২০.৩৬
১৯১৩-১৪	৬২৮	২০৭.২৫	৮১০	৩৩৯.৪৮	৮৬০	২৪২.২৭	১৯৮	৪১৪.৯৮	৬৪৮	১৮৫.২৩	৫৪১	১০৬.২৯	৩,৬৮৫	২৩৬.৯৫
১৯১৪-১৫	৬৫৬	১৬৭.৭৯	৭৪৩	২৭২.৮২	৭৫০	২৪৬.৭১	১৮২	৫০৩.৯৩	৬৪১	৩২৭.৩৯	৫০০	১৬৭.৮০	৩,৪৭২	২৫৪.৪০
১৯১৫-১৬	৭১৩	১৬৭.৯০	৯১৫	২০৬.৫৪	৯৮০	২৩৬.৩৫	২২৪	৪৮৩.৫৫	৭৯১	৩৭০.০৭	৬২০	২৮৮.৫৭	৪,২৪৩	২৬৪.০৩
১৯১৬-১৭	৯৫০	২০০.৭৯	৮৩৮	২০৭.০৬	১,০১০	২৫০.১০	২৩৫	৫১৮.৮৬	৯০৫	৩৮৫.৪৮	৭৫০	২৮৯.৩২	৪,৬৮৮	২৭৮.২৯
১৯১৭-১৮	১,১২০	১৯৮.৬৬	১,০৪০	১৯৮.৩৩	১,৪৯০	২৫৮.৫৪	২৬০	৫২২.৯৫	১,০৯০	৩৯৫.৯১	৯৮০	২৮৬.৮৬	৫,৯৮০	২৭৮.০৩
১৯১৮-১৯	১,৪৫০	২৩৪.০৩	১,৫৫০	১৭৫.০৯	১,৮৫০	৩০০.১৫	৩০৬	৪০৮.৪৪	১,২৬৪	৩৭৭.২০	১,১৫০	৩১৬.১৮	৭,৫৭০	২৮১.৫৯
১৯১৯-২০	১,৯১০	২৩৫.৯৩	১,৯৯৩	১৬২.৬৪	২,০৭০	২০৫.৩১	৩২৫	৩৯৩.৯৯	১,৩১৫	৩৭৮.৩৫	১,১৭০	২৮৭.৯০	৮,৭৮৩	২৪৬.১৮
১৯২০-২১	২,৪৫০	২৪৩.৬৪	২,২৯৩	২৩২.৮৪	২,৩০৫	২৪২.৪১	৩[illegible]	৫৬৫.৯৯	১,৪৪০	৪২৮.৩৪	১,১৬৫	৩৬২.২৭	৯,৯৬৩	২৯১.৪৭
১৯২১-২২	২,৩৫৩	২৫৫.৪৭	২,৩০৬	২৭২.১২	২,৩৬০	২৩৯.৮২	৩৩২	৫৯৫.৯৮	১,৫৪৩	৪০১.৬৮	১,০৩০	৩৫৬.৯৯	৯,৯২৪	৩০০.২৮
১৯২২-২৩	২,৭২৫	২৩৮.৬৬	২,৩৩৯	২৪৬.২৫	২,২৬৫	২০৮.৮৮	৩৬০	৫৬২.১৫	১৫৯০	৩৪৩.১৯	১,০৫০	৩৪০.০২	১০,৩২৯	২৭০.৪৭

সূত্র : ITB : *Evidence* (Report on Steel), খণ্ড ১ (কলকাতা, ১৯২৪) পৃ. ১০৯-১১।

টীকা : ১৯১৮-১৯ সালের পরিসংখ্যান ৯ মাসের তথ্যের উপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা হয়েছিল, এই রকম সাক্ষ্য পাওয়া যায়। সামঞ্জস্য সাধনের উদ্দেশ্যে উক্ত সময়ের মজুরির পরিসংখ্যানকে ১.৩৩ সংখ্যাটির দ্বারা গুণ করা হয়েছে।

যদি আমরা লৌহ-ইস্পাত শিল্পের মতো আরও 'আধুনিক' শিল্পের দিকে তাকাই, চিত্রটির বিশেষ পরিবর্তন হয় না। সারণি ৫.৮-এ ১৯১২-১৩ থেকে ১৯২২-২৩ পর্যন্ত টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল ওয়ার্কসের চুক্তিবদ্ধ নয় এমন কর্মীদের (অর্থাৎ ভারতীয় কর্মীদের) মজুরি দেওয়া আছে। এই সময়েই ইয়োরোপীয় ও আমেরিকার কর্মীদের পরিবর্তে ভারতীয় কর্মীদের নিয়োগ কিছু পরিমাণে হয়েছিল। এই সমস্ত ভারতীয় কর্মীদের মজুরি গড়-মজুরির তুলনায় বেশি ছিল। তবুও দেখা যাচ্ছে মাথাপিছু মজুরি সবসময়ে বাড়ে নি। ১৯২০ এবং ১৯২২ সালের ধর্মঘটের পরেই জীবনযাপনের ব্যয়বৃদ্ধির জন্যে সামান্য মজুরি বৃদ্ধি পায়।[৭৪] ১৯২৮-এ আর একটি বড় ধর্মঘট হয়। টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানির শ্রমিক ছাঁটাই করার প্রয়াসই ছিল এর মূল কারণ। রয়্যাল কমিশন অন লেবারের অনুসন্ধানের সময় দেখা যায়, জামশেদপুরের দক্ষ শ্রমিকরা অন্য অঞ্চলের শ্রমিকদের তুলনায় সামান্য বেশি উপার্জন করত এবং অদক্ষ শ্রমিকদের উপার্জন অন্যত্রের তুলনায় জামসেদপুরে অতি সামান্যই বেশি ছিল। জামশেদপুরে জীবনযাপনের ব্যয় ছিল বিহারের অন্যান্য শহর বা গ্রামের তুলনায় অনেক বেশি। এর ফলে অদক্ষ শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রের তুলনায় জামশেদপুরে কম ছিল। ১৯২২ থেকে ১৯২৮-এর মধ্যে টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল ওর্য়াকসে দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিকদের মজুরির প্রায় কোনো পরিবর্তন হয় নি।[৭৫] শুধুমাত্র অদক্ষ শ্রমিকদের মজুরি সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঐ শহরেরই টিনপ্লেট কোম্পানির শ্রমিকদের মজুরি বিহারের অন্যান্য কারখানার (যেমন মারহাওরার চিনি কারখানা বা মজঃফরপুরের আর্থার বাটলার অ্যান্ড কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার) সমপর্যায়ভুক্ত দক্ষ শ্রমিকদের তুলনায় বেশি ছিল। কিন্তু জামশেদপুরের অদক্ষ শ্রমিকদের মজুরি ছিল দিনাপুরের চালকল বা মুঙ্গেরের পেনিনসুলার টোবাকো কোম্পানির শ্রমিকদের প্রায় সমান। অবশ্য আর্থার বাটলার অ্যান্ড কোম্পানির মতো অন্যান্য কারখানার সমপর্যায়ভুক্ত শ্রমিকদের তুলনায় এই মজুরি বেশ ভালো রকমই বেশি ছিল।[৭৬] ১৯২৭-৮ থেকে ১৯৩২-৩ পর্যন্ত টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল ওয়ার্কস-এ প্রতিবছরে শ্রমিক পিছু ব্যয় নিচে দেওয়া হলো (টাকায়) :

	১৯২৭-৮	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১	১৯৩১-২	১৯৩২-৩
চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক	২৫,২৭১	২৫,৯২৪	২৬,৩৮৯	২৫,৫৯৭	২৪,৩২৮
মাসিক বেতনভোগী শ্রমিক	৬১৯	৭৮২	৭৯৪	৮৩৬	৮৩৪
সাপ্তাহিক বেতনভোগী শ্রমিক	১৫৮	১৮৯	১৭৯	১৮৪	১৭৪

সূত্র : আই. টি. বি.

বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীদের মজুরির বৈষম্য এবং মাসিক বেতনভোগী ও সাপ্তাহিক বেতনভোগী কর্মীদের মজুরির ওঠানামার মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে ১৯৩৩ পর্যন্ত জামশেদপুরে মজুরির গতিবিধির খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ, অদক্ষ শ্রমিকরা এই লাভজনক শিল্পেও মুনাফার কোনো ভাগ পায়নি। একদিকে জীবনযাপনের ব্যয় ছিল বেশি, অন্যদিকে ছিল স্বল্প মজুরি ও জনসংখ্যার চাপ। এর ফলে অদক্ষ এবং আংশিক দক্ষ শ্রমিকরা ছিল ভীষণভাবে ঋণ-জর্জরিত এবং ধর্মঘট-প্রবণ।[৭৭] ১৯৩৩ পর্যন্ত উচ্চ বেতনভোগী

ইয়োরোপীয় কর্মীদের সাথে মুনাফার বৃহৎ অংশ ভাগ করে নেওয়া হতো। পরবর্তীকালে ইয়োরোপীয় কর্মীদের পরিবর্তে পরিদর্শক পদে নিযুক্ত ভারতীয় কর্মীদের সাথেও কিছুটা পরিমাণে মুনাফা ভাগ হতো। কিন্তু সাধারণ শ্রমিকরা এই মুনাফার কোনো ভাগই পেত না।[৭৮]

ভারতে মজুরির বিচলনের এবং শ্রম-যোগান পরিস্থিতির মূল নির্ধারকগুলি ছিল : (ক) সামগ্রিক ভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, (খ) শিল্পাঞ্চলগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং (গ) বিভিন্ন অঞ্চলে ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধির হার। এই সর্বশেষ কারণটির সাথে দ্বিতীয় কারণটির যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ ছিল। যে সব অঞ্চলে জমিদারী প্রথা চালু ছিল সেখানে কৃষি-শ্রমিকের অনুপাতও বেশি ছিল। অতএব অনুমান করা যায়, ভূমিব্যবস্থার সাথেও সর্বশেষ কারণটির সম্বন্ধ ছিল। অবশ্য মজুরি হ্রাস এবং শ্রমিকছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে শ্রমিক সংগঠনের প্রতিরোধ শ্রমের যোগান -মূল্যকে কিছুটা প্রভাবিত করেছিল। শেষদিকে প্রাদেশিক সরকারগুলির প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপেরও একটি প্রভাব ছিল। ইয়োরোপীয়দের প্রভাবিত শিল্পাঞ্চলে সাধারণত মজুরি কম হতো। এর একটি সহজ কারণ হতে পারে, ইয়োরোপীয়রা ঘন জনবসতিপূর্ণ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উঁচু এমন অঞ্চলে শিল্পস্থাপন করেছিল। কিন্তু প্রমাণ পাওয়া যায় যে ইয়োরোপীয়দের একজোট হওয়ার ক্ষমতা বেশি ছিল এবং তার ফলে তারা শ্রমের বাজারে একমাত্র ক্রেতা (মনোপ্সনি) হিসাবে অসংগঠিত শ্রমিকদের সম্মুখীন হতে পারত। তাদের শ্রমনিয়োগ নীতি দরিদ্রতর অঞ্চল থেকে সস্তায় শ্রম পেতে সাহায্য করেছিল। এর ফলেই কারখানায় নিযুক্ত শ্রমশক্তির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শ্রমিকদের অস্তিত্ব দেখা যায় এবং যা শ্রমিকদের কোনো যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। স্থানীয় মানুষদের সাথে ভাষাগত প্রভেদ থাকলে, এই সমস্যা আরও জটিল হয়। বাংলার দৃষ্টান্ত থেকে তা পরিষ্কার হয়। এর বিপরীতে আমেদাবাদ ও বোম্বাইতে শ্রমিকরা ছিল অনেকটাই সমজাতীয়। তাছাড়া মালিকেরাও মনোপসনি সৃষ্টি করতে পারেনি (যেমন, বোম্বাইতে) অথবা তারা শ্রমিক সংগঠনগুলির সাথে আলাপ আলোচনায় বেশি উৎসাহী ছিল (যেমন, আমেদাবাদে)।[৭৯]

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কানপুর এবং বোম্বাইতে মাঝে মাঝে শ্রমযোগানের অভাবের অভিযোগ উঠত। ঐ সময়েই বাংলা এবং যুক্তপ্রদেশে কারখানায় শ্রমযোগানের বিষয়ে ফ্রেম্যান্টল এবং ফোলির করা অনুসন্ধানে কোনো যোগান ঘাটতির অস্তিত্ব ধরা পড়ে না।[৮০] বোম্বাইয়ের শ্রম-পরিস্থিতি কয়েক বছরের জন্যে একটু অন্যরকম ছিল। তার কারণ, একদিকে শ্রমযোগানের উপর দুর্ভিক্ষ ও প্লেগের প্রভাব, অন্যদিকে বন্দর নির্মাণের মতো বৃহৎ পূর্তকার্যে শ্রমের চাহিদা।[৮১] কিন্তু এই পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। শ্রমের বাজারের পরিস্থিতি পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রকৃত মজুরি পরিবর্তিত হয়নি এবং একটি সীমার মধ্যে শ্রমিক সংগঠনগুলি প্রকৃত মজুরিকে প্রভাবিত করতে পারত। অতএব একথা বলা অসঙ্গত যে, শ্রমের যোগান-দাম স্থির ছিল। শিল্পের জন্যে শ্রমের যোগানে দীর্ঘস্থায়ী ঘাটতি ছিল, এ রকম কোনো ধারণাও অযৌক্তিক।

প্রকৃত মজুরির বিচলনের ব্যাখ্যার মধ্যেই আমাদের মূল আলোচনা এ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। আর্থিক মজুরিকে সাধারণ জীবনযাপনের ব্যয়ের মূল্য-সূচক দ্বারা ভাগ করে প্রকৃত মজুরি পরিমাপ করা হয়। মালিক বা নিয়োগকারীর দিক থেকে আর্থিক মজুরির তুলনায়

উৎপন্ন দ্রব্যের দাম অথবা আর্থিক মজুরির তুলনায় জীবনযাপনের ব্যয় থেকে শ্রমের যোগান-দাম সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু এদের কোনোটাই শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান যথাযথভাবে নিরূপণ করতে পারে না। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান বোঝার জন্যে বাসস্থানের অবস্থা শ্রমিকদের ঋণগ্রস্ততার মাত্রা, মালিক, দালাল অথবা মহাজনদের দ্বারা আইনী ও বেআইনীভাবে মজুরি কেটে নেওয়া এবং জনস্বাস্থ্য-পরিস্থিতি, এইসব বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হবে।[৮২] আমরা আগেই দেখেছি যে, বাসস্থানের জন্যে বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রের শ্রমিকদের ভোগ ব্যয় পরিমাপের কোনো মাপকাঠি নেই। পূর্ব ভারতের তুলনায় পশ্চিম ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বেশি সম্ভাবনা দেখা যায়। এর সম্ভাব্য কারণ, পশ্চিম ভারতের শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরির বৃদ্ধির হার এবং রপ্তানি-প্রতিস্থাপন শিল্পের বিকাশের হার বেশি থাকা। কিন্তু এই ধরনের একটি প্রস্তাব প্রমাণ বা খণ্ডনের জন্যে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। এই গ্রন্থে তা সম্ভব নয়।

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অধিকাংশ দৃষ্টান্তই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের (যদিও সমস্ত প্রদেশে নয়) উদ্বৃত্ত শ্রমের অস্তিত্বকে প্রমাণ করে। এই উদ্বৃত্ত শ্রম নিয়োজিত হতে পারত শিল্পে, যখন সেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেত।[৮৩] শ্রমের বাজারে ভারসাম্যহীনতা থাকলে পূর্ণ প্রতিযোগিতার নিয়মগুলি কার্যকর হয় না।[৮৪] অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমের বাজারে মনোপসনি (একজন ক্রেতার বাজার) অথবা অলিগোপ্‌সনি (কতিপয় ক্রেতার বাজার) থাকায় মালিকরা শ্রমিকদের শোষণ করতে পারত। ইয়োরোপীয় মালিকরা ভারতীয়দের তুলনায় এই কাজে বেশি সফল ছিল। যেখানে শ্রমিকরা নিজেদের সংগঠিত করতে পেরেছিল এবং যেখানে মালিকদের কাছ থেকে দাবিদাওয়া আদায়ে সক্ষম হয়েছিল, সেখানে সামগ্রিকভাবে শিল্পের বিকাশে বাধা না সৃষ্টি করেই প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছিল। (যদিও প্রকৃত মজুরির বৃদ্ধির ফলে কিছু স্থানীয় অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছিল) প্রকৃত মজুরির বৃদ্ধি বিনিয়োগকারীদের নিরুৎসাহিত করেনি। প্রথম অধ্যায়েই আমরা বলেছি যে ভারতে আধুনিক শিল্পবিকাশের হার সঞ্চয়ের যোগানের পরিবর্তে বিভিন্ন শিল্পদ্রব্যের বাজারের আয়তন দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল। (এই বাজারের আয়তন আবার আভ্যন্তরীণ চাহিদা ও সরকারি নীতি দ্বারা নির্ধারিত হয়। তাই প্রকৃত মজুরির বৃদ্ধির ফলে পুঁজিপতিদের বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত হ্রাস পেলেও শিল্পোন্নয়নের উপর তার কোনো প্রভাব পড়েনি। তাই ভারতবর্ষের আধুনিক শিল্পে শ্রমের যোগান স্থিতিস্থাপক হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীনতার পূর্বে ভারতীয় শিল্প বিকাশের ব্যাখ্যায় লুইস-জাতীয় মডেল ব্যবহার করা যাবে না। এর কারণ অন্তত দুটি : (ক) শিল্পে বিনিয়োগ সীমায়িত হয়েছিল চাহিদার দ্বারা, সঞ্চয়ের যোগানের দ্বারা নয়, এবং (খ) গ্রামাঞ্চলে শ্রমের অতিরিক্ত যোগানজনিত পরিস্থিতিতে পূর্ণ প্রতিযোগিতার মডেলগুলি মজুরি নির্ধারণের অথবা গ্রাম ও শহর অঞ্চলে শ্রমিকের কাজের শর্ত নিরূপণের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ সমর্থ হয় না।

৫.৭ দক্ষ শ্রমের যোগান

বর্তমান অধ্যায়ে আমরা আলোচনাকে অদক্ষ শ্রমের যেগানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছি। দক্ষ শ্রমিক এবং কারিগরি বিদ্যায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর যোগান বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নির্ভর করত

এই ধরনের শ্রমিকের চাহিদার উপর । এই চাহিদা আবার শিল্প ও পরিবহনের (মূলত রেলপথ) প্রসারের হারের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। শিল্প এবং অন্যান্য আধুনিক উৎপাদন সংস্থার নিয়ন্ত্রক ব্রিটিশ পরিচালক এবং শিল্পপতিদের বর্ণবিদ্বেষী দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবও চাহিদার উপর বর্তেছিল। ব্রিটিশ প্রশাসক এবং শিল্পপতিরা ভারতীয়দের তত্ত্বাবধায়কের বা ম্যানেজারের পদে নিয়োগ করত না। এই ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র ভারতীয় এবং ইয়োরোপীয়দের মধ্যেই বৈষম্য ছিল না, ভারতীয় এবং ইঙ্গ-ভারতীয়দের (ইয়োরেশিয়) মধ্যেও বৈষম্য রাখা হতো। প্রযুক্তিবিদ্যার সরকারি বৃত্তির ব্যবস্থাটির (যা ১৯০৪ সালে শুরু হয়েছিল) বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হয়েছিল তার রিপোর্টে বলা হয়েছে : 'জাতিবিদ্বেষ ও শ্রেণীবিদ্বেষ যা ভারতের অন্যান্য অনেক সমস্যাকে জটিল করেছিল তা শিল্পে অনুপস্থিত ছিল না। ভারতের সর্বাধিক সফল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির একটি বৃহৎ অংশ ইয়োরোপীয়দের হাতে ছিল এবং আমাদের বলা হয়েছিল যে ভারতীয়দের চাকুরি দিতে তারা নিয়মমাফিকই অনিচ্ছুক।'[৮৫] স্যার আর. এন. মুখার্জি কমিটিকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে এই সমস্যা প্রায় অতিক্রম করা গেছে। কিন্তু পাটকলগুলিতে ভারতীয়দের নিয়োগসংক্রান্ত যে তথ্যাদি পাওয়া যায়, তা স্যার মুখার্জির বক্তব্যের বিরোধী। ১৯১৪ সালের আগে এই মুখার্জিই ছিলেন পূর্ব ভারতের ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের সহযোগী স্বল্পসংখ্যক সফল ভারতীয়দের মধ্যে একজন।[৮৬]

রেল ও আধুনিক শিল্পে যে সব পদে প্রযুক্তিগত জ্ঞানের প্রয়োজন হতো জাতিবিদ্বেষের জন্যে সেখানে ভারতীয়দের নিয়োগ করা হতো না। ভারত সরকারের নীতিতেও ছিল জাতিবিদ্বেষ; সরকারি পূর্তকার্য এবং রাষ্ট্রীয় রেলে উঁচুপদের অধিকাংশ লোককে নিয়োগ করা হতো বিলেত থেকে। এই বিভেদমূলক নিয়োগনীতির সঙ্গে চলত প্রযুক্তিগত শিক্ষার সুযোগকে সংকুচিত করার প্রয়াস। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি থেকে উত্তীর্ণ সামান্য কিছু লোকের পক্ষেও চাকুরি পাওয়া শক্ত ছিল।[৮৭] সরকার তার বাণিজ্য বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে পরিদর্শকের পদে এই সমস্ত উত্তীর্ণ-ছাত্রদের নিয়োগ করত না। সরকার প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলির ভারতীয় স্নাতকদের চাকুরির জন্যে প্রথাগত সরকারি কর্ম সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে ছিল। তাছাড়া, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়োগপদ্ধতিতে সরকার কখনোই হস্তক্ষেপ কবত না। সুতরাং, প্রযুক্তিগতভাবে শিক্ষিত ভারতীয়দের জন্যে মুক্ত অথবা প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব ছাড়া আর কি ফল প্রত্যাশা করা যেতে পারে?

রয়্যাল ইন্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দৃষ্টান্তটি ভারত সরকারের জাতিগত বিদ্বেষ কত মারাত্মক এবং অপব্যয়ী হতে পারে তা পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেয়। ইংল্যান্ডের কুপার্স হিলে ভারত সরকার এই কলেজ স্থাপন করে। এই কলেজে 'ভারতের সরকারি পূর্তকার্য দপ্তরের উচ্চতর পদগুলিতে' নিয়োগের জন্যে ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো । এর ব্যয়ভার বহন করত ভারত সরকার এবং এই ব্যয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। (১৯০১ সালে একজন ছাত্রের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যয় হতো দু'শো আশি পাউন্ড) কলেজের কার্য-বিবরণীটিতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এও লেখা ছিল যে ভর্তির জন্যে প্রার্থীদের অবশ্যই 'ইয়োরোপীয় জাতির ব্রিটিশ প্রজা' হতে হবে। অবশ্য যদি অতিরিক্ত স্থান থেকে থাকে তবে কলেজের সভাপতি সর্বোচ্চ দুজন 'নেটিভ' ভারতীয়কে ভর্তি করতে পারতেন।[৮৮] শেষপর্যন্ত কলেজটি বন্ধ করে দিতে হয়েছিল নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্যে ; (ক) গ্রেট ব্রিটেনে আরও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ছিল যেগুলি একই ধরনের প্রশিক্ষণ দিত ; (খ) কলেজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অধিকাংশ লোকই

ভারতে কাজ করতে চাইত না। সুতরাং ভারত সরকারের দিক থেকে প্রশিক্ষণ বাবদ অর্থব্যয়ের সম্পূর্ণই ছিল অপব্যয়; (গ) কলেজটি চালানো ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে পড়েছিল কারণ ভর্তির যোগ্যতাসম্পন্ন যথেষ্ট সংখ্যক প্রার্থী পাওয়া যেত না।

এমনকি ভারত সরকারের ঘোষিত নীতি ছাড়াও সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ইয়োরোপীয় (মূলত ব্রিটিশ) অফিসাররা নিয়ম করে বিভেদীকরণের নীতির পক্ষপাতিত্ব করলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতে ১৯১৭ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত সামবিক যুদ্ধাস্ত্র তৈরির কারখানাগুলির (অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরির) পরিচালক (১৯১৭-২১), ব্রিগেডিয়ার জেনারেন এইচ. এ. ইয়াং, ১৯২৪ সালে বলেন : 'অর্ডিনান্স ফ্যাক্টরিগুলিতে দায়িত্বপূর্ণ পদের জন্যে ভারতীয়দের প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রয়াস ছিল সামান্য।'[৮৯] প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেও এই পক্ষপাত বজায় ছিল। এফ. এম. গ্রীমস্টোন যিনি কিছুদিন আগেই ভারতের অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিজ অ্যাণ্ড ম্যানুফ্যাকচারের পরিচালক ছিলেন, ১৯৩১ সালে স্মৃতিচারণ করে বলেন যে ভারতের সমস্ত অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরির সর্বমোট ৪০২ জন ফোরম্যানের মধ্যে সুনিশ্চিতভাবে ভারতীয় ছিলেন ইছাপুরে ধাতু ও ইস্পাত কারখানায় একজন ফোরম্যান ও দুজন সহকারী ফোরম্যান এবং কানপুরে ঘোড়ার জিন্ ও সাজসরঞ্জাম নির্মাণ কারখানায় দুজন সহকারী ফোরম্যান। এই কারখানাগুলির ৪৯ জন গেজেটেড অফিসারের মধ্যে একজনও ভারতীয় ছিলেন না।[৯০]

বেসরকারি ইয়োরোপীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পরিচালক বা পরিদর্শকের পদগুলির জন্যে ভারতীয়দের প্রশিক্ষণদানের কোনো উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। অসংখ্য দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি নেওয়া যাক। টিটাগড় পেপার মিলস পরিদর্শনের দায়িত্ব ছিল সম্পূর্ণভাবে ইয়োরোপীয়দের উপর। উৎপন্ন-দ্রব্য প্রেরণ এবং কাঁচামাল সংগ্রহ করার দায়িত্ব ছিল তিনজন ইয়োরেশীয়র উপর। এই কলগুলিতে কখনই একটি নির্দিষ্ট স্তরের বাইরে অর্থাৎ আংশিক দক্ষতার কর্ম ছাড়া ইয়োরোপীয়দের পরিবর্তে ভারতীয়দের নিয়োগ করার চেষ্টা করা হয়নি; যদিও ভারতীয় শ্রমিকের জন্য ব্যয় হতো অনেক কম।[৯১] বৈষম্যমূলক শুল্ক সংরক্ষণ নীতি গৃহীত হওয়ার পর কিছু ইয়োরোপীয় প্রতিষ্ঠান শুল্ক সংরক্ষণ থেকে সুবিধা পেয়ে বা সুবিধা পাওয়ার আশায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইয়োরোপীয় কর্মচারীদের পরিবর্তে ভারতীয়দের নিয়োগ করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সাধারণভাবে ইয়োরোপীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব বজায় ছিল। জনৈক ভারতীয়, এল. জুৎসি, ১৯৩২-এ ভারতীয় শ্রম পরিস্থিতির উপর একটি প্রবন্ধ নিয়ে অলোচনার সময় বলেন (প্রতিবেদনটির সংক্ষিপ্তসার জে. আর. এস. এ.-তে উপস্থাপিত) : *'তিনি সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতে পারবেন যে জাতিগত বিদ্বেষ ছিল দুর্ভাগ্যক্রমে নিয়ন্ত্রণবিহীন, বিশেষত বাংলায়। তিনি স্মরণ করতে পারেন যে ১৯২৫-এ একটি কয়লাখনির পরিচালককে চাকুরির জন্যে বলেন এবং জানান যে তিনি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সাত বছর কাটিয়েছেন এবং লন্ডনে কাটিয়েছেন চার বছর, তাছাড়াও কাজ করেছেন সমগ্র ইয়োরোপের বিভিন্ন খনি ও কয়লাখনিতে। পরিচালক তাঁকে মাসিক ৫০ টাকা বেতনের একটি চাকুরির প্রস্তাব করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন সমস্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও তিনি কেন এর বেশি বেতন পাবেন না। পরিচালক উত্তর দেন, 'সমস্ত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ছেলেরা যেখান থেকে শুরু করে, অর্থাৎ ৫০ টাকা প্রতি মাসে, সেখান থেকেই তাঁকে শুরু করতে হবে। এই সমস্ত ছেলেরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (অথবা*

অনুত্তীর্ণ)"[২২] প্রাতিষ্ঠানিক কারিগরি শিক্ষার সম্পূরক হিসাবে প্রয়োজন হয় কোনো কারখানায় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ। স্নাতক হওয়ার পর স্বাধীনভাবে কাজ করার বা নিজের কাজ সঠিকভাবে জানার দাবি করার আগে কোনো ব্যবসায় প্রকৃত অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হতো।[২৩] কোনো ভারতীয় কারিগরি বিষয়ে প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করার পরেও সে কোনো ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের সুযোগ পেত না। কারণ ভারতে প্রশিক্ষণের উপযুক্ত সংস্থা ছিল না অথবা কারিগরি বিদ্যায় শিক্ষানবিস হিসাবে সুযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব করা হতো। এই কারণে ভারতীয়দের পক্ষে উপযুক্ত ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জন করা প্রায়শই সম্ভব হতো না। গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে মূলধনী শিল্পের বিকাশ এবং বিশেষভাবে যন্ত্রপাতি-শিল্পের বিকাশ দক্ষতা সৃষ্টিতে বিপুলভাবে সাহায্য করেছিল।[২৪] গ্রেট ব্রিটেনে ইঞ্জিন তৈরির কারখানাগুলি 'যন্ত্রবিদ্যার ব্যবহারিক বিদ্যালয়ের' ভূমিকা পালন করেছে।[২৫] ভারত সরকার ১৯২৩-এর আগে দেশের কোনো শিল্পকে শুল্কের দ্বারা সংরক্ষণ করেনি অথবা অন্য কোনো ভাবে পর্যাপ্ত সাহায্য দেয়নি। ভোগ্যদ্রব্য শিল্পের তুলনায় 'শিশু' মূলধনী দ্রব্য শিল্পের কাছে বিদেশী প্রতিযোগিতা ছিল বেশি মারাত্মক। ১৯২৪ সালে পেনিনসুলার লোকোমোটিভ কোম্পানি একটি প্রস্তাবিত রেল ইঞ্জিন কারখানার জন্যে সরকারি সাহায্যের আবেদন জানায় এই দাবিতে যে, এর ফলে ভারতবর্ষের যন্ত্রশিল্প-প্রযুক্তিবিদদের প্রশিক্ষণের সুবিধা হবে। এই আবেদন অবশ্য ব্যর্থ হয়েছিল।[২৬]

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জাতীয়তাবাদের আবেগে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে প্রযুক্তিগত শিক্ষার জন্যে আর্থিক সাহায্য করলেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে এই ক্ষেত্রে ভারত সরকারের প্রয়াস যথেষ্ট ছিল না। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের আগেই যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ ১৯০৪ সালে অ্যাসোসিয়েশান ফর দি অ্যাডভান্সমেন্ট্ অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাসট্রিয়াল এডুকেশন স্থাপন করেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুরু হওয়ার সাথে সাথেই প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন এবং সোসাইটি ফর দি প্রমোশন অব টেক্‌নিকাল এডুকেশন।[২৭] এই সংস্থাগুলি ভারতবর্ষে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিল এবং ভারতে ও বিদেশে কারিগরি ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যে বৃত্তি অনুমোদন করেছিল। এর ফলে দক্ষ কর্মীর যোগান সুনিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার এই সমস্ত স্নাতকরা ভারতের নতুন উৎপাদক সংস্থাগুলিতে পরিদর্শক হিসাবে কাজে যোগ দেয়। অথবা তারা নিজেরাই ব্যক্তিগত উদ্যোগে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-সংস্থা গড়ে তোলে। এইভাবে ব্যক্তিগত প্রয়াসে ভারতবর্ষে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মূলধনের সৃষ্টি ও বিকাশ ঘটে। ভারত সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারগুলি 'স্টেট টেকনিকাল স্কলারশিপ' পরিকল্পনায় বিদেশে ভারতীয় ছাত্রদের প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষার জন্যে অর্থদান শুরু করল। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়েও এই পরিকল্পনা চালু ছিল। এই সময়ে বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি ভারতে শিক্ষাপ্রাপ্ত স্নাতকদের তৈরি করেছে। একটি সমালোচনা প্রায়শই করা হতো যে যোগ্য সুযোগের অভাবে ভারতে অথবা বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত বহু প্রযুক্তিবিদ্যায় স্নাতক তাদের প্রশিক্ষণের বিষয়ের বাইরে অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। এই সমালোচনা খতিয়ে দেখার জন্যে সরকার স্থানীয় সিলেকশন বোর্ডের সাহায্য নিল। বিদেশে শিক্ষণপ্রাপ্ত স্নাতকদের চাকুরির সুযোগ নির্ধারণ করার জন্যে বোর্ডকে বলা হলো। প্রকৃত শিল্পোদ্যোগীদের বিদেশ থেকে প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রাদেশিক সরকার বিশের দশকে

বিদেশ গমনের জন্যে অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা করল। বহু সরকারি সংস্থা ইতিপূর্বেই শূন্যপদে কর্মী নিয়োগের কথা ভেবে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের জন্যে বিদেশে লোক পাঠিয়েছিল।[১৭ক] এসব সত্ত্বেও দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন সময়ে বহু ক্ষেত্রেই প্রযুক্তিবিদ্যায় স্নাতকদের অতিরিক্ত যোগান বজায় ছিল।

ভারতীয়দের পেশাদারী ক্ষেত্রে বা সরকারি প্রশাসন ও বিচার বিভাগের চাকুরির ক্ষেত্রে প্রবেশের তুলনায় সরকারি ও বেসরকারি শিল্পক্ষেত্রে প্রবেশের উপর অপেক্ষাকৃত বেশি কার্যকরী বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল জাতিগত বিদ্বেষ। একজন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভারতীয়ের পক্ষে শিল্পক্ষেত্রের তুলনায় প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে যোগ্যতা অর্জনের বা ধনোপার্জনের সুযোগ বেশি ছিল। স্বাভাবিকভাবেই শিল্পক্ষেত্রে চাকুরির তুলনায় পছন্দ ছিল স্বাধীন পেশা বা প্রশাসনিক বা বিচারবিভাগীয় চাকুরি। সাধারণভাবে উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে যা মনে করা হতো বাস্তব অবস্থা ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে উত্তীর্ণ স্নাতকের সংখ্যা সরকারি চাকুরি এবং পেশাদারী ক্ষেত্রে যত লোক সার্থকভাবে নিয়োগ করা প্রয়োজন তার তুলনায় বেশি ছিল না। ১৯০৭-এর আগে মাত্র একবারই সব ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সমস্ত বিষয়ের যেমন কলা, বিজ্ঞান, যন্ত্রবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যার স্নাতকদের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযুক্তিবিদদের বার্ষিক সর্বমোট সংখ্যা ২০০০ অতিক্রম করেছিল। পাঁচকোটি জনসংখ্যার মধ্যে অবস্থিত মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯০০ সালে মাত্র ৩৬৫ জন এবং ১৯০১ সালে ৩৩১ জন কলাবিদ্যার স্নাতক উত্তীর্ণ হয়েছিল। ভারতে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচেষ্টার করুণ অবস্থা এখান থেকেই বোঝা যায়। ভারতে শিক্ষার পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পর্যালোচনায় বলা হয় : বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৫ জন স্নাতকদের মধ্যে ৪৫০ জন আইনবিভাগের স্নাতক এবং তাদের বেশির ভাগই বিচারব্যবস্থায় যোগদান করে। ১৯০৩ সালে উচ্চ সরকারি পদে নিযুক্ত ভারতীয়দের সংখ্যার একটি বিবরণ দেওয়া হয়। বিবরণটিতে শুধুমাত্র মাসিক ৭৫ টাকার অধিক বেতনের পদগুলির উল্লেখ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সদ্য-উত্তীর্ণ যুবকের প্রত্যাশিত বেতনের তুলনায় এই বেতন বেশি ছিল। ফলত সরকারি চাকুরিতে স্নাতকদের চাহিদার সম্পূর্ণ খতিয়ান এই বিবরণে পাওয়া যায় না। কিন্তু দেখা যায় যে, ১৬,০০০-এরও বেশি ভারতীয় কর্মী ৭৫ টাকার অধিক বেতনের পদে নিযুক্ত ছিল।[১৮]

সুতরাং, শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে সরকারি প্রশাসন এবং বিচারবিভাগের চাকুরিতে অথবা স্বাধীন পেশায় যোগদানের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। সরকারি প্রশাসন এবং বিচার বিভাগে অবস্থা ছিল বেশি সুবিধাজনক।[১৯] ব্রিটিশ সংস্থায় রসায়নবিদ বা প্রযুক্তিবিদের অনুচ্চ পদের তুলনায় স্বাধীন পেশায় ভারতীয়দের উচ্চ আয় উপার্জনের সম্ভাবনা বেশি ছিল। তাছাড়া, ইংরেজদের জাতিগত বিদ্বেষ স্বাধীন পেশায় নিযুক্ত ভারতীয়দের ভবিষ্যত সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করতে পারত না। স্বাভাবিকভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর চাহিদা হঠাৎ বৃদ্ধি পেলে সেখানে প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন ভারতীয়দের অভাব হতো। কিন্তু এই দক্ষ কর্মীর অভাবের সমস্যা ছিল স্বল্পস্থায়ী। বিশ এবং তিরিশের দশকে লৌহ ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিনি এবং কাগজ শিল্পে ভারতীয়দের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত উৎপাদন-সংস্থা গড়ে উঠল। তখন পরিচালক ও পরিদর্শক পদগুলিতে ইয়োরোপীয়দের পরিবর্তে ভারতীয়দের নিয়োগ করতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের জন্যে প্রাথমিক

ব্যয় ছিল অত্যন্ত বেশি।[১০০] কিন্তু এই ব্যয় অনেকটাই সংক্ষেপ করা সম্ভব হতো, কারণ দক্ষতার দিক থেকে ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে তুলনীয় ভারতীয়দের অনেক কম বেতন দেওয়া যেত। এর আগেও মূলত ভারতীয় ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণাধীন বোম্বাইয়ের বস্ত্রবয়নশিল্পে পরিদর্শকের পদে ইয়োরোপীয়দের পরিবর্তে ভারতীয়দের সাফল্যের সাথে নিয়োগ করা হয়েছিল। ভারতীয় মিলগুলির সাহায্যে ভিক্টোরিয়া জুবিলি ট্রেনিং ইন্‌স্টিটিউটে (১৮৮২সালে স্থাপিত) নিয়মমাফিক প্রশিক্ষণেব পরিকল্পনাব মাধ্যমে এই সাফল্য সম্ভবপর হয়েছিল। ১৮৯৫ নাগাদ, বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্প-কারখানাগুলিব উচ্চ পদাধিকারী ২৪৫ জনের মধ্যে মাত্র ১০৪ জন ছিলেন ইযোরোপীয়।[১০১] ইয়োবোপীয় ও ভাবতীয়দের অনুপাত উত্তরোত্তর হ্রাস পেতে থাকে।

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে যখন ভারতীয় শিল্পের বিকাশ ঘটছে তখন দক্ষ শ্রমের অভাব কোনো মৌলিক সমস্যা ছিল না। বরং পূর্ববর্তী কালের দক্ষ শ্রমিকের অভাবজনিত সমস্যার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে ভারতের শিল্পে অনগ্রসরতা এবং ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের অনুসৃত নিয়োগ সংক্রান্ত নীতি। সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে দক্ষতার অভাবের মূল কারণ ছিল তাদের নিরক্ষরতা।[১০২]

অনুবাদক : মনোজ কুমার সান্যাল ও অরিন্দম মানি

উৎস ও টীকা

১। ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যে চলনশীলতার অভাব এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে উৎসাহব্যঞ্জক কোনো ব্যবস্থায় তারা সাড়া দেয় না—এই বক্তব্যের উপর আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য : Anstey, *Economic Development of India*, পৃ. ১১৮-২৫, এবং ২৮১-২ ; ভারতীয় শ্রমিকদের বিরুদ্ধে অবাধ্যতার অভিযোগ সম্পর্কে মতামতের জন্যে দেখুন : Alexander Gerschenkron, *Economic Backwardness in Historical Perspective* (নিউইয়র্ক, ১৯৬২)। লেখকের মত গবেষনালব্ধ না হলেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ : 'প্রকৃত অর্থে শিল্প-শ্রম শক্তির সৃজন সময়সাপেক্ষ ও দুঃসাধ্য। রুশ শিল্প থেকে তার কিছু জোরালো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।.... আমাদের সময়ে বিভিন্ন ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে যে সব তথ্য পাওয়া যেত সেগুলি যেন ইয়োরোপীয় শিল্পায়ন কালের দুর্ভাগ্যজনক শ্রম-যোগান পরিস্থিতির পুনর্বিবরণ, আরও বেশি অতিরঞ্জিত আকারে।' *ঐ*, পৃ. ৯।

২। বিশেষত দ্রষ্টব্য : D. H. Buchanan, *The Development of Capitalistic Enterprise in India* (লন্ডন ১৯৬৬, ১৯৩৪-এর সংস্করণের পুনর্মুদ্রন), অধ্যায় ১৪-১৭; C. A. Myers, *Labor Problems in the Industrialization of India* (কেম্ব্রিজ, ম্যাস, ১৯৫৮), অধ্যায় ৩ ও ৪; এবং Morris David Morris, *The Emergence of an Industrial Labour Force in India* (বার্কলি, ১৯৬৫)।

৩। দ্রষ্টব্য : Sir Reginold Coupland, *India : A Restatement*, পৃ. ৫৩-৪।

৪। Davis, *Population of India and Pakistan,* অধ্যায় ৪ ও ১৩।

৫। Patel, *Essays on Economic Transition,* পৃ. ৩-৩২ ('Agricultural Labourers in Modern India and Pakistan'); এবং *Census of India, 1931,* Vol. 1. *India*, Part I, *Report* (দিল্লী), ১৯৩৩, অধ্যায় ৮। ১৯০১-এর পবিসংখ্যানে কৃষি-শ্রমিকদের পরিবার বা তাঁদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত। ১৯৩১-এর পরিসংখ্যান (৪২.২ মিলিয়ন) শুধুমাত্র প্রকৃত শ্রমিকদেব ধবা হয়েছে।

৬। *Census of India, 1911,* Vol. 1, *India,* Part 1, *Report* (কলকাতা, ১৯১৩), পৃ. ৪৪৪, এবং Gov. India, CISD : *Statistical Abstract for British India from 1911-12 to 1920-21* (কলকাতা, ১৯২৩) পৃ. ৬৪৮-৫৩।

৭। Gov. India, CISD : *Statistical Abstract for British India from 1922-3 to 1931-2* (দিল্লী, ১৯৩৪), সারণি সংখ্যা ৩১৪ ও ৩১৬।

৮। A.R. Burnett-Hurst (Sir Stanley Reed-এর মুখবন্ধ), *Labour and Housing in Bombay* (লন্ডন, ১৯২৫). পৃ. ৫।

৯। RC on Labour in India, *Report* (PP 1930-1, XI), পৃ. ২১।

১০। G. M. Broughton, *Labour in Indian Industries* (লন্ডন, ১৯২৪) পৃ. ৭৩-৪; N.C. | Chaudhury, *Jute and Substitutes* (কলকাতা, ১৯৩৩), পৃ. ৪৫-৭। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ভারতের যে কোনো শস্যের তুলনায় পাট চাষে একর প্রতি মোট আয় বেশি ছিল (সম্ভবত দক্ষিণ ভারতের আখ চাষ বাদে)। কিন্তু পাট চাষে প্রতিযোগী শস্যের (যেমন, ধান) তুলনায় অনেক বেশি শ্রমিকের প্রয়োজন হতো। দ্রষ্টব্য : *Proceedings of the Inter-Provincial Jute Conference held at Calcutta from the 2nd to 4th August, 1915, with Appendices* (কলকাতা, ১৯১৫), পৃ. ৩ (সভাপতি B. Coventry-র ভাষণ, তিনি ছিলেন ভারত সরকারের কৃষি উপদেষ্টা) এবং পৃ. ১৯-২০ ('Note on Jute', R. S. Finlow, বাংলার সরকারের তন্তু বিশেষজ্ঞ) চাষের মরশুমে বাংলায় ও বিশেষ করে পাট উৎপাদনকারী উত্তর বাংলায় কৃষি-শ্রমের অতিরিক্ত চাহিদা সাধারণত মেটানো হতো বিহার ও উত্তর প্রদেশ থেকে (সাময়িকভাবে) আগত শ্রমিকদের দ্বারা। দ্রষ্টব্য : *Census of India, 1911,* Vol. V, *Bengal, Bihar and Orissa and Sikkim,* Part I, *Report* (কলকাতা, ১৯১৩), পৃ. ৬৬ (এই রিপোর্টে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে শ্রমের চলনশীলতা সম্পর্কে মন্তব্য আছে); Bengal District Gazetteers : *Santal Parganas* (কলকাতা, ১৯১০, পৃ ১৯২-৩; Bihar District Gazetteers : *Santal Parganas* (দ্বিতীয় সংস্করণ, পাটনা, ১৯৩৮), পৃ. ২৫৩-৪।

১১। বোম্বাইয়ের সুতিবস্ত্র শিল্প থেকে দৃষ্টান্ত ও মজুরির প্রমিতকরণ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য Morris, *Emergence of an Industrial Labour Force,* অধ্যায় ৯। পাটকলভেদে মজুরির পার্থক্য এবং বিভিন্ন দ্রব্য (যেমন

পাটজাত পণ্য, তুলোর সুতো ও কাপড় এবং রাসায়নিক দ্রব্য) উৎপাদনকারী কলকাতা ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের মিলগুলির মধ্যে মজুরির বৈষম্য বিষয়ক ধারণার জন্যে দ্রষ্টব্য : Indian Factory Labour Commission 1908 : Inspection Notes, Vol I, *Report*, Appendix F (সিমলা, ১৯০৮) পৃ. ১৯-২৬। ১৯৩০-এ, অর্থাৎ যথেষ্ট বিলম্বে, রয়্যাল কমিশন অব লেবার যখন অনুসন্ধান করল তখনও কলকাতার পাট বা অন্য কোনো শিল্পে মজুরির প্রমিতকরণ ঘটেনি। আই জে এম এ এরকম কোনো চেষ্টাই করেনি বরং প্রমিতকরণের বিরোধিতা করেছে। (বোম্বাইয়ের সুতিবস্ত্র শিল্পে মজুরির প্রমিতকরণ শেষ পর্যন্ত ঘটেছিল সরকারের চাপে।) এই মর্মে আই জে এম এ ও তার প্রতিনিধিদের সাক্ষ্যের জন্যে দ্রষ্টব্য : *Evidence*, খণ্ড ৫ (লন্ডন, ১৯৩১), অংশ ১, পৃ. ৩০৩, ৪২১, ৪৩০ এবং অংশ ২, পৃ. ১৬৩ ও ১৭১।

১১। ভারতে প্লেগ মহামারীর প্রকোপ বৃদ্ধির সংক্ষিপ্ত বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য : Charles Creighton, MD, 'Plague in India', *JSA*, খণ্ড ৫৩, সংখ্যা ২৭৪৩, ১৬ই জুন, ১৯০৫, পৃ. ৮১০-২৬। গবেষণাপত্রটির অনুসরণে যে আলোচনা হয়েছিল তা-ও ঐ সূত্রে নথিভুক্ত হয়েছে।

১৩। মার্কিনী গবেষকদের মধ্যে D. H. Buchanan (১৯৩৪) সমস্যাগুলির প্রতি অনেক বেশি মনোযোগী ছিলেন।

১৪। K. Mukerji, (১) 'Trend in Real Wages in Cotton Textile Mills in Bombay City and Island, from 1900 to 1951,' *Artha Vijnana* (পুণা), খণ্ড ১, সংখ্যা ১, মার্চ ১৯৫৯; (২) 'Trend in Real Wages in Cotton Textile Industry in Ahmedabad from 1900 to 1951', *Artha Vijnana* খণ্ড, ৩ সংখ্যা ২ (৩) 'Trend in Textile Mill Wages in Western India : 1900 to 1951,' *Arthan Vijnana* জুন ১৯৬১; খণ্ড ৪, সংখ্যা ২, জুন ১৯৬২; এবং (৪) 'Trend in Real Wages in the Jute Textile Industry from 1900 to 1951,' *Artha Vijnana*, খণ্ড ২, সংখ্যা ১, মার্চ ১৯৬০।

১৫। মুখার্জি পরিবেশিত সিরিজে, ১৯২৯ ও ১৯৩০, এই দুই বছরের পাটকল শ্রমিকদের আর্থিক ও প্রকৃত মজুরির হার সম্ভবত কমানো আছে। ১৯২৯-এর ধর্মঘটের পরে ৭½ থেকে ১০ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি স্বীকৃত হয়েছিল , কিন্তু মুখার্জির আর্থিক মজুরির সিরিজে তার প্রতিফলন ঘটেনি (*Artha Vijnana*, খণ্ড ২ (১), মার্চ ১৯৬০, পৃ. ৬৭)। ১৯২৯-এর ধর্মঘটের ফলাফলের জন্যে দ্রষ্টব্য আই জে এম এ-র সাক্ষ্য R.C. on Labour in India, *Evidence*, খণ্ড ৫ (লন্ডন, ১৯৩১), অংশ ১, পৃ. ৩০২।

১৬। উদাহরণস্বরূপ Gazetteers of the Bombay Presidency : [S.M. Edwardes] খণ্ড ১, *Bombay City and Island* (বোম্বাই, ১৯০৯, পৃ. ৩২৩) পরিবেশিত মজুরিরপরিসংখ্যান Manockji Petit Mills-এর (বোম্বাই) সূত্র থেকে নেওয়া হয়েছে এবং সেগুলিই আবার ব্যবহৃত হয়েছে সরকার প্রকাশিত একটি প্রতিনিধিমূলক সিরিজে : Gov. India, CISD : *Prices and Wages in India* (Calcutta,

annual)। Bengal District Gazetteers : *24 Paraganas* (কলকাতা, ১৯১৪), পৃ. ১৪১-এ দু'টি পাটকলের (বজবজ ও গৌরীপুরে অবস্থিত) বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের ১৯২১ সালের সর্বনিম্ন মজুরির পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। শ্রমশক্তির গঠন মজুরির তারতম্যের পরিসর (range of wages), উভয়ই অজ্ঞাত। অতএব সর্বনিম্ন মজুরির সঙ্গে মুখার্জি-প্রদত্ত ১৯১১-র গড় মজুরির পরিসংখ্যান সঙ্গতিপূর্ণ কিনা দেখা ছাড়া তথ্য যাচাইয়ের আর কোনো উপায় নেই। এ দিক থেকে মুখার্জির পরিসংখ্যান অবশ্যই সঙ্গতিপূর্ণ।

১৭। যেমন 'Inspection Notes' for Bombay, Ahmedabad and Calcutta, Indian Factory Labour Commission 1908 : Vol. I, *Report*, Appendix F (সিমলা, ১৯০৮)। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারতের কাপড়কলের তুলনায় পাটকলে মজুরির হার বেশি ছিল (*Ibid*, পৃ. ২২), কিন্তু কাপড়কলের ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় গড় মজুরি বোম্বাইয়ের মজুরির হারের তুলনায় যথেষ্ট কম ছিল। G. K. Devadhar একটি সমীক্ষায় (১৯১৩ নাগাদ) দেখেছিলেন যে বোম্বাইয়ের দুটি অঞ্চলে (Chinchpokli ও Tardeo) কারখানা শ্রমিকদের মাসিক গড় আয় ছিল ২০.১৭ টাকা। দ্রষ্টব্য : 'The Indian Mill Hands : A Movement on their Behalf.' *ITJ*, অক্টোবর, ১৯১৩, পৃ. ৩২। এই তথ্যের সঙ্গে মুখার্জির দেওয়া ১৯১৩ ও ১৯১৪ সালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পাট ও সুতিবস্ত্রের কারখানা শ্রমিকদের গড় মজুরির পরিসংখ্যানের (সারণি ৫.৩) তুলনা ভালোভাবে চলে। মুখার্জির সিরিজে বোম্বাইয়ের প্রকৃত মজুরির বৃদ্ধির হিসাবে সম্ভবত সামান্য অতিরঞ্জন আছে, বিশেষ করে তা ধরা পড়ে ১৯১৩-র বদলে ১৯১৪-কে শেষ বছর ধরলে (সারণি ৫.২-এ বর্ণিত K. L. Datta-র সিরিজের সঙ্গে তুলনীয়)। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের মূল যুক্তি প্রভাবিত হয় না।

১৮। আবাসন সম্পর্কিত সমস্যার তুলনামূলক গুরুত্ব আন্দাজ করা যায় জীবনযাত্রার ব্যয়ের সূচক থেকে। ১৯২৬ থেকে এই সূচক গঠন করেছিল দি বম্বে লেবার অফিস। সূচকটিতে বাড়ি ভাড়া গুরুত্ব (weight) পেয়েছিল ১০০-তে ১৩। দ্রষ্টব্য : Labour office, *Wages and unemployment in the Bombay Cotton textile industry* : *Report of the Departmental Enquiry* (বোম্বাই, ১৯৩৪) পৃ. ৪১-২।

১৯। G.O.W. Dunn, 'The Housing Question in Bombay', *JRSA*, খণ্ড ৫৮, সংখ্যা ২৯৮৯, মার্চ ৪, ১৯১০, পৃ. ৪০৮।

২০। পাটকল শ্রমিক বা বোম্বাইয়ের শ্রমিকদের জন্যে বসত বাড়ি তৈরি করায় তুলনামূলক মুনাফা-লভ্যতা অনুসন্ধানের জন্যে দ্রষ্টব্য : Indian Factory Labour Commission 1908 : *Report and Applindices* ; Appendix F, খণ্ড ১, পৃ. ২২ (সিমলা, ১৯০৮)। ১৯০০ ও ১৯১৪ সালের মধ্যে বোম্বাইতে প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতির পরিবর্তন বোঝার উদ্দেশ্যে দ্রষ্টব্য একই উৎস : খণ্ড ২, *Evidence* (পৃ. ৬৮) এবং *Report of the Bombay Development Committee 1914* (বোম্বাই, ১৯১৪), পৃ. ৪৪ ও ২৪৩।

২১। IJMA, *Report of the Committee for the year ended 31 December 1904* (কলকাতা, ১৯০৫), পৃ. ৪ (বার্ষিক সাধারণ সভায় চেয়ারম্যান J. D. Nimmo-র বক্তৃতা)

২২। G. M. Broughton, *Labour in Indian Industries* (লন্ডন, ১৯২৪), পৃ. ১৩৮।

২৩। C. H. Bompas, 'The Work of the Calcutta Imporvement Trust', *JRSA*, ৭৫, সংখ্যা ৩৮৬৮, জানুয়ারি ৭, ১৯২৭, পৃ. ২০০-১৩। বোম্বাইতে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট গঠিত হয়েছিল ১৮৯৮-এ, কলকাতায় ১৯১২-য়। বোম্বাইয়ের ট্রাস্ট সরকারি জমির ভিত্তিতে কাজ আরম্ভ করে। কিন্তু কলকাতায় তা সম্ভব হয়নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে সরকারের হাতে জমি ছিল না এবং অত্যন্ত চড়া দামে বেসরকারি জমি কিনতে হতো। যুদ্ধের পরে ইমারতের মূল্যের পতনের ফলে কলকাতার ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট বেশ সমস্যায় পড়ে।

২৪। Labour Office, Bombay : *General Wage Census*, Part I, *Perennial factories Third Report* (বোম্বাই, ১৯৩৭), পৃ. ৬১-৪ ; *Report of th Textile Labour Enquiry Committee*, Vol II, *Final Report* (বোম্বাই, ১৯৪০), পৃ. ২৬৭-৭৪। ডেভলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের তৈরি শ্রমিকদের চালাঘরে বসবাসকারী ব্যক্তিদের সংখ্যা ১৯৩৮-এ ছিল ৬৩,০০০। এঁরা সবাই বস্ত্রবয়ন শিল্পের শ্রমিক ছিলেন না। *ঐ*, পৃ. ২৭২।

২৫। Gov. India, Labour Investigation Committee : *Report on an enquiry into conditions of labour in the jute mill industry of India*, S.R. Deshpande (দিল্লী, ১৯৪৬), পৃ. ২৯। শ্রমিকদের মধ্যে অনেকেরই বাসস্থান ছিল ভাড়া করা কুঁড়েঘর যার দেওয়াল ছিল মাটির এবং ছাদ টালির বা খড়ের।

২৬। *ঐ*, পৃ. ৩১।

২৭। *ঐ*, পৃ. ২৭।

২৮। আরও *দেখুন* Buchanan, *Development of Capitalistic Enterprise*, অধ্যায় ১৫ ও ১৮।

২৯। অভিবাসন ও আভ্যন্তরীণ চলনশীলতার বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য : Davis, *Population of India and Pakistan*, অধ্যায় ১২-১৪।

৩০। ঐ, পৃ. ১০৯-১০।

৩১। Zachariah, *A Historical Study*, পৃ. ২০০-১১।

৩২। Morris, *Emergence of an Industrial Labour Force*, পৃ. ৬২-৪

৩৩। উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য : Hari Har Dayal, 'Agricultural Labourers : An enquiry into their conditions in the Unao District' in Radhakamal Mukherjee (ed), *Fields and Farms in Oudh* (কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ, ১৯২৯)। বোম্বাই-এ শ্রমিকদের কারখানায় কাজ নিয়ে বাইরে থেকে আসার সম্ভাবনা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনুসন্ধান সামান্যই হয়েছে। H. H. Mann ও N. V. Kanitkar (*Land and Labour in a Deccan Village, Study*

No. 2, লন্ডন ও বোম্বাই, ১৯২১, পৃ. ১৫৮-৯) জানিয়েছেন তাঁদের অনুসন্ধান-করা গ্রাম (Jategaon Budruk) থেকে বহু সংখ্যায় শ্রমিক বোম্বাই ও অন্যান্য বড় শিল্প-কেন্দ্রে গমন করেছিল অত্যন্ত অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত এবং তজ্জনিত অর্থনৈতিক দুর্দশার কারণে।

৩৪। 'Agricultural Labour in India : A Regional Analysis with Particular Reference to Population Growth', *Economic Development and Cultural Change*, খণ্ড ২, জুলাই ১৯৬৩।

৩৫। R. K. Das, *Plantation Labour in India* (কলকাতা, ১৯৩১), অধ্যায় ২-৪, এবং S. K. Bose, *Capital and Labur in the Indian Tea Industry* (বোম্বাই, ১৯৫৪), অধ্যায় ৮-১০।

৩৬। B. Shiva Rao, *The Industrial Worker in India* (লন্ডন, ১৯৩৯), অধ্যায় ৯।

৩৭। R. C. on Labour in India, *Report* (PP 1930-1, XI), পৃ. ৩৭৬-৮।

৩৮। বিহার ও উড়িষ্যার সরকার মন্তব্য করেছিল, কোনো দরিদ্র শ্রমিক আবাদের (Plantations) কাজ একবার ধরলে তা আর ছাড়তে পারত না। 'আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উৎকর্ষের কথা এমন কাউকে শোনানো নিছক ঠাট্টা যার একমাত্র উপায় পায়ে হাঁটা। R. C. on Labour in India : *Evidence*, খণ্ড ৪, অংশ ১, *Bihar and Orissa with Coalfields* (লন্ডন, ১৯৩১), পৃ. ১১।

৩৯। *ঐ*, খণ্ড ৬, অংশ ১, Assam and the Dooars পৃ. ৫, ২৩-৫, এবং ২৭-৩৫।

৪০। *ঐ*, পৃ. ৪।

৪১। *ঐ*।

৪২। Gov. India, Department of Revenue and Agriculture, *Emigration*, October 1900, *A Proceedings*, সংখ্যা ১৫ ও ১৬, পৃ. ৭৯৬।

৪৩। *Report of the Labour Enquiry Commission 1895* (Bengal) (কলকাতা, ১৮৯৬), পৃ. ৭-১৬।

৪৪। পূর্ব ভারতের খনিগুলিতে শ্রমের যোগান সম্পর্কিত তথ্যাদির মূল উৎস : (a) Gov. India, Department of Mines, *Reports of the Inspection of the Mines in India* (বার্ষিক; ১৯০১ থেকে, *Report of the Chief Inspector of Mines in India*), (b) *Report of the Labour Enquiry Commission* (Bengal) (কলকাতা, ১৮৯৬), (c) *Census of India, 1921*, খণ্ড ৫, *Bengal* অংশ ২, (কলকাতা, ১৯২৩) এবং খণ্ড ৭, *Bihar and Orissa*, অংশ ২, (পাটনা, ১৯২৩), সারণি ২২, অংশ ৪ ও ৫ উভয় খণ্ডে, (d) RC on Labour in India : *Evidence*, খণ্ড ৪, অংশ ১ *Bihar and Orissa with Coalfields* (লন্ডন, ১৯৩১), পৃ. ৫-৯। খনিতে শ্রমিক নিয়োগের অবলম্বিত পদ্ধতিগুলির বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য : ঐ, পৃ. ৯-১১। আরও দেখুন Buchanan, *Development of Capitalistic Enterprise* পৃ. ২৭০-৩।

৪৫। IJMA, *Report of the Committee for the year ended 31st December, 1905* (কলকাতা, ১৯০৬), পৃ. iii।

৪৬। A. R. Murray, 'Note on Industrial Development of Bengal', *Evidence (Report of IIC)*, খণ্ড ৬, *Confidential Evidence* (কলকাতা, ১৯১৮), পৃ. ১০৩-১৩, বিশেষ করে পৃ. ১১১.

৪৭। *Census of India, 1921*, খণ্ড ৫, *Bengal*, অংশ ২ (কলকাতা, ১৯২৩), সারণি ২২, অংশ ৪ ও ৫।

৪৮। 'বাঙালি শ্রমিক বেশি মজুরি দাবি করে,' 'সে পাট উৎপন্ন করে' এবং পাটের দাম অন্য পণ্যের তুলনায় বেশি (যুদ্ধের আগে)—এই সব কারণে পাটকলে নিয়েজিত শ্রমিকদের মধ্যে বাঙালি শ্রমিকদের অনুপাত কমে যাওয়ার কারণ হিসাবে এই বিষয়গুলি ITC-র অনুসন্ধান-কালে উল্লেখ করা হয়েছিল। দ্রষ্টব্য : *Evidence (Report of IIC)*, খণ্ড ৬, *Confidential Evidence*, পৃ. ১১৬-১৭।

৪৯। Morris, *Emergence of an Industrial Labour Force*, পৃ. ৬৩।

৫০। R C on Labour in India, *Evidence* খণ্ড ১, অংশ ১, *Bombay Presidency* (লন্ডন, ১৯৩১), পৃ. ৪ ও ২৭৫।

৫১। ১৮৮৮-তে এবং আবার ১৮৯২-তে J. N Tata শ্রমিক নিয়োগের উদ্দেশ্যে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব করেন, কিন্তু Bombay Millowners' Association এই বিষয়ে কিছু করতে নারাজ হয়। দ্রষ্টব্য : Morris, *Emergence of an Industrial Labour Force*, পৃ. ৫৪-৫।

৫২। দ্রষ্টব্য : Davis, *Population of India and Pakistan*, অধ্যায় ১৪, এবং Zachariah, *A Historical Study*।

৫৩। R. K. Das, *Plantation Labour in India* (কলকাতা, ১৯৩১), অধ্যায় ২ ও ৪, এবং *Resolution on Immigrant Labour in Assam for the year ended 1920-21* (শিলং, ১৯২১)। আসামে বসবাসের উদ্দেশ্যে আগমনকারী ব্যক্তির সংখ্যা (বন্ধনীর মধ্যে বছর উল্লেখ করা হয়েছে) : ৪৮,১৩০ (১৯১৬-১৭), ১৯,৪০৭ (১৯১৭-১৮), ২২২,১৭১ (১৯১৮-১৯) এবং ১০২, ০৮৯ (১৯১৯-২০)।

৫৪। *Reports on Immigrant Labour in the Province of Assam for 1922-3 and 1923-4* (শিলং, ১৯২৩ ও ১৯২৪), এবং R C on Labour in India, *Evidence*, খণ্ড ৬, *Assam and the Doars* (লন্ডন, ১৯৩১), পৃ. ৩-৪। ১৯১৮-১৯ ও ১৯১৯-২০-তে চা শিল্পে বিপুল সংখ্যায় শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছিল, কিন্তু ১৯২০-২১ ও ১৯২১-২-এ শিল্পটিতে মন্দা আসে এবং শ্রমিকের চাহিদা কমে যায়। উন্নতি আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পটির পক্ষ থেকে সরকারকে শ্রমের ঘাটতিজনিত সমস্যার কথা জানানো হয় এবং সরকারও তাতে সাড়া দেয়। আসামের সরকার ১৯২২-২৩-এর 'Resolution on Immigrant Labour in Assam' মারফৎ জানায় যে চা শিল্পে চূড়ান্ত সমৃদ্ধি এসেছে। কিন্তু ফসল ভালো

হওয়ার ফলে জেলাগুলি থেকে শ্রমিক চা বাগানের কাজে কম সংখ্যায় আসছে। অন্যান্য শিল্পে শ্রমের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার ফলেও চাশিল্পে শ্রমের যোগানে টান পড়েছে। উপরোক্ত 'Resolution'-এ আরও জানানো হয়েছিল যে, আসামে শ্রমিকদের নিয়োগের উদ্দেশ্যে মাদ্রাজের সরকার সমগ্র মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিকে উন্মুক্ত করেছিল। এ-হেন সরকারি সালিশীর ফল বৃথা হয়নি। আসামে প্রচরণকারী শ্রমিকদের সংখ্যা ১৯২২-২৩-এ ছিল ২১,৬৫৪, ১৯২৩-২৪-এ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৪১,৮৬২-তে।

৫৫। ভারত সরকারের শিল্প ও শ্রম দপ্তর Imperial Economic Committee-কে দুর্ভিক্ষ ও পরিবহনের উন্নতির প্রভাব সম্পর্কে কিছু মনোগ্রাহী তথ্য পরিবেশন করেছিল। এই তথ্য থেকে প্রকাশ হয় যে চা শিল্পে আর্থিক মজুরি কৃষি-শ্রমিকের মজুরির তুলনায় বেশি ছিল না এবং এই কারণে শিল্পটি শ্রমিকের ঘাটতি পূরণের জন্যে দুর্ভিক্ষ বা স্বল্পোৎপাদনজনিত পরিস্থিতির উপর নির্ভর করতে বাধ্য হতো। দ্রষ্টব্য : Gov. India, Department of Industries and Labour : Interprovincial migration files ; File No. L-1420 of 1926, *Note on the Labour Position in the Assam Tea Gardens for the Imperial Economic Committee*, পৃ. ৩।

৫৬। Bengal National Chamber of Commerce-এর পক্ষ থেকে S. Ghose ও J. C. Mittra Indian Fiscal Commission (1921-2) -কে জানান যে বাংলায় কারখানার কাজে শ্রমের ঘাটতি নেই এবং কৃষি থেকে শ্রমিকদের কারখানার কাজে নিয়োগ করলে বাংলার কৃষি উৎপাদন কমবে না : *Evidence (Report of the Indian Fiscal Commission*, খণ্ড ২ (কলকাতা, ১৯২৩), পৃ. ৪০৫। Royal Commission on Labour in India-র কাছে বোম্বাইয়ের সরকার যে লিখিত সাক্ষ্য পেশ করে তাতে দেখানো হয়েছিল, শ্রমের যোগানের উপর মজুরির হ্রাস-বৃদ্ধির প্রভাব সামান্যই ছিল যেহেতু সাময়িক শ্রমের যোগান অব্যাহত থাকত এবং শ্রমিকরা বেকার হয়ে গেলে গ্রামে ফিরে যেত : RC on Labour in India, *Evidence*, খণ্ড ১, অংশ ১ (লন্ডন, ১৯৩১) পৃ. ৭৮-৯। দক্ষিণ ভারতের শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমের যোগানে কখনও ঘাটতি দেখা দেয়নি। মাদ্রাজ থেকে শ্রমের নীট্ প্রচরণ অব্যাহত ছিল ১৯০১ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত এবং তার পরিমাণ ক্রমাগত বেড়েছিল Zachariah, *A Historical Study*, পৃ. ২০৭। দক্ষিণ ভারতের শিল্পপতিরা সস্তায় শ্রম পাওয়ার সুবিধাকে সমর্থন করেন। উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য : *Issues advertised in the Times* সংখ্যা ১৫, জানুয়ারি-জুন ১৮৯৮, ২৩ শে মে ১৮৯৮ পৃ. ২১৭, Advertisement for the Anglo-French Textile Company Limited of Pondicherry। আরও দ্রষ্টব্য : Stanes and Company-র W. E. Winter and F. Stanes প্রদত্ত সাক্ষ্য, *Evidence (Report of IIC)*, খণ্ড ৩ (PP. 1919, XIX), পৃ. ৪৪৮-৫৪। উত্তরপ্রদেশও অন্যান্য অঞ্চলে শ্রমের নীট যোগানদার ছিল। Zachariah, *A Historical Study*, পৃ. ২০০। শ্রমের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে TISCO'র কোনো অসুবিধা হয়নি : RC on Labour in India, *Evidence*, খণ্ড ৪, অংশ ১ (লন্ডন, ১৯৩১), পৃ. ১৬০।

৫৭। A. R. Burnett-Hurst, *Labour and Housing in Bombay* (লন্ডন, ১৯২৫), অধ্যায় ৯।

৫৮। RC on Labur in India, *Evidence,* খণ্ড ১, অংশ ১ *Bombay Presidency* (লন্ডন, ১৯৩১), পৃ. ১০৩-৫।

৫৯। *ঐ,* খণ্ড ৫, অংশ ১, পৃ. ২৭১।

৬০। ঐ, খণ্ড ৫, অংশ ১,পৃ. ২৬১ এবং খণ্ড ৫, অংশ ২, পৃ. ১১৯।

৬১। *ঐ,* খণ্ড ৫, অংশ ১, পৃ. ১২৭।

৬২। Upper India Chamber of Commerce-এর পক্ষ থেকে P. Mukerjee, W. R. Taylor এবং Shri Ram প্রদত্ত সাক্ষ্য : *ঐ,* খণ্ড ২, অংশ ১, পৃ. ৭৫-৮১ এবং অংশ ২, পৃ. ১২৩-৩৩।

৬৩। *ঐ,* খণ্ড ৩, অংশ ১, পৃ. ১৩৫ ও ১৮৭।

৬৪। *ঐ,* খণ্ড ৫, অংশ ১, পৃ. ১২৮-৯।

৬৫। ১৯২০-২১-এ Buckingham ও Carnatic Mills-এ ধর্মঘটের কারণ ও ধারার বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য : Gilbert Slater : *Southern India* (লন্ডন, ১৯৩৬), অধ্যায় ২৯। মহাত্মা গান্ধীর কথায় Cornatic Mills-এর শ্রমিকরা কাজে যোগ দিল নিষ্ফল ধর্মঘটের পর।

৬৬। C. A. Myers, *Labour Problems in Industrialization of India* (কেম্ব্রিজ, ম্যাস, ১৯৫৮) পৃ. ৫৭-৬০; আরও দ্রষ্টব্য : R C on Labour in India, *Report* (PP. 1930-1, XI) পৃ. ৩৩৬-৭ এবং *Report of the Textile Labour Enquiry Committee,* খণ্ড ২ ; *Final Report* (বোম্বাই, ১৯৪০), পৃ. ৩৭০-১।

৬৭। ১৯০৮-এ তিলককে বন্দী করা হলে বোম্বাইয়ের কারখানা শ্রমিকরা ধর্মঘট করেন। দ্রষ্টব্য : L. A. Gordon, 'Social and Economic Conditions of Bombay workers on the eve of the 1908 strike', I. M. Reisner ও N. M Goldberg (eds.) , *Tilak and the Struggle for Indian Freedom* (নিউ দিল্লী, ১৯৬৬), পৃ. ৪৭১-৫৪৪।

৬৮। *Report of Cawnpore Textile Labour Inquiry Committee appointed by the Government of the United Provinces* (এলাহাবাদ, ১৯৩৮), পৃ. ৪০।

৬৯। Radhakamal Mukerjee, *The Indian Working Class* (বোম্বাই, ১৯৪৫), পৃ. ৩০৯; এবং R. P. Dutt, *India Today* (বোম্বাই, ১৯৪৯), পৃ. ৩৯৬।

৭০। রয়্যাল কমিশনের অনুসন্ধানকালেও যে বোম্বাইয়ের বস্ত্র শিল্পের শ্রমিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে বেকারত্ব ছিল তার প্রমাণ মেলে বোম্বাইয়ের সরকারের সাক্ষ্য থেকে : R C on Labour in India, *Evidence* ; খণ্ড ১, অংশ ১ (লন্ডন, ১৯৩১), পৃ. ১০ এবং পৃ ৭৮-৯।

৭১। দ্রষ্টব্য : Morris, *Emergence of an Industrial Labour Force,* অধ্যায় ১০।

৭২। Dutt, *India Today,* পৃ. ৩৯৫-৬; IJMA, *Report of the Committee for the year ended 31st December 1938* (কলকাতা, ১৯৩৯), পৃ. ৭২-৬। বোম্বাইয়ের Millowners' Association লেবার অফিসার হিসাবে R. G. Gokhale-কে নিয়োগ করে সরকারি লেবার অফিসারের সঙ্গে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে; দ্রষ্টব্য : R. C. James, 'Labour mobility, unemployment, and economic changes : an Indian case', *The Journal of Political Economy (JPE)*, খণ্ড ৬৭, সংখ্যা ৬, ডিসেম্বর ১৯৫৯, পৃ. ৫৪৯-৫৯; Morris, *Emergence of an Industrial Labour Force,* পৃ. ১২৫-২৭। IJMA তার প্রথম লেবার অফিসার হিসাবে ১৯৩৮-এ J. H. Mulcahy-কে (অবসর-প্রাপ্ত অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার অব পুলিস) নিযুক্ত করে; 'কমিউনিস্ট বিক্ষোভের' ভয়ে দ্বিতীয় লেবার কমিশনার হিসাবে S. Sinha-কে নিযুক্ত করা হয়। তিনি Bengal Civil Service থেকে অবসর নেন ঐ কাজে যোগ দেওয়ার জন্যে। দ্রষ্টব্য : IJMA, *Report of the Committee for the year ended 31st December 1938* (কলকাতা, ১৯৩৯), পৃ. ৭৬-৮০।

৭৩। Mukerjee, *The Indian Working Class,* পৃ. ১২২-৭।

৭৪। RC on Labour in India, *Evidence,* খণ্ড ৪, অংশ ১ (লন্ডন, ১৯৩১), পৃ. ১২২।

৭৫। *ঐ,* পৃ. ৬৭।

৭৬। *ঐ,* পৃ ৬৫-৭।

৭৭। Mukerjee, *Indian Working Class,* পৃ. ১৪৬-৭; S. Kaunappan, 'The Tata Steel Strike : Some Dilemmas of Industrial Relations in a Developing Economy', *JPE,* ৬৭ সংখ্যা ৫, অক্টোবর ১৯৫৯, পৃ. ৪৮৯-৫০৭, বিশেষত পৃ. ৫০১-৪।

৭৮। এই সূত্রে আরও দ্রষ্টব্য, J. Kuezynski, Condition of Workers (১৮০৮-১৯৫০)' V. B. Singh (ed), *Economic History of India,* ১৮৫৭-১৯৫৬ (বোম্বাই, ১৯৬৫), পৃ. ৬০৯-৩৭।

৭৯। অধ্যাপক Morris David Morris বোম্বাইয়ের বস্ত্র শিল্পে নিয়োজিত শ্রমের যোগান বৃদ্ধি ও শ্রমিক সংগঠন সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন তাঁর *Emergency of an Industrial Labour Force* গ্রন্থে। শ্রমের যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন বার-বার। কিন্তু তিনি বস্ত্রশিল্পে আর্থিক মজুরির আত্যন্তিক বৃদ্ধির বিষয়টি ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন নি অথবা দেখান নি তাঁর শ্রমের যোগানের পূর্ণ-স্থিতিস্থাপকতার ধারণার সঙ্গে মজুরি বৃদ্ধির বিষয়টি কী করে মেলে। তাঁর মতে, বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে রীতিবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন' ব্যর্থ হয়েছে (ঐ, পৃ. ১৯৬-৭)। প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধির বিষয়টি ব্যাখ্যার চেষ্টা করলে তিনি হয়ত শ্রমিক ইউনিয়নের ব্যর্থতার ব্যাপারে এত নিশ্চিত থাকতেন না। শ্রম-যোগানের পূর্ণ-স্থিতিস্থাপকতার সঙ্গে বর্ধিষ্ণু প্রকৃত মজুরির ধারণা সঙ্গতিপূর্ণ, কিন্তু বিষয়টি ব্যাখ্যার জন্যে শ্রমের বাজারের যে সূক্ষ্ম নক্সার প্রয়োজন তা Morris-এর গ্রন্থে নেই।

৮০। S. H. Fremantle, 'The Problem of Indian Labour Supply', *JRSA*, ৫৭, সংখ্যা ২,৯৪৭, ১৪ই মে ১৯০৯, পৃ. ৫১০-১৯।

৮১। *ঐ*, পৃ. ৫২১ (T. J. Bennett-এর আলোচনা)।

৮২। এই সূত্রে দ্রষ্টব্য, Buchanan, *Development of Capitalistic Enterprise*, অধ্যায় ১৫ ও ১৭।

৮৩। অধ্যাপক T. W. Schultz ১৯১৮-১৯-এর ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীকে (influenza epidemic) একটি test case হিসাবে গণ্য করে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে ভারতে শ্রম উদ্বৃত্ত নয়। Schultz-এর ভ্রান্তি নিপুণভাবে প্রদর্শিত হয়েছে নিম্নোক্ত প্রবন্ধে : A. K. Sen, 'Surplus Labour in India : A Critique of Schultz's Statistical Test,' *Economic Journal* খণ্ড ৭৭, মার্চ ১৯৬৭, পৃ. ১৫৪-৬১।

৮৪। এই সিদ্ধান্তের যথাযথ প্রমাণের জন্যে দ্রষ্টব্য : K. J. Arrow, 'Towards a Theory Price Adjustment' in Moses Abramovitz and others, *The Allocation of Economic Resources* (স্ট্যানফোর্ড, ক্যালিফোর্নিয়া, ১৯৫৯) পৃ. ৪১-৫১।

৮৫। *Report of a Committee appointed by the Secretary of State for India to inquire into the system of State Technical Scholarships established by the Government of India in 1904* (PP. 1913, XLVII), পৃ. ২৫।

৮৬। এই গ্রন্থের অধ্যায় ৮ দ্রষ্টব্য।

৮৭। ভারত সরকারের শিক্ষানীতির সংক্ষিপ্ত বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য : J. R. Cunningham, 'Education' in O'Malley, *Modern India and the West;* ভারতে কারিগরি শিক্ষার সারাংশের জন্যে, R. I. Crane, 'Technical Education and Economic Development in India before World War I', C. A. Anderson ও M. J. Bowman (eds.), *Education and Economic Development* (লন্ডন, ১৯৬৬), পৃ. ১৬৭-২০১, এবং A. T. Weston, 'Technical and Vocational Education', *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, খণ্ড ১৪৫ (১৯২৯), পৃ. ১৫১-৬০।

৮৮। দ্রষ্টব্য : *Report and Correspondence relating to the expediency of maintaining the Royal Indian Engineering College* (PP. 1904, LXIV), পৃ. ৬৪৪-৫, ৬৪৯-৫১, এবং ৬৬৫-৬।

৮৯। 'The Indian Ordnance Factories and Indian Industries,' *JRSA*, ৭২, ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯২৪, পৃ. ১৮১।

৯০। F. S. Grimston, 'The Indian Ordnance Factories and their Influence on Industry' *JRSA* ৭৯, সংখ্যা ৪১০৩, ১০ই জুলাই ১৯৩১, পৃ. ৭৭৭-৮৯, এবং আলোচনা, পৃ. ৭৮৯-৯২ (বিশেষত পৃ. ৭৭৮ ও ৭৯০)।

৯১। Titaghur Paper Mills Co. Ltd.-এর পক্ষে থেকে W. L. Carey ও J. Thomson প্রদত্ত মৌখিক সাক্ষ্য (ডিসেম্বর ৪, ১৯১৬) : *Evidence (Report of IIC)*, খণ্ড ৬, *Confidential Evidence*, পৃ. ৩৯-৪৮, বিশেষত পৃ. ৪২-৫।

৯২। L. Zutshi'র আলোচনা, Beryl M. le P. Power, 'Indian Labour Conditions' *JRSA*, ৮০, সংখ্যা ৪১৫৩, ২৪ জুন ১৯৩২, পৃ. ৭৮০-১।

৯৩। দ্রষ্টব্য সাক্ষ্য : I. S. Mackenzie ও S. Deb, *Evidence (Report of IIC)* (PP 1919, XIX), পৃ. ৩৪-৫১ এবং (PP 1919 XVIII), পৃ. ৫০।

৯৪। দ্রষ্টব্য : N. Rosenberg, 'Capital goods, technology and economic growth' এবং 'Technological change in the machine tool industry, 1840-1910,' *Journal of Economic History*, খণ্ড ২৩, ১৯৬৩, পৃ. ৪১৪-৪৩।

৯৫। S. B. Saul, 'The Engineering Industry' in D. H. Aldcroft (ed.), *The Development of British Industry and Foreign Competition, 1875-1914* (লন্ডন, ১৯৬৮), পৃ. ১৯৬।

৯৬। দ্রষ্টব্য : ITB, *Evidence (Report on Steel)*, ১৯২৪, খণ্ড ২, পৃ. ২৮০। রেল ইঞ্জিন শিল্পের বিকাশে ভারত সরকারকে সাহায্য করতে অস্বীকার করার পেছনে প্রত্যক্ষভাবে 'অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ' কাজ করেছে ব্রিটেনের ইঞ্জিন তৈরির ফার্মগুলি ব্যবসায়িক স্বার্থের মাধ্যমে। দ্রষ্টব্য : F. Lehmann, 'Great Britain and the Supply of railway locomotives to India : A Case Study of "Economic Imperialim", "*The Indian Economic and Social History Review*, ২, অক্টোবর ১৯৬৫।

৯৭। Sumit Sarkar, 'Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908' (thesis approved by the University of Calcutta in 1969 for the degree of D. Phil.), অধ্যায় ৩, এবং Haridas ও Uma Mukherjce, *The Origins of the National Education Movement* (কলকাতা, ১৯৫৭), অংশ ১, অধ্যায় ২ এবং ৩।

৯৭(ক) দ্রষ্টব্য : A. G. Clow, *The State and Industry* (ভারত সরকার, কলকাতা, ১৯২৮), অধ্যায় ৫।

৯৮। *Progress of education in India 1920-7*, খণ্ড ১, *Fifth quinquennial review* (PP 1909, LXIII, পৃ. ৩৪-৫।)

৯৯। সিভিল সার্ভিসে ও রেলে ভারতীয়দের নিয়োগ সংক্রান্ত পরিস্থিতি আলোচিত হয়েছে এই গ্রন্থের অধ্যায় ৬-এ।

১০০। ১৯২১-২৩-এ TISCO-র Technical Institute-এ একজন ছাত্রের জন্যে প্রশিক্ষণের মাসিক ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২৫০ টাকা। কিন্তু এই ব্যয় ছিল অস্বাভাবিক রকমের বেশি। তার কারণ, এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তখন সবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং

সুযোগের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভবপর করে তোলার মতো অবস্থা তখনও তার আসেনি। দ্রষ্টব্য : ITB, *Evidence (Report on Steel)* (কলকাতা, ১৯২৪), খণ্ড ১, Statement No. IX, পৃ. ১২১-২।

১০১। Mehta, *The Cotton Mills of India,* অধ্যায় ৮ ; পৃ. ১০০-১৩, বিশেষত পৃ. ১০৬।

১০২। দাবি করা হয়েছিল, দারিদ্র্যের কারণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার খাতে সরকারি ব্যয় কম ছিল এবং এর আরও প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হতো সরকারের রাজস্বের পরিমাণের স্বল্পতা। এই সূত্রে রয়্যাল কমিশন অন লেবার-এর সভ্য এবং শ্রম মন্ত্রণালয়ের প্রধান অফিসার (১৯৩২) Miss Power-এর মন্তব্য স্মর্তব্য : 'সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টি শুধুমাত্র একটি রাজস্ব বিষয়ক প্রশ্ন নয়, এটি উৎসাহ, উদ্যম এবং মনুষ্যত্বে প্রকৃত বিশ্বাসেরও প্রশ্ন : এবং এই প্রসঙ্গে তিনি বলতে চান, 'রাশিয়ার দিকে তাকাও'। দ্রষ্টব্য : আলোচনা নিম্নোক্ত প্রবন্ধের শেষে : Beryl, M. le P. Power. 'Indian Labour Conditions', পৃ. ৭৮২। বস্ত্র শিল্পের কারখানায় শ্রমের দক্ষতার উপর নিরক্ষতার প্রভাব আলোচিত হয়েছে এই গ্রন্থের অধ্যায় ৭-এ।

অনুবাদক : মনোজ কুমার সান্যাল ও মন্দিরা সান্যাল

৬

মূলধন ও উদ্যোগ সরবরাহ

অর্থনৈতিক প্রসার বা *গ্রোথ* সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহকারীদের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে প্রক্রিয়াটির হোতা হিসাবে। কিন্তু উৎপাদনের প্রত্যক্ষ পরিবেশ এবং উৎপাদনে যারা জড়িত তাদের নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসাবে মূলধনের তাৎপর্যকে যদি অস্বীকার করা হয় এবং পুঁজির ভূমিকাকে যদি কেবলমাত্র উৎপাদনের একটি উপাদান হিসাবে দেখা হয়, তা হলে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পুঁজির মালিকের আর কোনো অপরিহার্য ভূমিকা থাকে না। তাই তাকে আবার আলোচনায় নিয়ে আসতে হয় চোরাপথে পরিচালক, সংগঠক বা উদ্যোক্তার ভূমিকায়।[১] ভারতসহ অনুন্নত দেশগুলিতে মূলধনের বিশাল ঘাটতি আছে বলে ধরে নেওয়া হয়। শুধুমাত্র সমার্থবাচক অর্থেই যে এসব দেশে হিসাব করা মূলধনের ভিত্তিতে এটা ধরা হয় তাই নয়, কার্য-কারণগত অর্থেও ধরা হয় যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজনীয় মূলধন এরা সরবরাহ করতে পারবে না। এই অক্ষমতার অনুমিত কারণ হলো দুটি : সাধারণ মানুষের চূড়ান্ত দারিদ্র্য এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগে ধনীদের অর্থ বিনিয়োগে অনীহা। এই জাতীয় কিছু ব্যাখ্যায় প্রভাবিত অর্বাচীন সমাজতত্ত্বে এও দাবি করা হয় যে মূলধনের একমাত্র কার্যকরী সরবরাহকারী হলো ব্যবসায়ীরা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সাম্রাজ্যিক শক্তি দ্বারা সংরক্ষিত সামন্ততান্ত্রিক বা অন্য প্রাক-ধনতান্ত্রিক উচ্চ-আয়-গোষ্ঠীগুলির সাধারণভাবে গঠনমূলক কোনো ভূমিকা থাকে না। এই ভাবনা অনুসারে ভারতীয় অর্থনীতিতে একমাত্র জঙ্গম উপাদানটি ছিল শিল্পগত উৎপাদনে ঝুঁকি বহনে আগ্রহী ও নতুন কিছু প্রবর্তনে সক্ষম বিদেশী উদ্যোগ।[২] বিষয়টিকে সাধারণত ব্যাখ্যা করা হয় এই বলে যে পার্সীরা ছিল একটি বিশেষ সংখ্যালঘু গোষ্ঠী এবং তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সমাজের অবশিষ্ট অংশের বিভেদমূলক আচরণের ফলেই তারা উৎকর্ষতা অর্জন করেছিল। অথবা, ভারতীয়দের সঙ্গে পার্সীদের সংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের মূলগত পার্থক্যও তাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হতে পারে।[৩]

এই অধ্যায়ে আমরা উদ্যোগ ও মূলধনের যোগানসমূহ বিশ্লেষণ করে উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করব সেইসব অধিগম্য বিষয়গুলি যেগুলি প্রভাবিত করেছে আলোচ্য সরবরাহ ব্যবস্থাটিকে। বিষয়গুলি ছিল এই রকম : গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের ঔপনিবেশিক সম্পর্ক, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবসায়ী বা বাণিজ্যিক শ্রেণীগুলির উপর ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবের মাত্রাগত তারতম্য, বিভিন্ন ব্যবসায়ী শ্রেণীর সঙ্গে প্রাক-ধনতান্ত্রিক অবশেষস্বরূপ উচ্চ-আয় সম্পন্ন শ্রেণীর যোগাযোগ এবং শিল্পে তাদের ভূমিকা। ভারতীয়দের শিল্পে অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীদের তৈরি বাধাগুলিও আমরা পরীক্ষা করব। অর্থনীতিবিদরা (উন্নত অর্থনীতি প্রসঙ্গে) মনোযোগ দিয়েছিলেন অন্তরায় সৃষ্টিকারী এই বিষয়গুলির প্রতি :

কাঁচামালের উৎসগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ, পরিবহনের উপর নিয়ন্ত্রণ, বন্টনের খাতগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদনের মাত্রাজনিত ব্যয়-সংকোচন এবং প্রাথমিক মূলধনের প্রয়োজন।[৫] কিন্তু প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী গোষ্ঠীরা সহযোগী নির্বাচনে এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের নির্মূল করতে রাজনীতিক, সামাজিক ও জাতিগত উপাদানগুলিকে কীভাবে ব্যবহার করে সে বিষয়ে তাঁরা মাথা ঘামাননি। ব্রিটিশদের সহযোগী হিসাবে ভারতীয় গোষ্ঠীদের নির্বাচনে এবং ভারতে ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীদের তুলনামূলক কর্মসম্পাদনে শাসক ও শাসিতদের মধ্যে রাজনৈতিক, জাতিগত এবং সামাজিক সম্পর্কগুলি প্রকৃতপক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। অতএব, মূলধন ও উদ্যোগ সরবরাহের বিশ্লেষণে ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীদের মধ্যে সহযোগিতা ও দ্বন্দ্বের কয়েকটি সুস্পষ্ট দিক আমাদের আলোচনা করতে হচ্ছে।[৫]

৬.১ ভারতে ব্যক্তিগত বিদেশী বিনিয়োগ, ১৯০০-১৪

বিশ শতকের শুরুতে আধুনিক কৃৎকৌশল বা সাংগঠনিক পদ্ধতিগুলি ব্যবহারকারী ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মূলধনের অধিকাংশই ছিল বিদেশী —প্রধানত ব্রিটিশ—নিয়ন্ত্রণে। ১৯৩৯ নাগাদ ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণাধীন আধুনিক উদ্যোগগুলিতে নিয়োজিত মূলধনের অনুপাত যথেষ্ট বেড়ে গেলেও পাটকল, চা বাগিচা ও কয়লাখনির মতো প্রধান শিল্পগুলিতে বিদেশী সংস্থাগুলির কর্তৃত্ব বজায় ছিল।[৬] অতএব ভারতে ইয়োরোপীয়দের ব্যক্তি-মালিকানাধীন শিল্পে মূলধনের উৎস, ইয়োরোপীয়দের নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখার উপায় এবং তাদের কাছ থেকে, বিশেষত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে, সংস্থা ও শিল্পগুলির উপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান জরুরি হয়ে পড়ে। আলোচ্য সময়ের গোড়ার দিকে অথবা শেষের দিকে ব্যবসায় নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতার প্রশ্নে ইয়োরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য ছিল কিনা তাও আমাদের দেখার বিষয়।

স্থায়ী জনবসতি ছিল এমন সব উপনিবেশগুলির মতো ভারতবর্ষেও বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ মূর্ত হয়েছিল সরকারকে দেওয়া ঋণে, অথবা রেলওয়েজে ও সাধারণের স্বার্থবাহী শিল্পে (public utilities)। বাকি পুঁজির অধিকাংশই লগ্নী হয়েছিল রপ্তানি-বাজারগুলির উদ্দেশ্যে গঠিত খনিজ অথবা বাগিচা শিল্পে।[৭] ভারতের ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল পাট শিল্পে ব্রিটিশ বিনিয়োগ। অবশ্য পাটকলগুলি দেশীয় উপকরণ ব্যবহার করলেও তাদের উৎপাদনের ৯০ শতাংশ রপ্তানি হতো এবং তার প্রধান অংশ যেত নতুন জনবসতি গড়ে উঠেছিল যে উপনিবেশগুলিতে।

ইয়োরোপীয়দের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত উদ্যোগগুলিতে নিয়োজিত মূলধন গঠিত হয়েছিল তাদের অর্জিত মুনাফার পুনর্বিনিয়োগের মাধ্যমে এবং ভারতে বসবাসকারী ইয়োরোপীয়দের কাছ থেকে পুঁজি সংগ্রহ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ভারতীয়রা ঐ সব উদ্যোগগুলিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পুঁজি সরবরাহ করেনি। ব্যক্তি-মালিকানাধীন উদ্যোগগুলিতে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ইয়োরোপ (ব্রিটেন) থেকে ভারতে সম্পদের প্রকৃত স্থানান্তর (real transfer)-ও সামান্যই ঘটেছিল। নিজেদের মালিকানাধীন সংস্থাকে কোম্পানিতে রূপান্তরিত করার প্রবণতা দেখা

যেত। এই কারণে ১৮৯৮-৯ থেকে ১৯১৩-১৪ পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে (১৯০০-১ও ১৯০৫-৬, এই দুই বছরের ব্যতিক্রম ছাড়া) ভারতে ইংরেজদের 'ব্যক্তিগত বিনিয়োগের' (শেয়ার-বাজার বহির্ভূত) হার, পণ্ডিতের হিসাবে—ঋণাত্মক ছিল।[৮] পণ্ডিত ইঙ্গিত দিয়েছেন,[৯] ১৯০৫-৬-র পর থেকে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এই পরিস্থিতির একটি কারণ হতে পারে, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। ইয়োরোপীয়দের ভারতে বিনিয়োগে প্রণোদিত করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছিল, এই বিষয়টি বিবেচনা করে থিয়োডর মরিসন ১৯১০-এ বলেছিলেন যে, ১৮৯৯থেকে ১৯০৯ সময়সীমার মধ্যে তাদের বিনিয়োগ ২১ মিলিয়ন স্টার্লিং পাউন্ড ধরলে তা হবে 'বেপরোয়া' পরিমাপ।[১০] এই পরিমাপে ভারতে বসবাসকারী ব্রিটিশ নাগরিকদের দ্বারা প্রেরিত টাকাকড়ির হিসাব ধরা হয়নি। মরিসনের গ্রন্থের পর্যালোচনায় জন মেয়নার্ড কেন্‌স্ সিদ্ধান্ত করেন :

> ১৮৯৯ থেকে ১৯০৯, এই দশ বছরে ভারতের ব্যবসায়ে বা কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োজিত ব্যক্তিগত মূলধনের দরুন বিদেশকে প্রদেয় সুদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়েছিল উক্ত সময়কালে সংঘটিত ব্যক্তিগত মূলধনের নতুন বিনিয়োগের দ্বারা। ... এই দশ বছর সময়সীমায় ব্যক্তিগতভাবে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ, আমার হিসাবে, বছরে ৪০ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ পাউন্ডের (বণিক ও ব্যাঙ্কারদের বাণিজ্যিক মূলধন সহ) মধ্যে ছিল এবং পূর্ববর্তীকালের ব্যক্তিগত বিনিয়োগের দরুন প্রদেয় সুদের পরিমাণও ঐ রকম ছিল।[১১]

পণ্ডিতের করা ভারত ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে মূলধন হস্তান্তরের পরোক্ষ হিসাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং ইমলার পর্যবেক্ষণের অনুরূপ। ইমলার মতে, ১৭৯৬ থেকে ১৯১৩-এর মধ্যে বিদেশে ব্রিটিশ নাগরিকদের বিনিয়োগ 'কেবলমাত্র দৃশ্য বাণিজ্য ও সেবামূলক বাণিজ্যের ঘাটতিই মেটায়নি, নতুন বিনিয়োগের জন্যে প্রয়োজনীয় উদ্বৃত্তও দিয়েছে'।[১২]

প্রশ্ন করা হয়ত যথার্থ, কেন ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্পে আরও বেশি ব্রিটিশ মূলধনের বিনিয়োগ ঘটেনি? ম্যাথু সাইমনের একটি সাম্প্রতিক হিসাব অনুসারে ঋণপত্রে বা শেয়ারে ব্রিটিশ বিনিয়োগের (portfolio investment) ১৪ শতাংশ গেছে এশিয়ায়, ১৭ শতাংশ দক্ষিণ আমেরিকায়, ১১ শতাংশ আফ্রিকায়, ১১ শতাংশ অস্ট্রেলেশিয়ায়, ১৩ শতাংশ ইয়োরোপে এবং ৩৪ শতাংশ উত্তর আমেরিকায়। রাজনৈতিক অবস্থা অনুসারে দেশগুলিকে সাজিয়ে সাইমন হিসাব করে দেখিয়েছেন যে মোট নতুন পোর্ট ফোলিও বিনিয়োগের মাত্র ৪০ শতাংশ গিয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলিতে।[১৩] এই প্রসঙ্গে যে যুক্তিটি প্রথমেই মনে আসে তা হলো, ভারতে চাহিদা সীমায়িত ছিল চূড়ান্ত দরিদ্রের দ্বারা।[১৪] এই যুক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় কেন উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলেশিয়ায় বিনিয়োগ প্রশ্রয় পেয়েছিল, কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকায় বিনিয়োগ সংঘটনের ব্যাখ্যা যুক্তিটি থেকে মেলে না। লাতিন আমেরিকায় ব্রিটিশ জনসাধারণের বিনিয়োগ একেবারেই লাভজনক হয়নি। সেখানে সরকারগুলি ছিল ঋণ পরিশোধে অক্ষম এবং প্রজাতন্ত্রগুলি ছিল যুদ্ধ-প্রবণ।[১৫] ভারতে ব্রিটিশ বিনিয়োগের অপেক্ষাকৃত নিচু স্তরের ব্যাখ্যা এই বিষয়গুলির মধ্যে পাওয়া যেতে পারে : (ক) দেশীয় শিল্পজাত পণ্যের চাহিদা দারিদ্র্যের কারণে এবং অবাধ বাণিজ্যের সাম্রাজ্যিক নীতি অনুসরণের ফলে অবনত ছিল। এই অবাধ বাণিজ্যের নীতি তখন অধিকাংশ দেশ, এমনকি ব্রিটিশ ডোমিনিয়নগুলিও, বর্জন করছিল। (খ) ভারতের মুনাফালভ্যতা সম্বন্ধীয় পরিস্থিতির খবরাখবর ইংরেজরা পেত এবং এদেশের (এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত অশ্বেতাঙ্গ

অধ্যুষিত দেশগুলির) ভবিষ্যতের বৈষয়িক নীতির উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষাকৃত বেশি থাকার কথা, অতএব ফাট্‌কা বিনিয়োগের সুযোগ ছিল কম। (গ) ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ ব্যবসায়ী সংস্থাগুলি ইতিমধ্যেই উপকরণ-যোগানের উৎসগুলির ও তাদের বাজারের উপর কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করেছিল, অতএব ব্রিটেন থেকে ভারতে ব্রিটিশ সংস্থাগুলি কর্তৃক মূলধনের প্রকৃত হস্তান্তর ঘটানোর সুযোগ ও প্রয়োজন কম ছিল।

আমাদের আলোচ্য সময়ে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্পে বিদেশী মূলধনের বিনিয়োগ ঘটত প্রধানত ভারতে বসবাসকারী ব্রিটিশ নাগরিকদের পরিচালনাধীন কোম্পানিগুলির মারফৎ। কোম্পানিগুলির কোথায় রেজিস্ট্রি হয়েছিল সেই তথ্য থেকে পাট, চা ও কয়লার মতো ইয়োরোপীয় নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত কোম্পানিগুলি সম্পর্কে উপরোক্ত সিদ্ধান্তে আসা যায়। ১৮৯৭-র পরে যে-সব চটকল চালু হয়েছিল তাদের অধিকাংশ ভারতে রেজিস্ট্রীকৃত।[১৬] ১৯১১-এ ভারতীয় কয়লা শিল্পে ১২৮-টি যৌথ-মালিকানাধীন কোম্পানি ছিল, এগুলির মধ্যে ৫-টি বাদে সবই ছিল ভারতে রেজিস্ট্রীকৃত।[১৭] আপাতদৃষ্টিতে চা শিল্পের পরিস্থিতি ভিন্ন রকম মনে হয়। ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য অনুসারে ১৯১৪-এ ভারতে চা উৎপাদনকারী যৌথ-মালিকানাধীন কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োজিত মোট আর্থিক মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩০ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা, তার মধ্যে মাত্র(প্রায়) ৪ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা ভারতে রেজিস্ট্রীকৃত কোম্পানিগুলির এবং বাকি সবই ছিল স্টার্লিং কোম্পানিগুলির।[১৮] প্রসঙ্গত দুটি বিষয় লক্ষ্য করা দরকার : প্রথমত, ভারতের বাগিচাগুলি অনেকাংশেই ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছিল এবং সেগুলি পরিচালিত হতো ম্যানেজিং এজেন্সি হাউস বা ব্যক্তিগত বাগিচা মালিকদের দ্বারা। বাগিচাগুলি যৌথ মালিকানার অধীনে আসে অনেক পরে। দ্বিতীয়ত, একটি কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন ভারতে না যুক্তরাজ্যে হবে, এই বিষয়টি নির্ভর করত ম্যানেজিং এজেন্টদের সুবিধা-অসুবিধার উপর, এবং স্টার্লিং রেজিস্ট্রেশন হওয়ার অর্থ এই নয় যে বিনিয়োজিত মূলধনের অনেকটা অংশ ভারতের বাইরে অর্জিত হয়েছে। বাগিচাগুলি সাধারণত তৈরি করত ভারতে ব্যবসায় লিপ্ত কোনো একটি সংস্থা অথবা কোনো আবাদকারী যে পরবর্তীকালে কার্যকরী মূলধন ও অতিরিক্ত স্থির মূলধনের জন্যে কোনো ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসের সন্ধান করত।[১৯] কোনো কোনো সময়ে আবাদকারী বাগিচা তৈরি করার পরে তা বেশি মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে ম্যানেজিং এজেন্সি হাউস বা যৌথ-মালিকানাভুক্ত কোম্পানিকে বিক্রি করে দিত। অনেক সময়ে কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার ছিল, কেননা অধিকাংশ মূলধনই থাকত এজেন্সি প্রতিষ্ঠানের অংশীদার বা তাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের হাতে। ভারতে চা বাগিচায় জড়িত অধিকাংশ ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসই ভারতে চা শিল্পের বিকাশের সাথে সাথে গড়ে উঠেছে, কিম্বা অন্য ক্ষেত্রে টাকা রোজগার করে অন্যান্য উদ্যোগের সঙ্গে চা ব্যবসায় লিপ্ত হয়েছে। এই শতাব্দীর শুরুতে মালিকদের উদাহরণ হিসাবে কলকাতার ডানকান ব্রাদার্স কোম্পানি, উইলিয়ামসন ম্যাগর অ্যান্ড কোম্পানি, অ্যালেন্স নরি অ্যান্ড কোম্পানি এবং ড্যাভেন পোর্ট অ্যান্ড কোম্পানির নাম করা যায়। দ্বিতীয় ধরনের সংস্থার উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় অ্যানড্রু ইউল অ্যান্ড কোম্পানি, শ ওয়ালেস অ্যান্ড কোম্পানি, জার্ডিন স্কিনার অ্যান্ড কোম্পানি, এবং জেম্‌স্ ফিন্‌লে অ্যান্ড কোম্পানির চা শিল্পে অনুপ্রবেশের ঘটনা।[২০]

জেম্‌স্ ফিন্‌লে অ্যান্ড কোম্পানি কয়েকটি ব্রিটিশ ম্যানেজিং হাউসগুলির মধ্যে একটি যাদের মূল শিকড়গুলি ছিল গ্রেট ব্রিটেনে এবং যাদের কার্যকলাপ বড়টা পরিচালিত হতো

হোম, অর্থাৎ বিলাত থেকে তার থেকে কম মাত্রায় ভারত থেকে। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ দিকে তাদের ব্যবসায়িক আকর্ষণের এবং মুনাফার মূল উৎস গ্রেট ব্রিটেন থেকে সরে আসে ভারতে, বিশেষ করে যখন হুগলিতে ঐ সংস্থা একটি পাটকল (চাঁপদানি জুট কোম্পানি) প্রতিষ্ঠা করল এবং পাটের ব্যবসায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে থাকল। ভারত ও সিংহলে জেম্‌স্ ফিন্‌লে অ্যান্ড কোম্পানির নিয়ন্ত্রনাধীন চায়ের কোম্পানিগুলির গঠনের সময়কালে (১৮৯৬ থেকে ১৮৯৮-র মধ্যে) মূলধনের পরিমাণ ছিল ৪,৪৫৮,৪০০ পাউন্ড এবং এই শতাব্দীর শুরুতে তাদের বাগিচার আয়তন ছিল ৭৪,০০০ একর, নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ৭০,০০০। অন্য ম্যানেজিং হাউসের মতো জেম্‌স্ ফিন্‌লে অ্যান্ড কোম্পানি (ভারতের ফিন্‌লে, মিউয়ার অ্যান্ড কোম্পানি বা ফিন্‌লে, ক্লার্ক অ্যান্ড কোম্পানি) নীলকরদের আর্থিক ঋণ দিত। নীলের ব্যবসা পড়ে গেলে এই ম্যানেজিং হাউসটি চিনি উৎপাদনে নিয়োজিত হয় এবং প্রভূত পরিমাণে ম্যাঞ্চেস্টার থেকে থান কাপড় আমদানির ও ভারত থেকে কাঁচামাল রপ্তানির বাণিজ্য চালিয়ে যেতে থাকে। যে কয়েকটি ব্রিটিশ ম্যানেজিং হাউস তুলোকল শিল্পে অনুপ্রবেশ করেছিল জেম্‌স্ ফিন্‌লে অ্যান্ড কোম্পানি ছিল তাদের অন্যতম।[২০ক]

৬.২ ১৯১৪ সালের আগে ইয়োরোপীয় নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পগুলিতে মূলধন সরবরাহ

পাট বা কয়লার মতো শিল্পে দীর্ঘমেয়াদী বিদেশী মূলধনের উৎস সন্ধান করতে গেলে বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত ম্যানেজিং হাউসগুলিকে স্বাভাবিকভাবেই সবথেকে বেশি গুরুত্ব দিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত প্রধান ম্যানেজিং হাউসগুলি বাণিজ্য ও শিল্পের উভয় ক্ষেত্রেই আগ্রহী ছিল এবং তাদের বাণিজ্যে রপ্তানি ও আমদানির সমস্ত প্রধান শাখাগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল। ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসগুলির প্রতিনিধিস্থানীয় জার্ডিন, স্কিনার অ্যান্ড কোম্পানির প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ের কাজকর্মের একটি বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তারা আটটি চা কোম্পানির (যাদের মধ্যে কিছু সংস্থা ভারতে এবং কিছু যুক্তরাজ্যে রেজিস্ট্রীকৃত), তিনটি কয়লা কোম্পানির, একটি কাঠ এবং দুটি পাটকলের ম্যানেজিং এজেন্ট ছিল। তারা আবার বহু বীমা কোম্পানির এবং প্রশান্ত মহাসাগরে পরিবহণ ব্যবস্থায় লিপ্ত বহু জাহাজ কোম্পানির ম্যানেজিং এজেন্ট হিসাবেও কাজ করেছে। ভারত ও চীনের মধ্যে জাহাজী পরিবহণ ব্যবস্থায় নিয়োজিত ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি লিমিটেডের সঙ্গেও তারা যোগ দিয়েছিল। উপরন্তু, তাদের বিশাল বাণিজ্য ছিল ম্যাঞ্চেস্টার থেকে থানকাপড় আমদানির এবং ভারত থেকে চা ও চট রপ্তানির।[২১] কলকাতার বৃহত্তম ম্যানেজিং হাউসগুলির মধ্যে একটি ছিল জার্ডিন, স্কিনার অ্যান্ড কোম্পানি। ১৯০০ থেকে ১৯১৪-র মধ্যে অনেকগুলি ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসের মূলধন বহুলাংশে আকর্ষণ করেছিল পাট শিল্প। ১৮৯০-র দশকের মধ্যবর্তী সময়ে চাহিদার তুলনায় যোগান বৃদ্ধির হার বেশি হওয়ার ফলে চা শিল্পে মন্দা দেখা দেয় এবং ১৯০৭ বা তারপর থেকে উন্নতির সূচনা হয়। ১৯১১ নাগাদ চা কোম্পানিগুলি স্বাভাবিক হারে ডিভিডেন্ড ঘোষণা আরম্ভ করে

এবং অত্যন্ত সফল কোম্পানিগুলি স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি হারে ডিভিডেন্ড দিতে থাকে।

এই শতাব্দীর শুরুতে চা শিল্পে মন্দা থাকার জন্যে পূর্ব ভারতের ব্রিটিশ ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসগুলির মূলধন বিনিয়োগের প্রতিযোগী ক্ষেত্র হিসাবে চা শিল্প, পাট শিল্পের গুরুতর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারেনি। ভারতে কয়লা উৎপাদন ১৯০০সালে ৬১লক্ষ ২০ হাজার টন থেকে ১৯০৯-এ ১ কোটি ১৮ লক্ষ ৭ হাজার টনে পৌঁছায়।[২২] ভারতের অভ্যন্তরে রেলের, সরকারি কর্তৃপক্ষের এবং পাটকল ও তুলোকলগুলির ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং সিংহল, মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা ও হংকং-এ কয়লা রপ্তানির বৃদ্ধি কয়লাশিল্পকে উৎপাদন সম্প্রসারণে উৎসাহিত করেছিল। ১৯০৬ থেকে ১৯০৮ সময়কালে শিল্পটিতে চূড়ান্ত সমৃদ্ধি এসেছিল। যখন বাংলার কয়লার দাম (f. o. b.) ১৯০৫-এর ৩-৮-০ টাকা থেকে ক্রমাগত বাড়তে থাকে : ১৯০৬-এ ৪-১০-০ টাকা, ১৯০৭-এ ৬-৪-০ টাকা এবং ১৯০৮-এ ৬-১২-০ টাকা। এই সমৃদ্ধির ফলে ১৯০৭ ও ১৯০৮-এ ৬২-টি কয়লা উৎপাদনকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রীকৃত হয়।[২৩]

অবশ্য কয়লা উৎপাদনকারী কোম্পানির সংখ্যা বৃদ্ধির তথ্য থেকে প্রমাণ হয় না যে কলকাতার ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসগুলি এই শিল্পে নতুন পুঁজি প্রভূত পরিমাণে বিনিয়োগ করছিল। প্রথমত, 'এই সমস্ত কোম্পানিগুলির একটি বড় অংশ ব্যক্তি-মালিকদের কাছ থেকে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল মাত্র এবং মোট উৎপাদনের কোনো উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটেনি'।[২৫] দ্বিতীয়ত, ভারতে কয়লা উৎপাদনের পদ্ধতি সাধারণভাবে অত্যন্ত শ্রম-নির্ভর ছিল। খনন ও উত্তোলনের কাজে মানবিক শ্রম ব্যবহার করা হতো এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির অস্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞাত ছিল। অনেক সময়ে ভূপৃষ্ঠের সামান্য নিচে কয়লার মোটা স্তর পাওয়া যেত। শ্রম-ব্যয়ও ছিল অত্যন্ত কম। যন্ত্রপাতি বিক্রয়ের দালালদের প্রভাবে প'ড়ে কিছু ঐ ধরনের দ্রব্য ক্রয়ের ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ছাড়া মালিক বা ম্যানেজারদের মধ্যে যান্ত্রিক বা বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম অথবা বৈদ্যুতিক শক্তির উপর নির্ভরশীলতার কোনো লক্ষণ ছিল না।[২৭]

পাটকলের ক্ষেত্রে একক প্রতি উৎপাদনে অপেক্ষাকৃত বেশি প্রারম্ভিক বিনিয়োগ ও স্থায়ী মূলধনের প্রয়োজন হতো। কিন্তু এই সমস্যা বড় হয়ে দাঁড়াত না কয়লা ও চা শিল্পের তুলনায় পাটকল শিল্পের অনেক রকম সুবিধা থাকার জন্যে। কলকাতার অফিস থেকে পাটকলগুলির উপর নজর রাখা অনেক সহজসাধ্য ছিল। তাদের উৎপাদন পদ্ধতিগুলি প্রকৃত শিল্পোৎপাদন প্রক্রিয়াসমূহের নিকটবর্তী ছিল এবং সেগুলির উপর মানবিক নিয়ন্ত্রণ বা তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা সম্ভবপর ছিল। কয়লাখনির শেয়ারে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের উপকারের উদ্দেশ্যে *আই আই ওয়াই বি* ১৯১১ সালে জানায় :

> কোনো পাটকল বা চা বাগানের ক্ষেত্রে অনেকটা সঠিক মাত্রায় বলা যায়, তাঁত প্রতি উৎপাদন-ব্যয় বা ভালো সাজসরঞ্জামযুক্ত বাগানে একর প্রতি ব্যয় কত হবে, কিন্তু, কয়লাখনির সম্পত্তির ক্ষেত্রে মূলধনের মূল্যের পরিমাপ কিছুটা জটিল।...... একটি বিশেষ কারবারকে বিবর্ধিত করার ব্যয় এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের প্রয়োজনে কারখানা যন্ত্রপাতি ও সাইডিং অ্যাকোমোডেশন বাবদ ব্যয়ের অনেকটা গ্রহণযোগ্য

পরিমাপ করা খুব শক্ত কাজ নয়, কিন্তু এই পরিমাপগুলি নির্ভরযোগ্য নয়। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কয়লার দাম এত ওঠা- নামা করেছে যে কয়লা ঠিক কি দামে বিক্রি হবে তা অনুমান করাটাই হলো সমস্যা। ... মাটির নিচের প্রকৃত অবস্থা যা যে কোনো কয়লাখনির উন্নয়ন শেষ পর্যন্ত প্রকট করে—সব ক্ষেত্রেই বিনিয়োগকে ঝুঁকিবহুল ও অনিশ্চিত করে তোলে এবং এ কথা বিবেচনা করে বলা যায়, একটি নতুন কোম্পানিতে একজন বিনিয়োগকারী তার বিনিয়োজিত অর্থের দরুন সর্বনিম্ন যে প্রতিদান যুক্তি-সঙ্গতভাবে আশা করতে পারে তা হলো ১০ শতাংশ।[২৬]

উপরন্তু, কাঁচা পাটের উৎপাদনে ভারত প্রকৃতপক্ষে প্রায় একচেটিয়া অধিকার ভোগ করত এবং যখন বিশ্ব-চাহিদার তুলনায় বিশ্ব-যোগান বেশি হয়ে যেত, সেই সময় ছাড়া পাটজাত দ্রব্যে অন্য কোনো দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামনে ভারত পড়ত না। এরকম সময়ে পাটজাত দ্রব্যের দাম লাভজনক স্তরের বহু নিচে নেমে গেলে হুগলির পাটকলগুলি কাজের সময় কমিয়ে যোগানকে চাহিদার সঙ্গে সুষম সম্পর্কে নিয়ে আসত (এ ব্যাপারে কম দামের প্রতি কৃষকদের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াও তাদের সহায়তা করত)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগের সমস্ত বছরগুলিতে ইয়োরোপীয় দেশগুলির পুরনো ও নতুন উপনিবেশগুলি থেকে কাঁচামাল রপ্তানি প্রচুর বেড়ে গিয়েছিল এবং সেই কারণে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির হার অত্যন্ত উঁচু ছিল। অতএব এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, চা শিল্প থেকে উৎসারিত চাহিদা প্রতিযোগিতামূলক হওয়া সত্ত্বেও পাটকলগুলির জন্যে মূলধন সংগ্রহের সমস্যা ছিল না। লাভের হার চমকপ্রদ না হলেও অন্য দুটি শিল্পের তুলনায় নিশ্চিত প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি পাটশিল্পের ক্ষেত্রে ছিল।

সব উদ্যোগেরই দীর্ঘস্থায়ী মূলধন তোলা হতো প্রধানত ইক্যুইটি বা সাধারণ শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে। কিন্তু প্রেফারেন্স শেয়ারও বেশ ভালই চলত, বিশেষ করে পাটকল-গুলির আর্থিক সংস্থানের ক্ষেত্রে। সাধারনত এ ক্ষেত্রে সুদের হার ছিল (কখনও কখনও চক্রবৃদ্ধি হারে) ৭ শতাংশ। ডিবেঞ্চার সাধারণত বছরে ৫ থেকে ৬ শতাংশ সুদের হার বহন করত।

বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং এবং শিল্পে আগ্রহী ইয়োরোপীয়রা ছাড়া অন্যান্য বিনিযোগকারীরা সরকার, ব্যাঙ্ক বা অফিসের অথবা সামরিক বাহিনীর কর্মচারী ছিলেন। ভারতে ইয়োরোপীয়দের বেতন (ভাইসরয় ছাড়া) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে বছরে ৩০০ থেকে ৭,০০০ পাউন্ডের মধ্যে ছিল। ইয়োরোপীয়দের মধ্যে আয় বণ্টনের রেখা লগনর্মালে গাণিতিক রেখার অনুরূপ ধরলে এবং জ্যামিতিক গড়কেই যথার্থ গড় ধরলে আমরা দেখি যে বেতনভোগী ইয়োরোপীয়দের গড় আয় ছিল ১,৪৫০ পাউন্ড। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ ভারতের উচ্চবেতনের সমস্ত পদই ছিল ইয়োরোপীয়দের একচেটিয়া অধিকারে এবং এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে অধিকাংশ ইয়োরোপীয় শিল্পপতিরা মনে করতেন না মূলধন অপ্রতুল।[২৭]

ভারতে ব্রিটিশ শিল্পপতিদের স্বল্পমেয়াদী মূলধন যোগাড়ের সূত্র খুঁজে বার করাটা অনেক বেশি কঠিন কাজ। ব্যবসায়ে রত ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসগুলি নিজেরা দৈনন্দিন ব্যবসায়িক মূলধনের কিছুটা যোগাড় করতে পারলেও কোনো সন্দেহ নেই যে, অধিকাংশ স্বল্পমেয়াদী মূলধন আসত অ্যালায়েন্স ব্যাঙ্ক অব সিমলা এবং তথাকথিত এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক থেকে। আমরা

দেখব যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ভারতে সংগঠিত ব্যাঙ্কগুলির মূলধনের অধিকাংশ ইয়োরোপীয়দের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

৬.৩ ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে পৃথকীকরণের সরকারি বা আধা-সরকারি ব্যবস্থা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে আধুনিক শিল্পে ইয়োরোপীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বকে সমর্থন ও মজবুত করার জন্যে ভারতের ভেতরে শাসনবিভাগীয়, রাজনীতিক এবং আর্থিক ব্যবস্থার একটা বেড়াজাল ছিল। ইযোরোপীয় ব্যবসায়ীরা সচেতনভাবে নিজেদের *নেটিভ* (দেশীয়) ব্যবসায়ীদের থেকে আলাদা রাখতেন। তাঁরা ভারতের ব্রিটিশ শাসকদের সাথে সাংস্কৃতিক এবং জাতিগত সমতা দাবি করতেন। এই সমতা ভারতীয়দের ক্ষেত্রে অস্বীকার করা হতো যাতে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় না নামতে পারেন।[২৮]

ইয়োরোপীয়দের কাছে, তা সে সরকারি কর্মচারী, সামরিক অফিসার বা ব্যবসায়ী, যাই হোক না কেন, সমাজ গঠিত হতো অন্যান্য ইয়োরোপীয়দের, মূলত (আইরিশসহ) ব্রিটিশদের নিয়ে।[২৯] সাধাবণত তাদের ক্লাবে ইয়োরোপীয়রাই সভ্য হতে পারত। ইয়োরোপীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্যে কিছু ক্লাব ছিল। কিন্তু আরও অনেক ক্লাব ছিল যেগুলির সভ্য হতে পারত শুধুমাত্র সামাজিক মর্যাদার অধিকারী ইয়োরোপীয়রা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বেঙ্গল ক্লাব ছিল ভারতের প্রাচীনতম সামাজিক ক্লাব এবং সব চাইতে প্রভাবশালী ক্লাবগুলির অন্যতম। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের (হাউস) অনেক অংশীদার তার সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিল।[৩০] ১৯৩৮ সালে মুরের *হ্যান্ডবুক ফর ট্রাভেলিং ইন ইন্ডিয়া, বার্মা অ্যান্ড সিলোন* (পঞ্চদশ সংস্করণ, ১৯৩৮) চোখে আঙুল দিয়ে বলছে যে, তালিকাভুক্ত ক্লাবগুলির মধ্যে (বোম্বাইতে ১২, কলকাতায় ১০ এবং মাদ্রাজে ৯টি) কেবলমাত্র ক্যালকাটা ক্লাব ভারতীয় এবং ইয়োরোপীযদের জন্যে উন্মুক্ত ছিল, যদিও মাদ্রাজের উইলিংডন ক্লাবের দরজা ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় মহিলাদের জন্যে খোলা ছিল। ইয়োরোপীয়দের মধ্যে এই একত্ববোধ এবং তার ফলস্বরূপ ভারতীয়দের প্রতি বিদ্রূপাত্মক আচরণ যে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের স্পর্শ করত তা বোঝা যায় নিচের উদ্‌ধৃতি থেকে :

> এইসব (ভারতের অভারতীয় ব্যবসায়ী) সংস্থা তাদের বাইরের জগতের সঙ্গে প্রসরতর যোগাযোগ ও অভিজ্ঞতার ফলে, সমতুল্য ভারতীয় ব্যবসার সঙ্গে অসম শর্তে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম। ভারতীয়রা যেসব আর্থিক ও কর সংক্রান্ত সুবিধা পায় এই সংস্থাগুলিও সেই সুবিধা ভোগ করে। উপরন্তু, তারা ভোগ করে দেশের শাসকদের সঙ্গে জাতিগত সাদৃশ্যের মোহময় বন্ধনজনিত নিরুচ্চার সহানুভূতি। ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তারা অদৃশ্য অথচ কার্যকরী সুবিধা পায়। এই কৌশলের বিরুদ্ধে খুব জোরালো প্রতিবাদ করা যাবে না।[৩১]

ভারতীয় ও ইয়োরোপীয়দের মধ্যে এই সামাজিক বৈষম্যের সম্পূরক ও সমার্থক ছিল কোনো বিশেষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ও আর্থিক ব্যবস্থা যা ভারতে

ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীদের তাদের ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় অনেক বেশি সুবিধা দিয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক ব্যবস্থায় ভারতের ভূমিকা ছিল কাঁচামাল সরবরাহকারীর ও স্টার্লিং ব্যতিরেকে অন্য মুদ্রা যোগানদারেব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের দরুন ব্রিটেনের বাণিজ্য ব্যালেন্সে যে ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছিল তা পূরণের জন্যে অন্যান্য মুদ্রাব প্রয়োজন ছিল।[৩২] ভারত সরকারেব বৈযয়িক নীতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল আমদানি ও রপ্তানির ধারাকে অবিচল বাখা অথবা তার বৃদ্ধি ঘটানো এবং টাকার বৈদেশিক বিনিময মূল্য স্থিতিশীল রাখার উদ্দেশ্যে বৈদেশিক মুদ্রার বাজারকে প্রভাবিত করা।

রেলওয়ে ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিকে বন্দরের সাথে যুক্ত করার জন্যে, কেন্দ্রগুলির পরস্পরের যোগাযোগের জন্যে নয়। রেলপথে বিভিন্ন আভ্যন্তবীণ কেন্দ্রগুলির মধ্যে পণ্য পরিবহণের মাশুলের তুলনায় সেই সব কেন্দ্র থেকে বন্দরমুখী পরিবহণের মাশুল কম ছিল।[৩৩] এই ভাবে ভারতের অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্য অস্বাভাবিক গুরুত্ব লাভ করে; সরকারি মহলে দেশের শ্রীবৃদ্ধি প্রায়শই বিচার করা হতো বৈদেশিক বাণিজ্যের হ্রাস-বৃদ্ধির মাপকাঠিতে। বোম্বাই ব্যতিরেকে সমস্ত বন্দবগুলিতেই বৈদেশিক বাণিজ্য ইয়োরোপীয়দের (মূলত ব্রিটিশ) দৃঢ় নিয়ন্ত্রণে ছিল। এমন কি বোম্বাইতেও বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকাংশই তাদের হাতে ছিল।

সারণি ৬.১ ১৯০১-২ থেকে ১৯০৫-৬এ ভারতের প্রধান বন্দরগুলির বৈদেশিক বাণিজ্য

	মোট আমদানি (টা'০০০)		মোট রপ্তানি (টা'০০০)	
	ব্যক্তিগত খাতে	সরকারি খাতে	ব্যক্তিগত খাতে	সরকারি খাতে
	(১)	(২)	(৩)	(৪)
বাংলা				
১৯০১-২	৩২, ৮১, ৯৬	৩, ৪১, ১১	৫৫, ২০, ২০	১৬, ৮২
১৯০২-৩	৩২, ৮২, ৮৯	৩, ২২, ৮১	৫৩, ৬৭, ৪২	১৩, ৬৭
১৯০৩-৪	৩৩, ৬৪, ৫৪	৩, ৭৩, ৭৮	৫৯, ৭৫, ০১	৬, ৮১
১৯০৪-৫	৩৮, ৬১, ৫৯	২, ৬৭, ৫৬	৬৪, ০৮, ৩৪	৫, ৩৮
১৯০৫-৬	৪১, ৯০, ১৪	৩, ৬১, ৪৯	৭০, ৪২, ৪৯	১, ৭৮
বোম্বাই				
১৯০১-২	২৮, ৩১, ৫২	১, ৯৬, ০৬	৩৫, ২৯, ২৬	৭, ৪৮
১৯০২-৩	২৭, ৬১, ১৯	১, ৫৫, ৮৪	৩৬, ০৮, ৯০	৩৭, ১১
১৯০৩-৪	২৯, ৯২, ৪৯	২, ১০, ২৮	৪৬, ১২, ০০	৪১, ৮৬
১৯০৪-৫	৩২, ৯৯, ৩৭	২, ৪১, ১৯	৪১, ৫৪, ৪৫	১০, ১৩
১৯০৫-৬	৩৬, ৫১, ৯৪	১, ৯৭, ৪৩	৪৫, ৭৩, ৬৬	৫, ৭১
মাদ্রাজ				
১৯০১-২	৭, ৭৩, ০৯	২৬. ৭৮	১১, ৭৭, ০৪	২, ৩৭
১৯০২-৩	৭, ২০, ৩৬	৩৯, ৮৪	১৩, ০১, ৫৯	১, ০৮
১৯০৩-৪	৭, ৫১, ৪৮	৩৩,৬৮	১৫, ০০, ৭৪	৭৭
১৯০৪-৫	৮, ৪৫, ৫৬	৩১, ০৩	১৪, ৬৬, ৪৩	১, ০৯
১৯০৫-৬	৭, ৭৭, ৪৭	৩৬, ৫৬	১৫, ৪৫, ৫৬	৩২

	(১)	(২)	(৩)	(৪)
সিন্ধু				
১৯০১-২	৬, ৪৩, ৯৬	১, ২৮, ১৫	৮, ৪২, ৭৫	৮
১৯০২-৩	৫, ১৮, ৮১	১, ৬২, ২৪	৭, ৬২, ৬৯	১২
১৯০৩-৪	৫, ৪৭, ৫৬	১, ৪৬, ৬৪	১২, ৯৩, ৫৭	১৬
১৯০৪-৫	৭, ৭০, ৩৭	২, ০০, ০৮	১৭, ৫৮, ৭৮	১১
১৯০৫-৬	৮, ৬৯, ৪৫	২, ৭৮, ৭১	১১, ০৬, ২২	৫

সূত্র : ভারত সরকার, CISD : *Annual statement of the seaborn trade of British India* (ক্যালকাটা অ্যানুয়েল)।

সারণি ৬.১ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে এই শতাব্দীর শুরুতে বাংলার বাণিজ্য (সিন্ধু প্রদেশ বাদে) বোম্বাইয়ের সামগ্রিক বাণিজ্যের চাইতে অনেক বেশি ছিল। আমদানির তুলনায় রপ্তানির ক্ষেত্রে এটি আরও সত্য ছিল। চা, পাট, পাটজাত দ্রব্য এবং আফিম রপ্তানির প্রধান বন্দর ছিল কলকাতা।[৩৪] প্রাচ্যে ম্যাঞ্চেস্টারে তৈরি জিনিসের বৃহত্তম বাজারও ছিল কলকাতা। বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং মহাসাগরীয় ও উপকূলবর্তী জাহাজী পরিবহণ ব্যবস্থার উপর বাস্তবিকভাবে একচেটিয়া কর্তৃত্ব থাকার ফলে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের সিংহ ভাগই ইংরেজ ব্যবসায়ীরা ভোগ করত। সরকারি চাকুরী, ব্যাঙ্ক এবং রেলের উঁচু আমলাদের প্রায় সবাই জাতিতে ছিল ব্রিটিশ।

১৮৮৭ও ১৯১৪ সালের রয়্যাল কমিশন ভারতে সরকারি চাকুরি সম্পর্কে দুটি অনুসন্ধান করে এবং সেগুলি থেকে ভারতীয় ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের সরকারি কাজে অংশগ্রহণের কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত তথ্য সারণি ৬.২-এ পরিবেশিত হলো।

সারণি ৬.২ সরকারি চাকুরীতে পদাধিকারীদের বেতন, ১৮৮৭ থেকে ১৯১৩

পদাধিকারীর মাসিক বেতন	ইয়োরোপীয়	ইঙ্গভারতীয়	ভারতীয় এবং বর্মী	মোট পদাধিকারীদের মধ্যে ভারতীয় ও বর্মীদের শতকরা অংশ
২০০ টাকা ও তার বেশি				
১৮৮৭	৪,৮৩৬	১,০০১	৩,০০৩	৩৪
১৯১৩	৪,৮৯৮	১,৫৯৩	৪,৫৭৩	৪২
৫০০ টাকা ও তার বেশি				
১৮৮৭	৩,১৬৩	৮৩	৪২৭	১২
১৯১৩	৩,৬৯১	৩৫১	৯৪২	১৯
৮০০ টাকা ও তার বেশি				
১৮৮৭	১,৬৩৭	৭	৭৭	৪
১৯১৩	২,১৫৩	১০৬	২৪২	১০

সূত্র : RC on the public Services in India, *Report*, (পিপি ১৯১৬, VII), পৃ. ২৬।

৮০০ টাকা ও তার বেশি বেতনভোগী পদাধিকারীদের মধ্যে ভারতীয় ও বর্মীদের নিচু শতকরা হারের মতোই চমক লাগায় ১৯১৩-তে ভারতীয় ও বর্মী পদাধিকারীর মধ্যে বিভিন্ন চাকুরীর চূড়ান্ত অসম বণ্টন; তাদের হার প্রাদেশিক সরকারের শাসনবিভাগের চাকুরীতে ৮৭ শতাংশ এবং বিচারবিভাগে ৯৮ শতাংশ ছিল। এই দুটি চাকুরীতে ২০০ টাকা ও তার বেশি বেতন পাওয়া পদাধিকারীদের সংখ্যা ২,৪৩২ ছিল, এবং এই পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে অন্যান্য চাকুরীতে ভারতীয় ও বর্মীরা ছিলেন ৪২ শতাংশের অনেক কম। এটি বিশেষ করে লক্ষণীয় যে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের মতো অভিজাত চাকুরীর ক্ষেত্রে মাত্র ৫ শতাংশ ছিলেন ভারতীয়। কৃৎকৌশল বা বাণিজ্যিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ চাকুরীতে—যেমন, জিওলজিক্যাল সার্ভে, দি সার্ভে অব ইন্ডিয়া, শুল্ক বিভাগ; পূর্ত বিভাগ, খনি, টাকশাল, কারখানা ও বয়লার পরিদর্শন এবং পাইলটের (বেঙ্গল) চাকুরীতে ভারতীয় ও বর্মীদের সংখ্যা ছিল খুব কম। শেষ চারটিতে তাদের সংখ্যা শূন্য।[৩২]

সরকারি বা বেসরকারি রেলের চাকুরীতে ভারতীয়দের ও বর্মীদের কর্মসংস্থানের অবস্থা আরও খারাপ ছিল। বেসরকারি কোম্পানি পরিচালনাধীন রেলের তুলনায় সরকারি রেলের উচ্চ পদে ভারতীয়দের শতাংশ বেশি ছিল। ১৯২১ সালেও অ্যাকওয়ার্থ কমিটিব মতে, 'উচ্চতম পদের কোনোটিতেই ভারতীয়রা কেউ নেই, উচ্চতর পদগুলিতেও তারা বিরল'।[৩৬] এই কমিটির তথ্য অনুসারে দেশের প্রধান রেলপথগুলিতে উচ্চতর পদ বলে স্বীকৃত ১,৭৪৯টি পদের মধ্যে ১৮২ বা শতকরা ১০ ভাগের কিছু বেশি পদে ভারতীয়রা ছিলেন। ১৮২ জন ভারতীয়র মধ্যে ১৫৮ জন বিভিন্ন বিভাগে সহকারি ডিস্ট্রিক্ট অফিসারেব পদে ছিলেন ও ২৪ জন ডিস্ট্রিক্ট অফিসারের স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন এবং কেউ তার থেকে উচ্চপদ পাননি। সরকারি রেলপথে (মূলত ট্রাফিক বিভাগে) উচ্চতর পদে ভারতীয় ও বর্মী পদাধিকারীদের হার ১৪.৬শতাংশ হলেও, গ্রেট পেনিনসুলা রেলওয়েতে এই হার ছিল ৫ শতাংশের কম এবং বার্মা রেলওয়েতে ছিল মাত্র ৩ শতাংশ। অধিকাংশ বেসরকারি কোম্পানি পরিচালিত রেলওয়েতে এই হার ছিল ৩ থেকে ১৪.৬ শতাংশের মধ্যে।[৩৭]

ব্যবসার ক্ষেত্রে শাসকদের সঙ্গে ইয়োরোপীয় (ব্রিটিশ) ব্যবসায়ীদের জাতিগত ও রাজনৈতিক, সহমর্মিতা এবং ভারতীয়দের প্রতি তাদের বিরূপ সংস্কার দেশীয় ব্যবসায়ীদের পক্ষে প্রভূত অসুবিধা সৃষ্টি করেছিল। ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীদের শ্রেণীবিন্যাস সুদৃঢ় হলো প্রায়শ আরও অভিজ্ঞ প্রশাসক ও রাজনীতিকদের অনুপ্রবেশের ফলে : ১৮৯৫ থেকে ১৯০৩ পর্যন্ত যিনি ভারত সচিব ছিলেন সেই লর্ড হ্যামিলটন ১৯০৮ সালে চার্টার্ড ব্যাঙ্ক অব্ ইন্ডিয়া, অস্ট্রেলিয়া অ্যান্ড চায়নার পরিচালকমণ্ডলীতে যোগ দেন এবং ১৯২৬ পর্যন্ত ঐ পদে থাকেন।[৩৮] যুক্তপ্রদেশের গভর্নর এবং ভাইসরয়ের কাউন্সিলের প্রথম কমার্স মেম্বার স্যার জন হিউয়েট (ইন্ডিয়ান সিভিল থেকে ১৯১২-তে অবসর প্রাপ্তির পরে) ১৯১৫তে ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক অব্ ইন্ডিয়ার পরিচালকমণ্ডলীতে যোগ দেন এবং ১৯৪১ পর্যন্ত তিনি ঐ কাজ করেন।[৩৯]

সরকারি নীতির আরও কয়েকটি দিক ছিল যা ভারতীয়দের বিরুদ্ধে এবং ইয়োরোপীয়দের পক্ষে যেত। ভারত সরকারের বৈষয়িক নীতিকে কখনও কখনও 'সমাজতন্ত্র' অভিমুখী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সম্পূর্ণ বিপরীতে ম্যাঞ্চেস্টার ধারার নীতির কঠোর অনুসারী বলা হয়েছে। এ দুটোর কোনোটির সঙ্গেই এই পক্ষপাতিত্ব খাপ খায় না। সামাজিক উৎপাদন

সামগ্রীর নির্মাণ সরকারি দায়িত্ব বলে ধরা হয়েছিল। রেল বা বন্দর তৈরির ব্যাপারে জনমতের চাপ এবং ওকালতির দরকার ছিল। এ বিষয়ে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের তুলনায় ইয়োরোপীয় চেম্বার অব্ কমার্সগুলি অনেক বেশি সুসংগঠিত ছিল এবং তারা বিভিন্ন সরকারি সংস্থায় সভ্যপদের অধিকারী ছিল; সুতরাং, পোর্ট ট্রাস্টে, ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টে, স্বায়ত্ত শাসন সংস্থাগুলিতে, বিশেষ করে ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীদের কর্তৃত্বাধীন শহরে তারা অধিকতর সুবিধাভোগীও ছিল। শুধুমাত্র সভাধিপতি হিসাবেই যে ইয়োরোপীয় পদাধিকারীরা থাকতেন তাই নয়, সদস্যদের মধ্যেও তাঁরাই ছিলেন সংখ্যাগুরু। যে অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে সরকার পথপ্রদর্শক শিল্পে সাহায্য করেছে, যেমন পোটোনোভোতে হিথের লৌহজাত সামগ্রী তৈরির কারখানায়, মাদ্রাজে অ্যালফ্রেড চ্যাটারটনের অ্যালুমিনিয়াম দ্রব্য তৈরির প্রতিষ্ঠানে বা কানপুরে কুপার অ্যালেন অ্যান্ড কোং-এর সামরিক বুট ও অন্যান্য জিনিস তৈরির প্রতিষ্ঠানে, সে সব ক্ষেত্রেই উপকৃত হয়েছে ব্রিটিশ সংস্থা। যখন ভাবত সরকারের ভাণ্ডারের জন্যে পণ্যসামগ্রী কেনার নীতিতে ভারতে তৈরি জিনিস ঠাঁই পেল, ইয়োরোপীয় ইঞ্জিনীয়ারিং, কাগজ বা পশম দ্রব্য তৈরির প্রতিষ্ঠানগুলিই এই নীতি-পরিবর্তন থেকে উপকৃত হলো।

৬.৪ ইয়োরোপীয় বাণিজ্যিক সংস্থা এবং শিল্প ও লগ্নীতে ইয়োরোপীয় কর্তৃত্ব

ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের রুখবার জন্যে ও নিজেদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা রক্ষার উদ্দেশ্যে ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীরা সারা ভারতে তাদের সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলির গড়ে তুলেছিল। তারা সংগঠিত ছিল বিভিন্ন চেম্বার অব্ কমার্সে যার মধ্যে খুব কম ভারতীয় প্রবেশ করতে পারত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে বাংলা, মাদ্রাজ এবং উত্তর ভারতীয় তিনটি চেম্বার অব কমার্সের কোনোটিতে বস্তুত কোনো ভারতীয় সদস্যই ছিল না। কেবলমাত্র বোম্বাই চেম্বার অব্ কমার্সের শুরু থেকেই ভারতীয় সদস্য ছিল—প্রাথমিক পর্বে সবাই পার্সী[৪০]—কিন্তু সংস্থার মূলগত চরিত্র ছিল ইয়োরোপীয়। এইসব চেম্বার অব্ কমার্স বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংস্থার স্বার্থ দেখত। পূর্ব ভারতে পাটের বাণিজ্য প্রায় সম্পূর্ণই ইয়োরোপীয়দের করতলগত ছিল। এই শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীদের যেসব সংস্থা ছিল তাদের স্বার্থ দেখত বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্স। পশ্চিম ভারত বাদে অন্য সব অঞ্চলে এবং অন্য ব্যবসার ক্ষেত্রে একই ছবি দেখা যায়। কোনো কোনো সংস্থার নিয়মাবলীতে ভারতীয়দের বাদ দেবার জন্যে স্পষ্ট ধারা ছিল। কিন্তু অধিকাংশেরই এ জাতীয় ধারার প্রয়োজন ছিল না, কেননা তৎকালীন সদস্যরাই প্রবেশেচ্ছু ভারতীয়দের বাধা দিতে পারত। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পরস্পরের স্বার্থ মানিয়ে নেওয়া এবং প্রতিযোগিতা দূর করার ব্যাপারে চেম্বার অব্ কমার্স এবং ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন একটি ভালো অস্ত্র ছিল। অন্যদের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার সুফলে গভীর বিশ্বাসী হলেও ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ী ও বেনিয়ারা নিজেদের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত আপসে এবং পারস্পরিক সুবিধাদানে বিশ্বাস করত। একটি ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর নেতা হিসাবে একটি সংস্থাকে মেনে নেবার মধ্যে দিয়েই অনেক সময় এই ধরনের আপস রূপ পেত।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ভারতীয় পাটকল সংগঠন (আই জে এম এ) পাট শিল্প এবং পাট ব্যবসা উভয়েরই মুখপাত্র ছিল।[১]

ফলে, প্রায় সব ক্ষেত্রেই ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীরা 'যৌথ একচেটিয়া'র কাছাকাছি অবস্থা রক্ষার জন্যে সুসংগঠিত ছিল। এই যৌথ একচেটিয়া ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে ও শিল্পে নতুন প্রবেশকারীদের বাধা দিতে পারত, কারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের বিভিন্ন শাখায় প্রবেশের দরজাগুলি ইয়োরোপীয়দের নিয়ন্ত্রণে ছিল, সামুদ্রিক জাহাজী পরিবহণ মূলত ইয়োরোপীয়দের হাতেই ছিল। একই অবস্থা ছিল অধিকাংশ উপকূলবর্তী ও আভ্যন্তরীণ জাহাজী পরিবহণ ব্যবস্থায়। কেবলমাত্র বোম্বাইতে ভারতীয় বা এশীয়দের মালিকানায় জাহাজ ছিল।[১২]

আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে, সবচাইতে লাভজনক বৈদেশিক বাণিজ্যের (যেমন-আফিম, চা, পাট ও পরবর্তীকালে কয়লা) অধিকাংশ ইয়োরোপীয়দের হাতে ছিল (পশ্চিম ভারতে উৎপাদিত তুলো, সুতো এবং আফিমের ব্যবসা অবশ্য ভারতীয়দের হাতে ছিল)। জাহাজী পরিবহণের কারবারে ইয়োরোপীয় একচেটিয়া প্রাধান্যের বিরুদ্ধে খুব কম চ্যালেঞ্জ ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় অনেক বেশি আর্থিক সঙ্গতি, সরকারি নেকনজর ও সবচাইতে শক্তিশালী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির[১৩] আনুকূল্য থাকার ফলে ইয়োরোপীয় কোম্পানিগুলি সহজেই তাদের প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করতে পারত। উপকূল বরাবর যাতায়াতকারী ও সমুদ্রগামী জাহাজগুলির ইয়োরোপীয় কোম্পানিসমূহ ভারত ও ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত ডাক চলাচলের কাজের জন্যে ভরতুকি পেত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ জাহাজ কোম্পানিগুলিকে অন্যভাবেও অনুদান দিয়েছে, কিন্তু অন্যায় প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে ভারতীয় জাহাজ কারবারকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকারকে প্রণোদিত করার সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল।[১৪]

বৈদেশিক বাণিজ্যে ইয়োরোপীয়দের প্রায় একচেটিয়া কারবারের পরিপূরক ও সহায়ক হিসাবে কাজ করেছে সংগঠিত টাকার বাজারে তাদের নিয়ন্ত্রণ। ১৮৭৬ ও ১৯২১ পর্যন্ত ব্যাঙ্ক অব্ বেঙ্গল ও ব্যাঙ্ক অব মাদ্রাজের পরিচালন সমিতিতে কোনো পরিচালকই ভারতীয় ছিলেন না। ঐ সময়সীমার শেষ দুই-এক বছরে কিছু ব্যতিক্রম ঘটেছিল। ১৮৭৬-এ দুটি ব্যাঙ্ক পুনর্গঠিত হয়েছিল প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কগুলি হিসাবে, ১৯২১-এ তাদের একত্রীকরণ সৃষ্টি করল ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। কিন্তু ব্যাঙ্ক অব বম্বের পরিচালকদের মধ্যে ভারতীয়রা ছিলেন এবং অনেক সময়ে তাঁরাই ছিলেন সংখ্যাগুরু। সরকার এবং সরকারি সংস্থাগুলোর আমানত প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কগুলি বিনা সুদে ব্যবহার করতে পারত। ১৯০০-তে তাদের মোট আমানতের এক পঞ্চমাংশ ছিল এই রকমের আমানত।[১৫] প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কগুলোর মধ্যে ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল সহজেই বৃহত্তম হতে পেরেছিল। মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক, অ্যালায়েন্স ব্যাঙ্ক অব সিমলা ও এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের মতো অন্যান্য বড় যৌথ কারবারী ব্যাঙ্কগুলি ইয়োরোপীয়দের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল, যদিও এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক শুরুতে ভারতীয়দের দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল। শুধু পরিচালকরাই নন, উচ্চ পদাধিকারীরাও সবাই ছিলেন ইয়োরোপীয়। ফলে আর্থিক কাঠামোর মধ্যে ইয়োরোপীয় ব্যবস্থার স্বপক্ষে পক্ষপাতিত্ব জোরদার ছিল। ১৯০৬-র পর থেকে শুধু বৃহৎ ভারতীয় যৌথকারবারী বাঙালি ব্যাঙ্কগুলি গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পেরেছিল এবং অস্তিত্ব অটুট রাখতে সমর্থ হয়েছিল পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া।[১৬]

সারণি ৬.৩ এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক ও অন্যদের আদানপ্রদান (হাজার পাউন্ড)

	সংরক্ষিত মূলধন ও অন্যান্য	ভারতে আমানত	ভারতে নগদ ব্যালেন্স
প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক			
১৯০০	৩,৭৩১	১০,৪৫৮	৩,৩৬৩
১৯১০	৪,৬০৭	২৪,৩৮৭	৭,৫৬৭
এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক			
১৯০০	-	৭,০০০	১.৬০০
১৯১০	-	১৬,২০০	২,৯০০
ভারতীয় যৌথ কারবারী ব্যাঙ্ক			
১৯০০	৮৫০	৫,৩৮০	৭৯০
১৯১০	২,৫১০	১৭,১১০	১,৮৭০

সূত্র : জে এস কেইন্স, *Indian Currency and Finance* (লন্ডন, ১৯১৩), অধ্যায় ৭।

যেসব তথাকথিত বিদেশী বিনিময় ব্যাঙ্কগুলি ভারতে আমানত নিয়ে সুদের ব্যবসা করত সেগুলি ইয়োরোপীয়দের হাতে ছিল।[৫৭] ইয়োরোপীয়দের নিয়ন্ত্রিত ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলির সম্মিলিত ক্ষমতার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে ৬.৩ সারণি থেকে।

১৯০০ সালে ভারতীয়দের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং গুরুত্বপূর্ণ কোনো যৌথকারবারী ব্যাঙ্ক বস্তুতপক্ষে ছিল না : ইয়োরোপীয ও ভারতীয়দের দ্বারা যৌথভাবে নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসাবে যদি আমরা ব্যাঙ্ক অব্ বম্বেকে ধরি তা হলে দেখতে পাই যে, সমস্ত দেশের মোট আমানত ২২,৮৩০,০০০ পাউন্ডের মধ্যে বছরে ঐ ব্যাঙ্কের আমানত ছিল ৩,৪৭১,০৪৯ পাউন্ড। এমনকি ১৯১০ সালে সমস্ত ব্যাঙ্কের মোট আমানত ৫৭,৬৯৭,০০০ পাউন্ডের মধ্যে ব্যাঙ্ক অব্ বম্বে, ব্যাঙ্ক অব্ ইন্ডিয়া, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইন্ডিয়া (১৯১২ সালের আমানতের হিসাব ব্যবহার করা হয়েছে), পিপল্স্ ব্যাঙ্ক, ইন্ডিয়ান স্পিসি ব্যাঙ্ক, বম্বে মার্চেন্টস' ব্যাঙ্ক, বেঙ্গল ন্যাশান্যাল ব্যাঙ্ক, বেনারস ব্যাঙ্ক, অবধ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব ব্যাঙ্কিং কোং, পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক এবং পাঞ্জাব কো অপারেটিভ ব্যাঙ্ক-এর মোট জমা ছিল ১৭,৭৪৮,০০০ পাউন্ড বা ২৬,৬২,৩২,০০০ টাকা।[৫৮] সংগঠিত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে ভারতীয় নিয়ন্ত্রণের সূচক হিসাবে এই হিসাব ব্যবহার করলে ব্যাপারটিকে বাড়িয়ে দেখা হবে, কেননা এই হিসাবের মধ্যে ধরা সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ দুটি ব্যাঙ্ক, ইন্ডিয়ান স্পিসি ব্যাঙ্ক এবং পিপল্স ব্যাঙ্ক এবং ১৯১৩ সালে লোপ পায়।

ইয়োরোপীয় শিল্প ব্যাঙ্ক থেকে কী পরিমাণে কার্যকরী মূলধন (Working Capital) ঋণ হিসাবে নিয়েছে তা বের করাটা সহজ নয়। কিন্তু আই টি বি-র সামনে দেওয়া সাক্ষ্য এবং পুরনো শেয়ার রেজিস্ট্রার থেকে এটা বোঝা যায় যে প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কের সঙ্গে অথবা যে সব জায়গায় ব্যাঙ্কের শাখা ছিল না সেখানে নিয়ন্ত্রণাধীন অন্য ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে ইয়োরোপীয় ম্যানেজিং এজেন্সি হাউস নিয়ন্ত্রিত কোম্পানিগুলির নগদ ধার (Cash Credit)

ও ওভারড্রাফটের ব্যবস্থা ছিল। ভারতীয় শিল্প কমিশনের সামনে স্যার ডাবলু, বি হান্টারের সাক্ষ্য[৪৯] অনুসারে, এমনকি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেও মাদ্রাজে ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পসংস্থাও কার্যকরী মূলধনের বড় একটা অংশ ব্যাঙ্ক অব্ মাদ্রাজ থেকে ঋণ হিসাবে পেয়েছে। যুদ্ধের আগে অন্য কোনো ব্যাঙ্কের তুলনীয় তথ্য পাওয়া যায় না। ১৯২৬-এর রয়্যাল কমিশন অব্ ইন্ডিয়ান কারেন্সি অ্যান্ড ফিন্যান্সের সামনে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক অব্ ইন্ডিয়ার অন্যতম ম্যানেজিং গভর্নর নর্মান মুরের দেওয়া সাক্ষ্য থেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ও সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিমিশ্র শিল্প সংস্থাকে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের দেওয়া ঋণের তথ্য পাওয়া যায়। ওই তথ্য ৬.৪ নং সারণিতে দেওয়া হলো :

সারণি ৬.৪ শিল্প সংস্থাগুলিকে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক প্রদত্ত ঋণ (টাকা'০০০)

	ভারতীয়	ইয়োরোপীয়	মোট
বাংলা	৩৭৪	৫৭৪	৯৪৮
বোম্বাই	৮৫০	৬৫	৯১৫
মাদ্রাজ	৯০	১৩১	২২১

সূত্র : RC on Indian Currency and Finance, খণ্ড ৪, *Minutes of Evidence taken in India before the RC on India Currency and Finance* (লন্ডন, ১৯২৬), পৃ. ৪৭৯।

স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এই হিসাব হচ্ছে স্বল্পমেয়াদী ঋণের জন্যে। এটা থেকে গড়পড়তা অবস্থা বোঝা যেতে পারে, আবার নাও যেতে পারে, কিন্তু একথা আন্দাজ করা অন্যায় হবে না যে, যুদ্ধপূর্ব সময়ে যেহেতু শিল্পে ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ আরও দুর্বল ছিল এবং ব্যাঙ্ক অব্ বেঙ্গল ও ব্যাঙ্ক অব্ মাদ্রাজ সম্পূর্ণভাবে ইয়োরোপীয়দের নিয়ন্ত্রণে ছিল, সেইজন্যে তখনকার অবস্থা ইয়োরোপীয় সংস্থাগুলির প্রতি আরও পক্ষপাতদুষ্ট ছিল।[৫০]

প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কগুলি, বিনিময় ব্যাঙ্কগুলি অবং ম্যানেজিং এজেন্সিগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ঘনিষ্ঠতার অনেক যোগসূত্র ছিল। প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কগুলির সভাপতি ও পরিচালকবর্গের অনেকেই ছিলেন বড় বড় ম্যানেজিং এজেন্সির সদস্য। একইভাবে বিনিময় ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে ভারতে ব্রিটিশ ম্যানেজিং এজেন্সিগুলির যোগ ছিল : স্যার মন্টেগু কর্নিশ টার্নার ম্যাকিনন, ম্যাকেন্জি অ্যান্ড কোম্পানির অংশীদার ছিলেন এবং পরে তিনি চার্টার্ড ব্যাঙ্ক অব্ ইন্ডিয়া, অস্ট্রেলিয়া অ্যান্ড চায়নার সভাপতি হন; ম্যাকিনন, ম্যাকেন্জি অ্যান্ড কোম্পানির স্যার জেমস এল ম্যাকে (যিনি পরবর্তীকালে লর্ড ইঞ্চকেপ হন) এই একই ব্যাঙ্কের পরিচালক ছিলেন ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৭ সাল পর্যন্ত।[৫১] একইভাবে বিভিন্ন সময়ে ন্যাশান্যাল ব্যাঙ্ক অব্ ইন্ডিয়ার পরিচালক সমিতিতে সদস্য ছিলেন জার্ডিন, স্কিনার অ্যান্ড কোম্পানি, হোর মিলার অ্যান্ড কোম্পানি, থিনী অ্যান্ড কোম্পানি, জর্জ হেন্ডারসন অ্যান্ড কোম্পানি, জেমস ফিনলে অ্যান্ড কোম্পানি, বার্ড অ্যান্ড কোম্পানি, কিলবার্ন অ্যান্ড কোম্পানি এবং অ্যালেক্স লরি অ্যান্ড কোম্পানির অংশীদারেরা।[৫২]

৬.৫ পূর্ব ভারতের ব্যবসায়ে ইয়োরোপীয়দের নিয়ন্ত্রণ

আমরা এবারে ইযোরোপীয় ও ভাবতীয়দের শিল্প নিযন্ত্রণে আঞ্চলিক পার্থক্য পর্যালোচনা করব। ভারতবর্ষ বিশাল দেশ, সেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিকাশের ভিন্ন ধারা কীভাবে গড়ে উঠেছিল তা বোঝার জন্যেই যে শুধু তা নয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে শিল্পে ইয়োরোপীযদের আধিপত্যের কারণগুলি বোঝার ব্যাপারেও এই ব্যাখ্যা সাহায্য করবে।

পশ্চিম ভারত, বিশেষ করে বোম্বাই ও আমেদাবাদ ভারতেব অন্য শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলি থেকে আলাদা বলে প্রথম দর্শনেই বোঝা যায়, কেন না, সেখানে শিল্প ও বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণে ভারতীয়দের ভূমিকা অনেক বড় ছিল। ভারতীয় নিয়ন্ত্রণাধীন বৃহত্তম শিল্প, সুতিকল শিল্পের আদি পুরুষ ছিলেন বোম্বাইয়ের পার্সী সি এল ডাবর এবং আমেদাবাদের ব্রাহ্মণ রণছোড়লাল ছোটালাল।[২১] পশ্চিম ভারতের 'পার্সীদের বিচক্ষণতা, কর্মকাণ্ড এবং বাণিজ্যিক উদ্যোগকে' মনে কবা হতো 'প্রাচ্যেব প্রবাদ' [২২] হিসাবে ; অন্যদিকে এটাও বলা হতো যে 'গুজরাটে বাস্তবিকভাবে বণিকতন্ত্র গড়ে উঠেছে এবং বেনিয়ারা সমাজে ব্রাহ্মণদের চেয়ে অধিক গুরুত্বের অধিকাবী'।[২২] প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ভারতের অন্য কোনো অঞ্চলে শিল্পগত উদ্যোগ এবং ব্যবসার প্রতি এই ধরনের সামাজিক 'সম্ভ্রম প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যেত না'। আমরা প্রথমে ভারতের দুই প্রধান শিল্পকেন্দ্র কলকাতা ও বোম্বাইয়ের মধ্যে অবস্থার তুলনা করব এবং তারপবে কানপুর ও মাদ্রাজের উদ্যোগশীলতা (entrepreneurship) বিকাশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেব।

১৯০০ সালে ভারত অত্যন্ত গরীব দেশ ছিল।[২৬] ততদিনে ২৫,০০০ মাইলের কাছাকাছি রেলপথ তৈরি হযে গেলেও দেশের আভ্যন্তরীণ অঞ্চলগুলির একমাত্র যোগাযোগ ছিল সামুদ্রিক বন্দরগুলি মারফৎ। অন্তর্দেশীয় অর্থব্যবস্থা বিভিন্ন খণ্ডে বিচ্ছিন্ন থাকার আরেক কারণ ছিল এই যে, গোটা দেশ বেশ কয়েকটি কারেন্সি সার্কেলে বিভক্ত ছিল। ফলে যদি কোনো অঞ্চলে বাইরে থেকে মাল আমদানির খরচ বেশি থাকত অথবা অন্য কোনো সরকারি আনুকূল্য সেখানকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পেত, তা হলে সেই প্রতিষ্ঠানগুলি কার্যত বিদেশী প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সংরক্ষণ ভোগ করত এবং তখন তাদের উৎপাদিত পণ্যে একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠা কবা সহজ, কারণ আঞ্চলিক বাজার ছিল ছোট। ভারতের তিনটি প্রধান আঞ্চলিক বন্দরের মধ্যে ব্যবসার বৃহত্তম অংশেব অংশীদার ছিল কলকাতা। পূর্ব ভারতের বাণিজ্যে ইয়োরোপীদের অধিকতর অংশগ্রহণের অন্যতম ফল হিসাবে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে তুলনামূলকভাবে অধিকতর পার্থক্য এখানে দেখা গেছে। আরেকটি ফল হয় যে, বোম্বাইয়ের ভারতীয় ব্যবসায়ীদের তুলনায় ইয়োরোপীয়রা কলকাতাতে আরও অনেক বিশাল মূলধন ভিত্তি গড়ে তুলেছিল। কলকাতা ভারত সরকারের কেন্দ্র হওয়ায় বোম্বাইয়ের তুলনায় অনেক বেশি সরকারি আনুকূল্য এখানে পাওয়া যেত— অন্তত পক্ষে সিন্ধু দেশের সেচ প্রকল্পের জন্যে ঐ অঞ্চলে বিশাল নির্মাণকর্ম আরম্ভ হওয়ার আগে একথা সত্য ছিল। নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা কমিয়ে এনে এবং পারস্পরিক সমঝোতা ঘটিয়ে বাইরের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার ব্যাপারে ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ী বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করত, একথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। প্রধান

প্রধান শিল্পে এর প্রত্যক্ষ ফল দেখা যায়। ১৮৮৫ সাল থেকে তিরিশের দশকের মন্দাবস্থা পর্যন্ত এবং মূলত ভারতীয় নিয়ন্ত্রণাধীন নতুন মিলগুলির প্রবেশের যুগ্ম চাপে ভেঙে না পড়া পর্যন্ত আই. জে. এম. এ. প্রয়োজন দেখা দিলেই মিলের কাজের সময় কমানোর চুক্তি হাসিল করত। পাট ও পাটজাত পণ্যের বহনের জন্যে পূর্ব ভারতের বাষ্পচালিত জাহাজ কোম্পানিগুলির সাথে পাটকলগুলি যৌথ চুক্তি করত। বাজারের ভাগ বাঁটোয়ারা এবং মাশুল ও জাহাজ ভাড়া ঠিক করার উদ্দেশ্যে বাষ্পচালিত জাহাজ কোম্পানিগুলি নিজেদের মধ্যে একাধিক চুক্তি করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পূর্ব ভারতে ইয়োরোপীয় নিয়ন্ত্রিত দুটি প্রধান কাগজকল কাগজের দাম ঠিক করার জন্যে নিজেদের মধ্যে চুক্তি করেছিল এবং এই সহযোগিতা দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেকার সময় পর্যন্ত কার্যকরী ছিল।

একই ম্যানেজিং এজেন্সি সংস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবেশ এবং কয়েকটি ইয়োরোপীয় ম্যানেজিং সংস্থার হাতে মূলধনের কেন্দ্রীকরণ একক বা যৌথ একচেটিয়া কারবার রক্ষার সহায়ক হয়ে উঠেছিল এবং ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা তাদের এই সুবিধা ভালো মতো উপভোগ করত। তাই কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক অব্ ইন্ডিয়ার সঙ্গে একজোট হয়ে 'প্যারি অ্যান্ড কোং' যখন ইস্ট ইন্ডিয়া ডিস্টিলারিজ অ্যান্ড সুগার ফ্যাক্টরিজ লিমিটেড নামে কোম্পানি বাজারে ছাড়ল তখন তার প্রসপেক্টাসে তারা দাবি করল : '... এই কোম্পানি ... মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির সর্বত্র স্পিরিট এবং শর্করা শিল্পের বাস্তব নিয়ন্ত্রক হবে।'[৫৭] এই দাবির সারমর্ম হল মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি ও ব্রহ্মদেশে ঘাঁটি গড়া সেনাদলের জন্যে চিনি সরবরাহে একচেটিয়া অধিকার, মহীশূরে স্পিরিট সরবরাহ এবং (বিনী অ্যান্ড কোম্পানির একটি কারখানা ছাড়া) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিব সমস্ত বড় চিনি ও স্পিরিট তৈরির কারখানাগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ। বাস্তবিক একচেটিয়া কারবারের পথে এই শেষ বাধাটিও দূর হলো মূলত শর্করা শিল্পে বিশাল ক্ষতির ফলে বিনী অ্যান্ড কোম্পানি যখন ১৯০২-তে ডেকান সুগার অ্যান্ড আবখারী কোম্পানিকে প্যারী অ্যান্ড কোম্পানির হাতে তুলে দিতে বাধ্য হলো।[৫৮] একই ধরনের স্থানীয় ইয়োরোপীয় নিয়ন্ত্রণাধীন একচেটিয়া কারবার ছিল উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে মদ তৈরির কারখানায় এবং সামরিক বুট, কম্বল ও অন্যান্য জিনিসপত্র সরবরাহে। অনেক ক্ষেত্রেই এইসব একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠার পিছনে ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারি আনুকূল্য।[৫৯]

একেকটি শিল্পে একেকটি কোম্পানি বা ম্যানেজিং এজেন্সি সংস্থার আধিপত্যের চাইতে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে সমস্ত প্রধান শিল্পে মুষ্টিমেয় কয়েকটি ইয়োরোপীয় ম্যানেজিং এজেন্সি সংস্থায় অধিপত্য। ১৯১১-র *আই আই ওয়াই বি* তালিকাভুক্ত ভারতে রেজিস্টীকৃত কোম্পানিগুলির বিশ্লেষণে (৬.৫ সারণি দেখুন) দেখা যায় যে, সাতটি ম্যানেজিং এজেন্সি সংস্থা—যথা, অ্যানড্রু ইউল অ্যান্ড কোম্পানি, বার্ড অ্যান্ড কোম্পানি, ডানলপ অ্যান্ড কোম্পানি, শ ওয়ালেস অ্যান্ড কোম্পানি, উইলিয়ামসন, মেগর অ্যান্ড কোম্পানি, ডানকান ব্রাদার্স, এবং অক্টেভিয়াস স্টিল অ্যান্ড কোম্পানি পাট কোম্পানিগুলির ৫৫ শতাংশ, চা কোম্পানিগুলির ৬১ শতাংশ এবং কয়লা কোম্পানিগুলির ৪৬ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করত। কেবলমাত্র অ্যানড্রু ইউল অ্যান্ড কোম্পানি ও বার্ড অ্যান্ড কোম্পানিই ২৯টি পাট কোম্পানির ১৪টি নিয়ন্ত্রণ করত। ১৯১০-২০-র দশকে তাদের নিয়ন্ত্রণ আরও বৃদ্ধি পায়, যদিও স্টার্লিং কোম্পানিগুলি হিসাবের মধ্যে আনলে তাঁতের সংখ্যা ও মূলধনের উপরে নিয়ন্ত্রণের মাপকাঠিতে কেন্দ্রীকরণের মাত্রা কমে যায়।[৬০]

অধিকাংশ কয়লা কোম্পানিই ছিল রুপিয়া কোম্পানি (অর্থাৎ ভারতে রেজিস্ট্রীকৃত) এবং এদের মধ্যে বৃহত্তম দুটি, যথা, বেঙ্গল কোল কোম্পানি ও বরাকর কোল কোম্পানি যথাক্রমে অ্যানড্রু ইউল ও বার্ডের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। চা শিল্পে স্টার্লিং কোম্পানিগুলির অন্তর্ভুক্তি আমাদের মাপা কেন্দ্রীকরণের মাত্রায় অনেকখানি পার্থক্য ঘটিয়ে দেয়। পূর্বে উল্লিখিত একটি হিসাব অনুসারে ১৯১৪ সালে চায়ের ব্যবসা করার জন্যে ভারতে রেজিস্ট্রীকৃত যৌথ কারবারগুলির মোট নামগত (nominal) মূলধন ছিল ৩০.২৩ কোটি টাকার এবং তার মধ্যে কেবলমাত্র ৪.৩১ কোটি টাকা ছিল রুপিয়া কোম্পানিগুলির।[৬১] অবশ্য মিনসিং লেন টি অ্যান্ড রাবার শেয়ার ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশন লিমিটিড এবং ইন্ডিয়ান টি শেয়ার এক্সচেঞ্জ লিমিটেড প্রকাশিত (৬.৬সারণি দেখুন) ১৯১৪-র মধ্যে রেজিস্ট্রীকৃত এবং ভারতে কর্মরত স্টার্লিং চা কোম্পানিগুলির তালিকা খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায় যে ১২৪টি তালিকাভুক্ত কোম্পানির মধ্যে ৪২টি নিয়ন্ত্রিত হতো জর্জ উইলিয়ামসন অ্যান্ড কোম্পানি, অক্টেভিয়াস স্টিল অ্যান্ড কোম্পানি, ওয়াল্টার ডানকান অ্যান্ড কোম্পানি এবং আর. জি. শ. অ্যান্ড কোম্পানি বা আমাদের তালিকার কলকাতার সাতটি বড় ম্যানেজিং এজেন্সি সংস্থার লন্ডনে প্রতিনিধিত্বকারী চারটি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা।[৬২]

সারণি ৬.৫ ভারতে রেজিস্ট্রীকৃত এবং চা, কয়লা ও পাট শিল্পে নিযুক্ত যৌথ কারবারী কোম্পানিগুলির নিযন্ত্রণ

ম্যানেজিং এজেন্ট বা সচিবের নাম	নিয়ন্ত্রিত যৌথ কারবারী কোম্পানিগুলির সংখ্যা		
	চা	কয়লা	পাট
অ্যান্ড্রু ইউল অ্যান্ড কোং	১০	১১	৬
বেগ, ডানলপ অ্যান্ড কোং	১০	-	২
বার্ড অ্যান্ড কোং	-	১১	৮
শ ওয়ালেস অ্যান্ড কোং	২	১১	-
উইলিয়ামসন মেগর অ্যান্ড কোং	১০	৫	-
জর্জ হেন্ডারসন অ্যান্ড কোং	২	-	-
প্ল্যান্টার্স স্টোরস্ অ্যান্ড এজেন্সি	১	-	-
কিলবার্ন অ্যান্ড কোং	৬	২	-
অক্টেভিয়াস স্টিল অ্যান্ডকোং	১০	২	-
গিল্যান্ডার্স, আরবুথনট অ্যান্ড কোং	১	-	১
কেটলওয়েল, বুলেন অ্যান্ড কোং	১	-	১
জে ম্যাকিলিক্যান অ্যান্ড কোং	২	-	-
সি এ স্টুয়ার্ট	৪	-	-
ডানকান ব্রাদার্স	১২	-	-
ডেভেনপোর্ট অ্যান্ড কোং	৮	-	-
হোর, মিলার অ্যান্ড কোং	১	৩	-
জার্ডিন, স্কিনার অ্যান্ড কোং	২	২	২
ম্যাকলিওড অ্যান্ড কোং	৩	৫	২
ব্যারী অ্যান্ড কোং	৩	-	১

ম্যানেজিং এজেন্ট বা সচিবের নাম	নিয়ন্ত্রিত যৌথ কারবারী কোম্পানিগুলির সংখ্যা		
	চা	কয়লা	পাট
ম্যাকনীল অ্যান্ড কোং	-	৫	-
এইচ.ভি.লো অ্যান্ড কোং	-	৪	-
এফ ডাবল্যু হিলগার্স অ্যান্ড কোং	-	৭	২
স্ট্যানলি, ওকস অ্যান্ড কোং	-	১	-
আপকার অ্যান্ড কোং	-	-	১
অ্যান্ডারসন রাইট অ্যান্ড কোং	-	২	১
অর্নস্টহাউসেন লিমিটেড	-	১	২
বানার লরি অ্যান্ড কোং	-	৪	-
মার্টিন অ্যান্ড কোং	-	৩	-
লায়াল, মার্শাল অ্যান্ড কোং	-	১	-
এন সি সরকার অ্যান্ড সন্স	-	৭	-
মোট	৮৮	৮৭	২৯

সূত্র : *IIYB*, 1911 (কলকাতা, ১৯১১)

সারণি ৬.৬ ১৯১৪ সালে একাধিক স্টার্লিং চা কোম্পানি নিয়ন্ত্রক ম্যানেজিং এজেন্সি সংস্থা বা সচিবের (সেক্রেটারির) তালিকা

ম্যানেজিং এজেন্সি বা সচিবের নাম	পরিচালিত চা কোম্পানির সংখ্যা
জর্জ উইলিয়ামসন অ্যান্ড কোং	১৮
অক্টেভিয়াস স্টিল অ্যান্ড কোং	১৩
প্ল্যান্টার্স স্টোর্স অ্যান্ড এজেন্সি	৬
ওয়াল্টার ডানকান অ্যান্ড কোং	৬
জেমস ফিনলে অ্যান্ড কোং	৫
এফ এ রবার্টস অ্যান্ড কোং	৫
ম্যাকলিওড, রাসেল অ্যান্ড কোং	৫
আর জি শ অ্যান্ড কোং	৫
সি এ গুডরিক অ্যান্ড কোং	৪
পি আর বুকানন অ্যান্ড কোং	৪
অ্যালেক্স লরি অ্যান্ড কোং	৪
এফ এ বস্তু অ্যান্ড কোং	৩
এ আর ওয়ার্নার	৩
হ্যারিসন্‌স অ্যান্ড গ্রসফিল্ড	৩
জে ই এ সিসমোর	২
টমাস হোর	২
ডবলিউ ই নিস	২

ম্যানেজিং এজেন্সি বা সচিবের নাম	পরিচালিত চা কোম্পানির সংখ্যা
জি জি প্লেফেয়ার	২
ই জি রক	২
জ্যাস বি লেকি অ্যান্ড কোং	২
রোই হোয়াইট অ্যান্ড কোং	২
প্রতি চা কোম্পানির পরিচালনকারী কোম্পানি বা সচিব	২৬
মোট	১২৪

সূত্র : *Tea Producing Companies 1914* এবং *Tea Producing Companies 1923-24* (লন্ডন, ১৯১৪ ও ১৯২৪), মিনসিং লেন টি অ্যান্ড রাবার শেয়ার ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশন লিমিটেড এবং ইন্ডিয়ান টি শেয়ার এক্সচেঞ্জ লিমিটেড দ্বারা সংকলিত।

যে সাতটি প্রতিষ্ঠান আমাদের তালিকায় পাওয়া যায় সেগুলিই সম্ভবত বৃহত্তম ছিল না; প্রভাব ও বিভিন্ন ব্যবসায়ের সঙ্গে যোগাযোগের দিক থেকে বিচার করলে সম্ভবত জার্ডিন, স্কিনার অ্যান্ড কোম্পানি, মার্টিন অ্যান্ড কোম্পানি, এবং এফ. ডাবলু হিলগার্স অ্যান্ড কোম্পানি আপেক্ষিক ঐ সাতটি প্রতিষ্ঠানের কয়েকটির চাইতে বড় হবে। পাট, কয়লা ও চা শিল্পে নিয়ন্ত্রণের পরিমাণও কেন্দ্রীকরণের সঠিক মাপকাঠি নয়। ব্রিটিশ ম্যানেজিং এজেন্সি সংস্থাদের একই গোষ্ঠী অন্য ক্ষেত্রও নিযন্ত্রণ করত অ্যানড্রু ইউল বাষ্পীয় নৌপথের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, বার্ড এবং মার্টিন ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ক্ষেত্রে এবং গিলান্ডারস্, আরবুথনট ও মার্টিন রেলপথের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৯১৪-র আগে ভারতের দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাগজ কল নিয়ন্ত্রণ করত এফ. ডাবলু হিলগার্স এবং বামার লরি। কেবলমাত্র ম্যানেজিং এজেন্সি সংস্থাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা কোম্পানির তালিকা বা তাদের মূলধন দিয়ে কেন্দ্রীকরণের ডিগ্রী মাপা যাবে না : বিভিন্ন ম্যানেজিং এজেন্সি সংস্থার নিয়ন্ত্রণে থাকা পরিচালক সমিতিগুলির মধ্যে বহু বিস্তৃত পারস্পরিক গাঁটছড়া বাঁধা ছিল।[৬৩] বিধিসম্মতভাবে গঠিত বা বিধিবহির্ভূত সংগঠন ও ক্লাবের সদস্য হওয়াব সুবাদে ব্রিটিশ ম্যানেজিং হাউসের নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানিগুলি ও তাদের ম্যানেজাররা দাম নির্ধারণের ও বাজার ভাগ করে নেওয়ার বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রভাবশালী তো ছিলই, তাছাড়াও প্রভাব বিস্তারের বড় উপায় ছিল বিভিন্ন পরিচালন সমিতিতে একই প্রতিনিধির মনোনয়নের মাধ্যমে একত্র সংবদ্ধ করা পরিচালকবর্গ।

ভারতের শিল্পক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের মাত্রা যে খুব অস্বাভাবিক ছিল এখানে সে কথা বলা হচ্ছে না। যদিও অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের মাত্রা যে কত তীব্র ছিল তার কোনো সূক্ষ্ম পরিমাপ করা হয়নি, তবুও সমস্ত বিষয় বিচার করলে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে ওঠে যে ১৯২০-র দশকে শীর্ষ স্থানীয় ব্রিটিশ ম্যানেজিং হাউসের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার আরও বেশি মাত্রায় কেন্দ্রীভবন ঘটেছিল।[৬৪] কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে নতুন ভারতীয় উদ্যোক্তাদের প্রবেশের সাথে সাথে ব্রিটিশ পরিচালক গোষ্ঠীর আধিপত্য ক্রমশ শক্ত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে পড়ল।

পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, পূর্ব ও উত্তর ভারতের সম্পদের উপর ম্যানেজিং হাউসগুলির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা শ্রমের যোগান অবধি বিস্তৃত ছিল। চা বাগিচাগুলিতে শ্রমিক

সংগ্রহের জন্যে একটি ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থার অস্তিত্ব ইঙ্গিত দেয় যে, চটকল ও কয়লাখনিগুলিতে শ্রমিক নিয়োগের উদ্দেশ্যেও এই সংস্থাকে ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। স্থানীয়ভাবে শ্রমের যোগান অপর্যাপ্ত হলেও সরকারের আইনী ব্যবস্থা এবং ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসের একচেটিয়া অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে কলকারখানা, খনি এলাকা ও বাগিচাগুলিতে সস্তায় শ্রমের যোগান দেওয়ার ব্যাপারটিকে সুনিশ্চিত করে তোলা হয়েছিল।

কলকাতার অধিকাংশ বৃহৎ ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসগুলি সম্পদশালী হয়ে উঠেছিল ব্যবসার মাধ্যমে অথবা শ্রমের যোগানদার হিসাবে। যেমন অ্যানড্রু ইউল প্রথমে শুরু করেছিল বাণিজ্য দিয়ে, কিন্তু পরবর্তীকালে চট শিল্পে আসার আগে কয়লা উৎপাদন এবং জাহাজ নির্মাণে হাত দিয়েছিল। অপর দিকে বার্ড অ্যান্ড কোম্পানি কাজ শুরু করেছিল ইস্ট ইন্ডিয়া রেল কোম্পানির শ্রমের যোগানদার হিসাবে, শেষ পর্যন্ত কোম্পানিটি বহুবিধ শিল্পোদ্যোগে যুক্ত হয়।[৬৫]

ভারতের সর্বত্র অধিকাংশ ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসগুলি যখন বড় আকারে শিল্পোদ্যোগে অংশগ্রহণ করতে শুরু করল তখন তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব রপ্তানি ও আমদানি দপ্তর স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিল।[৬৬] এদের বাণিজ্যের মধ্যে ম্যাঞ্চেস্টার থেকে আমদানি করা সুতির কাপড় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, পূর্ব গোলার্ধে কলকাতা ছিল সুতি কাপড়ের সর্ববৃহৎ বাজার। আমদানি বাণিজ্যে ইয়োরোপীয়দের আধিপত্য বোম্বাই ছাড়া অন্যান্য বন্দরে সুতির কাপড়ের পাইকারি বাণিজ্যে তাদের একচেটিয়া ক্ষমতা অর্জনের পথ খুলে দেয় । যন্ত্রপাতি ও লোহালক্কড় আমদানিও বাণিজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ ছিল। রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কাঁচাপাট, পাটজাত দ্রব্য, আফিম, চামড়া, তৈলবীজ, নীল, চা, কফি ও মশলাপাতি। অবশ্য আফিম ও নীলের রপ্তানি এক সময়ে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছিল।[৬৭]

পূর্ব ভারতের ব্রিটিশ ম্যানেজিং এজেন্সি হাউস সম্পর্কে আরো দুটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমত, অধিকাংশ বড় কোম্পানিগুলি স্থাপন করেছিলেন মূলত বাণিজ্য ব্যবসায়ী, কন্ট্র্যাক্টর ও লগ্নীকারীরা। আসাম কোম্পানির সঙ্গে যাঁরা প্রথমদিকে যুক্ত ছিলেন এবং যাঁরা চা উৎপাদনের উপযুক্ত বিশাল পরিমাণ জমি কিনতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁদের বাদ দিয়ে খুব কম সংখ্যক চা বাগিচার মালিকরাই পরবর্তীকালে শিল্পোদ্যোগী হিসাবে টিঁকে থাকতে পেরেছিলেন। নীল চাষের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁরা মূলত বড় কৃষকই থেকে গেলেন। ভারতীয় জমিদারদের মতোই কেবলমাত্র খাজনা আদায় করা ছাড়া চাষের পদ্ধতির উন্নতি ঘটানোর কোনো চেষ্টা তাঁদের মধ্যে ছিল না। মার্টিন অ্যান্ড কোম্পানি ছাড়া অন্য কোনো ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্মের শিল্প উৎপাদনের অন্য কোনো ক্ষেত্রে নিজস্ব উদ্যোগ নেওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

দ্বিতীয় যে বিষয়টির উপর আবারও জোর দিচ্ছি তা হলো বৃহৎ শিল্পে উদ্যোগ নিলেও ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসগুলির বাণিজ্যে আগ্রহ থেকেই গেল। বস্তুত, বিশেষ করে কাঁচামালের বাণিজ্যে এই হাউসগুলির আগ্রহ প্রসারিত হয়েছিল তাদের শিল্পোদ্যোগের স্বার্থেই।[৬৮]

ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্মগুলি ইঞ্জিনীয়ারিং সাজসরঞ্জাম ও লোহালক্কড় আমদানি সংক্রান্ত কারবারও করত।[৬৯] ব্যবসায়িক স্বার্থের এই ধরনের বিচিত্র সমাবেশের অন্যতম ফল হয়েছিল

এই যে, শুল্ক-সংরক্ষণ ও রাষ্ট্রের সাহায্যেব প্রশ্নে বিভিন্ন ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আবদ্ধ ও পরস্পরবিরোধী। ফলে যে সব হাউসের স্বার্থ মূলত রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল বা যারা দেশীয় বাজারের জন্যে কোনো রকম শিল্প-উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত ছিল না তারা সংরক্ষণমূলক শুল্কনীতির বিরুদ্ধতায় চলে গেল।[৭০]

৬.৬ পশ্চিম ভারতে দেশীয় ও ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীবৃন্দ

এখন যদি আমরা পশ্চিম ভারতে দেশীয় শিল্পদ্যোগীদের দিকে দৃষ্টি ফেরাই, তাহলে দেখব যে পূর্ব ও উত্তর ভারতেব তুলনায় ছবিটা বেশ ভিন্ন। এই অঞ্চলেও ব্রিটিশ শিল্পপতিদের উপস্থিতি ছিল প্রবল— তাঁবা কাঁচা তুলো কিনতেন, যান্ত্রিক উপায়ে বীজ আলাদা করে তুলোকে পরিশুদ্ধ করতেন এবং তুলো গাঁট বেঁধে তাকে রপ্তানির জন্যে প্রস্তুত কবতেন। কখনো-বা তুলো থেকে সুতো তৈরি করা হতো। আবার ফিন্‌লে এবং সোয়ান মিল বা ইন্দো ব্রিটিশ ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসের অধীন মিলগুলি ভারতের আভ্যন্তরীণ বাজারের জন্যে সুতো থেকে কাপড় প্রস্তুত করত। কিলিক, নিক্সন অ্যান্ড কোম্পানি, এরা ছিল বোম্বাইয়ের অগ্রণী ম্যানেজিং এজেন্সি হাউস যাদের কাজ ছিল সারা ভারতে হাল্কা ধবনের রেলপথ নির্মাণ ও তার পরিচালনা করা। ই ডি স্যাসুন অ্যান্ড কোম্পানির নেতৃত্বে ইস্টার্ন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়াব আগে পর্যন্ত বোম্বাইয়ের এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির পরিচালনা পুরোপুরিভাবে ইয়োবোপীয়দের হাতে ন্যস্ত ছিল।[৭১]ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতোই প্রশাসনেব উচ্চ পদে আসীন ব্যক্তিরা এবং বোম্বাই ও সিন্ধু রেলওয়ের উচ্চপদাধিকারীরা সকলেই ছিলেন ইয়োরোপীয়। বোম্বাইয়ের পোর্ট ট্রাস্টও নিয়ন্ত্রিত হতো ইয়োরোপীয়দের দ্বারা।

কিন্তু সে তুলনায় রপ্তানি বাণিজ্যে ভাবতীয়দের উপস্থিতি ছিল অনুজ্জ্বল। সরকারি আদেশবলে বোম্বাই ডক ইয়ার্ডের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত ভারতীয় উদ্যোক্তারা জাহাজের মালিক ও নির্মাণকারী উভয়ই ছিলেন।[৭২] সুতো ও সুতি বস্ত্রের বাণিজ্য মূলত ভারতীয়দের হাতেই ছিল।[৭৩] তাছাড়া আফিমের ব্যবসাতেও ভারতীয়দের প্রাধান্য ছিল। কারণ, পশ্চিম ভারতে আফিম উৎপাদিত হতো এমন সব দেশীয় রাজ্যে যেখানে ব্রিটিশ শাসনাধীন এলাকার তুলনায় ভারতীয়দের প্রভাব ছিল অনেক বেশি।

ভারতীয়দের প্রভাব ও অবস্থানগত ওই পার্থক্য শিল্পপুঁজি নিয়ন্ত্রণের অধিকতর মাত্রা-তেই শুধু প্রতিফলিত হয় না, বরং তা ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বোম্বাই চেম্বার অব কমার্স ছিল মূলত একটি ইয়োরোপীয় সংস্থা যদিও এর অনেক সদস্যই ছিলেন ভারতীয়। ব্যাঙ্ক অব বোম্বাইয়ের পরিচালকমণ্ডলীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য ছিলেন ভারতীয়, যদিও এর সভাপতি হতেন একজন ইংরেজ। নিক্সন অ্যান্ড কোম্পানি, কিলিক, ব্র্যাডবেরি অ্যান্ড কোম্পানি, এই ধরনের ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসের অধীন কোম্পানিগুলির পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যদের বেশির ভাগ হতেন ভারতীয়।[৭৪]

সারণি ৬.৭ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকানা ও পরিচালনা

প্রদেশ এবং কারখানা, ইত্যাদির প্রকৃতি	কোম্পানির মালিকানাধীন কারখানার সংখ্যা, যাদের ডিবেক্টররা হলেন			ব্যক্তি মালিকানাধীন কারখানার সংখ্যা		কারখানার সংখ্যা যাদের পবি-চালনায় ছিলেন	
	ইয়োরোপীয় ও ইঙ্গ-ভারতীয়	ভারতীয়	উভয় জাতীয়	ইয়োরোপীয় ও ইঙ্গ-ভারতীয়	ভারতীয়	ইয়োরোপীয় ও ইঙ্গ-ভারতীয়	ভারতীয়
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
আসাম							
চা বাগিচা	৪৯৪	১২	—	৫৫	৪৮	৫৩৬	৭৩
বাংলা							
চা বাগিচা	১৫৮	১৮	—	৪৬	১৮	১৯৩	৪৭
কয়লার খনি	৫৩	৬	২১	৭	৪৩	৬৬	৬৩
পাট পেষণের কল	৫০	১৬	—	৭	৩৬	৬৪	৪৫
পাটকল	৪৯	—	—	১	—	৫০	--
যন্ত্রাদি ও ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা	২২	—	—	৪	৭	৩০	৭
ইট এবং টালি কারখানা	৭	৩	৪	১০	১৩৬	৮	১৫৩
তেলকল	৪	৪	—	—	১১৮	৪	১১৫
ছাপাখানা	১১	৪	১	১৭	৬৫	৩২	৭১
বিহার ও উড়িষ্যা							
নীল বাগিচা	১২	—	—	৯৩	১৪	১১৭	২
কয়লাখনি	৮০	১১	৫	৬	৯৯	৮৭	১১২
অভ্র-খনি	১০	—	১	৪	৩৭	১৪	৩৮
লাক্ষা কারখানা	১	—	—	১	৪৬	২	৪৬
বোম্বাই							
তুলো ইত্যাদির বীজ পৃথক করার, পবিশোধনের ও পেষণের কল	১৩	৯২	১৩	—	১৯৪	১০	৩০৪
তুলো ইত্যাদির সুতো কাটার, বয়নের এবং অন্যান্য কারখানা	১২	৯২	২৫	—	১৮	৪৩	১০৬
আটা ও চালের কল	১	১৪	৩	—	৩৯	৬	৫১
যন্ত্রাদি ও ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা	৫	—	২	৪	২	১০	৩
ছাপাখানা	৮	৮	—	৫	৩৬	১৬	৪৫
রেলওয়ে কারখানা	১৩	—	—	—	—	১২	১

	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার							
ম্যাঙ্গানিজ খনি	১৫	৩	—	১	২১	২০	২০
তুলো থেকে বীজ পৃথক করার, পরিশোধনের ও পেষণের কল	৫	৫৬	১	—	৯১	৭	১৪৬
মাদ্রাজ							
কফি বাগিচা	৩০	৬	১	৫৬	১১	৮৬	১৮
টালি কারখানা	৭	৯	—	২	২৩	১০	৩০
চাল কল	২	২৩	—	—	৫৭	৩	৭৮
রেলওয়ে কারখানা	২৩	—	—	—	—	২৩	—
ছাপাখানা	১১	১৬	১	১	১৯	১৫	৩৬
চামড়া পাকা করার কারখানা	৩	২৬	—	১	৩৬	৩	৬৪

উৎস : *Census of India 1911*, খণ্ড ১, *India*, অংশ ১ E. A. Gait -এর রিপোর্ট (কলকাতা, ১৯১৩), সহায়ক সারণি ১২(পৃ. ৪৪৬)

টীকা : 'ইয়োরোপীয় ও ইঙ্গ-ভারতীয় শিরোনামায়' আর্মেনিয়ানরা অন্তর্ভুক্ত।

সারণি ৬.৭ প্রকাশ করে ভারতের বিভিন্ন অংশে ১৯১১ নাগাদ শিল্পটির উপর ভারতীয় ও ইয়োরোপীয়দের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে মাত্রাগত পার্থক্য। সারণিটি নিঃসন্দেহে অসম্পূর্ণ : যেমন এটি থেকে জানা যায় না 'অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-সংস্থাগুলি' কী ভাবে নির্বাচিত হলো, তাছাড়া বেশ কিছু সংস্থা তালিকা থেকে বাদ পড়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার এবং মাদ্রাজের ক্ষেত্রে সুতো তৈরির ও বস্ত্রবয়নের কারখানাগুলি বাদ গেছে, এবং যুক্তপ্রদেশের উল্লেখই নেই। মধ্যপ্রদেশের সুতিকলগুলি ভারতীয়দেব নিয়ন্ত্রণে ছিল, উত্তর প্রদেশ ও মাদ্রাজে ছিল ইয়োরোপীয়দের আধিপত্য। এই ধরণের অসম্পূর্ণতা থাকলেও বিষয়টির কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক সারণিটি থেকে অনুধাবন করা যায়। ভারতীয় পরিচালকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোম্পানিগুলির অনুপাত আসাম, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যাকে এক সঙ্গে দেখলে যে রকম দাঁড়ায় তা বোম্বাই এবং যুক্তপ্রদেশ ও বেরারের একত্রিত অবস্থার থেকে ভিন্ন। ইঞ্জিনীয়ারিং ও মেশিনারি ওয়ার্কশপের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি একই রকম ছিল। শেষোক্ত ক্ষেত্রে ইয়োরোপীয়দের প্রাধান্যের কারণ ছিল সরকার ও রেলওয়েজের মদত। বেসরকারি উদ্যোগের পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব চলত জাতিগত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে। একই কারণে কোনো নতুন ভারতীয় সংস্থার পক্ষে ইয়োরোপীয় উদ্যোগের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়া দুঃসাধ্য ছিল।[৭৫]

সারণিটি ব্যাখ্যা করার সময়ে মনে রাখা দরকার শিল্পের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উদ্যোগগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করত কিছু যৌথ মূলধনী কারবার। অবশ্য এর ব্যতিক্রম হিসাবে কিছু ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা, বাগিচা এবং কিছু ছোটো আয়তনের শিল্পের দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। পরিচালকরা যে কোন ভারতীয় সম্প্রদায় থেকে এসেছিলেন তা জানার মতো তথ্য নেই। ১৯১১সালে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে অবস্থিত ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত কারখানা বিষয়ক তথ্য থেকে সম্প্রদায় ভিত্তিক পরিচালনা ও মালিকানার বণ্টন সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যায়।[৭৬] ১৯১১ সালের ভারতের জনগণনার সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যে

৭৯৮-টি কারখানার উল্লেখ আছে। তথ্যানুসারে এই কারখানাগুলির মধ্যে ৪৫৩-টি ছিল ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত। এর মধ্যে ২০-টি ইয়োরোপীয় অথবা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সমাজভুক্ত ব্যক্তিদের মালিকানাধীন, ১২৫টি বেনিয়াদের, ৮৫-টি পার্সীদের, ৪০-টি বোহরাদের, ৩১-টি ব্রাহ্মণদের, ২১-টি কুনবিসদের, ১৪-টি কুস্তরদের, ১৩-টি মেমনদের, ১৩-টি শেখদের, ৯-টি ক্ষত্রিয়দের অবং ৫-টি ইহুদিদের। ১৯৪-টি তুলো থেকে বীজ ছাড়ানো, পরিশোধন এবং পেষণের কারখানাগুলির ক্ষেত্রে কোনো ইয়োরোপীয় মালিকানা ছিল না। এই কারখানাগুলির মধ্যে ৮৪-টি ছিল বেনিয়াদের, ৩৪-টি পার্সীদের, ২০-টি বোহরাদের, ১২-টি ব্রাহ্মণদের এবং ১২-টি কুনবিসদের। ১৪৮-টি সুতোকল, তাঁতকল ও সুতিবস্ত্র শিল্পের অন্যান্য কারখানাগুলির মধ্যে মাত্র ১৯-টি ছিল ব্যক্তি মালিকানায়। এগুলির মধ্যে ৫-টি বেনিয়াদের, ৩-টি পার্সীদের এবং ২-টি বোহরাদের মালিকানাধীন ছিল।[৭৭]

সুতোকল, তাঁতকল ও অন্যান্য সুতিবস্ত্র শিল্পের কারখানায় ম্যানেজারদের মধ্যে পার্সীরা (৪৫) সংখ্যায় ইয়োরোপীয় ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ান (৪৩) এবং বেনিয়াদের (২৮) তুলনায় বেশি ছিল। কিন্তু তুলো থেকে বীজ পৃথক করা, পরিশোধন ও পেষণের কারখানাগুলিতে ১৪৯ জন ম্যানেজার ছিলেন বেনিযা। পার্সী, ব্রাহ্মণ, কুনবিস, ইয়োরোপীয় ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ান এবং লিংগায়ত সম্প্রদায়ভুক্ত ম্যানেজারদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪৬, ৪৪, ১৬, ১০ এবং ১০। ৭৯৮-টি কারখানা সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, ম্যানেজারদের মোট সংখ্যার মধ্যে ইয়োরোপীয় ও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, বেনিয়া, পার্সী, ব্রাহ্মণ, কুনবিস, বোহরা, কুস্তর, শেখ, খোজা ও মেমনদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৩৫, ২৩৩, ১৫০, ৮৬, ৩২, ২২, ১৮, ১৭, ১৬ ও ১২।

উপরোক্ত পরিসংখ্যান ও অন্যান্য সূত্র (যেমন, *IIYB* 1914) থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ধারণা করা যায় যে বড় উদ্যোগগুলির অধিকাংশ ছিল পার্সীদের নিয়ন্ত্রণে, বিশেযত সুতিবস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রটি। পরিচালনার ক্ষেত্রে বেনিয়াদের তুলনায় পার্সীদের বেশি এগিয়ে থাকার আং শিক কারণ ছিল শিল্পটির উপর শেষোক্ত সম্প্রদায়ের অপেক্ষাকৃত বেশি মাত্রায় নিয়ন্ত্রণেব ক্ষমতা। শিক্ষায় এবং বিশেষ করে কারিগরি শিক্ষায় পার্সীরা অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় বেশি এগিয়ে ছিল। পার্সীদের প্রাধান্যের অন্যান্য কারণগুলি পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে।

৬.৭ বাণিজ্যে ইয়োরোপীয়দের প্রাধান্যের কারণ : কানপুরের দৃষ্টান্ত

পূর্ব ও উত্তর ভারতের অর্থনীতির উপর ইয়োরোপীয়দের অসাধারণ মাত্রায় নিয়ন্ত্রণের ব্যাখ্যায় উদ্যোক্তাদের প্রাধান্যের 'ষড়যন্ত্র' তত্ত্বে অথবা শিল্পের যে কোনো ক্ষেত্রে ইয়োরোপীয়দের চরম শ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্বে বিশ্বাসের প্রয়োজন হয় না। ইয়োরোপীয় ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসগুলির প্রসারের ব্যাখ্যা সহজেই করা যায় তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন শিল্প-ক্ষেত্রের মধ্যে অনিবার্য পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সূত্রে। ইয়োরোপীয়দের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ যে বহুলাংশে সম্ভবপর হয়েছিল রাজনৈতিক কারণে তা আমরা পরে আলোচনা করব। একটি থেকে অপর ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তারের তত্ত্বটির উদাহরণ পাওয়া যায় অ্যানড্রু ইউল কোম্পানির কার্যকলাপ থেকে। ১৮৬০-এর দশকের প্রথম কয়েক বছরে ভারতের এই কোম্পানির প্রধান ব্যবসা—হরকের (Horrock) লং-ক্লথের এজেন্সি এবং তিনটি বীমা কোম্পানির এজেন্সি।[৭৮]

অল্প সময়ের মধ্যেই সংস্থাটি পাট, তুলো ও কয়লা শিল্পের ব্যবসায় নেমে পড়ে। ১৮৮৩ সালে অ্যানড্রু ইউল কোম্পানি পূর্ববঙ্গ ও আসাম থেকে পাট ও চা পরিবহণের জন্যে ইনল্যান্ড ফ্লোটিলা কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠা করে। শেষোক্ত কোম্পানিটি পরবর্তীকালে ইন্ডিয়া জেনারেল স্টিম নেভিগেশন কোম্পানির অঙ্গীভূত হয়। তার কারণ, 'যে তীব্র প্রতিযোগিতা উভয়ের পুনর্মিলনের প্রয়োজনকে প্রমাণ করেছে তা এড়িয়ে যাওয়া। জর্জ ইউল ইন্ডিয়া জেনারেলের বোর্ডে যোগ দিয়েছিলেন।'[৭৯] ১৮৯৫ সালে অ্যানড্রু ইউল কোম্পানির ডেভিড বেঙ্গল আসাম স্টিমশিপ কোম্পানি লিমিটেড গঠন করেন পূর্ব ভারতের জলপথে পরিবহণের উদ্দেশ্যে। তারপর তিনি প্রতিষ্ঠা করেন, পোর্ট শিপিং কোম্পানি 'যেটি কলকাতার বৃহত্তম লাইটার ব্যবহৃত মাল পরিবহণের সংস্থায় পরিণত হয়'।[৮০] একই পথে বার্ড অ্যান্ড কোম্পানি কাজ শুরু করে, প্রথমে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়েকে চুক্তি অনুযায়ী শ্রমের যোগান দিতে থাকে এবং তারপর কয়লা ও পাট শিল্পে ক্রমশ অনুপ্রবেশ করে। কয়লা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকায় সংস্থাটি কুমারধুবিতে ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা গড়ে তোলে এবং জেলার কোলিয়ারির জন্যে কোল্ টারস্ ও পিট্ হেড্ ফ্রেম উৎপাদন করতে থাকে। ইঁট তৈরির মাটি পাওয়া যায় বলে কুমারধুবিতে মৃৎশিল্পের কারখানা ও ইটের ভাটা স্থাপন করে। এই দুই ধরনের কারখানা কুমারধুবির শিল্পের বড় রকম উন্নয়নের কেন্দ্রে পরিণত হয়।[৮১]

শিল্পের অধিকাংশ শাখায় ইংরেজ ব্যবসায়ীদের প্রারম্ভিক সুবিধাগুলি সম্পর্কে সন্দেহ করা যেত না। আর যাই হোক, তাঁরা শিল্পায়নে পৃথিবীর অগ্রণী দেশটির সংস্পর্শে ছিলেন। কিন্তু ঐ সব সুবিধাগুলিকে অব্যাহত রাখার জন্যে তাঁদের নিজস্ব এলাকায় ভারতীয়দের অনুপ্রবেশে বাধা দিতে হতো। বর্হিবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই কাজ করেছিল বাধা সৃষ্টিতে যেহেতু যে কোনো ক্ষেত্রে উন্নয়নের উদ্দীপণা এসেছিল বিশ্ব বাণিজ্যের ফলশ্রুতি হিসাবে। বর্হিবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার উপর ইংরেজদের একচেটিয়া অধিকার এবং সমপর্যায়ভুক্ত অংশীদার হিসাবে ভারতীয়দের অনুপযুক্ত গণ্য করার ক্ষেত্রে ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে শিল্পপতিদের গভীর আঁতাত, বিশেষত যেখানে ইংরেজদের দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রাধান্য ছিল। কানপুর ছাড়া অন্য কোনো শিল্পনগরের ক্ষেত্রে ইয়োরোপীয় নিয়ন্ত্রণের স্থায়িত্ব রক্ষার উপযুক্ত উপাদানগুলি এত প্রকট ছিল না, অতএব আমরা এখন কানপুরের দিকে দৃষ্টি ফেরাব আমাদের পরবর্তী পর্যায়ের বর্ণনার প্রয়োজনে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একটি এজেন্সি ও ক্যান্টনমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কানপুরে ১৭৭৮ সালে, এবং শহরটি দ্রুত গড়ে উঠল ও দোয়াব অঞ্চলের সব থেকে বড় বিপণন কেন্দ্রে পরিণত হলো।

> একটি বৃহৎ সমরাস্ত্রের কারখানা প্রতিষ্ঠা শহটি গড়ে তোলার পেছনে যে উৎসাহ যুগিয়েছিল তার সঙ্গে যুক্ত হল গঙ্গার খাল খনন ও লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত বাঁধানো রাস্তা তৈরির কাজ এবং তখন শহরগুলির মধ্য কানপুরের প্রাধান্য সম্পর্কে আর কোন সংশয় থাকল না। ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে নির্মাণের সমাপ্তি বাণিজ্যকে আরও উৎসাহিত করল এবং প্রায় একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হল বড় বড় চামড়া পাকা করার কারখানা ও তুলোকল।[৮২]

প্রথম আধুনিক কারখানা হিসাবে গভর্নমেন্ট হারনেস অ্যান্ড স্যাডলরি ফ্যাক্টরিকে যদি গণ্য না করি তাহলে অন্তত বলতে হয় এটি ছিল প্রথম আধুনিক কারখানাগুলির মধ্যে একটি। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময়ে অশ্বাদির সাজসরঞ্জাম যোগানের ও জিন তৈরির ক্ষেত্রে যে ঘাটতি দেখা দিয়েছিল তা পূরণের উদ্দেশ্যে ঐ কারখানাটি স্থাপন করা হয়। গোলন্দাজ বাহিনীর একজন যুবক অফিসার, Captain John Stewart-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল কানপুরে তৈরি চামড়ার গুণগত মানের উন্নতিসাধনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর। এই উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডের চামড়ার কারখানায় কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কিছু সৈন্যকে নিয়োগ করা হয়েছিল এবং সৈন্যবাহিনীর খাদ্যের জন্যে বরাদ্দ কিছু গবাদি পশু নিধন করা হয়েছিল। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলি সফল হয়েছিল এবং হারনেস অ্যান্ড স্যাডলরি ফ্যাক্টরিটি প্রতিষ্ঠা করা হলো ১৮৬৩ সালে। এক অর্থে এই কারখানা আর্মি বুট অ্যান্ড ইক্যুইপমেন্ট ফ্যাক্টরির (প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৮০ অথবা ১৮৮১সালে) জনক ছিল। উক্ত ফ্যাক্টরিটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মিস্টার (পরবর্তীকালে স্যার) ডব্লু ই কুপার। তিনি স্যার জর্জ অ্যালেনের সহযোগিতায় কুপার অ্যালেন অ্যান্ড কোম্পানি স্থাপন করে আর্মি বুট অ্যান্ড ইক্যুইপমেন্ট্ ফ্যাক্টরির মালিকানা লাভ করেন।

> ১৮৮৩ সালে সংস্থাটির সঙ্গে সরকারের বুট বিক্রয়ের প্রথম চুক্তিটি সম্পাদিত হয়, এবং ঐ সংস্থাকে বড় অঙ্কের টাকা আগাম দেয় এই সমঝোতার ভিত্তিতে যে তারা সরকারি কারখানার পদ্ধতি অনুসরণ করে পিট তৈরি ও পাকা চামড়া প্রস্তুত করবে। সংস্থাটি এখন ভারতের সমগ্র ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনীয় বুট সরবরাহের চুক্তিতে আবদ্ধ ... কারখানাটি উন্নতিশীল নিজস্ব ব্যবসা ছাড়াও সরকারের অন্যান্য দপ্তরের সঙ্গে যথেষ্ট বড় ব্যবসা করছে..[৮৩]

কুপার অ্যালেন অ্যান্ড কোম্পানি ১৯০৪ সালে নর্থ-ওয়েস্ট ট্যানারি কোম্পানি লিমিটেডের ম্যানেজিং এজেন্টের দায়িত্বও পেয়েছিল। ১৮৯০-র দশকের গোড়ার দিকে কোম্পানিটি একটি কারখানা স্থাপন করে।[৮৪]

সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন মেটাত আরও একটি উদ্যোগ যার নাম ছিল কানপুর উলেন মিল্‌স্ অ্যান্ড আর্মি ক্লথ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড। এই সংস্থাটি গঠন করেন ড: জে কনডন, মেসার্স গ্যাভিন জোন্স্ ও পিটম্যান। কিন্তু ১৮৮২সালে এটি বিক্রি করা হয়েছিল একটি লিমিটিড কোম্পানিকে। প্রতিষ্ঠাতারা যতটা আশা করেছিলেন সংস্থাটি সেই মাত্রায় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। 'সামান্য সরকারি সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা সংস্থাটি যদি তার প্রারম্ভিক সংগ্রামের কালে লাভ করত তা হলে তার অনেক মূল্যবান বছরগুলি বাঁচত, ক্ষতিও কম হতো। কিন্তু সেই সাহায্য এল না, প্রতিষ্ঠাতাদের বইতে হলো তাঁদের বিশ্বাস প্রমাণের এবং কালক্রমে সংস্থাটিকে শক্ত বনিয়াদের উপর স্থাপন করার সমগ্র দায়ভার'—এই অভিযোগ করেছিলেন মি: গ্যাভিন জোন্স্।[৮৫] কিন্তু ১৮৮৫ সালে কোম্পানিটি থেকে সরকারি ক্রয়ের পরিমাণ ছিল তার মোট বিক্রয়ের ৮৬.৮৮ শতাংশ এবং ১৮৯০-এ ৪১.৬৩ শতাংশ।[৮৬] কানপুর উলেন মিল্‌স্ ও নিউ ইগারটন উলেন মিলস্ কোম্পানি লিমিটেড (প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পাঞ্জাবের ধারিওয়ালে অবস্থিত বন্ধ হয়ে যাওয়া ইগারটন

মিলের সম্পত্তি ১৮৯০-এ অধিগ্রহণ করে)[৮৭] শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে স্যার আলেক্জান্ডার ম্যাক রবার্টের পরিচালনায়।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ফলে ভারতীয় তুলোর দাম বাড়ল এবং তুলোর কাপড়ের স্বল্পতা দেখা দিল। এই পরিস্থিতি কানপুরের প্রথম তুলোকল—এলগিন মিলস্ প্রতিষ্ঠার কারণ হিসাবে কাজ করেছিল। তাছাড়া, কানপুরে ছিল বিরাট সুতির কাপড়ের বাজার। ১৮৬৩ সালে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেন সৈন্যবাহিনীর খাদ্যসরবরাহকারী দপ্তরের অফিসাররা যাঁরা আর্থিক সাহায্য পান ধনবান কনট্র্যাক্টার ও ঐ বিভাগের গোমস্তাদের (ভারতীয়) কাছ থেকে। কিন্তু সংস্থাটি সুপরিচালিত ছিল না এবং এটি পুনর্গঠিত হয় ১৮৬৪ সালে গ্যাভিন জোন্সের পরামর্শে। জোন্‌স্‌কে আনা হয়েছিল আদি কারখানাটির গঠন ও পরিচালনার জন্যে। ১৮৭৪-এ গ্যাভিন জোন্স্ মিউয়ার মিলস্ কোম্পানি লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮২-তে কানপুর কটন মিল্স্ কোম্পানি লিমিটেড স্থাপন করেন জে হারউড। তিনি ছিলেন এলগিন মিল্সের একজন কর্মচারী। এলগিন মিল্সের উইভিং মাস্টার অ্যাথার্টন ওয়েস্ট শিওপ্রসাদের সহযোগিতায় ১৮৮৫ সালে ভিক্টোরিয়া মিল্স্ প্রতিষ্ঠা করেন। শিওপ্রসাদ ছিলেন একজন সুপরিচিত ব্যাঙ্কার ও ব্যবসায়ী। তাঁর একটি ছোট কারখানা ছিল সুতো তৈরির ও তাঁত বোনার। ১৮৯৭ সালে গ্যাভিন জোন্স্ এম্প্যায়ার ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড স্থাপন করেন। সংস্থাটি ছিল কাঠামো নির্মাণের একটি কারখানা যার উৎপাদনের উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় চাহিদা পূরণ। কারখানাটিতে তৈরি হতো কূপ খননের ও অন্যান্য খনন যন্ত্র। এর অধিকাংশ ব্যবহৃত হতো 'শুধুমাত্র পৌরসভার প্রয়োজনে এবং জলনিষ্কাশন ও আবর্জনা-দূরীকরণে।'[৮৮]

১৯০০থেকে ১৯৩০সালের মধ্যে কানপুরের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ম্যানেজিং এজেন্সি হাউস বেগ, সাদারল্যান্ড অ্যান্ড কোম্পানি শিল্পক্ষেত্রে কোনো প্রধান দায়িত্ব নেয়নি ১৮৯৪ সালে কানপুর সুগার ওয়ার্কস্ লিমিটেড গঠন করার আগে পর্যন্ত। কারখানাটি চিনি উৎপাদন আরম্ভ করে ১৮৯৫ সালে। উৎপাদনের পদ্ধতি ছিল গোঁড়া হিন্দু সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য (অস্থি-কয়লা বা অন্যানা প্রাণীজাত দ্রব্যের সংশ্রববিহীন পদ্ধতি)।[৮৯] সংস্থাটি ১৯০৫-এ চালু করে চম্পারণ সুগার কোম্পানি লিমিটেড। এই সংস্থা ১৯১৪সালে এলগিন মিল্সের ম্যানেজিং এজেন্ট ছিল, ব্রাশওয়্যার লিমিটেডেরও। তাছাড়া, স্টার্লিং কোম্পানির এবং ইন্ডিয়ান ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই অ্যান্ড ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেডের স্থানীয় এজেন্টের কাজও সংস্থাটি করত।[৯০]

বেগ, সাদারল্যান্ড অ্যান্ড কোম্পানি ১৮৫৬ সালে কানপুরে বেগ, ক্রিস্টি অ্যান্ড কোম্পানি হিসাবে কাজ আরম্ভ করে (এই কোম্পানির সঙ্গে তারও আগে যোগাযোগ ছিল জন কার্ক অ্যান্ড কোম্পানি নামের একটি সংস্থার। সংস্থাটি কানপুরে বণিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪২-এর আগে)।[৯১] কোম্পানিটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ড: ডেভিড বেগ যুক্তরাজ্য থেকে ভারতে এসেছিলেন ১৮৩০-এর দশকের শেষ দিকে ড: চার্লস ম্যাককিন্ননের সহযোগী হিসাবে। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন বিহারের নীল ও আখ আবাদকারীদের চিকিৎসক। কালক্রমে বেগ নীলের ব্যবসায়ে মালিকানার বড় অংশ ক্রয় করেন এবং তার পরে কানপুরে বেগ, ক্রিস্টি অ্যান্ড কোম্পানি এবং কলকাতায় বেগ, ডানলপ অ্যান্ড কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন।[৯২] ১৮৯৪ সালের আগে বেগ, সাদারল্যান্ড অ্যান্ড কোম্পানির প্রধান ব্যবসা সীমাবদ্ধ ছিল নীলের বীজ ও সাধারণ বাণিজ্যিক পণ্যের মধ্যে। কোম্পানিটি নীলের আবাদকারীদের এজেন্ট

হিসাবেও কাজ করেছিল। এই আবাদকারীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ইয়োরোপীয়। পরবর্তীকালে কোম্পানিটি বড় রকমে চিনি উৎপাদন আরম্ভ করে, বিশেষত যখন নীলের ব্যবসা বিপর্যস্ত হলো জার্মানদের দ্বারা এনিলিন রঞ্জক আবিষ্কারের ফলে।

৬.৮ ১৯১৪ পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতে ব্যবসায় উদ্যোগ

বাংলায় যেমন মাদ্রাজেও তেমনই রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের সমগ্র অংশই ছিল ইয়োরোপীয়দের হাতে কেন্দ্রীভূত। তিনটি প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কের অন্যতম—ব্যাঙ্ক অব্ মাদ্রাজের ১৮৭৬ সালে স্থাপনকাল থেকে ১৯২১-এ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব্ ইন্ডিয়ার অঙ্গীভূত হওয়া পর্যন্ত কোনো সময়েই ভারতীয় পরিচালক ছিল না।[৯৩] ১৯২৩ সালের দিকে মাদ্রাজ চেম্বার অব্ কমার্সের মাত্র দুজন ভারতীয় সদস্য ছিল— তাঁদের একজন হলেন স্যার এস. আর. এম. আন্নামালাই চেট্টিয়ার এবং অন্যজন এইচ. এম. ইব্রাহিম সাইত।[৯৪]

এই পর্বে বোম্বাই ও বাংলার তুলনায় সমগ্র দক্ষিণ ভারত শিল্পের ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল; তবে আলোচ্য পর্বের শেষ ভাগে শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়েছিল। শিল্প বলতে অবশ্য ছিল কিছু চা ও কফি বাগিচা, কয়েকটি সুতিবস্ত্রের কারখানা, কয়েকটি ইঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠান, চালের কল, তুলোর বীজ থেকে তুলো ছাড়ানোর যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত শিল্প বলতে যা কিছু ছিল তা মূলত ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণেই ছিল। কয়েকটি ক্ষেত্রে অবশ্য ভারতীয়দের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগও ছিল।[৯৫]

১৯১৪-র আগে পর্যন্ত মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে যেসব অগ্রণী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ছিল—যেমন, বেস্ট অ্যান্ড কোম্পানি, বিনী অ্যান্ড কোম্পানি, প্যাবি অ্যান্ড কোম্পানি এবং এ. অ্যান্ড এফ. হার্ভে—সেগুলি শুরু করেছিল বাণিজ্য দিয়ে। বেস্ট অ্যান্ড কোম্পানি যে সব বাণিজ্যে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছিল সেগুলি হলো পশুর চামড়া ও হাড় এবং তৈলবীজ রপ্তানি এবং ম্যাঞ্চেস্টার থেকে সুতির কাপড় আমদানি ইত্যাদি। এরা ছিল অ্যাংলো ফ্রেঞ্চ টেক্সটাইল কোম্পানি লিমিটেডের এজেন্ট। অ্যাংলো ফ্রেঞ্চ কোম্পানিটি ১৮৯৮ সালে স্টার্লিং কোম্পানি হিসাবে রেজিস্ট্রীকৃত হয়েছিল। এদের হাতে আরও অনেক কোম্পানির এজেন্সি ছিল, যেমন পি অ্যান্ড ও স্টিম নেভিগেশন কোং লিমিটিড, দি অ্যাঙ্কর লাইন, দি বরাকর কোল লিমিটেড, দি মাইসোর গোল্ড মাইনিং কোং লিমিটেড, এবং সোনার খনির কাজের সঙ্গে যুক্ত এরকম আরও কয়েকটি কোম্পানি যথা, দি কোলার মাইনস পাওয়ার স্টেশন লিমিটেড, দি কোলার গোল্ড্ ফিল্ডস ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্ট এবং নোবেল্স্ এক্সপ্লোসিভ্স্ লিমিটেড।[৯৬] ১৯১৪-১৫-এ বিনী অ্যান্ড কোম্পানি 'মাদ্রাজ শহরের সম্ভবত সর্ববৃহৎ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ছিল এবং তাদের গ্রাহকদের সাথে ব্যবসায়িক স্বার্থ আরও সুরক্ষিত করতে এদের নিজস্ব ব্যাঙ্কও ছিল। ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্টিম নেভিগেশন কোং লিমিটেডের এজেন্ট হিসাবে মেসার্স বিনী অ্যান্ড কোম্পানি প্রচুর নৌকা সংগ্রহ করেছিল এবং সেগুলির মাধ্যমেই মাদ্রাজ বন্দরের আমদানির বেশিরভাগ অংশ চলাচল করত।'[৯৭] এই প্রতিষ্ঠানটি মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাস্টের 'ল্যান্ডিং এজেন্ট' ছিল এবং এই সুবাদে এর অধীনে ছিল অনেক মালবাহী নৌকা ও স্টিমার, নৌকা মেরামতির জন্যে একটি ডক ইয়ার্ড। 'রপ্তানিকারকদের

গুদাম থেকে বন্দবে পণ্য পবিবহণেব অসুবিধা দেখা দেওয়ায তাবা নিজস্ব পবিবহণ ব্যবস্থাও গড়ে তুলেছিল।' '

বিনী অ্যান্ড কোম্পানি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি এলাকায সুতিবস্ত্র শিল্পেবও অগ্রদূত ছিল। এই কোম্পানি দি বাকিংহাম নীল কোম্পানি লিমিটেডেব সেক্রেটাবি হিসাবে কাজ কবত। বাকিংহাম কোম্পানি ভাবতে ১৮৭৬ সালে বেজিস্ট্রীকৃত হয এবং ১৮৭৭-এ এব ফ্যাক্টবিতে সুতো তৈবিব কাজ শুরু হয এবং কাপড তৈবিব কাজ শুরু হয় ১৮৯০ সালে। বিনী অ্যান্ড কোম্পানি দি কর্ণাটক মিল কোম্পানি লিমিটেডেব কোষাধ্যক্ষ হিসাবেও কাজ কবত। এই কোম্পানিটি ভাবতে বেজিস্ট্রীকৃত হয ১৮৮১ সালে এবং তাবপব সুতো ও কাপড তৈবিব মিল হিসাবে কাজ শুরু কবে। এই দুটি মিল ভাবতে সবচেযে লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠানে পবিণত হয প্রথম দিকে, তাদেব উৎপাদিত পণ্য স্থানীয বাজাবে বিক্রয হতো এবং পবে স্বদেশী আন্দোলন গডে উঠলে এদেব পণ্য সাবা ভাবত জুডে বিক্রয হতে থাকে। এই কোম্পানিগুলিব অবস্থান আবও জোবদাব হয যখন তাবা দীর্ঘ আঁশযুক্ত স্থানীয তুলো— বিশেষ কবে 'কাম্বোডিযা তুলো'-ব সাহায্যে উৎপাদন শুরু কবে। এই প্রতিষ্ঠানটি বাঙ্গালোবেব দি বাঙ্গালোব উলেন, কটন অ্যান্ড সিল্ক মিল্‌স্ কোং লিমিটেডেব তবফে এজেন্ট, সেক্রেটাবি ও ট্রেজাবাব হিসাবে কাজ কবছিল। কোম্পানিটিব পত্তন হযেছিল ১৮৮৪ সালে 'দি বাঙ্গালোব উলেন মিল্‌স্' (যেটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৭৯সালে) -এব ব্যবসাযেব দাযিত্ব নেওযাব জন্যে। পবে এব উৎপাদিত সামগ্রীব মধ্যে সিল্ক ছাডা সুতো ও সুতিব কাপডও যুক্ত হয। বিনী অ্যান্ড কোম্পানি এব এজেন্ট হয ১৮৮৬ সালে। ১৮৮৬ থেকে ১৯১৪-ব মধ্যে 'দি বাঙ্গালোব মিল্‌স কোম্পানি'ব ব্যবসাযেব আযতন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায। এই কোম্পানি খোলা বাজাবে উন্নত মানেব সুতো এবং সবকাবেব কাছে সেনাবাহিনীব জন্যে কম্বল ও 'ব্লুল্‌স্' বিক্রয কবত।' ' বিনী অ্যান্ড কোম্পানি মাদ্রাজ ইলেকট্রিক সাপ্লাই কবপোবেশন অব্ ইন্ডিযা লিমিটেড, কযেকটি সুতিবস্ত্র কোম্পানি এবং অনেকগুলি বীমা কোম্পানিব এজেন্ট হিসাবেও কাজ কবত।

অষ্টাদশ শতাব্দীব শেষ দিকে প্যাবী অ্যান্ড কোম্পানি কাজ শুরু কবেছিল। এই কোম্পানি টাকা ধাব দিত কর্নেল কালেন (যিনি নীল চাষ ও চিনির উৎপাদন নিযে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু কবেছিলেন) এবং এডওযার্ড ক্যাম্পবেলকে (যিনিও প্রথমে নীল চাষ এবং পরে চিনি উৎপাদনে আত্মনিযোগ কবেছিলেন)। কিন্তু ১৮৩৬-এ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ভারত থেকে ইংল্যান্ডে চিনি আমদানিব উপর আরোপিত শুল্কের হারে সমতা আসার পর প্যাবী অ্যান্ড কোম্পানি চিনি শিল্পে প্রবেশ করে। ১৮৪৫-এ ইংল্যান্ডে চিনি আমদানির উপর শুল্ক যখন তুলে নেওযা হলো তখন ভাবতেব অধিকাংশ নতুন চিনি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলি লোপ পেল। কেবলমাত্র দক্ষিণ আর্কটে প্যারী অ্যান্ড কোম্পানির এবং আস্কায় বিনী অ্যান্ড কোম্পানিব ফ্যাক্টবিগুলি টিকে গেল। দক্ষিণ আর্কটের প্যারী কোম্পানির ফ্যাক্টরিটি কালক্রমে বৃহৎ আকাব নিযে পরিণত হলো ইস্ট ইন্ডিয়া ডিস্টিলারিজ অ্যান্ড সুগার ওয়ার্ক্‌স্ লিমিটেড নামক কোম্পানিতে (ইংল্যান্ডে বেজিস্ট্রীকৃত) যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল আর্কট সুগার ওয়ার্কস অ্যান্ড ডিস্টিলারিজ নামে আর একটি কোম্পানি। ১৯০২-এ বিনী অ্যান্ড কোম্পানি যখন আর্থিক ক্ষতি ও অসুবিধার কারণে ডেকান সুগার অ্যান্ড আবখারি কোম্পানিটি প্যারী

কোম্পানির হাতে তুলে দিল, তখন চিনি ও সুরা উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমগ্র দক্ষিণ ভারতে প্যারী অ্যান্ড কোম্পানি বস্তুত একচেটিয়া উৎপাদক হয়ে উঠল। এই কোম্পানি দক্ষিণ ভারতে সার উৎপাদনের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলো।[১০১]

এ অ্যান্ড এফ হার্ভের প্রতিষ্ঠানটি ১৮৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শুধুমাত্র তুলো রপ্তানিকারী ফার্ম হিসাবে। ক্রমে এই ফার্ম ১৮৮৪ সালে অমবাসামুদ্রমে প্রতিষ্ঠা করল 'দি টিনেভেলি মিলস্'; ১৮৮৯-এ টিউটিকোরিনে স্থাপন করল 'দি কোরাল মিল্স্' এবং ১৮৯২-এ 'দি মাদুরা মিলস্'। শেষোক্ত কারখানাটিতে ১০০,৫৩৬-টি তাঁত ছিল এবং এটিই দক্ষিণ ভারতের সর্ববৃহৎ কারখানায় পরিণত হয়েছিল। ১৯১৪ পর্যন্ত সমস্ত মিলগুলিতেই কেবলমাত্র সুতো তৈরির কাজ চলত।[১০২]

সুতি শিল্পে আর একটি ব্রিটিশ ফার্ম উদ্যোগী হয়েছিল— তা হলো, টি. স্টেন্স্ অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড। এই কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা, রবার্ট স্টেন্স্ এবং তাঁর পরিবারের লোকজন নীলগিরি অঞ্চলে কফির চাষ শুরু করেছিলেন, কফি তৈরির কারখানাও স্থাপন করেছিলেন এবং এইভাবে কোয়েম্বাটুরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা মাদ্রাজের আর্বুথনট অ্যান্ড কোম্পানির সঙ্গে যৌথভাবে প্রতিষ্ঠা করলেন কোয়েম্বাটুর স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং ফ্যাক্টরি এবং যখন শেষোক্ত কোম্পানিটি উঠে গেল তখন ১৯০৭-এ স্টেন্স্ এর কোম্পানি সমগ্র ফ্যাক্টরিটির নিয়ন্ত্রণভার হাতে তুলে নিল। পরবর্তীকালে তাঁরা কোয়েম্বাটুর ম্যাল্ মিল্স্ কোম্পানি লিমিটেডের পরিচালনার ভারও নিজেদের হাতে নিয়ে নেন।[১০৩] শেষত, আমরা ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্মের একটি গোষ্ঠীর সন্ধান পাই যেমন, ম্যাসে অ্যান্ড কোম্পানি এবং ক্রম্পটন ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানি (এটি একটি ফার্মের শাখা যার সদর দপ্তরের অবস্থান ছিল ইংল্যান্ডে)। এই কোম্পানিগুলি তাদের নিয়মিত কাজের জন্যে রেল ও পূর্ত বিভাগের উপর খুব বেশি মাত্রায় নির্ভরশীল ছিল। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি এলাকায় ইঞ্জিনীয়ারিং কাজকর্মের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ছিল পুরোপুরি ইয়োরোপীয়দের হাতে। মাদ্রাজ সরকারের প্রথম উদ্যোগ অ্যালুমিনিয়ম দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন সংস্থা হস্তান্তরিত করে দেওয়া হয়েছিল মাদ্রাজের একজন ব্যারিস্টার আর্ডলি নর্টনকে এবং প্রাথমিকভাবে এই সংস্থা কেনার জন্যে অনুদানও দেওয়া হয়েছিল।[১০৪]

দিল্লী ও পাঞ্জাবে কয়েকটি সুতো কল, কার্পেট ও সুরা তৈরির কারখানা স্থাপিত হলেও এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে বন্দর হিসাবে মাদ্রাজকে ছাড়িয়ে ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম বন্দর হিসাবে পরিগণিত হলেও, করাচির পশ্চাতভূমি কিন্তু পুরোমাত্রায় কৃষিভিত্তিক থেকে গিয়েছিল। সুরা কারখানাগুলি ডায়ার পরিবারের বিভিন্ন শাখা দ্বারা পরিচালিত হতো। ভারতে সামরিক দপ্তরগুলিতে মদ সরবরাহ করার উদ্দেশ্যেই ডায়ার কসৌলিতে সুরা উৎপাদন শুরু করেন এবং ১৮৬০ সালে মুরীতে স্থাপিত প্রথম বৃহৎ সুরা কারখানার ম্যানেজার হন। যখন পাঞ্জাব সরকার সুরা উৎপাদন বন্ধের আদেশ জারি করে তখন ডায়ার ভ্রাতৃদ্বয় ১৮৯৮ সালে অমৃতসরে সুরা তৈরির কারখানা চালু করেন। ডায়ার পরিবার এবং তার সহযোগীরা এতগুলি সুরা কারখানা স্থাপনের প্রাথমিক সুবিধাগুলি ক্রমশ সংহত করে তোলে, প্রথমে সরকারি দপ্তরগুলিতে এই পানীয় সরবরাহের দীর্ঘকালীন চুক্তির মাধ্যমে এবং পরবর্তীকালে স্বল্পকালীন ভিত্তিতে হলেও সরকারি চুক্তিগুলির একচেটিয়া অধিকার পাওয়ার মাধ্যমে।[১০৫]

৬.৯ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, ইয়োরোপীয় ভারতীয় উদ্যোক্তাদের আপেক্ষিক শক্তির পরিবর্তন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে ভারতীয় অর্থনীতির উপর ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীদের কর্তৃত্ব অনেক শিথিল হয়ে গিয়েছিল। ভারতের প্রায় সর্বত্রই অনেক ইয়োরোপীয় যুদ্ধের কাজে স্বেচ্ছাসেবী হয়ে গিয়েছিলেন।[116] যুদ্ধে গ্রেট ব্রিটেন যোগ দেওয়ার ফলে এবং জাহাজের ঘাটতি দেখা দেওয়ায় সুতিবস্ত্রের আমদানি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। একই কারণে পাট ও অন্যান্য প্রধান কয়েকটি দ্রব্যের রপ্তানিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অন্যদিকে, ভারতীয় উদ্যোক্তাদের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত সুতিবস্ত্র শিল্প চাহিদা বৃদ্ধির ফলে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। সামরিক ও নৌবাহিনীর জন্যে যোগান দিতে ইঞ্জিনীয়ারিং ও অন্যান্য ব্যবসায়ে অনেক ভারতীয় সংস্থা এই সময়ে গড়ে উঠেছিল। যুদ্ধের অবসানে দেখা গেল ভারতের সাথে অন্যান্য দেশের বর্হিবাণিজ্যে—বিশেষ করে গ্রেট ব্রিটেনের সাথে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে গেছে : ভারতে সুতিবস্ত্রের আমদানির পরিমাণ ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে যুদ্ধকালীন বছরগুলিতে নগণ্য স্তরে নেমে গিয়েছে। অন্যান্য পণ্যের যেমন, লোহা ও ইস্পাত, কাগজ ও সিমেন্ট, ইত্যাদির ক্ষেত্রেও আভ্যন্তরীণ চাহিদার অধিকাংশ ভারতেই উৎপাদিত হতে শুরু করেছিল।

কিন্তু চালু কারখানাগুলিব উপর ইয়োরোপীয়দের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রভাব সম্ভবত খুব বেশি উল্লেখযোগ্য ছিল না। যদিও এরকম দাবি করা হয়েছে যে, পাট শিল্পে ভারতীয়দের নিযন্ত্রণে যে শেয়ার ছিল তা 'শতকরা ৬০ ভাগের কম নয়'[117] তবুও শেয়ার হোল্ডারদের বিস্তৃত তালিকা না থাকার ফলে এই দাবির যাথার্থ্যতা প্রমাণ করা শক্ত।[118] ইয়োরোপীয় ফার্ম দ্বাবা নিয়ন্ত্রিত পাটকলগুলির পরিচালকমণ্ডলীতে বাঙ্গুর এবং অন্যান্য কয়েকটি ভারতীয় নাম বাদ দিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পাট কোম্পানির শেয়ারের বৃহৎ অংশ যে ভারতীয়দেব হাতে ছিল তার কোনো প্রমাণ পাওযা যায় না।[119] দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে কোনো পাটকলেরই নিয়ন্ত্রণ ইযোরোপীয়দের হাত থেকে ভারতীয়দের হাতে চলে যায় নি। ১৯৩২ নাগাদ টিটাগড় পেপার মিলের (বার্ড-হিলজার্স গোষ্ঠীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত) সাধারণ শেযারের অংশ ভারতীয়দের হাতে ছিল ৫৬ শতাংশ। কিন্তু ভারতীয়দের হাতে এই কোম্পানির প্রেফারেন্স (পুরনো ইস্যু), প্রেফাবেন্স (নতুন ইস্যু) এবং ডেফার্ড শেয়ার ছিল যথাক্রমে ৩৯, ৩৩ ও ২৮ শতাংশ।[120] একই সময়ে বামার লরি অ্যান্ড কোম্পানি নিয়ন্ত্রিত বেঙ্গল পেপার মিলে ভারতীয় শেযার হোল্ডারদের হাতে ছিল সাধারণ শেয়ারের ৪৩ শতাংশ (মূল্য ৩৮৭,০০০ টাকা), ৭ শতাংশ চক্রবৃদ্ধি হারে দেয় সুদের প্রেফারেন্স শেয়ারের ৫৮ শতাংশ (মূল্য ১১৬,০০০টাকা), এবং ঐ একই হারে দেয় সুদের 'ক' শ্রেণীভুক্ত প্রেফারেন্স শেয়াবের ২৫·৫ শতাংশ।[121] প্যাট লভেট তাঁর *দি মিরর্ অব্ ইনভেস্টমেন্ট* (কলকাতা, ১৯২৭) বই -এ দেখিয়েছেন যে ইয়োরোপীয় ম্যানেজিং এজেন্সি পরিচালিত কোম্পানিগুলিতে শেয়ারের সিংহভাগ থাকত ভারতে বা ইংল্যান্ডে অবস্থিত ম্যনেজিং এজেন্ট বা তাদের সহযোগীদের হাতে। এরও আগে ডাবলু. এ. আয়রনসাইড ভারতীয় শিল্প কমিশনকে জানিয়েছিলেন যে, পাট কোম্পানিগুলিতে '১৪৮ লক্ষ টাকা মূল্যের শেয়ার ছিল

ইয়োরোপীয়দের হাতে এবং ভারতীয়দের হাতে ছিল ২৫ লক্ষ টাকাব শেয়ার।'[১১২]

এই রকম সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল যে ব্রিটিশ শেয়ার হোল্ডারদের মালিকানায় যত মূলধন ছিল তার তুলনায় অনেক বেশি শিল্পপুঁজি ব্রিটিশ ম্যানেজিং হাউসগুলি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করত। কিন্তু সে সময়ে প্রতিষ্ঠিত অধিকাংশ কোম্পানির উপর কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ ছিল নিশ্চিতভাবে এই সব শেয়ার হোল্ডারদের হাতে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানও এই ঘটনাকে সমর্থন করে। বিনী অ্যান্ড কোং-এর স্যার ক্লিমেন্ট সিম্পসন ভারতীয় শিল্প কমিশনের কাছে দেওয়া সাক্ষ্যে বলেছেন যে, বাকিংহাম মিলের মোট শেয়ারের দশ শতাংশ ছিল ভারতীয়দের হাতে।[১১৩] রেজিস্ট্রার অব্ কোম্পানিজ্, কলকাতা অফিসে ১৯৬৭ পর্যন্ত যে কয়টি কোম্পানির শেয়ার হোল্ডাবদের তালিকা খুঁজে পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে একটি হলো রায়ম সুগার কোম্পানি। ১৯১৩ সালে এই কোম্পানি রেজিস্ট্রীকৃত হয় এবং বেগ, মাদারল্যান্ড অ্যান্ড কোম্পানি এটি নিয়ন্ত্রণ করত। ১৯১৪ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে এই কোম্পানির প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের মোট ৩৯৫৮৫-টি শেয়ারের মধ্যে ভারতীয়দের হাতে (ভারতীয় ব্রোকারসহ) ছিল মাত্র ৪০২৫-টি শেয়ার এবং বাকি শেয়ার ছিল ভারতে বা ইংল্যান্ডে অবস্থিত ইয়োরোপীয়দের হাতে। একই কোম্পানিতে পরবর্তী বছরগুলিতে ভারতীয়দের হাতে থাকা শেয়ারের পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ : ১৯১৯-এর ২৩ শে অগাস্টে ৩৬২৫ -টি, ১৯২০-র ২১ শে অগাস্টে ৫৬৭৫-টি, ১৯২৫-এর ১৭ই অক্টোবরে ৪৪২৫-টি এবং ১৯৩২-এর ৩০ শে অগাষ্টে ৬০০০-টি (এই সমস্ত বছরগুলিতে মোট শেয়ারের সংখ্যা ছিল ৪০০০০)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই পরিস্থিতি একেবারে আমূল বদলে গেল যখন থেকে ভারতীয়দের হাতে শেয়ারেব সিংহভাগ এসে গেল— ইতিমধ্যে যার পরিমাণ দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল। উপরোক্ত সমস্ত তথ্য একসূত্রে গাঁথলে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে পড়ে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকে যেসব কোম্পানি ব্রিটিশ ম্যানেজিং হাউসগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল সেগুলি দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়কালে আগের মতোই একইভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল এবং শুধু তাই নয়, এই সমস্ত সংস্থার পুঁজির মালিকানাও মূলত কেন্দ্রীভূত ছিল ভারতে বা ইংল্যান্ডে বসবাসকারী ব্রিটিশদের হাতে।[১১৪]

অন্যান্য কয়েকটি পরোক্ষ প্রমাণ ও তথ্য থেকেও উপরোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায়— যেমন, ১৯২৭পর্যন্ত পাটকলগুলিতে মুনাফার হার. ১৯২১-২২ থেকে ১৯২৫-২৬ পর্যন্ত সময়ে বিদেশ থেকে বেসরকারি পুঁজি আসার পরিমাণ, তিরিশের দশকে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত কাগজ ও চিনি শিল্পে মুনাফার হার, ইত্যাদি। তিরিশের দশকে ব্যক্তিগত বিদেশী পুঁজিব কিছু অংশ বিদেশে ফেরৎ পাঠানো হয়েছিল, যদিও তার বেশির ভাগ অংশই সরকারি খাতে পাঠানো হয়েছিল।[১১৫] এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত আগে চা, পাট ও কয়লার মতো প্রাচীন শিল্পে ইয়োরোপীয় ফার্মের মূলধন বিনিয়োগ ছিল শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশি।[১১৬]

দুই যুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ে নতুন শিল্পোদ্যোগগুলিতে ভারতীয়দের ভূমিকা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। ১৯১৯-২০ থেকে ১৯২১-২২—এই বছরগুলিতে যুদ্ধোত্তর সমৃদ্ধি হঠাৎই বৈদেশিক প্রতিযোগিতার চাপে থমকে গেল ওবং অনেক ভারতীয় ও ব্রিটিশ সংস্থা বন্ধ হয়ে গেল। এক অর্থে এই শতকের বিশের দশকটি ছিল অচলাবস্থার সময়।

এই পর্বে ভারতীয় পুঁজি অন্তত একটি ক্ষেত্রে এই অচলাবস্থা ভেঙে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল এবং তা হলো ১৯২৪-এর পর টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি তার অবস্থা আরও সুসংবদ্ধ ও দৃঢ় করে তুলেছিল। টাটা গোষ্ঠীর পরিচালনায় জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এই পর্বেই গড়ে উঠেছিল। অবশ্য বাধা ও সমস্যা অনেক ছিল যেমন, ১৯২৮-এর বোম্বাইয়েব কাপড়ের কলগুলিতে ধর্মঘট ও অন্যান্য নানাবকম অশান্তি এবং তার ফলে বিশের দশকে উৎপাদন-ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহাবে ব্যর্থতা এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ লগ্নীব ঝুঁকি, ইত্যাদি। ১৯২৯-এর পব থেকে এই কোম্পানিব পরিচালনার দায়িত্ব যৌথভাবে ন্যস্ত হল টাটা গোষ্ঠী এবং দি আমেবিকান অ্যান্ড ফবেন পাওযাব কোম্পানি ইন্‌কর্পোবেটেড নামে এক মার্কিন কোম্পানির উপর।[১১৭] অনেক ভাবতীয সংস্থা পাট শিল্পেও প্রবেশ করল। বিশের দশকেই সিমেন্ট শিল্পেও উদ্যোগ নিতে শুরু কবল মূলত ভারতীয়রাই, ফলে ভারতের আভ্যন্তরীণ চাহিদা প্রধানত দেশের নিজস্ব উৎপাদনের সাহায্যে মেটানো সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু প্রতিষ্ঠিত শিল্পক্ষেত্রে ব্রিটিশ সংস্থাগুলির আধিপত্য বেড়েই চলল। ১৯২৮সালে পাটশিল্পে অপেক্ষাকৃত বড় ব্রিটিশ ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসের নিয়ন্ত্রণে তাঁতের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ :

বার্ড অ্যান্ড হিলজার্স	৮২১৫
জার্ডিন, স্কিনার	৫৮৯৬
অ্যানড্রু ইউল	৫২৯৬
টমাস ডাফ্	৪৯৩৭
মোট তাঁতের সংখ্যা (অন্যান্য কোম্পানিগুলির অধীন তাঁতের হিসাবসহ)	৪৯৪৯১

অন্যদিকে ভারতীয় ফার্মগুলির নিয়ন্ত্রণে তাঁতের সংখ্যা ছিল মাত্র ২১৬৬।[১১৮] ১৯৩৬ সালেও এই অবস্থার বিশেষ তারতম্য ঘটে নি; সর্বমোট ৫৪২০০ তাঁতের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় চারটি ম্যানেজিং হাউসের নিয়ন্ত্রণে তাঁতের সংখ্যা ছিল এইরকম :

বার্ড অ্যান্ড হিলজার্স	৮৮৩৯
অ্যানড্রু ইউল	৮০৩০
জার্ডিন, স্কিনার	৬৫৪০
টমাস ডাফ্	৬৩৩৪

অতএব, ১৯২৮ এবং ১৯৩৬, উভয় বছরেই এই চারটি গোষ্ঠী মোট তাঁতের শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশি নিয়ন্ত্রণ করছিল। ১৯৩৬-এ ভারতীয় শিল্পসংস্থার নিয়ন্ত্রণে পাট শিল্পে তাঁতের সংখ্যা ছিল ৩৭৪৩ অর্থাৎ ১৯২৮-এর তুলনায় অবস্থার সামান্য উন্নতি ঘটেছিল। যদিও মোট তাঁতের সংখ্যার তুলনায় এই উন্নতি ছিল খুবই নগণ্য।[১১৯]

অন্যদিকে ভারতীয় নিয়ন্ত্রণে ছিল যে সবচেয়ে বড় শিল্প— সুতিবস্ত্র শিল্প, তা বিশের দশকে খুব গুরুতর সমস্যার মধ্যে পড়েছিল, বিশেষ করে বোম্বাইয়ে। ফলে ভারতীয় শিল্পদ্যোগের প্রধান শক্তি এসেছিল বোম্বাই ছাড়া অন্যান্য অঞ্চল থেকে।

সিমেন্ট ব্যতীত শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রে ভারতীয় উদ্যোগের গুরুত্ব টের পাওয়া যাচ্ছিল যখন থেকে অধিকাংশ সাধারণ ভোগ্য দ্রব্য শিল্পের জন্যে কার্যকরী সংরক্ষণের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছিল। সুতি বস্ত্র শিল্পে বিশের দশকেই দিল্লী একটি প্রধান শিল্পকেন্দ্র হিসাবে বিকশিত হয়ে উঠেছিল এবং এই উপমহাদেশে দ্বিতীয় বৃহত্তম কেন্দ্র হিসাবে এগিয়ে আসছিল আমেদাবাদ। চিনি শিল্পে উচ্চহারে শুল্ক চালু হওয়ার পর থেকেই অনেকগুলি সংস্থার উদ্ভব ঘটল যাদের অধিকাংশরই সঙ্গে এই শিল্পের কোনো পূর্বতন যোগাযোগ ছিল না। কাগজ শিল্পে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ শিল্পসংস্থাগুলি বিশেষ অগ্রগতি আনতে পারেনি; বরং এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উন্নতির স্বাক্ষর রেখেছিল বিড়লা ব্রাদার্স, করম চাঁদ থাপার এবং ডালমিয়া, জৈন, প্রমুখ ভারতীয় শিল্পদ্যোগী সংস্থাগুলি। ভারতের বাণিজ্যক্ষেত্রে রপ্তানি ও আমদানির গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে মূলত দেশীয় বাজারে যোগানের কাজে লিপ্ত ভারতীয় উদ্যোক্তাদের সুযোগ বৃদ্ধি পেতে থাকল।

৬.১০ ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে আঁতাত ও দ্বন্দ্ব

আলোচ্য সময়কালে ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় পুঁজির পারস্পরিক সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকে অর্থাৎ তাদের মৌলিক দ্বন্দ্বের প্রশ্নে, আমাদের আলোচনা কেন্দ্রীভূত হলেও এ কথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে ভারতীয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠী কখনই ইয়োরোপীয় বণিক সম্প্রদায় বা শাসককুলের সঙ্গে কোনোরকম সহযোগিতা করেনি। ব্রিটিশ শাসনের ফলে এ দেশে প্রাক-ধনতান্ত্রিক শাসকবর্গ একেবারে ধ্বংস না হলেও যে পরিমাণে দুর্বল হয়েছিল, সে পরিমাণে অগ্রগামী শ্রেণী হিসাবে ভারতীয় পুঁজিপতিদের উত্থানের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। বিরোধের কারণ যে ঘটনায় নিহিত ছিল তা হলো, ভারতীয় সম্পদ পূর্ণমাত্রায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠী অনেক বেশি সুবিধাজনক জায়গায় ছিল, যদিও সাম্রাজ্যের প্রকৃত বা কাল্পনিক স্থিতিশীলতা ধরে রাখার স্বার্থে উৎপাদিকা শক্তির পূর্ণ বিকাশ ব্যহত হয়েছিল। এই বিরোধ সত্ত্বেও এবং অংশত এই বিরোধের কারণেও অনেক ভারতীয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ইয়োরোপীয় বণিক সম্প্রদায় এবং ব্রিটিশ শাসক উভয়ের সাথেই সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা লাভজনক বিবেচনা করেছিল।

উনিশ শতকে ব্রিটিশ শিল্পদ্যোগী ও প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল পার্সী সম্প্রদায়। প্রথম ভারতীয় নাইট এবং পরবর্তী কালে ব্যারোনেট, স্যার জামশেদজী জিজিভয় জার্ডিন, ম্যাথেসন অ্যান্ড কোম্পানির সাথে চীনে আফিম ব্যবসায়ে অংশীদার হন। ভারতে প্রথম রেলপথ নির্মাণকারী সংস্থা-- দি গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়ে কোম্পানি— স্থাপনের সূচনা থেকেই তিনি যুক্ত ছিলেন।[১২০] এই রেলপথের অনেক অংশের নির্মাণকাজের সঙ্গে পার্সী ঠিকেদাররাও যুক্ত ছিলেন।[১২১] এছাড়া উনিশ শতকের মাঝামাঝি বোম্বাই পোতাঙ্গন বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাজে যুক্ত ছিল নামী জাহাজ তৈরির প্রতিষ্ঠান ওয়াদিয়া গোষ্ঠী। বোম্বাইয়ে ব্রিটিশ মার্কেন্টাইল গোষ্ঠীগুলির সাথে অন্যান্য পার্সী ব্যবসায়ীরাও যুক্ত ছিলেন।[১২২]

ব্রিটিশ ও ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সহযোগিতা কেবল পার্সী সম্প্রদায় বা পশ্চিম ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। হিন্দুরাও এই সহযোগিতার কাজে যুক্ত ছিল—যেমন, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ছিলেন বোম্বাইয়েব রিচি, স্টুয়ার্ট অ্যান্ড কোম্পানির দালাল (ব্রোকার)।[১২৩] পূর্ব ভারতে উনিশ শতকের প্রথম ভাগে দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং ঐ শতকের শেষ ভাগে নীল কমল সেন ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে ব্যবসার কাজে লিপ্ত ছিলেন। উনিশ শতক জুড়ে, বিশেষ করে পূর্ব ভারতের ক্ষেত্রে, ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের ব্যবসায়িক সম্পর্কের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পুঁজিবাদ ব্রিটেনের চালচিত্র যত বদলে দিচ্ছিল এবং আর্থিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় পুষ্ট হয়ে ভারতীয় বাজারের উপর তার নিয়ন্ত্রণ যত দৃঢ় হচ্ছিল তত ভারতীয়দের সঙ্গে ব্যবসায়িক সহযোগিতা থেকে সমতার ভিত্তিতে লাভ করার সুযোগ ইয়োরোপীয় বণিকদের কমে আসছিল। পূর্ব ভারতে উনিশ শতকের তিবিশ ও চল্লিশের দশকে ইয়োরোপীয ব্যবসায়ীদের সহযোগী হিসাবে পাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেযে বিখ্যাত ও উদ্যোগী ভাবতীয় ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। তিনিই ম্যানেজিং এজেন্সি ব্যবস্থার প্রবর্তক এরকম দাবি করা হযে থাকে, যদিও এ যাবৎ মনে করা হতো যে এই ব্যবস্থা একান্ত ভাবেই ব্রিটিশ-উদ্ভাবন।[১২৪] দ্বাবকানাথেব মৃত্যু ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতনের পর পূর্ব ভারতে ভারতীয শিল্পদ্যোগ একটা বড়সড ধাক্কা খেল। তিরিশের দশকের প্রথম দিকে ইযোরোপীয় এজেন্সি হাউসগুলির ব্যর্থতার ফলে ভারতীয মহাজনেরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং ব্রিটিশদের সাথে সহযোগিতার সুফল সম্পর্কে ধণাঢ্য ভারতীয়দের আস্থা বেশ টলে গিয়েছিল। অবশ্য ১৮৬০-এ দেখা যাচ্ছে পাট রপ্তানি ব্যবসায়ে প্লেফেয়ার, ডানকান অ্যান্ড কোম্পানিব সাথে সহযোগী হিসাবে যুক্ত ছিল এম. এম. বসাক অ্যান্ড ব্রাদার্স।[১২৫] ১৮৬৩-তে চারজন ভারতীয় এবং তিনজন ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ী একসঙ্গে মিলে প্রতিষ্ঠা করলেন ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন—এটিই ছিল ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক অব্ ইন্ডিয়ার আদি নাম।[১২৬] কিন্তু বিশ্বের অর্থের বাজারের কেন্দ্র হিসাবে লন্ডন শহরের ক্রমাগত প্রসার এবং ইয়োরোপ ও নবজাত উপনেবেশগুলিতে রপ্তানি পণ্য যোগানের উৎস হিসাবে পূর্ব ভারতের ক্রমবিকাশ ব্যবসায়ের অংশীদারি থেকে ভারতীয়দের হটিয়ে দিতে ইয়োরোপীয়দের সাহায্য করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে একমাত্র স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী ব্যতীত পূর্ব ভারতে বৃহৎ কোনো ব্রিটিশ ফার্মের অংশীদার হিসাবে বস্তুত আর কোনো ভারতীয় ব্যবসাযীকে দেখা যায় না।[১২৭] বোম্বাইয়ে অবশ্য ভারতীয় ব্যবসায়ীরা, বিশেষ করে সুতিবস্ত্র শিল্পে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শিল্পপতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেন, এবং ব্রিটিশ ও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে সহযোগিতার শর্তাবলী ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি সমতা-ভিত্তিক হলো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে যতই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শক্তিশালী এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্তি দুর্বল হতে লাগল, ভারত সরকার ততই চরমপন্থী রাজনীতির বিরুদ্ধে সমর্থন গড়ে তোলার জন্যে ভারতীয় ব্যবসায়ীগোষ্ঠীগুলিকে সুবিধা দিতে প্রস্তুত হচ্ছিল। ফলত, সরকারের কাছ থেকে সুবিধা পাওয়ার উদ্দেশ্যে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কোনো প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন হচ্ছিল না। অবশ্যই এ কথা সমস্ত শিল্প বা সব ধরনের ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, টাটা গোষ্ঠীর কথা বলা যেতে পারে—

যারা লোহা ও ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকারি সংরক্ষণের উপর খুবই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। ১৯২৫ সালে টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানির বোর্ড অব্ ডিরেক্টরের সদস্য ছিলেন নিম্নলিখিত ব্যক্তি : স্যার ডি. জে. টাটা, স্যার স্যাসুন ডেভিড, বার্ট, স্যার কাউয়াসজি জাহাঙ্গীর, বার্ট, স্যার ফজুলভয় করিমভয়, আর. ডি. টাটা, নরোত্তম মোরারজী, দি অনারেব্‌ল্ মি: লালুভাই সামলদাস, এফ. ই. দিন্‌শ, দি অনারেব্‌ল্ মি: ফিরোজ, সি. শেঠনা, স্যার পুরুষোত্তমদাস, ঠাকুরদাস এবং স্যার প্রভাশঙ্কর ডি. পট্টানি।[১২৮] লালুভাই সামলদাস এবং ফিরোজ সি. শেঠনা, এঁরা উভয়েই পরবর্তীকালে 'নাইট' উপাধি পেয়েছিলেন সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পরিচালকদের অধিকাংশই ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি আনুগত্যের প্রমাণ রেখেছেন। তাছাড়া টাটা গোষ্ঠী তাদের সংস্থায় ব্রিটিশ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মচারী অথবা রেলওয়ে বোর্ডের প্রাক্তন অফিসারদের নিয়মিতভাবে নিয়োগ করতে শুরু করল যাতে ভারতের শুল্ক বোর্ডের কাছে এইসব ব্রিটিশ অফিসাররা তাদের হয়ে ওকালতি করতে পারেন। জে. সি. কে. পিটারসন, আই. সি. এস, ১৯১৯ সালে টাটা সন্‌স্ লিমিটেড-এ একজন ডিরেক্টর হয়ে যোগ দেওয়ার আগে বাংলায় নিযুক্ত ছিলেন কন্ট্রোলার অব্ মিউনিশন্‌স্ এবং শিল্প বিভাগের অধিকর্তা হিসাবে। ঐ একই বছরে টিসকো-তে যোগ দিয়েছিলেন এস কে সডে— যিনি প্রথমে কাজ করেছিলেন ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে। তেমনই বলা যেতে পারে আর এইচ মাথের-এর নাম যিনি টিসকোতে ১৯২৭ সালে অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে যোগদান করার আগে ইস্পাত শিল্পে সংরক্ষণ দেওয়ার প্রশ্নে প্রথম অনুসন্ধান পর্ব চলার সময়ে ভারতীয় শুল্ক বোর্ডের কারিগরী পরামর্শদাতা ছিলেন। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের এক প্রতিনিধি স্যার ফ্রেডারিক জেম্‌স্-কে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন টাটা সন্‌স্ লিমিটেডের দিল্লী অফিসের দায়িত্ব দিয়ে নিযুক্ত করা হয়েছিল।[১২৯] টাটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের পরামর্শদাতা রূপে অল্পদিনের জন্যে কাজ করেছিলেন স্যার আলফ্রেড চ্যাটারটন। অন্য দিকে ১৯২৬ থেকে ১৯৩৬, এই দীর্ঘ দশ বছর ধরে যুক্তপ্রদেশ বিধান পরিষদে স্যার জাওলা প্রসাদ শ্রীবাস্তব প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ী অধ্যুষিত আপার ইন্ডিয়া চেম্বার অব্ কমার্সের এবং একই কেন্দ্র থেকে ১৯৩৭ সালে নতুন যুক্তপ্রদেশ বিধান পরিষদে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছিলেন।[১৩০]

পূর্ব ভারতে পাট শিল্পে এবং সাধারণভাবে রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যে ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ক্রমশই তীব্র হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া যে সমস্ত পণ্যের চাহিদা সরকার বা রেলওয়ের কাছ থেকে না এসে সাধারণ ভারতীয়দের কাছ থেকে আসত—সে সমস্ত পণ্যের বাজারের ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের প্রত্যক্ষ সরকারি সাহায্যের গুরুত্ব ছিল খুবই কম। ফলত ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় পূর্ব ভারতে ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেক বেশি প্রত্যক্ষ সংঘাতের প্রমাণ পাই।[১৩১]

ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় যতই তাদের সম্ভাব্য শক্তি ও সুযোগ সম্বন্ধে বেশি করে সচেতন হতে থাকল ততই বিদেশী মূলধন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি দ্ব্যর্থবোধক হয়ে উঠল। যখন তারা দেখল যে ইয়োরোপীয়দের নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়ের সঙ্গে ভারতীয় কোম্পানিগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হয়ে উঠেছে, তখন সামগ্রিকভাবে সমস্ত ধরনের বিদেশী মূলধন সম্বন্ধে

তাদের ধারণা প্রতিকূল হয়ে উঠল। অবশ্য যেহেতু তখনও পর্যন্ত রাষ্ট্রযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে তারা যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি এবং অন্য শ্রেণী বা গোষ্ঠী এসে যে ব্রিটিশ শাসকদের জায়গায় ক্ষমতার উত্তরাধিকার পেতে পারে সে বিষয়ে তারা সচেতন হয়ে উঠছিল। ব্রিটিশ শাসকরা যাতে সহজে ও ধীরে ধীরে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে সমর্থ হয় সে ব্যাপারে তারা আরও বেশি আগ্রহী হয়ে উঠল। শেষত, ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় যখন বৃহৎ শিল্পগুলির নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করল তখন দেখা গেল যে তাদের আর্থিক ও কারিগরি সম্পদ উন্নত পুঁজিবাদের মানের উপযুক্ত ছিল না। ফলে তারা সমস্ত উন্নত পুঁজিবাদী দেশ থেকে বিদেশী বিনিয়োগকে স্বাগত জানাতে আগ্রহী ছিল। অবশ্য শেষোক্ত এই প্রবণতা দেখা গেল একমাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালেই।[১৩২]

৬.১১ ভারতীয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর সামাজিক উৎস ও রাজনৈতিক স্বার্থ

এখন আমরা ভারতে শিল্প-উদ্যোগীদের সামাজিক, জাতীয় ও আঞ্চলিক মূলগুলিকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করব। ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে যাঁরা শিল্পে বড় সড় উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাঁরা সাধারণভাবে ব্যবসা, শ্রমিক নিয়োগের চুক্তি অথবা নীল ও চা উৎপাদনের মাধ্যমে সম্পদশালী হয়ে উঠেছিলেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, বার্ড অ্যান্ড কোম্পানি, অ্যান্ড্রু ইউল, বিনী অ্যান্ড কোম্পানি এবং বেগ, সাদারল্যান্ড অ্যান্ড কোম্পানির কথা। চা বা নীল উৎপাদনকারীরা কালক্রমে শিল্পক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্টের ভূমিকায় উন্নীত হয়েছিলেন—এ রকম ঘটনা বিরল।[১৩৩] ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্মের ইয়োরোপীয় মালিকদের মধ্যেও কেউ এমন ছিলেন না' যিনি শিল্পে কোনো বৃহৎ অংশে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে পেরেছিলেন। একমাত্র ব্যতিক্রম হলো মার্টিন অ্যান্ড কোম্পানি; কিন্তু ঐ কোম্পানির বিল্ডিং কন্ট্র্যাক্টর হিসাবে একটা বড় ব্যবসা ছিল, যার ফলে ব্যাপক সরকারি আনুকূল্যের সুযোগও পেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত এই কোম্পানি বার্ন অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবসায় মালিকানা লাভে সমর্থ হয়। শেষোক্ত কোম্পানিটি রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং-এ বিশেষত্ব লাভ করে এবং বিশের দশকে রেলে বিনিয়োগ হ্রাস পাওয়ার ফলে যথেষ্ট অসুবিধায় পড়ে।[১৩৪]

ইয়োরোপীয় ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসগুলি বাণিজ্য শিল্প, দালালি ও আবাদকারীদের পুঁজি সরবরাহ সংক্রান্ত ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিল, এবং বাণিজ্যিক ও শিল্প সংক্রান্ত ব্যবসায়িক স্বার্থের মধ্যে তখন কোনো গভীর পার্থক্য ছিল না। ভারতীয় ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসগুলি এদের অনুসরণ করে চলত। তারা বড় শিল্পপতিতে পরিণত হয় এবং বহু রকমের ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। হাউস অব টাটার মতো সংস্থার ব্যবসায়িক স্বার্থ এত বিস্তৃত ছিল না।

ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে বাণিজ্য ও শিল্পের উপর আধিপত্য স্থাপনের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পার্সীদের ভূমিকা চোখে পড়ে। দাবি করা হয়েছে, পার্সীদের মূল্যবোধ ছিল প্রোটেস্ট্যান্টদের মতো এবং তার ফলে তাদের অভ্যুদয় ঘটেছিল উদ্যোক্তা হিসাবে।[১৩৫] যাই হোক, আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি, পশ্চিম ভারতে সাধারণভাবে ভারতীয় শিল্পপতিরা—শুধুমাত্র পার্সী নয়—প্রস্তুতকারী শিল্পের নিয়ন্ত্রণে ছিলেন। প্রোটেস্ট্যান্ট মূল্যবোধ যদি পার্সীদের সক্ষম করে

তোলে শিল্প স্থাপনায় অগ্রণী ভূমিকা নিতে তা হলে কোন মূল্যবোধ আমেদাবাদে তুলোকল শিল্পের পথিকৃৎ হিসাবে বেনিয়া ও ব্রাহ্মণদের অভ্যুদয় ঘটিয়েছিল? কেনই বা পার্সীরা আমেদাবাদের তুলোকল শিল্পের প্রসারে কখনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেনি?[১৩৬]

ব্যবসার ক্ষেত্রে পার্সীদের অভ্যুদয়ের ব্যাখ্যা হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে বিশেষ একধরনের পরিস্থিতি যার উৎপত্তি ঘটে ভারতে সমুদ্রপথে ইয়োরোপীয় বণিকদের অনুপ্রবেশের সময় থেকে। বিভিন্ন ইয়োরোপীয় বণিক গোষ্ঠীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং তাদের সঙ্গে দেশীয় রাজাদের সম্পর্ক রক্ষা অথবা দালালদের প্রতিনিধিত্ব অথবা ব্রিটিশ ও ওলন্দাজ বণিকদের দোভাষী হওয়া—এই ধরনের বিচিত্র কাজে নিয়োজিত থাকার পূর্ব পর্যন্ত পার্সীরা নয়শত বছর ধরে নির্ভর করেছিল প্রধানত জমির উপর।[১৩৭] বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পার্সীরা সহযোগী হিসাবে ইয়োরোপীয়দের নজরে পড়েছিল, তাদের গুণের বিচারে এই ঘটনার যত-না গুরুত্ব তার থেকেও বেশি গুরুত্ব নিহিত ছিল তাদের মালিকদের আরও বেশি উদ্যোগী করে তোলায়।[১৩৮] যখন ইংরেজরা বোম্বাইতে কোনো বন্দর বা কারখানা স্থাপন করত পার্সীরা তখন তাদের অনুগামী হতো। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে যখন সুরাটের অবক্ষয় ঘটল তখন বোম্বাইয়ের অভ্যুদয় হলো ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের বৃহত্তম বন্দর হিসাবে এবং তার সঙ্গে পার্সীরাও সমৃদ্ধ হতে থাকল।[১৩৯] তারা প্রথমে মূলধন লাভ করল আফিমের বাণিজ্য[১৪০]থেকে এবং তারপরে, বিশেষত আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়ে, তুলোর বাণিজ্য থেকে।

ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে তাদের যতই বিশেষ সম্পর্ক[১৪১] থাকুক না কেন, পার্সীরা বাণিজ্য থেকে অত বেশি মূলধন সংগ্রহ করতে পারত না এবং বহির্বাণিজ্যের মারফৎ বাজারগুলির সঙ্গেও তেমন পরিচয় ঘটত না যদি পশ্চিম ভারতের ব্রিটিশ রাজত্ব কবলিত হতো ইস্ট্ ইন্ডিয়া কোম্পানির লোভাতুর রণজয়ে ও লুণ্ঠনে। শিখদের ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ছাড়া মারাঠারাই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সব থেকে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম চালিয়েছিল। ১৮১৮ সালে যখন পেশোয়া চূড়ান্তভাবে রাজ্যচ্যুত হলো তখনও রাজ্যের বিশাল এলাকা চারজন মারাঠা সর্দারের শাসনাধীন ছিল। তাঁরা ছিলেন, সিন্দিয়া, গাইকোয়াড়, হোলকার ও ভোঁশ্‌লে। অবশ্য পরবর্তীকালে শেষ মারাঠা শাসকের সমগ্র রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। মারাঠাদের সঙ্গে সংঘর্ষের কালে পার্সীরা ইংরেজদের কাছে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল সহযোগী হিসাবে অথবা কখনও পুঁজি সরবরাহকারী হিসাবে। উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বৃহত্তর রাজনৈতিক স্বার্থের তাগিদে ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যিক পদ্ধতিগুলিকে কিছুটা সহনীয় করে তোলার চেষ্টা আরম্ভ হয়। তাছাড়া, বোম্বাইয়ের পশ্চাৎপ্রদেশ কলকাতার পশ্চাৎপ্রদেশের মতো প্রসারিত ছিল না এবং রেল চালু হওয়ার আগে বোম্বাইয়ের ঐ অঞ্চল যথেষ্ট দুর্গম ছিল। ইংরেজরা দাক্ষিণাত্যের অপেক্ষাকৃত শুষ্ক মালভূমিতে নীল বা চায়ের আবাদ সম্ভবপর করে তুলতে পারেনি, সেখানে এমন কোনো মূল্যবান খনিজ সম্পদের সন্ধানও পায়নি যা তারা বাংলায় ও বিহারে পেয়েছিল। এই সব কারণে, শুধু পার্সীরাই নয়, পশ্চিম ভারতে সমস্ত ভারতীয় ব্যবসায়ীরাই পূর্ব ভারতের তুলনায় অনেক কম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েছিল। পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর দেশীয় ব্যবসায়ীরা দেশীয় প্রধানদের পৃষ্ঠপোষকতার উপর কিছুটা নির্ভর করতে পারত। আফিম বাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত মুনাফায় আমেদাবাদ ও

বরোদার বণিকদের অংশ ছিল। এই ব্যবসাকে বলা হতো মালোয়া বাণিজ্য।[১৪২] কিন্তু আফিম বাণিজ্যে যে মুনাফা পাওয়া যেত তা বোম্বাইয়ের মাধ্যমে সংঘটিত বাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত মুনাফার তুলনায় কম ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে পার্সীরাই ছিল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং পশ্চিম ভারতের একমাত্র ব্যবসায়ী সম্প্রদায় যেটি পরবর্তীকালে শিল্পে অনুপ্রবেশ করেছিল। অন্যান্য ব্যবসায়ীদের তুলনায় পার্সীদের কতগুলি বিশেষ সুবিধা ছিল : যেমন, তাদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা চালু ছিল না এবং তারা যে কোনো লাভজনক জীবিকাকে লজ্জাকর মনে করত না। একটি পার্সী পরিবার—ওয়াদিয়ারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উদ্দেশ্যে তৈরি জাহাজের প্রধান নির্মাণকারী হিসাবে ছিল যত দিন পর্যন্ত বোম্বাইয়ের পোতাঙ্গন (dockyard) বন্ধ হয়ে যায় নি। সমুদ্রযাত্রা বিরোধী কোনো সংস্কার পার্সীদের ছিল না। এই সব কারণে বাণিজ্যের পন্থা নির্ণয়ে পার্সীরা অপেক্ষাকৃত বেশি নমনীয় হতে পেরেছিল এবং কারিগরি শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে কিছু প্রারম্ভিক সুবিধা পেয়েছিল। যে কোনো ভারতীয় সম্প্রদায়ের (এবং অনেক সময়ে সমস্ত সম্প্রদায়গুলিকে এক করে ধরলেও) তুলনায় তুলোকলগুলিতে তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে, এমনকি ১৯২৫ সালেও, পার্সীরা সংখ্যায় বেশি ছিল।[১৪৩]

নাগরিক জীবন সম্পর্কে পার্সীদের ধ্যানধারণার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছিল। স্যার ফিরোজশাহ্ মেহ্তার অধীনে বোম্বাইয়ের পৌরশাসন একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ মডেলে পরিণত হয়েছিল। নগরের উন্নতির উদ্দেশ্যে তারা মোটা অঙ্কের টাকা দান করত এবং এর ফলে প্রথম দিকে জনাকীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বোম্বাই কলকাতার তুলনায় অনেক বেশি উন্নত শহরে পরিণত হয়।[১৪৪] পাটকলের ইংরেজ মালিকরা কুলিদের জন্যে ব্যারাক অথবা ম্যানেজারদের জন্যে নদীর ধারে বাংলো তৈরি করতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনই জনস্বার্থে অর্থ ব্যয় করেছিল।[১৪৫] এই সমস্ত সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, শিল্পক্ষেত্রে পার্সীদের নেতৃত্বের মূলে আছে যতটা ভারতের এক বিশেষ অঞ্চলে তাদের অবস্থিতি ততটা গোষ্ঠী হিসাবে তাদের বিশেষ গুণাবলী এবং প্রাথমিক সুবিধা।

শিল্প-পুঁজি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ভারতীয় ও ইয়োরোপীয়দের ক্ষমতার তারতম্যের নিরিখে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের বৈপরীত্যের ছবিটা আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি। এরকম দাবি আগেও করা হয়েছে এবং এখনও করা হয়ে থাকে যে, পূর্ব ভারতে শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে বিলম্বিত ভারতীয় উদ্যোগের পেছনে তিনটি বিষয় মূলত কাজ করেছিল : (ক) বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিল্প ও বাণিজ্যের কাজে বিরূপতা ছিল এবং মুক্ত ও উদারপন্থী বৃত্তির প্রতিই ছিল তাদের আগ্রহ (খ) সাধারণভাবে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য বা ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে আসতে আগ্রহী ছিল এবং শিল্পে অংশগ্রহণে অনীহা ছিল যেহেতু শিল্প থেকে আশু মুনাফার প্রতিশ্রুতি ছিল না।[১৪৬] (গ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে পূর্ব ভারতে বড় ব্যবসায়ীদের গুরুত্ব লোপ পেয়েছিল এবং ক্রমশ পূর্ব ভারত 'জমিদারদের স্বর্গে' পরিণত হয়েছিল কারণ অন্যান্য ধরনের বিনিয়োগের চেয়ে জমিতে বিনিয়োগ অনেক বেশি লাভজনক ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।[১৪৭]

শেষোক্ত বিষয়টিকেই প্রথমে ধরা যাক। যদিও একথা সত্য যে পূর্ব ভারতের ব্যবসায়ীদের জমিদারে পরিণত করার ব্যাপারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, তবু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের বাণিজ্যিক কাজকর্মের ফলে জমিদারদের লাভের ক্ষেত্র ইতিমধ্যেই বেশ সঙ্কুচিত ও সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী ও প্রথম যুগের ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেশীয় লগ্নিকারীদের সমস্যার সমাধান করতে পারে নি। অর্থের যোগানের জন্যে ভারতীয় মহাজন বা ব্যবসায়ীদের উপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ইয়োরোপীয় বণিকদের নির্ভরশীলতা কমানোর জন্যেই ব্যাঙ্ক অব্ বেঙ্গল স্থাপিত হয়েছিল। শুরুতে ব্যাঙ্ক অব্ বেঙ্গলের পরিচালন-সভায় একজন ভারতীয় ডিরেক্টর ছিলেন (১৮০৬ সালে ওই ব্যাঙ্ক অন্য নাম নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল); তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওযাব আগে পর্যন্ত এই ব্যাঙ্কে কোনো ভারতীয় ডিরেক্টর ছিলেন না।[১৪৮]

পরবর্তীকালে ভারতীয়—বিশেষ করে বাঙালি-ব্যবসায়ীদের দিক থেকে শিল্পে সাফল্য অর্জনের চেষ্টা হয়েছিল। ১৮৩০-এর দশকের প্রথম দিকে ইয়োরোপীয় এজেন্সি হাউসগুলির ব্যর্থতা তাদের সঙ্গে জড়িত অনেক ভারতীয় ব্যবসায়ীর ভাগ্য বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। অথচ এই সমস্ত এজেন্সি হাউসগুলির মূল অংশীদাররা সমুদ্রের ওপারে তাদের মুনাফা নিয়ে প্রায় নিরাপদেই ছিলেন। ১৮২৯–এ ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নিয়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করলেন ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক। কালক্রমে তিনি বাংলার কয়লা শিল্পের অন্যতম অগ্রদূত হয়ে উঠেছিলেন (তাঁর অধিকৃত কয়লাখনিগুলিই ছিল পরবর্তীকালের বৃহত্তম কয়লা কোম্পানি, বেঙ্গল কোল কোম্পানির ভরকেন্দ্র)। ভারতের নদীপথে বাষ্পীয় পোতের পরিবহণের প্রচলনের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন পথপ্রদর্শক।[১৪৯] দি ইন্ডিয়া জেনারেল অ্যান্ড নেভিগেশন কোম্পানিরও পূর্বসূরী ছিলেন দ্বারকানাথ ও তাঁর সহযোগী ইয়োরোপীয় বণিকেরা। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, ম্যানেজিং এজেন্সি ব্যবস্থার উদ্ভাবনের কৃতিত্ব ব্লেয়ার কিং দ্বারকানাথকে দিয়েছেন।[১৫০] কিন্তু ১৮৪৬-এ দ্বারকানাথের মৃত্যু এবং ১৮৪৭-এ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতনের পর ভারতীয় শিল্পোদ্যোগের এই পর্বের সমাপ্তি ঘটল। পরবর্তী ষাট বছর বা তারও বেশি সময় ধরে ইয়োরোপ ও উত্তর আমেরিকার ক্রমপ্রসারমান বাজারে পাট ও নীল—এই দুটি কাঁচামাল—এবং একটি নতুন পণ্য চায়ের রপ্তানির জোগানদার হয়ে উঠল বাংলা ও বিহার। অর্থনীতির উপর ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণ আরও গভীর ও বিস্তৃত হয়েছিল সম্ভবত ব্যবসা ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সমস্ত ক্ষেত্রেই তাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠাব মাধ্যমে। ১৮৬৩ সালে চারজন ভারতীয় ও তিনজন ইয়োরোপীয় ডিরেক্টর নিয়ে চালু হয়েছিল দি ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন, কিন্তু ১৮৬৬ সালে কোনো ভারতীয় ডিরেক্টর ছাড়াই এটি একটি স্টার্লিং কোম্পানিতে রূপান্তরিত হলো এবং পরিবর্তিত নাম হলো ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব্ ইন্ডিয়া।[১৫১] অবশেষে ১৮৪০-এর পর থেকে যান্ত্রিক তাঁত ও বাষ্পীয় ইঞ্জিনের জয়যাত্রার সাথে সাথে ব্রিটেনে পুঁজিবাদের যে অগ্রগতি শুরু হলো তা ভারতসহ অন্যান্য উপনিবেশগুলিকে ব্রিটিশ কলকারখানা ও শিল্পশহরগুলির খামারবাড়িতে রূপান্তরকরণের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করেছিল।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ অবশ্যই খুব সরলীকৃত ব্যাখ্যা। ইতিহাসের অনেকগুলি বিস্তৃত অধ্যায়কে মাত্র কয়েকটি অনুচ্ছেদে পুরে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তবু প্রচলিত যে সব ব্যাখ্যায় পূর্ব ভারতে শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতীয় উদ্যোগের অভাবের দায়ভাগ চাপানো হয়েছে মূল্যবোধ তথা জাতিগত সংকীর্ণতার উপর, উপরোক্ত বিশ্লেষণ সে সব ব্যাখ্যাকে অনেকটাই সংশোধন করবে। মধ্যবিত্ত বাঙালিরা না-হয় উদ্যোক্তার ভূমিকায় তেমন আগ্রহী ছিলেন না, কিন্তু উত্তর ভারতের মাড়োয়ারি ও বৈশ্যরা তো বেশ উদ্যমী ছিলেন।

এ রকম যুক্তি দিয়ে কোনো লাভ নেই যে ব্যবসায়ে বেশি আগ্রহ থাকার কারণে তাঁরা শিল্পস্থাপনে তেমন উদ্যোগী হননি, কারণ আমরা দেখেছি যে ব্রিটিশ ম্যানেজিং এজেন্টদেরও ব্যবসায়ে ভালো মতো স্বার্থ ছিল। তাছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর একই গোষ্ঠীর ব্যবসায়ীর আগ্রাসী উদ্যোক্তা হিসাবে আত্মপ্রকাশের ঘটনা কীভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব? এর উত্তর অংশত নিহিত আছে দুটি ঘটনার মধ্যে : (ক) প্রতিটি উপনিবেশ অর্থনীতির ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে, পূর্ব ভারতেও তা ঘটেছিল। সমগ্র পূর্ব ভারতের অর্থনীতি কাঁচামাল সরবরাহকারীর ভূমিকায় নিয়োজিত হয়েছিল। এবং (খ) শিল্পায়নের কাজ প্রথমে শুরু করা এবং বৈদেশিক বাজারের সাথে পরিচিত হওয়ার সুবাদেই যে ইয়োরোপীয়রা নিরবচ্ছিন্ন সুবিধা লাভ করেছিল তাই নয়; আর একটি কারণও ছিল— তা হলো, ভারতে ব্রিটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার নীতিতে ব্রিটিশদের প্রতি দাক্ষিণ্য এবং তার ফলে আর্থিক ও অন্যান্য পরিষেবার সুবিধা ব্যবসা ও শিল্পক্ষেত্রে ইয়োরোপীয় নিয়ন্ত্রণকে আরও বেশি সাহায্য ও পুষ্ট করেছিল।

এরকম জাতিগত পক্ষপাত যে ছিল তা সমকালীন লেখক ও ব্রিটিশ প্রশাসকদের মন্তব্য থেকেই প্রমাণিত ও সমর্থিত হয়।[১৫২] এখানে যে বিচার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যেই এর স্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়—যেমন, একই অপরাধের জন্যে ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় অপরাধীদের ভিন্ন মাত্রার শাস্তির বিধান ছিল। একজন ভারতীয়র বিরুদ্ধে একজন ইয়োরোপীয়র অপরাধের বিচার এবং কোনো ইয়োরোপীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে একজন ভারতীয়র অপরাধের বিচার, এই দুয়ের মধ্যে বৈষম্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি কীভাবে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে ইয়োরোপীয়রা সামাজিক বাধার প্রাচীর তুলে দিয়েছিল। এর ফলে রেলপথে পণ্য পরিবহণের কাজে ইয়োরোপীয়রা ভারতীয়দের থেকে অনেক ধরনের ও মাত্রার সুযোগ-সুবিধা বেশি পেত। কারণ, রেলওয়ের উচ্চ পদাধিকারীদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল ইয়োরোপীয়। তাছাড়া দায়িত্বপূর্ণ পদে লোক নিয়োগের ব্যাপারে ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীদের অনুসৃত নীতির মধ্যেও ভারতীয়দের বিরুদ্ধে জাতিগত বিদ্বেষের প্রতিফলন ঘটেছিল।[১৫৩] কারিগরি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত যাঁরা, তাঁদের যেহেতু দেশেই হোক বা বিদেশেই হোক—আরও বেশি ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হতো,[১৫৪] কোনো ভারতীয়র পক্ষে ব্যবসায়ের উপযোগী কারিগরি শিক্ষা অর্জনের পথে জাতিগত বিদ্বেষের এই নীতি গুরুত্বপূর্ণ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে একটি ঘটনা লক্ষ্য করলে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তা হচ্ছে এই যে, পূর্ব ভারতে পাটকলগুলিতে তত্ত্বাবধায়কের পদে কোনো ভারতীয়কে প্রায় দেখা যায় না। যদিও বিপরীতক্রমে পশ্চিম ভারতে কাপড়ের কলগুলিতে আরও বেশি কারিগরি দক্ষতার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও ঐ সব পদে ছিলেন প্রায় ক্ষেত্রেই কোনো ভারতীয়, বিশেষ করে ১৯২০-র পর থেকে।[১৫৫]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শিল্পোদ্যোগী শ্রেণী হিসাবে ভারতীয়দের মধ্যে যাঁদের উদ্ভব ঘটেছিল, তাঁরা সাধারণভাবে এসেছিলেন ব্যবসা ও বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় থেকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে অনেক ভারতীয় ডাক্তার ও আইনজীবী শিল্প প্রতিষ্ঠার কাজে হাত পাকানোর চেষ্টা করেছিলেন। এই ধরনের উদ্যোগে জমিদাররাও মাঝে মাঝে যুক্ত থাকতেন। ডাঃ নীলরতন সরকার বাংলায় শুরু করেছিলেন ন্যাশনাল ট্যানারি প্রতিষ্ঠার কাজ; বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ প্রতিষ্ঠা করলেন ডাঃ পি. সি. রায়।[১৫৬]

বোম্বাইয়ে শিল্পদ্যোগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন ডা: বালচন্দ্র ভাটওয়াদেকর (ডা: বালচন্দ্র কৃষ্ণ) ও লক্ষ্মণরাও কির্লোস্কর। কির্লোস্কর ছিলেন সম্ভবত দেশের মধ্যে অন্যতম উদ্ভাবনী শক্তি সম্পন্ন শিল্প উদ্যোক্তা। পাঞ্জাবে লালা হরকিষণ লাল—যিনি জাতিগত ভাবে ছিলেন একজন অরোরা এবং পেশাগত ভাবে একজন আইনজীবী—প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভারত ইন্সিওরেন্স এবং লাহোর ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড- সহ অনেকগুলি কাপড়ের কল ও অন্যান্য কোম্পানি গঠনের উদ্যোগও নিয়েছিলেন।[১৫৭] আবার বাংলার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বৈকুণ্ঠনাথ সেনের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ক্যালকাটা পটারি ওয়ার্কস্‌।[১৫৮] যুক্ত প্রদেশে বারাওঁ-এর রাজা একটি চিনির কল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—যেটি অবশ্য পরে বন্ধ হয়ে যায়।[১৫৯] এর কিছু পর বিহারে বানেলির রাজা শুরু করেছিলেন কীর্ত্যানন্দ আয়রন অ্যান্ড স্টিল ওযার্কস লিমিটেড যেখানে লোহা ও ইস্পাতের ঢালাইয়ের কাজ হতো। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ঢালাই ইস্পাতেব উৎপাদনকে শুল্ক বা অনুদানের মাধ্যমে সংরক্ষণ দিতে অস্বীকৃত হওয়ায়[১৬০] এই কোম্পানিটির দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন বা তার আগেও অনেক ভারতীয় ব্যবসায়ী দেশলাই ও কাঁচ তৈরির কারখানা শুবু করেছিলেন। শিল্পদ্যোগ বলতে যদি বোঝায় কোনো ঝুঁকিবহুল উৎপাদনের কাজে পুঁজি নিযোগেব ইচ্ছা, তাহলে ভারতীয়দের মধ্যে বস্তুত এই শিল্পদ্যোগের কোনো ঘাটতি ছিল না।[১৬১] প্রকৃতপক্ষে ঘাটতি যা ছিল তা হলো, যে সব শিল্প বেছে নেওয়া হয়েছে সেগুলিতে বিনিয়োগেব যথাযথ পরিবেশের অভাব এবং বাজার ও পরিচালনা সংক্রান্ত কলাকৌশল সম্পর্কে উদ্যোক্তাদেব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের অভাব। তাছাড়া, এই সব প্রতিষ্ঠানগুলিকে যেহেতু উন্নত দেশেব শিল্পেব সঙ্গে মুক্ত বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতায় নামতে হতো, সেহেতু তাদের টিঁকে থাকাব জন্যে বিপুল পরিমাণ পুঁজিরও প্রয়োজন ছিল।

সীমিত মাত্রায় হলেও যখন শিল্পে বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হলো, তখন প্রথমে কুড়ির দশকে এবং পরে আরও বেশি উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় তিরিশের দশকে ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় আধুনিক শিল্পস্থাপনের কাজে ভালোভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। চেট্টিয়ারদের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। নাট্টুকোট্টাই চেট্টিয়ার-রা এসেছিলেন মাদ্রাজের পুদুকোট্টাই রাজ্যের রামনদ জেলা থেকে; মহাজনী কারবার ও ব্যবসা করার জন্যে তাঁদের অতি উন্নত ম্যানেজিং এজেন্সি ব্যবস্থা ছিল এবং মাদ্রাজে ব্যাঙ্ক ও মহাজনী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁরা ছিলেন শীর্ষস্থানীয়।[১৬২] দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও আর্থিক লেনদেন নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারেও তাঁদের ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।[১৬৩] ফার্নিভাল একটি হিসাবে দেখিয়েছেন যে, ১৯৩০ সালে ব্রহ্মদেশে তাঁদের নিজস্ব পুঁজির বিনিয়োগের পরিমাণই ছিল ৭৫০ মিলিয়ন টাকার মতো।[১৬৪] কিন্তু যতদিন পর্যন্ত না সুতি কাপড়ের আমদানির উপর শুল্ক বসানো হলো এবং দক্ষিণ ভারতের অর্থনীতির উপর ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণ যতদিন পর্যন্ত না শিথিল হতে শুরু করল, ততদিন পর্যন্ত চেট্টিয়ার গোষ্ঠী বড় আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দেয় নি।[১৬৫]

কুড়ির দশকে স্বল্প পুঁজিসম্পন্ন ও ব্যবসা-বিনিয়োগ সম্পর্কে একেবারেই অভিজ্ঞতাহীন ভারতীয় উদ্যোক্তাদের থেকে অনেকেই প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে শিল্পক্ষেত্র থেকে বিদায়

নিয়েছিলেন এবং নতুন কিছু গোষ্ঠী প্রবেশ করা সত্ত্বেও শিল্পে কেন্দ্রীভবনের প্রবণতা বেড়েই যাচ্ছিল। কলকাতার পাটকলগুলি সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যেই কিছু তথ্য প্রমাণের উল্লেখ করেছি যা এই প্রবণতার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। বোম্বাইয়ের ক্ষেত্রে যা তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় তা কিছুটা অস্পষ্ট। কারণ একদিকে, করিমভয় গ্রুপ অব্ মিল্‌স্, সম্ভবত এককভাবে যাদের অধীনে ছিল সর্বাধিক সংখ্যক তাঁত ও মাকু, ১৯৩০ এর মন্দার প্রথম দিকে তাদের ব্যবসা মার খেল। অন্য দিকে, ১৯৩২-এ শেয়ার হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন বিভিন্ন কোম্পানির ডিরেক্টরদের একটি তালিকা প্রকাশ করেছিল, তাতে বিভিন্ন কোম্পানির পরিচালনব্যবস্থার পারস্পরিক সংযুক্তির বিস্ময়কর নজির পাওয়া যায়।[১৬৬]

নাম	যে সব কোম্পানির পরিচালক ছিল তাদের সংখ্যা।
এফ. ই. দিনশ	৬৫
স্যাব পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস	৪২
স্যার ফিরোজ মি. শেঠনা	৩৪
এইচ. পি. মোদি	১৪
স্যাব ফাজুলভয় করিমভয় ইব্রাহিমভয়	২৬
স্যার লালুভাই সামলদাস	২৬
এন. বি. সাকলাট্‌ওয়ালা	২৯

উপরোক্ত ব্যক্তিগুলির মধ্যে ফাজুলভয়ের নাম আলোচনা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পাবে, কারণ তাঁর পরিবারের অধীনস্ত কোম্পানিগুলি অল্পদিনের মধ্যেই উঠে গিয়েছিল। অন্যদের মধ্যে এফ. ই. দিনশ ছিলেন একজন ব্যবহার দেশক এবং লগ্নিকারী। স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস 'বস্ত্র সম্রাট' রূপে খ্যাতি লাভ কবেছিলেন এবং বিভিন্ন কোম্পানিতে তাঁর আগ্রহের সাথে কদাচিৎ অর্থলগ্নীর কোনো সম্পর্ক ছিল।[১৬৭] ফলে অনেক ক্ষেত্রেই ও ব্যক্তিগত অর্থলগ্নীর ঝুঁকির কারণে ঠিক নয়, বরং বিপণন ও মূলধন নিয়োগের ব্যাপারে তাঁদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সূত্রেই কোম্পানিগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় ছিল।

অবশ্য তিরিশের দশকে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে যাঁদের আগে থেকেই শিল্পে অল্প হলেও কিছু স্বার্থ জড়িত ছিল, সেই সব নতুন ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর ক্ষমতা বেড়ে যায়। তাঁরা সাধারণত বৃহদাকার কিছু ফার্ম অথবা একই সঙ্গে অনেকগুলি ফার্মকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। এঁদের বেশির ভাগই ছিলেন ব্যবসায়ী বা ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ভুক্ত। দিল্লীর লালা শ্রী রাম, যিনি দিল্লী ক্লথ অ্যান্ড জেনারেল মিলস্‌কে একটি বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন, একটি পুরনো ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী পরিবারের লোক ছিলেন।[১৬৮] নারং গোষ্ঠীর—যাঁরা অনেকগুলি চিনি মিলের কর্ণধার ছিলেন—নেতৃত্বে ছিলেন ডঃ জি. সি. নারং। তিনি ছিলেন জাতিতে বৈশ্য এবং আইনশাস্ত্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত।[১৬৯]

মধ্য ও পূর্ব ভারতে পাট ও সুতিবস্ত্র শিল্পে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন বিড়লা-গোষ্ঠী।[১৭০] তিরিশের দশকে এঁরা চিনি ও কাগজ শিল্পে প্রবেশ করেন। স্যার স্বরূপচাঁদ হুকমচাঁদ মাড়োয়ার ও মধ্য ভারতের একটি জৈন ব্যবসায়ী পরিবার থেকে এসেছিলেন এবং আফিমের ব্যবসা,[১৭১]

ব্যাঙ্ক পরিচালনা, সুতো, শস্য এবং ভোগ্যপণ্যের ব্যবসা থেকে প্রভূত সম্পদ অর্জন করেন। অবশেষে কলকাতায় পাট ব্যবসায়ও শুরু করেন। এদেশে ভারতীয়দের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অন্যতম পাটকল ইনি স্থাপন করেন এবং বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে ঢালাই ইস্পাত তৈরির কারখানাতেও অর্থ লগ্নী করেন। তিরিশের দশকে কানপুরে যুদ্ধের আগে তুলো থেকে বীজ ছাড়াবার যন্ত্র এবং তেল ও ময়দার কল স্থাপন করে যুগ্গিলাল কমলাপত সিংহানিয়া প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর শিল্পোদ্যোগের কার্যকলাপ সুতিবস্ত্র ও চিনি শিল্পে এবং আরও অন্যান্য নানা ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছিল।[১৭২] অন্যান্য গোষ্ঠীর মতো এই পরিবারটিও শিল্পোদ্যোগ শুরু করার অনেক আগে থেকেই কানপুরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল পণ্য ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে।[১৭৩] প্রায় একই সময়ে ডালমিয়া জৈন পরিবার চিনি শিল্প গড়ে তোলে এবং একদিকে অ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানি ও অন্যদিকে ইয়োরোপীয়দের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কাগজ শিল্পকে চ্যালেঞ্জ জানায়; এই কাজ তাঁরা করতে পেরেছিলেন নতুন নতুন কলকারখানা স্থাপন করার মধ্য দিয়ে, বাজারের উপর যাদের প্রভাব ছিল অনস্বীকার্য।[১৭৪] কলকাতার প্রাচীনতর প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জির কোম্পানি ও মার্টিন অ্যান্ড কোম্পানি লৌহ পিণ্ড ও ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল।

বিশের দশকে দক্ষিণ ভারতে শিল্পের প্রসারে মন্থরতা এসেছিল। নতুন উদ্যোগগুলির মধ্যে সব কটিই ছিল তুলোকল। তুলোর কাপড়ের উপর আরোপিত শুল্ক-সংরক্ষণের মাত্রা বৃদ্ধির ফলে দক্ষিণ ভারতে (প্রধানত কোয়েম্বাটুরে, মাদ্রাজে ও মাদুরায়) তাঁত ও মাকুর সংখ্যা উচ্চতর হারে বাড়তে থাকে। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে, নতুন উদ্যোক্তারা ছিলেন চেট্টিয়ার। কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীরাও নতুন উদ্যোগ সৃষ্টিতে জড়িত ছিলেন। পাইকারা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের মতো আরও কিছু প্রকল্প থেকে সুলভে বিদ্যুতের সরবরাহ সম্ভবপর হয়েছিল এবং তা শিল্পপতিদের সাহায্যে আসে। কম মজুরিতে শ্রমের যোগান এবং, বিশেষ করে, তুলোর কাপড় ও সুতোর বিশাল স্থানীয় বাজারের সুবিধাকে শিল্পপতিরা কাজে লাগাতে পেরেছিলেন সুলভে জলবিদ্যুৎ সরবরাহের ফলে।[১৭৫] শিল্পের প্রসারের কারণ হিসাবে কৃষিতে মন্দা ও তজ্জনিত কৃষি ঋণের চূড়ান্ত বৃদ্ধির বিষয়টি উল্লেখ করা যায় : আর্থিক পুঁজির মালিকরা ঐ সময়ে দেখলেন যে কৃষকদের ঋণ দেওয়া আর লাভজনক নয় এবং তাঁরা শিল্পে বিনিয়োগ করতে থাকলেন। তাছাড়া, মহীশূরের রাজ্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা, যেমন সরকার প্রদত্ত কম সুদের হারে ঋণ, সস্তায় বা বিনা দামে জমি হস্তান্তর ও অন্যান্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা, রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত ও ব্যক্তি মালিকানাধীন উদ্যোগগুলিকে উন্নত হতে সাহায্য করেছিল।[১৭৬]

ভারতের অন্যান্য দেশীয় রাজ্যে, যেমন গোয়ালিয়রে ও বরোদায়, তুলোকলের সংখ্যা বহুগুণ বেড়েছিল কখনও সরকারের প্রত্যক্ষ সাহায্যে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য ছাড়াই এই বৃদ্ধি সম্ভবপর হয়েছিল। ঐ রাজ্যগুলিতে বিনিয়োগের বড় আকর্ষণ ছিল ব্রিটিশ ভারতের তুলনায় কম আয় ও অন্যান্য কর, নিম্নতর মজুরিতে শ্রমের যোগান এবং কম দামে জমির যোগান।[১৭৭] মধ্য ভারতের রাজ্যগুলিতে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় হিসাবে মাড়োয়ারী হিন্দু বা জৈনরাই প্রধান ছিল,[১৭৮] স্বাভাবিকভাবে তাদের মধ্যে থেকেই এসেছিল অধিকাংশ নতুন উদ্যোক্তা।

বোম্বাইতে পার্সীরাই থেকে গেল প্রভাবশালী উদ্যোক্তাদের একটি প্রধান গোষ্ঠী হিসাবে, কিন্তু টাটারা ছাড়া আর কোনো উদ্যোক্তা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সফল সাহসিকতার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেননি। ওয়ালচাঁদ হিরাচাঁদকে (একজন মাড়োয়ারি) হয়ত ব্যতিক্রম হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। কিলাচাঁদ দেবচাঁদ ও নরোত্তম মোরার্জীর সহযোগিতায় তিনি ১৯১৯ সালে সিন্দিয়া স্টিম নেভিগেশন কোম্পানিটি স্থাপন করেন। এই সংস্থাটিই ছিল প্রথম ভারতীয় জাহাজ কোম্পানি প্রতিযোগিতায় যেটি টিকে থাকতে পেরেছিল এবং তা সম্ভবপর হয়েছিল সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা (যা অন্যান্য ব্রিটিশ জাহাজ কোম্পানিগুলি ভোগ করত) ছাড়া। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতীয় জাহাজী সংস্থার উদ্দেশ্যে ইন্ডিয়ান মারক্যানটাইল মেরিন কমিটি বিভিন্ন রকমের সরকারি সাহায্য সুপারিশ করেছিল এবং একটি আবশ্যকীয় চুক্তি হিসাবে প্রস্তাব করেছিল যে, ভারতীয় উপকূল বাণিজ্য সংরক্ষিত থাকবে 'মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের দিক থেকে ভারতীয়দের প্রাধান্য আছে এই রকম জাহাজী সংস্থাগুলির জন্যে'।[১৭৯] পরবর্তীকালে ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদের গোষ্ঠী প্রিমিয়ার (আদিতে টাটার) কনস্ট্রাক্‌শন কোম্পানিটিকে অধিগ্রহণ করে। এই কোম্পানিটিই পশ্চিম ভারতের ঐ জাতীয় সংস্থাগুলির মধ্যে বৃহত্তম ছিল। তিরিশের দশকে উক্ত ব্যবসায়ী গোষ্ঠী চিনি উৎপাদনও শুরু করে। ১৯৬৫ সালে মনোপলিস এনকোয়্যারি কমিশন ওয়ালচাঁদ গোষ্ঠীকে ভারতের প্রথম কুড়িটি ব্যবসায়ী পরিবারের অন্যতম হিসাবে চিহ্নিত করে।[১৮০] দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত পার্সী ব্যবসায়ীদের মধ্যে এফ ই দীনশ ছিলেন একজন সফল ব্যবহারদেশক এবং আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থাপনায় তিনি ছিলেন যাদুকর। অর্থের অভাবে বিপন্ন কারখানা ও সংস্থাগুলিকে উজ্জীবিত করার বিভিন্ন প্রকল্পের পরিকল্পনাকারী হিসাবে তিনি বিশেষত্ব অর্জন করেছিলেন। তিনি কর্মজীবন পরিসমাপ্ত করেন সিমেন্ট কোম্পানিগুলি একত্রীকরণের একটি প্রকল্প পেশ করে। এই প্রকল্প ফলশ্রুত হয় অ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। স্যার নেস্‌ ওয়াদিয়া দি বম্বে ডাইং অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিটিকে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তুলোকলে পরিণত করেন। বোম্বাইয়ে পার্সী ব্যবস্থাপনার আরও কিছু দৃষ্টান্ত সন্ধান করা দরকার। কিছু সিমেন্ট কোম্পানি ও জামসেদপুরের টাটার উদ্যোগগুলি ছাড়া পার্সীদের উদ্যোগগুলি অন্যান্য ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সংস্থাগুলির মতোই অত্যন্ত বেশি মাত্রায় কেন্দ্রীভূত হয়েছিল নিজেদের বসবাসের অঞ্চলগুলিতে। গোয়ালিয়র, ইন্দোর ও ভূপালের মতো মধ্য ভারতের রাজ্যগুলিতে মাত্র কয়েকজন পার্সী ব্যবসায়ী ছিলেন। আমেদাবাদে কস্তুরভাই লালভাই এবং অম্বালাল সারাভাই খ্যাতি ও সমৃদ্ধি অর্জন করেন তাঁদেরই সৃষ্টি তুলোকল ও অন্যান্য নতুন উদ্যোগগুলি পরিচালনার মাধ্যমে। অতএব, প্রাচীন শিল্পকেন্দ্রগুলিতে ভারতীয় ব্যবস্থাপনা ক্ষয়িষ্ণু ছিল না, কিন্তু সব থেকে বেশি প্রভাব ছিল সেই সমস্ত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলির যারা বুঝতে পেরেছিল প্রথাসিদ্ধ বা প্রাচীন ব্যবসার তুলনায় শিল্পে বিনিয়োগ, অন্তত একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত, বেশি লাভজনক হবে।

উপরোক্ত বিবরণে আমরা অঞ্চল ভেদে ইয়োরোপীয় আধিপত্যের মাত্রাগত পার্থক্যের উপর জোর দিয়েছি ব্যবসায়ে ও শিল্পে ভারতীয়দের অংশগ্রহণের মাত্রাগত ভিন্নতার প্রধান ব্যাখ্যা হিসাবে। এর বিকল্প ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে ভূমিব্যবস্থা বা প্রজাস্বত্বের আঞ্চলিক ভিন্নতার সূত্রে। এই যুক্তি অগ্রাহ্য করা যায় না যে, জমিদারি ব্যবস্থার অধীনস্ত অঞ্চলগুলিতে শিল্পে বিনিয়োগের তুলনায় জমি কিনে ভূস্বামী বনে যাওয়া বেশি লাভজনক ছিল, অতএব

বাংলো, বিহার অথবা মাদ্রাজে বোম্বাই বা পাঞ্জাবের তুলনায় বেশি সংখ্যায় এমন ব্যবসায়ীদের সন্ধান মেলে যাঁরা জমিদারি ক্রয় করতেন। যেভাবে এই ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তার কারণ, জমিদারি স্বত্ব বেচাকেনার বাজারে প্রতিযোগিতার একটি যুক্তি-সম্মত মাত্রা অনুমান করে নিলে বলা যায় যে, জমি থেকে প্রাপ্ত নীট প্রতিদান অন্যান্য সম্পত্তিতে বিনিয়োগলব্ধ প্রতিদানের প্রায় সমান হতে পারত। এই সম্পত্তিগুলির মধ্যে পড়ে শহরের ভূসম্পত্তি, ফাটকার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পণ্যের মজুত এবং সরকারি ঋণপত্র। জমিদারি থেকে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত কীভাবে ব্যবহৃত হতো তা ব্যাখ্যা করাও প্রয়োজনীয়। উপরের যুক্তিটি আলোচনা করলে এই বিষয়টি পরিস্ফুট হবে যে- সমস্ত এলাকায় ইয়োরোপীয় মূলধনের প্রাধান্য ছিল সেই সব ক্ষেত্রে ঐ উদ্বৃত্ত বিনিয়োগের সুযোগ সীমিত ছিল এবং ব্যবসায়ীরা চিরাচরিত ব্যবসায় ও বিনিয়োগ থেকে সরে এসে অন্য ধরনের বিনিয়োগ ঘটালে দ্রুত পতনশীল নীট প্রতিদানের সমস্যার সম্মুখীন হতো।

ভূমি ব্যবস্থার সূত্রে গঠিত বিকল্প অনুকল্পটি পরীক্ষার সময়ে আমরা একটি পরিচিত সমস্যার সম্মুখীন হই : ব্যাখ্যামূলক চলন রাশিগুলির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা জমিদারি ব্যবস্থার অধীনস্ত অঞ্চলগুলিতে শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইয়োরোপীয় আধিপত্য ছিল। বহু ব্যবসায়ীর ভূস্বামীতে রূপান্তরিত হওয়ার সাথে সাথে স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও অপসারিত হচ্ছিলেন ইয়োরোপীয়দের দ্বারা, বিশেষত ব্যাঙ্কিং ও বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে। বাংলা ও মাদ্রাজ থেকে ব্যবসায়ীরা ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমিশনের কাছে অভিযোগ করেছিলেন : জমিতে বিনিয়োগ এত নিরাপদ ও লাভজনক যে শিল্পের জন্যে মূলধন সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য।[১৮১] কিন্তু এই ব্যবসায়ীরা ছিলেন তুলনামূলকভাবে ছোট পুঁজিপতি এবং মূলধনের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে ঐ ধরনের অভিযোগ উঠবেই। উক্ত অঞ্চলের কোনো ইয়োরোপীয় পুঁজিপতি অথবা বোম্বাইয়ের বড় পুঁজিপতিরা ঐ রকম অভিযোগ করেননি।[১৮২] উপরন্তু, আমরা লক্ষ্য করেছি যুক্তপ্রদেশ অথবা সিন্ধুপ্রদেশের মতো কোনো অঞ্চলে—যেখানে জমিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল না–ইয়োরোপীয়রা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে বাণিজ্যে ও শিল্পে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল।

প্রথমে বাংলায় ও পরে ধরা যাক, বোম্বাইয়ে জমিদারি কেনা অথবা জমিতে প্রকৃত বিনিয়োগ ঘটানো সম্পত্তিতে বিনিয়োগের এই প্রকারভেদের মধ্যে কোনটি গ্রহণীয় ছিল, এই প্রশ্নটি আমরা এখনও উত্থাপন করিনি। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য যথেষ্ট কম। অপর দিকে, আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, সেচ ব্যবস্থার অভাবে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষের পরিকল্পনা করা যায় না। বাংলা, বিহার ও উত্তরপ্রদেশে শুধুমাত্র নীল চাষ ও পরবর্তীকালে আখ চাষের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী কৃষির কিছু লক্ষণ পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, আবাদকারীরা প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদী চাষী ছিলেন না। আবাদকারীরা যাঁদের জমি অধিগ্রহণ করতেন তাঁদেরই অনুসৃত চাষের পদ্ধতি তাঁরা অনেক সময়ে গ্রহণ করতেন। যে সমস্ত শর্তে তাঁরা কৃষকদের আগাম দিতেন সেগুলি ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে প্রচলিত ঋণ দানের শর্তাবলী থেকে ভিন্ন ছিল না, এবং আবাদকারীরাও এজেন্সি হাউসগুলির কাছে গভীরভাবে ঋণগ্রস্ত ছিলেন।[১৮৩]

ভূমি রাজস্ব প্রথার অপর একটি দিক ছিল যা জমি থেকে মূলধন গঠনের মুনাফালভ্যতাকে প্রভাবিত করেছিল। রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত চালু থাকা অঞ্চলগুলিতে সরকার জমি চাষে নজর

দিয়েছিল যেহেতু সেখানে রাজস্বের পরিমাণ প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করত চাষীদের আয়ের উপর। তাকাবি ঋণ হিসাবে সরকার নিয়মিত ঋণ দিত মোটা অঙ্কের টাকা, কিন্তু বাংলায় সরকার প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ছিল অতি সামান্য। কৃষিব উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে গৃহীত অন্যান্য প্রকল্পের খাতে বাংলায় সরকাবি ব্যয়ের পরিমাণও ছিল নগণ্য।

মূলধন গঠনের মুনাফালভ্যতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভূমিব্যবস্থা ছাড়াও সেচের সুযোগ- সুবিধার দিকেও আমাদের নজর দেওয়া উচিত। কিছু তথ্য অনুসারে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় মাদ্রাজে সারের ব্যবহার বেশি ব্যাপক ছিল, বিশেষ করে বিশের দশক থেকে। এর অনেক কারণগুলির মধ্যে কোনটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বলা শক্ত। সরকারি প্রচার ও কৃষির উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে সবকাবি ব্যয় (জল উত্তোলনের পাম্প ও ইঞ্জিন বসানোর মাধ্যমে), প্যারীর প্রচার এবং বিশের ও তিবিশের দশকে দক্ষিণ ভারতে সেচের প্রসার ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, এই বিষয়গুলির মধ্যে যে কোনটি সারের ব্যবহার বৃদ্ধিতে বেশি কার্যকর ছিল তা বলা সহজ নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, প্যারী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে রানিপেতে সার উৎপাদন আরম্ভ করে। আবাব এই রকম তথ্যও সামান্যই পাওয়া যায় যার ভিত্তিতে বলা চলে যে, কৃষি উদ্যোগ শিল্পে ক্রমোন্নতির একটি উপায় হিসাবে কাজ করেছিল।[১৮৪]

ব্রিটিশ ভারতে এবং ভাবতের আদিম স্বৈরতন্ত্রী দেশীয় রাজ্যে প্রচলিত ভূমি-রাজস্ব ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থার নিশ্চিত প্রভাব ছিল আয় ও উদ্বৃত্ত বন্টনেব উপর। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের অপর দিকগুলি থেকে ভূমি ব্যবস্থার প্রভাবকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, বিশেষত সরকারের অঘোষিত কোটা বা পবিমাণগত নিয়ন্ত্রণযুক্ত 'অবাধ বাণিজ্য' নীতি থেকে। এই নীতি ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের অনুকূলে এবং ভাবতীয ব্যবসায়ীদের বিপক্ষে কাজ করেছিল। প্রজাস্বত্ব ব্যবস্থা যে রকমই হোক না কেন,[১৮৫] সাধারণ চাষী সম্বল হারাল এবং শিল্পপণ্যের বাজারের সংকোচন ঘটল। রাজা ও জমিদাররা কুখ্যাত ছিলেন তাঁদের জাঁকজমকের ব্যয়ের জন্যে এবং অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের এই অপচয় অন্ততপক্ষে আংশিকভাবে কার্যকব ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক ব্যবস্থাব দিক থেকে। বহু সংখ্যক পোষ্য ব্যক্তির ভরণপোষণের ব্যবস্থা বুর্জোয়া আইন এবং নতুন ব্যক্তিগত ও সম্পত্তির মালিকানাজনিত সম্পর্ক প্রবর্তনের রূঢ় প্রভাবকে সহনীয় করেছিল, সাহয্য করেছিল আগ্রাসী ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের আঘাত ক্লিষ্ট সেকেলে সমাজ-কাঠামো স্থিতিশীল রাখতে। উপরন্তু, উৎপাদনশীল মূলধন পুঞ্জীভবনে ধনবানদের অক্ষমতা ভারতে ও ব্রিটেনে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা থেকে অনেকটা মুক্ত রাখে এবং ব্রিটেন (ও অন্য ইয়োরোপীয় দেশগুলি) থেকে রপ্তানি করা নকল বিলাসদ্রব্যের বাজারকে বিস্তৃত করে। অবশ্য শেষোক্ত ফলাফলটির গুবুত্ব সামান্য ছিল। ভারত সরকার রাজা ও জমিদারদের বিলাসদ্রব্যের ভোগকে উৎসাহিত করত এবং তাঁদের পদক দিয়ে সম্মান জানাত নিয়মিতভাবে। ইংরেজ রাজপুরুষ ও রাজকীয় ব্যক্তিদের জন্যে আয়োজিত ব্যয়বহুল আতিথেয়তা এবং শাসন ও সামরিক বিভাগের ইংরেজ অফিসারদের আমোদ-প্রমোদের উদ্দেশ্যে অথবা তাদের উপকারে (প্রধানত বা শুধুমাত্র ইয়োরোপীয়দের উপকারসাধনে হাসপাতাল, ক্লাব বা রেসকোর্স তৈরিতে) অর্থদানের বিনিময়ে রাজা ও জমিদাররা সম্মানিত হতেন।

মহাজন, ব্যবসায়ী ও ভূস্বামীদের কার্যকলাপের সমন্বয়ে ব্যবস্থাটি টিকে ছিল।[১৮৬] ব্যবসায়ীরা সুযোগ পেলে শিল্পে বিনিয়োগে ইচ্ছুক থাকতেন। ভূস্বামীদের অনেক সময়ে

উদ্বৃত্ত থাকত এবং তাঁরা তখন লাভজনক ব্যবসায়ে বিনিয়োগের সুযোগ খুঁজতেন। ভারত সরকারের অবাধ বাণিজ্য নীতির অথবা তার শিল্পায়নে আগ্রহের অভাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুধুমাত্র শিল্পপতিদের কাছ থেকেই আসত না।[১৮৭] অতএব ভূস্বামী, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির মধ্যে স্বার্থের সংঘাত প্রায়শই ঘটত না। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৩০সালে মোরাদাবাদ (যুক্ত প্রদেশ) জেলার জমিদার চাষীদের সংঘ এবং বিহারের আবাদকারী ও আখ চাষীদের সংঘ চিনি শিল্পের ক্ষেত্রে শুল্ক-সংরক্ষণের আবেদন জানায়।[১৮৮] আরও উচ্চ পর্যায়ে দেখা যায়, বরোদার গাইকোযাড়, গোয়ালিয়রেব সিন্দিয়া, ও ইন্দোরের হোলকার সরকারি উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা করছেন এবং ভারতীয় পুঁজিপতিদের সাহায্য করছেন তাঁদের এলাকায় কারখানা স্থাপনে।[১৮৯] দক্ষিণ ভারতে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ও মহীশূর রাজ্যগুলিও শিল্প স্থাপনে অনুরূপ সাহায্য করে। দেশীয় রাজ্যগুলির শাসকরা ব্রিটিশ ভারতের পুঁজিপতি পরিচালিত উদ্যোগেও বড় আকারে বিনিয়োগ করেন।[১৯০] যদিও তাঁরা কোনো কোনো সময়ে বিনিয়োগে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন ভারত সরকারেব দ্বারা।[১৯১] দেশীয় রাজাদেব শাসনের ফলাফল সাধারণ মানুষের পক্ষে হয়ত ক্ষতিকারক হযেছিল, কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলি বাজারের সুযোগ করে দেয় এবং ভারতীয় উদ্যোগগুলির বিকাশের জন্যে কিছু মূলধন যোগায়। শিল্পের প্রসারের উপর এর ফলাফল ইতিবাচক ছিল। ব্রিটিশ শাসিত ভাবতের থেকে দেশীয় রাজ্যগুলির রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র শাসন ব্যবস্থাব আধা সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর তুলনায় শিল্পের প্রসারের দিক থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সাম্রাজ্যিক বাবস্থার অধীন ব্রিটিশ ভারতে দেশীয় ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি বিবেচ্য।

বিশের দশকে আইন সভায় সংঘটিত বিতর্কে শুল্ক-সংরক্ষণ সংক্রান্ত মতামতের ক্ষেত্রে বিশেযত শিল্পে অনগ্রসর প্রদেশের বড় ভূস্বামী এবং ব্যবসাযী বা পেশাদারী গোষ্ঠীব প্রতিনিধিদেব মধ্যে পার্থক্য ছিল। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মীমাংসায় ভাইসরয় ও তাঁর কার্যনির্বাহী কাউনসিলের মতামত চূড়ান্ত হওয়ার ফলে ভূস্বামী ও ব্যবসায়ীদেব মধ্যে বিতর্ক সাধারণত চরম পর্যায়ে যেত না। তিরিশের দশকে কৃষিতে মন্দা ও নগর জীবনে বেকারত্ব এলে ভূস্বামী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে মতামতের পার্থক্য অনেকটা কমে যায়। গৃহযুদ্ধের আগে আমেরিকায় দক্ষিণের আবাদকারীদের সঙ্গে উত্তরাঞ্চলের শিল্প পণ্যের প্রস্তুকারকদের মতামতের পার্থক্য যে পর্যায়ে গিয়েছিল ভারতে তা কোনো সময়েই ঘটেনি। বিশেষত পাঞ্জাবের প্রতিনিধিদের মধ্যে অসন্তোষ ছিল বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ীদের প্রাধান্যকে কেন্দ্র করে। এই অসন্তোষের শিকড় ছিল ধনতান্ত্রিক কাঠামোর অন্তর্গত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের তুলনামূলক অনগ্রসরতার ভিতরে, কিন্তু প্রাক-ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের স্তরে পশ্চাৎগমনের কোনো প্রবণতা এর মধ্যে ছিল না।[১৯২]

৬.১২ উপসংহার

বিশেষত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় উদ্যোগগুলির মধ্যে সংঘাত অনেক সময়ে প্রচ্ছন্ন থাকত স্বল্পকালীন সহযোগিতার মাধ্যমে। ইংরেজ ব্যবসায়ীদের সব থেকে

উল্লেখযোগ্য সহযোগী ছিলেন পার্সীরা। অন্যান্য ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলি থেকেও কিছু ব্যক্তি প্রাধান্য পেতে থাকলেন এবং সম্মানিত হলেন অনার্স লিস্টে স্থান পেয়ে (এই সম্মান অনেক সময়ে রাজনৈতিক সহযোগিতার স্বীকৃতিস্বরূপ ছিল, অর্থনৈতিক সহযোগিতার নয়)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে পূর্ব ভারতে ইংরেজ ও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রকাশ্য সংঘাত বেঁধে গেল, বিশেষ করে পাট বাণিজ্যের ক্ষেত্রে। জনসাধারণের পৃষ্ঠাপোষকতা-প্রাপ্ত এই দ্বন্দ্ব থেকে ফয়দা তোলার এত সুযোগ বড় ব্যবসায়ীদেব ছিল যে তাঁরা চাইতেন না ব্রিটিশ শাসন-বিরোধী প্রকাশ্য সংঘাতে দ্বন্দ্বটি পরিসমাপ্ত হোক।

ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় উদ্যোগের তুলনামূলক গুরুত্ব পরিবর্তিত হয়েছে সময়ের সঙ্গে। সামগ্রিকভবে ইয়োরোপীয়দের ফয়দা তোলার সুবিধা ছিল রপ্তানির বাজারগুলিতে, ভারতীয়দের দেশীয় বাজারগুলিতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে এই পরিস্থিতি ব্যবসায়ে ও শিল্পে ইয়োরোপীয়দের আধিপত্য লাভে সাহায্য করেছে। একটি লক্ষ্যণীয় বিষয়, গ্রিভ্‌স্‌, কটন অ্যান্ড কোম্পানি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে সুতোকলগুলির সব থেকে বড় গোষ্ঠী গঠন করেছিল এবং প্রধানত চীনের বাজারে সুতো রপ্তানি করত। অথচ এই কোম্পানি দেশীয় বাজারমুখী কাপড় উৎপাদনে ব্যর্থ হলো যখন সুতোর রপ্তানি থেকে মুনাফা ক্রমাগত কমতে থাকল। এর বিপরীত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় দক্ষিণ ভারত থেকে যেখানে ইয়োরোপীয়দের পরিচালনাধীন তুলোকলগুলি প্রধানত ভারতীয় বাজারে কাপড় ও সুতো সরবরাহ করছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে, এবং আরও স্পষ্টভাবে শিল্প-সংরক্ষণ শুরু হলে, ভারতীয় উদ্যোক্তারা সিমেন্ট, কাগজ ও চিনির মতো শিল্পে প্রাধান্য লাভ করেছিল, যদিও শেষোক্ত দুটি শিল্প পূর্ববর্তীকালে ব্রিটিশ ম্যানেজিং এজেন্সি নিয়ন্ত্রণ করত। বাণিজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল এমন কিছু গোষ্ঠী থেকে ভারতীয় উদ্যোক্তাদের উদ্ভব ঘটেছিল। মাত্র কয়েকজন পেশাদারী বা পশ্চিমী মনোভাবাপন্ন ভারতীয় বড় শিল্পপতি হতে পেরেছিলেন। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে ইয়োরোপীয়দের তুলনামূলক নিষ্ক্রিয়তার প্রধান কারণগুলি ছিল সম্ভবত এই রকম :

(ক) জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠা এবং ইংরেজ সরকার কর্তৃক কিছু সুবিধা প্রদানের সঙ্গে জড়িত রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা,

(খ) দূর প্রাচ্যে বিনিয়োগের অপেক্ষাকৃত বেশি আকর্ষণ এবং

(গ) ব্রিটিশ অর্থনীতির সমস্যা যার ফলে প্রভূত পরিমাণে ভারত থেকে তিরিশের দশকে ব্রিটিশ পুঁজির (প্রধানত সরকারি) নির্গমন।

ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় উদ্যোক্তারা পীড়িত হয়েছিল ভারতীয় অর্থনীতির শিল্পে অনগ্রসরতার একটি প্রধান সমস্যার দ্বারা : কারিগরি উদ্ভাবনে উভয় গোষ্ঠীর অক্ষমতা। জাতীয় আয়ে শিল্প-বিনিয়োগের অংশ এবং আধুনিক শিল্পের ক্ষেত্রে মূলধন-দ্রব্য শিল্পের অংশের স্বল্পতা উদ্ভাবনে অক্ষমতার ইঙ্গিত দেয়। বিদেশী বিনিয়োগের অনুষঙ্গে প্রযুক্তিতে গতিশীলতা এসেছিল, এই ধারণার অনুকূলে সামান্যই সাক্ষ্য পাওয়া যায় অন্তত আমাদের আলোচ্য সময়সীমার মধ্যে।

অনুবাদক : অভিজিৎ ভট্ট, জয়ন্ত আচার্য ও মনোজ কুমার সান্যাল।

উৎস ও টীকা

১। এক সময়ের নিশ্চল অর্থনীতিতে ব্যবস্থাপনার প্রসার কীভাবে অর্থনৈতিক প্রসার ঘটাচ্ছে তার দৃষ্টান্তের জন্যে দ্রষ্টব্য : G. F. Papenek, 'The Development of Entrepreneurship' এবং এই প্রবন্ধের উপর আলোচনা, E. E. Hagen, A. M. Kamarck ও F. C. Shorter, *American Economic Review*, খণ্ড ৫২, সংখ্যা ২, মে ১৯৬২, পৃ. ৪৬-৬৬।

২। D. H. Buchanan, যিনি সম্ভবত ভারতের শিল্পোন্নয়নের ইতিহাসের সব থেকে মননশীল ছাত্র, ভারতীয় ব্যবসায়ে ব্রিটিশ আধিপত্যের অনেক কারণের মধ্যে এগুলিও উল্লেখ করেছেন : 'তৃতীয়ত, শিল্পের উন্নয়ন ও বিনিয়োগের সঙ্গে এই সময়ে সমান্তরালভবে চলেছিল ইয়োরোপ এবং বিশেষ করে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ থেকে ব্যবসায়িক দক্ষতা ও মূলধনের নির্গমন। প্রাপক দেশগুলির মধ্যে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, চীন ও মালয়েশিয়ার কথা না-হয় বাদই দিলাম। ভারতবর্ষকেও এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না যেহেতু তার ছিল কাঁচামাল, তৈরি বাজার এবং অনিপুণ কিন্তু সুলভ শ্রম। ভারতীয়রা আধুনিক ব্যবসা উদ্যোগ ও মূলধনের সঙ্গে পরিচিত ছিল না বলে সেগুলি তাদের আমদানি করতে হতো। শিল্প ও উপনিবেশ স্থাপনের অভিজ্ঞতা ইংরেজ ও স্কটল্যান্ডের মানুষদের ছিল এবং তাঁরাই প্রয়োজন মিটিয়েছিলেন।' Buchanan, *Development of Capitalist Enterprise*, পৃ ১৪৩।

৩। প্রথম মতটির জন্যে দ্রষ্টব্য : W. A. Lewis, *The Theory of Economic Growth* (লন্ডন, ১৯৬০), পৃ. ৮৯-৯০। দ্বিতীয় মতটির জন্যে : Robert E. Kennedy, 'The Protestant Ethic and the Parsis', *The American Journal of Sociology*, খণ্ড ৬৮ (১৯৬২-৩), পৃ. ১১-২০, পুনর্মুদ্রিত : N. J. Smelser (সম্পাদিত), *Readings in Economic Sociology* (Englewood Cliffs, N. J., ১৯৬৫), পৃ. ১৬-২৬।

৪। উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য : Joe. S. Bain, *Barriers to New Competition* (কেমব্রিজ, ম্যাস, ১৯৫৬)।

৫। D. R. Gadgil, 'Indian Economic Organization', *Economic Growth: Brazil, India, Japan* (Durham, N. C.,১৯৫৫), পৃ. ৪৪৮-৬৩, এবং V. I. Pavlov, *The Indian Capitalist Class* (নিউ দিল্লী, ১৯৬৪)। ভারতীয় উদ্যোক্তাদের গোষ্ঠীগুলির উদ্ভব ও প্রকৃতি সম্পর্কে মনোগ্রাহী বিবরণের জন্যে শেষোক্ত গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

৬। Nurul Islam, *Foreign Capital and Economic Development : Japan, India and Canada* (Rutland Vermont ও Tokyo, ১৯৬২), পৃ. ১৬৯-৯২; এবং A. Bose, 'Foreign Capital'; Singh, *Economic History of India, 1857-1956*, পৃ. ৪৮৪-৫২৭।

৭। উনবিংশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক অঞ্চলে মূলধন বিনিয়োগের প্রকৃতি অনুধাবনের জন্যে দ্রষ্টব্য : H. W. Singer, 'The Distribution of Gains between Investing and Borrowing Countries', *American Economic Review,* ৪০, সংখ্যা ২, মে ১৯৫০, পৃ. ৪৭৩-৮৫; R. Nurkse, 'Some International Aspects of the Problem of Economic Development', *American Economic Review,* ৪২, সংখ্যা ২, মে ১৯৫২, পৃ. ৫৭১-৮৩; *idem,* 'International Investment Today in the Light of Nineteenth-Century Experience', *Economic Journal,* ৬৪, ডিসেম্বর ১৯৫৪, পৃ. ৭৪৪-৫৮। সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্র-ভেদে বিদেশী বিনিয়োগের বন্টনের উপর আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য : Y. S. Pandit, *India's Balance of Indebtedness, 1898-1913* (লন্ডন, ১৯৩৭), অধ্যায় ৫। স্টক এক্সচেঞ্জে সরকারি ঋণের মাধ্যমে বিনিয়োগকে পণ্ডিত 'সরকারি বিনিয়োগ' হিসাবে অভিহিত করেছেন। কিন্তু পণ্ডিতের পরিমাপ এবং পণ্ডিত উদ্‌ধৃত Hammond-এর পরিমাণ থেকে এই বিষয়টি পরিস্ফুট হয় যে ভারতে মোট বিদেশী বিনিয়োগের মধ্যে ৫০ শতাংশেরও যথেষ্ট বেশি পরিমাণ ছিল সরকারকে প্রদত্ত ঋণ, অথবা তা নিহিত ছিল রেলে ও জন-উপযোগে।

৮। Pandit, *India's Balance of Indebtedness,* পৃ. ১২৭।

৯। *ঐ,* পৃ. ১২৬।

১০। Sir Theodore Morison, *The Economic Transition in India* (লন্ডন, ১৯১১), অধ্যায় ৮, বিশেষত পৃ. ২০২-৩।

১১। J. M. Keynes, *Economic Journal,* ২১, সেপ্টেম্বর ১৯১১, পৃ. ৪৩০।

১২। A. H. Imlah, *Economic Elements in the Pax Britannica* (কেমব্রিজ, ম্যাস, ১৯৫৮),পৃ. ৬০।

১৩। Matthew Simon, 'The Pattern of New British Portfolio Foreign Investment, 1865-1914', J. H. Adler (সম্পাদিত), *Capital Movements and Economic Development* (লন্ডন, ১৯৬৭), পৃ. ৩৩-৬০।

১৪। উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য : J. E. O'Conor, 'The Economic and Industrial Progress and Condition of India', *JSA,* ৫২, সংখ্যা ২৬৯১, ১৭ জুন ১৯০৪, বিশেষত পৃ. ৬৫২-৪।

১৫। দ্রষ্টব্য : J. Fred Rippy, *British Investments in Latin America, 1822-1949* (Hamden, Connecticut,১৯৬৬)। অধ্যায় ১৫-এ Rippy সব থেকে লাভজনক ব্রিটিশ কোম্পানিগুলি থেকে সংগৃহীত দুটি নমুনার মধ্যে তুলনা করেছেন। প্রথমটি ল্যাটিন আমেরিকার ব্রিটিশ কোম্পানিগুলির নমুনা, দ্বিতীয়টি এশিয়া ও আফ্রিকার। দ্বিতীয় নমুনাভুক্ত কোম্পানিগুলি প্রথমটির তুলনায় সর্বত্র বেশি মুনাফা অর্জন করত।

১৬। এই গ্রন্থের অধ্যায় ৮ দ্রষ্টব্য।

১৭। *IIYB, 1911*, প্রথম বার্ষিক সংস্করণ (কলকাতা, ১৯১১), পৃ. ২১৩।

১৮। সংখ্যাতথ্যসমূহ উদ্‌ধৃত করেছেন G. D. Hope, Chief Scientific Officer, Indian Tea Association, 'The Tea Industry of Bengal and Assam', Playne ও Wright, *Bengal and Assam, Behar and Orissa*, পৃ. ৩৮৭।

১৯। উদাহরণস্বরূপ কাছাড় ও ডুয়ার্স টি কোম্পানি লিমিটেডের এবং ইস্ট ইন্ডিয়া ও সিলন্‌ টি কোম্পানি লিমিটেডের প্রস্‌পেক্টাস্‌ দ্রষ্টব্য : *Issues 1895 advertised in The Times* (লন্ডন), সংখ্যা ১০, জুলাই-ডিসেম্বর ১৮৯৫।

২০। চা শিল্পের উন্মেষ সম্পের্কে দ্রষ্টব্য : H. A. Antrobons, *A History of the Assam Company 1839-1953* (এডিনবারা, ১৯৫৭); এবং *Idem*, *The Jorehaut Tea Company Ltd.* (লন্ডন, ১৯৪৯), বিশেষত পৃ. ৩-৬৫। একটি বড় ম্যানেজিং এজেন্সি সংস্থা নতুন চা বাগান তৈরি ও ক্রয়ের প্রক্রিয়ায় কী ভূমিকা নিয়েছিল তার বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন, *The Duncan Group, Being a short history of Duncan Brothers & Co. Ltd., Calcutta and Walter Duncan & Goodricke Ltd. London 1859-1959* (লন্ডন, ১৯৫৯), অধ্যায় ৪ ও ৫; এবং Sir Harry Townend (Compiler), *A History of Shaw Wallace & Co. and Shaw Wallace & Co. Ltd.* (লন্ডন, ১৯৬৫), H. K. Stringfellow লিখিত চা বিষয়ক অধ্যায়টি।

২০ক। *James Finlay and Company Limited : Manufacturers and East India Merchants, 1750 - 1850* (গ্ল্যাসগো, ১৯৫১), বিশেষত ৪৬-৮, ৮৫-৮, এবং ৯০-৫ এবং অধ্যায় ১৬। শেষ অধ্যায়টিতে চা শিল্পের প্রারম্ভিক সমস্যাগুলি আলোচিত হয়েছে কিছুটা বিস্তৃতভাবে।

২১। Playne and Wright, *Bengal and Assam, Behar and Orissa*, 'Jardine, Skinner and Company', পৃ. ১২৮-৩১।

২২। *IIYB*, 1911, পৃ. ২০৬।

২৩। *ঐ*, পৃ. ২১১ - ১৫।

২৪। *ঐ*, পৃ. ২১৫।

২৫। দ্রষ্টব্য : Buchanan, *Development of Capitalistic Enterprise* কয়লা উত্তোলনের পদ্ধতিগুলির বর্ণনা ১২ অধ্যায়ে।

২৬। *IIYB*, 1911, পৃ. ২১৪।

২৭। উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য : L. P. Watson (Cooper Allen and Co. Cawnpore), W. A. Ironside (Partner, Bird and Co., Calcutta) প্রদত্ত সাক্ষ্য, *Evidence (Report of IIC)*, খন্ড ১ ও ২ (PP. ১৯১৯, XVII ও XVIII), পৃ. ৬৫ ও ৮৬৯।

২৮। দ্রষ্টব্য : Bengal Chamber of Commerce-এর প্রতিনিধি R. Steel-এর সাক্ষ্য, R C on Opium : *Minutes of Evidence taken between 18 November and 29 December 1893, with Appendices* (PP. ১৮৯৪, LX1), পৃ. ১৬১।

'নেটিভদের' সঙ্গে ইয়োরোপীয়দের বর্ণগত পার্থক্যের ইঙ্গিত বহন করে এই জাতীয় অভিধান : 'White man's burden' ও 'black town'।

২৯। স্বাধীনতার আগে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেছেন বা সেদেশে কাজ করেছেন এমন কয়েকজন ইয়োরোপীয়দের নির্বাচিত মতামতের জন্যে দ্রষ্টব্য : Hilton Brown, *The Sahibs* (লন্ডন, ১৯৪৮), বিশেষ করে 'Society' ও 'Hospitality' সম্পর্কিত অধ্যায়গুলি।

৩০। বিশিষ্ট ব্যবসায়ীদের মধ্যে (যাঁরা Bengal Club-এর সভাপতিও ছিলেন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন : J. J. J. Keswick (১৮৮২-৫), A. A. Apear (১৮৮৬ - ৮, ১৯১০), T. B. G. Overend (১৯০৬, ১৯০৮-৯), এবং J. C. Shorrock (১৯১২-১৩)। দ্রষ্টব্য : H. R. Panckridge, *A Short History of the Bengsl Club (1827-1927)* (কলকাতা, ১৯২৭), পরিশিষ্ট B।

৩১। The All-India Manufacturer's Organization : *Indian and International Economic Policies,* Statement on the Agenda of the International Business Conference at Tye, New York, mid-November 1944, পৃ. ৪১ উদ্‌ধৃত হয়েছে M. Kidron-এর গ্রন্থে : *Foreign Investments in India* (লন্ডন, ১৯৬৫) পৃ. ৬৭।

৩২। এই গ্রন্থের অধ্যায় ২ দ্রষ্টব্য।

৩৩। সবকারের রেল সম্পর্কিত নীতি এবং রেলের বাণিজ্য বিষয়ক নীতির জন্যে দ্রষ্টব্য Daniel Thorner : (a) 'Great Britain and the Development of India's Railway', *Journal of Economic History,* ১১, সংখ্যা, ৪, শরৎ ১৯৫১, পৃ. ৩৮৯-৪০২; এবং (b) 'The Pattern of Railway Development in India' *For Eastern Quarterly,* ১৪, সংখ্যা ২, ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫, পৃ. ২০১-১৬।

৩৪। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক লেনদেন ব্যবস্থা এবং ভারতের রাজস্ব ব্যবস্থার দিক থেকে আফিমের গুরুত্ব অনুধাবনের উদ্দেশ্যে দ্রষ্টব্য : G. H. M. Batten , 'The Opium Question ' *JSA,* ৪০, ১লা এপ্রিল ১৮৯২, পৃ. ৪৪৪-৬৭। এই প্রবন্ধের শেষাংশ এবং রয়্যাল কমিশনেব সাক্ষ্য (R C on opium) *Evidence* (PP. 1894, LX, LXI, LXII) থেকে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় চীনে আফিম রপ্তানি-বিরোধী মতামত কত দৃঢ় ছিল। শাসক ও ব্যবসায়ীরা বিশ্বাস করতেন যে 'ভালো ব্যবসা'কে নৈতিক কারণে খারাপ বলা যায় না, সাক্ষ্যটি থেকে এই রকম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শেষোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে রয়্যাল কমিশনের (R C on Opium) মতের কার্যত মিল ছিল।

৩৫। RC on the Public Services in India : *Report* (PP. 1916, VII), পৃ. ২৪।

৩৬। *Report of the Committee appointed by the Secretary of State far India to enquire into the administration and working of Indian Railways* (PP 1921, X), পৃ ৫৮।

৩৭। *ঐ*, পৃ. ৫৮ ও পরিশিষ্ট ২। কারিগরি বিদ্যায় ভারতীয়দের প্রশিক্ষণ সরকারি নীতি ও ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের কর্মী নিয়োগের পদ্ধতির দ্বারা কীভাবে প্রভাবিত হয়েছিল তা আলোচিত হয়েছে এই গ্রন্থের ৫.৭ অনুচ্ছেদে।

৩৮। Sir Compton Mackenzie, *Realms of Silver* (লন্ডন, ১৯৫৪), পৃ. ১৭৮।

৩৯। G. W. Tyson , *One hundred years of Banking in Asia and Africa* (লন্ডন, ১৯৬৩), পৃ. ২৩১।

৪০। R. J. F. Sulivan, *One hundred years of Bombay* (বোম্বাই, ১৯৩৭), অধ্যায় ২।

৪১। পরবর্তীকালে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা চেম্বার্স অব কমার্স ও মিল-ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন সংগঠিত করেন। কিন্তু শেষোক্ত সংগঠনটি দাম, স্বল্পকালীন কাজ, মজুরি বা নিয়োগ নীতি সম্পর্কে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার ক্ষমতার দিক থেকে অনুরূপ ইয়োরোপীয় সংগঠনগুলির তুলনায় অনেক কম সফলতা অর্জন করতে পেরেছিল। দ্রষ্টব্য : L. A. Joshi, *The Control of Industry in India* (বোম্বাই, ১৯৬৫), অধ্যায় ২।

৪২। ১৯০৬-এ নিবন্ধভুক্ত দি বম্বে স্টিমশিল্প কোম্পানি লিমিটেড পরিচালকদের সভা বা বোর্ড গঠন করে ১৯১৪ সালে। দুই জন ইয়োরোপীয়, একজন ইহুদি (Sir David Sasson), একজন পার্সী এবং চারজন এশিয় এই বোর্ডের সভ্য ছিলেন। কোম্পানিটি Shepherds Steamers-এর নামে প্রচলিত নৌ পরিবহণের ব্যবসায় মালিকানা লাভ করেছিল Haji Ismail Hassun নামের মালিক ও বিক্রেতার কাছ থেকে। দ্রষ্টব্য : *IIYB, 1914*, (কলকাতা, ১৯১৪), পৃ. ৪০০-২।

৪৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ফ্লোটিলা স্টিমার কোম্পানির বিলুপ্তির ইতিহাসের জন্যে দ্রষ্টব্য : Rabindranath Tagore, *My Reminiscenses* (লন্ডন, ১৯১৭), পৃ. ২৫২-৫; আরও দেখুন : George Blake, *B. I. Centenary* (লন্ডন, ১৯৫৬), পৃ. ১৭০। ভারত ও চীনের মধ্যে বাণিজ্য-দ্রব্য পরিবহণের ক্ষেত্রে ইয়োরোপীয় কোম্পানিগুলির একচেটিয়া আধিপত্য রোধ করার যে প্রয়াস জামসেদজি টাটা নিয়েছিলেন তা ব্যর্থ হয়। তার কারণ ঐ কোম্পানিগুলি জাহাজের ভাড়া বিপুলভাবে কমিয়ে দেয়, এমনকি P. & O. এবং তার সঙ্গে যুক্ত কোম্পানিগুলি 'বিনা ভাড়ায় জাপানে তুলো পৌঁছে দেওয়ার অস্বাভাবিক প্রস্তাব রাখে।' এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : Harris, *Jamsetji Nusserwanji Tata*, অধ্যায় ৫। অন্তর্দেশীয় স্টিমার কোম্পানিগুলি একই রকম কৌশল অবলম্বন করে।

৪৪। S. N. Haji : *State Aid to India Shipping* (Indian Shipping Series, Pamphlet No. 1, বোম্বাই, ১৯২২) এবং The Memorandum of the Indian National Steamship Owners' Association, Bombay, *Evidence (Report of the Fiscal) Commission, 1949 - 50*, খণ্ড ৩, (দিল্লী, ১৯৫২), পৃ. ১৮৫-২৭৬।

৪৫। *IIYB, 1911,* পৃ. ৪৩ - ৮।

৪৬। দি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া প্রধানত বোম্বাইয়ের পার্সী ব্যবসায়ীরা সংগঠিত করে। শেষ পর্যন্ত এই সংস্থাটি বৃহত্তম ভারতবাসী নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি মালিকানাধীন যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্কে পরিণত হয়। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে এই সংস্থাটি তেমন গুরুত্ব পায়নি। বোম্বাইয়ের দি ইন্ডিযান স্পিসি ব্যাঙ্ক ভাবতীয়দের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আরও একটি বড় ব্যাঙ্ক। কিন্তু ১৯১৩ সালে এই ব্যাঙ্কটির পতন ঘটে। তার প্রধান কারণ ছিল রুপোর উপর ফাটকা বাজারীতে জড়িযে পড়া।

৪৭। ১৮৬৩-তে দি ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার উৎপত্তি ঘটে দি ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্কিং কবপোবেশন গঠনেব মাধ্যমে। এই প্রতিষ্ঠানেব তিনজন পবিচালক ছিলেন ইয়োবোপীয, চারজন ভারতীয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির প্রধান অফিস ১৮৬৬ সালে লন্ডনে স্থানান্তরিত হয এবং ভারতীয় পরিচালকরা বোর্ডের সদস্যপদ হারান। দ্রষ্টব্যঃ Tyson, *One hundred years of Banking in Asia and Africa,* অধ্যায ২ ও ৩।

৪৮। পরিসংখ্যানের সূত্র : *IIYB, 1911, IIYB, 1914*।

৪৯। Hunter-র মতে কাজের মরসুমে ১৭.৫ মিলিয়ন থেকে ২০ মিলিয়ন টাকা শিল্প সংস্থাগুলিকে (তুলোকল , ধানকল, তুলো থেকে বীজ পৃথক করার ও পেষণেব কাবখানা, তেলকল এবং চিনিকল এগুলির অন্তর্ভুক্ত) ধার দেওয়া হয়েছিল। তিনি এই দাবিও করেন যে ঐ পরিমাণ অর্থের মধ্যে ১১মিলিয়ন টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছিল ভারতীয় সংস্থাগুলিকে এবং ৮মিলিয়ন টাকা ইয়োরোপীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে। দ্রষ্টব্য : *Evidence (Report of IIC),* Vol. III (PP. 1919, XIX), পৃ. ২৭৫-৬।

৫০। Norman Murray-র লিখিত বক্তব্য থেকে জানা যায যে একটি সম্প্রদায হিসাবে ইয়োবোপীয়রা মোট ঋণেব বৃহত্তর অংশ লাভ করেছিল, মোট আমানতের অংশ হিসাবে ঐ ঋণের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম ছিল। এই বৈসাদৃশ্য চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল বাংলায়। দ্রষ্টব্য : R C on Indian Currency and Finance : Vol II, *Appendices to the Report* (লন্ডন, ১৯২৬), পরিশিষ্ট ৪৮। ভারতীয়দের তুলনায় ইয়োরোপীয আমানতকারীদের মধ্যে ব্যবসায়ীর সংখ্যা বেশি থাকার ফলে উপরোক্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল।

৫১। Mackenzie, *Realms of Silver,* পৃ. ১৭৮-৯।

৫২। Tyson, *100 years of Banking in Asia and Africa,* পৃ. ২২৮ - ৩৬।

৫৩। তুলোকল শিল্পে প্রবর্তন সম্পর্কে দ্রষ্টব্য : S. M. Edwardes, *Memoir of Rao Bahadur Ranchhodlal Chhotalal, C. I. E.* (Exeter, 1920), অধ্যায় ৪; Mehta, *Cotton Mills of India,* অধ্যায় ২, এবং H. Spodek, 'The "Manchesterisation" of Ahmedabad', *Economic Weekly* (বোম্বাই), ১৩-ই মার্চ ১৯৬৫, পৃ. ৪৮৩-৯০।

৫৪। A. Fuhrer, 'Parsees or Parsis', *Encyclopaedia Britannica* (9th ed. Edinburgh, 1885), খণ্ড ১৮, পৃ. ৩২৭।

৫৫। *Census of India 1911*, Vol, VII, *Bombay*, Part I, *Report*, P. J. Mead ও G. Laird Macgregor (বোম্বাই, ১৯১২), পৃ. ৩০৭।

৫৬। Lord Curzon ও F J. Atkinson -এর হিসাব অনুযায়ী মাথাপিছু আয় ছিল দুই পাউন্ড থেকে তিন পাউন্ডের মধ্যে। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যাযে তথ্যটি উল্লেখ করা হয়েছে।

৫৭। *Issues 1897 advertised in the Times*, সংখ্যা ১৪, (লন্ডন, জুলাই - ডিসেম্বর ১৮৯৭), পৃ. ২৬৯।

৫৮। Hilton Brown, *Parry's of Madras : A Story of British Enterprise in India* (মাদ্রাজ, ১৯৫৪), পৃ. ১৬২-৫।

৫৯। The Murree Breery Limited এবং E. Dyer and Company Limited, উভয়ের সঙ্গেই ডায়ার পরিবারের যোগাযোগ ছিল। এই দুটি কোম্পানি উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে মদ উৎপাদন ও তার ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করত : S. Playne (Compiler) ও A. Wright (ed) : The Bombay *Presidency, the United Provinces, the Punjab etc.* (লন্ডন, ১৯২০), পৃ. ১৫৭-৭৪, ৫৬৬-৮ এবং ৬৩৩ - ৮। কানপুরের কারখানাগুলির সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করার বিষয়টির উপর আলোচনা আছে এই গ্রন্থের ৬.৭ অনুচ্ছেদে।

৬০। *IIYB*, 1911, এবং *Capital* (কলকাতা), জানুয়ারি ৫, ১৯১১ এবং জানুয়ারি ৪, ১৯১২, থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুসারে ১৯১০-এ পাটকলের ৩২, ৭১১-টি তাঁতের মোট সংখ্যার মধ্যে Bird and Company নিয়ন্ত্রণ করত ৪,৭০৭-টি, Thomas, Duff and Company ৩,৭২৪-টি, Andrew Yule and Company ৩,৩০২-টি, Jardine, Skinner and Company ২,১৭৭-টি, Ernsthausen ২,১৫০-টি এবংGeorge Henderson ২,০৪০-টি।

৬১। Hope, 'The Tea Industry of Bengal and Assam', পৃ. ৩৮৭।

৬২। *Tea Producing Companies 1914* (লন্ডন, ১৯১৪) এবং *Tea Producing Companies 1923-4* (লন্ডন, ১৯২৪)। ১৯১৪ নাগাদ নিবন্ধভুক্ত এমন কোনো কোম্পানির বিষয়ে কাজে লাগত শেষোক্ত প্রকাশনাটি, কোনো কারণে হয়ত সেই বিষয় বাদ পড়ে গেছে আগের প্রকাশনায়।

৬৩। প্রধান ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসগুলি ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলকে নিয়ন্ত্রিত করত। *Capital*-এ (কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২, ১৯০৯) প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছিল, 'ব্যাঙ্ক এব বেঙ্গল'-এর পরিচালন ব্যবস্থা ছিল বদ্ধ পৌরনগরের মতো, কিছু সুবিধাভোগী সংস্থার মধ্যে এর লেনদেন সীমাবদ্ধ ছিল। এই রকম সংস্থার সংখ্যা ষোলর বেশি ছিল না। এর মধ্যে নয়টির কাজকর্ম বন্ধ ছিল। Jardine, Skinner and Gillanders ও Arbuthnot, এই দুটি সংস্থার প্রতিনিধিরা ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের বোর্ডে পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। প্রবন্ধটি থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয় উদ্‌ধৃত হয়েছে নিম্নোক্ত রিপোর্টে : RC on Indian Finance and Currency : *Appendices to the Final Report of the Commissioners* (PP 1914, XX), পৃ. ৬৪৯।

৬৪। Bird and Company ও F. W. Heilgers and Company, এই দুটি ব্যবসায়ী সংস্থার একত্রীকরণ এক্ষেত্রে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। Martin and Company কর্তৃক Burn and Company-টির অধিগ্রহণ আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। TISCO-কে বাদ দিয়ে ধরলে Burn and Company-টিই ছিল ভারতের সব থেকে বড় ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থা।

৬৫। Godfrey Harrison, *Bird and Company of Calcutta. A History produced to mark the firms's Centenary 1864-1964* (কলকাতা, ১৯৬৪), অধ্যায় ২, ৩, ৪।

৬৬। Playne and Wright, *Southern India,* পৃ. ১৩৫-৯।

৬৭। বম্বে চেম্বার এব কমার্সের প্রতিনিধি W. R. Macdonald এবং বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি R. Steel রয়্যাল কমিশন অন ওপিয়ামকে দেওয়া এক সাক্ষ্যে দাবি করেছিলেন যে ব্যক্তিগতভাবে আফিমের ব্যবসার সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ নেই, কিন্তু ভারত সরকারের আফিমেব ব্যবসা সংক্রান্ত নীতির প্রচলনে দুটি চেম্বারর্সেরই সমর্থন ছিল, এমনকি চীনে আফিমের অনিয়ন্ত্রিত রপ্তানি চালু রাখাতেও : R. C. on Opium : *Evidence. with Appendices,* Vol. II (PP 1894, LXI), পৃ. ১৬০-২ এবং ৪৩৯-৫২ এবং RC on Opium : *Evidence, with Appundices,* Vol. IV(PP 1894, LXII), পৃ. ৩১৪-১৬। আফিম রপ্তানির সব থেকে বড় অংশ (মোট পরিমাণের দুই-তৃতীয়াংশ কি তারও বেশি) কলকাতা থেকে জাহাজে পাঠানো হতো। লাইসেন্সপ্রাপ্ত উৎপাদকরা সরকারের তদারকিতে আফিম উৎপাদন করতেন এবং নিলামের পরে আফিম রপ্তানি করা হতো। অনুমান করা স্বাভাবিক যে ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীরা মুনাফার বড় অংশ লাভ করতেন।

৬৮। দৃষ্টান্তের জন্যে, Playne and Wright, *Bengal and Assam, Behar and Orissa,* 'Birkmyre Brothers', পৃ. ৮৫।

৬৯। ঐ, পৃ. ১৫৭। সূত্রটিতে Martin and Company ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যের বড় আমদানিকারী হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। ঐ সময়ে এই সংস্থাটি Bengal Iron and Steel Company-র ম্যানেজিং এজেন্ট ছিল। নিশ্চিতভাবে বলা যায়, উক্ত কোম্পানির মূল আগ্রহ ছিল শুল্ক-সংরক্ষণ প্রাপ্তিতে।

৭০। Turner, Morrison and Company-র লিখিত সাক্ষ্য এবং ঐ কোম্পানির W. S. J. Wilson-এর মৌখিক সাক্ষ্য *(Evidence, Report of Indian Fiscal Commission),* খণ্ড ২, (কলকাতা, ১৯২৩), পৃ. ৩৮১-৮ দ্রষ্টব্য।

৭১। স্যাসুন গ্রুপের মূল ব্যবসা লন্ডন থেকে সাংহাইতে স্থানান্তরিত হওয়ার সাথে সাথে ইস্টার্ন ব্যাঙ্ক ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

৭২। দ্রষ্টব্য : Edwardes, *Gazetteer of Bombay City and Island,* (বোম্বাই, ১৯০৯), পৃ. ৩৯০-১; Pavlov, *The Indian Capitalist Class,* পৃ. ১৪৬-৫৪। D. F. Karaka, *History of the Parsis,* খণ্ড ২ (লন্ডন, ১৮৮৪), পার্সী জাহাজ মালিকদের তালিকার জন্যে দ্রষ্টব্য।

৭৩। দ্রষ্টব্য : M. L. Dantwala. *Marketing of Raw Cotton in India* (বোম্বাই, ১৯৩৭), *idem, A Hundred Years of Indian Cotton* (বোম্বাই, ১৯৪৮)। পশ্চিম ভারতে তুলোর বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্যের জন্যে দ্রষ্টব্য : Frank Moracs, *Sir Purshotamdas Thakurdas* (বোম্বাই, ১৯৫৭)।

৭৪। *IIYB, 1914*-এ 'Railways' ও 'Cotton' শিরোনামায় তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলি উদাহরণস্বরূপ উল্লেখযোগ্য।

৭৫। ভারতে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের পথিকৃতদের মধ্যে ছিলেন Sorabji, Shapurji& Co.। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা একজন পার্সী। পশ্চিম ভারতের প্রথম ফাউনড্রি ও ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ১৯১৯-এ এই সংস্থা বা অন্য কোনো ভারতীয় সংস্থা পশ্চিম ভাবতে প্রধান ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থা-গুলির অন্যতম হতে পারেনি। দ্রষ্টব্য : Playne and Wright, *The Bombay Presidernc*y, পৃ. ৩৩৭-৮ এবং S. M. Rutnagur, *Bombay Industries: The Cotton Mills* (বোম্বাই, ১৯২৭), পৃ. ৬৭১, ৭২৫। ১৯২২-এ পশ্চিম ভারতে কোনো ভারতীয় সংস্থা সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত সংস্থাগুলিব তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় নি। দ্রষ্টব্য : Sen, *Studies in Economic Policy*, পৃ. ২২৭-৮।

৭৬। পরিসংখ্যানের সূত্র : *Census of India 1911*, Vol. VII, *Bombay*, Part II, Imperial Tables by P. J. Mead and G. L. Magregor (Bombay, 1912), PP. 518-21 (Table XV, Part E, Parts III and IV)।

৭৭। জাতপাতের ব্যাপারে সরকারি মনোভাব যে কত আচ্ছন্ন ছিল তার একটি চমৎকাব উদাহরণ পাওয়া যায়। বোম্বাইয়ের উপর জনগণনা সংক্রান্ত রিপোর্টের প্রণেতারা সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করে সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, 'পার্সীদের ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ছাড়া, যে জাত গোড়া থেকে কোনো একটি কারিগরি শিল্পের সঙ্গে জড়িত ছিল, সেই একই জাত একই শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকত, এমনকি যখন সেই শিল্পটি বড় প্রতিষ্ঠানের আকার ধারণ করত।' *Census of India, 1911*, Vol. VII, *Bombay*, Part I, Report by P. J. Mead. and G. L. Macgregor (বোম্বাই, ১৯১২), পৃ. ৩২৪-৫।

৭৮। Andrew Yule & Co., *Andrew Yule & Co. Ltd.* (বেসরকারি প্রচলনের জন্যে গ্রেট ব্রিটেনে মুদ্রিত, ১৯৬৩), পৃ. ৫।

৭৯। ঐ, পৃ. ১১। আরও দেখুন *IIYB, 1911*, পৃ. ৩১০-১১।

৮০। Andrew Yule & Co., *Andrew Yule & Co. Ltd*, পৃ. ১১।

৮১। Harrison, *Bird and Company of Calcutta*, অধ্যায় ২-৫।

৮২। District Gazetteers of the United Provinces of Agra and Oudh, Vol. XIX, *Cawnpore*, (এলাহাবাদ, ১৯০৯), পৃ. ৭৫।

৮৩। ঐ, পৃ. ৭৮-৯।

৮৪। Playne ও Wright, *The Bombay Presidency*, পৃ. ৪৭৫।

৮৫। Gavin Jones in 'The Rise and Progress of Cawnpore', ঐ, পৃ. ৪৯৭।

৮৬। Sen, *Studies in Economic Policy,* পৃ. ৩৮।

৮৭। *IIYB, 1914,* পৃ. ৪৩৫।

৮৮। Playne ও Wright, *The Bombay Presidency,* পৃ. ৪৪৭।

৮৯। *IIYB, 1914,* পৃ. ৪১৩।

৯০। Playne ও Wright, *The Bombay Presidency* পৃ. ৪২৬; District Gazetteers of the United Provinces of Agra and Oudh, Vol XIX, *Cawnpore,* পৃ. ৮১-২।

৯১। Playne ও Wright, *The Bombay Presidency,* পৃ. ৪২৬।

৯২। Antrobus, *The Jorehant Tea Company Ltd.* পৃ. ৬৪।

৯৩। ব্যবসা থেকে ভারতীয়দের উল্লেখযোগ্যভাবে বাদ দেওয়ার বিষয়টি স্বপক্ষ-সমর্থনমূলক ছিল। Sir W. B Hunter (Secretary, Bank of Madras) বলেছিলেন যে, এমন কোনো ভারতীয় ছিলেন না যিনি কোনো ইয়োরোপীয় সংস্থার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় নিযুক্ত ছিলেন, অতএব কোনো ভারতীয়ই Bank of Madras-এর ডিরেক্টর পদের যোগ্য ছিলেন না। *Evidence (Report of IIC),* Vol. III, *Madras and Bangalore* (PP 1919, XIX), পৃ. ২৮৫-৬।

৯৪। *Report of the Proceedings of the Madres Chamber of Commerce, January-December 1923.* ১৯১৭ সালে এই চেম্বার অব কমার্সে মাত্র একজন ভারতীয় সদস্য ছিলেন। দ্রষ্টব্য : Mr. Gordon Fraser-এর সাক্ষ্য : *Evidence (Report of IIC),* খণ্ড ৩, পৃ. ৩১৩। Madras Chamber of Commerce-এ ১৮৩৬ সালে তার প্রতিষ্ঠাকালে মাত্র দুই জন ভারতীয় সদস্য ছিলেন। আশ্চর্যজনক ব্যাপার, শতবর্ষপূর্তির বছরেও ঐ চেম্বারে ভারতীয় সদস্য ছিলেন দুই জন (প্যারীর ইতিহাস অনুসারে) দ্রষ্টব্য : Brown, *Parry's of Madras,* পৃ. ৬৬।

৯৫। *Evidence (Report of IIC),* খণ্ড ৩, পৃ ৮৮ (Evidence of K. Suryanarayanamurti Nayudu, Proprietor, Messrs Innes and Company, Cocanada); এবং Playne and Wright, *Southern India,* পৃ. ৬১৪-১৬ ('Innes & Co.').

৯৬। *ঐ,* পৃ. ১৩৫ ও ৫৯৮।

৯৭। *ঐ,* পৃ. ১৩৫-৯।

৯৮। *ঐ,* পৃ. ১৩৯।

৯৯। *ঐ,* পৃ. ১৩৯; Slater, *Southern India,* পৃ. ১১৪।

১০০। Playne ও Wright, *Southern India,* পৃ. ১৩৯ ও ২১২।

১০১। উপরের বিবরণটি দেওয়া হয়েছে এই দুটি প্রকাশনার ভিত্তিকে : Brown, *Parry's of Madras* এবং Playne ও Wright, *Southern India,* পৃ. ১৬৬-৯।

১০২। Playne ও Wright, *Southern India,* পৃ. ৪৮১-৪।

১০৩। *ঐ,* পৃ. ৪১৪।

১০৪। *ঐ,* পৃ. ১৫২ এবং *Report of IIC* (PP 1919, XVII), Appendix J।

১০৫। দ্রষ্টব্য : Playne and Wright, *The Bombay Presidency,* পৃ. ৫৬৬-৮, ৬০২ ও ৬৩৩-৮।

১০৬। দ্রষ্টব্য : G. W. Tyson, *The Bengal Chamber of Commerce and Industry 1853-1953 : A Centenary Survey* (কলকাতা, ১৯৫৩), পৃ. ১১২, এবং Herbert Feldman, *Karachi through a Hundret years, the Centenary History of the Karachi Chamber of Commerce and Industry 1860-1960* (করাচী, ১৯৬০), পৃ. ১৩১।

১০৭। *Evidence (Report of Indian Fiscal Commission),* খণ্ড ২ (কলকাতা, ১৯২৩), পৃ. ৪১৯ (কলকাতার মাড়োয়ারি অ্যাসোসিয়েশনের লিখিত বক্তব্য)।

১০৮। কলকাতার Office of the Registrar of the Companies-এ রক্ষিত শেয়ারহোল্ডারদের তালিকা জায়গার অভাবে বিনাশ করা হয়েছে। এখন থেকে দশ বা পনের বছর আগের কাল পর্যন্ত তালিকাগুলি সংরক্ষিত আছে।

১০৯। ১৯৫১ সালেও বিদেশী বিনিয়োগকারীরা Bird-Heilgers group-এর নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানির মোট মূলধনের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ এবং Andrew Yule group-এর মোট মূলধনের ৪৬ শতাংশ অধিকার করে রেখেছিল। দ্রষ্টব্য : Hazari, *Structure of the Corporate Private Sector,* পৃ. ১১৭ ও ১২২।

১১০। ITB : *Evidence (Report on Paper and Paper pulp)* ১৯৩২, পৃ. ১৬২।

১১১। *ঐ,* পৃ ৩৯৭।

১১২। *Evidence (Report of IIC),* খণ্ড ২ (PP 1919, XVIII), পৃ. ৮৮১।

১১৩। *Evidence (Report of IIC),* খণ্ড ৩ (PP 1919, XIX), পৃ. ২০৪।

১১৪। দ্রষ্টব্য: Banerjee, *India's Balance of Payments,* পৃ. ১৭৬-৮১।

১১৫। *ঐ,* পৃ. ১৮৬-৯৬। ঐ গ্রন্থের অধ্যায় ৫ ও তার পরিশিষ্ট A, B ও C-এ ব্যানার্জি প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ পরিমাপের উপযুক্ত তথ্যের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। বিভিন্ন এনকোয়ারি কমিশনকে দেওয়া সাক্ষ্যগুলি বিশ্লেষণ করে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, অন্তত বিশের দশকের শেষ দিক পর্যন্ত অভারতীয় এজেন্ট কর্তৃক পরিচালিত ভারতীয় মুদ্রায় মূলধন বিনিয়োগের অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভারতীয়দের প্রাধান্য ছিল। তাঁর 'প্রত্যক্ষ পরিমাপ' থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান প্রকাশ করে যে, ১৯২১ ও ১৯৩৮ সময়সীমার মধ্যে বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১,৭৬৬.২ মিলিয়ন টাকা। লন্ডনের অর্থের বাজার থেকে গৃহীত ঋণ ও তার পরিশোধের জ্ঞাত তথ্যের ভিত্তিতে ভারতে মূলধনের বার্ষিক পুঞ্জীভবনশীল নীট অনুপ্রবেশের পরিমাণ ব্যানার্জি পরিমাপ করেছেন। তাছাড়া, মূলধনের নীট অনুপ্রবেশের 'পরোক্ষ পরিমাপ'ও তিনি করেছেন লেনদেন ব্যালেন্সের (Balance of Payaments) সমস্ত খাতে দেনা ও পাওনার পরিমাণের

যোগফলের ভিত্তিতে এবং নির্ণীত সংখ্যাটি ২,১৭০ মিলিয়ন টাকা। ভারতীয় টাকায় মূলধনের বিদেশী মালিকানা সম্পর্কিত তথ্যের অসম্পূর্ণতা এবং স্টার্লিং কোম্পানিগুলি সম্পর্কে তার থেকে কিছু কম পরিমাণে তথ্যের অভাব, এবং বিদেশী বিনিয়োগের নির্ণীত সংখ্যাতথ্যে প্রতিফলিত হয়েছে সমহার মূল্য—বাজারের মূল্য নয়—এই সমস্যাগুলির কথা মনে রেখেও উপরোক্ত সংখ্যাতথ্যের দুটি সেটের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সঙ্গতির উপর গুরুত্ব দিতে হয়। বিশেষ কিছু শিল্পের ক্ষেত্রে বিদেশী মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ যে যথেষ্ট প্রভাবসম্পন্ন ছিল গ্রন্থটির এই সিদ্ধান্তকে উল্লিখিত পরিমাপ সমর্থন করে।

১১৬। নিয়ন্ত্রণেব কার্যকরী মাত্রার নির্দেশক কিছু প্রতিনিধিস্বরূপ সংখ্যাতথ্যের জন্যে দ্রষ্টব্য : Michael Kidron, *Foreign Investments in India* (লন্ডন, ১৯৬৫),পৃ. ৩-১১।

১১৭। Harris, *Jamsetji Nusserwanji Tata,* অধ্যায় ১১; Alfred Dickinson, 'Water Power in India', *JRSA,* খণ্ড ৬৬ ; সংখ্যা ৩,৪১৭; মে ১৭, ১৯১৮, পৃ. ৪১৮-২২। A. T. Cooper, 'Recent Electrical Progress in India', *JRSA* খণ্ড ৭৭, সংখ্যা ৩.৯৯৪, পৃ. ৭৪৭-৮ ; Sir Frederick James, 'The House of Tata – Sixty years' Industrial Development in India', *JRSA,* খন্ড ৯৬, অগাস্ট ১৯৪৮, পৃ. ৬১৬।

১১৮। IJMA, *Report of the Committee for 1928* (কলকাতা, ১৯২৯), পৃ. ২৭৩।

১১৯। IJMA, *Report of the Committee for 1936* (কলকাতা, ১৯৩৭), Statement XII.

১২০। J. N. Sahni, *Indian Railways , One Hundred years 1853 to 1953* (নিউ দিল্লী, ১৯৫৩), পৃ. ২।

১২১। দৃষ্টান্তের জন্যে দেখুন, Jamsedjee Dorabjee Naigaumwala-এর জীবনী : N. K. D. Naigaumwalla, *Stars of the Dawn : A Historical Memoir* (বোম্বাই, ১৯৪৬); Jamsedjee Dorabjee-এর অংশীদারদের মধ্যে সবাই ছিলেন পার্সী, যেমন Sorabjee Kharshedjee Thoonthi, Cooverjee Pallonjee, Pestonjee Rustomjee Kanga এবং Rustomjee Ratanjee Billimoria। *ঐ,* পৃ. ২৪।

১২২। Framjee Nusserwanji Patel (জন্ম ১৮০৪) প্রথমে অংশীদার ছিলেন Wallace and Company-র। সংস্থাটি প্রতিষ্ঠায় (১৮৪৪ সাল) তিনি সাহায্য করেছিলেন। তারপর তিনি ১৮৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত Framjee, Sands and Company-এর অংশীদার হন। Playne ও Wright, *The Bombay Presidency,* পৃ. ১৮১। Wallace and Company (লন্ডনের Wallace Brothers) পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠা করল Bombay Burmah Trading Corporation Limited এবং এই সংস্থাটিকে নিয়ন্ত্রণও করতে থাকল। এই কোম্পানি কালক্রমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বনজ সম্পত্তির ব্যবহারের সব থেকে বড় অধিকারী ও কাঠের

ব্যবসায়ী হিসাবে পরিগণিত হয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, Framjee Patel কোম্পানিটি পরিত্যাগ করার পরে Wallace and Company-র কোনো ভারতীয় অংশীদার ছিল না। দ্রষ্টব্য A. C. Pointon. *The Bombay Burmah Trading Corporation LImited, 1863-1963* (লন্ডন, ১৯৬৪), পৃ. ২-৩, এবং ১৩৩।

বোম্বাইয়ের তুলোকল শিল্পের পথিকৃত Cowasjee Nanabhoy Davar ও তাঁর পিতা ছিলেন ব্রিটিশ কোম্পানিগুলির দালাল। ঐ শিল্পের আরও একজন পথিকৃত Maneckjee and Company প্রথমে ছিলেন Messrs Sutton Malcolm and Company-র এজেন্সি হাউসের শিক্ষানবিশ, তারপরে Messrs Dyren, Hunter and Company'র দালাল। পারিবারিক উপাধি 'Petit' প্রাপ্ত হয়েছিল ফরাসিদের সঙ্গে তাদের ব্যবসায়িক সম্পর্কের সূত্রে। দ্রষ্টব্য : Mehta, *Cotton Mills of India*, অধ্যায় ২, এবং S. M. Rutnagur, Bombay *Industries : The Cotton Mills* (বোম্বাই, ১৯২৭), পৃ. ১০, ৭০৫ এবং ৭২০। ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীদের সম্পর্কের অর্থ এই নয় যে তাঁরা অধিনস্ত ছিলেন এবং Davar ও Petit উভয়েরই বড় নিজস্ব ব্যবসা ছিল। Cowasjee's পিতা বম্বে চেম্বার এব কমার্সের কমিটির নির্বাচিত সদস্য ছিলেন।

১২৩। Playne ও Wright, *The Bombay Presidency* পৃ. ১৯২।

১২৪। দ্রষ্টব্য : Blair Kling, 'The Origin of the Managing Agency System in India', *The Journal of Asian Studies*, ২৬, সংখ্যা ১, নভেম্বর ১৯৬৬, পৃ. ৩৭-৪৮ এবং N. K. Sinha, 'Indian Business Enterprise: Its failure in Calcutta (1800-1848)', *Bengal Past and Present*, Diamond Jubilee Number, জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৬৭, পৃ. ১১২-২৩।

১২৫। *The Duncan Group*, পৃ. ২৩-৪।

১২৬। Tyson, *One Hundred years of Banking in Asia and Africa*, অধ্যায় ২।

১২৭। The Calcutta Jute Dealers' Association. *Report of the Committee from 1st January to 31st December 1927* (কলকাতা, ১৯২৮), পৃ. ২১ — সহকারী দালালদের তালিকার জন্যে সূত্রটি দ্রষ্টব্য। এঁরা সবাই ভারতীয় এবং অধিকাংশ বাঙালি। কিন্তু অ্যাসোসিয়েশনের চুক্তিকে (পৃ. ১২-১৭, *Report*) সদস্যপদ ইয়োরোপীয় ডিলারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল।

১২৮। *IIYB, 1925-26* (কলকাতা, ১৯২৫) পৃ. ৪০১-২।

১২৯। James, Mather. Peterson and Sawday সম্পর্কিত কিছু তথ্য পাওয়া গেছে লন্ডনের Tata Limited–এর সূত্রে। অবশিষ্ট তথ্যাদির সূত্র : *Industrial Handbook 1919*, Indian Munitions Board, *Reports and Evidence*, ITB, *JRSA*, *Evidence (Report of the Indian Fiscal Commission)*.

১৩০। *Indian Year-Book, 1923-40*, খণ্ড ২৬ (বোম্বাই, ১৯৩৯), পৃ. ১০৮৫।

১৩১। দৃষ্টান্তের জন্যে ডি. পি. খৈতান ও মাড়োয়ারি চেম্বার এব কমার্স প্রদত্ত সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য : *Evidence (Report of the Indian Fiscal Commission),* খণ্ড ২ (কলকাতা, ১৯২৩), পৃ. ৪১৯-৩৬। খৈতানের চূড়ান্ত সংরক্ষণবাদী মনোভাবে স্যার আর. এন. মুখার্জি ও স্যার মানেকজী দাদভয় সন্ত্রস্ত হন। খৈতান বিড়লার ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং তিনি Birla Brothers Limited-এর জেনারেল ম্যানেজারও হন : *Indian Year-Book, 1939-40,* খন্ড ২৬, পৃ. ১০২৯। গান্ধীজীর আবেদন অগ্রাহ্য করে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ব্রিটেনে তৈরি তুলোর থানকাপড় বিক্রয় করতে থাকে। তার কারণ, ঐ ব্যবসা লাভজনক ছিল। বোম্বাইয়ের মিল-মালিকরা অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। যদিও এই আন্দোলন থেকে তাঁরা ফয়দা তুলেছিলেন। ১৯৩৩-এর 'The Bombay - Lancashire Pact'-কে নেহেরু এবং অন্যান্য ভারতীয়রা (বিড়লার মতো ব্যবসায়ীরা সমেত) জাতীয়তাবাদী স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে চিহ্নিত করেছিলেন। দ্রষ্টব্য : J. Nehru, *An Autobiography* (লন্ডন, ১৯৩৬), পৃ. ৩৬৭।

১৩২। Michael Kidron তাঁর *Foreign Investments in India* গ্রন্থে (লন্ডন, ১৯৬৫, পৃ. ১৯-২৬ এবং ৬৫-৭৩) স্বাধীনতার আগে বিদেশী মূলধন সম্পর্কে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল তার একটি সমীক্ষা করেছেন। ব্রিটিশ শাসন ও উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির প্রতি ভারতের জাতীয় মূলধন বিনিয়োগকারীদের মনোভাব এমনকি স্বাধীনতার আগেও ধোঁয়াটে ছিল, এই ধারণাটির উপর লেখক গুরুত্ব দিয়েছেন। বিদেশী মূলধনের সঙ্গে বৈরিতার সম্পর্ক ইচ্ছুক সহযোগিতার সম্পর্কে পরিবর্তিত হওয়ার প্রক্রিয়াটি আদৌ তত স্পষ্ট ছিল না যতটা লেখক দেখেছেন।

১৩৩। নীল আবাদকারীরা (কৃত্রিম রঙের চল হওয়ার ফলে নীলের বাণিজ্য লোপ পেলে যাঁরা আখ চাষ শুরু করেন) সাধারণ রায়তদের তুলনায় অনেক বড় আকারে চাষ করতেন এবং সার ব্যবহার করতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা কৃষিতে বিপ্লব ঘটাতে পারেন নি। এঁদের মধ্যে অনেকেই বর্গাদার নিয়োগ করেন এবং ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষের তুলনায় বেশি মুনাফা লাভ করতে থাকেন। পুঁজিবাদী বিপ্লবের অগ্রদূত হিসাবে এঁদের গণ্য করা যায় না, এঁদের বড় জোর উন্নত ধরনের জমিদার হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। দ্রষ্টব্য : Playne ও Wright, *Bengal and Behar, Assam and Orissa,* পৃ. ২৯৬-৯ ('The Doulatpur Concern') এবং পৃ. ৩২৯ ('Naraipur Zamindary'); RC on Agriculture in India ; *Evidence,* খন্ড ১৩, *Evidence taken in Bihar and Orissa* (কলকাতা, ১৯২৮), পৃ ৪২৯-৪০ (সাক্ষ্যদাতা : N. Meyrick, সাধারণ সম্পাদক, বিহার প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন লিমিটিড); এবং ITB : *Oral Evidence (Report on Sugar),* খণ্ড ২ (কলকাতা, ১৯৩২), পৃ. ২৮৮-৯২ (সাক্ষ্যদাতা : E. C. Danby ও W. W. Murray, বিহার প্ল্যান্টার্স অ্যান্ড কেন্ গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন)। দৌলতপুরের সংস্থাটি এবং নারাইপুরের জমিদার বর্গাচাষে জমি দিয়ে জমিদার

বনে যায়। Meyrick-এর হিসাব অনুসারে অর্থনৈতিক মাপের (১,০০০ একর) জমিতে চাষেব ব্যয় ছিল ৩০০,০০০ টাকা। Danby-র ভূসম্পত্তি ছিল ২৫,০০ একর জমি, Murray-র ১,৪০০ একর। তাঁরা ব্যবহার করতেন মোটর ট্রাক্টর ও বলদে টানা লাঙ্গল, কিন্তু বাষ্পচালিত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতেন না। কৃত্রিম রং বাজারে আসার ফলে মালচাষ যখন ব্যাহত হয়নি তখনও এই ভারতীয় শিল্পটির ক্ষেত্রে গবেষণার ঘাটতি ছিল। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : D. J. Reid, 'Indigo in Behar': Playne ও Wright, *Bengal and Behar, Assam and Orissa,* পৃ. ২৫৭-৮।

১৩৪। Playne ও Wright, *Bengal and Behar, Assam and Orissa,* পৃ. ১৫৪-৭; K. C. Mahindra, *Sir Rajendra Nath Mookerjee* (কলকাতা, ১৯৬২), পৃ. ১২৩ এবং *Growth and Pespective* (মার্টিন বার্ন, কলকাতা, ১৯৬৮), পৃ. ১১।

১৩৫। R. E. Kennedy, 'The Protestentethic and the Parsis', *The American Journal of Sociology* 1962-63,পৃ. ১১-১২, পুনর্প্রকাশিত : N J. Smelser (সম্পাদিত), *Readings in Economic Sociology* (Englewood Cliffs, N. J., ১৯৬৫), পৃ. ১৬-২৬।

১৩৬। Howard Spodek, 'The "Manchesterisation" of Ahmedabad' *Economic Weekly* (বোম্বাই), ১৭, সংখ্যা ১১, মার্চ ১৯৬৫, পৃ. ৪৮৩-৯০।

১৩৭। Dosabhai Framji Karaka, *History of the Parsis* (লন্ডন, ১৮৮৪), খণ্ড ২, পৃ. ১-১৩।

১৩৮। 'ইয়োরোপীয়দের আনুকূল্য লাভ করার বিশেষ ক্ষমতা ছিল পার্সীদের অথবা তাদের বুদ্ধি, ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা ও সততার জন্যে ইয়োরোপীয়রা পার্সীদের সহযোগী হিসাবে নির্বাচন করেছিল এবং তাদের সঙ্গে বিশ্বাস ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল দ্রুত।' ঐ, পৃ. ৯। তাছাড়া, 'পার্সীদের চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য প্রবণতা ছিল সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য।' ঐ, পৃ. ৫০।

১৩৯। সুরাট বন্দরের অবনতি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য : Gazetteers of the Bombay Presidency : খণ্ড ২, *Surat & Broach* (বোম্বাই, ১৮৭৭), পৃ. ১৬৬-৭৭।

১৪০। Jamsetjee Jejeebhoy and Sons কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন Jamsetjee Jejeebhoy, প্রথম পার্সী (এবং ভারতীয়) ব্যারোনেট এবং তাঁর সময়কালের সব থেকে ধনী পার্সী। দ্রষ্টব্য : Michael Greenberg, *British Trade and the Opening of China* (কেমব্রিজ, ১৯৫১), পৃ. ১৪৬-৫১ ও ১৬৪। Metheson-এর বর্ণনা অনুসারে এই পার্সী সংস্থাটি ছিল কেপের এ প্রান্তের সব থেকে সুপরিচালিত সংস্থা'; *ঐ,* পৃ. ১৬৪ এন।

১৪১। ব্রিটিশ শাসনের মুগ্ধ অনুরাগী আর পি মাসানি আরও একজন বিশ্বস্ত পার্সী এন এম ওয়াদিয়ার আনুগত্যের বিবরণ দিয়েছেন প্রায় কাব্যের মতো করে : R. P. Masani, *N. M. Wadia and His Foundation* (বোম্বাই, ১৯৬১), পৃ. ১।

তবে পার্সীরা সবাই ব্রিটিশদের সম্পর্কে একরকম মনোভাব পোষণ করতেন না। ভারতীয় রাজনৈতিক (সাংস্কৃতিক নয়) জাতীয়তাবাদের পিতা হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার সব থেকে বেশি দাবি ছিল দাদাভাই নৌরজীর। তিনি ছিলেন পার্সী।

১৪২। Gazetteers of the Bombay Presidency : খণ্ড ৪, *Ahmedabad* (বোম্বাই, ১৮৭৯), পৃ. ৬৪।

১৪৩। S. M. Rutnagur, *Bombay Industries : The Cotton Mills* (বোম্বাই, ১৯২৭), পৃ. ২৯৮-৩১১।

১৪৪। নাগরিক উন্নতিসাধন ও দাতব্যের উদ্দেশ্যে পার্সীদের অপরিসীম বদান্যতা আলোচিত হয়েছে নিম্নোক্ত প্রবন্ধে ও গ্রন্থে : L. R Windham Forrest, 'The Town and the Island of Bombay—Past and Present', *JSA*, ৪৯, সংখ্যা ২৫৩৪, জুন ১৪, ১৯০১, পৃ. ৫৭৯-৮০; Masani, *N. M. Wadia and His Foundation*, অধ্যায় ১০; এবং J R P Mody, *Jamsetjee Jejeebhoy—the first Indian Knight and baronet* (বোম্বাই, ১৯৫৯), অধ্যায় ৭ ও ৮।

১৪৫। স্যার পার্সী নিউসন আপাতদৃষ্টিতে কলকাতার একমাত্র ব্রিটিশ বণিক—এবং বাস্তবিকভাবেও মাত্র একজনই—যিনি জনস্বার্থে মোটা অঙ্কের টাকা (১মিলিয়ন) দিয়েছিলেন। দ্রষ্টব্য : 'Ditcher's Diary', *Capital* (কলকাতা), জানুয়ারি ৩, ১৯২০, পৃ. ১১।

১৪৬। প্রথম দুটি বক্তব্যের সমর্থনে দ্রষ্টব্য : Report of *IIC* (PP 1919, XVII), পৃ ৬৪-৫; Jadunath Sarkar, *The Economics of British India* (কলকাতা, ১৯১১), বিশেষত ভূমিকা ('To my Countrymen') এবং অধ্যায় ২ ও ৭। দ্বিতীয় বক্তব্যের সমর্থনে আরও আধুনিককালের সমর্থনের জন্যে : R. Chatterjee, *Indian Economics* (কলকাতা, ১৯৫৯), পৃ. ১৩৪।

১৪৭। এই মতের সমকালীন ও সমগ্র ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিশ্লেষণের জন্যে দ্রষ্টব্য : Barington Moore, Jr., *Social Origins of Dictatorship and Democracy* (লন্ডন, ১৯৬৭), পৃ. ৩৪৫-৭০। ভারতীয় বণিকদের ভূস্বামীতে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াটির বর্ণনার জন্যে দ্রষ্টব্য : N. K. Sinha, *The Economic History of Bengal*, খণ্ড ১ (কলকাতা, ১৯৬১), এবং খণ্ড ২ (কলকাতা, ১৯৬২), বিশেষত শেষোক্ত খণ্ডের অধ্যায় ৭-৯।

১৪৮। C. N. Cooke, *The Rise, Progress and Present Conditions of Banking in India* (কলকাতা, ১৮৬৩); H. Sinha, *Early European Banking in India* (লন্ডন, ১৯২৭), এবং A. Tripathi, *Trade and Finance in the Bengal Presidency* (কলকাতা, ১৯৫৬)।

১৪৯। Kishori Chand Mitra, *Dwarakanath Tagore* (কলকাতা, ১৯৬২) (বাংলায় অনুদৃত সংস্করণটির প্রকাশকাল ১৮৭০)। N. K. Sinha, 'Indian Business Enterprise : Its Failure in Calcutta (1800-1848)', *Bengal*

Past and Present, Diamond Jubilee Number, জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯৬৭, পৃ. ১১২-২৩।

১৫০। B. Kling, 'The Origin of the managing agency system in India'.

১৫১। Tyson, *100 years of banking in Asia and Africa*, অধ্যায় ১-৩।

১৫২। উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য : C. E. Buckland, 'The City of Calcutta', *JSA*, ৫৪, সংখ্যা ২,৭৭৬, ফেব্রুয়ারি ২, ১৯০৬, পৃ. ২৭৫-৯৪। ইয়োরোপীয়দের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাকে যুক্তিপূর্ণ করে তোলার প্রয়াসের একটি দৃষ্টান্তের জন্যে দ্রষ্টব্য : Slater, *Southern India*, পৃ. ৩৩২। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে আইন ও বিচারের জাতিগত ভিত্তির জন্যে দ্রষ্টব্য : B. B. Misra, *The Indian Middle Classes* (লন্ডন, ১৯৬১), পৃ. ৩৭৭-৯।

১৫৩। উদাহবণস্বরূপ দ্রষ্টব্য : *Report of a Committee appointed by the Secretary of State for India to inquire into the System of State technical scholarships established by the Government of India in 1904, with Appendices* (PP1913, XLVII), পৃ. ২৫।

১৫৪। এই গ্রন্থের অনুচ্ছেদ ৫.৭ দেখুন। ভারতীয়দের দ্বারা সংগঠিত বেসরকারি সঙ্ঘগুলি প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলায়, দক্ষিণ ভারতে, মালোয়ায় এবং ভারতের অন্যান্য অংশে। এই সঙ্ঘগুলির উদ্দেশ্য ছিল, ভারতীয়দের আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণের জন্যে বিদেশে প্রেরণ করা। দেশীয় রাজ্য বরোদা, হায়দ্রাবাদ ও মহীশূর এবং ভারত সরকার ভারতীয় ছাত্রদের জলপানি দিত মাইনিং ও টেক্সটাইল প্রযুক্তিবিদ্যার মতো বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্যে। কিন্তু যুক্তরাজ্যে ভারতীয় ছাত্রদের অনেক সময়ে বর্ণ বৈষম্যের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ১৯১৩ সালে ভারত সরকার State technical scholarships সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি পর্যালোচনার জন্যে একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটিকে Mr. Levinstein (ইংল্যান্ডে) জানান : 'আমরা ভারতীয়দের চাই না, কিন্তু এর মধ্যে কিছু দেশাত্মবোধের ব্যাপার আছে এবং আমরা ইংল্যান্ডকে সাহায্য করব ভারতকে সাহায্যের মাধ্যমে'। Sir William Mather কমিটিকে জানিয়েছিলেন : 'আমি মনে করি না যে লন্ডনের কাউনসিল অব ইন্ডিয়া ছাড়া আর কারও পক্ষে বিষয়টির প্রতি সুবিচার সম্ভবপর। কিছু ভারতীয়কে বিদেশে প্রশিক্ষণের সুযোগ দেওয়া নির্দিষ্ট কিছু শিল্পের মালিকদের ক্ষেত্রে জাতীয় কর্তব্য হিসাবে চিহ্নিত করতে পারে এই কাউনসিলই'। *I T J*, ফেব্রুয়ারি ১৯১৪, পৃ ১৬৯।

১৫৫। এই গ্রন্থের অধ্যায় ৮ দ্রষ্টব্য।

১৫৬। *Evidence (Report of IIC)* ,খণ্ড ২ (PP 1919, XVIII), পৃ. ৩৪-৫২, ৭৮-৮৮, ৩৩৫-৪৭।

১৫৭। Playne ও Wright, *The Bombay Presidency*, 'Bharat Insurance Company Limited'.

১৫৮। H. Ghosh, *The Advancement of Industry* (কলকাতা, ১৯১৯), পৃ. ৯০।

১৫৯। Playne ও Wright, *The Bombay Presidency*, পৃ. ৪২৩।

১৬০। ITB, *Evidence (Report on steel)* (কলকাতা, ১৯২৪) খণ্ড ২. পৃ. ২৫৭।

১৬১। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখযোগ্য মাদ্রাজের তদানীন্তন ডিরেক্টর অব্ ইন্ডাস্ট্রিজ C. A. Innes-এর সাক্ষ্য : *Evidence (Report of IIC)*, খণ্ড ৩ (PP 1919, XIX), পৃ. ১৪৯। ভারতীয় কাঁচ শিল্পের ব্যর্থতা সম্পর্কে আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য : Indian Munitions Board. *Industrial Handbook 1919* (কলকাতা, ১৯১৯), পৃ. ২৬২।

১৬২। তাদের ব্যবসায়িক পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য : Madras Provincial Banking Enquiry Committee, খণ্ড ১, *Report* (মাদ্রাজ, ১৯৩০), পৃ. ১৮৬-৭, এবং খণ্ড ৩ *Written Evidence—Contd.* (মাদ্রাজ, ১৯৩০), পৃ. ১১০১-১৮ (সাক্ষ্য : Nattukottai Nagarathars' Association ও C. A. C. Kasinathan Chettiar)। এই রিপোর্ট অনুসারে স্বদেশে বিনিয়োজিত চেট্টিয়ারদের মূলধনের পরিমাণ (ঋণ পুঁজি সমেত) ১৮৯৬-এ ছিল ১০০ মিলিয়ন টাকা, ১৯৩০-এ তা বেড়ে দাঁড়ায় ৮০০ মিলিয়ন টাকায় এবং এর মধ্যে ৭৫০ মিলিয়ন টাকা মাদ্রাজেই বিনিয়োগ করা হয়েছিল। Furnivall-এর দাবি অনুসারে শুধুমাত্র ব্রহ্মদেশেই তারা সমপরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছিল। কিন্তু উভয় পরিমাপই আন্দাজের উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং কোনটি যে যথার্থ তা সহজে বিচার করা যায় না।

১৬৩। সিংহলে চেট্টিয়ারদের ভূমিকার উপর তথ্যের জন্যে দ্রষ্টব্য : Compton Mackenzie, *Realms of Silver : One hundred Years of Banking in the East* (লন্ডন, ১৯৫৪), পৃ. ৯০; ব্রহ্মদেশে তাঁদের ভূমিকার জন্যে দেখুন : J. S. Furnivall, *An Introduction to the Political Economy of Burma* (রেঙ্গুন, ১৯৩১); মালয়ে স্ট্রেট্‌স্ সেটেলমেন্টসে ও ডাচ ইস্ট ইন্ডিজে তাঁদের ভূমিকার জন্যে দ্রষ্টব্য : G. C. Allen ও A. G. Donnithorne, *Western Enterprise in Indonesia and Malaya* (লন্ডন, ১৯৫৭)। ভারতে চেট্টিয়ারদের কার্যকলাপের আরও বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন : Madras Provincial Banking Enquiry Committee, খণ্ড ১, *Report* (মাদ্রাজ, ১৯৩০), অধ্যায় ১৩।

১৬৪। Furnivall, *An Introduction to the Political Economy of Burma*, পৃ. ১১৯-২৪।

১৬৫। চেট্টিয়ারদের শিল্পোদ্যোগ ও সংগঠন সম্পর্কে দ্রষ্টব্য : Shoji Ito, 'A Note on the "Business Combine" in India—with Special reference to the Nattukottai Chettiars', *The Developing Economics* (টোকিও), খণ্ড ৪, সংখ্যা ৩, ১৯৬৬, পৃ. ৩৬৭-৮০।

১৬৬। ITB, *Cotton Textile Industry*, খণ্ড ২, *Views of the Local Governments, Collectors of Customs, and written statements submitted by Associations and Committees* (দিল্লী, ১৯৩৪), পৃ. ২৪২-৮।

১৬৭। Frank Moraes, *Sir Purshotamdas Thakurdas* (বোম্বাই, ১৯৫৭), পৃ. ১৬৪-৫। কাঁচাতুলোর পারিবারিক ব্যবসা ছাড়া স্যার পুরুষোত্তমদাস একটি মাত্র তুলোকলের সঙ্গে আর্থিক দিক থেকে জড়িত ছিলেন এবং তা-ও খুব অল্প সময়ের জন্যে।

১৬৮। দ্রষ্টব্য : Punjab District Gazetters : Vol. VA, *Delhi District with Maps* (লাহোর, ১৯১৩), পৃ. ৭৭; Playne ও Wright, *The Bombay Presidency* পৃ ৬৫৯-৬০; *ITJ, 1890-1940, Jubilee Souvenir* (বোম্বাই, জানুয়ারি ১৯৪১), পৃ. ৩২৬।

১৬৯। *Debrett's Peerage, Baronetage, Companionage, etc.*, 1941, পৃ. ১১৬৬।

১৭০। কলকাতা বা তার নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত The Kesoram Cotton Mills, The Birla Cotton Mills, The Birla Jute Manufacturing Company এবং গোয়ালিয়রের Jiyajirao Cotton Mills নিবন্ধভুক্ত হয়েছিল ১৯১৯ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে : *Joint-Stock Companies in British India and in the Indian States of Hyderabad, Mysore, Baroda, Gwalior, Indore and Travancore, 1929-30* (কলকাতা, ১৯৩২)। অন্যান্য উদ্যোক্তাদের মতো বিড়লারাও অর্থবান হন বাণিজ্য থেকে। রাজা বলদেব দাস বিড়লা ১১ বছর বয়সে ব্যবসা শুরু করেন এবং ১৫ বছর বয়সে তাঁর পিতার সঙ্গে বোম্বাইয়ে একটি ব্যবসায়িক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৭৯ সালে)। ১৯০১-এ তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং ১৯২০ সালে ব্যবসা থেকে অবসর নেন। তাঁর পুত্র ঘনশ্যাম দাস বিড়লা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর সম্ভবত সব থেকে প্রভাবশালী মুখপাত্র (কিন্তু তাঁর এই পরিচয় ১৯৩৬-৭ সালে ইন্দো-ব্রিটিশ বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদনে ভারত সরকারের সঙ্গে সহযোগিতায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি)। তিনি পারিবারিক ব্যবসায়ে যোগ দেন ১২ বছর বয়সে এবং স্বাধীনভাবে ব্যবসায় নামেন পাট ও গুনচটের দালাল হিসাবে ১৬ বছর বয়সে (১৯১০ নাগাদ)। দ্রষ্টব্য : G. D. Binani ও T. V. Rama Rao, *India at a Glance : A Comprehensive Reference Book on India* (কলকাতা, ১৯৫৪), পৃ. ১৭০৩-৪। ভারতে বাণিজ্য, শিল্প ও জমিদারি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত ছিল এবং তার লক্ষণমূলক দৃষ্টান্ত হিসাবে জি ডি বিড়লা *Indian Year Book, 1939-40* খণ্ড ২৬, পৃ. ৯৮৮-এ বর্ণিত হয়েছেন 'মিলমালিক বণিক ও জমিদার' হিসাবে।

১৭১। আফিমের বাণিজ্য থেকে তিন বছরে ১০ মিলিয়নেরও বেশি টাকা মুনাফালাভ করায় তিনি সুনাম অর্জন করেছিলেন : Playne ও Wright, *The Bombay Presidency*, পৃ. ৮৯৮-৯০১।

১৭২। Hazari, *Structure of the Corporate Private Sector*, পৃ. ১৫২, এবং *Report of the Monopolies Inquiry Commission 1956*, খণ্ড ১ ও ২ (দিল্লী, ১৯৬৫), পৃ. ৬১-৩।

১৭৩। UP District Gazetteers : খণ্ড ১৯, Cawnpore, পৃ. ৭৪; The UP Provincial Banking Enquiry Committee 1929-30, খণ্ড ৪, *Evidence* (এলাহাবাদ, ১৯৩১), পৃ. ৬৫-৭৪ (evidence of Parshotamdas Singhania of Messrs. Seth Amritlal Gulzarilal of Firozabad, district Agra); S. D. Tripathi, *The Kanpur Money Market* (দিল্লী, ১৯৬৬) পৃ. ১১-১৬; শেঠ অমৃতলাল গুলজারিলালের অংশীদারবা প্রধানত ছিলেন ব্যাঙ্কার। তাঁদের কাঁচের কারখানা ও ব্যবসাও ছিল। Hazari-র *Structure of the Corporate Private Sector*, পৃ. ১৫২ মতানুসাবে অংশীদার জুগ্গিলাল কমলাপৎ বিকানীব থেকে কানপুরে এসেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে।

১৭৪। প্রতিষ্ঠাতা আর কে ডালমিয়া বোম্বাইয়ে তাঁর কাকার সংস্থায যোগ দিয়েছিলেন ১১ বছর বয়সে এবং স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ কবেন খুব অল্প বয়সে। ১৯২৯ এ তিনি দিনাপুরে অবসর নেন, কিন্তু ১৯৩১-এ চিনি শিল্প সংরক্ষিত হলে তিনি অনেকগুলি চিনিব কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন এবং এইভাবে তাঁর 'অবসর' জীব শেষ হয়। দ্রষ্টব্য : *Indian Year-Book 1939-40*, খণ্ড ২৬, পৃ. ১২১৮। কি অস্পষ্ট কাবণে ব্যবসায়ীদের মধ্যে একমাত্র ডালমিয়া 'Indian Nobles'-এ তালিকায় স্থান পেয়েছিলেন এই *Year-Book*-এ।

১৭৫। পাইকারা জলবিদুৎ ব্যবস্থার উপর 'লোভ' বৃদ্ধির হার প্রত্যাশার তুলনায অনে বেশি ছিল। ১৯৩৭-৩৮ নাগাদ পাইকারা জলবিদুৎ তার বিনিয়োজিত মূলধনে ১৪ শতাংশেরও বেশি উপার্জন করছিল : *Madras, administration report 1937-38* (মাদ্রাজ, ১৯৩৯), পৃ. ১৮১। Mettur dam নির্মাণেব ফলে প্রত্যক্ষভাবে গড়ে উঠেছিল Mettur Chemical Works। দক্ষিণ ভাবতে তুলোকলগুলি এমন কি মন্দার সময়েও মুনাফা অর্জন করে এবং শিল্পটি লাভজনক হওয়াতে বিনিয়োগ হতে থাকে। ১৯৩৪ ও ১৯৩৫ সালে যখন ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে বস্ত্র শিল্পের অবস্থা মন্দ তখন ব্যাঙ্গালোর ও মাদ্রাজের তুলোকলগুলি যুক্তিসঙ্গত হারে ডিভিডেন্ড দিচ্ছিল। দ্রষ্টব্য : *Indian Finance Year-Book*, ১৯৩৬, পৃ. ২৫৬।

১৭৬। দক্ষিণ ভারতে বিশেষ করে মহীশূরে, শিল্পের প্রসারের বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য : G. D. Baldwin, *Industrial Growth in South India* (Glencoe, Illinois, ১৯৫৯)।

১৭৭। একটি দৃষ্টান্ত, ১৯০৫-৬ সালে বরোদায় মাত্র একটি তুলোকল ছিল, কিন্তু ১৯৩৭-৮ নাগাদ ১৬ টি Govt. India CISD, *Financial and commercial statistics of British India*, 13th Issue (কলকাতা, ১৯০৭)।

১৭৮। The Central India State Gazetteer Series : *Gwalior State Gazetteer*, খণ্ড ১, *Text and Tables* (কলকাতা, ১৯০৮), পৃ. ৭৭; *Indore State*

Gazetteer, খণ্ড ২, *Text and Tables* (কলকাতা, ১৯০৮), পৃ. ২১৭; *Bhopal State Gazetteer*, খণ্ড ৩, *Text and Tables* (কলকাতা, ১৯০৮), পৃ. ৫৫।

১৭৯। Seth Narottam Morarjee, 'Indian Mercantile Marine', *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, খণ্ড ১৪৫, অংশ ২, ১৯২৯, পৃ ৬৯। আরও দেখুন : *Bombay Investors' Yearbook 1940* (বোম্বাই, ১৯৪০), পৃ. ৫৮-৬৬ (ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ : 'Why Indian shipping does not grow')।

১৮০। *Bombay Investors' Yearbook 1940*, পৃ. ৭১-২ (Lalchand Hirachand : 'Indian Sugar Industry'), এবং পৃ. ৭৫-৭ (Ratanchand Hirachand : 'Constructional engineering in India')। আরও দেখুন Hazari, *Structure of the Corporate Private Sector*. পৃ. ২০২-৩; *Report of the Monpolies Inquiry Commission 1965*, পৃ. ১১৭-১৮, ১২০।

১৮১। উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য : Rai Sitanath Ray Bahadur of Bengal ও Rao Bahadur K. Suryanarayanamurti Nayudu of Madras in *Evidence* (*Report of IIC*), খণ্ড ২ (PP 1919 XVIII), পৃ. ২৭৯। এবং খণ্ড ৩ (PP. 1919 XIX), পৃ. ৮৮, যথাক্রমে।

১৮২। উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য : বম্বে মিলওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি C. N. Wadia প্রদত্ত সাক্ষ্য : *Evidence* (*Report of IIC*), খণ্ড ৪ (PP 1919, XIX), পৃ. ১-১৭।

১৮৩। দ্রষ্টব্য : Benoy Chowdhury, *Growth of Commercial Agriculture in Bengal (1757-1900)*, খণ্ড ১ (কলকাতা ১৯৬৪), এবং D. J. Reid, 'Indigo in Behar', Playne and Wright, *Bengal and Assam, Behar and Orissa*, পৃ. ২৫৫-৮।

১৮৪। ভারতে বড় চাষীদের শিল্পে অনুপ্রবেশের দৃষ্টান্ত আছে। যেমন, দাক্ষিণাত্যের কিছু চাষী ১৯৩২-এ ডেপুটি ডিরেক্টর অব এগ্রিকালচার (বম্বে)-এর ব্যবস্থাপনায় যুক্তপ্রদেশে চিনির কারখানা পরিদর্শন করেন এবং তাঁরা শোলাপুরে Saswad Mali Sugar Factory Limited কারখানাটি স্থাপন করেন। দ্রষ্টব্য : ITB, *Evidence* (*Report on sugar*) (দিল্লী, ১৯৩৮-৯) খণ্ড ৫, *Oral Evidence* পৃ. ৩৩। কিন্তু এই উদ্যোগগুলি ছোট ছিল এবং বেশি পরিমাণ মূলধনের উপর নিয়ন্ত্রণ বিস্তারে সক্ষম কোনো ব্যবসায়ী গোষ্ঠী তৈরির উপযুক্ত ভিত্তি স্থাপন করেনি।

১৮৫। বিভিন্ন ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার সমকেন্দ্রিতা আলোচিত হয়েছে এই গ্রন্থের অধ্যায় ৪-এ।

১৮৬। ইংরেজ শাসনের প্রতি অবিচল আনুগত্য ও তিনটি কাজের উপর কিভাবে সৌভাগ্য নির্ভর করেছিল তার মনোগ্রাহী দৃষ্টান্তের জন্যে শীতলপ্রসাদ খাড়গপ্রসাদের সংস্থার বিবরণ দেখুন : Playne ও Wright, *Bengal and Assam, Behar*

and Orissa, পৃ. ৬৮৬-৯১। ভারত অভ্যুদয় মিল্‌স্‌ ক্রয় করে সংস্থাটি সুতো উৎপাদন আরম্ভ করল। ভারত অভ্যুদয় মিল্‌স্‌ যাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁরা তুলনামূলকভাবে বেশি উদ্যোগী ছিলেন, কিন্তু তাঁদের অভাব ছিল বিজ্ঞতা ও ধনবলের।

১৮৭। দারভাঙ্গার মহারাজা স্যার রামেশ্বর সিং ১৯০৫ সালে বাজেট অধিবেশনে বলেছিলেন যে, ভারতীয় পুঁজিপতিরা রেল নির্মাণে বিনিয়োগ করতে সম্মত হবেন। ফাটকার কোনো উপাদান ঐ বিনিয়োগ যে নেই, এই বিষয়ে নিশ্চিত করতে পারলে তাঁদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহে অসুবিধা হবে না। তাঁর মতে রেলের প্রসার বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে ঘটতে পারে এবং প্রতিশ্রুত সুদে বিনিয়োগ আকর্ষণ করার প্রকল্পটি রেলওয়ে বোর্ড বিবেচনা করতে পারে। দ্রষ্টব্য : *Indian financial statement and proceedings* (PP. 1905, LVII), পৃ. ২২৮।

১৮৮। ITB, *Evidence* (*Report on sugar*) (কলকাতা, ১৯৩২), খণ্ড ১, পৃ. ৪২-৯, এবং খণ্ড ২, পৃ. ২৮৮-৯২।

১৮৯। সিন্দিয়ার নীতিগুলির আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য : H. M. Bull ও K. N. Haksar, *Madhav Rao Scindia of Gwalior 1876-1925* (গোয়ালিয়র, ১৯২৬), পৃ. ২৫৫-৬০। বরোদার জন্যে দেখুন : J. Alva, *Men and Supremen of Hindustan* (বোম্বাই, ১৯৪৩), পৃ. ৭৫-৮৮ এবং Gazetteers of Bombay Presidency : খণ্ড ৭ *Baroda* (বোম্বাই, ১৮৮৩), অধ্যায় ৫ ও ৬। মধ্য ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য উপরের ১৭৮ টীকায় উল্লিখিত Central Indian State Gazetteer Series।

১৯০। গোয়ালিযরের সিন্দিয়া যে টাটা উদ্যোগে বিনিয়োগ করেছিলেন এবং তাঁদের সংকটের মুহূর্তে সাহায্য করেছিলেন তা সুবিদিত। বোম্বাইয়ের ব্যাঙ্কার ও দালালদের মারফৎ দেশীয় রাজ্যগুলি নিয়মিত পুঁজি বিনিয়োগ করত। দ্রষ্টব্য : লালজী নারাণজী (কিকাভাই প্রেমচাঁদের) প্রদত্ত সাক্ষ্য : Royal Commission on Indian Currency and Finance, *Evidence*, খণ্ড ৪, পৃ. ২৪৪ ও ২৫১।

১৯১। রাও বাহাদুর আর এল মুধলকার প্রদত্ত সাক্ষ্য : *Evidence* (*Report of IIC*), খণ্ড ২ (PP 1919, LVIII), পৃ. ৪৬৮।

১৯২। D. D. Kosambi বুঝেছিলেন, প্রাক-ধনতান্ত্রিক সম্পর্কগুলিকে ব্রিটিশ রাজ সক্রিয় করছিল পুঁজিবাদী উপায়ে অর্থবান হওয়ার লক্ষ্যসাধনে এবং এর ফলে সামন্ততন্ত্র দুর্বল হলো পুনরুদ্ধারের উপায় না রেখে। J. Nehru, *Discovery of India* গ্রন্থের রিভিয়্যু : 'The Bourgeoisie comes of age in India', *Science and Society*, খণ্ড ১০, ১৯৪৬, পৃ. ৩৯২-৮।

অনুবাদক : মনোজ কুমার সান্যাল।

৭

সুতোকল শিল্পের বিকাশ

৭.১ হস্তশিল্প ও সুতোকল শিল্পের উৎপাদন

পুঁজিবাদী শিল্প গড়ে ওঠার পাঠ্যপুস্তকীয় ব্যাখ্যাকে সংক্ষেপ করলে এই বকম দাঁড়ায় : প্রয়োগকৌশলের ছক নির্দিষ্ট হলে মজুরি বৃদ্ধির সাথে সাথে আরও বেশি পুঁজিনির্ভর পদ্ধতির ব্যবহার লাভজনক হয়। সুতরাং একজন তন্তুশিল্পী যদি কেবলমাত্র একটিই হস্তচালিত তাঁতেব উপব নির্ভর করে থাকেন, তবে সেই তাঁতের উৎপাদনশীলতাকে ত্বরান্বিত কবার কোনো পদ্ধতিব প্রয়োগ লাভজনক হবে। এতে তন্তুশিল্পীর মাথাপিছু মূলধন বৃদ্ধি পাবে, যার যুক্তিগত পারম্পর্য হলো যন্ত্রচালিত তাঁতের দ্বারা হস্তচালিত তাঁতের অপসারণ। এই পরিবর্তনেব গতি মজুরি বৃদ্ধির পরিসরের দ্বারা নির্দেশিত হয় না। এই গতি নির্ধাবিত হয় বিনিয়োগেব হার দ্বারা। অপর পক্ষে, বিনিয়োগের হার নির্দেশিত হয় মোট আয়ে পুঁজিবাদীদের অংশ ও তাদের সঞ্চয়-প্রবণতার দ্বারা।[১]

উপরোক্ত আলোচনাকে ভারতের প্রসঙ্গে সাজিয়ে বলা যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীব শেষ ভাগে ভারতীয় শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মানের এক ধরনের উন্নতি ঘটে এবং তা ছিল দেশীয় কৃষকদের সমৃদ্ধির ফলশ্রুতি। এই সমৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল কৃষি-পণ্যের ক্রমবর্ধমান রপ্তানির মাধ্যমে। শ্রমিকদের মজুরিবৃদ্ধি এবং অনিযন্ত্রিত বাণিজ্যেব ক্ষেত্রে অনুন্নত যানবাহন ব্যবস্থা যে বাধা সৃষ্টি করেছিল তার অপসারণ এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি কবেছিল যেখানে যন্ত্রচালিত তাঁত হস্তচালিত তাঁতের তুলনায় উন্নততর ও লাভজনক পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃতি পেল।

যন্ত্রচালিত তাঁতের উৎকর্ষতার সঙ্গে ভারতীয় শ্রমিকের উন্নততর জীবনযাপনের মান অর্জনকে সম্পর্কযুক্ত করার ব্যাপারে সকলের মত এক নয় যেহেতু ঐ মান বৃদ্ধির স্বপক্ষে প্রামাণ্য তথ্যের অভাব ছিল। কিন্তু এঁরা জোর দিয়ে বলেছেন যে, পুবনো সুতো-কাটা চরকা ও হাতে বোনা তাঁতের তুলনায় আধুনিক কালের শক্তি চালিত টাকু ও তাঁত সব দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট তো বটেই, বেশি লাভজনকও। কারণ, এতে মুনাফা সব সময়েই বেশি—শ্রম ও মূলধনের আপেক্ষিক দাম যাই হোক না কেন। এই মত অনুসারে যন্ত্রচালিত তাঁতের দ্বারা হস্তচালিত তাঁতের অপসারণ অবশ্যম্ভাবী এবং তা শুধু সময়ের ব্যাপার। তাছাড়া, ইয়োরোপের অগ্রণী দেশগুলিতে এই পরিবর্তন এসেছিল ; অতএব ভারতে তাকে অভ্যর্থনা জানানো উচিত—যদিও এটা জনসংখ্যার এক উল্লেখযোগ্য অংশের সাময়িক দুর্দশার কারণ হতে পারে।[২]

যাই হোক, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কিছু কিছু পর্যবেক্ষক উপলব্ধি করলেন যে, ব্রিটেনে যে-ভাবে সর্বত্র হস্তচালিত তাঁতের পরিবর্তে যন্ত্রচালিত তাঁতের প্রতিস্থাপন সম্ভব হয়েছে সেই ধরনের ঘটনার হুবহু পুনরাবৃত্তি কিন্তু ভারতে ঘটার নয়। কিন্তু ব্রিটেনের ঘটনার আংশিক পুনরাবৃত্তি ভারতে বস্তুত ঘটেছিল, যেমন, হাতে কাটা সুতোর জায়গায় মেশিনে কাটা সুতোর আবির্ভাব। যদিও ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত পাঞ্জাবের অধিকাংশ হস্তচালিত তাঁতের সুতোর যোগান ঘর থেকে হাতে কাটা সুতোর মাধ্যমেই আসত,[৩] ঐ সুতোর প্রচলন ক্রমশই কমতে থাকে।[৪] হাতে সুতো কাটা বাবদ উপার্জন ক্রমশ কমতে কমতে ১৯০০ সাল নাগাদ দৈনিক এক আনায় এসে দাঁড়ায়, এবং সেই সময় থেকে কেবলমাত্র বৃদ্ধা ও পর্দানশিন মহিলাদের মধ্যেই পেশাটি সীমাবদ্ধ থাকে। ভারতে সুতোকলগুলি প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় চীন ও ভারতের তন্তুবায় শিল্পীদের হস্তচালিত তাঁতের জন্যে প্রয়োজনীয় মোটা সুতোর যোগান দেওয়ার উদ্দেশ্যে। এই সময়ে মিহি সুতো আসত ল্যাঙ্কাশায়ার থেকে। যন্ত্রচালিত তাঁত এবং উন্নততর হস্তচালিত তাঁতের উল্লেখযোগ্য প্রচলন ঘটে যখন উৎপাদনের প্রারম্ভিক স্তরগুলিতে যন্ত্রের ব্যবহার হতে থাকে। এই দিক থেকে ব্রিটেনের সাথে ভারতের কিছু মিল লক্ষ্য করা যায়। সেখানেও ১৭৩৩-এ কে সাহেবের ফ্লাইং শাট্‌ল্ আবিষ্কার ছাড়া বস্ত্রশিল্পে কারিগরি ক্ষেত্রে যা কিছু উন্নতি তা সবই সুতো কাটার পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে ঘটেছিল, বিশেষত ১৭৮৫-তে কার্টরাইট সাহেবের যন্ত্রচালিত তাঁতের উদ্ভাবন পর্যন্ত।[৫]

তবে হস্তচালিত তাঁত এবং তাঁতকলগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পার্থক্য ধরা পড়ে। যদিও এটি সত্য যে ১৯০০ থেকে ১৯৩৯ সময়সীমার মধ্যে সুতিবস্ত্রের কারখানা শিল্পের উৎপাদন হস্তচালিত তাঁতের উৎপাদনের চেয়ে বহুলাংশে বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম হয়, হস্তচালিত তাঁত শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল সামান্য। মুনাফা-লভ্যতার দিক থেকে ভারতের হাতে চলা তাঁতের কিছু বিশেষ সুবিধা এই শতাব্দীর গোড়া থেকে ছিল : ভারতের একজন সাধারণ গ্রামবাসী মোটা তাঁতের কাপড়কে মিলের কাপড়ের তুলনায় বেশি টেকসই বলে মনে করতেন। হাতে বোনা তাঁতে রং-বেরঙের শাড়ি তৈরি হতো যা তখনও ভারতীয় মিলে সম্ভব হয়নি, অন্তত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত। তাছাড়া, তাঁতিদের নিজস্ব নৈপুণ্য ও কোনো অঞ্চলের উৎপাদনগত বৈশিষ্ট্য হস্তচালিত শিল্পকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছিল। প্রযুক্তিগতভাবে সুতোকল শিল্পের পক্ষে হয়ত সম্ভব ছিল ঢাকার মস্‌লিনের মতো মিহি কাপড় উৎপাদন অথবা কাশ্মীরী শালের সূক্ষ্ম সূচিকর্মের অনুকরণ, কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে তা লাভজনক ছিল না।[৬] মোটের উপর এটিই সত্যি যে, ভারতীয় মিলগুলির তখনও বিভিন্ন ধরনের মিহি কাপড়ের বয়ন, বিরঞ্জন ও ছাপাইয়ের কাজ রপ্ত হয়নি।

অল্প মূলধন ব্যয় ও পারিবারিক শ্রমের ব্যবহার তন্তুবায় শিল্পীদের পক্ষে একটি বড় সুবিধা ছিল; অর্থাৎ, মজুরিপ্রাপ্ত শ্রমিক নয়, পরিবারই ছিল উৎপাদনের অর্থনৈতিক একক। প্রয়োজন অনুসারে সুতোর মাপ ঠিক করার ক্ষেত্রেও তাঁদের কিছু বিশেষ সুবিধা ছিল।

ভুল হবে যদি উল্লেখ না করি কী ধরনের অসুবিধাজনক পরিস্থিতি কোনো ভারতীয় তন্তুবায় শিল্পীকে তাঁতের কাজে নিযুক্ত থাকতে বাধ্য করত। ভারতের বেশির ভাগ অঞ্চলে, একমাত্র পশ্চিম পাঞ্জাব বাদে হিন্দু ও কিছুটা মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁতিদের স্থান ছিল নিচুতে। বেশির ভাগ সময়ে বসে বসে কাজ করতে হতো বলে তাঁদের মধ্যে শারীরিক

দুর্বলতার প্রবণতাও দেখা যেত।[৭] অনেক সময়ে তাঁদের মজুরি কৃষি-শ্রমিকদের তুলনায় কম হতো।[৮] যে সমস্ত মহাজন ও দালালরা তুলো বা সুতোর যোগান দিতেন এবং এঁদের কাছ থেকে কাপড় কিনতেন তাঁদেরই দয়ায় তাঁতিদের দিন কাটত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁতিদের বাজার-দামের তুলনায় কম দাম দেওয়া হতো। তা ছাড়া ঐ সব পণ্যের বাজারও ছিল অনিশ্চিত এবং তাঁতিরাও বাজারের অবস্থা সম্পর্কে প্রায়শই অজ্ঞ থাকতেন।[৯]

ব্রিটিশ অফিসার ই ডব্লু কলিন (১৮৯০), এ চ্যাটার্টন (১৯০৫) এবং এ সি চ্যাটার্জি ও জে জি কামিং (১৯০৮) পর্যালোচনা করেন কীভাবে তাঁতিরা প্রতিকূল অবস্থাতেও নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখেন।[১০] ভারতের পশ্চিমোপকূলের বিভিন্ন খ্রিস্টান মিশনারি, খ্রিস্টীয় মুক্তিবাহিনীরা স্যালভেশন আর্মি, অন্যান্য কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং পরের দিকে সরকারি শিল্পদপ্তরগুলির সম্মিলিত পৃষ্ঠপোষকতায় তন্তুশিল্পীদের সামগ্রিক উন্নতিব কিছু প্রচেষ্টা হয়েছিল : যেমন, সাধারণ হস্তচালিত তাঁতের সঙ্গে ফ্লাই-শাট্‌ল্ স্লি'র ব্যবহাব পণ্য প্রস্তুতিকরণের এবং প্রাথমিক প্রক্রিয়ার উন্নতিসাধন (বিশেষত পাক খোলার পদ্ধতির)।[১১] ভারতীয় তাঁতিদের মধ্যে কাপড়ের মাপ ঠিক রাখার যে-সব পদ্ধতি চালু ছিল সেগুলি সুতির কাপড়ের কারখানাগুলির পদ্ধতির তুলনায় আবও উন্নত হিসাবে সাধারণত মনে করা হতো। শিল্পটির উন্নতিসাধনের বহু প্রচেষ্টার মধ্যে পেশাদারী দক্ষতার অভাব ছিল। তার কারণ, সাধারণত পরিকল্পনাকারীরা হস্তচালিত তাঁত বোনার পদ্ধতির বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও যান্ত্রিক সমস্যাগুলির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। তাছাড়া, নির্দেশিত পদ্ধতিগুলি কোনো তাঁতির পক্ষে অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ছিল। তবে এ কথা ঠিক যে, ফ্লাই-শাট্‌ল্ যুক্ত একটি পিটলুম—মাদ্রাজ অঞ্চলে যার ব্যবহার অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল—যথেষ্ট উন্নত মানের হস্তচালিত তাঁত হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। এই যন্ত্রের সাহায্যে একজন তাঁতির দৈনন্দিন উৎপাদন ৫০ শতাংশ থেকে ২০০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভবপর ছিল (সাধারণত কাপড় যত চওড়া হতো ফ্লাই-শাট্‌ল্ যুক্ত তাঁতের ব্যবহার থেকে তত বেশি লাভ হতো)।[১২]

হস্তচালিত তাঁত উৎপাদনের ক্ষেত্রে উন্নততর পদ্ধতিগুলির ব্যবহার তাঁতিদের মধ্যে কতটা ছড়িয়ে পড়েছিল তা ধারণা করা শক্ত। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে অবস্থিত সরকারি শিল্পদপ্তরগুলি এত ছোট ছিল এবং তাদের এত দায়িত্ব পালন করতে হতো যে শিল্পটি উন্নততব উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কতটা এগিয়েছে তার খোঁজখবর সঠিকভাবে রাখা তাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না. এই দপ্তরগুলির কাজ ছিল অনুসন্ধিৎসু ব্যবসায়ীদের শিল্প বা বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন করা এবং শিল্পটির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় গবেষণার কাজ চালিয়ে যাওয়া। অধিকাংশ তন্তুবায় শিক্ষিত ছিলেন না এবং তাঁরা শিল্পটির প্রযুক্তিগত উন্নতির সম্ভাবনা অনুধাবন করতে পারতেন না। আর্থিক ও চাহিদার দিক থেকে অনুকূল পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও শিল্পটির মধ্যে উন্নত প্রযুক্তির বিস্তার সরকারের দৃঢ় ও নিরন্তর প্রয়াস ছাড়া দুঃসাধ্য ছিল। ভাইসরয় লর্ড কার্জন সহ উচ্চপদস্থ সরকারি আমলারা বিশ্বাস করতেন না যে, হস্তচালিত শিল্পটিকে টিকিয়ে রাখা যাবে অথবা শিল্পটির প্রয়োজনীয়তা ছিল।[১৩] তন্তুবায়দের মধ্যে উন্নততর পদ্ধতিতে বয়ন, পাক খোলা ও কলপ করার প্রক্রিয়াগুলিকে জনপ্রিয় করার কষ্টসাধ্য কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল মধ্যম মানের আমলাদের উপর। এঁদের মধ্যে ছিলেন মাদ্রাজের এ চ্যাটার্টন, বাংলায় জে জি কামিং ও ই বি হ্যাভেল এবং যুক্তপ্রদেশে এ সি চ্যাটার্জি। এই কাজে কিছু বেসরকারি সংস্থাও নিযুক্ত

ছিল, যেমন স্যালভেশন আর্মি ও খ্রিস্টান মিশনারিজ। তাছাড়া, পি এন দে ও টি চেট্টির মতো কয়েকজন ব্যক্তি উন্নত পদ্ধতিগুলি প্রচলনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯১০-এ মোর্‌লে সাহেবের নির্দেশে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় কলকারখানা স্থাপনের প্রয়াস বন্ধ রাখা হয়। এর ফলস্বরূপ ছোট আয়তনে শিল্প গড়ে তোলার সরকারি উদ্যোগ প্রকৃতপক্ষে প্রত্যাহৃত হয়। সালেম উইভিং ফ্যাক্টরি এই নিষেধাজ্ঞা অনুসারে বন্ধ হয়ে যায়।[১৪]

সরকারের সহানুভূতির অভাব ছাড়াও তন্তুবায়দের অন্যান্য সমস্যা ছিল। অর্থের অভাব তো ছিলই (অধিকাংশ তন্তুবায়ের পক্ষে দশ টাকা থেকে বেশি দামে বিলাতী তাঁত যন্ত্র কেনা সম্ভব ছিল না), তাছাড়া ছিল চাহিদার অভাব এবং সুতো সরবরাহকারী ও পণ্যের ক্রেতাস্থানীয় দালালদের কাছে ঋণ।[১৫] মিলের কাপড়ের বাজার ছিল দেশব্যাপী, কিন্তু হাতে বোনা কাপড় কেবলমাত্র স্থানীয় চাহিদা মেটাত। বিভিন্ন রকমের কাপড়ের এজেন্সিগুলির মাধ্যমে বিপণনের যে ব্যবস্থা চালু ছিল তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল ছিল। তাঁতিদেরও সামর্থ ছিল না নিজেদের উদ্যোগে বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলার। এ কথা বলা অসঙ্গত হবে না, যে বিষয়গুলি তাঁতিদের দারিদ্র্য এবং নিম্নতর সামাজিক অবস্থানের জন্যে দায়ী সেগুলিই আবার তাঁদের বিরত করেছে উৎপাদনের উন্নততর পদ্ধতিগুলির প্রয়োগ থেকে।

এই সমস্ত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও ফ্লাই শাট্‌ল্ তাঁতের ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তাঁতিদের মধ্যে যোগাযোগের সূত্রে, সরকারি প্রচারের মাধ্যমে নয়।[১৬] ফ্লাই শাট্‌ল্ ব্যবহারের উপর মাদ্রাজে ১৯১১ সালে একটি সমীক্ষা হয় এবং তা থেকে প্রকাশ পায় যে, সেখানে ৬,৫২৮-টি ফ্লাই শাট্‌ল্ স্লি-যুক্ত তাঁত ছিল। স্লির ব্যবহার বস্তুত সীমাবদ্ধ ছিল মাদ্রাজের উত্তরের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে যেখানে মোটামুটি ৪০ শতাংশ তাঁতি মাকু চালনার নতুন পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করেছিল।[১৭] ১৯১৪-১৫ সাল নাগাদ মাদ্রাজে ২৫ হাজারেরও বেশি ফ্লাই শাট্‌ল্ বয়ন-যন্ত্রের প্রচলন ঘটেছিল প্রাদেশিক শিল্প-দপ্তরের ভ্রাম্যমান কর্মীদের প্রচারের মাধ্যমে।[১৮] অবশ্য মাদ্রাজের পরিস্থিতি থেকে সমগ্র ভারত সম্পর্কে কোনো ধারণা করা সঙ্গত নয় যেহেতু কিছু তাঁতের কাপড়, যেমন হাতে বোনা রুমাল ও লুঙ্গি তৈরিতে মাদ্রাজের বিশেষত্বের খ্যাতি ছিল। হাতে বোনা তাঁতের উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্য প্রদেশের শিল্প-দপ্তরগুলির সাংগঠনিক তৎপরতা মাদ্রাজের দপ্তরটির তুলনায় কম ছিল। অতএব, ভারতের অবশিষ্টাংশে অগ্রগতির হার অপেক্ষাকৃতভাবে কম থাকাই ছিল স্বাভাবিক (ব্যক্তিগত চেষ্টায় অন্যান্য অঞ্চলে উন্নত পদ্ধতির প্রয়োগ বিস্তারিত হলে পরিস্থিতি অন্যরকম হতো, কিন্তু সেরকম কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না)। তাছাড়া, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলেও হাতে বোনা তাঁতের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বিঘ্নিত হয় যেহেতু ঐ সময়ে বিলাত থেকে সুতো আমদানির তীব্র হ্রাস ঘটে। ফ্লাই শাট্‌ল্ লুমসের প্রসারও এই যুদ্ধের ফলে ব্যাহত হয়। ১৯১৯-২০ থেকে ১৯২০-২১ পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে বাণিজ্যে সংকটের কালে থান কাপড়ের বাজারে যে ঘাটতি সৃষ্টি হয় তা চাহিদার দিক থেকে সমস্যাটিকে আরও বর্ধিত করে এবং মাদ্রাজের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলিতে বহু তাঁতি যাঁরা এক সময়ে উন্নত পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন—পুরনো পদ্ধতিতে উৎপাদন করতে থাকেন।[১৯] ১৯২১ সালে বাংলায় শিল্পের আদমসুমারির সঙ্গে হাতে চলা তাঁতের উপর যে সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হয় তা থেকে জানা যায় যে, ঐ প্রদেশের ২১৩,৮৮৬-টি হাতে চলা তাঁতের মধ্যে ৫৩,১৬৮-টিতে, অর্থাৎ মোটামুটিভাবে

২৫ শতাংশ তাঁতে, ফ্লাই-শাটলের ব্যবহার ছিল। হুগলি, হাওড়া, যশোহর খুলনা, ঢাকা, বাকারগঞ্জ, মালদহ ও বর্ধমান জেলায় ফ্লাই শাটলের অনুপাতিক ব্যবহার বেশি ছিল, কিন্তু মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, মৈমনসিংহ এবং অন্যান্য জেলায় এই প্রযুক্তির ব্যবহার যথেষ্ট কম ছিল। ত্রিপুরা রাজ্যে ও পার্বত্য চট্টগ্রামে ফ্লাইশাট্‌ল তাঁতযন্ত্রের প্রকৃতপক্ষে কোনো ব্যবহারই ছিল না যদিও ঐ দুটি অঞ্চলে মাথা পিছু তাঁতের ব্যবহার সবথেকে বেশি ছিল।[২০]

কুড়ি বছর পরে ফ্যাক্ট ফাইনডিং কমিটি (হ্যাণ্ডলুম অ্যান্ড মিল্‌স্) লক্ষ্য করেছিল, ভারতের মোট ২ মিলিয়ন হাতে চলা তাঁতের মধ্যে ৬৪ শতাংশ ছিল থ্রো-শাট্‌ল্ লুম্‌স্, ৩৫ শতাংশ ফ্লাই-শাট্‌ল্ লুম্‌স্ এবং মাত্র ১শতাংশ অন্যান্য ধরনের। আসাম বাদে ভারতের মোট তাঁতের মধ্যে ৪৪ শতাংশ ছিল ফ্লাই-শাটল লুম্‌স্। ত্রিবাঙ্কুর (৮১ শতাংশ), মাদ্রাজ (৮১ শতাংশ), মহীশূর (৭৮ শতাংশ), কোচিন (৭৩ শতাংশ), বাংলা (৬৭ শতাংশ) ও বোম্বাই (৫৫ শতাংশ) অঞ্চলে ফ্লাই-শাট্‌ল্ লুম্‌সের অনুপাত বেশি ছিল। ফ্যাক্ট ফাইনডিং কমিটি মন্তব্য করে : 'পূর্ববর্তীকালের পরিসংখ্যান না থাকায় কোনো তুলনা সম্ভবপর নয়। অবশ্য এটি নিশ্চিত যে কুড়ি বছব আগে ফ্লাই-শাট্‌ল্ লুম্‌সেব ব্যবহার অনেক কম ছিল।[২১]

সারণি ৭.১ ভারত : ১৯০০-১ থেকে ১৯৩৮-৯ পর্যন্ত সুতিব থান কাপড়ের মিলে উৎপাদন, হাতেচলা তাঁতে উৎপাদন এবং নীট আমদানি ও বপ্তানি।

সময়	ভারতীয় মিলে থান কাপড়ের উৎপাদন (দশলক্ষ গজ)	আগের বছরের তুলনায় ভারতীয় মিলে থান কাপড় উৎপাদনের পরিবর্তন (দশলক্ষ গজ)	ভারতে থান কাপড়ের নীট আমদানি (আমদানি পুনরায় রপ্তানি) (দশলক্ষ গজ)	তাঁত থেকে থান কাপড়ের উৎপাদন (দশলক্ষ গজ)	(১) + (৪) (দেশজ উৎপাদন) (দশলক্ষ গজ)	(৫) এর শতকরা হিসাবে (১) এর মান	ভারতীয় থান কাপড়েব রপ্তানি (দশলক্ষ গজ)
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১৯০০-১	৪২০.৬	—	১৮৭৫	৬৪৬.৪	১০৬৭.০	৩৯.৪	১১১
১৯০১-২	৫০৬.৭	+৮৬.১	২০৪২	৮২৭.২	১৩৩৩.৯	৩৮.০	১২০
১৯০২-৩	৫২১.০	+১৪.৩	১৯৮৬	৯০৪.৮	১৪২৫.৮	৩৬.৫	১০৯
১৯০৩-৪	৫৭৮.৪	+৫৭.৪	১৯০৩	৮২৬.৮	১৪০৫.২	৪১.২	১২৫
১৯০৪-৫	৬৬৪.৪	+৮৬.০	২১৫২	৯৩৭.২	১৬০১.৬	৪১.৫	১৩৫
১৯০৫-৬	৬৯৩.১	+২৮.৭	২৩৩৫	১০৩৩.২	১৭২৬.৩	৪০.২	১২৯
১৯০৬-৭	৭০২.৭	+৯.৬	২১৯৩	১১০১.৬	১৮০৪.৩	৩৮.৯	১১৫
১৯০৭-৮	৮০৩.০	+১০০.৩	২৪০১	১০৫০.৪	১৮৫৩.৪	৪৩.৪	১১২
১৯০৮-৯	৮১৭.৪	+১৪.৪	১৮৭০	১০৬৬.১	১৮৮৩.৫	৪৩.৪	১১৩
১৯০৯-১০	৯৭৫.১	+৫৭.৭	২০৭৩	৮৪৫.৬	১৮২০.৭	৫৩.৬	১২৬

সময়	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১৯১০-১১	১০৪২.০০	+৬৬.৯	২১৬২	৮৬৮.০	১৯১০.০	৫৪.৬	১৩৪
১৯১১-১২	১১৩৭ ৬	+৯৫.৬	২২৬২	৯৯৪.৮	২১৩২.৪	৫৩ ৫	১১৮
১৯১২-১৩	১২১৪ ১	+৭৬.৫	২৮৪৭	৯৯০.৮	২২০৪.৯	৫৫.৫	১২৫
১৯১৩-১৪	১১৭১.১	—৪৩ ০	৩০৪২	১০১৮.৮	২১৮৯.৯	৫৩.৫	১৩০
১৯১৪-১৫	১১৭৫.৯	+৪ ৮	২৩২৭	১১৩৬.০	২৩১১.৯	৫০.৮	১১০
১৯১৫-১৬	১৪৯৬ ১	+৩২০ ২	২০১৯	৯৪৩.২	২৪৩৯.৩	৬১.৪	১৬১
১৯১৬-১৭	১৬০৬.১	+২১০ ০	১৭৭১	৬৪৫.৬	২২৫১.৭	৭১ ৩	৩০৯
১৯১৭-১৮	১৬১৫.৬	+৯.৫	১৫০৫	৭৪১.২	২৩৫৬.৮	৬০.১	২৩৪
১৯১৮-১৯	১৪৮১.৮	-১৩৩ ৮	৯৫৫	৪৯০.০	২৩৭১.৮	৬২ ৫	১৮৭
১৯১৯-২০	১৬৩০.০	+১৪৮.২	৯৩৬	৫০৬.০	২১৩৬.০	৭৬.৩	২৩৯
১৯২০-১	১৫৬৩.১	-৬৬ ৯	১৪০৫	৯৩১ ২	২৪৯৪.৩	৬২.৭	১৭০
১৯২১-২	১৭১৬.০	+১৫২ ৯	৯৮০	৯৩৮.০	২৬৫৪.০	৬৪.৭	১৮৭
১৯২২-৩	১৭২০.৪	+৪.৮	১৪৬৭	১০৮৪.০	২৮০৪.৮	৬১.৩	১৮৬
১৯২৩-৪	১৬৯৬.৯	-২৩ ৯	১৩৭৪	৮১৬.৮	২৫১৩.৭	৬৭.৫	২০১
১৯২৪-৫	১৯৩৫.৯	+২৩৯.০	১৭১০	১০১০.৮	২৯৪৫.৭	৬৫.৭	২৩০
১৯২৫-৬	১৯৬৪.৬	+২৮.৭	১৫২৯	৮৮৮.৪	২৮৫৩ ০	৬৮.৯	১৬৫
১৯২৬-৭	২২৬৫.৭	+৩০১.১	১৭৫৯	১২১৬.৮	৩৪৮২.৫	৬৫.১	১৯৭
১৯২৭-৮	২৩৭০.৯	+১০৫.২	১৯৩৯	১২১০.৮	৩৫৮১.৭	৬৬.২	১৬৯
১৯২৮-৯	১৮৫৯.৪	-৫১১.৫	১৯১৩	৯৭৩.২	২৮৩২.৬	৬৫.৬	১৪৯
১৯২৯-৩০	২৩৫৬ ৫	+৪৯৭.১	১৮৯৭	১২৮২.৪	৩৬৩৮.৯	৬৪.৮	১৩৩
১৯৩০-১	২৪৮০.৮	+১২৪ ৩	৪৭৩	১২৫৭.২	৩৭৩৮.০	৬৬.৪	৯৮
১৯৩১-২	২৮৭২ ৮	+৩৯২.০	৭৬০	১৩৩২ ৪	৪২০৫.২	৬৮৩	১০৫
১৯৩২-৩	২৯৮২.৭	+১০৯.৯	১২০৩	১৫১৯.২	৪৫০১.৯	৬৬.৩	৬৬
১৯৩৩-৪	২৭৬৭ ৬	-২১৫.১	৭৭১	১২৬২.০	৪০২৯.৬	৬৮.৭	৫৬
১৯৩৪-৫	৩১৩৫.৭	+৩৬৮.১	৯৩৩	১২৫৫.৬	৪৩৯১.৩	৭১ ৪	৫৪
১৯৩৫-৬	৩২৪০.৮	+১০৫.১	৯৩৬.৬	১৪৫০.৪	৪৬৯১.২	৬৯.৩	৭২
১৯৩৬-৭	৩৩২২.১	+৮১.৩	৭৫৩.২	১২৬৫.২	৪৫৮৭.৩	৭২.৪	১০২
১৯৩৭-৮	৩৬৬১.৫	+৩৩৯.৪	৫৭৯.৫	১২৯৩.২	৪৯৫৪.৭	৭৩.৯	২৪১
১৯৩৮-৯	৩৯০৫.৩	+২৪৩.৮	৬৩১.৪	১৭০৩.২	৫৬০৮.৫	৬৯.৬	১৭৭

টীকা : উপরের সারণিতে, মিল ও তাঁত উভয় ক্ষেত্রেই সুতো থেকে কাপড়ে রূপান্তরের জন্য নিচে দেওয়া সূত্র অনুসরণ করা হয়েছে : ১ পাউন্ড সুতো = ৪ গজ কাপড় (তাঁতের ক্ষেত্রে)
১ পাউন্ড সুতো = ৪.৭৮ গজ কাপড় (মিলের ক্ষেত্রে)

উৎস বিষয়ে টীকা : (১), (৪) এবং (৫) স্তম্ভের সংখ্যাগুলি *Report of the Fact-finding Committee (Handloom and Mills)*, (দিল্লী, ১৯৪২) থেকে উদ্ভূত তথ্যের ভিত্তিতে নেওয়া। স্তম্ভ (৩) এর সংখ্যাগুলি যথাক্রমে *ITB Reports on the Cotton Textile Industry* (দিল্লী, ১৯২৭, ১৯৩২, ও ১৯৩৬); এবং Gov. India. CISD : *Statistics of British India* for the relevant years (কলকাতা, বার্ষিক) থেকে নেওয়া।

১৯০০-১ থেকে ১৯১৪-১৫ পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে হাতে চলা তাঁত থেকে উৎপাদনের পরিমাণ এবং তার ওঠানামার একটি চিত্র পাওয়া যায় ৭.১ সারণি থেকে। ১৯০৪-৫ থেকে ১৯০৮-৯ পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধির উঁচু হারগুলি গুচ্ছবদ্ধ হয়ে আছে। ঐ সময়ে হাতে চলা তাঁতের উৎপাদন বেড়ে যাওয়ার কারণ ছিল স্বদেশী আন্দোলন। কিছু সমসাময়িক বিবরণ ইঙ্গিত দেয় যে, স্বদেশী আন্দোলন থেকে সব চাইতে বেশি ফয়দা তুলেছিল তুলোকল শিল্প যেহেতু বিদেশী সুতো ব্যবহরের বিরুদ্ধে ঐ সময়ে সক্রিয় প্রচার চলছিল এবং হাতে চলা তাঁতে ঐ সুতো ব্যবহাব করা হতো। অবশ্য এইরকম মন্তব্যও করা হয়েছিল যে, স্বদেশী আন্দোলন (যার আগে ঘটেছিল রাজনৈতিক বয়কট আন্দোলন) হস্তচালিত শিল্পের মুমূর্ষু কেন্দ্রগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল। এর বিশেষ কারণ, ঐ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল উৎপাদনের কলাকৌশলগত উন্নতিসাধনে তাঁতিদের প্রণোদিত করার প্রয়াস।[২২] থানকাপড় আমদানির উপর রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে আরোপিত ৩½ শতাংশ শুল্কের প্রভাবকে নিরপেক্ষ করার উপায় হিসাবে ১৮৯৬ সালে ভারতীয় তুলোকল শিল্পে উৎপাদিত কাপড়ের উপর ৩½ শতাংশ আবগারি শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল। এই শুল্ক আরোপের মাধ্যমে হস্তচালিত তাঁত শিল্পের স্বপক্ষে যে বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করা হয় তার অবদানও উল্লেখ করা উচিত দেশী তাঁত শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির আংশিক কারণ হিসাবে। উপরন্তু, আমাদেব পরিসংখ্যান ইঙ্গিত দেয় যে তাঁত শিল্পের অগ্রগতির উপর স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব ছিল বড়জোর ক্ষণস্থায়ী যেহেতু ঐ শিল্পের উৎপাদন ১৯০৮-৯ সালের পর থেকে আবার কমতে থাকে এবং ১৯১৪-১৫ পর্যন্ত তার সম্পূর্ণভাবে পুনরুন্নীত হওয়ার লক্ষণ ছিল না। ১৯০৮-এর একটি রিপোর্টে জে জি কামিং উল্লেখ করেছিলেন যে, শ্রীরামপুরের আরও উন্নত তাঁতিরা (যাঁদের মাসিক আয় ৩০ টাকা পর্যন্ত) সস্তা বলে মিলের কাপড় ব্যবহার করতেন এবং একই বছরে এ সি চ্যাটার্জি বলেছিলেন, যুক্তপ্রদেশের বহু তাঁতি স্বদেশী আন্দোলনলব্ধ বর্ধিত চাহিদার কথা কখনও শোনেননি।[২৩]

প্রাক-যুদ্ধকালীন প্রসার হাতে চলা তাঁতের কাপড় উৎপাদনের যা ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমিশনের[২৪] অনুসন্ধানকালে মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল—প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে নিশ্চিত ভাবে থেমে গিয়েছিল। সর্বভারতীয় স্তরে ও মাদ্রাজের মতো প্রদেশগুলিতে সুতো ব্যবহারের পরিমাণ সম্পর্কে তথ্য এবং সুতো তৈরি, সাইজিং ও বয়ন-এর উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির সংখ্যা ১৯১১-র তুলনায় ১৯২১-এ হ্রাস পাওয়ার ঘটনা উপরোক্ত ধারণাকে সমর্থন করে।[২৫]

যুদ্ধের আগের ও পরের সময়কালে তাঁতিদের আয়ে পরিবর্তন সম্পর্কে কোনো ধারণা করা দুঃসাধ্য। এঁদের মধ্যে একটি বড় অংশ ছিলেন রীতিসম্মতভাবে স্বয়ংনিযুক্ত অন্য একটি বড় অংশ উৎপাদন বা কাজের ভিত্তিতে পারিশ্রমিক পেতেন। একমাত্র হাতে চলা তাঁতের কারখানার অপেক্ষাকৃত বেশি সংগঠিত কেন্দ্রগুলিতে শ্রমিকদের নির্দিষ্ট হারে দৈনিক মজুরি দেওয়া হতো। এই সব কারণে তাঁদের দৈনিক উপার্জন সম্পর্কে ধারণা পেতে হয় অন্যান্য তথ্য থেকে। ডিপার্টমেন্ট অব স্ট্যাটিস্টিক্স্ ও পরবর্তীকালে ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স পরিবেশিত মজুরির তথ্য সাধারণত নির্ভরযোগ্য হতো না যেহেতু দৈনিক উপার্জনের হিসাবের পদ্ধতি কি হবে তা অতি মাত্রায় নির্ভর করত অনুসন্ধানকারীদের উপর এবং অনুসন্ধানকালের মরশুমের উপর। তাঁতিদের মধ্যে যথেষ্ট ভাবে অপূর্ণ কর্মসংস্থানের

সমস্যা ছিল, অতএব একটি থেকে অপর মরশুমে তাঁদের উপার্জনের বিপুল ওঠা-নামা ছিল স্বাভাবিক। *প্রাইসেস্ অ্যান্ড ওয়েজেস্ ইন ইন্ডিয়ার*[২৬] বিভিন্ন সংখ্যা থেকে প্রাপ্ত স্বীকৃতভাবে অসম্পূর্ণ ও অনিয়মিত পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে সাধারণভাবে তাঁতিরা শহরের সাধারণ শ্রমিকদের তুলনায় সামান্য বেশি মজুরি পেতেন এবং সাধারণ শ্রমিকদের মজুরি তাঁতিদের নিম্নতম মজুরির সমান হতো, কিন্তু তাঁদের উচ্চতর মজুরির সমান হতো না। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে কিছু কেন্দ্রে তাঁতিদের অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে, এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যেত সাধারণত শ্রমিকদের উপার্জন তাঁতিদের তুলনায় বেশি। অন্তত সর্বনিম্ন মজুরিপ্রাপ্ত তাঁতিদের তুলনায় তো বটেই। তাঁতের কাজে ব্যতিক্রমী দক্ষতার দাম নিশ্চয়ই বেশি ছিল, অতএব অনুমান করা যায় যে, তাঁতিদের সামান্য অংশই উপার্জনের উচ্চ সীমায় উন্নীত হয়েছিল। যুদ্ধের সময়ে ও তার আগে তাঁতিদের মজুরি লোহালক্কড়ের কাজে, ছুতোর মিস্ত্রির বা রাজমিস্ত্রির কাজে নিযুক্ত দক্ষ শ্রমিকদের মজুরির তুলনায় নিশ্চয়ই কম ছিল, কিন্তু যুদ্ধের সময়ে মজুরির পার্থক্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেড়ে যায়।

ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল কমিশনের (IIC) অনুসন্ধানকালে দক্ষিণ ভারতে মজুরির বিনিময়ে শ্রমিক নিয়োগকারী হাতে চলা তাঁতের কারখানার সংখ্যা বাড়তে দেখা গেছে। ভারতে ফ্লাই শাটল্ লুম্সের প্রথম ব্যবহারকারীদের অন্যতম পি থিয়েগারিয়া হাতে চলা তাঁতের কারখানারও প্রথম সংগঠক ছিলেন। কিন্তু কোয়েম্বাটুরের মতো বড় হাতে চলা তাঁতের কেন্দ্রে দেশীয় প্রথায় উৎপাদন অব্যাহত ছিল। সেখানে ব্যবসায়ীরা সোনার জরি ও রেশম তাঁতিদের সরবারহ কবতেন এবং ফুরণে মজুরি দিতেন যখন কমিশনের ভিত্তিতে উৎপাদনের ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যাত হলো।[২৭]

ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির (হ্যান্ডলুম্স্ অ্যান্ড মিল্স্) মতে, ১৯৪০ নাগাদ ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে স্বাধীন তাঁতির অনুপাত কমে গিয়েছিল। তাঁতিরা দেশীয় প্রথায় উৎপাদনের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত মহাজনদেব কাছ থেকে ঋণ নিতেন তাঁদের এবং কারখানাদারদের (যাঁরা ছোট কারখানার কাজে তাঁতিদের নিযুক্ত করতেন) ক্ষমতা শিল্প কমিশনের অনুসন্ধানের কাল থেকে বাড়ছিল এবং এই কারণে তাঁতিদের মধ্যে মজুরি-উপার্জনকারীর অনুপাত নিশ্চিত ভাবে বেড়েছিল। কমিটি ব্যস্ত ও ঢিমে মরশুমে তাঁতিদের উপার্জন (ফুরণ-মাফিক মজুরির এবং কর্মসংস্থানের প্রকৃতি ও নিবিড়তার ভিত্তিতে) পরিমাপ করে। মাদ্রাজের কোনো তাঁতির ব্যস্ত মরশুমে মাসিক উপার্জন ৬ টাকা ৮ আনা থেকে ১৫ টাকার মধ্যে ওঠা-নামা করত যখন তিনি কোনো বড় তাঁতির অধীনে কারখানায় কাজ করতেন। তাঁতিদের তরফ থেকে দেখলে মাদ্রাজ ছিল সমৃদ্ধ প্রদেশ। আসামে মাসিক মজুরিতে পার্থক্যের পরিসর ছিল ৫ টাকা থেকে ১০ টাকা এবং বোম্বাইয়ে ৪ টাকা ৮ আনা থেকে ১২ টাকা।[২৮] এঁদের প্রকৃত মজুরির মূল্যায়নে লক্ষ্য করা উচিত যে, হাতে চলা তাঁত (আসাম বাদে) কেন্দ্রীভূত ছিল শহরাঞ্চলে যেখানে জীবনযাপনের ব্যয় গ্রামের তুলনায় সাধারণত বেশি ছিল। তিরিশের দশকে তাঁতিদের মজুরি সংক্রান্ত পরিস্থিতি যে কী দাঁড়িয়েছিল তার সাক্ষ্য বিক্ষিপ্ত। কিন্তু এই ধারণা প্রায় নিশ্চিত যে, তাঁতিদের মজুরি কারখানার শ্রমিকদের তুলনায় যথেষ্ট বেশি পরিমাণে কমে গিয়েছিল এবং তাঁদের উপার্জন অদক্ষ শ্রমিকদের আয়ের কাছাকাছি নেমে এসেছিল।[২৯]

৭.২ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত তুলোকল শিল্পের অগ্রগতি

সুতো ও থানকাপড়ের উপর বাণিজ্য-শুল্ক এবং ভারতে উৎপাদিত কাপড়ের উপর সমতা-রক্ষাকারী অন্তঃশুল্ক সম্পর্কে যে বিতর্ক চলেছিল তা থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ভারতের ও ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার বহু প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়।[৩০]

প্রথমত, সুতোর মোট ভারতীয় উৎপাদনের মধ্যে ২৪-এর বেশি পাকের সুতোর পরিমাণ ছিল মাত্র ৬ শতাংশ। দ্বিতীয়ত, ১৮৯৩-৯৪-এ ভারতে উৎপাদিত ৩৭৩ মিলিয়ন পাউন্ড সুতোর মধ্যে ৯৭০ মিলিয়ন পাউন্ড রপ্তানি কবা হতো, ১২৯ মিলিয়ন পাউন্ড বিক্রি করা হতো হাতে চলা তাঁতের প্রয়োজনে এবং মাত্র ৭৪ মিলিয়ন পাউন্ড মিলের তাঁতের জন্যে। এই ৭৪ মিলিয়ন পাউন্ড থেকে ৮৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ড কাপড় উৎপাদন হতো এবং এর মধ্যে ৭০.৫ মিলিয়ন পাউন্ড বিক্রি হতো দেশের বাজাবে। ভাবতের মোট সুতো রপ্তানির মধ্যে ০.৫ শতাংশেরও কম ছিল ২৪-এর বেশি কাউন্টের সুতো।

বোম্বাইতে আমদানি করা সুতোর মধ্যে ১৮ শতাংশেবও (ওজনে) বেশ কম ২৪ বা তারও কম কাউন্টের সুতো। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় মিলে কোনো আমদানিজাত সুতোর ব্যবহার ছিল না। ভারতীয় ও ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলের মধ্যে অতি অল্পই প্রতিযোগিতা ছিল ২৪ কাউন্টের কম সুতোর ক্ষেত্রে। ১৮৯৫ সালে ল্যাঙ্কাশাযারের ও বোম্বাইয়ের মিলে ১ পাউন্ড ২০ কাউন্ট সুতো কাটার ব্যয় ছিল যথাক্রমে ৮ আনা ৪.৪৬ পাই এবং ৬ আনা ২.৯৮ পাই। সে সময়ে মার্কিন ও ভারতীয় তুলোর দাম স্বাভাবিক ছিল (যথাক্রমে ৬ আনা ১০.৫৭ পাই এবং ৪ আনা ১১.১৮ পাই যখন তুলোর দাম বেশ কমে যায়। এর মধ্যে যে কোনো অবস্থায় ল্যাঙ্কাশায়ারের তুলনায ভারতের নিশ্চিত সুবিধা ছিল ভারতীয় তুলো থেকে ২০ কাউন্টের সুতো উৎপাদনে। ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলে অতি সামান্যই ভারতীয় সুতোর ব্যবহার হতো, তার কারণ, তাদের চাহিদা ছিল মিহি সুতোর।

সুতির কাপড়ের প্রকারভেদ করা সহজ ছিল না যেহেতু থানকাপড়ের শ্রেণীবিভাগ সুতোর কাউন্ট অনুসারে হতো না। কিন্তু ল্যাঙ্কাশায়ার মিলসের প্রতিনিধিদের দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায় যে, ভারতকে রপ্তানি করা সব রকম কাপড়ের মধ্যে একমাত্র ড্রিল্‌সের ক্ষেত্রে বিশ বা তার কম কাউন্টের সুতো ব্যবহার করা হতো এবং বোম্বাইয়ের মোট থান কাপড় আমদানির মাত্র ২ শতাংশ ছিল ড্রিল্‌স্ এবং ভারতের মোট ঐ কাপড় আমদানির তিন চতুর্থাংশ। উন্নত শ্রেণীর ভারতীয় কাপড়ে যে ধরনের সুতোর ব্যবহার হতো তার মধ্যে প্রস্থের দিকে বুনানির সুতো হয়ত ছিল পঁচিশ (বা তার বেশি) কাউন্টের এবং লম্বালম্বিভাবে টানা সুতো সাধারণত বিশ কাউন্টের বেশি হতো না। কাপড়ের ওজনের এক-তৃতীয়াংশ হতো প্রস্থের সুতোর দরুন এবং অবশিষ্টাংশ নির্দিষ্ট মাপের লম্বা সুতোর দরুন, ফলে ঐ পণ্য ভোগকারীরা পছন্দ করত এবং এ ক্ষেত্রে ভারতীয় উৎপাদনের সঙ্গে আমদানিজাত পণ্যটির প্রতিযোগিতা সম্ভাব্য ছিল। অবশ্য নির্ণয় করা শক্ত, আমদানিজাত কোরা কাপড়ে তিরিশ পাকের সুতো থাকত কিনা এবং ভারতে ক্ষুদ্রায়তনে ঐ সব পণ্য কত পরিমাণ উৎপাদিত হতো।

বিরঞ্জন করা, রঙিন বা ছাপা কাপড়ের ক্ষেত্রে ১৮৯৬-এ ভারতীয় তুলোকলের প্রতিযোগিতা একদম কার্যকর ছিল না বিরঞ্জনের সুযোগ সুবিধা না-থাকায়।[৩১] রং করার

কারখানা ছিল মাত্র তিনটি এবং সেগুলির উৎপাদন-ক্ষমতাও ছিল অতি সামান্য। অতএব সহায়ক শিল্পে বিনিয়োগ ছাড়া ভারতীয় মিলগুলির পক্ষে রঙিন ও বিরঞ্জন করা কাপড়েব বাজারে কার্যকরভাবে প্রবেশ করা সম্ভবপর ছিল না। যেহেতু তুলোর থানকাপড়ের মোট মূল্যে ৩০ থেকে ৭০ শতাংশ অবদান থাকত রং ও ছাপার[৩২] এবং যেহেতু রঙিন কাপড়ের বড় দেশীয় বাজার ছিল, ভারতীয় ব্যবসীযদের পক্ষে ঐ ক্ষেত্রে বিনিযোগ ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু ১৯০৫-এর আগে ঐ সুযোগেব যথাযথ ব্যবহার হয়নি।

বেশি পাকের সুতো কাটারও অনেক সমস্যা ছিল যেগুলি ওয়েস্টল্যান্ডের নোটের এই উদ্‌ধৃতি থেকে স্পষ্ট হয়:

প্রস্তুতিপর্বে, অর্থাৎ 'রোভিঙে'র, স্তর পর্যন্ত, কারখানায় পুরোদমে কাজ হলে একটি নির্দিষ্ট পাউন্ডের পরিমাণ তুলোর প্রস্তুতিকরণ হতো। এই স্তবেও প্রক্রিয়াটির মধ্যে কিছু হেরফের ঘটত শেষ পর্যায়ে সুতোর পাকের সংখ্যা অনুসারে, কিন্তু সাধারণভাবে যন্ত্রপাতিব পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে দৈনিক উৎপাদন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পাউন্ডে দাঁড়াত। এখন সুতো তৈরির বিভাগে পুরো কাজ চললে শেষ পর্যায়ে উৎপাদনের পরিমাণ কত হবে তা নির্ভর করত আবর্তনের সেই সংখ্যাটিব উপর যা থেকে সুতোগুলি একটি বিশেষ দৈর্ঘ প্রাপ্ত হয়। বিশ পাকের সুতো তৈরিতে যে পরিমাণ তুলো লাগবে তার দুই-তৃতীয়াংশ তুলোর প্রয়োজন অনুমান কবে নিয়ে তিরিশ পাকের সুতো কাটা হতো যাতে প্রস্তুতিপর্বের প্রক্রিয়াজাত তুলোর মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ ব্যবহার কবা চলে। অন্যভাবে বললে বিষয়টি এই রকম দাঁড়ায়, বিশ পাকের সুতো তৈরির কারখানাকে তিরিশ পাকের সুতো উৎপাদনের উপযোগী করে তুলতে হলে সেই কারখানায় প্রস্তুতিপর্বে নিয়োজিত যন্ত্রপাতির এক-তৃতীয়াংশকে অকেজো করে রাখতে হবে। এই ফলাফলের প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে যদি বিবেচনা করি যে, অপেক্ষাকৃত মিহি সুতো উৎপাদনের জন্যে কারখানাগুলিকে আরও কিছুটা ঢিমেতালে চলতে হচ্ছে।[৩৩]

ঘটনাক্রমে, মিলে তৈরি সুতির থান কাপড়ের উপর সমতারক্ষাকারী ৩½ শতাংশ আবগারি শুল্ক আরোপের সময় ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরু পর্যন্ত আঠারো বছরের মধ্যে বিরঞ্জন করা বেশি পাকের সুতোর উৎপাদন অথবা মিহি সুতোর উপকরণে বিরঞ্জন করা পণ্য উৎপাদনের সম্প্রসারণ ঘটানোর পরিবর্তে রঙিন বা ছাপা কাপড়ের উৎপাদন ভারতীয় মিলগুলির পক্ষে সহজতর হয়ে উঠেছিল। যখন মিস্টার (পরবর্তীকালে স্যার) জেম্‌স্ ওয়েস্টল্যান্ড তার সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণ লিখেছিলেন তখন একমাত্র পেটিট গোষ্ঠীর মিলগুলিতে মিশরের তুলো থেকে মিহি সুতো উৎপাদনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল। ১৯১২ সালেও ভারতে ২০,০০০ টাকু নিয়োজিত ছিল মিহি সুতো উৎপাদনে।[৩৪] সারণি ৭.২ থেকে প্রতীয়মান হয় ভারতীয় কারখানায় ৪০ পাক পর্যন্ত, ২১ থেকে ৩০ পাক পর্যন্ত, এবং ৩১ থেকে ৪০ পাক পর্যন্ত সুতোর মোট উৎপাদন অনুরূপ পরিসরের পাকের সুতো আমদানির (মূলত গ্রেট ব্রিটেন থেকে) তুলনায় বেশি হারে বাড়ছিল।[৩৫] সরকারি পরিসংখ্যান এক-রকমভাবে সাজানো না থাকায় বিভিন্ন ধরনের থানকাপড় আমদানির প্রবণতার মধ্যে তুলনা করা যাবে না। যাই হোক, একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে সাদা (বিরঞ্জন করা) এবং ছাপা বা রঙিন কাপড়ের আমদানি কোরা কাপড় (অবিরঞ্জিত) আমদানির তুলনায় বেশি হারে বেড়েছিল, এবং কোরা কাপড়, নকশা আঁকা, রঙিন অন্যান্য কাপড়ের ভারতীয় মিলের উৎপাদনও ঐসব শ্রেণীব আমদানির তথ্যগুলি প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ভারতের কিন্তু মিলে

উৎপাদিত সুতোর তথ্যগুলি শুধুমাত্র ব্রিটিশ ভারতের, এখানে দেশীয় রাষ্ট্রের তথ্য দেওয়া হয় নি। কারণ ঐ সময়কালে এখানকার উৎপাদন মোট উৎপাদনের তুলনায় খুব নগণ্য। কাপড় আমদানির তুলনায় বেশি হারে সম্প্রসারিত হয়েছিল। উপবস্ত্র ১৮৯৯-১৯০০ থেকে ১৯০১-২ পর্যন্ত এবং ১৯১১-১২ থেকে ১৯১১-১২ থেকে ১৯১৩-১৪, এই দুই সময়কালের মধ্যে ভারতীয় মিলে শেষোক্ত শ্রেণীর কাপডেব উৎপাদন পাঁচ গুণ বেড়েছিল, যেখানে কোরা কাপড়ের উৎপাদন বেড়েছিল ১০০ শতাংশের একটু বেশি।[১৬]

সারণি ৭.২ ব্রহ্মদেশ বাদে ব্রিটিশ ভারতের মিলগুলিতে সুতো উৎপাদন ও আমদানি, ১৮৯৯-১৯০০ থেকে ১৯১৩-১৪

		১৮৯৯-১৯০০ থেকে ১৯০১-২ ('০০০ পাউন্ড)	১৯১১-১২ থেকে ১৯১৩-১৪ ('০০০ পাউন্ড)
ক- ব্রিটিশ ভারতে আমদানিকৃত সুতোর পরিমাণ			
সুতো কাটার কল এবং জল কাউন্ট			
১ থেকে	২০	৮৮৬	১৮৩৪
২১ „	২৫	৭৪	৬৩৮
২৬ „	৩০	৯৫৬৫	৮১০১
৩১ „	৪০	২৭৩৯৪	২৮৯৯৬
৪০ „	ঊর্ধ্ব	৯১৫৮	১৮৮৯৬
কমলা, লাল এবং অন্যান্য বঙ সমূহ—কাউন্ট			
১ থেকে	২০	১২৬৪	৪১০
২১ „	২৫	১০৪৬	২৮
২৬ „	৩০	২৫৮০	২৪১১
৩১ „	৪০	৩৯৩৭৭	৪৪৮১৩
৪০ „	ঊর্ধ্ব	১৮৭০	২১৪০
নির্দিষ্ট বিবরণ নেই এমন		৫৯৮০	১৬৮৬৪
মোট		৯৮১৯৫	১২৪৯৯৪
খ-মিলসমূহে সুতো উৎপাদনের পরিমাণ কাউন্ট			
১ থেকে	২০	১১,৮৭,৩৭৩	১৩৭১৭০৮
২১ „	৩০	১৮১৫৭৯	৪৪৬৬৫৫
৩১ „	৪০	৩০৬১৮	৫৮০৫৫
৪০ „	ঊর্ধ্ব	৪২৯৪	৭৮১৫
মোট		১৪০৪৪৬৪	১৮,৮৬,২৭৭

উৎস : Gov. India, CISD : *Financial and Commercial Statistics of British India* (কলকাতা, বার্ষিক) এবং *Statistial Abstract for British India from 1911-12 to 1911-21*। (কলকাতা, ১৯২২)।

অতএব, বহু ক্ষেত্রে ভারতীয় কাপড় উৎপাদন যদিও আমদানির আপেক্ষিক অপসারণ ঘটিয়েছিল তবু এ কথা সত্য যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনাকালেও উচ্চতর মানসম্পন্ন থানকাপড় আমদানি মোট থানকাপড আমদানির যথেষ্ট বড় অংশ গঠন করেছিল।

সারণি ৭.৩ ব্রিটিশ ভারতে (ব্রহ্মদেশ বাদে) থান কাপড় আমদানি ও মিলে উৎপাদন, ১৮৯৯-১৯০০ থেকে ১৯১৩-১৪

	১৮৯৯-১৯০০ থেকে ১৯০১-২	১৯১১-১২ থেকে ১৯১৩-১৪
ক- থান কাপড়ের আমদানি ('০০০ গজ)		
কোরা (অবিরঞ্জিত)	৩,৬২৫,০৫৩	৪২,২৯,২৮৫
সাদা বিরঞ্জিত)	১,৩৯৫,৪৭১	২০,৫৪,০৩৫
রঙিন, ছাপা অথবা রঞ্জিত	১,১২৮,৪১৬	১,৮৮৮,১৭০
মোট থান কাপড়	৬,১৪৯,৯৪০	৮,১৭১,৪৯০
খ- থান কাপড়ের উৎপাদন ('০০০ পাউন্ড)		
(ক) কোরা কাপড়	২৫৭,৮২১	৫৭৭,৫৫৮
(খ) নকশা আঁকা, বঙিন ও অন্যান্য কাপড়	৪৮,০৮২	১৯১,৫৯৩

উৎস : সারণি ৭২ অনুযায়ী।

১৯০০সালের অনতিকাল পরে বেশি কার্যক্ষম কারখানাগুলির প্রয়াসে বিরঞ্জন ও রং করার সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হতে থাকল।[৩৭] ১৯০৫-এর পরে যখন যারতীয কাপড়ের ব্যবহার বাড়তে থাকল বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বিকশিত রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে তখন বোম্বাইয়ের কারখানাগুলিতে বিরঞ্জন ও রং করার নিজস্ব ব্যবস্থা থাকাটাই স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে উঠল। এই উন্নতির প্রক্রিয়াটিকে উস্কে দিল চীনে সুতো রপ্তানির বাজারের রমরমা অবস্থাটির অনেকাংশে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ঘটনা। ১৯০১-২ থেকে ১৯০৫-৬ সময়সীমার মধ্যে চীনে ভারতের সুতো রপ্তানির চরম উন্নতি ঘটেছিল যদিও এই উন্নতি ছিল ঝুঁকিবহুল এবং ক্ষণস্থায়ী।[৩৮] সুতো রপ্তানি হ্রাসের ফলাফল প্রতিফলিত হলো শুধুমাত্র সুতো তৈরিতে নিয়োজিত কারখানাগুলির মুনাফার দ্রুত পতনে এবং সুতো থেকে থানকাপড় বয়নের কারখানগুলির আপেক্ষিক মুনাফালভ্যতার বৃদ্ধিতে।

সুতো রপ্তানির এই হ্রাস ফলশ্রুত হলো সামগ্রিকভাবে তুলোকল শিল্পে তাঁত ও টাকুর অনুপাত বৃদ্ধিতে এবং ভারতে ঐ শিল্পের বিভিন্ন কেন্দ্রগুলির উন্নতির হারের বিভিন্নতায়। ১৯০০ সালে তুলোকল শিল্পটি প্রায় পুরোপুরি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল পশ্চিম ভারতে। শিল্পটি বড় হয়ে উঠেছিল বোম্বাই ও আমেদাবাদ শহর ও তাদের আশেপাশে, বোম্বাই ছিল সব থেকে বড় শিল্পকেন্দ্র। ১৯০০-১-এ সমগ্র ভারতের প্রায় ৫৬ শতাংশ তাঁত এবং ৫৩ শতাংশ টাকু বোম্বাই শহরের মিলগুলিতে ছিল। আমেদাবাদের মিলগুলি, এমনকি এই শতাব্দীর শুরুতেও, মূলত দেশীয় বাজারের উদ্দেশ্যে উৎপাদন করত। তাদের তাঁত ও টাকুর অনুপাত বোম্বাইয়ের ও সমগ্র ভারতের মিলগুলির তুলনায় অনেক বেশি ছিল। ঐ

মিলগুলিব উৎপাদনে গড়ে বিশেব বেশি পাকেব সুতোব অনুপাতও বোম্বাই ও সমগ্র ভাবতেব তুলনায অনেক বেশি ছিল।[১৯] তাঁত ও টাকুব প্রসাবেব হাবও সমগ্র ভাবত ও বোম্বাইযেব তুলনায আমেদাবাদে অনেক বেশি ছিল (দ্রষ্টব্য সাবণি ৭ ৪)।

সাবণি ৭-৪ ভাবতে তাঁত ও টাকুব সংখ্যা—প্রধান কেন্দ্রগুলিতে সেগুলিব বন্টন, ১৯০০-২০

	আমেদাবাদ		বোম্বাই (শহব)		ভাবত (ব্রহ্মদেশ ছাড়া)	
	তাঁত	টাকু	তাঁত	টাকু	তাঁত	টাকু
১৯০০-১	৫,৮৬১	৪,৮৫,৭০৬	২২,৫৬৩	২,৬০৮,৫২৭	৪০,৫৪২	৪,৯৩২,৬০২
১৯০১-২	৬,২৪০	৪৮৭,৯৬৯	২২,৯৬৮	২,৫৮১,৬৮৪	৪১,৮১৫	৪,৯৬৪,৯৭৯
১৯০২-৩	৬৪৯১	৫১১,১৮৪	২৩,১৭৮	২,৬৪৮ ৫৪৪	৪৩,৬৭৬	৫,১৬৪,৩৬০
১৯০৩-৪	৬,৬৪৩	৫০৯,৯২৮	২৫,৩৫৯	২,৬৩৮,৮৩০	৪৬,৪২১	৫,২১৩,৩৪৪
১৯০৪-৫	৭,০৬১	৫৩৭,৯২৮	২৫,৩৮৭	২,৫৯৪,২০০	৪৭,৩০৫	৫,১৯৬,৪৩২
১৯০৫-৬	৮,১৮৮	৫৭৭,৬৮০	২৮,৫৩৮	২,৬১৭,৩৯৩	৫২,২৮১	৫,২৯৩,৮৩৪
১৯০৬-৭	৯,৮০৫	৭১৪,৬০১	৩২,৫৩৪	২,৬৮৯,৫৩২	৫৯,৩৭৫	৫,৫৪৬,২৮৮
১৯০৭-৮	১২,৬৭৯	৮৭১,৭৪৫	৩৪,৭৮২	২,৭০৪,৫৭৮	৬৬,১৭৮	৫,৭৬৩,৭১০
১৯০৮-৯	১৩,৮৮০	৮৮৪,৫৩৮	৩৮,৬২৯	২,৭৪০,৭৪৮	৭৪,৫৯২	৫,৯৬৬,৫৩০
১৯০৯-১০	১৫,১৭৯	৯১৪,৬৩১	৪১৩৮৯	২,৮২৪,৩৫০	৮০,১৭১	৬,১৪২,৫৫১
১৯১০-১১	১৬,০৩৭	৯২২,৪৫৮	৪২,২৯৯	২,৯০৭,২৩৫	৮৪,৬২৭	৬,৩৪৬,৬৭৫
১৯১১-১২	১৬,৬১৬	৯৬৫,০৪০	৪৩,০৬২	২,৯১৯,৪৭৪	৮৭,৬৪০	৬,৪২৭,১৮১
১৯১২-১৩	—	—	—	—	৯১,৫৮৫	৬,৪৯৫,০১২
১৯১৩-১৪	১৮,৩৫৯	৯৬৩,০৯৩	৪৭,৭৯০	৩,০৪৪,১৪৮	৯৬,৬৮৮	৬,৬২০,৫৭৬
১৯১৪-১৫	—	—	—	—	১০৩,৩১১	৬,৫৯৪,১০৮
১৯১৫-১৬	২১,৮৭১	১,০২৪,৯২৮	৫৩,১৬৮	২,৯৯০,৭৬৯	১০৮,৪১৭	৬,৬৭৫,৬৮৮
১৯১৬-১৭	—	—	—	—	১১০,৮১২	৬,৬৭০,১৬২
১৯১৭ ১৮	২২,২৫০	১,০৬৫,৭১৭	৫৮,০৬১	২,৮৯৬,৩১৬	১১৪,৮০৫	৬,৬১৪,২৬৯
১৯১৮-১৯	২২,০৭৯	১,০৭২,৫৪০	৬০,৩৪৪	২,৯২১,০৯৯	১১৬,০৯৪	৬,৫৯০,৯১৮
১৯১৯-২০	২২,৭৩১	১,০৭৪,৮৮৬	৬০,৪৭৫	৩,০৩১,৯৫৩	১১৭,৫৫৪	৬,৭১৪,২৬৫

উৎস [১৯০৫-৬ পর্যন্ত] *Financial and Commercial Statistics of British India* [১৯১১-১২ পর্যন্ত] *Statistics of British India*, Part I, *Industrial*, [১৯১৩-১৪ থেকে পববর্তী সময] *Statistics of British India*, Vol I, *Commercial Statistics* (কলকাতা, বার্ষিক)। [এখানে "India'-ব মধ্যে দেশীয় বাষ্ট্রগুলিকে বাদ দেওয়া হয়েছে]

১৯০০-১ ও ১৯১৩-১৪, এই দুই বছরে তাঁত ও টাকুব অনুপাত ভাবতেব (আমেদাবাদ বাদে) তুলনায় বোম্বাইয়ে বেশি ছিল। ভারতেব (আমেদাবাদ ব্যতিবেকে) সঙ্গে বোম্বাইয়েব উৎপাদন-ক্ষমতাব প্রসাবেব হাবের দিক থেকে খুব বেশি কিছু পার্থক্য ছিল না। যেহেতু ভাবতের তুলোকল শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতায় বোম্বাইয়েব গুরুত্ব প্রাবম্ভিক কালে অত্যন্ত বেশি ছিল, এবং যেহেতু আমেদাবাদ ছিল সব থেকে দ্রুত সম্প্রসারণশীল উৎপাদন-কেন্দ্র, শিল্পটি প্রায় ১৯০০-১-র মতো ১৯১৩-১৪ সালেও পশ্চিম ভারতে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকল।

পশ্চিম ভারতের বাইরে তুলোকল শিল্পের প্রসার ঘটেছিল প্রধানত মোটা সুতোর চাহিদাকে কেন্দ্র করে। এই সুতো ব্যবহার করা হতো হাতে চলা তাঁতে। বিশেষত, দক্ষিণ ভারতে অল্প কয়েকটি কাপড় বয়নের কারখানা ছিল। অধিকাংশ কারখানায় তৈরি হতো মোটা সুতো।[৪০] হাতে চলা তাঁতের প্রয়োজন মিটত উন্নত ধরনের সুতো আমদানির মাধ্যমে। পশ্চিম ভারতের মিলগুলিও ঐ রকমের সুতোর যোগান দিত। মোটা ও মাঝারি মানের থানকাপড়ের যোগান পশ্চিম ভারতের মিলগুলি থেকে ক্রমাগত বাড়তে থাকল। হাতে চলা তাঁত থেকেও। উন্নত রকমের কাপড় আসতে থাকল বিদেশ থেকে। এই ভাবে বিশেষীকরণের একটি বিশেষ প্যাটার্ন তৈরি হলো। শুধুমাত্র আমদানি-পরিবর্ত উৎপাদনের কোনো সরল অনুমান উক্ত সময়সীমার মধ্যে ভারতের তুলোকল শিল্পে বিনিয়োগের প্রবণতা ব্যাখ্যা করতে পারে না। যেহেতু চীন ও জাপানের মিলগুলির প্রতিযোগিতায় ১৯০৫-৬-র পর থেকে চীনে ভারতের সুতো রপ্তানি ক্রমাগত ব্যাহত হতে থাকল, আমদানি-পরিবর্ত উৎপাদনে বিনিয়োগ শিল্পটির উন্নয়নে প্রধান উপাদান হয়ে দাঁড়াল বিশেষ করে বোম্বাইয়ের তুলোকলগুলির কাঠামোর যথোপযুক্ত পুনর্বিন্যাসের পর থেকে। উপরন্তু, এই শতাব্দীর প্রথম কয়েক বছরের পরিমাপের তুলনায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত আগের কয়েক বছরের বিনিয়োগের পরিমাপে নিম্নাভিমুখী প্রবণতা আছে যেহেতু তুলো বয়নের যন্ত্রপাতি আমদানির হিসাবের মধ্যে বিরঞ্জনের ও রং করার যন্ত্রপাতি বাদ দেওয়া হয়েছে, যদিও সেগুলির গুরুত্ব ক্রমাগত বেড়েছে। আমদানি-পরিবর্ত উৎপাদনের প্রবণতা থাকলেও তা চীনে সুতো রপ্তানি হ্রাসের ফলাফলকে অতিক্রম করার জন্যে শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকল ১৯১৩-১৪ নাগাদ।

মোট ও মাঝারি ধরনের কাপড় উৎপাদনে ব্যয়গত সুবিধা স্পষ্টভাবে থাকা সত্ত্বেও দেশীয় উৎপাদনে ব্যয়গত বিদেশী পণ্য আমদানির অপসারণ কেন সম্পূর্ণ হলো না, এই প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। প্রথমত, ম্যাঞ্চেস্টার থেকে থানকাপড় আমদানির দীর্ঘস্থায়ী বাণিজ্য ছিল এবং ভারতীয় থানকাপড়ের দ্বারা ঐ পণ্যের অপসারণের ক্ষেত্রে তা ছিল বাধাস্বরূপ। ভারতের থানকাপড়ের বাজারের সব থেকে বড় অংশ ছিল বাংলায় এবং সেখানে পশ্চিম ভারতের তুলনায় অনেক বেশি প্রাধান্য ছিল ইংরেজ বণিক ও শিল্পপতিদের। দ্বিতীয়ত, শুল্ক সংরক্ষণের কোনো সরকারি নীতি না থাকায় শিল্পপতি তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেননি। ম্যাঞ্চেস্টারের শিল্পপতিদের, অর্থাৎ প্রধান রপ্তানিকারীদের, দ্বারা সৃষ্ট বাধা প্রতিহত করার কোনো স্পষ্ট লক্ষ্য ভারতীয় শিল্পপতিদের ছিল না। অনুমানের ভুল বা এমনকি কোনো সাময়িক অসুবিধা থেকে যে সমস্যার উৎপত্তি হতো তা থেকে তাঁদের রক্ষা করত না কোনো শুল্ক সংরক্ষণের প্রাচীর। তৃতীয়ত, সুতো রপ্তানিতে মন্দা এলে বোম্বাইয়ের বড় ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এদের মধ্যে ছিল গ্রীভ্‌স্ কটন অ্যান্ড কোম্পানি এবং ই ডি স্যাসুন অ্যান্ড কোম্পানি। এই কোম্পানিগুলি অতীতে গতিশীল ভূমিকা নিয়েছিল। সুতো উৎপাদনে প্রতিদানের স্বল্পতা এবং বোম্বাইয়ের সন্নিকটবর্তী জমির ও শ্রমের ঊর্ধ্বমুখী ব্যয়ও সম্ভবত বিনিয়োগকে অনুৎসাহিত করেছিল। তাছাড়া, বোম্বাইয়ের মিল-মালিকদের বিভিন্ন সভায় ও *ইন্ডিয়ান টেক্সটাইল জার্নালের*[৪১] পাতায় বারবার অভিযোগ উঠছিল যে, সেখানকার মালিকদের মধ্যে গতিশীলতার অভাব আছে এবং তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন নতুন দেশীয় বাজারের সুযোগ নিতে অথবা চীনের মতো পুরনো বাজারে চীন ও জাপানের প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে। সমালোচকদের বক্তব্যে এই মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল

যে বোম্বাইয়ের মিল-মালিকরা আশা করতেন ক্রেতারাই তাঁদের কাছে আসবেন, ক্রেতাদের কাছে তাঁদের পণ্য নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই।[৪২] বিপণনের ক্ষেত্রে জাপানীদের আগ্রাসী মনোভাব এবং ম্যাঞ্চেস্টারের অনুকূলে প্রচলিত ব্যবস্থার তুলনায় বোম্বাইয়ের মিল-মালিকদের উদ্যোগ ছিল দুর্বল। অন্যান্য কেন্দ্রে স্থানীয় অনুন্নত মানের তুলো পুঁজির চলনশীলতার অভাব এবং প্রাথমিকভাবে দক্ষ কারিগরি কর্মী ও ম্যানেজারের অভাবের জন্যে তুলোকল শিল্পের বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।[৪৩]

কখনও কখনও এই অভিযোগও সোচ্চার হয়েছে যে, ভারতে পর্যাপ্ত পরিমাণে দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলোর উৎপাদন না হওয়ার জন্যে মিহি সুতো ও থান কাপড়ের উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। অবশ্য এই অভিযোগের ভিত্তি ছিল দুর্বল। দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলোর উৎপাদনের একটি বড় অংশ (মূলত মাদ্রাজের ক্ষেত্রে) রপ্তানি করা হতো। ইয়োরোপীয় মহাদেশে প্রায়শই ভারতীয় স্বল্প দৈর্ঘ্যের আঁশযুক্ত তুলো মার্কিনী দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলোর সঙ্গে মিশিয়ে উন্নত মানের সুতির কাপড় প্রস্তুত করা হতো এবং ঐ পণ্য ভারতে রপ্তানি করা হতো। ভারতীয় মিল-মালিকদের পক্ষে মার্কিনী তুলো আমদানি করার এবং তা থেকে মিহি সুতো, উন্নত মানের কাপড় তৈরি করার পথে কোনো বাধা ছিল না। ভারতীয় শিল্প কমিশন অনুসন্ধানকালে লক্ষ্য করেছিল যে, ভারতে দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলোর উৎপাদন (এমনকি মাঝারি দৈর্ঘ্যের আঁশযুক্ত তুলোরও) সীমিত হয়েছিল উপযুক্ত দাম না পাওয়ার কারণে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, স্বল্প আঁশযুক্ত তুলোর তুলনায় দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলোর একর পিছু উৎপাদন হতো অনেক কম।[৪৪] স্যার জেম্‌স্‌ ম্যাককেনা আগেই লিখেছিলেন : 'বর্তমানে বিশ পাকের নিচে মোটা সুতোর তীব্র ক্রমবর্ধমান চাহিদা আছে এবং এই ধরনের সুতো উৎপাদনের পক্ষে ভারত বিশেষভাবে উপযুক্ত। এই চাহিদা যতক্ষণ থাকবে এর চাষ বন্ধ করতে কৃষকদের প্রণোদিত করা দুঃসাধ্য।[৪৫] ভারতে উৎপাদিত তুলোর মান উন্নত করার প্রয়াস নিয়েছিল বম্বে মিল-ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন, বম্বে চেম্বার অব কমার্স এবং বোম্বাইয়ের কৃষি দপ্তর।[৪৬] কিন্তু দেশে বা বিদেশে দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলোর জোরালো চাহিদা না থাকায় (ভারতীয় তুলোর সব চেয়ে বড় ক্রেতা জাপান মূলত স্বল্প দৈর্ঘ্যের আঁশযুক্ত তুলো কিনত), এবং তুলো-উৎপাদক অঞ্চলে সেচের যথাযথ ব্যবস্থা না থাকায় এই ধরনের প্রচেষ্টার ফলাফল নগণ্য হওয়াই ছিল স্বাভাবিক।[৪৭] এই প্রসঙ্গে ১৯১৩-র ২৫শে ডিসেম্বর করাচিতে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনফারেন্সের সভাপতি লালুভাই সামলদাসের প্রদত্ত ভাষণ থেকে নিম্নোক্ত উদ্‌ধৃতিটি প্রণিধানযোগ্য :

আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি পরিমাণে মার্কিনী তুলোর আমদানি হচ্ছে, যার ফলে মিলগুলি মিহি সুতো বুনতে পারছে। বিগত দশকে তাঁতের কাপড়ের উৎপাদন দ্বিগুণ হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সুতি কাপড়ের আমদানি কমার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এর কারণ, এ দেশে সাদা ও বিরঞ্জিত কাপড়ের উৎপাদন এত কম পরিমাণে হয় যে, আমদানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে তাতে প্রভাবিত হয়নি। যতক্ষণ পর্যন্ত কারখানা ও যন্ত্রপাতির জন্যে আমাদের বাইরের দেশের উপর নির্ভর করে থাকতে হবে, কারিগরি রসায়ন বিদ্যায় আমরা যতক্ষণ এই সব দেশের থেকে পিছিয়ে থাকব এবং মার্কিনী ও মিশরীয় তুলোর সমতুল্য উৎপাদন আমরা না করতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পক্ষে ম্যাঞ্চেস্টার বা বয়নশিল্পের অন্যান্য কেন্দ্রের সঙ্গে সমান তালে প্রতিযোগিতা করা শক্ত।[৪৮]

৭.৩ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত বৈদেশিক প্রতিযোগিতা ও বহিঃশুল্কের পরিবর্তন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জাহাজের অভাবে ব্রিটেন (যে দেশ ছিল ভারতের বাজারে থানকাপড়ের সবচেয়ে বড় যোগানদার) থেকে নিচুমানের থানকাপড় রপ্তানি হ্রাস করা হয়েছিল। রপ্তানি হ্রাসের এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ব্রিটিশ কটন কন্ট্রোল বোর্ড। ১৯১৭-এ থানকাপড় আমদানির উপর শুল্ক ৩$\frac{1}{2}$ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭$\frac{1}{2}$ শতাংশ করা হয়েছিল। কিন্তু ঐ একই পণ্যের উপর আরোপিত অন্তঃশুল্ক অপরিবর্তিত থাকল ৩$\frac{1}{2}$ শতাংশে। গ্রেট ব্রিটেনে অনেক উৎপাদন স্থগিত রেখে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সম্পদের ব্যবহার এবং মালবাহী জাহাজের অভাব সুতো আমদানি হ্রাসের কারণ ছিল। এই আমদানির উপর হাতে টানা তাঁতগুলি নির্ভরশীল ছিল বলে তাঁতের উৎপাদন কমে গিয়েছিল। কিন্তু মিলের উৎপাদন বেড়েছিল। মিলের উৎপাদন বাড়ার আরেকটি কারণ ছিল কাঁচা তুলোর আপেক্ষিক দামের অধোগতি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জাপানি সুতিবস্ত্র উৎপাদকদের ভারতীয় বাজারে অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দেয় ও জাপানি মিলে উৎপাদিত পণ্য ভারতের বাজার থেকে ম্যাঞ্চেস্টারের থানকাপড় হটিয়ে দিয়েছিল এবং কোনো সংশয় নেই, অপসারণের প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত হয়েছিল এই যুদ্ধে। যাই হোক, ভারতে জাপানের রপ্তানি বৃদ্ধির কারণ হিসাবে বলা যায় যে জাপানি মিলগুলি নৈপুণ্যের দিক থেকে ভারতীয় মিলগুলিকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। চীনের বাজার থেকে ভারতীয় সুতোর রপ্তানি অপসারিত হলো চীনা ও জাপানি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এবং এরপর যখন জাপান চীনে থানকাপড়ের রপ্তানি বাড়াতে আরম্ভ করেছিল, ভারত তখন তা পারে নি। সম্ভবত বৈদেশিক বাজারের স্থানীয় পরিস্থিতি বোঝার জন্যে ভারতীয়দের তুলনায় জাপানিরা বেশি মনোযোগ দিয়েছিল।[৪৯] প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে জাপানিদের বাজার ভারতের তুলনায় অনেক বেশি নমনীয় ছিল। লকউডের মতে[৫০] ১৯১৩ থেকে ১৯২৬-এর মধ্যে সুতো কাটার কাজে জাপানি শ্রমিকের দক্ষতা খুব সামান্যই বেড়েছিল। কিন্তু ১৯২৬-এর শুরু থেকে সুতো কাটা ও বোনার কাজে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির অভূতপূর্ব বৃদ্ধি ঘটে।[৫১] উৎকৃষ্ট বাজার ব্যবস্থা ও কারখানা স্তরে বাজার ব্যবস্থা ও কারখানার স্তরে উৎপাদনের কলাকৌশলগত উন্নতি বিশের দশকে জাপানকে তুলোর কাপড়ের প্রধান রপ্তানিকারকে উন্নীত করেছিল। তিরিশের দশকে এই দেশ অন্যান্য রপ্তানিকারকদের তুলনায়ও এগিয়ে গিয়েছিল।[৫২]

সারণি ৭.৫ ভারতে থান কাপড়ের মোট আমদানি, ১৯০০-১ থেকে ১৯৩৯-৪০ (প্রদত্ত রাশিমালা দশলক্ষ গজে)

সময়	যুক্তরাজ্য থেকে	জাপান থেকে	মোট ভারতে আমদানি
১৯০০-১	১৯৭২	—	২০০৩
১৯০১-২	২১৫৪	—	২১৯০
১৯০২-৩	১০৭১	—	২১০৭
১৯০৩-৪	১৯৯৭	—	২০৩৩

সময়	যুক্তরাজ্য থেকে	জাপান থেকে	মোট ভারতে আমদানি
১৯০৪-৫	২২৫১	—	২২৮৮
১৯০৫-৬	২৪১৫	—	২৪৬৩
১৯০৬-৭	২২৭৬	—	২৩১৮
১৯০৭-৮	২৪৮৭	—	২৫৩২
১৯০৮-৯	১৯৪১	১	১৯৯৩
১৯০৯-১০	২১৪১	৬	২৩০৮
১৯১০-১১	২২৫৪	৯	২৪৩৮
১৯১১-১২	২৩৭৯	১৬	৩০২৩
১৯১২-১৩	২৯৪২	৩৯	৩১৯৭
১৯১৩-১৪	৩১০৪	১০০	২৪৪৬
১৯১৪-১৫	২৩৭৮	৯৫	২১৪৮
১৯১৫-১৬	২০৪৯	২৩৮	১৯৩৪
১৯১৬-১৭	১৭৮৬	৭৬	১৫৫৬
১৯১৭-১৮	১৪৩০	১৭০	১১২২
১৯১৮-১৯	৮৬৭	৯০	১০৮১
১৯১৯-২০	৯৭৬	১০৮	১৫১০
১৯২০-১	১২৯২	১২৩	১০৯০
১৯২১-২	৯৫৫	১৫৫	১৫৯৩
১৯২২-৩	১৪৫৩	২১৭	১৪৮৬
১৯২৩-৪	১৩১৯	২৪৪	১৮২৩
১৯২৪-৫	১৬১৪	৩২৩	১৫৬৪
১৯২৫-৬	১২৮৭	৩৫৭	১৭৮৮
১৯২৬-৭	১৪৬৭	৫৬২	১৯৭৩
১৯২৮-৯	১৫৪৩	৩১২	১৯৩৭
১৯২৯-৩০	১৪৫৬	৩৪০	১৯১৯
১৯৩০-১	১২৪৮	৫৭৯	৮৯০
১৯৩১-২	৫২৩	৩৪১	৭৫৩
১৯৩২-৩	৫৭৬	৩৭৪	১১৯৩
১৯৩৩-৪	৩৮৬	৪৯৬	৭৬১
১৯৩৪-৫	৪১৫	—	৯৪৪
১৯৩৫-৬	৫৫২	—	৯৪৭
১৯৩৬-৭	৪৪০	৪১৭(৩৭০)	৭৬৪(৬৯৯)
১৯৩৭-৮	৩৩৪(৩০৯)	৩০৬	৫৯১
১৯৩৮-৯	২৬৭	৪২৫	৬৪৭
১৯৩৯-৪০	২০৬	৩৯৩	৫৭৯

উৎস : Gov. India, CISD : *Review of the trade of India* (কলকাতা বার্ষিক)

উৎস ও টীকা : ১৯৩০-৩১ পর্যন্ত সময়ের পরিসংখ্যানে ছাঁটকাপড় ও খুঁতযুক্ত কাপড়ের আমদানি অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। ১৯২০-২১ পর্যন্ত ঐ আমদানি মোট আমদানির ১ থেকে ১.৫ শতাংশের মধ্যে ছিল এবং পরবর্তী কিছু বছরে তা ২ থেকে ৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৩৬-৩৭ পর্যন্ত পরিসংখ্যানে ব্রহ্মদেশ অন্তর্ভুক্ত যেহেতু তার স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সত্তা রক্ষিত ছিল বাণিজ্য-শুল্ক সংক্রান্ত উদ্দেশ্যে। তার পর থেকে ঐ পরিসংখ্যানে ধরা হয়নি। বন্ধনীভূক্ত রাশিগুলিতে ব্রহ্মদেশ-বিযুক্ত ভারতের আমদানি দেখানো হয়েছে। এইভাবে ব্রহ্মদেশকৃত আমদানির গুরুত্বের বিন্যাস আন্দাজ করা যায়।

জাপানি এবং ব্রিটিশ থানকাপড় রপ্তানির আপেক্ষিক স্থান পরিবর্তন সারণি ৭.৫-এ দেখান হলো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে বস্ত্রশিল্প সম্পর্কিত ভারত সরকারের বাণিজ্য শুল্কনীতি নির্ধারিত হয়েছিল তিনটি বিষয় মাথায় রেখে : (ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ থেকে পরপর ক'বছর রাজস্ব বৃদ্ধির প্রয়োজন, (খ) ভারতীয় উৎপাদন এবং যুক্তরাজ্যের ভারতে রপ্তানিকে জাপানি প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষার প্রয়োজন এবং (গ) তিরিশের দশকে ভারতীয় মিল শিল্পের একটি বড় অংশকে লোপ পাওয়ার আশঙ্কা থেকে মুক্ত রাখা। ভারতীয় মিলের দিক থেকে ল্যাঙ্কাশায়ারের তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগী হিসাবে জাপানের অভ্যুদয় ঘটেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বহু ভারতীয় মিলের প্রতি একক উৎপাদনের মজুরি-ব্যয় ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলের তুলনায় কম ছিল। কিন্তু এ দিক থেকে ভারতীয় মিলগুলির পরিস্থিতি জাপানি মিলেব তুলনায় সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। জাপানও মোটা কাপড় বিক্রি করত যদিও ভারতীয় মিলে ১৯৩০-এর আগে মোট কাপড় উৎপাদন হতো।[৫৩]

১৯২১-এ বাজেটের প্রয়োজনে ভারত সরকার সাধারণ আমদানি-শুল্কের হার বাড়িয়ে ১১ শতাংশে দাঁড় করিয়েছিল এবং এই শুল্কের হার তুলোর কাপড় আমদানির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। একই সঙ্গে বয়ন শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানির উপর ২$\frac{১}{২}$ শতাংশ মূল্যভিত্তিক শুল্ক ধার্য করা হয়। ১৯২২-এ আমদানি-শুল্কের সাধারণ হার বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়, কিন্তু সুতির কাপড়ের ক্ষেত্রে আমদানি শুল্কের হার অপরিবর্তিত থাকে ১১শতাংশে। ১৮৯৬ থেকে সর্বপ্রথম তুলোর সুতোর উপর আমদানি শুল্ক চাপানো হয়। শুল্কের হার ছিল ৫ শতাংশ বস্ত্রশিল্পের মন্দায় বিক্ষোভ দানা বাঁধল এবং তারই ফলে ভারত সরকার ১৯২৫-এ তুলোর কাপড়ের উপর অন্তঃশুল্ক প্রয়োগ স্থগিত রাখে। ১৯২৬-এ এই শুল্ক রদ করা হয়।

১৯২৭-এ ইন্ডিয়ান ট্যারিফ বোর্ড সুতিবস্ত্র শিল্প সম্পর্কে একটি তদন্ত পরিচালনা করেছিল। ট্যারিফ বোর্ডের মতে এই শিল্পের (বিশেষ করে বোম্বাইতে) প্রধান অসুবিধা হলো জাপানের 'অন্যায্য' প্রতিযোগিতা। জাপান উৎপাদন-ব্যয়ের দিক থেকে সুবিধা ভোগ করত। তার কারণ, দু শিফ্‌টে কাজের প্রথা চালু করা এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে গৃহীত নীতি লঙ্ঘন করে রাতের শিফ্‌টে মহিলা ও শিশু শ্রমিক নিয়োগ করা। প্রয়োজনীয় প্রতিবিধানের ব্যাপারে দু'জন ভারতীয় সদস্যের সঙ্গে ব্রিটিশ রাষ্ট্রপতির মতামতের পার্থক্য ছিল। ভারতীয় সদস্যরা দাবি করেছিলেন, দেশীয় মিলে উৎপাদিত তিরিশ কাউন্টের বেশি সুতোর উৎপাদনের জন্যে দান বা বাউন্টি এবং সুতির থানকাপড়ের উপর ৪ শতাংশ অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক। রাষ্ট্রপতি ভেবেছিলেন যে, জাপান থেকে সুতো আমদানির উপর শুল্ক এবং একই সাথে

তুলোর থান কাপড়ের উপর ৪শতাংশ আমদানি শুল্কের বৃদ্ধি ভারতীয় শিল্পের প্রয়োজন মেটাবে।[৫৪]

ভারত সরকার প্রথমে রাষ্ট্রপতি অথবা ট্যারিফ বোর্ডের ভারতীয় সদস্যদের প্রস্তাবিত প্রতিবিধান গ্রহণ করতে রাজি হয়নি এবং সমস্যার আংশিক উপশম হিসাবে কেবলমাত্র মিল স্টোর ও বস্ত্রশিল্পের যন্ত্রপাতির উপর শুল্ক তুলে দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও মিল শিল্পের গভীর সঙ্কট এ বিষয়ে কঠোরতর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করেছিল : ১৯২৭-এ আমদানিকৃত সুতোর উপর ৫ শতাংশ মূল্যানুযায়ী শুল্ককে অপসারিত করার সঙ্গে একটি বিকল্প শুল্ক ব্যবস্থা নেওয়া হলো। মূল্য অনুযায়ী ৫ শতাংশ অথবা পাউন্ড প্রতি ১.৫ আনা—এর মধ্যে যে হারটি বেশি সেটিই ধার্য হলো। এর ফলে ৫০ কাউন্টের কম আমদানিকৃত সুতোর উপর মূল্যানুগ শুল্কসমূহ বেড়েছিল। এই বৃদ্ধি বিশেষ করে লক্ষণীয় ৩০ থেকে ৪০ কাউন্টের সুতোর ক্ষেত্রে যেখানে ভারতীয় ও জাপানি মিলের মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল সবচেয়ে তীব্র।[৫৫]

এই সব ব্যবস্থা জাপানের প্রতিযোগিতার তীব্রতা কমাতে পারেনি। ১৯২৮ ও ১৯২৯-এ বোম্বাইতেও সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়েছিল। পরিস্থিতি বুঝতে সরকার তৎপর হলো বিভিন্ন শ্রেণীর থানকাপড়ের মধ্যে বৈদেশিক প্রতিযোগিতার ব্যাপ্তি এবং ঐ পণ্যের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ শুল্ক ব্যবস্থা গ্রহণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্যে ১৯২৯-এ ভারত সরকার জি এস হার্ডিকে নিয়োগ করেছিল। হার্ডি দেখেছিলেন যে, থানকাপড়ের ক্ষেত্রে ভারত এবং জাপানের মধ্যে প্রতিযোগিতা সব থেকে তীব্র। তাছাড়া, বিভিন্ন কোরা কাপড় ও রঙিন কাপড়ের সূক্ষ্মতর প্রকারগুলি এবং বিরঞ্জিত কাপড় উৎপাদনে প্রকৃতপক্ষে ল্যাঙ্কাশায়ারের একচেটিয়া ভূমিকা ছিল। অতএব হার্ডি সুপারিশ করলেন নির্দিষ্ট শুল্ক আরোপের মাধ্যমে মাঝারি মানের কাপড়ের উৎপাদনকে সংরক্ষণের সুযোগ দেওয়া উচিত।

১৯৩০-এ বাজেট ঘাটতির আশঙ্কা তীব্রভাবে দেখা দিল। ঠিক তার পরেই ভারত সরকার বেশ সক্রিয় হয়ে উঠল। সুতির থানকাপড়ের উপর শুল্ক ১১ থেকে ১৫ শতাংশে বৃদ্ধি করা হলো। সরকার প্রস্তাব করেছিল, অ-ব্রিটিশ সূত্র থেকে আমদানিকৃত সাধারণ কোরা কাপড়ের উপর পাউন্ড-প্রতি ৩$\frac{১}{২}$ আনার একটি সর্বনিম্ন বিশেষ শুল্ক। একই সূত্র থেকে থানকাপড়ের সমস্ত আমদানির উপর ৫ শতাংশের একটি অতিরিক্ত মূল্যানুগ শুল্কও ধার্য করা হলো। ব্রিটেন থেকে আমদানির ক্ষেত্রেও আইনসভা পাউন্ড প্রতি ৩$\frac{১}{২}$ আনার বিশেষ শুল্কটির প্রয়োগ ঘটিয়েছিল। সুতরাং, মোট ও মাঝারি মানের সব ধরনের সাধারণ কোরা কাপড়ের ক্ষেত্রে ভারতীয় মিলশিল্প শুল্ক-সংরক্ষণের সুবিধা পেয়েছিল।

১৯৩১-এ সুতিবস্ত্রের উপর শুল্কাদি আরও ৫ শতাংশ বাড়ানো হয়েছিল : সুতরাং, ব্রিটিশ এবং অ-ব্রিটিশ সূত্র থেকে আমদানির উপর কার্যকরী শুল্কের হার বৃদ্ধি করে যথাক্রমে মূল্যানুযায়ী ২০ ও ২৫ শতাংশ পরিণত করা হলো। ১৯৩১-এর সেপ্টেম্বরে সমস্ত আমাদানি-শুল্কের উপর ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত কর আরোপের ফলে ব্রিটিশ ও অ-ব্রিটিশ থানকাপড়ের উপর শুল্ক যথাক্রমে ২৫ শতাংশ ও ৩১.২৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছিল। একই সময়ে তুলোর সুতো আমদানির উপর শুল্ক বেড়েছিল ৫ শতাংশ থেকে ৬$\frac{১}{৪}$ শতাংশ অথবা পাউন্ড-প্রতি ১$\frac{১}{২}$ আনা হতে পাউন্ড প্রতি ১$\frac{৭}{৮}$ আনা। যন্ত্রপাতি ও মিল স্টোরের উপর শুল্কের পুনরানয়ন এবং কাঁচা তুলোর আমদানির উপর পাউন্ড প্রতি আধ আনার একটি শুল্ক আরোপ বস্ত্রশিল্পের সুযোগ সুবিধাকে কিছু পরিমাণ খর্ব করেছিল।

১৯৩২-এ জাপানি ইয়েনের (yen) অবমূল্যায়ন জাপানি থানবস্ত্রের আমদানি বৃদ্ধি আবারও সম্ভবপর করেছিল এবং ভারতীয় শিল্পের একটি বিরাট অংশের অস্তিত্ব এতে বিপন্ন হয়। আই টি বি-র সুপারিশ গৃহীত হয়েছিল একটি বিশেষ তদন্তের পরে। সেই সুপারিশের ফলশ্রুতি হিসাবে ভারত সরকার অ-ব্রিটিশ থানকাপড় আমদানির উপর মূল্যানুগ শুল্ক ৩১$\frac{১}{২}$ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করেছিল। ১৯৩২-এ আই টি বি বস্ত্রশিল্পের উপর একটি ব্যাপক তদন্ত সম্পাদন করে। কিন্তু ট্যারিফ বোর্ডের সুপারিশ সরকারের পক্ষে বিশেষভাবে বিবেচনা করার মতো যথেষ্ট সময় ছিল না, যেহেতু সে সময় দৃশ্যপটের দ্রুত পরিবর্তন ঘটছিল। ১৯৩২-এর অগাস্টে অ-ব্রিটিশ সূত্রের সুতির থানকাপড়ের উপর শুল্ক বৃদ্ধি জাপানের আমদানিকে বাধা দিতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং ভারত সরকার ১৯০৪-এর ইন্দো-জাপানি কন্‌ভেন্‌শন্‌কে নাকচ করার উদ্দেশ্যে ছ' মাসের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল। এই কন্‌ভেন্‌শন্‌ই জাপানকে সবচেয়ে পছন্দসই জাতি হিসাবে আখ্যায়িত করেছিল। ১৯৩৩-এর জুনে সুতি থানকাপড় যা ব্রিটেনে প্রস্তুত নয় তার আমদানির উপর শুল্ক মূল্যানুযায়ী ৭৫ শতাংশ বাড়ানো হয়েছিল। সেই সাথে সাধারণ কোরা কাপড়ে পাউন্ড প্রতি ৬$\frac{৩}{৪}$ আনার একটি সর্বনিম্ন বিশেষ শুল্ক ধার্য করা হয়েছিল। প্রত্যুত্তর হিসাবে জাপান ভারতের কাঁচা তুলো বয়কট করেছিল। জাপান ভারতের এই কাঁচা তুলোর সবচেয়ে বড় বিদেশী ক্রেতা ছিল। কিন্তু জাপানি দ্রব্যের আমদানির উপর বেশি শুল্ক নির্ধারণ জাপানকে আলোচনার টেবিলে আনে এবং ১৯৩৪-এর জুলাইয়ে ভারত ও জাপানের মধ্যে একটি বাণিজ্য সমঝোতা সম্পাদিত হয়। এই সমঝোতা জাপান থেকে আমদানিকৃত থানকাপড়ের উপর একটি পরিমাণগত সীমাবদ্ধকরণ আরোপ করে। জাপানও সর্বনিম্ন পরিমাণ ভারতীয় কাঁচা তুলো কিনতে সম্মত হয়। বিনিময় হিসাবে এটা ঠিক হয় যে, জাপানি থানকাপড়ের উপর ধার্য শুল্ক মূল্যানুযায়ী ৫০ শতাংশ অথবা পাউন্ড প্রতি ৫$\frac{১}{৪}$ আনা—এদের মধ্যে যেটি বেশি তাকে অতিক্রম করবে না যা সাধারণ কোরা কাপড়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্য সব দ্রব্যের ক্ষেত্রে এটি হবে ৫০ শতাংশ।[৫৬]

১৯৩৩-এর শেষে ব্রিটিশ টেক্সটাইল মিশন এবং বোম্বাইয়ের মিল-মালিকদের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি সন্ধি সম্পাদিত হয়েছিল, যেখানে শেষোক্ত ব্যক্তিবর্গ সুতোর উপর আমদানি শুল্কে একটি রিডাক্‌শন্‌ বা ছাড় গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিল। যদি সব আমদানির উপর ২৫ শতাংশের অতিরিক্ত কর তুলে নেওয়া হয়, তবে তারা 'যুক্তরাজ্যের আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শুল্ক সম্পর্কে নতুন প্রস্তাব' দিতে অসম্মত হয়। ভারতীয় প্রতিনিধিরাও কৃত্রিম রেশমে তৈরি থানকাপড়ের আমদানি-শুল্কের ক্ষেত্রে একটি মোটা রকম ছাড়ের (মূল্যানুযায়ী ৫০ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশ অথবা বর্গ গজ প্রতি ৪ আনা হতে বর্গ গজ প্রতি ২$\frac{১}{২}$ আনা) এবং তুলো ও কৃত্রিম রেশমে তৈরি বস্ত্রের ক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণ ছাড়ের (৩৫ শতাংশ অথবা বর্গ গজ প্রতি ২$\frac{১}{৪}$ আনা থেকে ৩০ শতাংশ অথবা বর্গ গজ প্রতি ২ আনা) প্রস্তাব গ্রহণ করেন।[৫৭] ব্যবস্থা হল এইরকম : ভারত অন্যদেশে ব্রিটেনের রপ্তানি কোটা থেকে কিছু ভাগ পাবে, তার নিজস্ব কোনো কোটা ছিল না, ম্যাঞ্চেস্টারের মধ্যস্থতায় ভারতীয় উৎপাদকরা আমদানিকারীদের সংস্পর্শে আসবে সেই বাজারগুলিতে যেখানে ভারতের বিক্রির ভাল ব্যবস্থা নেই এবং ব্রিটিশ ফার্মগুলিতে ভারতীয় তুলোর ব্যবহার জনপ্রিয় করে তোলা হবে।[৫৮]

১৯৩৪-এ তুলোর কাপড় ও রেশম শিল্প সম্পর্কিত ১৯৩২-এর ট্যারিফ বোর্ডের রিপোর্ট, ১৯৩৪-এর ইন্দো-জাপানি বাণিজ্য-সন্ধি এবং ১৯৩৩-এর বোম্বাই ল্যাঙ্কাশায়ার (বা মোদি-লীজ) চুক্তির ভিত্তিতে ভারত সরকার আইন পাশ করেছিল। কাউন্টের থেকে ঊর্ধ্বে সুতো আমদানির উপর শুল্ক তুলে দেওয়া হলো এবং অব্রিটিশ সূত্র থেকে ৫০ কাউন্ট পর্যন্ত সুতোর আমদানি-শুল্কের হারকে পাউন্ড-প্রতি ১$\frac{৭}{৮}$ আনায় রাখা হল। ব্রিটিশ সূত্র থেকে ৫০ কাউন্ট পর্যন্ত সুতো আমদানির উপর শুল্ককে কমিয়ে করা হলো মূল্যানুযায়ী ৫ শতাংশ অথবা পাউন্ড-প্রতি ১$\frac{১}{৪}$ আনা। ইন্দো-জাপান বাণিজ্য চুক্তি অনুযায়ী, ব্রিটিশ সুতির থানকাপড়ের উপর শুল্ক ২৫ শতাংশে (অ-ব্রিটিশ থানকাপড়ের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ) রাখা হয়েছিল।

১৯৩৬-এ ইন্ডিয়ান ট্যারিফ বোর্ড তুলোকল শিল্প সম্বন্ধে আর একটি তদন্ত করে। ১৯৩৬-এর জুনে ট্যারিফ বোর্ডের সুপারিশে ব্রিটেনে তৈরি কোরা কাপড়ের আমদানি-শুল্ক মূল্যানুযায়ী ২৫ শতাংশ (অথবা পাউন্ড-প্রতি ৪$\frac{৩}{৮}$ আনা) থেকে হ্রাস করে মূল্যানুযায়ী ২০শতাংশ (অথবা পাউন্ড-প্রতি ৩$\frac{১}{২}$ আনা) এবং অন্যান্য ধরনের সুতির কাপড়ের ও ব্রিটেনে তৈরি কাপড়ের (সুতির ছাপা থানকাপড় ও ছাপা কাপড় বাদে) উপর শুল্ক মূল্যানুযায়ী ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০ শতাংশ করা হলো। ইন্দো-ব্রিটিশ বাণিজ্য চুক্তির ধারা অনুসারে ১৯৩৯-এ ব্রিটেনে তৈরি সুতির থানকাপড়ের উপর আমদানি-শুল্ক আবার কমানো হয়েছিল। ছাপা তাঁতের কাপড়ের উপর আমদানি-শুল্কের নতুন হার ছিল ১৭$\frac{১}{২}$ শতাংশ, কোরা কাপড়ের উপর মূল্যানুযায়ী ১৫ শতাংশ অথবা পাউন্ড প্রতি ২ আনা ৭$\frac{১}{২}$ পাই। এদের মধ্যে সর্বোচ্চ হারটি গ্রহণযোগ্য। অন্য সব সুতির পণ্যের ক্ষেত্রে মূল্যানুযায়ী ১৫শতাংশ ধার্য করা হয়। কোনো বছর ব্রিটেন থেকে আমদানি ৫০০ মিলিয়ন গজ অতিক্রম করলে আমদানি-শুল্ক বাড়ানো যাবে এবং ৩৫০ মিলিয়ন গজের কম হলে আমদানি-শুল্ক আরও কম হবে, এরকম একটি ব্যবস্থা করা হলো। যুক্তরাজ্যের সর্বনিম্ন পরিমাণ ভারতীয় কাঁচা তুলো আমদানির ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হলো এই বিশেষ সুবিধাগুলি : ব্রিটিশ থানকাপড়ের উপর আমদানি-শুল্ক অবশ্যই বাড়ানো যেত, যদি ১৯৪০-এর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যুক্তরাজ্যে কাঁচা তুলোর বার্ষিক রপ্তানি ৪০০,০০০ বেলের কম হয়, অথবা তার পরবর্তী সময়ে যদি ঐ রপ্তানির পরিমাণ ৪৫০,০০০ বেল হয়।

সংশোধিত ইন্দো-জাপান চুক্তি অনুযায়ী জাপান থেকে থানকাপড় আমদানির উপর পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ ১৯৩৭-এর এপ্রিল থেকে চালু রাখা হলো। উপরন্তু ছাঁট কাপড় আমদানির উপর নতুন বিধিনিষেধ আরোপ করে শুল্ক ফাঁকির কিছু উপায় বন্ধ করা হলো। কৃত্রিম রেশম ও কৃত্রিম রেশম-মিশ্রিত কাপড়ের বর্গ গজ প্রতি এক আনা শুল্ক বৃদ্ধি এবং কৃত্রিম রেশমের ছাঁটকাপড়ের আমদানি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে আরও কঠোর করা হলো। শুল্ক পরিবর্তন এবং বাণিজ্য চুক্তি ছাড়া দুটি অন্য রাজনৈতিক ঘটনা ভারতে তুলোর থানকাপড়ের আমদানির বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করেছিল, যদিও উভয় ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ছিল সাময়িক। ভারতে আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে এদেশে (ভারতে) বিদেশী দ্রব্যের আমদানি কমে যায়। ১৯২৯-৩০ এবং ১৯৩০-৩১-এর মধ্যে তুলোর থানকাপড় আমদানির মূল্য চিনি, ধাতু এবং যন্ত্রপাতির মূল্যের তুলনায় অনেক বেশি মাত্রায় কমেছিল। থানকাপড়, চিনি, ধাতু ও যন্ত্রপাতির আমদানি মূল্যের হ্রাসের পরিমাণ যথাক্রমে ৫৭, ৩০, ৩৩ এবং ২২ শতাংশ।[৫৯] সেই বছরে মোট দেশীয় ভোগব্যয় কমে গিয়েছিল,

কিন্তু ভারতীয় মিলের উৎপাদন বেড়েছিল। ১৯৩০-৩১-এর বিদেশী পণ্য বর্জনের আন্দোলন এক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল।

১৯৩৭-এর চীন ও জাপানের মধ্যে বড় মাপের লড়াই ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা। জাপান এক সময় যুদ্ধের রসদ সন্ধানে সম্পূর্ণ নিয়োজিত ছিল যার ফলে জাহাজের অভাব ঘটে এবং সুতিবস্ত্রের রপ্তানি ব্যাহত হয়। জাপানি মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রেও কিছু সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু ১৯৩৬-৩৭ ও ১৯৩৭-৩৮, এই দু'বছরের তুলনায় ১৯৩৮-৩৯-এ জাপান আবারও বেশি পরিমাণে থানকাপড় রপ্তানি করতে সমর্থ হয়।[৬০]

সারণি ৭.৬ ১৯৩১-৩ থেকে ১৯৩৯-৪০ পর্যন্ত যুক্তরাজ্য ও জাপান থেকে আমদানিকৃত থানবস্ত্রের গড় ঘোষিত মূল্য

সময়	কোরা		সাদা		রঙিন	
	যুক্তরাজ্য	জাপান	যুক্তরাজ্য	জাপান	যুক্তরাজ্য	জাপান
	টা. আ. প.	টা. আ. প.	টা. আ. প.	টা. আ. প.	টা. আ. প.	টা. আ. প.
১৯৩১-২	০ ২ ৭	০ ২ ৬ .	০ ৩ ১	০ ২ ৬	০ ৫ ২	০ ২ ৯
১৯৩২-৩	০ ২ ৬	০ ২ ২	০ ৩ ০	০ ২ ২	০ ৪ ০	০ ২ ২
১৯৩৩-৪	০ ২ ৫	০ ১ ১১	০ ৬ ২	০ ২ ০	০ ৪ ০	০ ২ ২
১৯৩৪-৫	০ ২ ৬	০ ২ ০	০ ৩ ১	০ ২ ৭	০ ৩ ৯	০ ২ ৫
১৯৩৫-৬	০ ২ ৬	০ ১ ১১	০ ৩ ২	০ ২ ৪	০ ৩ ১১	০ ২ ১
১৯৩৬-৭	০ ২ ৯	০ ১ ১১	০ ৩ ৪	০ ২ ৬	০ ৪ ০	০ ২ ৪
১৯৩৭-৮	০ ২ ১১	০ ২ ২	০ ৩ ৬	০ ২ ৫	০ ৪ ৫	০ ২ ৭
১৯৩৮-৯	০ ২ ১১	০ ১ ৯	০ ৩ ৪	০ ২ ১	০ ৪ ৪	০ ২ ২
১৯৩৯-৪০	০ ৩ ৬	০ ১ ১০	০ ৩ ৮	০ ২ ৫	০ ৪ ৭	০ ২ ৫

উৎস: Gov. India, CISD: *Review of the trade of India* (কলকাতা, বার্ষিক): 1936-37, পৃ. ৩৮; 1937-38, পৃ. ৮৩; 1938-39, পৃ. ৮৮; 1939-40, পৃ. ১১০।

সারণি. ৭.৭ ১৯২৯-৩০ থেকে ১৯৩৯-৪০ পর্যন্ত ভারত থেকে কাঁচা তুলোর রপ্তানি (সংখ্যাগুলি ৪০০ পাউন্ডের '০০০ বেল)

সময়	যুক্তরাজ্য	জাপান	মোট
১৯২৯-৩০	২৭০	১,৬৪০	৪,০৭০
১৯৩০-১	২৮১	১,৬৮৬	৩,৯২৬
১৯৩১-২	১৬৬	১,০৮০	২,৩৬৯
১৯৩২-৩	১৬৭	১,০৮৫	২,০৬৩
১৯৩৩-৪	৩৪২	১,০২২	২,৭৪০
১৯৩৪-৫	৩৪৭	২,০১১	৩,৪৪৬
১৯৩৫-৬	৪৫৬	১,৭৫৯	৩,৩৯৭
১৯৩৬-৭	৬১০	২,৩৩৪	৪,১৪০
১৯৩৭-৮	৩৯৫	১,৩৫৯	২,৭৩১
১৯৩৮-৯	৪১১	১,২১১	২,৭০৩
১৯৩৯-৪০	৪৭৩	১,০৫৬	২,৯৪৮

উৎস : Govt. India,CISD : *Review of the trade of India* (কলকাতা,বার্ষিক)

সারণি ৭.৫ যেভাবে দেখায় সেই অনুযায়ী ব্রিটেনের থানকাপড়ের প্রতি পক্ষপাত ১৯৩৪-৩৫-এর পরে যুক্তরাজ্য থেকে আমদানির বড় মাপের হ্রাসকে রোধ করতে পারেনি। সমমানের পণ্যের ক্ষেত্রেও জাপানের তুলনায় যুক্তরাজ্যের রপ্তানি পণ্যের দাম অনেক বেশি ছিল। ১৯৩৫-৩৬ থেকে ব্রিটিশ পণ্যের দাম ক্রমাগত বাড়ছিল, কিন্তু জাপানি পণ্যের দাম পরিবর্তনের ধরন প্রায়শই অন্যরকম হতো (সারণি ৭.৬ দ্রষ্টব্য)। পরের বছরগুলিতে বিদেশী পণ্যের ঊর্ধ্বমুখী দাম ভারতীয় শিল্পের পক্ষে দেশীয় বাজার লাভ করা আরও সহজ করেছিল। সারণি ৭.৭ ইঙ্গিত দেয় যে, বোম্বাই-ল্যাঙ্কাশায়ার চুক্তির ফলে ব্রিটেনে ভারতীয় তুলোর ব্যবহার বেড়ে যায়, ভারতে লম্বা আঁশযুক্ত তুলোর উৎপাদন বৃদ্ধিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য জাপান ভারতীয় তুলোর সবচেয়ে বড় বিদেশী ভোগকারী রয়ে গেল, কিন্তু ১৯৩৬-৩৭-এর পরে তার আমদানির দ্রুত পতন ঘটে।

উপরের বর্ণনায় আমরা ভারতের যন্ত্র-নির্ভর বস্ত্রশিল্পের প্রসঙ্গে সরকারের শুল্ক নীতির ধারা বিশ্লেষণ করেছি। যুদ্ধ মধ্যবর্তী বছরগুলিতে হাতে বোনা তাঁত শিল্প সম্পর্কিত সরকারি নীতির একটি নির্দিষ্ট পরিবর্তনও ঘটেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে, শিল্পের আঞ্চলিক দপ্তর এ ধরনের তাঁত শিল্পের বিষয়ে নিজেদের বেশি করে সংশ্লিষ্ট রেখেছিল। তুলোর থানকাপড় আমদানির উপর যখন শুল্কাদি আরোপ করা হলো, সুতো আমদানি তখনও শুল্কমুক্ত ছিল। কিন্তু, ভারতের মিলে উৎপাদিত তুলোর থানকাপড় মূল্যানুযায়ী ৩$^1/_2$ শতাংশ অন্তঃশুল্কের অধীনে আনা হয়েছিল। সুতরাং তাঁত-বয়ন বিদেশী বস্ত্র ও ভারতীয় মিলে তৈরি বস্ত্র, উভয়ের বিপক্ষে কিছু সংরক্ষণের সুবিধা ভোগ করত। ১৯২৫ থেকে কার্যকরীভাবে মিলে তৈরি থানকাপড়ের উপর ভারসাম্য রক্ষাকারী অন্তঃশুল্কের অবসান এবং তুলোর সুতো আমদানির উপর ৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ হাতে বোনা তাঁত শিল্পের সংরক্ষণের ব্যবস্থাকে বানচাল করে দেয়। পরবর্তীকালে কৃত্রিম রেশমের সুতো এবং কৃত্রিম রেশম ও তুলোর মিশ্রণজাত সুতোর আমদানির উপর শুল্ক আরোপকারী আইন প্রণয়ন তাঁত বয়নকারীদের অসুবিধাকে আরও বাড়িয়েছিল।

অনুচ্ছেদ ৭.১-এ আমরা দেখেছি, এমন-কি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেও তাঁতের উৎপাদন ও মিলের উৎপাদনের অনুপাত কমে যাচ্ছিল। উপরন্তু, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেও ভারতীয় মিলগুলি বিদেশী উৎপাদকদের তুলনায় তাঁত শিল্পে সুতোর যোগানদার হিসাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল।[৬১] কিছু তাঁতের উৎপাদনে আমদানিজাত বেশি পাকের সুতো ব্যবহৃত হতো। সে কারণে আমদানি-করা সুতো ও তাঁতের ব্যবহার করা মোট সুতোর পরিমাণের অনুপাত তাঁত শিল্পে সুতো আমদানির গুরুত্ব সঠিকভাবে নির্দেশ করে না। কিন্তু শুল্ক সংরক্ষণ মিলগুলির পক্ষে সূক্ষ্ম কাউন্টের সুতো উৎপাদন সম্ভবপর করে তোলে এবং তার ফলে তাঁত শিল্প গোড়ার দিকে যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল দীর্ঘকালে তা হয়নি। তিরিশের দশকে তাঁত শিল্পের উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য অনাপেক্ষিক বৃদ্ধি এই বক্তব্যকে সমর্থন করে। উৎপাদন ও বিশেষত, বিপণন প্রক্রিয়ায় উন্নতিসাধনের সরকারি (প্রাদেশিক) প্রয়াস তাঁতের উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করেছিল।

যদি আমরা তুলোর থান কাপড়ের মোট আভ্যন্তরীণ ভোগের সংখ্যার দিকে তাকাই, আমরা দেখব যে, ১৯০০-১ থেকে ১৯০২-৩-এই তিন বছরে সময়ে ৯,৩৮৯.৭ মিলিয়ন গজ, এবং ১৯৩৬-৭ থেকে ১৯৩৮-৯—এই তিন বছরে ১৬,৫৯৪.৬ মিলিয়ন গজ ছিল, যা নির্দেশ

করে প্রায় ৭৭ শতাংশ বৃদ্ধি। ১৯০১-৪১—এই সময়কালে ভারতের জনসংখ্যা প্রায় ৩৬ শতাং শ বেড়েছিল।[৬২] সুতরাং এই সময়ে মাথাপিছু বস্ত্রের ভোগে মোটা রকমের বৃদ্ধি ঘটেছিল। যদি আমরা প্রচলিত পদ্ধতিতে সেন্‌সাস্ মধ্যবর্তী সময়ের জনসংখ্যা গণনা করি, আমরা দেখব যে ১৯১৩-১৪ পর্যন্ত স্থায়ীভাবে মাথা পিছু বস্ত্রের ভোগ কম-বেশি বেড়েছিল, কমে যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, এবং তিরিশের দশকের শেষ পাঁচ বছরে প্রায় প্রাক্-যুদ্ধের স্তরে ফিরে আসে।[৬৩] আয় ও মূল্য উভয় উপাদানই মনে হয় এই অগ্রগতির জন্যে দায়ী। ১৯০১-১৪-তে যে মাথা পিছু আয় বাড়ছিল তা বিশ্বাস করার মতো ভিত্তি রয়েছে (দ্রষ্টব্য অধ্যায়-৩)। বিশের দশকে আপেক্ষিকভাবে মন্দা ছিল, বিশেষ করে ১৯২৬-এর পরে, যখন প্রাথমিক দ্রব্যের দাম চরমভাবে এবং আপেক্ষিক ভাবে শিল্পদ্রব্যের দামের তুলনায় পড়ে গিয়েছিল। তিরিশের দশকের মন্দা যে সমস্ত জনগণ কৃষির উপর সরাসরি নির্ভরশীল তাদের আয় আরও কমার দিকে চালিত করেছিল। সারণি ৭.৮ এবং ৭.৯ থেকে বোঝা যায় যে, ভারতে থান কাপড়ের দামের বিচলন আয়ের পরিবর্তনকে প্রভাবিত করেছিল।

সারণি ৭.৮ জামা তৈরির কোরা কাপড় এবং পণ্যদ্রব্যের আপেক্ষিক মূল্যের বিচলন, ১৯০১-৫ থেকে ১৯১১-১৫.

সময় কাল	জামা তৈরির কোরা কাপড়ের মূল্যের সূচক সংখ্যার গড় (কলকাতা) (১)	সমস্ত পণ্য দ্রব্যের মূল্যের সূচক সংখ্যার গড় (কলকাতা) (২)	(২) এবং (১) এর অনুপাত (৩)
১৯০১-৫	৮৩.৬	১০৫.২	১.১৩
১৯০৬-১০	৯১.৬	১৩০.০	১.৪২
১৯১১-১৫	১০৩.৬	১৪১.৬	১.৩৭

উৎস : Gov. India, CISD : *Index numbers of Indian Prices, 1861-1931* (দিল্লী, ১৯৩৩), সারণি-v. ভিত্তি : ১৮৭৩=১০০

সারণি ৭.৯ সুতো তৈরির এবং সমস্ত পণ্যদ্রব্যের আপেক্ষিক মূল্যের বিচলন, ১৯১৪ থেকে ১৯৩৯-৪০

সময় কাল	সুতো তৈরির মূল্যের সূচকের গড়মান (কলকাতা) (১)	সমস্ত পণ্যদ্রব্যের মূল্য সূচকের গড়মান (কলকাতা) (২)	(২) এবং (১) এর অনুপাত (৩)
১৯১৪	১০০	১০০	১.০০
১৯১৯-২৩	২৫৯.০	১৮৫.০	.৭১
১৯২৪-২৮	১৮৫.৮	১৫৪.৬	.৮৩
১৯২৯-৩৩	১৩০.৮	১০৬.২	.৮১
১৯৩৪-৩৮	১১৩.২	৯৩.৩	.৮২
১৯৩৯-৪০	১১৪.০	১১৪.০	১.০০

উৎস : *Statistical abstract for British India* (লন্ডন, ১৯৩৯ এবং ১৯৪৩) ভিত্তি : জুলাই ১৯১৪=১০০.

সারণি ৭.৮ ও ৭.৯-এ উদ্‌ধৃত সংখ্যাতথ্য অপরিহার্যভাবে স্থূল এবং তার পরিবেশনে বিভিন্ন ধরনের সুতির কাপড়ের এবং কৃষি ও শিল্প পণ্যের আপেক্ষিক দামের পরিবর্তন অগ্রাহ্য করা হয়েছে অথবা গোপন থেকেছে। গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রীর তুলনায় ভারতের মিলে তৈরি সুতি-কাপড়ের দাম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে কমেছিল, কিন্তু যুদ্ধের পরে বেড়েছিল— বিভিন্ন ধরনের থানকাপড়ের এবং চাল, তুলো ও পাটের মতো গুরুত্বপূর্ণ কৃষি পণ্যের আপেক্ষিক দামের সংগৃহীত তথ্যসমূহ এই ধারণাকে সমর্থন করে। তিরিশের মন্দার সময়ে তুলোজাত পণ্যের দাম কমলেও তার হার কৃষিপণ্যের দামের পতনের তুলনায় কম ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যখন কৃষিপণ্যের চাহিদা বাড়ল শুধুমাত্র তখন থেকে দামের সমতা ফিরে এল।

৭.৪ বস্ত্রশিল্পে গঠনগত পরিবর্তন, ১৯১৯-৩৯

প্রথম বিশ্বযুদ্ধেব আগে থেকে এই শিল্পের ক্ষেত্রে গঠনগত পরিবর্তন সাধনের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তা দুই যুদ্ধের মধ্যকালীন সময়ে অব্যাহত ছিল। মিলগুলি তখন দেশীয় বাজারে থান কাপড়ের বর্দ্ধিষ্ণু চাহিদার দিকে নজর রেখে উৎপাদন করছিল এবং বোম্বাই থেকে সুতো রপ্তানির হ্রাস (১৯০৬-৭ থেকে ১৯০৮-৯ পর্যন্ত গড় বার্ষিক রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২৪৫ মিলিয়ন গজ, ১৯২৬-৭—১৯২৮-৯-এর মধ্যে মাত্র ৪২ মিলিয়ন গজ) তাঁত ও সুতো কাটার টাকুর অনুপাত বৃদ্ধির কারণ হিসাবে উল্লেখ্য।[৬৪] ভারতের মিলে মোট সুতো উৎপাদনে বিশ পাক পর্যন্ত সুতোর উৎপাদনের (ওজনে) হার বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাঁচ পছরে ৮০ শতাংশের ওপর থেকে কমে দাঁড়ায় ৭২.৭ শতাংশ ১৯১৪-এ, ৬৭.৮ শতাংশ ১৯১৯-এ, ৬৫.৩ শতাংশ ১৯২৪-এ, ৫৯.২ শতাংশ ১৯২৯-এ, ৫৭.৩ শতাংশ ১৯৩৪-এ এবং ৫২.৪ শতাংশ ১৯৩৭-এ। চল্লিশ উর্ধ্ব পাকের সুতো উৎপাদনের (ওজনে) হার ১৯০১-এর ০.২ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯১৪-এ হয় ০.৩ শতাংশ, ১৯১৯-এ ০.৫ শতাংশ, ১৯২৪-এ ০.৮ শতাংশ, ১৯২৭-এ ১.৯ শতাংশ, ১৯৪৩-এ ৪.৪ শতাংশ এবং ১৯৩৭-এ ৭.৩ শতাংশ।[৬৫] থানকাপড়ের মোট উৎপাদনে (ওজনে) রঙিন থান কাপড়ের অনুপাত ১৯০১, ১৯১৪, ১৯১৯ এবং ১৯২৪ এ যথাক্রমে ১৬.৪, ২২.০, ২৬.৬ এবং ২৭.৪ শতাংশ। তবে রঙিন কাপড়ের অনুপাত পরে নেমে আসে উৎকৃষ্ট মানের ধুতি ও সার্টের কাপড় উৎপাদনের বড় রকম বৃদ্ধির ফলে: ১৯২৯-এ ২২.৪ শতাংশ, ১৯৩৪-এ ২১.০ শতাংশ এবং ১৯৩৭-এ ১৯.৬ শতাংশ মাত্র।[৬৬]

এই সব গঠনগত পরিবর্তন ইঙ্গিত দেয় যে, দেশীয় বাজারের প্রয়োজনের সঙ্গে বোম্বাইয়ের মিলগুলি ভালোভাবে মানিয়ে নিতে পেরেছিল এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ, শিল্পটির উন্নততর কেন্দ্র হিসাবে আমেদাবাদ, কানপুর ও মাদ্রাজের পক্ষে উঁচু মানের কাপড় উৎপাদনের মাধ্যমে যুক্তরাজ্য থেকে আমদানির বহুলাংশ অপসারণ সম্ভবপর করা। বোম্বাইয়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার প্রক্রিয়াটি চূড়ান্তভাবে অনমনীয় ছিল। যুদ্ধ ও যুদ্ধপরবর্তী বছরগুলিতে কেনা-বেচার আকস্মিক তেজীভাবের কারণে মিলসমূহের মূলধনের মূল্যমান অসঙ্গতভাবে স্ফীত হয়। ১৯১৭ থেকে ১৯২২ পর্যন্ত ৮০টির মধ্যে ৩০টি মিলের হাত বদল হয় ম্যানেজিং এজেন্ট ও মালিকদের মধ্যে।[৬৭] প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্যান্য কেন্দ্রে

ও ভারতের বাকি অংশের তুলনায় বোম্বাইয়ের মজুরি বেশি ছিল। ১৯২০-র পরে বস্ত্রশিল্পের সমস্ত প্রধান কেন্দ্রগুলি মজুরি বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু অন্যান্য কেন্দ্রে ১৯২০ নাগাদ মজুরি কমে যায়। বোম্বাইয়ে গোটা বিশের দশকে মজুরির হার বেশি ছিল। মজুরি ও শ্রমিক নিয়োগ কমানোর চেষ্টা চললে বেশ ঝুঁকি নিয়ে শ্রমিকরা ধর্মঘট করে ১৯২৮ ও ১৯২৯-এ। যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শ্রমের উন্নততর ব্যবহার, এবং মোট উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের অবনতির পরিপ্রেক্ষিতে দেশীয় প্রয়োজনের স্বার্থে আরও ভালোভাবে মানিযে চলা—এই সব চেষ্টার ফলে বোম্বাইয়ের মিলের কর্মভার আমেদাবাদ অথবা কানপুরের তুলনায় অনেক বেশি কঠিন ছিল। আমেদাবাদ অথবা কানপুরে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান ব্যাপকভাবে বেড়েছিল।

অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার দ্রুত পরিবর্তনের প্রয়োজন উপলব্ধি করতে বোম্বাইয়ের মিল ব্যবস্থাপনার মূল গলদের বিষয়টি উল্লেখ না করলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। আর্নো পিয়ার্স দেখেছিলেন, যেখানে আমেদাবাদের ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসের প্রতিনিধিরা মিল পবিদর্শন করতে এসে সারাটা দিন ব্যয় করতেন মিল অফিসে বা মিলে সেখানে বোম্বাইয়ে ম্যানেজিং এজেন্টদের প্রতিনিধিরা মিল পরিদর্শন করতে আসতেন নিতান্তই অল্প সময়ের জন্যে এবং তাও প্রতিদিন নয়।[৬৮] একই ম্যানেজিং এজেন্টের হাতে বহু সংখ্যক মিল এবং অন্যান্য ব্যবসা থাকায় বিশেষ কোনো মিলের প্রতি নজর দেওয়ার অবকাশ ঘটত না। পিয়ার্সের চোখে এমন আরও গলদ ধরা পড়ে যার জন্যে বোম্বাইয়ের মিল পরিচালন ব্যবস্থাকে দায়ী করা যায়। বোম্বাইয়ের মিলগুলির যন্ত্রপাতির বিরাট অংশ ছিল ক্ষয়প্রাপ্ত বা সেকেলে এবং আমেদাবাদের মিলের তুলনায় তাদের কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ কম ছিল। সাম্প্রতিককালে আমেদাবাদের শিল্পের দ্রুততর প্রসারের ফলে যে নতুন মূলধন-কাঠামো সৃষ্টি হয়েছিল তাতে অদূর অতীতে তৈরি মূলধন-দ্রব্যের প্রাধান্য থাকাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু এই নতুন মূলধন-কাঠামোর অর্থনৈতিক তাৎপর্যের সমর্থনে স্বীকার করতে হয় যে, বোম্বাইয়ের মিলগুলির প্রাচীনতর মূলধনের মজুত কোনো প্রায়-খাজনা (quasi-rent) সৃষ্টিতে সক্ষম ছিল না। যদি এই মূলধন-কাঠামোর উপর নির্ভর করে চলতি মোট মুনাফার সৃজন সম্ভবপর না হতো তাহলে সাবেকী মূলধন-ভাণ্ডারের প্রতিস্থাপন ঘটানোই ছিল যুক্তিসঙ্গত। যেহেতু বোম্বাইয়ের মিলগুলি সমৃদ্ধির বছরগুলিতে প্রভূত মুনাফা অর্জন করে সাবেকী মূলধনের প্রতিস্থাপন তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। মুনাফা পুনর্বিনিয়োগের উচ্চতর হার অর্জনের মাধ্যমে কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজনও মেটানো যেত।[৬৯] কিন্তু সে রকম কিছু ঘটেনি। ম্যানেজিং এজেন্সি ব্যবস্থার প্রবণতাই ছিল কারখানা-স্তরের উৎপাদনের সমস্যাগুলির চাইতে আর্থিক সমস্যার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া। এর ফলে বিভিন্ন রকমের দুর্নীতির সৃষ্টি হয়—যেমন যন্ত্রপাতি বা তুলো বিক্রেতাদের কাছ থেকে ম্যানেজিং এজেন্টদের কমিশন নেওয়া। আরও কিছু অপকর্মের উদাহরণ আছে যা ছিল সম্পূর্ণ বেআইনী, কিন্তু তা রোধ করা যেত না যতক্ষণ-না-পর্যন্ত মিলটির পরিস্থিতি সংকটজনক হয়ে উঠত। কিছু মিল যন্ত্রপাতির সংগ্রহশালায় পরিণত হয়েছিল। যে সমস্ত ফার্মের কাছ থেকে এই যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হতো ভারতে তাদের বিক্রয়ের মাধ্যম ছিল কিছু ম্যানেজিং এজেন্ট। ফার্মগুলি ম্যানেজিং এজেন্টদের কমিশন প্রদানেও উদগ্রীব ছিল।[৭০] বোম্বাইয়ের মিলগুলি বিশের দশকের শেষ বছরগুলিতে এবং তিরিশের দশকের প্রথমার্ধে

মূলধনের লিখিত মূল্যের হ্রাস ঘটিয়ে তীব্র প্রতিযোগিতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা সম্ভবপর করেছিল।[৭১] শ্রমের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও উন্নতি ঘটেছিল। শ্রমিক পিছু টাকু ও তাঁতের সংখ্যা অধিকাংশ মিলে বেড়েছিল যদিও শ্রমিক সংগঠনের বিরোধিতার ফলে মালিকরা সব মিলে শ্রম-নৈপুণ্য বাড়ানোর একটি বিশেষ প্রকল্প চালু করতে পারেনি যা বুননের ক্ষেত্রে ১৭ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত শ্রম-ব্যয় (১৯৩২-এ) কমাতে পারত। ১৯৩০ তেকে ১৯৩৩-এর মধ্যে বোম্বাইয়ের মিলগুলি প্রতি ১০০ তাঁতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ৯৪ থেকে ৬১-তে হ্রাস করতে সমর্থ হয়েছিল।[৭২]

শিল্পটির অন্যান্য কেন্দ্রগুলিও প্রতি একক শ্রম ও কাঁচামাল পিছু উচ্চতর উৎপাদনশীলতা অর্জন করেছিল। হ্যারল্ড বাটলারের বিবরণ থেকে জানা যায়, ১৯৩৭-এ বোম্বাই ও আমেদাবাদে এমনও মিল ছিল যেখানে একজন তাঁতীর দায়িত্বে ছিল ২, ৪ এমন কি ৬ টি বয়নযন্ত্র।[৭৩] ১৯৩৬-এর স্পেশাল ট্যারিফ বোর্ড ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের মিলগুলিতে বোনা কাপড়ের ওজন-সাপেক্ষ দৈর্ঘ সাধারণভাবে বেড়েছিল।[৭৪] প্রধানত যুক্তরাজ্য থেকে বিভিন্ন ধরনের মিহি কাপড়ের আমদানি অপসারণের চেষ্টার ফলে শিল্পটির আরও কিছু উন্নতি ঘটে, যেমন বিরঞ্জন ও ছাপার কাজের প্রসার। এই উন্নতির একটি সূচক বোম্বাইয়ের মিলগুলির জলের ব্যবহার যা ১৯২৯-৩০-এ ছিল ৮০.৬৫ মিলিয়ন গ্যালন, ১৯৩৮-৩৯-এ ২২৭.৯০ মিলিয়ন গ্যালন। ১৯৩০-এ ভারতীয় মিলগুলির মার্সিরাইজিং রেঞ্জের সংখ্যা ছিল প্রায় ছ'টি, ১৯৪০নাগাদ আরও কুড়িটি যুক্ত হয়।[৭৫] রং করার ও বিরঞ্জনের যন্ত্রপাতি আমদানিকে এই ধরনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির যথোপযুক্ত সূচক হিসাবে গণ্য করা সম্ভব নয় যেহেতু কুটির শিল্পে এই কাজ অনেকটাই চলত যন্ত্রের সামান্য ব্যবহারের মাধ্যমে।

শিল্পটিকে দাঁড়াতে হলো জাপানের প্রতিযোগিতার সামনে। অপর দিকে ব্রিটিশ শিল্প প্রতিযোগিতার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল এবং ভারতীয় মিলগুলি আরও বড় আভ্যন্তরীণ বাজার পেতে থাকল। এই পরিস্থিতিতে দেশীয় শিল্পটির উন্নয়ন ঘটতে থাকল দুটি দিকে। প্রথমত, বোম্বাই ও আমেদাবাদের মতো প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রে দক্ষতা বেড়েছিল। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৯-এর মধ্যে প্রধান শিল্পকেন্দ্রগুলিতে বহু শিফ্‌টে কাজের প্রথা চালু ছিল। কিন্তু এই সময়ে মিলগুলি মজুত বৃদ্ধি ও বিক্রয় হ্রাসের সমস্যার চাপে পড়ে রাতের শিফ্‌ট বন্ধও রাখছিল। শেষে যুদ্ধ এসে তাদের রেহাই দিল।[৭৬]

দ্বিতীয়ত, শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল নতুন অঞ্চলে, স্থানীয় বাজারের সন্নিকটে, যেখানে মজুরি-ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম ছিল। যেহেতু শ্রম-ব্যয় যে কোনো জায়গায় মোট ব্যয়ের ১৫ ও ২৫ শতাংশের মধ্যে ছিল এবং কাঁচামালের ব্যয় সর্বত্রই এক, অল্পশ্রম ব্যয়ের কেন্দ্রে অবস্থিত মিলগুলি (যেমন, কানপুর, কলকাতা ও কোয়েম্বাটুর) বোম্বাইয়ের মিলগুলির তুলনায় অনেক বেশি লাভজনক ছিল।[৭৭] বোম্বাইয়ের শিল্পটির একটি বড় অংশ চীনের বাজারে কম গুণমানের সুতো যোগান দিত। স্বভাবতই তাদের যন্ত্রপাতি মিহি সুতো বোনার কাজে কম উপযোগী ছিল যদিও মজুরি-ব্যয়ের দিক থেকে দেখলে মনে হবে মিলগুলির নজর দেওয়া উচিত ছিল উন্নতমানের পণ্যের উপর। বোম্বাইয়ের শ্রমিকদের অধিকতর নৈপুণ্যও ঐ ধরনের পণ্য উৎপাদনের সপক্ষে যায়। কিন্তু উপযুক্ত সরঞ্জামের অভাবে উন্নত মানের পণ্য উৎপাদনের কেন্দ্র হিসাবে বোম্বাই গুরুত্ব পেল না, বরং আমেদাবাদে বিনী অ্যান্ড কোম্পানির পরিচালনাধীন মিলগুলিতে মিহি সুতো ও নানা রকমের কাপড় উৎপাদন

চলতে থাকল। আমেদাবাদেরও বিরঞ্জন ও রং করার কাজ হতো কুটির শিল্পে, দামী যন্ত্রের ব্যবহার ছাড়া।[৭৮]

সুতি বস্ত্র শিল্পের অবস্থানগত পরিবর্তনের কিছু উল্লেখযোগ্য দিক আছে। বিশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন-কেন্দ্রে সাধারণ প্রবণতা ছিল সুতো কাটা ও তাঁতের কাজ একই প্রতিষ্ঠানের অধীনে রাখার এবং মিলের আয়তন বেড়ে যাওয়ার (আমেদাবাদের মিলগুলি বৈশিষ্ট্যগত ভাবেই বোম্বাইয়ের মিলগুলির তুলনায় আয়তনে ছোট ছিল)। তিরিশের দশকে কিছু সংখ্যক শুধু সুতো কাটার মিল স্থাপিত হয়েছিল মাদ্রাজের কোয়েম্বাটুরের সন্নিহিত অঞ্চলে। নিকটবর্তী বাজার (মাদ্রাজের তাঁতিরা ছিলেন এর প্রধান ক্রেতা), কাঁচামালের যোগান এবং সুলভ বৈদ্যুতিক শক্তি ছিল ঐ অঞ্চলের আকর্ষণ।[৭৯] নতুন কেন্দ্রে স্থাপিত বহু ইউনিটের আয়তন পুরনো কেন্দ্রের মিলগুলির তুলনায় ছোট ছিল। কত রকমের পণ্য উৎপন্ন হবে, তার উপর অনেকটাই নির্ভর করত কোনো ইউনিটের চরম (Optimum) আয়তন।[৮০] ১৯৩২-এ আই টি বি লক্ষ্য করে, সুতো কাটা ও বয়নের ক্ষেত্রে ব্যয়-সংকোচের কোনো উল্লেখযোগ্য সুবিধা ছিল না। তাছাড়া পরিচালনা ও কর বাবদ স্থির ব্যয় এবং শক্তি ব্যবহারের (Cost of power) ব্যয়, এই দুই ক্ষেত্রে একটি বড় আয়তনের মিল ছোটটির তুলনায় কিছু সুবিধা লাভ করত। আই টি বি এর সিদ্ধান্ত ছিল এই রকম :

'অতএব এ কথা বলা যেতে পারে যে, ভারতের কোনো মিলের আয়তন স্থির করার মূল উপাদানটি ছিল ব্যয়সংকোচের মাত্রা যা একটি বড় আয়তনের কারখানার ক্ষেত্রে শক্তি বাবদ ব্যয়ের সঙ্গে যুক্ত। বোম্বাইয়ের মতো যেখানে শক্তির যোগান আসত বাইরের কোনো কেন্দ্রীয় উৎস থেকে সেখানে শক্তির বৃহত্তর ভারের অর্থই হবে স্বল্পতার একক প্রতি ব্যয়। অপর দিকে যেখানে মিলগুলি নিজেরাই শক্তি উৎপাদন করে, যেমন আমেদাবাদে, সেখানে অভিজ্ঞতার থেকে দেখা গেছে তাঁতের সংখ্যা ৬০০ থেকে ৭০০ হলে সর্বোচ্চ ব্যয়-সংকোচের সুবিধা লাভ করা যায়।[৮১]

কোনো সুতি বস্ত্র মিলের উৎপাদিত পণ্যের বিভিন্নতার কথা মনে রাখলেই বোঝা যায় কেন উন্নতমানের পরিচালনা শিল্পটির সাফল্যের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ। এ দিক থেকে আমেদাবাদের অবস্থা বোম্বাইয়ের তুলনায় অনেক বেশি ভালো ছিল যেহেতু সেখানে যে কোনো একটি কোম্পানি একটি বা দুটির বেশি মিল পরিচালনার দায়িত্ব নিত না।[৮২]

আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি, আমেদাবাদ প্রথম থেকেই দেশীয় থান কাপড়ের বাজারের সাথে মানিয়ে নিয়েছিল এবং আমদানি-পরিবর্ত উৎপাদনের সুযোগকে বেশ কাজে লাগানোর উপযুক্ত অবস্থা তার ছিল। সম্ভবত তিরিশের দশকের গোড়ার দিকে আমেদাবাদের সুযোগ সুবিধা আরও বেড়েছিল। সে সময়ে ভারতের কিছু শিল্পের দ্রুত বৃদ্ধি, শিল্পের অনুকূল বাণিজ্য শর্ত, আয় বণ্টনে অসমতা বৃদ্ধি (চাষীদের ঋণ-বৃদ্ধি তার একটি সাক্ষ্য) এবং উন্নতমানের থানকাপড় দ্রুততর উৎপাদন প্রসারের উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। বিভিন্ন ধরনের উন্নতমানের পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি কী ভাবে সম্ভব হয়েছিল তার বিবরণ পাওয়া যায় না, কিন্তু তা আন্দাজ করার মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে। ১৯৩০-৩১ ও ১৯৩৪-৩৫-এর মধ্যে মোট সুতো উৎপাদনে ৩০ ঊর্ধ্ব কাউন্টের সুতোর অনুপাত সমগ্র ভারতে ১০ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৪ শতাংশ হয়, আমেদাবাদে ২০ থেকে ২৬ শতাংশ ও বোম্বাইতে ১২ থেকে ১৭ শতাংশ হয়। ৫০ ঊর্ধ্ব কাউন্টের সুতো উৎপাদন আমেদাবাদে কেন্দ্রীভূত

হয়েছিল এবং অন্য কেন্দ্রের তুলনায় বেশি হারে তা বৃদ্ধি হতে থাকে উপরোক্ত সময়কালে।[৮৩]

নতুন উৎপাদন-কেন্দ্রগুলিতে কারখানা স্থাপনের প্রবণতার অর্থই ছিল শিল্পটির দক্ষতা বৃদ্ধি, এই অনুমান সব ক্ষেত্রে যথার্থ নয়—বিশেষ করে দীর্ঘকালের পরিপ্রেক্ষিতে। পুরনো যন্ত্রপাতির কারিগরি নৈপুণ্য নতুন উৎপাদন-কেন্দ্রে ব্যবহৃত আধুনিক যন্ত্রপাতির তুলনায় কম ছিল, এই মত মেনে নিলেও বলা যায় যে, তার ব্যবহার অনেক সময়েই যথেষ্ট যুক্তি-সঙ্গত ছিল নিম্নতর মজুরির হার, অপেক্ষাকৃত বেশি সুদের হার অথবা সীমিত মূলধনের পরিপ্রেক্ষিতে। নতুন কেন্দ্রের অনেক মিলের পরিকল্পনায় ও পরিচালনায় যে বেশ গলদ ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। সব থেকে ভালো কারিগরি অবস্থার শর্ত সম্পর্কে উদ্যোক্তা ও তাদের ম্যানেজারদের অজ্ঞতাই ছিল তার কারণ।[৮৪] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশ অঞ্চলের এবং নাগপুর কানপুর কেন্দ্রের বহু মিলে মজুরির হার নিম্নতর হওয়া সত্ত্বেও উৎপাদনের একক প্রতি শ্রম-ব্যয় তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল।[৮৫]

কানপুর, পশ্চিমবঙ্গ ও মধ্যপ্রদেশের মতো কম-মজুরি সম্পন্ন কেন্দ্রের বহু মিলে বিশেষ রকমের আর্থিক সমস্যা দেখা দেয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যখন তাদের সেকেলে যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন করতে হয়েছিল। দি টেকনিক্যাল সাবকমিটি অব দি ওয়ার্কিং পার্টি অন দি কটন টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি (১৯৫২) প্রদত্ত রিপোর্ট থেকে শিল্পটির বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রতিস্থাপনও পুনর্নির্মান বাবদ ব্যয়ের পরিসংখ্যান পাওয়া যায়[৮৫ক] :

কেন্দ্র	যে সব মিল সবকারিভবে তাদের বিবরণ পেশ করেছে তাদের সংখ্যা	উক্ত মিলে টাকুর সংখ্যা	উক্ত মিলে মোট তাঁতের সংখ্যা	শুধুমাত্র সুতো কাটা এবং বয়নের উদ্দেশ্যে পুনর্নির্মাণ ও প্রতি-স্থাপনেব যথাযথ ব্যয়ের হিসাব (টাকায়)
আমেদাবাদ	৩৮	১,০৬৭,০০০	২৩,২০০	৭০,০০০,০০০
বোম্বাই	৩৮	২,২০০,০০০	৫০,০০০	৩০০,০০০,০০০
দিল্লী-উত্তর প্রদেশ	১০	৪৭৬,০০০	৯,৫০০	৪৮,০০০,০০০
কোয়েম্বাটুর	১১	৩৩৬,০০০	৮৭২	১৩,০০০,০০০
মধ্য ভারত	৮	২১৭,০০০	৫,৬০০	২০,০০০,০০০
মধ্যপ্রদেশ	৬	২৫৬,০০০	৫,৩০০	৪৬,০০০,০০০

বিভিন্ন কেন্দ্রে পুনর্নির্মাণ এবং প্রতিস্থাপনের মোট ব্যয়, টাকু প্রতি ব্যয় এবং তাঁত প্রতি ব্যয় হিসাবে নিচে প্রকাশ করা হয়েছে :

কেন্দ্র	টাকু-প্রতি (টাকায়)	তাঁত-প্রতি ব্যয় (টাকায়)
আমেদাবাদ	৬৬	৩,০১৭
বোম্বাই	১৩৬	৬,০০০
দিল্লী-উত্তর প্রদেশ	১০১	৫,০৫৩
কোয়েম্বাটুর	৩৯	১৪,৯০৮
মধ্য ভারত	৯২	৩,৫৭১
মধ্যপ্রদেশ	১৮০	৮,৬৭৯

কোয়েম্বাটুরের মিলের টাকু প্রতি ব্যয়ের বিষয়টি বাদ দিয়ে ধরলে দেখা যায়, আমেদাবাদের মত বেশি মজুরির কেন্দ্রে তাঁত বা টাকু প্রতি প্রতিস্থাপন-ব্যয় যে কোনো কেন্দ্রের তুলনায় কম ছিল। বোম্বাইতে প্রতিস্থাপন ব্যয় (তাঁত বা টাকু প্রতি) বেশি হওয়ার কারণ ঘটেছিল শিল্পটির দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী কালের বিশেষ কিছু সমস্যা থেকে।

৭.৫ ভারতীয় ও জাপানি সুতিবস্ত্র শিল্পের তুলনামূলক দক্ষতা

শিল্পের অবস্থানগত পরিবর্তন উৎপাদিত পণ্যের বৈচিত্র্যসাধন, যন্ত্রপাতির ব্যবহারিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ৫০ শতাংশ পর্যন্ত সংরক্ষণমূলক শুল্ক আরোপ সত্ত্বেও ভারতীয় মিলগুলি জাপানের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে পরেনি।[৮৬]দেশে এমন কিছু মিলও ছিল যাদের পক্ষে এমন-কি ১৯৩২-এও জাপানি মিলগুলির সঙ্গে সম-শর্তে প্রতিযোগিতায় নামা সম্ভব ছিল না।

অবশ্য বিশের দশকের শেষ দিকে জাপান নিম্নতম ব্যয়ে উৎপাদনে সক্ষম দেশগুলির অন্যতম হয়ে উঠেছিল। ১৯৩০-এর দশকে ইয়েনের অবমূল্যায়ন ঐ দেশকে আরও বেশি সুবিধা দিয়েছিল বিশেষত এই কারণে যে, শ্রমিকদের মজুরি পণ্যসমূহের দামের তুলনায় কম ছিল, অর্থাৎ শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি, বয়ন-শিল্পের সমস্ত শাখায়, ১৯৩৩ (সেপ্টেম্বর) থেকে ১৯৩৬ (সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত কমতে থাকে এবং এদিক থেকে সুতিবস্ত্র উৎপাদনকারী প্রধান দেশগুলির মধ্যে জাপান ছিল অনন্য (চীন ও ভারত বাদে)।[৮৭] জাপানের আরও কিছু সুবিধা ছিল যা ভারত ও ব্রিটেনের ছিল না। জাপানি মিলের এক বিশাল সংখ্যাগুরু অংশ মিলিত হয়েছিল জাপান স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশন গঠনেব মাধ্যমে। অ্যাসোসিয়েশনটি সংকটের সময়ে স্বল্পকালীন কাজের চুক্তি কার্যকর করতে পেরেছিল এবং প্রথমে ভারত থেকে, পরে চীন থেকে, কাঁচা তুলো আমদানিও সংগঠিত করেছিল।[৮৮] সুতোর বেশি দাম ধার্য করে দেশের মধ্যে থানকাপড়ের দামকেও বাড়াতে সমর্থ-হয়েছিল। তাছাড়া বিরঞ্জন ও প্রস্তুতিকরণের শেষ পর্যায়ের কাজে যাঁরা নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের কম পারিশ্রমিক দিয়ে রপ্তানি-পণ্যের দাম কমিয়ে রাখাও অ্যাসোসিয়েশনটি সম্ভবপর করেছিল। কিন্তু এই বিষযে তার ক্ষমতার বিরুদ্ধতা কবে ফেডারেশন অব উইভার্স গিল্ডস।[৮৯] নতুন কোনো উৎপাদন পদ্ধতি ছড়িয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার কাজেও অ্যাসোসিয়েশনটি সফল হয়। দ্বিতীয়ত, 'অধিকাংশ কাঁচা তুলো আমদানি ও বড় পরিমাণ সুতির কাপড় রপ্তানি তিনটি বড় বণিক গোষ্ঠীর হাতে থাকে'।[৯০] তৃতীয়ত, ১৯২৫-এ প্রতিষ্ঠিত এক্সপোর্ট গিল্ডের ব্যাপক ক্ষমতা ছিল, 'রপ্তানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের, তার উপর লেভি আরোপ ও কোটা বণ্টনের'।[৯১] চতুর্থত, ১৯২৯-এ চারটি মিল সম্মিলিতভাবে সমগ্র শিল্পটির ৬০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করত। পরিশেষে, জাপানি বিপণন পদ্ধতি ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় ফার্মগুলির তুলনায় অনেক বেশি নমনীয় ছিল। লেনদেনের উপর সাধারণত নিম্নতর প্রতিদান-হার ধার্য করা হতো এবং স্থানীয় বাজারের পরিস্থিতি সম্পর্কে এদের জ্ঞানও অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল।[৯২]

ব্যবসায়িক সংগঠন ও বিপণন ব্যবস্থার দিক থেকে এই নির্দিষ্ট সুবিধাগুলি ছাড়াও, ভারতের তুলনায় অনেক দ্রুত শিল্পায়ন ও সাক্ষরতার প্রসার থেকে জাপানিরা সুফল পেতে থাকে। বিশের দশকের শেষ দিকে জাপান আরও কিছু উন্নতি ঘটাতে পেরেছিল। যেমন, ওয়ার্প-স্টপ মোশন যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে সাধারণ তাঁত চালকদের উৎপাদনশীলতা যথেষ্ট

বড় শতাংশে বৃদ্ধি করা।[৬৩] নতুন ধরনের স্বয়ংক্রিয় তাঁতের ব্যবহারও প্রথমে জাপানে ঘটে, এক্ষেত্রে সব থেকে সফল ও বিখ্যাত ছিল টোয়োডা অটোম্যাটিক লুম।

তিরিশের দশকের গোড়ার দিকে, কোনো জাপানি তাঁতি (পুরুষ বা মহিলা) সাধারণত ছ'টি তাঁত একা চালাতেন যেখানে বোম্বাইয়ের একজন তাঁতি চালাতেন দু'টি তাঁত। যদিও ভারতে তাঁতিদের দক্ষতায় কিছু উন্নতি ঘটে, কিন্তু জাপান আরও উন্নতি ঘটায়, দুই দেশের মধ্যে শ্রম-ব্যয়ে পার্থক্য দূর হয়নি, বরং তা ক্রমশ বাড়তে থাকে।[৬৪] স্বয়ংক্রিয় তাঁত অথবা স্বয়ংক্রিয় সংযোজক বেশি মাত্রায় ব্যবহারে অক্ষমতা ভারতীয় শিল্পের কারিগরি অনগ্রসরতাকে নাটকীয়ভাবে তুলে ধরে।

১৯৩০-এ আর্নো পিয়ার্স মাদ্রাজের বিনী মিল্‌সে স্বয়ংক্রিয় তাঁতের ব্যবহার দেখেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেন : তাদের ২,৩০০ টি স্বয়ংক্রিয় তাঁতে (অধিকাংশ নর্থরপ লুম্‌স) উৎপাদিত সমস্ত পণ্য, ভারতীয় (ছোট আঁশযুক্ত) তুলো থেকে কাটা সুতোয় তৈরি হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ নিখুঁত যা লেখক দেখেছেন ভারত ভ্রমণের সূত্রে ; পণ্যগুলির অধিকাংশই উচ্চশ্রেণীর সুতির পোশাক তৈরির কাপড় এই দেশে উৎপাদিত শ্রেষ্ঠ পণ্যগুলির অন্যতম।'[৬৫] ৪ নম্বর মিলে ২২টি টোয়োডা স্বয়ংক্রিয় তাঁত এবং ১১টি সাধারণ তাঁতের উপর নির্ভর করে একটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। পিয়ার্স মিলটি পরিদর্শন করেন এবং ঐ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলের বর্ণনা দেন। লক্ষ্য করা হয়েছিল, স্বয়ংক্রিয় তাঁত ব্যবহারের ফলে মোট ব্যয়ের হ্রাস ঘটছে যার পরিমাণ প্রতি পাউন্ড কাপড়ে ০.৫৩৭৫ আনা।[৬৬] বিনী মিল্‌স (১৯৩০-এ বাকিংহাম, ও কর্ণাটক মিল্‌সের সঙ্গে একত্রিত হয়) সমগ্র তিরিশের দশক জুড়ে সমৃদ্ধির কাল ভোগ করে। ভারতের দেশীয় বাজার পৃথিবীর বৃহত্তম বাজারগুলির অন্যতম ছিল, এবং সেখানে ভারতীয় পণ্যের দ্বারা ব্রিটেনে তৈরি উন্নতমানের কাপড় ও সুতোর প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যণীয় প্রবণতা ছিল। এই পরিস্থিতিতে প্রমিত পণ্যসমূহ (Standardized Commodities) উৎপাদনের উদ্দেশ্যে স্বয়ংক্রিয় তাঁতের দ্রুত প্রসার আশা করার কথা। কোরা বা বিরঞ্জিত অবস্থায় কাপড়ের পণ্যগুলি বিক্রি করা যেত অথবা সেগুলি বিভিন্ন ধরনের রঙিন কাপড়ে পরিণত করা যেত।

ভারতে স্বয়ংক্রিয় তাঁত জনপ্রিয় না হওয়ার অনেক কারণ ছিল, যেমন ল্যাঙ্কাশায়ার পদ্ধতির অনুকরণ (কারিগররা এই পদ্ধতির গুণে মুগ্ধ থাকার মতো শিক্ষা পেয়েছিলেন), জাপানি পদ্ধতি ও যন্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞতা, স্বয়ংক্রিয় তাঁত বসানোর অতিরিক্ত প্রাথমিক ব্যয় এবং ১৯৩০-এ ইন্ডো-জাপানিজ কনভেনশনে নিন্দাবাদ ঘোষণার পর থেকে ব্যয় কমানোর চাপ শিথিল করা। বোম্বাইয়ে মিলের ম্যানেজার ও তদারকি কর্মীদের বড় অংশকে ল্যাঙ্কাশায়ারেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। তাদের প্রশিক্ষণের (মিলগুলিতে অথবা ভিক্টোরিয়া জুবিলি ট্রেনিং ইন্‌স্টিটিউটে) দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁরাও ল্যাঙ্কাশায়ার-পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত। প্রায় সমস্ত যন্ত্রপাতি আমদানি করা হতো যুক্তরাজ্য থেকে। যে সমস্ত স্বয়ংক্রিয় তাঁতগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময়ে ব্যবহৃত হয়েছিল সেগুলি ছিল নর্থরপ তাঁত এবং এরই ভিত্তিতে দু'টি ট্যারিফ বোর্ড ভারতীয় পরিস্থিতিতে স্বয়ংক্রিয় তাঁতের ব্যবহারকে লাভজনক নয় বলে সাব্যস্ত করে। ইয়োরোপীয় কিংবা জাপানি তাঁত ব্যবহারের প্রশ্নটি আদৌ বিবেচনা করা হয়নি।[৬৭] ১৯৩৪-এর ১লা জানুয়ারিতে মোট তাঁতের সংখ্যার মধ্যে সাধারণ তাঁতের শতাংশ ছিল যুক্তরাজ্যে ৯৭.০ এবং ভারতে ৯৭.৬। ৩১শে জুলাই ১৯৩৬-এ মোট

টাকুর পরিমাণে (সংখ্যায়) বৃত্তাকার টাকুর শতাংশ ছিল যুক্তরাজ্যে ২৭, ভারতে ৯৩, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৯৯ জাপানে ১০০। ধরে নেওয়া হয় যে, মিউল স্পিন্ডল (mule spindle) অত্যন্ত দক্ষ শ্রমের সাহায্যে একমাত্র উচ্চমানের সুতো উৎপাদনে সক্ষম। অতএব ল্যাঙ্কাশায়ারের পদ্ধতির প্রতি আসক্তি এবং/অথবা সেকেলে যন্ত্র অপসারণে ব্যর্থতা ভারতে মিউল স্পিন্ডলের (মোট টাকুর ৭শতাংশ) অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করে।[৯৮]

বহু পর্যবেক্ষক মনে করতেন, ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যে সাক্ষরতার অভাব ও তাঁদের দুর্বল দৈহিক গঠন নতুন কোনো কারিগরি কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাধা ছিল, তাব কারণ ঐ ধরনের কৌশল আয়ত্ত করতে যে গতি ও অবিচ্ছিন্ন মনোযোগের প্রয়োজন হতো তা ভারতীয় শ্রমিকদের ছিল না। অপর দিকে, জাপানি শ্রমিকদের উন্নতমানের সাক্ষরতা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ নতুন নতুন কৌশল অবলম্বনের সহায়ক ছিল।[৯৯] জাপানি শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ ছিল না, কিন্তু ছাঁটাই বা মজুরি না বাড়িয়ে কাজের চাপ বাড়নোর কোনো চেষ্টার বিরুদ্ধে বোম্বাইয়ের শ্রমিকরা কার্যকরীভাবে প্রতিহত করতে পারতেন। এই বিষযটিও জাপানে উৎপাদনের নতুন কলাকৌশল গ্রহণের অনুকূলে যায়। কিন্তু বোম্বাইয়ের সমস্যা তীব্র হয়ে ওঠার কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়, সেখানে মিলমালিকরা দেশীয় চাহিদা বৃদ্ধির সুযোগ নিতে এবং উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়াতে ব্যর্থ হন। কিন্তু বোম্বাই ও (আরও কম মাত্রায়) আমেদাবাদ ছাড়া অন্য উৎপাদন-কেন্দ্রগুলি শ্রমিক সংঘের কোনো কার্যকরী প্রতিরোধের কদাচিৎ মুখোমুখি হয়েছে।

বোম্বাইয়ের মিল-মালিকরা উৎপাদনের মানের সমতা সাধনের অথবা স্বল্পতর কাজের সময় নির্ধারণের মাধ্যমে উৎপাদন কমানোর অনেক চেষ্টা তিরিশের দশকে করেছিলেন, কিন্তু উৎপাদন-কেন্দ্রগুলির মধ্যে পরিস্থিতির বিভিন্নতা সমস্ত প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দেয়। র‍্যাশেনালাইজেশনের পরিকল্পনা এমনকি বোম্বাইয়ের মধ্যেও সমভাবে গৃহীত হয়নি। সম্ভবত জাপান থেকে আমদানি করা পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্কসংরক্ষণ ও পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে বহু ভারতীয় ফার্ম উৎপাদন-ব্যয় না কমিয়েও অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল। কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয়, সরকারি তদারকি ও বাধ্যবাধকতা ছাড়া র‍্যাশেনালাইজেশন বা কাজের সময় হ্রাসের চেষ্টা কী ভাবে সফল হতে পারত, বিশেষ করে যখন শত শত মিল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিল এবং যখন উৎপাদন-কেন্দ্রগুলির মধ্যে ব্যয় ও উৎপাদন-কাঠামোর বিপুল পার্থক্য থাকত।[১০০] কিছু ফার্ম অথবা একই সামাজিক ও রাজনৈতিক চরিত্র সম্পন্ন একটি গোষ্ঠীর হাতে (যেমন কলকাতার পাটকল-মালিকানার ক্ষেত্রে) উৎপাদন কেন্দ্রীভূত হলে, কোনো গোষ্ঠীবদ্ধ প্রয়াস কার্যকর হতে পারত। তবে তার জন্যেও প্রয়োজন ছিল সরকারি হস্তক্ষেপের যেহেতু অনধিকারী বহিরাগতরা সব চেষ্টাই ভেস্তে দিত (যেমন, তিরিশের দশকের শেষ দিকে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন ঘটেছিল বাংলার পাটকল এবং বিহার ও উত্তর প্রদেশের চিনিকলগুলির ক্ষেত্রে)।

প্রশ্ন তোলা যায়, বয়ন-যন্ত্র শিল্পের অস্তিত্ব থাকলে ভারতীয় তুলো-মিল শিল্পের পক্ষে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস সম্ভবপর হতো কিনা। উত্তরে অবশ্যই বলতে হয়, বয়ন-যন্ত্র শিল্প বিচ্ছিন্ন ভাবে একমাত্র শুল্ক-সংরক্ষণের সাহায্যে টিঁকে থাকলে ব্যয় বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়াত। কিন্তু ভিন্ন চিত্র পাওয়া যেত যদি ভারি শিল্পের অস্তিত্ব থাকত—বিশেষত শিল্পের ঐতিহ্য আছে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী সৃষ্টির। এমনকি ভারতীয় শিল্পের অনগ্রসর অবস্থাতেও অন্যান্য

ভারতীয় শিল্পগুলি থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে চলছে এমন দেশীয় বয়ন-যন্ত্র শিল্প পরিস্থিতির উন্নতিতে সাহায্য করতে পারত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে বা তার পরে (এবং বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে)। পুরনো সরঞ্জামের প্রতিস্থাপনে এবং নতুন যন্ত্রের দরুন ব্যয় কমাতে মিলগুলিকে সক্ষম করে তুলত। যুদ্ধে বিধ্বস্ত ইয়োরোপে দেশীয় পরিস্থিতির চাপে নতুন যন্ত্রপাতির দাম বেড়ে গিয়েছিল।

সারণি ৭.১০ পশ্চিম ভারতের সুতোকল শিল্পে প্রকৃত বিনিয়োগ, ১৯০৫-৬ থেকে ১৯৩৮-৯

বছর	বোম্বাইতে তুলো বয়ন যন্ত্র সমূহের আমদানি (টা ’০০০)	বোম্বাইতে তুলো বয়ন যন্ত্র সমূহের নিয়ন্ত্রিত আমদানি (টা ’০০০)	যুক্তরাজ্য থেকে বোম্বাইতে আমদানিকৃত তুলো বয়ন যন্ত্রসমূহের দামের সূচক (১৯০৪=১০০)	বোম্বাইতে তুলো বয়ন যন্ত্রসমূহের আমদানির প্রকৃত মূল্য (টা ’০০০)	পশ্চিমভারতে সুতোকল শিল্পে সমগ্র বিনিয়োগের প্রকৃত মূল্য বছর
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১৯৫০-৬	১০৭২৬	১০৭২১	১০০.৩৮	১০৬৮০	১৬৪৪৭
১৯০৬-৭	১১৬৫৮	১১৬৫৩	৮৯.১৯	১৩০৬৫	২০১২০
১৯০৭-৮	১৪২৭৪	১৪২৬৮	৮৯.১৯	১৫৮৮৭	২৪৪৬৬
১৯০৮-৯	১৩৫৩৩	১৩৫২৭	৯৭.৪৬	১৩৮৮০	২১৩৭৫
১৯০৯-১০	১১৩০৭	১১৩০২	৯৩.৬৮	১২০৬৪	১৮৫৭৯
১৯১০-১১	৭৬৫৩	৭৬৫০	১০০.৭৪	৭৫৯৪	১১৬৯৫
১৯১১-১২	৭৭৮২	৭৭৭৮	১০০.১৪	৭৭৬৭	১১৯৬১
১৯১২-১৩	৮৮২১	৮৮২১	১০০.৮৬	৭৯৫৭	১২২৫৪
১৯১৩-১৪	১৫৮১৪	১৫৮১৪	১০১.৪০	১৫৫৯৬	২৪০১৮
১৯১৪-১৫	১৩২৬১	১৩২৬১	১০৩.৪৩	১২৮২১	১৯৭৪৪
১৯১৫-১৬	১০৮৮০	১০৮৮০	১০৯.১৪	৯৯৬৯	১৫৩৫২
১৯১৬-১৭	১১৫৪২	১১৫৪২	১৭৪.৩৩	৬৬২১	১০১৯৬
১৯১৭-১৮	১০৬৫৩	১০৬৫৩	২৫৩.৯৩	৪১৯৫	৬৪৬০
১৯১৮-১৯	১৫১৬২	১৫১৬২	৩৭৫.০১	৪০৪৩	৬২২৬
১৯১৯-২০	৯৮৭৬	৯৮৭৬	২৯৫.৫৪	৩৩৪২	৫১৪৭
১৯২০-১	২৮৬৪৫	২৮৬৪৫	৩৩১.৮১	৮৬৩৩	১৩২৯৫
১৯২১-২	৬০৭৭৮	৬০৭৭৮	৩৬২.৮৮	১৬৭৪৯	২৫৭৯৩
১৯২২-৩	৬৫৯৪৯	৬৫৯৪৯	৩০৭.৮০	২১৪২৬	৩২৯৯৬
১৯২৩-৪	৪৪৬৬২	৪৪৬৬২	২৪২.৩৩	১৮৪৩০	২৮৩৮২
১৯২৪-৫	২০৬৩৮	২০৬৩৮	২৩৬.০২	৮৭৪৪	১৩৪৬৬
১৯২৫-৬	১৮৩৬১	১৮৩৬১	২০৮.১৫	৮৮২১	১৩৫৮৪
১৯২৬-৭	১৩২০৫	১৩২০৫	২৩৩.১০	৫৬৬৫	৮৭২৪
১৯২৭-৮	১৪৯২৩	১৪৯২৩	২৬২.২৪	৫৬৯১	৮৭৬৪
১৯২৮-৯	১৬৬৯৭	১৬৬৯৭	১৯৫.৭৪	৮৫৩০	১৩১৩৬

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১৯২৯-১০	১৫৫৪১	১৫৫৪১	১৮৮.৬৫	৮২৩৮	১২৬৮৭
১৯৩০-১	১৩৪৮৬	১৩৪৮৬	১৯৮ ৪৮	৬৭৯৫	১০৪৬৪
১৯৩১-২	১৫৮৯৫	১৫৮৯৫	—	—	—
১৯৩২-৩	১৭৩১০	১৭৩১০	—	—	—
১৯৩৩-৪	১৪২৬১	১৪২৬১	—	—	—
১৯৩৪-৫	১৫৯৫৫	১৫৯৫৫	—	—	—
১৯৩৫-৬	১২৮৩৭	১২৮৩৭	—	—	—
১৯৩৬-৭	১০৩১৭	১০৩১৭	—	—	—
১৯৩৭-৮	১৭৮৬০	১৭৮৬০	—	—	—
১৯৩৮-৯	১৬৫১৭	১৬৫১৭	—	—	—

উৎস ও টীকা · *Annual Statements of the foreign trade of the U.K.* (PP), Vol. I (১৯১৯ পর্যন্ত) এবং Vol. III (১৯২০-র পর থেকে) তে উল্লিখিত বয়ন যন্ত্রসমূহের পরিমাণ ও মূল্যকে ভিত্তি করে মূল্যসূচক নির্ধারিত হলো। বয়ন যন্ত্রের টন প্রতি দাম ধরা হয়েছে। বোম্বাইযে বয়নযন্ত্র আমদানির তথ্য *Annual statement of the seanborne trade of British India* (কলকাতা, বার্ষিক), খণ্ড ১ থেকে গৃহীত হয়েছে।

সারণি ৭.১১ সমগ্র ভারতে (ব্রহ্মদেশ ছাড়া) সুতি বয়ন যন্ত্রসমূহের আমদানি ('০০০ টাকায়), ১৯০৫-৬ থেকে ১৯৩৮-৩৯

বছর	বয়ন যন্ত্রসমূহের আমদানি (টা '০০০)	তুলো ও পাট বয়ন যন্ত্রসমূহের আমদানি (টা '০০০)	পাট বয়ন যন্ত্রসমূহের আমদানি (টা '০০০)	তুলো-বয়ন যন্ত্রসমূহের আমদানি (টা '০০০)	তুলো-বয়ন যন্ত্রসমূহের আমদানির প্রকৃত মূল (টা '০০০)	বোম্বাইতে রপ্তানিকৃত বয়ন যন্ত্রসমূহের মূল্যসূচক (১৯০৪=১০০)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১৯০৫-৬	২৪৮,৯৮	২৪৫৪৯	১১৭২৯	১২৮২০	১২৭৭১	১০০.৩৮
১৯০৬-৭	২২৭,৪৫	২২৪২৭	৯৫৫০	১২৮৭৭	১৪৪৩৮	৮৯.১৯
১৯০৭-৮	২৬৩,২৯	২৫৯৬০	৯৯০৬	১৬০৫৪	১৭৮৭৬	৮৯.৮১
১৯০৮-৯	২৮৭,৬০	২৮৩৫৭	১২৭৬৫	১৫৫৯২	১৫৯৯৮	৯৭.৪৬
১৯০৯-১০	২১৫১৫	২১২১৪	৭৮০১	১৩৪১৩	১৪৩১৮	৯৩.৬৮
১৯১০-১১	১৬৩৯৬	১৬১৬৬	৭১০৬	৯০৬০	৮৯৯৩	১০০.৭৪
১৯১১-১২	১৩৫৮১	১৩৩৯১	৪১৫৬	৯২৩৫	৯২২৫	১০০.১৪
১৯১২-১৩	২০৪৩১	১৯৯৯৪	৮৬৪২	১১৩৫২	১০২৪০	১১০.৮৬
১৯১৩-১৪	৩২৭৯৯	৩২৪২৪	১৪৫৭০	১৭৮৭৪	১৭৬২৭	১০১.৪০
১৯১৪-১৫	২৪১৪৪	২৩৪৫২	৮৭৬২	১৫০৯০	১৪৫৯০	১০৩.৪৩
১৯১৫-১৬	২১৭৪৪	২১৩৫৫	৯৩৬০	১১৯৯৫	১০৯৯০	১০৯.১৪

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১৯১৬-১৭	২৩৮৬৪	২৩৬৫৫	১০৭৮১	১২৮৭৪	৭৩৮৫	১৭৪.৩৩
১৯১৭-১৮	১৮৮৮১	১৮৫৭০	৬৯১৯	১১৬৫১	৪৫৮৮	২৫৩.৯৩
১৯১৮-১৯	২২৯৩৬	২২২৩৮	৫৭০৬	১৬৫৩২	৪৪০৮	৩৭৫.০১
১৯১৯-২০	২৯২৪০	২৭৮৪৬	১৪৭৭৭	১৩০৬৯	৪৪২২	২৯৫.৫৪
১৯২০-১	৬৬৯৬৮	৬৪১৯৮	২৭৭৬৭	৩৬৪৩১	১০৯৭৯	৩৩১.৮১
১৯২১-২	১২৮০৮০	১১৯৫৪১	৪৩২১৫	৭৬৩২৬	২১০৩৩	৩৬২.৮৮
১৯২২-৩	১০৫৯৯৯	১০২০৩০	১৭৯০৮	৮৪১৩২	২৭৩৩৩	৩০৭.৮০
১৯২৩-৪	৭১৯০৪	৬৯৬২৬	১৩৬৮৯	৫৫৯৩৭	২৩০৮৩	২৪২.৩৩
১৯২৪-৫	৩৮০৬১	৩৬০২৮	৯২৮৪	২৬৭৪৪	১১৩৩১	২৩৬.০২
১৯২৫-৬	৩২৯১৭	৩১৬৩৪	৮১৫৮	২৩৪৬৬	১১২৭৪	২০৮.১৫
১৯২৬-৭	২৫১৫২	২৩৫১০	৬৪৬৭	১৭০৪৩	৭৩১১	২৩৩.১০
১৯২৭-৮	৩০৮৬১	২৯১৪৫	৯৪১১	১৯৭৩৪	৭৫২৫	২৬২.২৪
১৯২৮-৯	৩৬৪৮২	৩৪৫২১	১২৯৮৮	২১৫৩৩	১১০০১	১৯৫.৭৪
১৯২৯-৩০	৩৮০৬৮	৩৫৩৩৮	১৪৩৮৬	২০৯৫২	১১১০৬	১৮৮.৬৫
১৯৩০-১	২৮২৩৮	২৫৯১৬	৮১৩৩	১৭৭৮৩	৮৯৬০	১৯৮.৪৮
১৯৩১-২	২৪৭৩৯					
১৯৩২-৩	২৬৮০৫					
১৯৩৩-৪	২৬০৫১					
১৯৩৪-৫	৩২২৯৯					
১৯৩৫-৬	৩৪১৪৬					
১৯৩৬-৭	২৭৪৭৯					
১৯৩৭-৮	৪৫০৪৯					
১৯৩৮-৯	৩৭৮৭৭					

উৎস ও টীকা : ৭.১০ সারণির উৎসের অনুরূপ এবং বয়ন যন্ত্রসমূহের মূল্যসূচক ঐ সারণির অনুরূপ।

উপরোক্ত আগাম অনুমানগুলি বর্জিত হলেও লক্ষ্য করা যায় ভারত ও জাপানের তুলো-বয়ন শিল্পের উপর উভয় দেশের অর্থনৈতিক প্রসারের প্রকৃতিগত ভিন্নতার প্রভাব। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে তুলোর সুতো ও কাপড় উৎপাদনে জাপানিদের দক্ষতা ভারতীয়দের তুলনায় কম ছিল বলে মনে করা হতো।[১০১] কিন্তু বিশের দশকের শেষ দিক থেকে জাপানি মিলের শ্রমিকরা স্বীকৃতি পেতে থাকল ভারতীয়দের তুলনায় বেশি দক্ষ বলে। বয়নযন্ত্রের যোগানের জন্যে ভারত বিদেশের উপর নির্ভর করে চলল যেখানে জাপান বয়নযন্ত্র শিল্প গড়ে তুলেছিল স্বদেশে এবং যার পণ্য ইংরেজদের তৈরি পণ্যের তুলনায় অনেক সময়ে ভাল হতো। অথচ ব্রিটেনের শিল্পটি তখনও ভারতে বয়নযন্ত্রের যোগানের প্রধান উৎস।

অনুবাদক : মহঃ শাহরিয়ার, শান্তনু ভট্টাচার্য, উজ্জ্বল দাস ও মনোজ কুমার সান্যাল।

উৎস ও টীকা

১. D. Bendsusan-Butt তাঁর *On Economic Growth* গ্রন্থে মূলধন নিবিড়তার উপর মজুরি বৃদ্ধির প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন এমন একটি কাঠামোর মধ্যে যেখানে পুঁজিপতিদের বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণই হচ্ছে পরিবর্তনের প্রাথমিক নিয়ামক ; পুঁজিপতি শ্রেণী অপেক্ষাকৃত কম মূলধন নিবিড় শিল্প থেকে বেশি মূলধন নিবিড় শিল্প—এই ক্রমপর্যায়ে একটার পর একটা শিল্প জয় করে চলে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পুঁজিপতি শ্রেণী তার আক্রমণ শুরু করে হস্তশিল্প বা 'সরল পণ্য উৎপাদন' ব্যবস্থার উপর (জোয়ান রবিনসন যেভাবে দেখিয়েছেন)।

২. এই বক্তব্যের জোরালো সমর্থন পেতে হলে Sir Theodore Morison-এর *The Economic Transition in India* (লন্ডন, ১৯১১) দ্রষ্টব্য, বিশেষ করে ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়।

৩. Elijah Helm, 'An International Survey of the Cotton Industry', *Quarterly Journal of Economics*, ১৯০৩, পৃ. ৪১৭-৩৭।

৪. দৃষ্টান্ত হিসেবে দ্রষ্টব্য : Chatterjee [IPG প্রকাশনা], *Notes* , পৃ. ২-৩; এবং *Census of India*, ১৯১১, প্রথম খণ্ড, *India*, Part I, E. A. Gait-কৃত *Report* (কলকাতা, ১৯১৩), পৃ. ৪১৮ : '১৯০১ সালের তুলনায় বস্ত্র শিল্পের উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা শতকরা ৬.১ ভাগ হ্রাস পেয়েছে (১৯১১-তে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল মোট জনসংখ্যার শতকরা ২.৬ ভাগ)। এটা হয়েছিল মূলত হাতে সুতো কাটার প্রায় সম্পূর্ণ অবলুপ্তির কারণে।'

৫. W. Woodruff, *Impact of Western Man* (লন্ডন, ১৯৬৬) পৃ. ২০৭; H. H. Ghosh, *The Advancement of Industry*, পৃ. ১৪২-৪।

৬. The Imperial Gazetteer of India, *The Indian Empire*, খণ্ড ৩, *Economic* (অক্সফোর্ড, ১৯০৭), পৃ. ১৯৭-৮।

৭. Chatterjee [IPG প্রকাশনা], *Notes*, পৃ. ২১; A. Latif [IPG প্রকাশনা], *Industrial Punjab* (বোম্বাই ও কলকাতা, ১৯১১), পৃ. ২।

৮. দ্রষ্টব্য : Sir Theodore Morison, *The Industrial Organisation of an Indian Province* (লন্ডন, ১৯১১), অষ্টম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট, হস্তশিল্পে কারিগরদের অবস্থা সম্বন্ধে 'Inquiry into the Economic Condition of the Agricultural and Labouring Classes of the North-Western Provinces and Oudh', 1888, থেকে অনেক তথ্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। যেখানে একজন তাঁতি দৈনিক প্রায় এক আনা রোজগার করতেন, সেখানে একজন সাধারণ শ্রমিকের দৈনিক রোজগার ছিল ৬ পয়সা থেকে ৮ পয়সা অর্থাৎ তাঁতির আয়ের থেকে শতকরা ৫০ ভাগ থেকে ১০০ ভাগ বেশি। দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃ. ১৯৩ এবং পৃ. ২০৮-৯।

৯. দ্রষ্টব্য : Chatterjee [IPG প্রকাশনা], *Notes*, পৃ. ২১; তাছাড়াও দ্রষ্টব্য : H. J. Tozer, 'The Manufactures of Greater Britain—III. India', *JSA*, সংখ্যা ২৭৪১, জুন২ ১৯০৫, বিশেষ করে, পৃ. ৭৫৪-৬। Tozer ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁতিদের অবস্থার তারতম্য উল্লেখ করেছেন। মাদ্রাজ বা আসামের তুলনায় বাংলা ও যুক্তপ্রদেশে এই সম্প্রদায় অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। যুক্তপ্রদেশে তাদের দৈনিক রোজগার ছিল ২$\frac{১}{২}$ আনা বা তার কম, কিন্তু মাদ্রাজে সূক্ষ্ম কাপড় বোনার কাজে আয় হতো দৈনিক ৬ থেকে ১০ আনার মধ্যে। অবশ্য এটা বার করা কঠিন যে এই আয়ের মধ্যে পরিবারের অন্য যে সব সদস্য কাপড় বোনার কাজে সাহায্য করতেন তাঁদের অনুমিত আয়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা। বছরে কত দিন কাজ পাওয়া যেত তা-ও জানা যায় না। Tozer অবশ্য দেখিয়েছেন যে, অধিকাংশ তাঁতিই ছিলেন পুরো সময়ের কর্মী। তাঁরা সেই সব কৃষকদের মতো ছিলেন না যাঁরা তাঁত বোনার কাজ করতেন আংশিক সময়ের বৃত্তি হিসাবে। তিনি এটাও বলেছেন যে, হাতে বোনার কাজটা ছিল শহুরে বৃত্তি। ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলেই হাতে-বোনা কাপড়ের চাহিদার প্রকাশ ঘটত হয় মোটা, টেঁকসই কাপড়ের অথবা স্থানীয়ভাবে জনপ্রিয় সূক্ষ্ম মানের কাপড়ের চাহিদার আকারে।

১০. E. W. Collin [IPG প্রকাশনা], *Report on the Arts and Industries of Bengal* (কলকাতা, ১৮৯০), অনুচ্ছেদ ২৮। Alfred Chatterton [IPG প্রকাশনা], *Note on Industrial Work in India* (১৯০৫ সালের ৩০শে ডিসেম্বরে বেনারসে অনুষ্ঠিত শিল্প সম্মেলনে গঠিত); A. Chatterton, 'Weaving in India', *Hindusthan Review*, খণ্ড ১৫, সংখ্যা ৯১, মার্চ ১৯০৭, পৃ. ২৩৫-৪৯'। এঁর সম্পর্কে সম্মতি সূচক উল্লেখ আছে Chatterjee [IPG প্রকাশনা], *Notes*, পৃ. ২২-এ। চ্যাটার্জির হিসাবমতো ১৯০৮ সাল নাগাদ যুক্তপ্রদেশে ব্যবহৃত মোট কাপড়ের এক-তৃতীয়াংশ উৎপাদিত হতো হস্তচালিত তাঁতে (ওজনের নিরিখে)। J. G. Cumming [IPG প্রকাশনা], *Review of the Industrial Position and Propects in Bengal in 1908 with Special Reference to the Industrial Survey of 1890* (কলকাতা, ১৯০৮), বিশেষ করে পৃ. ৭-১০।

প্রথমে সন্দেহ ছিল যে, উপায়ে ভারতীয় তাঁতিরা টানা সুতো প্রয়োগ করতেন তার উন্নতিসাধন না ঘটালে ফ্লাই-শাটল তাঁত থেকে হয়তো কোনো মুনাফা লাভ করা যাবে না।

১১. *Modras, a review of the Administration of the Presidency, during the year 1903-1904* (মাদ্রাজ, ১৯০৪), পৃ. ১১২ দ্রষ্টব্য।

১২. দ্রষ্টব্য: A. Chatterton, 'The weaving Competitions in Madras'—*Indian Trade Journal*, খণ্ড ৯, সংখ্যা ১০৬, ৯-ই এপ্রিল, ১৯০৮, পৃ. ৫৪-৭; এবং Chatterjee [IPG প্রকাশনা], *Notes*, পৃ. ২২-৭।

১৩. E. B. Havell, 'Art Administration in India', *JRSA*, ফেব্রুয়ারি ৪, ১৯১০, পৃ. ২৭৮। হাতে বোনা তাঁত কাপড়ের উন্নতির উদ্দেশ্যে প্রথম দিকে যে সব প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে তার বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য : Ghosh, *The Advancement of Industry*, পৃ. ৬-৮, ১৪০-৭৭।

১৪. *Report of IIC* (PP 1919, XVII, পরিশিষ্ট)।

১৫. চাহিদার অভাব থেকে উদ্ভুত সমস্যা সম্পর্কে ১৯০৭-এর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সুরাট শিল্প সম্মেলনে পেশ করা সালেম বয়ন কারখানার উপর আলফ্রেড চ্যাটারটনের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। এটি Chatterjee [IPG প্রকাশনা], *Notes*, পৃ. ২৫-এ উদ্‌ধৃত হয়েছে। তাছাড়াও দ্রষ্টব্য : *Census of India, 1921*, খণ্ড ১৩, মাদ্রাজ, Part I, *Report* (মাদ্রাজ, ১৯২২), পৃ. ১৯৬। ১৯২৫-এ Sir Alfred Chatterton মন্তব্য করেছিলেন যে, যখন পুরনো দেশী তাঁতে উৎপন্ন পণ্যের চাহিদারই ঘাটতি আছে, তখন তাঁতিপিছু উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করা বৃথা। A. Chatterton. 'The Industrial Progress of the Mysore State', *JRSA*, খণ্ড ৭৩, ২৬ জুন, ১৯২৫, পৃ. ৭৩১।

১৬. Cumming [IPG প্রকাশনা], *Review*, পৃ. ৯।

১৭. *Report of IIC* (PP 1919, XVII), পৃ. ৪১২।

১৮. Playne and Wright, Southern India, পৃ. ৬২৭-এ দ্রষ্টব্য শিল্প অধিকর্তা K. Tressler-এর নিবন্ধ 'Industries'।

১৯. *Census of India*, ১৯২১, খণ্ড ১৩, *Madras*, Part I. *Report* (মাদ্রাজ, ১৯২২), পৃ. ১৯৬।

২০. *Census of India*, ১৯২১, খণ্ড ৫, *Bengal*, Part I, *Report* (কলকাতা, ১৯২৩), পৃ. ৪০০-২।

২১. *Report of the Fact-Finding Committee (Handloom and Mills)*, (দিল্লী, ১৯৪২) পৃ. ৩১ মাদ্রাজ ব্যতিত অন্য সব প্রদেশে, যেমন, আসাম, পাঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশে, যেখানে তাঁতের সংখ্যা ছিল অনেক, সেখানে ফ্লাই-শাট্‌ল তাঁতের সংখ্যা কম ছিল।

২২. দ্রষ্টব্য : L.S.S. O'Malley এবং Monmohan Chakravarti রচিত Bengal District Gazeteers, *Hooghly* (কলকাতা, ১৯১২), পৃ. ১৮২-৩।

২৩. Cumming [IPG প্রকাশিত], *Review*, পৃ. ৯ এবং Chatterjee [IPG প্রকাশিত], *Notes*, পৃ. ৩০-১।

২৪. Report of IIC (PP 1919, XVII), Appendix I, Statistical Evidence Regarding the Development of Handloom Weaving. এই পরিশিষ্টে দেখানো হয়েছে যে হস্তচালিত তাঁতের উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যা বিষয়ে বিভিন্ন জনগণনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য নির্ভরযোগ্য নয়। কিন্তু এটা লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, হস্তচালিত তাঁতে মিলে প্রস্তুত সুতোর ব্যবহারের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে এরকম তথ্য প্রমাণও দেওয়া হয়েছে ভারতে ৪০ কাউন্টের বেশি কোরা

সুতোর আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভারতে হস্তচালিত তাঁতে প্রস্তুত রুমাল ও শালের রপ্তানি অনেক বেড়ে গিয়েছে।

২৫. *Census of India, 1921*, Vol XIII, *Madras* Part I, *Report* (মাদ্রাজ, ১৯২২), পৃ. ১৮৯-৯৫। এই রিপোর্টে দেখা যায় যে, ১৯০০ সালের তুলনায় ১৯২১ সালে তাঁতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে তাঁতিব সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিচাব কবলে উপরোক্ত তথ্য এটাই প্রমাণ করে যে, বয়নের মূলধন সামগ্রীর ও অবশিষ্ট তাঁতিদের শ্রমের অপূর্ণ নিয়োগের মাত্রা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল।

২৬. যেমন, Gov. India, CISD : *Prices and Wages in India*, ৩৫তম সংস্করণ (কলকাতা, ১৯২০), সারণি ২০ ও ২১ দ্রষ্টব্য।

২৭. Evidence (Report of IIC), Vol III, *Madras and Bangalore* (PP 1919, XIX), পৃ. ৫১-৬৩ ও ৪৪৪-৮-এ রাও বাহাদুর পি. থিয়াগারাইয়া চেট্টি এবং এল. গিরিয়া চেট্টিয়ার কর্তৃক প্রদত্ত সাক্ষ্যের বিবরণ দ্রষ্টব্য। গিরিয়া চেট্টিয়ার-এর মতে, গ্রাম অঞ্চলের তাঁতিদের তুলনায় কোয়েম্বাটুর শহরের তাঁতিরা অর্থনৈতিক ভাবে অনেক বেশি সম্পন্ন ছিলেন কারণ, গ্রামের তাঁতিদের মজুরি ছিল কম, তাঁদের তৈরি কাপড় ছিল প্রধানত মোটা এবং শহরের তাঁতিদের মতো তাঁরা অব্যবহৃত সুতো বা সিল্ক বা সোনার জরির সুতো ধরে রাখতে পারতেন না। গিরিয়া আরও দেখিয়েছেন যে, তাঁতিরা সাধারণভাবে ঋণগ্রস্ত হলেও, তাঁদের মধ্যে একটা শিল্প সমবায় গড়ে তোলার চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নি। যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, 'এখানে তাঁতিরা কী এত ভাল অবস্থায় আছে যে তাঁদের কোনো আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন হয় না?' তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'তাঁতিরা সে রকম ভালো অবস্থায় নেই, তবে ব্যবসায়ীদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হচ্ছে।' দ্রষ্টব্য : ঐ, পৃ. ৪৪৫।

২৮. *Report of the Fact-finding Committee (Handloom and Mills)* (দিল্লী, ১৯৪২), চতুর্থ অধ্যায়।

২৯. উদাহরণস্বরূপ, V. K. R. V. Rao, 'Handloom vs. Powerloom', *ITJ, 1890-1940, Jubilee Souvenir* (বোম্বাই, জানুয়ারি, ১৯৪১), পৃ. ৬৩ দ্রষ্টব্য। রাও দেখিয়েছেন যে, ১৯২৫ থেকে ১৯৩৮-এর মধ্যে বোম্বাই ও অন্যান্য কেন্দ্রে হস্তচালিত তাঁতে প্রস্তুত বিভিন্ন ধরনের কাপড়ের দাম শতকরা ৪৮ থেকে ৮১ ভাগ পর্যন্ত কমে গিয়েছিল। তাছাড়া দ্রষ্টব্য : *The Administration Report of the Department of Industries, United Provinces, for the year ending 31 March 1937* (এলাহাবাদ, ১৯৩৭) পৃ. ৫। এই রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে যে, যে সব তাঁতি হস্তচালিত তাঁত সম্পর্কিত সরকারি প্রকল্পের (এই প্রকল্পে কয়েকটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে সমবায়ের ভিত্তিতে বা সরকারিভাবে বিপণনের সুযোগ দেওয়া হতো) আওতায় ছিলেন, তাঁদের দৈনিক মজুরি হতো গড়ে ৬ আনা; অথচ যাঁরা এই ধরনের প্রকল্পের

আওতার বাইরে কাজ করতেন, তাঁদের মজুরি সাধারণভাবে থাকত দৈনিক ২ থেকে ৩ আনার মধ্যে।

৩০. *Indian tariff and the cotton duties : papers relating to the Indian Tariff Act and the Cotton Duties 1894, and Representations made to the Government of. India, in March 1894 against the exclusion of cotton manufactures from import duties, by Chamnbers of Commerce and other Public Bodies in India* (PP 1895, LXXII); and (*Papers relating to the*) *Indian Tariff Act, 1896, and the Cotton Duties Act, 1896 (PP 1896, LX)*. বিশেষ করে, দ্রষ্টব্য : J. Westland's note in the 1895 volume, পৃ. ৭-১৪; এবং R. E. Enthoven, First Assistant Collector of Customs, Bombay এবং John. Marshall, Secretary, Bombay Mill Owners' Association-এর মন্তব্য, 1896 volume, পৃ. ১০৬-৫৮। .

৩১. ঐ সময় পর্যন্ত আমেদাবাদ ম্যানুফাক্‌চারিং অ্যান্ড প্রিন্টিং কোম্পানি-ই ছিল একমাত্র কোম্পানি যারা কাপড় ছাপাত। ১৮৯৬-এ এই কোম্পানি এই কাজ বন্ধ করে দেয়। (*Papers relating to*) *the Indian Tariff Act, 1896* (PP 1896, LX)-এ Enthoven এর মন্তব্য দ্রষ্টব্য, পৃ. ৪৯৫।

৩২. ঐ (PP 1896, LX), পৃ. ১১০-১১।

৩৩. *Indian tariff and the cotton duties* (pp 1895, LXXII), পৃ. ৭-৮। এ ছাড়াও দ্রষ্টব্য : Mehta, *The Indian Cotton Textile Industry*

৩৪. Mehta, *The Indian Cotton Textile Industry*, পৃ. ১০ (মেহ্‌তা তাঁর তথ্যের সমর্থনে *International Cotton Statistics*, থেকে উদ্‌ধৃত করেছেন)।

৩৫. সারণি ৭.২ দ্রষ্টব্য।

৩৬. সারণি ৭.৩ দ্রষ্টব্য।

৩৭. খাটাউ মাকানজি স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং কোম্পানি লিমিটেড মনে হয় প্রথম প্রতিষ্ঠান যার নিজস্ব বিরঞ্জন ও রঞ্জন কারখানা ছিল। ১৯০৫-এর পরে যে প্রতিষ্ঠান এই কাজে নামল তা হচ্ছে করিমভয় এব্রাহিম গ্রূপ অব্ মিল্‌স্। Playne and Wright, *The Bombay Presidency*, পৃ. ২৩৪ ও ১৬৪ দ্রষ্টব্য।

৩৮. ভারত থেকে মোট পাকানো তুলো ও সুতোর রপ্তানির পরিমাণ১৮৮৯-৯০-এ ১৪৩.২ মিলিয়ন পাউন্ড থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৯৯-১৯০০-তে ২৪২-৬ মিলিয়ন হয়েছিল। তারপর ১৯০০-১ -এ বোম্বাইয়ে প্লেগের প্রাদুর্ভাবের জন্যে রপ্তানি কমে গিয়ে হয় ১১৯.৩ মিলিয়ন পাউন্ড। ১৯০৫-৬-এ পাকানো তুলো ও সুতোর রপ্তানি বেড়ে সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছয়—২৯৮.৫ মিলিয়ন পাউন্ড। তারপর আবার রপ্তানি হ্রাস পেতে থাকে—১৯১১-য় ১৫২.৩ মিলিয়ন পাউন্ড এবং ১৯১৪-য় দাঁড়ায় ১৯৮.৯ মিলিয়ন পাউন্ড।

৩৯. ১৯০১-২ থেকে ১৯০৫-৬ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের কাউন্টের সুতোর মোট উৎপাদনের তথ্য সম্বলিত নিচের সারণি থেকে চিত্রটি পরিষ্কার বোঝা যাবে :

সুতোর উৎপাদন ('০০০ পাউন্ডে)

	বোম্বাই শহর ও দ্বীপ	আমেদাবাদ	বোম্বাই শহর ও দ্বীপ, আমেদাবাদ ব্যতীত ব্রিটিশ ভারত
২১ কাউন্ট থেকে ৩০ কাউন্ট	২১৪,০১৪	১১৫,০১০	১০০,১২৩
৩১ কাউন্ট ও তার বেশি	১৬,৩০৫	৪৫,৬৫২	১৬,৪৪৪
সমস্ত ধরনের কাউন্টের সুতো একসঙ্গে ধরে-	১,৭১৮,৮৪৩	২৩৮,৫৭৫	৯২৯,১৫৬

সূত্র : Gov. India, CISD : *Financial and Commercial Statistics of British India,* 13th Issue (কলকাতা, ১৯০৭), পৃ. ৪১৫-১৯। উপরের সারণিতে ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে দেশীয় রাজ্যগুলি ধরা হয় নি।

৪০. Comming-এর রিপোর্ট অনুসারে ১৯০৮-এ বাংলায় ১৪ টি কাপড়ের কলের মধ্যে ৯ টিতে সুতো তৈরিব কাজ হতো এবং মাত্র দুটিতে ২৫ কাউন্টের বেশি সুতো উৎপাদন হতো। Cumming [IPG প্রকাশনা], *Review* দ্রষ্টব্য। যুক্তপ্রদেশে একই সময়ে ১১ টি কাপড়ের কলের মধ্যে মাত্র ৪ টিতে সুতো ও কাপড় তৈরির কাজ একসঙ্গে হতো । Chatterjee [IPG প্রকাশনা], *Notes*, পৃ. ৩ দ্রষ্টব্য।

৪১. *Indian Textile Journal*, এপ্রিল ১৯১৪-র সংখ্যায় প্রকাশিত Bombay Mill-owners' Association-এর বার্ষিক সভা সম্পর্কে সম্পাদকীয় এবং 'The Mill Industry in Bombay' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। পৃ. যথাক্রমে ২২২ ও ২২৫।

৪২. Gov. India, CSID : *Review of the trade of India for 1899-1900* (কলকাতা, ১৯০০), পৃ. ২৩-২৪। বোম্বাইয়ের মিল মালিকদের এই জড়তা লক্ষ্য করা যেত প্রধানত দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারের ক্ষেত্রে বিশেষত বয়নজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে। অথচ বিপরীতক্রমে পূর্ব আফ্রিকা ও পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে নতুন বাজার খোঁজার ব্যাপারে তাঁরা উল্লেখযোগ্য উৎসাহ ও উদ্যম দেখিয়েছেন। এর ব্যাখ্যা সম্ভবত এই যে, শেষোক্ত বাজারগুলিতে মিল মালিকরা তাঁদের তৈরি প্রচলিত ধরনের কোরা কাপড়ই বিক্রি করতেন। অন্যদিকে দেশীয় বাজার দখল করতে হলে তাঁদের উন্নত ও সূক্ষ্ম ধরনের কাপড় তৈরি করতে হতো এবং ল্যাঙ্কাশায়ারে প্রস্তুত পণ্যের প্রতিষ্ঠিত বিক্রেতাদের দিক থেকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হতো। পূর্ব আফ্রিকা এবং পশ্চিম এশিয়ার বাজারে বিক্রয় সম্প্রসারিত করার ব্যাপারে মিল মালিকদের প্রচেষ্টার বিবরণ পেতে হলে *Report of the Mill-owners' Association, Bombay, for the year 1901* (বোম্বাই, ১৯০৩), পৃ. ৭-৮ দ্রষ্টব্য।

৪৩. ১৯০৮-এ বাংলা ও যুক্তপ্রদেশেব শিল্প বিষয়ে যথাক্রমে Cumming ও Chatterjee-র রিপোর্ট দ্রষ্টব্য।

৪৪. Report of IIC (PP XVII, 1919), Appendix B, 'Draft Note on the Industrial Aspect of Cotton Growing in India,' বিশেষ করে, পৃ. ৩২৭-৮।

৪৫. J. MacKanna [ভাবত সরকার প্রকাশনা], *Agriculture in India*, পৃ. ৩৭।

৪৬. Sulivan, One Hundred Years of Bombay, পৃ ১৩২।

৪৭. এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৪৮. *Indian Textile Journal*, জানুয়ারি ১৯১৪, পৃ. ১১৪।

৪৯. *ITJ*, জানুয়ারি ১৯১৪, পৃ. ১২৭ ('The Textile Industry in Japan')। চীনের বাজারে জাপানিবা যেসব সুবিধা ভোগ করত সেগুলিব মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: তাদের স্থানীয ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান, বিদেশীদের কাছে অগম্য স্থানেও তাদের অনায়াস যাতায়াতেব ক্ষমতা (এটা হতো তাদের সঙ্গে চীনা জনসাধারণের আকৃতি বা চেহারাগত সাদৃশ্যেব.জন্যে), তাদের স্থানীয় রাষ্ট্রদূতের সহযোগিতা ও সমর্থন, ইত্যাদি। এর ফলে চীনা কল-মালিক বা বণিকদের তুলনায় জাপানি ব্যবসায়ীরা যথেষ্ট সুবিধাজনক অবস্থায় ছিলেন।

৫০. W. W. Lockwood, *The Economic Development of Japan* (প্রিন্সটন, নিউ জার্সি, ১৯৫৪), পৃ. ১৭২-৩।

৫১. দৃষ্টান্তের জন্যে দেখুন : G. C. Allen, *Japanese Industry : Its Recent Development and Present Condition* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৩১), পৃ. ৩১। 'সুতো তৈরির কাবখানাগুলিতে এক একটি চালকযন্ত্রে ১৯২৬-এ উৎপাদন হতো ৫,৭০০ পাউন্ড, ১৯২৯-এ তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭০০০ পাউন্ড, ১৯৩৫-এ ৯,৩০০ পাউন্ড। সুতো তৈরির কারখানার অন্তর্গত উইভিং শেড্‌স্‌গুলিতে ঐ একই বছরগুলিতে গড উৎপাদন হতো যথাক্রমে ২২,৩০০, ৩৬,০০০ এবং ৪৯,৫০০ গজ'।

৫২. I. Svennilson, *Growth and Stagnation in the European Economy* (জেনিভা, ১৯৫৫), সারণি ৩৫।

৫৩. উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য : A. S. Pearse, *The Cotton Industry of India, being the report of the journey to India* (ম্যাঞ্চেস্টার), ১৯৩০), পৃ ১৭২-৪। ইন্ডিয়ান ট্যারিফ বোর্ড ১৯৩২-এ সিদ্ধান্তে আসে যে, ভারতে প্রধান পণ্যগুলির উৎপাদনের একক প্রতি শ্রম-ব্যয় ল্যাঙ্কাশায়ারের তুলনায় সাধারণভাবে বেশি নয়। দ্রষ্টব্য : ITB, *Report regarding the grant of protection to cotton textile industry* (কলকাতা, ১৯৩২), পৃ. ১১৩। জাপানের ব্যয়ের সঙ্গে তুলনার জন্যে দ্রষ্টব্য : ঐ, পৃ. ২০৬, এবং Buchanan, *Development of Capitalistic Enterprise*, পৃ. ৩৮১।

৫৪. ITB, *Cotton Textile Industry Enquiry; 1927*, খণ্ড ১, *Report* (কলকাতা, ১৯২৭), অধ্যায় ১১-১৪ এবং Minute of Dissent by the President.

৫৫. B. N. Adarkar [Gov. India pub.], *The History of the Indian Tariff* (Studies in Indian Economics issued by the Office of the Economic Adviser, First Series, সংখ্যা ২, দিল্লী, ১৯৪০), পৃ. ২৮.।

৫৬. Adarkar [Gov. India pub.], *The History of the Indian Tariff,* পৃ. ৩৬।

৫৭. কৃত্রিম রেশম সুতো ও কাপড় অথবা ঐ সুতোর সঙ্গে তুলোর সুতোর মিশ্রণজাত পণ্য আমদানির উপর সংরক্ষণমূলক শুল্ক আরোপের প্রশ্নটি আমাদের বর্ণনায় উপেক্ষিত হয়েছে। তাঁদের তৈরি কাপড়ের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধির জন্যে তাঁতিরা অনেক সময় কৃত্রিম রেশম সুতো ব্যবহার করতেন। তুলো ও কৃত্রিম রেশমের মিশ্রণজাত সুতো ও কাপড়ের আমদানি শুল্ক কম হওয়ায় বিদেশী উৎপাদকরা প্রায়শই অল্প পরিমাণ কৃত্রিম রেশমের মিশ্রণ ঘটাতেন। এর ফলে নীতি প্রণয়নে ভারত সরকাব ও ভারতীয় ট্যারিফ বোর্ড অসুবিধার সম্মুখীন হয়। তাঁতির সরাসরি কোনো ক্ষতি হয় এমন কিছু উপায় অবলম্বন করতে তারা অনিচ্ছুক ছিল, যদিও ভারতীয় সুতি-বস্ত্র শিল্পের শুল্ক সংরক্ষণ কার্যকরী করার জন্যে ঐ রকম কোনো ব্যবস্থা তাদের নিতে হতে পারে। কিন্তু বস্ত্র-শিল্প সংরক্ষণের নীতিগুলিব একটি সাধারণ ঝোঁক ছিল উঁচু হারে শুল্ক আরোপের। হাতে চলা তাঁত শিল্পকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করার নীতিও নেওয়া হয়েছিল, যেমন আবও ভালো বাজারের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি, আর্থিক সাহায্যে নক্সা তোলার শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন এবং তাঁতিদের মধ্যে সমবায় সংগঠিত করা। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : Adarkar [Gov. India Pub.], *History of the Indian Tariff*, পৃ. ২৭-৪৬।

৫৮. Mehta, *The Cotton Mills of India,* পৃ. ১৮১-২।

৫৯. Gov. India, CISD : *Review of the trade of India for 1930-31* (দিল্লী, ১৯৩১), পৃ. ১৮। টাটা গ্রুপের একজন সদস্য, স্যার সোরাবজী সাকলাতওয়ালা, হিসাব করে দেখেন যে, এই বয়কট ৪৬০ মিলিয়ন গজ সুতির থান কাপড়ের এবং প্রায় ৬ মিলিয়ন পাউন্ড সুতোর আমদানি হ্রাসের জন্যে দায়ী। Mehta, *Cotton Mills of India*, পৃ. ১৭৮। ১৯২০-২১-এর অসহযোগ আন্দোলন ঐ একই ধরনের আমদানিকে কিছুটা প্রভাবিত করেছিল, কিন্তু তা খুব স্পষ্ট নয়। এর প্রধান কারণ, ভারতীয় বস্ত্র শিল্প সব রকমের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে যথেষ্ট প্রস্তুত ছিল না।

৬০. এখানে ব্রহ্মদেশ বাদে ভারতে আমদানির কথা বর্ণিত হয়েছে।

৬১. সারণি ৭.২ দ্রষ্টব্য। *Report of the Fact-finding Committee Handloom and Mills* (দিল্লী, ১৯৪২), অধ্যায় ১-এ বলা হয়েছে যে সংরক্ষণ হস্তচালিত তাঁতের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছে। এই তথ্যটি প্রশ্নসাপেক্ষ।

৬২. Davis, *Population of India and Pakistan,* পৃ. ২৭।

৬৩. সি আই এস ডি (ভারত সরকার) প্রদত্ত মাথা পিছু ভোগের হিসাব তুলনা করুন : *Review of the trade of India in 1936-37* (দিল্লী, ১৯৩৭), পৃ. ৪৩; ১৯৩২-৩৩ ছিল একটি ব্যতিক্রমী বছর, তার কারণ, সে সময়ে প্রভূত

পরিমাণে থানকাপড়ের আমদানি ঘটে, বিশেষত জাপান থেকে।

৬৪. Mehta, *Cotton Mills in India*, পৃ. ১৬৩।

৬৫. Sastry, *Statistical Study of India's Industrial Development*, পৃ. ৭৯-৮৪।

৬৬. *ঐ*, পৃ. ৮০-৫।

৬৭. Mehta, *Cotton Mills of India*, পৃ. ১৫৬।

৬৮. Pearse, *Cotton Industry of India*, পৃ. ১১৯-২০।

৬৯. বোম্বাইয়ের মিলগুলি সমৃদ্ধির বছরগুলিতে (boom years) অতিরিক্ত ডিভিডেন্ড দিচ্ছিল, এই বক্তব্য যুক্তিসম্মত মনে হতে পারে যদি দেখানো যায় যে সুতোকল শিল্পে লাভজনকভাবে বন্টিত মুনাফার টাকা বিনিয়োগ করা সম্ভবপর ছিল এবং ১৯২৩ থেকে যখন সংকট আরম্ভ তখন মুনাফার পুনর্বিনিয়োগের প্রয়োজন ঘটল না। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় মিল-মালিকরা, অন্তত ১৯২৬-এর পর থেকে, হাতে ধরে রাখা মুনাফার বিনিয়োগ সুবিবেচনার সঙ্গে করেছিলেন কিনা। দ্রষ্টব্য : ITB, *Cotton Textile Industry Enquiry, 1927*, খণ্ড ১, *Report* (কলকাতা, ১৯২৭), অধ্যায় ৬ ও ৭।

৭০. ভারতের সুতোকলের ম্যানেজিং এজেন্সিগুলির বিরুদ্ধে সব থেকে জোরালো অভিযোগের জন্যে দেখুন বোম্বাইয়ের বম্বে শেয়ার হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাক্ষ্য : ITB, *Cotton Textile Industry*, খণ্ড ২, *Views of the Local Governments*, etc. (দিল্লী, ১৯৩৪), পৃ. ১৮০-২৫১; আরও সুষম অথচ যথেষ্ট জোরালো অভিযোগের জন্যে দেখুন : ILO Studies and Reports, Series B, No. 27, *The World Textile Industry, Economic and Social Problems*, খণ্ড ১ (জেনিভা, ১৯৩৭), পৃ. ১৯৮-২০০; ITB, Cotton Textile *Industry Enquiry, 1927*, খণ্ড ১ (কলকাতা, ১৯২৭), পৃ. ৮৫-৯০; Buchanan, *Development of Capitalistic Enterprise in India*, পৃ. ১৬৫-৭১।

৭১. Mehta, *Cotton Mills of India*, পৃ. ১৬৯ ও ১৮০। বোম্বাইয়ের মিলগুলির অর্পিত মূলধনের (Paid-up Capital) পরিমাণ ১৯২২-২৩-এ ছিল ২০০ মিলিয়ন টাকা, ১৯২৯-৩০-এ এর পরিমাণ কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ১৫০ মিলিয়ন টাকারও কম, যদিও তখন তাদের উৎপাদন-ক্ষমতা প্রায় অপরিবর্তিত ছিল। ১৯৩৩-৩৪-এ বোম্বাইয়ের বহু সংখ্যক মিল অচল হয়ে পড়ে এমনকি করিমভয় গোষ্ঠীভুক্ত মিলগুলিও। একক ম্যানেজিং হাউস পরিচালিত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে এটিই ছিল সব থেকে বড়।

৭২. ITB, *Report on Cotton* (কলকাতা, ১৯৩২), অনুচ্ছেদ ১১০; Mehta, *Cotton Mills of India* পৃ. ১৭০ ও ১৭৯।

৭৩. ILO Studies and Reports, Series B, No. 29, Harold Butter, *Problems of Industry in the East with Special Reference to India*,

French India, Ceylon, Malaya and the Netherlands (জেনিভা, ১৯৩৮), পৃ. ২২-৩।

৭৪. ITB, Special Tariff Board : *Report on Cotton* (দিল্লী, ১৯৩৬), পৃ. ২২।

৭৫. Mehta, Indian. Cotton Textile Industry, পৃ. ২১ এবং পৃ. ২১-২-এর পাদটীকা।

৭৬. দ্রষ্টব্য : Gov. India, CISD : Review of the trade of India in 1939-40 (দিল্লী, ১৯৪০), পৃ. ৪০।

৭৭. বিভিন্ন সময়ে বোম্বাই ও অন্যান্য কেন্দ্রের মধ্যে মজুরির পার্থক্যের ধারণা পাওয়া যায় আই টি বি -র রিপোর্ট থেকে : ITB, *Cotton Textile Industry Enquiry,* খণ্ড ১ *Report* (কলকাতা, ১৯২৭), সারণি ৬৬; *Report of the Cawnpore Textile Labour Enquiry Committee* (এলাহাবাদ, ১৯৩৮), সারণি ৪; এবং Labour Investigation Committee ; *Report on an Enquiry into Conditions of Labour in the Cotton Mill Industry of India* by S. R. Deshpande. (দিল্লী, ১৯৪৬), পৃ. ৫-১২৯ ও পৃ. ১৯৭-৮।

৭৮. দ্রষ্টব্য : ITB, *Cotton Textile Industry,* খণ্ড ৪, *Oral Evidence given by the applicants for protection before the ITB* (দিল্লী, ১৯৩৪), পৃ. ৩। বম্বে মিল-ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি হিসাবে Mr. Saklavtala বলেন : 'বোম্বাইয়ে আমরা আমেদাবাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠি না, সেখানে কাপড় বিরঞ্জনের কাজ করেন স্থানীয় রজকরা। এই কারণে রঙিন সুতোয় তৈরি বিরঞ্জিত কাপড়ের ক্ষেত্রে বাণিজ্যের বড় অংশ ছিল আমেদাবাদের হাতে।' ১৯২৫-এর পর থেকে ভারতে তুলোকল শিল্প ছড়িয়ে পড়ার বিভিন্ন কারণগুলির আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য : Sastry, *Statistical Study of India's Industrial Development*, পৃ. ২২-৭; Mehta, *Structure of Indian Industries*, পৃ. ১৫৪-৬৮।

৭৯. ITB, Special Tariff Board : *Report on Cotton* (দিল্লী, ১৯৩৬), পৃ. ১৫।

৮০. Mehta তাঁর *Indian Cotton Textile Industry* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে দেখিয়েছেন, তুলোকল শিল্পের কাম্য আয়তন নির্ধারণ করা অসাধ্য, যে কোনো সময়ের পক্ষে এবং যে কোনো উৎপাদনকেন্দ্র বা বিভিন্ন ধরনের উৎপাদিত পণ্য-সমষ্টির ক্ষেত্রে এই ধারণাটি প্রযুক্ত হতে পারে।

৮১. ITB, *Report on Cotton* (কলকাতা, ১৯৩২), অনুচ্ছেদ ৯০।

৮২. ITB, *Cotton Textile Industry,* খণ্ড ৪, *Oral Evidence* (দিল্লী, ১৯৩৪), পৃ. ৭৬।

৮৩. ITB, Special Tariff Board : *Report on Cotton* (দিল্লী, ১৯৩৬), পৃ ১৯-২০।

৮৪. এই সূত্রে দেখুন : Buchanan, *Development of Capitalistic Enterprise in India*, পৃ. ২০৩। পশ্চিমের মিল নং ২৬ ও ২৭ সম্পর্কে আলোচনা পড়ুন : Pearse, *The Cotton Industry of India*, পৃ. ১৫০-৩।

৮৫. দ্রষ্টব্য : Gov. India, Ministry of Commerce and Industry : *Report of the Textile Enquiry Committee, 1958* (দিল্লী, ১৯৫৮), অধ্যায় ১০।

৮৫ ক. *Report of the Working Party for the Cotton Textile Industry* (দিল্লী, ১৯৫৩), Annexure C, পৃ. ১২৫।

৮৬. দ্রষ্টব্য : ITB, *Report on Cotton* (কলকাতা, ১৯৩২), অনুচ্ছেদ ১১৮।

৮৭. দ্রষ্টব্য : ILO, *World Textile Industry* খণ্ড ১ (জেনিভা, ১৯৩৭), পৃ. ২৪৫-৯।

৮৮. A. S. Pearse, *The Cotton Industry of Japan and China* (ম্যাঞ্চেষ্টার, ১৯২৯), পৃ. ২৫-৬।

৮৯. ILO, *World Textile Industry*, খণ্ড ১ (জেনিভা, ১৯৩৭), পৃ. ২০২।

৯০. *ঐ*, পৃ. ২০১।

৯১. *ঐ*, পৃ. ২০১-২।

৯২. Pearse, *Cotton Industry of India* পৃ. ১-১৪; এবং *idem* : *Cotton Industry of Japan and China*, পৃ. ১৪২-৩।

৯৩. *ঐ*, পৃ. ৮৩।

৯৪. ভারতীয় ও জাপানি শ্রমিকদের সুতো বা কাপড়ের একক প্রতি শ্রম-ব্যয়েব তুলনার জন্যে দেখুন : Buchanan, *Development of Capitalistic Enterprise*, পৃ. ৩৮১ (বুকাননের ব্যবহৃত পরিসংখ্যান ১৯২৮ সালের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তুলোকল শিল্পের সঙ্গে যাঁবা যুক্ত ছিলেন না তাঁদের অনুসন্ধানলব্ধ পর্যবেক্ষণগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় বোম্বাইয়েব Toyo Podar Mills-ব Mr. Sasakura প্রদত্ত সাক্ষ্য থেকে। এই সাক্ষ্য গ্রহণ কবে Fawcett Enquiry Committee। দ্রষ্টব্য . ITB, *Report on cotton* (কলকাতা, ১৯৩২), অনুচ্ছেদ ১০৬। ১৯৩২-এর শেষার্ধে Fuji Gas Spinning Company কর্তৃক সংগৃহীত পরি-সংখ্যান কলিন ক্লার্ক ব্যবহার করেন ৪০ পাক পর্যন্ত সুতো তৈরির শ্রম-ব্যয় পরিমাপের উদ্দেশ্যে এবং তাঁর হিসাবে ঐ ধরনের সুতো তৈরির প্রতি পাউন্ডে শ্রম-ব্যয় জাপানে ০.৫৩ পেন্স, যুক্তরাজ্যে ২.২০ পেন্স এবং ভারতে ২.৪৩ পেন্স। এই হিসাবের মধ্যে তুলনার ভিত্তি হিসাবে যে মজুরি-ব্যয়কে ধরা হয়েছে তা সম্ভবত বোম্বাই থেকে প্রাপ্ত। ভারতের অন্যান্য উৎপাদন-কেন্দ্রের শ্রম-ব্যয় বোম্বাইয়ের তুলনায় কম ছিল, সেই সব অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত কম মজুরি ও শ্রমের উৎপাদনশীলতা বিবেচনা করেও একথা বলা চলে। বিভিন্ন দেশের (যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ভারত) সুতো ও কাপড়ের মোট উৎপাদন-ব্যয়ের উপাদানগুলির মধ্যে তুলনার জন্যে দ্রষ্টব্য : ILO, *World Textile Industry*, খণ্ড ১ (জেনিভা, ১৯৩৭), পৃ. ২০৩-১৭। এই আলোচনায় (পৃ. ২১৫-১৭ ও

২৯৯-৩০০) দেখানো হয়েছে যে জাপানে ১৯২৭ থেকে ১৯৩২ ও ১৯৩২ থেকে ১৯৩৬ (এই বছর পর্যন্ত পরিসংখ্যান পাওয়া যায়) সময়কাল দুটিতে ঘণ্টায় টাকু পিছু এবং তাঁত প্রতি দৈনিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তথ্যাদির উৎস বিভিন্ন এবং সেগুলি সাধারণত ১৯২৩-৩৬ সময়সীমার অন্তর্গত কালাংশের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। পরিসংখ্যান থেকে এই সাধারণ ধারণাটি প্রতিপন্ন হয় যে তাঁত বা টাকু প্রতি শ্রমের দক্ষতা উন্নত হওয়ার ফলে শ্রম-ব্যয় কমে গিয়েছিল।

৯৫. Pearse, *Cotton Industry of India*, পৃ. ৯।

৯৬. *ঐ*, পৃ. ১২৫-৭।

৯৭. দ্রষ্টব্য ITB, *Cotton Textile Industry Enqiury*, খণ্ড ১, *Report* (কলকাতা, ১৯২৭), পৃ. ১৪৩-৫, এবং ITB, *Report on cotton* (কলকাতা, ১৯৩২), পৃ. ৬৫। উভয় ক্ষেত্রেই তাঁতি প্রতি স্বয়ংক্রিয় তাঁতের সংখ্যা অত্যন্ত কম করে ধরা হয়েছিল : Northrop looms-এর সংখ্যা প্রতিজন তাঁতির জন্যে ৪ বা ৫ যেখানে Binny Mills-এ, Pearse-এর মতানুসারে একজন তাঁতি ৬টি বয়নযন্ত্র চালাতেন। জাপানে একজন তাঁতি ৫০-টি Toyoda চালাতে পারতেন। স্বয়ংক্রিয় বয়নযন্ত্রের ব্যবহার অর্থনৈতিক নয় বলে বম্বে মিল-ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা মত দিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ করা সঙ্গত যে ইন্ডিয়ান ট্যারিফ বোর্ডের সভাপতি এই মতটি মানেননি। দ্রষ্টব্য ITB, *Cotton Textile Industry*, খণ্ড ৪, *Oral Evidence* (দিল্লী, ১৯৩৪), পৃ. ১০-১১।

৯৮. টাকু ও তাঁত সম্পর্কিত উপাত্তের জন্যে দেখুন, ILO, *World Textile Industry*, খণ্ড ১, পৃ. ৪৮-৫৬। ভারতীয় মিলে ল্যাঙ্কাশায়ারের পদ্ধতি অনুকরণ সম্পর্কিত তথ্যের জন্যে আরও দেখুন, Buchanan, *Development of Capitalistic Enterprise*, পৃ. ২০৩-৫।

৯৯. দ্রষ্টব্য : Pearse, *Cotton Industry of Japan and China*, পৃ. ১১-১২, এবং Butler, *Problems of Industry in the East*, পৃ. ২৪।

১০০. ITB, *Report on cotton* (কলকাতা, ১৯৩২) পৃ. ৭৪-৬, দেখুন। এক একটি কারখানার উৎপাদনের যুক্তিসঙ্গত পুনর্গঠনের (rationalization of production) প্রয়োজনের, কোনো কেন্দ্রীয় সংগঠনের মাধ্যমে একসঙ্গে বেশি পরিমাণ তুলো কেনার সুবিধার এবং অদক্ষ ইউনিটগুলি বর্জনের উপযোগিতার উপর আলোচনার জন্যে। শিল্পটির যুক্তিসঙ্গত পুনর্গঠনের প্রয়াস সম্পর্কে বিবরণ এবং তাদের ব্যর্থতার কারণগুলির আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য : P. S. Lokanathan, *Industrial Organization in India* (লন্ডন, ১৯৩৫), পৃ. ৩০৬-৮ এবং *Report of the Textile Labour Enquiry Committee* খণ্ড ২, *Final Report* (বোম্বাই, ১৯৪০), অধ্যায় ৮ ও ৯।

১০১. দ্রষ্টব্য : Mehta, *Cotton Mills of India*, পৃ. ৭৮-৯ ও ১৬৪।

অনুবাদক : জয়ন্ত আচার্য ও মনোজ কুমার সান্যাল।

৮

ভারতের পাটশিল্পে বেসরকারি বিনিয়োগ

৮.১ পাটশিল্প, ১৯০০-১৪

ভারতে পাটশিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় ডাণ্ডিতে ঐ শিল্প স্থাপনের কুড়ি বছরের মধ্যে এবং উন-বিংশ শতাব্দীর সমাপ্তিতে ভারতের এই শিল্পটি উৎপাদনের দিক থেকে নিশ্চিতভাবে ডাণ্ডিকে অতিক্রম করে যায়। ডাণ্ডি তার আধিপত্য বিনা সংগ্রামে ত্যাগ করেনি। তার প্রকাশ ঘটে শুধুমাত্র সাধারণ অর্থনৈতিক অস্ত্র ব্যবহারের মধ্যেই নয়, রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টিতেও। ১৮৯৪ সাল নাগাদ স্ব... হেস্টিংস্ মিলস্ রাতের শিফ্‌ট্ চালু করল, ডাণ্ডি চেম্বার অব কমার্স ভারতের সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে অভিযোগ করে যে, ভারতীয় মিল ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট লঙ্ঘন করছে এবং ঐ আইন যথাযথভাবে মানা হচ্ছে কিনা তা দেখার মতো দক্ষ পরিদর্শকও সাধারণত ঐ মিলগুলিতে থাকে না। ডাণ্ডির বর্ষীয়ান এম পি স্যার জন লেং চটকলগুলি পরিদর্শন করতে ভারতে আসেন। পরিদর্শন শেষে তিনি সপ্রশংস মন্তব্য করেন, 'এই মিলগুলিতে সব থেকে বেশি মজুরিপ্রাপ্ত দেশীয় শ্রমিকরা নিযুক্ত আছে। মেয়ে শ্রমিকদের রুপোর অলঙ্কারের আভরণ থেকে বোঝা যায় যে ওরা নিজেদের অভিজাত শ্রমিকদের পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করে।'[১] ভারতীয় চটকল ম্যানেজারদের শ্রম কল্যাণের নীতি সম্পর্কে স্যার জনের মতামত ডাণ্ডির সব মালিকদের সন্তুষ্ট করেনি। ১৯১২ সালে প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় ভারতীয় চটকলের অবিবেচনাপ্রসূত উন্নয়নের তীব্র সমালোচনা করা হয়।[২] যাইহোক, ডাণ্ডির অনেক ফার্ম ভারতীয় চটকলগুলিতে যন্ত্রপাতি সরবরাহে প্রবলভাবে আগ্রহী ছিল[৩] এবং এমনও কিছু ফার্ম ছিল যাদের ডাণ্ডির ও ভারতের উভয় পাটশিল্প সম্পর্কেই আগ্রহ ছিল। পাটের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল ডাণ্ডি। তার ফলে এই বৈরিতা কখনই খোলাখুলি সংঘর্ষের আকার ধারণ করেনি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষাবধি ভারতের পাটশিল্পে ব্রিটিশদের, বিশেষ করে স্কটিশ ব্যবসায়ীদের প্রায় সম্পূর্ণ আধিপত্য ছিল। ভারতীয় চটকলগুলির পরিচালকদের তালিকায় (*IIYB, 1911*, প্রথম সংখ্যা) শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ কানোরিয়া নামের মাত্র একজন ভারতীয় পরিচালকের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন তৎকালীন চটকলগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতম সুরা জুট মিলস্ কোম্পানি লিমিটেডের পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য। ১৯১০-এর ৩১ ডিসেম্বরে এই কোম্পানিটির নিট স্থাবর সম্পত্তির (নিট থোক ব্যয়) পরিমাণ ছিল ৭৮৫,৩৫৭ টাকা এবং ১৭৫টি তাঁত বা বয়নযন্ত্র।[৪] এই চটকলটি ছাড়া আর সব মিলগুলিই বড় বড় ব্রিটিশ বা ইয়োরোপীয় ম্যানেজিং হাউসগুলির দ্বারা পরিচালিত হতো। যেমন, অ্যানড্রু ইয়ুল অ্যান্ড কোম্পানি, বার্ড অ্যান্ড কোম্পানি, এফ ডব্লু হিলজার্স অ্যান্ড কোম্পানি (একজন

জার্মান পরিচালিত) টমাস ডাফ অ্যান্ড কোম্পানি, জার্ডিন, স্কিনার অ্যান্ড কোম্পানি, অ্যান্ডারসন, রাইট অ্যান্ড কোম্পানি এবং কেটল্ওয়েল, বুলেন অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯০০-র পরে গঠিত সমস্ত কোম্পানিগুলিব উদ্যোক্তা ছিল ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ বা ইয়োরোপীয় ম্যানেজিং হাউসগুলি। ভারতীয় মুদ্রায় বিনিয়োজিত মূলধনে এই কোম্পানিগুলি গঠিত হয়েছিল। এদের মূলধনের উৎস কী ছিল তা খুঁজে বের করা মুস্কিল, তবে অনুমান করা যায় যে, মূলধনের অধিকাংশই এসেছিল ভারতে অবস্থানকারী অথবা ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত ব্রিটিশ ব্যবসায়ী, সরকারি ও মিলিটারি অফিসারদের কাছ থেকে। কিন্তু পাট শিল্পে তখন সমৃদ্ধি চলছিল এবং কিছু পরিমাণ ভারতীয় মূলধনের বিনিয়োগও এই শিল্পে ঘটেছিল।[২]

পাটজাত পণ্য প্রস্তুত করার পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে সহজ এবং কাঁচাপাট উৎপাদনে ভারতের একচেটিয়া কর্তৃত্ব ছিল —এই বিষয়গুলি বিবেচনা করলে পাটশিল্পে ভারতীয় উদ্যোগের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিতে বিস্মিত হতে হয়। কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে উদ্যোগের অভাব ছিল অথবা মাড়োয়ারীরা শুধুমাত্র ব্যবসায়ে আগ্রহী ছিল, এ কথা বলাই যথেষ্ট নয়। তার কারণ ভারতের অপর প্রান্তে বহু পার্সী ও গুজরাটী শিল্পপতি বাণিজ্যে (বহু ক্ষেত্রে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য) থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন এবং তার পর সেই অর্থ শিল্পে বিনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি পাটশিল্পের ক্ষেত্রে ঘটল না কেন?

সমস্যাটির আংশিক ব্যাখ্যা নিহিত আছে নিম্নোক্ত পরিস্থিতির মধ্যে : পাট তুলোর মতো ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের উপকরণ ছিল না এবং তুলোর দেশীয় বাজার আগে থেকেই ছিল, কিন্তু কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্য উভয়ই ছিল রপ্তানিপণ্য। পাটজাত পণ্যের বাজার সন্ধান করে নিতে হতো,[৬] এবং এই সন্ধানের কাজ সে ধরনের ব্যবসায়ীরাই করতে পারতেন যাঁদের রপ্তানি বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। বোম্বাইতে নয়, বাংলায় রপ্তানি বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের হস্তচ্যুত হয়। বাংলায় কোনো ভারতীয়র নিজস্ব জাহাজ ছিল না, কিন্তু বোম্বাইতে বহু ভারতীয় ব্যবসায়ীর জাহাজের মালিকানা ছিল, এমন কি উনবিংশ শতাব্দী শেষ হয়ে গেলেও।[৭] পাট শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যবসায় টিকে থাকার মতো সব থেকে ছোট আকারের কারখানা স্থাপনের ব্যয়ও ভারতীয়দের পক্ষে বেশি ছিল কিনা, এই বিষয়টি সম্পর্কে কেউ কৌতূহলী হতে পারেন। ১৯৯০ থেকে ১৯১২ সাল নাগাদ একটি নতুন চটকলে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২০ লক্ষ টাকা। বিনিয়োগের এই অঙ্কটি অবশ্যই ছোট ভারতীয় শিল্পপতিদের দূরে সরিয়ে রাখার পক্ষে যথেষ্ট ছিল, কিন্তু বড় শিল্পপতিদের ক্ষেত্রে তা বাধা হিসাবে কাজ করেনি। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে উল্লেখ করা যায় যে, ভারতীয় পরিচালনাধীন এমনও সুতির কাপড়ের কারখানা ছিল যেখানে ২০ লক্ষ টাকা বা তারও বেশি মূলধন বিনিয়োগ করা হয়েছিল। প্রশ্নটির মীমাংসায় কেউ যুক্তি দিতে পারেন, ভারতীয় শিল্পপতিরা বস্ত্রশিল্পে বিনিয়োগকে তুলনামূলকভাবে নিরাপদ মনে করতেন। বিনিয়োগ সম্পর্কিত তথ্যাদি পরে আরও দেওয়া হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৬.৫-এ আমরা দেখেছি, পূর্ব ভারতে বসবাসকারী ইয়োরোপীয়দের নিয়ন্ত্রণে ছিল, অধিকাংশ পণ্যের রপ্তানি-আমদানি বাণিজ্য, নদী পরিবহণ ও উপকূলবর্তী জাহাজ পরিবহণ।[৮]

কলকাতার সঙ্গে পাট উৎপাদনকারী জেলাগুলির সংযোগ রক্ষাকারী রেলপথের পরিচালনায় ছিলেন ইস্টবেঙ্গল রেলওয়েজ ও অপর একটি বেসরকারি ব্রিটিশ কোম্পানির ব্রিটিশ অফিসাররা।[৯] বিনিময় ব্যাঙ্কগুলি (১৯১০-এ ই ডি স্যাসুনের দ্বারা স্থাপিত ফার্ম ইষ্টার্ন ব্যাঙ্ক ছাড়া) সম্পূর্ণভাবে ইয়োরোপীয় নিয়ন্ত্রেণে ছিল। দি ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল, বাংলার বৃহত্তম এই ব্যাঙ্কটি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। ব্যাঙ্কটির পরিচালনায় ছিল ইয়োরোপীয়রা। ১৮০৬-এ ব্যাঙ্কটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কয়েক বছর পর্যন্ত কোনো ভারতীয় পরিচালকের পদ পায়নি। পরিচালকদের মধ্যে ছিলেন কলকাতার বৃহত্তম ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসগুলোর অংশীদাররা।[১০] এই ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসগুলি পূর্ব ভারতের যে কোনো বাণিজ্যিক পণ্যের ব্যবসায় প্রকৃত পক্ষে আগ্রহ ছিল, পাটের ব্যবসায়ও তাদের সমান আকর্ষণ ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সূচনায় কিছু সংখ্যক ব্যাঙ্ক ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণে এসেছিল, কিন্তু ইয়োরোপীয়দের নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যাঙ্কগুলোর আধিপত্য মোকাবিলা করার মতো মূলধন বা যোগাযোগ তাদের ছিল না।

ইয়োরোপীয় (এবং আর্মেনিয়ান) ব্যবসায়ীরা পাটের বাণিজ্যের প্রতিটি স্তরে জড়িত ছিল—যেমন চাষীদের কাছ থেকে পাট কেনা থেকে আরম্ভ করে বিদেশে পাট ও পাটজাত পণ্য জাহাজে পাঠানো পর্যন্ত। পাট শিল্পের মূল কেন্দ্র হিসাবে ডাণ্ডির ভূমিকার যখন অবসান ঘটেছে, তারও অনেক কাল পরে লন্ডন গড়ে ওঠে কাঁচা পাট আমদানি রপ্তানির কেন্দ্র হিসাবে এবং কাঁচা পাট ও তন্তুর গুণগত মান নির্ধারক হিসাবেও।[১১] পাটের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইয়োরোপীয়দের আধিপত্য টের পাওয়া যেত গ্রাম ছেড়ে সিরাজগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও কলকাতার মতো বড় বাজারে এলে।[১২] ইয়োরোপীয়রা ব্যবসার প্রতিটি স্তরে সংগঠিত হয়েছিল বাণিজ্যিক সংঘ গঠনের মাধ্যমে। এই সব বাণিজ্যিক সংঘের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক্যালকাটা জুট ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন, ক্যালকাতা জুট ফেব্রিক্স্ ব্রোকার্স' অ্যাসোসিয়েশন, ক্যালকাটা জুট ফেব্রিক্স্ শিপার্স' অ্যাসোসিয়েশন, বেল্ড জুট শিপার্স অ্যাসোসিয়েশন (১৯২৬-এ নতুন নাম দেওয়া হয় ক্যালকাটা বেল্ড জুট শিপার্স অ্যাসোসিয়েশন) ক্যালকাটা বেল্ড জুট অ্যাসোসিয়েশন এবং দি ইন্ডিয়ান জুট মিল্স্ অ্যাসোসিয়েশন (২৫ শে জুলাই ১৯০২ পর্যন্ত পরিচিত ছিল ইন্ডিয়ান জুট ম্যানুফ্যাকচার্স্' অ্যাসোসিয়েশন হিসাবে)।[১৩] অনেকগুলি সংঘে দি ইন্ডিয়ান জুট মিল্স্ অ্যাসোসিয়েশনের (আই জে এম এ) প্রতিনিধি ছিল (যেমন জুট ফেব্রিক্স ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশনে)।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে এবং তাদের সঙ্গে সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি ছিল ব্যবসায়িক স্বার্থ ও ভাষার সমতা এবং সব থেকে উল্লেখযোগ্য, ভারতীয়দের সঙ্গে তাদের সামাজিক ব্যবধান। ব্যবসার ক্ষেত্রের সংঘাত কিছু ঘটলেও তার তাৎক্ষণিক সমাধান ঘটত বাজার বেড়ে চলছিল বলে। সরকারের আগ্রহ ছিল পাট পরিবহণের মাধ্যমে রেলখাতে রাজস্ব বৃদ্ধিতে। সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে বণিক ও মিল-মালিকদের সংযোগ স্থাপনে কোনো বাধা ছিল না, বিশেষ করে কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, অথবা রেলওয়েজের মতো দপ্তরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে। পাট পরিবহণের ক্ষেত্রে ওয়াগনের যদি কোনো অভাব ঘটত তবে তা দূর করতে আই জে এম এ-এর কমিটির সঙ্গে রেলের একজন উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তির একটি মামুলি সভাই যথেষ্ট ছিল। বন্দরে পাটের গুদামের জায়গার অভাব থাকলে কর্মকর্তাদের মধ্যে আরও

একটি সভার আয়োজন করা যেত (সাধারণত ক্যালকাটা পোর্ট কমিশনার্সে আই জে এম এ-এর একজন প্রতিনিধি থাকত)।[১৪] সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে এরকম পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকার ফলে ভারতীয় বণিকদের বিরুদ্ধে কোনো নিয়মমাফিক বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণের প্রয়োজন হতো না। কিছু সংস্থা ইয়োরোপীয়দের সদস্যপদ দেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণমূলক বিধি জারি করেছিল।[১৫] ভারতীয়দের সম্পর্কে এরকম কোনো প্রকাশ্য নিয়ম না থাকলেও কোনো সংগঠনে তাদের অনুপ্রবেশের বিস্তার অসুবিধা ছিল। ১৯৪৭ পর্যন্ত বাংলা মাদ্রাজ ও করাচির চেম্বার অব কমার্সের ইতিহাস তার যথেষ্ট সাক্ষ্য দেয়।

কাঁচা পাট পণ্যের বাণিজ্য নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার বিভিন্ন কোম্পানিগুলির প্রায় একই রকম উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলির উপর নির্ভর করত না : কাঁচাপাটের জাহাজী পরিবহণে বহু ফার্মের যতটা ব্যবসায়িক স্বার্থ জড়িত ছিল ততটাই তাদের স্বার্থ ছিল পাটজাত পণ্য উৎপাদনে।[১৬] চা ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে অ্যানড্রু ইয়ুল অ্যান্ড কোম্পানি দুটি জাহাজের কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছিল পূর্ব বাংলা ও আসাম থেকে পাট, চা ও অন্যান্য মাল পরিবহণের উদ্দেশ্যে।[১৭] বেশির ভাগ বৃহৎ পরিচালন সংস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে কয়লার ব্যবসায় জড়িত ছিল এবং বড় ও উন্নতমানের খনিগুলি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই ইয়োরোপীয় কোম্পানিগুলিব নিয়ন্ত্রণে ছিল। কোম্পানিগুলি সংগঠিত হয়েছিল ইন্ডিয়ান মাইনিং অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। জ্বালানির উৎপাদন-ব্যয়কে প্রভাবিত কবার ক্ষমতা স্বভাবতই তাদের ছিল। বৃহত্তর ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসগুলির যথেষ্ট মাত্রায় ব্যবসায়িক স্বার্থ নিহিত ছিল চা শিল্পে, এবং চা বাগান ও কয়লাখনির প্রয়োজনে দরিদ্র অঞ্চল থেকে অল্প মজুরিতে শ্রমিক নিয়োগের সমস্যা সম্পর্কে তারা ওয়াকিবহাল ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে চা বাগান ও কয়লাখনিগুলি চটকলের তুলনায় অনেক বেশি শ্রমিক নিয়োগ করত। ঐ সব শিল্পের তুলনায় চটকলে শ্রম নিয়োগের সমস্যা অনেক কম ছিল। তার কারণ ছিল, কলকাতার সঙ্গে শ্রম-যোগানকারী জেলাগুলির অপেক্ষাকৃত ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং কলকাতার আকর্ষণ। তাছাড়া, চা বাগান ও কয়লাখনির তুলনায় পাট শিল্পে মজুরি সামান্য কিছু বেশি ছিল। ১৮৯৫-এ বাংলার সরকার যখন কয়লাখনি শিল্পে শ্রম যোগানের সমস্যা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্যে একটি কমিশন গঠন করে এবং আবার যখন ১৯০৫-এ সরকার শ্রম সংক্রান্ত সমস্যা অনুসন্ধান করে, চটকলগুলি বিশেষ কোনো আগ্রহ প্রকাশ করেনি। তার কারণ, মিল-মালিকদের একমাত্র সমস্যা ছিল গ্রীষ্মকালীন তিনটি মাসে শ্রমের যোগানে ঘাটতি মোকাবিলা করা। শ্রমের যোগানে দীর্ঘকালীন ঘাটতির কোনো প্রশ্নই ছিল না।[১৮]

ইয়োরোপীয় চটকল মালিকদের পাট উৎপাদনের উপর কোনো প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ছিল না যদিও উৎপাদনের উপরই নির্ভর করত তাদের নিজস্ব সমৃদ্ধি ও কাঁচা পাটের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি। তাদের বরাবরই আগ্রহ ছিল উৎপাদন বৃদ্ধিতে।[১৯] পাট চাষের এলাকা এবং পাটের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রয়াস নেওয়ার জন্যে তারা সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করত। তারা সুপারিশ করেছিল, প্রয়োজন হলে সরকার অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন পাট রপ্তানির উপর অল্প কিছু কর আরোপের মাধ্যমে। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার সরকারি কৃষি দপ্তর সুনাম

অর্জন করেনি। ব্যয়সাপেক্ষ সরঞ্জাম ও বিদেশী পদ্ধতির সাহায্যে কিছু অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা-চালিয়ে সরকার অর্থের অপচয় ঘটায়।[২০] চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং সরকারের রাজস্ব চাহিদা প্রায় অপরিবর্তনীয় থাকায় বাংলার কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টায় ভারত সরকার প্রত্যক্ষভাবে উদ্‌যোগ নিতে আগ্রহ বোধ করত না। একই কারণে সরকার চাষীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি এবং রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তারা সরকারের এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন সার্ভিস'-এর সীমিত সুযোগের সঠিক ব্যবহারও করেননি। তাছাড়া সেচের ক্ষেত্র বিস্তার করে পাট চাষ বাড়ানোরও কোনো আশু সম্ভাবনা ছিল না। তার কারণ, আর্থিক দিক থেকে বাংলায় সরকারি সেচ ব্যবস্থা আদৌও লাভজনক নয় প্রমাণিত হয়েছিল । কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে, যখন জে মলিসন কৃষি বিভাগের ইনসপেক্টর জেনারেল পদে নিযুক্ত হলেন, সরকার কৃষি উন্নয়নে অনেক বেশি সক্রিয় উৎসাহ দেখাতে থাকলেন। তার অল্প কাল পরেই পুসাতে এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হলো, এবং আর এস ফিনলো ১৯০৪-এ বাংলার তন্তু বিশেষজ্ঞের (Fibre Expert) পদে নিযুক্ত হলেন।[২১]

ফিনলো এবং তাঁর সহকারীরা বর্ধমান ও কটকে পাট চাষের বিভিন্ন দিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তাঁরা পাটের বিভিন্ন প্রজাতির শ্রেণীবিন্যাস করেন এবং দুটি প্রধান শ্রেণীর পাট *করকোরাস ক্যাপসুলারিস* ও *করকোরাস অলিটোরিয়াস*-এর মধ্যে পার্থক্য সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করেন। ফিনলো ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করেন এবং কোন জেলাগুলি পাটচাষের পক্ষে কতটা উপযুক্ত তা পরীক্ষা করে দেখেন। তাঁর সহকারীরা বিভিন্ন অবস্থায় (উঁচু বা নিচু জমিতে, বিভিন্ন ধরনের সার ব্যবহার করে বা না করে) বিভিন্ন ধরনের পাটের উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন। তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন যে, বর্ধমানের খামারে 'কাক্য বোম্বাই' শ্রেণীর পাট সব থেকে ভালো ফলন দিচ্ছে। কিন্তু এই জাতীয় পাটের একর প্রতি উৎপাদন যে কোনো অবস্থায় সর্বোচ্চ হত না এবং চাষীরাও প্রচুর পরিমাণে উন্নতমানের সারের পরিবর্তে খামারেই প্রস্তুত করা নিম্নমানের সার পাট চাষে ব্যবহার করতে বেশি আগ্রহী ছিল। ফলে ইয়োরোপীয় পাটের দালালরা বীজ বন্টনের মারফৎ উৎপাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্যে চাষিদের যতই উৎসাহ দিক না কেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত বাংলায় পাটের গড় উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেনি।[২২]

যাইহোক, পাটের তন্তুর মোট যোগানের পরিমাণ যা ছিল তাতে কলকাতার চটকলগুলির প্রকৃতপক্ষে উদ্বেগের কোনো কারণ ছিল না। পাট চাষের ক্ষেত্রের বিস্তার নির্ভর করত দামের উপর, বিশেষ করে পাট ও ধানের দামের অনুপাতের উপর। তার কারণ পাট ধানের প্রতিযোগী শস্য।[২৩] উপরন্তু, পাট চাষের এলাকার প্রাক-যুদ্ধকালীন আয়তন ১৯০৭-৮-এ যদিও সর্বোচ্চ ছিল, ১৯১২-১৩-এ উৎপাদনের পরিমাণ ঐ বছরের তুলনায় বেশি ছিল। ভারতের চটকলগুলিতে পাটের ব্যবহার প্রায় অবিচলভাবে বাড়তে থাকে ১৮৯৯-১৯০০ থেকে। পাটের ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ২,২৪৮,০০০বেল্‌স্ (১ বেল = ৪০০পাউন্ড)। ১৯০৯-১০ তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪,৪৫৯,০০০বেলে। ১৯১০-১১ ও ১৯১১-১২ সালে বৃদ্ধির এই প্রবণতায় ছেদ পড়ে কিন্তু তারপর থেকে পাট ব্যবহারের পরিমাণ বেড়ে পূর্ববর্তী রেকর্ডকে অতিক্রম করে যায়।[২৪]

সাধারণত কলকাতার চটকলগুলিকে সুলভে কাঁচামাল পাওয়ার জন্যে পাটের বাণিজ্যে অথবা চাষীদের কাজে হস্তক্ষেপ করতে হতো না। চাষীরা সংঘবদ্ধ ছিল না। পূর্ববঙ্গের চাষীদের মধ্যে সমবায় আন্দোলন গড়ে ওঠেনি এবং চাষীরা পণ্য বিক্রয়ের দরুন যে দাম পেত তার উপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ১৯১৪-এ পাটের দাম হঠাৎ খুব পড়ে গেলে ঢাকার কালেক্টর চাষীদের ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে ২৫০,০০০ টাকা ঋণ দেওয়ার প্রস্তাব করেন। কিন্তু আই জে এম এ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে (প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন যখন জড়িয়ে পড়ল ভারতের পাটের রপ্তানি আকস্মিকভাবে ৫০ শতাংশেরও বেশি কমে গিয়েছিল)। কমিটির মূল অভিযোগ ছিল, এই ধরনের ঋণ রায়তদের পাট মজুত করতে উৎসাহী করবে এবং এ রকম ধারণা সৃষ্টি হবে যে, পাটের দাম একটি নির্দিষ্ট সীমার নিচে নেমে গেলে সরকার তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের মাধ্যমে কমিটির প্রতিবাদ জানার পরে বাংলার সরকার ঋণের পরিমাণ কমিয়ে ১২৫,০০০ টাকা মঞ্জুর করে।[২৫]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে চটকলগুলিকে অন্য কোনো ব্যবসায়িক স্বার্থের মোকাবিলা করতে হয়নি, এই ধারণা বাস্তবসম্মত নয়। যেমন, পরিবহণের সমস্যাকে কেন্দ্র করে স্বার্থের সংঘাত দেখা দেয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে পূর্ব ভারতের রেল ব্যবস্থার উপর চাপ অতিরিক্তভাবে বাড়তে থাকে এবং ওয়াগনের বণ্টনকে কেন্দ্র করে পাটের বাণিজ্যের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধত অন্যান্য বাণিজ্যের, যেমন কয়লার।[২৬] আই জে এম এ-র স্টিমার কোম্পানিগুলির সঙ্গে চুক্তি ছিল পাট পরিবহণের মাশুল ও অন্যান্য শর্ত সম্পর্কে। কোনো কোনো সময়ে এই চুক্তি ভেঙে যেত এবং তখন মিলগুলি স্টিমার কোম্পানির সঙ্গে পৃথকভাবে চুক্তিবদ্ধ হতো।[২৭] কিন্তু সে রকম ঘটনা কদাচিৎ ঘটত। সম্ভবত মিলমালিকদের সংঘবদ্ধভাবে চলার ক্ষমতা, ম্যানেজিং এজেন্টস্‌দের চটকলে ও স্টিমার কোম্পানিতে ব্যবসায়িক স্বার্থের অভিন্নতা এবং রেলওয়েজের দিক থেকে প্রতিযোগিতা চুক্তি ভঙ্গের সমস্যাকে অনেকটা লাঘব করেছিল। পাটজাত পণ্য যে কোম্পানিগুলি জাহাজযোগে বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করত তাদের সঙ্গে পাটের অন্যান্য ব্যবসায় নিয়োজিত সংস্থাগুলির কোনো কোনো সময়ে মতভেদ ঘটত।

কিন্তু ব্যবসায়িক স্বার্থের পারস্পরিক বিরোধিতা সত্ত্বেও আই জে এম এ-র সংঘবদ্ধভাবে বক্তব্য রাখার ও কাজ করার ক্ষমতা অটুট ছিল। ঐক্যবদ্ধ থাকার সব থেকে বড় প্রমাণ পাওয়া যায় স্বল্পমেয়াদী চুক্তিগুলির মধ্যে। দাম স্থির করার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত বিভিন্ন চুক্তিগুলি ব্যর্থ হলে ১৮৮৫-র ৩০শে ডিসেম্বর ইন্ডিয়ান জুট ম্যানুফ্যাকচারার্স (পরবর্তীকালে মিলস্) অ্যাসোসিয়েশন প্রথম একটি স্বল্পমেয়াদী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।[২৮] মিলগুলির মধ্যে সম্পাদিত এই চুক্তির প্রকারভেদ লক্ষ্যণীয়.: যেমন নির্দিষ্ট শতাংশে কিছু তাঁত ও টাকুর অবলুপ্তি, মিলগুলি বন্ধ রাখার দিনগুলির সংখ্যা নির্ধারণ, মিলগুলি চালু রাখার সর্বোচ্চ সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া, ইত্যাদি। চুক্তিটির তাৎপর্যপূর্ণ একটি শর্ত অনুযায়ী-পরিচালকবর্গ মেনে নেন যে, মিলগুলির উৎপাদন ক্ষমতা কোনোভাবেই বাড়ানো হবে না যত দিন পর্যন্ত সেটি বৈধ থাকবে। এই চুক্তি শুধুমাত্র উৎপাদন নিয়ন্ত্রণেরই প্রয়াস নয়, সম্প্রসারণশীল বাজারে

বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণেবও। একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, আমাদের আলোচ্য সময়কালের বেশির ভাগ অংশে কাজের সময় সম্পর্কিত চুক্তিটির সফল প্রয়োগ ঘটে। বিভিন্ন পরিচালন কমিটি মেনে নিয়েছিল যে, কাজের সময় ঘটিত চুক্তিটি সব থেকে গুবুত্বপূর্ণ এবং ঐ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া অনিবার্য।[২৯] নবাগত কোম্পানির অনুপ্রবেশের ফলে শিল্পটির সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে যে সীমা আরোপিত হয তাব মধ্যে থেকেও আই জে এম এ প্রায় অধিকাংশ সময়ে প্রায় একচেটিয়ামূলক সংস্থা হিসাবে কাজ করতে সমর্থ হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধেব আগে সাধাবণত মিল চালু রাখার সময়ের হেরফের হতো সপ্তাহে ৭৫থেকে ৯০ ঘন্টার মধ্যে, কিন্তু ১৯১০-১১-এ ঐ সময হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ৪৮ ঘন্টায়।[৩০] পরবর্তীকালে বহু মিল স্বল্পমেয়াদী চুক্তিটি মেনে চলতে ব্যর্থ হয়। মিলগুলি অপেক্ষাকৃত বেশি দামে প্রভূত পরিমাণে আগেই পাট ক্রয় করেছিল এবং করেছিল এবং স্থির ব্যয় (Overhead Costs) এবং পাটের বিপুল মজুতের কারণে উৎপাদন ও কাজের সময় হ্রাস করতে ব্যর্থ হয়, কিন্তু মিলগুলির উৎপাদনেব সামগ্রিক পরিমাণের কার্যকরী হ্রাস ঘটে এবং গুনচটের বাজারে আবার তেজি ভাব দেখা যায়।[৩১]

বৃষ্টিগতভাবে মিলগুলির ভাগ্য অনেকটাই নির্ভর করত কাঁচা পাট ও প্রস্তুতকরা পণ্যের মজুত সংক্রান্ত পরিস্থিতির উপর। ফসল ওঠার আগের ও অব্যবহিত পরের মাসগুলির মধ্যে পাটের দামের যথেষ্ট পার্থক্য থাকত। দামের বিপুল পরিবর্তন বছরে বছরেও ঘটত। এই পরিস্থিতিতে মিলগুলির কোনো প্রকল্পের সাফল্য নির্ভর করত কাঁচা পাট কেনার পরিমাণ ও সময়ের সঠিক নির্ধারণের যোগ্যতার উপর। অতএব পাটের বাৎসরিক উৎপাদন সম্পর্কিত বাংলা সরকারের আগাম অনুমানের নির্ভরযোগ্যতার সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে ছিল মিলগুলির ব্যবসায়িক কার্যকলাপ।[৩২] একই কারণে পাটের স্থিতিশীলতা মিলগুলির ব্যবসায়িক স্বার্থের দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত পাটের বাণিজ্য প্রধানত ইয়োরোপীয়দের হাতে ছিল, মিলগুলি মন করত যে, ফাটকা কারবারের কিছুটা চলন থাকা ব্যবসাব পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর।[৩৩]

১৮৯৫ থেকে পাট শিল্পের সমৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। চূড়ান্ত সমৃদ্ধির বছরগুলিতে, যেমন ১৯০৬ ও ১৯০৭-এ সাধারণ শেয়ারের ক্ষেত্রে ডিভিডেন্ডের হার ২৫ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছিল। বজবজ অ্যানড্রু ইয়ুল পরিচালিত), হাওড়া (আর্নস্ট্ হিউসেন লিমিটেড), ফোর্ট গ্লস্টার (কেট্ল্ওয়েল বুলেন), স্ট্যান্ডার্ড (বার্ড অ্যান্ড কোম্পানি), এবং ইউনিয়ন (বার্ড অ্যান্ড কোম্পানি)—এই সব চটকলগুলির ক্ষেত্রে ১৯০১ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত ডিভিডেন্ডের গড় হার ১২ শতাংশের বেশি ছিল।[৩৪] শিবপুর জুট কোম্পানির অবলুপ্তি এবং সাময়িক মন্দার উদ্ভব হওয়া সত্ত্বেও *IIYB, 1911* (পৃ.৬৮) শিল্পটির মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা সম্পর্কে আশাবাদী ছিল :

চটকলে সাধারণ মূলধনে যাঁরা বিনিয়োগ করেন তাঁদের নজর দেওয়া উচিত কোনো বিশেষ বছরের প্রতিদানের পরিবর্তে অনেকগুলি বছরের গড় প্রতিদানের দিকে এবং কোনো বিনিয়োগকারী তাঁর নিয়োজিত অর্থের অন্তত ৭ শতাংশ বাৎসরিক প্রতিদান লাভে নিশ্চিত থাকতে পারেন যদি তাঁর ক্রয়-দাম খুব বেশি না হয়।

গড় প্রতিদানের পরিমাপটি সমর্থিত হয় এই তথ্যের দ্বারা যে অধিকাংশ কোম্পানির মূলধনের উল্লেখযোগ্য অংশ (প্রায় সাধারণ মূলধনের পরিমাণের সমান) অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার মূলধন। এই ধরনের শেয়ার মূলধনের দরুন ডিভিডেন্ড দিতে হতো বছরে ৭ শতাংশ (অল্প ক'টি কোম্পানির ক্ষেত্রে ৬ শতাংশ)।

১৯০৫-৬ থেকে ১৯১৩-১৪ সময়কালের মধ্যে পাটশিল্পে স্থির বিনিয়োগের বৃদ্ধির কোনো স্পষ্ট প্রবণতা পাওয়া যায় না। ঐ বিনিয়োগ সর্বোচ্চ ছিল ১৯১৩-১৪-এ, প্রকৃত বা আর্থিক মূল্যে। (দ্রষ্টব্য সারণি ৮.১)। শিল্পটিতে বিনিয়োগ সম্প্রসারণের এই ধরনটি এসেছে কলকাতার ম্যানেজিং এজেন্সি সংস্থাগুলির সংঘবদ্ধভাবে নিয়ন্ত্রণের এই রকম চেষ্টা থেকে অনুমিত চাহিদার পরিমাণের থেকে সৃষ্ট উৎপাদনক্ষমতা প্রথমে সামান্যই বেশি থাকবে, তারপর চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের প্রক্রিয়া চলবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আবার চাহিদা উৎপাদন-ক্ষমতাকে অতিক্রম করে। শিল্পটির স্পন্দিত সম্প্রসারণের এই বিশেষ ধরনটির উৎপত্তি ঘটেছিল উৎপাদনের বিভিন্ন এককগুলির আয়তনগত সমস্যা থেকে : পুরনো কারখানায় স্থানাভাব অথবা ইমারত পুনর্গঠনে অতিরিক্ত ব্যয়ের কারণে উৎপাদন-ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটানো অনেক সময়ে দুঃসাধ্য ছিল। অপর দিকে, নতুন ইউনিটগুলির ন্যূনতম উৎপাদন-ক্ষমতা অর্জনের সমস্যা ছিল।[৩৫] ১৮৯৬ থেকে ১৯০০-র মধ্যে দশটি নতুন চটকল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর মধ্যে একটি (ডেল্টা) পুনর্গঠিত হয়েছিল পুরনো চটকল (সিরাজগঞ্জ) থেকে। একটি নতুন কোম্পানি (অ্যাংলো ইন্ডিয়ান) অপর একটি মিলকে (গর্ডন টুইস্ট মিল) আত্মভূত করে। আরও একটি মিল (অ্যারাথুন) ১৯১০-১১-র সংকটকালে শিবপুর মিলের সঙ্গে প্রায় অবসিত হয়। এই দশটি মিলের মধ্যে অ্যাংলো-ইন্ডিয়া নিবন্ধভুক্ত হয় যুক্তরাজ্যে এবং গোন্‌ডোলপারা মিলটি ফ্রান্সে। অবশিষ্ট আটটি মিল নিবন্ধভুক্ত হয় ভারতে। ১৯০১ থেকে ১৯০৮-এর মধ্যে আরও নয়টি মিল প্রতিষ্ঠিত হয়। সব ক'টি মিল ভারতেই নিবন্ধভুক্ত হয়। ১৯০১ থেকে ১৯১৪-র মধ্যে আরও তিনটি মিলের প্রতিষ্ঠা ঘটে। এর মধ্যে একটি ছিল আমেরিকান মিল। মিলটির উদ্যোক্তা ছিল টমাস ডাফ অ্যান্ড কোম্পানির অধীনস্থ মিলগুলির প্রাক্তন ম্যানেজার।[৩৬] নতুন মিলগুলি যখন চালু করা হচ্ছে, পুরনো ইউনিটগুলিরও তখন উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটছিল।

বেশির ভাগ মিলের মূলধন সংগৃহীত হয়েছিল ভারতের আবাসিক বিনিয়োগ-কারীদের কাছ থেকে : পরিমাপ অনুযায়ী ১৯০৯-এ ১০ মিলিয়ন পাউন্ডের আর্থিক মূলধন (ইক্যুইটি ও ডিবেঞ্চার) নিয়োজিত ছিল হুগলি নদীর তীরবর্তী পাটশিল্পে। যুক্তরাজ্যে নিবন্ধভুক্ত আটটি কোম্পানিতে প্রায় ২.৮ মিলিয়ন পাউন্ডের বিনিয়োগ ঘটেছিল। এর মধ্যে অধিকাংশ পরিমাণ বিনিয়োজিত হয়েছিল ১৯০০-র আগে।[৩৭] প্রাথমিক মূলধনের অনেকটাই সম্ভবত এসেছিল ম্যানেজিং এজেন্টস্‌দের কাছ থেকে। কিছু কোম্পানি কার্যকরী মূলধনের সমস্ত অর্থই প্রকৃতপক্ষে একই ভাবে সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু কার্যকরী মূলধনের অনেকটা পরিমাণ[৩৮] নিয়মিতভাবে বেড়ে যেত পাটের ফসল ওঠার পরে এবং কমত পরবর্তী ফসল ওঠার সামান্যকাল আগে। এই কারণে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম ছিল। ব্যাঙ্কের সুদের হার পাটের বাণিজ্যের পরিমাণ পরিবর্তনে যথেষ্ট সাড়া দিত।[৩৯]

সারণি ৮.১ বাংলার পাটশিল্পে মোট স্থির বিনিয়োগের যথাযথ পরিমাপ, ১৯০৫-৬ থেকে ১৯৩৮-৩৯

সময়	বাংলায় পাটশিল্পে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির আমদানি ('০০০ টা.)	বাংলায় পাটশিল্পে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির নিয়ন্ত্রিত আমদানি ('০০০ টা.)	যুক্তরাজ্য থেকে বাংলায় রপ্তানিকৃত বয়নশিল্পে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির দামের সূচক সংখ্যা (১৯০৪=১০০ টা.)	বাংলায় আমদানিকৃত পাটশিল্পে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির 'প্রকৃত' মূল্য ('০০০ টা.)	পাট শিল্পে প্রকৃত বিনিয়োগের মোট মূল্যের হিসাব ('০০০ টা.)
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)=(৪)×১.৭২
১৯০৫-৬	১২৭,৯৭	১১৭,২২	৯৮.৫২	১১৮,৯৮	২০৪,৬৫
১৯০৬-৭	১০৪,২১	৯৫,৪৫	১০০.৩২	৯৫,১৫	১৬৩,৬৬
১৯০৭-৮	১০৮,০৫	৯৮,৯৭	১০৫.৬৬	৯৩,৬৭	১৬১,১১
১৯০৮-৯	১৩৯,২৬	১২৭,৫৬	১০৯.২১	১১৬,৮০	২০০,৯০
১৯০৯-১০	৮৫,০৪	৭৭,৯০	১১২.৩১	৬৯,৩৬	১১৯,৩০
১৯১০-১১	৭৭,৫০	৭০,৯৯	১২৫,৬৮	৫৬,৪৮	৯৭,১৫
১৯১১-১২	৪৫,২৯	৪১,৪৯	১২৫.২৭	৩৩,১২	৫৬,৯৭
১৯১২-১৩	৮৬,৩৬	৮৬,৩৬	১১২.২০	৭৬,৯৭	১৩২,৩৯
১৯১৩-১৪	১৪৫,৬৫	১৪৫,৬৫	১০৫.২০	১৩৮,৪৫	২৮৩,১৩
১৯১৪-১৫	৮৭,৪৩	৮৭,৪৩	১০০.৯৯	৮৬,৫৭	১৪৮,৯০
১৯১৫-১৬	৯৩,৪৬	৯৩,৪৬	১১৮.২৫	৭৯,০৪	১৩৫,৯৫
১৯১৬-১৭	১০৭,৫৯	১০৭,৫৯	১৫২.৩৮	৭০,৬১	১২১,৪৫
১৯১৭-১৮	৬৯,১৮	৬৯,১৮	১৮৮.২৬	৩৬,৭৫	৬৩,২১
১৯১৮-১৯	৫৬,৬১	৫৬,৬১	১৮৫.৯৬	৩০,৪৪	৫২.৩৬
১৯১৯-২০	১৪৭,৫৭	১৪৭,৫৭	২৫১.২৩	৫৮,৭৪	১০১,০৩
১৯২০-২১	২৬০,৫৮	২৬০,৫৮	৩০১.৬২	৮৬,৩৯	১৪৮,৫৯
১৯২১-২২	৪২৫,৭৮	৪২৫,৭৮	৩২০.৯১	১৩২,৬৮	২২৮,২১
১৯২২-২৩	১৭০,৩৫	১৭০,৩৫	২৬৪.০২	৬৪,৫২	১১০,৯৭
১৯২৩-২৪	১৩১,০০	১৩১,০০	১৯০.৮৮	৬৮,৬৩	১১৮,০৪
১৯২৪-২৫	৯২,৫৯	৯২,৫৯	১৯০.০৯	৪৮,৭১	৮৩,৭৮
১৯২৫-২৬	৮১,৬৬	৮১,৬৬	১৯৯.৪১	৪০,৯৫	৭০,৪৩
১৯২৬-২৭	৬৪,৪৭	৬৪,৪৭	১৯৪.৪১	৩৩,১৬	৫৭,০৪
১৯২৭-২৮	৯৪,০২	৯৪,০২	২০৯.৭৮	৪৪,৮২	৭৭,০৯
১৯২৮-২৯	১২৯,৫৬	১২৯,৫৬	১৭৭.৯৪	৭২,৮১	১২৫,২৩
১৯২৯-৩০	১৪৩,৭৪	১৪৩,৭৪	১৮৪.৪৫	৭৭,৯৩	১৩৪,০৪
১৯৩০-৩১	৮১,৩৩	৮১,৩৩	১৯৯.৭৫	৪০,৭২	৭০,০৪
১৯৩১-৩২	৩২,১৮				
১৯৩২-৩৩	৩৫,৯৩				

	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)=(৪)×১.৭২
১৯৩৩-৩৪	৩১,৯০				
১৯৩৪-৩৫	৫১,৬৬				
১৯৩৫-৩৬	১১৫,১১				
১৯৩৬-৩৭	৭২,৭৩				
১৯৩৭-৩৮	১০৫,৮৭				
১৯৩৮-৩৯	৭০,৭৫				

উৎস ও টীকা : বাংলায় পাটকলের যন্ত্রপাতি আমদানির তথ্যসমূহের উৎস : Gov India, CISD: *Annual Statements of the seaborne trade of British India* (কলকাতা, বার্ষিক); দানের সূচক সংখ্যা (যুক্তরাজ্য থেকে বাংলাকে রপ্তানি করা পাটকলের যন্ত্রপাতির টন পিছু দাম) নির্মাণে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে *Annual statements of the foreign trade of the U. K.* (PP) থেকে। সূচকসংখ্যা নির্মাণের পদ্ধতি সারণি ৭.১০-এ অনুসৃত পদ্ধতিটির অনুরূপ। যন্ত্রপাতির সূচক সংখ্যার মূল্য যাচাই করার কোনো প্রত্যক্ষ উপায় নেই, কিন্তু ইন্ডিয়ান ট্যারিফ বোর্ডকে IJMA-র সেক্রেটারির লেখা একটি চিঠি (IJMA : *Report of the Committee for the year ended 31st December 1923* (কলকাতা, ১৯২৪, পৃ. ৬৩-৬) থেকে জানা যায় যে, যুদ্ধের পরে একটি পাটকলে যন্ত্রপাতি বসানোর খরচ ছিল তাঁত প্রতি ১৬,০০০ টাকা। যুদ্ধের আগে তুলনীয় ব্যয় ছিল ৬,০০০ টাকা, যুদ্ধের আগে তুলনায় ব্যয় ছিল ৬,০০০ টাকা। আমরা যদি ধরি যে, যন্ত্রপাতির দাম অন্যান্য ব্যয়ের অনুপাতে বেড়েছিল অথবা যন্ত্রপাতির ব্যয় মোট ব্যয়ের প্রধান অংশ ছিল তা হলে ১৯২৩-এর সূচকসংখ্যা দাঁড়ায় ২৬৭-তে (১৯১৩-১৪=১০০), এবং এই সংখ্যাটির সঙ্গে আমাদের পরিমাপের বেশি কিছু পার্থক্য নেই, একই চিঠিতে IJMA-র সেক্রেটারি জানান নির্মাণ কাজের উপযুক্ত ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিন এবং কারখানা বাবদ ব্যয় থোক ব্যয়ের (block expenditure) ৭৫ শতাংশ (প্রায় যথাযথ)। মোট থোক ব্যয় এবং কারখানার সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি বাবদ ব্যয়ের (নির্মাণ-কাজের উপযোগী ইস্পাত বাদে) অনুপাতের (১.৭২) সঙ্গে এই পরিমাপ সামঞ্জস্যপূর্ণ। উক্ত অনুপাতের হিসাব (কল্যাম ৫-এর পরিসংখ্যানের জন্যে যা আমাদের নির্ণয় করতে হয়েছে) ইন্ডিয়া জুট কোম্পানির ব্যালেন্স শিটগুলির তথ্য থেকে করা হয়েছে। প্রথম যুদ্ধপূর্ববর্তীকালীন থোক ব্যয়ের খণ্ডিত তথ্য (কারখানার সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য ব্যয়) একমাত্র এই কোম্পানিটির (স্কটল্যান্ডে নিবন্ধভুক্ত) ক্ষেত্রে লভ্য। ১৯২০-র ৩১শে মার্চে যন্ত্রপাতি, গৃহাদি ও জমি বাবদ মোট ব্যয় কত ছিল তার বিবরণ চাঁপদানি জুট কোম্পানি (স্কটল্যান্ডে নিবন্ধযুক্ত) প্রকাশ করেছে। এই কোম্পানিটির ক্ষেত্রে মোট থোক ব্যয় ও যন্ত্রপাতিবাবদ ব্যয়ের অনুপাত ছিল ১.৬৯। চাঁপদানি জুট কোম্পানি ইন্ডিয়া জুটের তুলনায় প্রাচীন ছিল, অতএব অনুমান করা যায় ঐ কোম্পানির গৃহাদি ও জমি বাবদ ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম ছিল। অবশ্য কোম্পানিটি তাঁতের সংখ্যা বাড়িয়েছিল অথবা অপসারণ করেছিল। এই তথ্যসমূহ বিবেচনা করলে ইন্ডিয়া জুট কোম্পানির ব্যালেন্সশিটের ভিত্তিতে ১.৭২ অনুপাতের পরিমাপটির উপর আস্থা রাখা যায়। আমাদের মোট বিনিয়োগের পরিমাপটির মধ্যে বরঞ্চ নিম্নাভিমুখী প্রবণতা আছে যেহেতু প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতির ব্যয়ের মধ্যে শক্তি ও আলোর জন্যে ব্যয়ও পড়ে যা যন্ত্রপাতি আমদানির পরিবেশিত তথ্যে ধরা হয়নি।

পাটকলগুলি তাদের নিজস্ব কারখানায় যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও অপসারণের কিছু কাজ করত। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত চার বছর সময়ে ঢালাই না-করা লোহার পিণ্ড ক্রয়ের একটি তালিকা IISCO-র সূত্রে পাওয়া যায়। তা থেকে জানা যায় যে ঐ সময়ে মাত্র একটি পাটকলের (১৯৩২-এ কামারহাটি কোম্পানি) বার্ষিক ক্রয় ১০০টনেরও বেশি ছিল, সাধারণত ক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াত বছরে ৪০ টন। দ্রষ্টব্য, ITB : *Statutory Enquiry 1933, steel*, খণ্ড ৩ (দিল্লী, ১৯৩৫), পৃ. ৫০২-৩। ঢালাই না-করা লোহার পিণ্ড ব্যবহারের মাধ্যমে মিলের কারখানায় উৎপাদিত যন্ত্রপাতির মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই প্রধান ছিল পাট বয়নের যন্ত্রপাতি। শুধুমাত্র মাঝারি ও বড় আয়তনের পাটকল তাদের নিজস্ব প্রয়োজনের যন্ত্রপাতি তৈরি করত এবং সে রকম মিলের সংখ্যা খুব বেশি হলে ৯০ হবে। অতএব মেরামত বা তৈরি করা যন্ত্রপাতির মোট পরিমাণ স্বাভাবিক সময়ের কোনো বছরে ৯০×৪০ বা ৩,৬০০ টন। এই হিসাবের ভিত্তিতে অনুমান করা যায় মিলের নিজস্ব কারখানায় যন্ত্রপাতির উৎপাদনে বিনিয়োগ যন্ত্রপাতিতে মোট বিনিয়োগের ২৫ শতাংশের বেশি ছিল (যন্ত্রপাতির আকৃতি প্রাপ্তির প্রক্রিয়াতে ঢালাই না-করা লোহার পিণ্ডের নিজস্ব ওজনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হ্রাস পাওয়ার কথা)। ১৯২০-র আগের থেকে পরের সময়কালে যন্ত্রপাতি নির্মাণের কাজ বেড়ে গিয়েছিল এবং তা বিবেচনা করলে পাটকল শিল্পে আমাদের বিনিয়োগের পরিমাপটিতে নিম্নাভিমুখী প্রবণতা থাকতে পারে। তাছাড়া, শিল্পটি মূলত গড়ে উঠেছিল ১৯১৪ সালের আগে এবং যুদ্ধের বছরগুলিতে মিলগুলিতে অতিরিক্ত কাজ চলে। তার ফলে যন্ত্রপাতি অপসারণ ও তার তদারকির প্রয়োজন বেড়ে যায়।

অতএব পরিমাপটি থেকে প্রাপ্ত রাশিমালা পাটকলগুলিতে অন্য ধরনের যন্ত্রপাতির সঙ্গে টাকু ও তাঁতের সম্পর্কের পরিবর্তন না-ঘটা পর্যন্ত, নিট বিনিয়োগ প্রবণতার কোনো বিকৃত চিত্র দেয় না। যন্ত্রপাতি আমদানিমূল্যের সিরিজ নির্মাণে ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১৯০৫ সালের দাম-সূচিকে মূল্য সঙ্কোচক হিসাবে প্রয়োগ করা হয়েছে ১৯০৫-৬ আর্থিক বছরের মূল্যের ক্ষেত্রে। পরবর্তী বছরগুলির ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

১৯১১-১২ পর্যন্ত পাট বয়নের যন্ত্রপাতির নিয়ন্ত্রিত আমদানির সিরিজ গঠনে ১৯১২-১৩ থেকে ১৯১৪-১৫ এবং ১৯১২-১৩ থেকে ১৯১৬-১৭ বছরগুলিতে পাট উৎপাদনের যন্ত্রপাতি আমদানি ও মোট বয়নযন্ত্রের আমদানির গড় অনুপাতের মধ্যক ব্যবহার করেছি। ১৯১১-১২ বছরটির জন্যে একমাত্র বয়ন যন্ত্রের বাংলায় মোট আমদানির তথ্য পাওয়া যায়। নিয়ন্ত্রণের সহগের (coefficient of adjustment) মান ছিল ০.৯১৬। বিনিময়হার যা কিছু ব্যবহার করা হয়েছে তা সবই সরকারি:

£১ = ১৫ টাকা, ১৯১৮-১৯ পর্যন্ত এবং

£১ = ১০টাকা, ১৯১৯-২০ পর্যন্ত।

প্রকৃত বিনিয়োগের সিরিজ ১৯৩০-৩১-এর পর থেকে গঠন করা যায়নি। তার কারণ, Accounts of foreign trade of the U.K (PP) বয়নযন্ত্র রপ্তানির বন্দর-ভিত্তিক তথ্য ১৯৩০-এর পর থেকে প্রকাশ করেনি।

৮.২ পাটশিল্প, ১৯১৪-২৯

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ভারতবর্ষে যত কাঁচা পাট উৎপন্ন হতো তার অর্ধেকের বেশি বিদেশে, বিশেষ করে ইয়োরোপের ও আমেরিকায়, রপ্তানি করা হতো। এই দেশগুলির বেশির ভাগেই পাটশিল্প গড়ে ওঠে পাট থেকে উৎপাদিত পণ্যেব উপর আমদানি-শুল্ক আরোপ করে এবং অন্যদিকে বিনা শুল্কে কাঁচা পাট আমদানি করে। ভারতের কাঁচাপাট রপ্তানির এক চতুর্থাংশ থেকে এক তৃতীয়াংশ ক্রয় করত ব্রিটেন।[১০] ইয়োবোপীয় বাজার, বিশেষ করে জার্মানি ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গারির চাহিদা, হ্রাস পাওয়ার অর্থই ছিল কাঁচা পাটের চাহিদা, হ্রাস পাওয়ার অর্থই ছিল কাঁচা পাটের চাহিদার দ্রুত পতন।

সারণি ৮.২ রপ্তানি মূল্য, কাঁচা পাট ও গুণ চটের থলির দাম, ১৯১১-১২ থেকে ১৯১৮-১৯ পর্যন্ত

সাল	ভারতের কাঁচা পাটের রপ্তানি মূল্য ('০০০ টাকায়)	জানুয়ারি	কাঁচা পাটের (বাছাই করা) দাম (কলকাতা)			গুনচটের থলির দাম (কলকাতা)		
			টাকা	আনা	পাই	টাকা	আনা	পাই
১৯১১-১২	২২,৫৬,৬৬	১৯১২	৫৫	০	০	৩৬	০	০
১৯১২-১৩	২৭,০৫,০৭	১৯১৩	৬৮	০	০	৩৯	৪	০
১৯১৩-১৪	৩০,৮২,৬৪	১৯১৪	৯৩	০	০	৪২	৮	০
১৯১৪-১৫	১২,৯১,০২	১৯১৫	৫৪	০	০	৩৪	০	০
১৯১৫-১৬	১৫,৬৪,২০	১৯১৬	৬২	০	০	৪৩	০	০
১৯১৬-১৭	১৬,২৮,৮১	১৯১৭	৬৮	০	০	৪৪	৮	০
১৯১৭-১৮	৬,৪৫,৩৮	১৯১৮	৫৩	০	০	৬৮	০	০
১৯১৮-১৯	১২,৭২,০১	১৯১৯	৯৫	০	০	৫৮	০	০

উৎস : Gov. India, CISD : *Statistical abstract for British India from 1911-1912 to 1920-1* [প্রথম সংখ্যা] (কলকাতা, ১৯২৩), পৃ. ৫২৬-৭। কাঁচা পাটের একক : ৪০০ পাউন্ডের এক বস্তা; গুন চটের থলির একক : ২½ পাউন্ড ওজনের একটি থলি যার পরিমাপ ৪৪''×২৬১/২''

যুদ্ধের সময় কাঁচা পাটের দাম এবং পাট-জাত দ্রব্যের দামের গতির বিভিন্নতা সারণি ৮.২ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়। হুগলি তীরবর্তী মিলগুলিতে পাট সরবরাহ কার্যত একই স্তরে আবদ্ধ ছিল এবং তারা পাট-জাত দ্রব্য তৈরির ব্যাপারে একচেটিয়া অধিকার পেয়েছিল। যুদ্ধের শুরুতে অসামরিক উদ্দেশ্যে পাট-জাত দ্রব্যের চাহিদা কমে যাচ্ছিল, কিন্তু যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বালির বস্তা, ক্যানভাস, শস্যের বস্তা, ইত্যাদির চাহিদা এত বৃদ্ধি পেল যে তা অসামরিক চাহিদার ঘাটতিকে শুধু পূরণই করল না, পাটের বাণিজ্যে মন্দাও রোধ করল। যুদ্ধের জন্যে রেলের নির্মাণকার্য এবং অন্যান্য বৃহৎ সরকারি কাজ বন্ধ হয়ে

যাওয়ায় মিলগুলি সস্তায় প্রচুর শ্রমিক পেয়ে যায়, ফলে যুদ্ধের বেশির ভাগ সময়ই মিলগুলিতে সপ্তাহে আশি ঘন্টা কাজ চলে।[৪১]

স্বাভাবিকভাবেই এর ফলে চটকলগুলি যুদ্ধের সময় প্রচুর পরিমাণে মুনাফা অর্জন করে। একটি হিসাব থেকে দেখা যায়, নিট মুনাফা (সুদ বাদে) ও প্রদত্ত মূলধনের (paid up capital) অনুপাত ১৯১৪-এ ছিল ১০,১৯১৫-এ ৫৮,১৯১৬-এ ৭৫ এবং ১৯১৭-এ ৪৯।[৪২] এই বছরগুলিতে যে সব ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হয়েছিল সেগুলির হার যে কোনো মাপকাঠিতেই খুব বেশি ছিল। কিন্তু জাহাজের অভাবে এবং ব্রিটেনের যাবতীয় কারিগরি সামর্থ যুদ্ধের কাজে নিয়োজিত কবার ফলে এই বছরগুলিতে মিলগুলির উৎপাদন-ক্ষমতাব সম্প্রসারণ খুবই কম হয়েছিল। পরিস্থিতিটি চটকলগুলিতে প্রকৃত বিনিযোগের পরিসংখ্যান থেকে (সারণি ৮.১) এবং (৮.৩ সারণিতে) দেওযা ভারতীয় চটকলে তাঁত ও টাকুর সংখ্যা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

সারণি ৮.৩ ১৯০০-১ থেকে ১৯৩৯-৪০ পর্যন্ত ভারতের চটকলে নিয়োজিত কর্মী, তাঁত ও সুতোকাটাব টাকুর সংখ্যা

সাল	IJMA মিলগুলিতে তাঁতের সংখ্যা ('০০০)		মোট (সারা ভারতে) সংখ্যা		নিয়োজিত কর্মীর সংখ্যা
	হেসিযান	স্যাকিং	তাঁত	টাকু	
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১৯০০-১	৬.৬	৮.৭	১৫,৩৪০	৩১৭,৩৪৮	১১১,২৭২
১৯০১-২	৮.২	৮.৪	১৬,১১৯	৩৩১,৩৮২	১১৪,৭৯৫
১৯০২-৩	৮.৭	৮.৯	১৭,১৮৯	৩৫৫,২১৪	১১৮,৯০৪
১৯০৩-৪	১০.৬	৯.৩	১৮,৪০০	৩৭৬,৭১৮	১২৩,৮৬৯
১৯০৪-৫	১১.৪	৯.৯	১৯,৯৯৯	৪০৯,১৭০	১৩৩,১৬২
১৯০৫-৬	১২.৮	১১.১	২১,৯৮৬	৪৫৩,১৬৮	১৪৪,৮৭৯
১৯০৬-৭	১৪.৫	১১.৯	২৫,২৮৪	৫২০,৫০৪	১৬৬,৮৯৫
১৯০৭-৮	১৬.৪	১২.৬	২৭,২৪৪	৫৬২,২৭৪	১৮৭,৭৭১
১৯০৮-৯	১৭.৭	১৩.১	২৯,৫২৫	৬০৭,৩৫৮	১৯২,১৮১
১৯০৯-১০	১৮.৩	১৩.৪	৩১,৪১৮	৬৪৫,৮৬২	২০৮,১০৪
১৯১০-১১	১৮.৩	১৪.০	৩৩,১৬৯	৬৮২,৫২৭	২১৬,৩৯০
১৯১১-১২	১৮.৭	১৪.০	৩২,৯২৭	৬৭৭,৫১৯	২০১,৩২৪
১৯১২-১৩	১৮.৬	১৪.০	৩৪,০৩৩	৭০৮,৭১৬	২০৪,০৯২
১৯১৩-১৪	২১.০	১৫.৮	৩৬,০৫০	৭৪৪,২৮৯	২১৬,২৮৮
১৯১৪-১৫	২২.৩	১৫.৮	৩৮,৩৭৯	৭৯৫,৫২৮	২৩৮,২৭৪
১৯১৫-১৬	২২.৬	১৫.৮	৩৩,৮৯০	৮১২,৪২১	২৫৪,১৪৩
১৯১৬-১৭	২২.৮	১৫.৯	৩৩,৬৯৭	৮২৪,৩২৫	২৬২,৫৫২
১৯১৭-১৮	২৩.২	১৫.৯	৪০,৬৩৯	৮৩৪,০৫৫	২৬৬,০৩৮

	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১৯১৮-১৯	২৩.৪	১৬ ০	৪০.০৪৩	৮৩৯,৯১৯	২৭৫,৫০০
১৯১৯-২০	২৩.৪	১৬.১	৪১,০৪৫	৮৫৬,৩০৭	২৮০,৪৩১
১৯২০-২১	২৪.৪	১৬.১	৪১,৫৮৮	৮৬৯,৮৭৯	২৮৮,৪০১
১৯২১-২২	২৪ ৫	১৬ ৪	৪৩,০২৫	৯০৮,৩৫৯	২৮৮,৪৫০
১৯২২-৩	২৫.০	১৬ ৪	৪৭,৫২৮	১,০০৩,১৭৯	৩২১,২৯৬
১৯২৩-৪	২৮.১	১৭.৫	৪৯,০৩৮	১,০৪৩,৪১৭	৩৩০,৪০৮
১৯২৪-৫	২৯ ১	১৮.৩	৫০,৩৫৯	১,০৬৭,৬৩৩	৩৪১,৭২৩
১৯২৫-২৬	৩১ ১	১৮.৩	৫০,৫০৩	১,০৬৩,৭০০	৩৩১,৩২৬
১৯২৬-৭	৩১.৩	১৮.৫	৫১,০৬১	১,০৮৩,৮১৬	৩৩,৬৫৯
১৯২৭-৮	৩১.০	১৯.২	৫২,২২১	১,১০৫,৬৩৪৩	৩৩৫,৮০৪
১৯২৮-৯	৩১.২	১৯.৩	৫২,৪০৯	১,১০৮,১৪৭	৩৪৩,৮৬৮
১৯২৯-৩০	৩১.৫	১৯.৫	৫৩,৯০০	১,১৪০,২৩৫	৩৪৩,২৭৫
১৯৩০-১	৩৬.২	২১.৯	৬১,৮৩৪	১,২২৪,৯৮২	৩০৭,৬৭৬
১৯৩১-২	৩৬.২	২১ ৯	৬১,৪২৬	১,২২০,৫৮৬	২৭৬,৮১০
১৯৩২-৩	৩৬.২	২১.৯	৬০,৫০৬	১,২০২,১৮৩	২৬৩,৪৪২*
১৯৩৩-৪	৩৫.৩	২১.৬	৫৯,৫০১	১,১৯৪,৪০৫	২৫৭,১৭৫
১৯৩৪-৫	৩৫.৩	২১.৬	৫৯.৫০১	১,১৯৪,৪০৫	২৫৭,১৭৫
১৯৩৪-৫	৩৫.৩	২১.৬	৬১,৩৮৭	১,২২১,৭৮৬	২৬৩,৭৩৯
১৯৩৫-৬	৩৫ ৩	২১.৬	৬৩,৭২৪	১,২৭৯,৪১৬	২৭৭,৯৮৬
১৯৩৬-৭	৩৫.৩	২১.৬	৬৫,২৭৩	১,৩০০,০৭৭	২৮৯,১৩৬
১৯৩৭-৮	৩৫.৩	২১ ৬	৬৬,৭০৪	১,৩৩৭,৯৫৮	৩০৫,৭৮৫
১৯৩৮-৯	৩৫.৩	২১.৬	৬৭,৯৩৯	১,৩৫০,৪৬৫	২৯৫,১৬২
১৯৩৯-৪০	৪১.১	২৩.৭	৬৮,৫২৮	১,৩৬৯,৮২১	২৯৮,৯৬৭

উৎস : (৩), (s), (৫) কলামের জন্য Gov. India, CISD . *Statistics of British India, 1913-14* (কলকাতা, ১৯১৫) পরবর্তী সংস্করণ সমূহ ; (১) এবং (২) কল্যামের জন্য IJMA : *Annual Reports of the Committee*

* ১৯৩২-৩ থেকে ১৯৩৯-৪০ পর্যন্ত

যুদ্ধের ফলে ভারতীয় চটকলশিল্প অন্যান্য দেশের প্রতিযোগীদের থেকে অনেক এগিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিল,[৪৪] প্রভূত মুনাফা অর্জন করেছিল। এই যুদ্ধ পাট শিল্প ও ব্যবসার ক্ষেত্রেও ইয়োরোপীয়দের একাধিপত্যের সমাপ্তি ঘটায়। যুদ্ধের ঠিক আগে চটকল মালিকরা পাটের বাজারে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের (মূলত মাড়োয়ারীদের) ফাটকা কারবারের ব্যাপারে চিন্তিত ছিল।[৪৫] আই জে এম এ বাংলা গভর্নমেন্টের কাছে 'ভিতর বাজারে' ফাটকা দমন করার উদ্দেশ্যে একটি বিলের খসড়া পেশ করে, কিন্তু সরকার এই প্রস্তাবকে অবাস্তব বলে বাতিল করে দেয়। যাই হোক, যুদ্ধের পর আই জে এম এ-কে 'ফাটকা' বাজার বা 'ভিতর বাজারের' প্রশ্ন কার্যত প্রতি বছরই বিবেচনা করতে হতো। পাট ও পাট-জাত দ্রব্যের

ভবিষ্যতের বাজার সম্পর্কে আগাম অনুমানের দ্বাবা চালিত কাজকর্মকে পাটতন্তুর চাহিদা পতনের জন্য প্রায়শই দায়ী কবা হতো।[৪৬]

যুদ্ধের সময় ভারতীয়রাও চটকলগুলির মূলধনের একটি বড় অংশ অধিকার করে নেয় বলে মনে করা হয়।[৪৭] এর ব্যাখ্যা হিসাবে বলা যায় না যে, ইয়োরোপীয়রা সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলির শেয়ার বিক্রি করে দিতে খুব আগ্রহী ছিল। তার কাবণ, ১৯২৬ পর্যন্ত পাটের শেয়ারের ডিভিডেন্ড যথেষ্ট চড়া ছিল।[৪৮] যুদ্ধের সময় কলকাতার ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের একটি বড় অংশ হয় যুদ্ধক্ষেত্রে ছিল নতুবা তারা যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত ছিল, ইয়োরোপীয়দের মালিকানা ত্যাগেব এবকম একটি ব্যাখ্যা চলতে পারে।[৪৯]

পাট ব্যবসার বিভিন্ন স্তরে ইয়োরোপীয়ান অ্যাসোসিযেশনের পাশাপাশি অনুরূপ ভারতীয় অ্যাসোসিয়েশন ও গড়ে ওঠে : দি বেঙ্গল জুট ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন, দি ইস্ট ইন্ডিয়া জুট অ্যাসোসিয়েশন, হাটখোলা বাণিজ্য সভা দি ইন্ডিয়ান জুট বেলার্স অ্যাসোসিযেশন এবং আরো অনেক।[৫০] যুদ্ধ শেষে চটকল শিল্পে দেখা গেল প্রথম ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত দুটি মিল - দি বিড়লা জুট ম্যানুফ্যাক্চার এবং হুকমচাঁদ জুট মিল্স্ লিমিটেড।

৮.৩ পাটশিল্পে মন্দা, ১৯২৯-৩০ থেকে ১৯৩৮-৯

পাটশিল্পের নিয়ন্ত্রিত উৎপাদন ও সম্প্রসারণের নীতি আই জে এম এ যুদ্ধের আগে যেভাবে অনুসরণ করত যুদ্ধের পরেও তা করতে থাকে। ১৯২১-এ মিলগুলি সপ্তাহে ৫৪ ঘন্টা কাজ করার ব্যাপারে মতৈক্যে পৌঁছায় এবং এই রীতি সমগ্র বিশের দশক ধরে পালন করা হয়। বিশ্বে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বিশের দশকে বৃদ্ধি পেতে থাকে : অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, কিউবা এবং নিউজিল্যান্ড প্রচুর পরিমাণে গুনচটের থলি ও গুনচটের কাপড় আমদানি করতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই পাটের উৎপাদন এবং চটকলগুলির উৎপাদনক্ষমতা ক্রমাগত বাড়ছিল, যদিও আই জে এম এ-এর সদস্য মিলগুলির ক্ষেত্রে উৎপাদনক্ষমতা সম্প্রসারণ সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু যেসব ফার্ম এই অ্যাসোসিয়েশনের বাইরে ছিল তাদের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধিতে বা নতুন মিল স্থাপনে বাধা ছিল না। প্রতিষ্ঠিত পাটকলগুলির ক্ষেত্রে মুনাফা এবং ডিভিডেন্ড-এর হার খুব উঁচু ছিল, এবং যুদ্ধ শেষে ভারতীয়রা পাট ব্যবসার সর্বক্ষেত্রে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে, তার ফলে নতুন মিল স্থাপন স্বাভাবিক ছিল।[৫১] বিশের দশকে পাটশিল্পে বাৎসরিক মোট বিনিয়োগের 'প্রকৃত' মূল্য কিছু থাকলেও তা যুদ্ধ-পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কম ছিল (সারণি ৮.১, স্তম্ভ ৪ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু, প্রাক্যুদ্ধ কালের মতো, পাটকলে বিনিয়োগ অবিভাজ্য হওয়ার ফলে তার বৃদ্ধি পাটতন্তুর অতি-উৎপাদন ঘটাত এবং সমস্যাটি ঘনীভূত হতো কাঁচা পাটের দামের ব্যাপক ওঠা-নামায়। অতিরিক্ত পরিমাণ পাটের আগাম ক্রয়ের জন্যে বহু মিল তাদের পণ্যের দাম কমাতে পারত না, বিশেষ করে চড়া দামে পাট কেনা থাকলে।[৫২]

যদিও ১৯২৯-৩০-এর মন্দা শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত মোট পাট রপ্তানির কোনো ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়নি। এবং সারণি ৮.৪ থেকে বোঝা যায় এর বৃদ্ধিও খুব একটা ঘটেনি। তদুপরি পাটের মূল্য ওঠানামা করায় কিছু মিলের লাভ ভীষণভাবে ব্যাহত হয়। ১৯২৯-

এব সেপ্টেম্বর নাগাদ সমস্ত বিশ্বব্যাপী মন্দা শুরু হলে বিশ্ব কৃষিবাজার তৎসহ কাঁচাপাট তথা পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা ভীষণভাবে পড়ে যায়। (ভারতীয় পাটকলগুলিতে উৎপন্ন দ্রব্যগুলির বেশিবভাগই ছিল মোটা উপাদানে তৈবি যা ব্যবহৃত হতো মূলত শস্য, পশম ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য পরিবহণে।)

সাবণি ৮.৪ ১৯১৯-২০ থেকে ১৯৩৯-৪০ পর্যন্ত ভারত থেকে কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্যেব বপ্তানি

সাল	কাঁচা পাটের রপ্তানি পরিমাণ ('০০০ টনে)	কাঁচা পাটের রপ্তানি মূল্য ('০০০ টা.)	রপ্তানি করা পাট-জাত দ্রব্যের মোট মূল্য ('০০০ টা.)
১৯১৯-২০	৫৯২	২৪৬,৯১৫	৫০০,১৫৫
১৯২০-১	৪৭২	১৬৩,৬০৯	৫২৯,৯৪৭
১৯২১-২	৪৬৮	১৪০,৪৯২	২৯৯,৯৫৭
১৯২২-৩	৫৭৮	২২৫,২৮৫	৪০৪,৯৪২
১৯২৩-৪	৬৬০	২০০,০০৬	৪২২,৮৩৬
১৯২৪-৫	৬৯৬	২৯০,৯৩০	৫১৭,৬৬৬
১৯২৫-৬	৬৪৭	৩৭৯,৪৫৭	৫৮৮,৩৯৮
১৯২৬-৭	৭০৮	২৬৭,৮০৪	৫৩১,৮০৯
১৯২৭-৮	৮৯২	৩০৬,৬২৬	৫৩৫,৬৪৩
১৯২৮-৯	৮৯৮	৩২৩,৪৯২	৫৬৯,০৪৯
১৯২৯-৩০	৮০৭	২৭১,৭৩৮	৫১৯২৬৮
১৯৩০-১	৬২০	১২৮,৮৪৭	৩১৮,৯৪৫
১৯৩১-২	৫৮৭	১১১,৮৮১	২১৯,২৪৩
১৯৩২-৩	৫৬৩	৯৭,৩০৩	২১৭.১১৮
১৯৩৩-৪	৭৪৮	১০৯,৩২৭	২১৩,৭৪৯
১৯৩৪-৫	৭৫২	১০৮,৭১১	২১৪,৬৮৩
১৯৩৫-৬	৭৭১	১৩৭,০৭৬	২৩৪,৮৯৫
১৯৩৬-৭	৮২১	১৪৭,৭১০	২৭৯,৪৭৫
১৯৩৭-৮	৭৪৭	১৪৭,১৯০	২৯০,৭৭৬
১৯৩৮-৯	৬৯০	১৩৩,৯৬৭	২৬২,৬১১
১৯৩৯-৪০	৫৭০	১৯৮,৩৩৩	৪৮৭,২১৪

উৎস : Gov. India, CISD : *Annual statement of the sea-borne trade of British India,* খণ্ড ১; (কলকাতা, বার্ষিক)।

মন্দা সূচনার সাথে সাথে আই জে এম এ-এর সঙ্গে যুক্ত মিলগুলিতে ইতিপূর্বেই দেখা দেওয়া চারটি সমস্যা আরও ঘনীভূত হয়ে উঠে। প্রথমটি ছিল দৈনিক কাজের সময় নির্ধণ্টের ব্যাপারে সহমত হওয়া এবং সঙ্ঘের সবল ও দুর্বল সদস্যদের মধ্যে উৎপাদন বাড়ানোর

ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছানো। এমনকি যখন চাহিদা বাড়ছে তখনও আই জে এম এ, বিশেষ অনুমোদন ছাড়া, সপ্তাহে ৫৪ ঘন্টা কাজের সময়সীমা এবং উৎপাদন-ক্ষমতা না-বাড়ানোর শর্ত আরোপ করেছে। উৎপাদন সীমিতকরণের ফলে ১৯২৮ সালে মিলগুলির মুনাফার হার প্রভূত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই নীতির যৌক্তিকতা সম্পর্কে কিছু জরুরি প্রশ্ন ওঠে যখন আই জে এম এ—বহির্ভূত দেশীয় মিলগুলি তাদের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াতে থাকে এবং নতুন নতুন মিল স্থাপিত হয়। ১৯২৮-এ আই জে এম এ সপ্তাহ পিছু কাজের সময় ৫৪ ঘণ্টা থেকে বাড়িয়ে ৬০ ঘণ্টা করে। কিন্তু এই নতুন চুক্তি ১৯২৯-এর ১লা জুলাই পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়।[৫৩] তারপর থেকে ১৯৩০-এর ৩০শে জুন পর্যন্ত নতুন চুক্তিটি বলবৎ থাকে।

১৯২৮-এ আই জে এম এ ওয়েভারলি ও ক্রেগ নামের দুটি মিলকে ২৫০টি অতিরিক্ত তাঁত বসিয়ে উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়ানোর অনুমতি দেয় অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হওয়ার প্রস্তাব মানার আগেই। মিলগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যুদ্ধের সময়ে এবং পরিচালিত হতো বেগ ও ডানলপ অ্যান্ড কোম্পানি দ্বারা।[৫৪]

মন্দা দেখা দেওয়ায় নতুনভাবে স্থাপিত মিল ও পুরনো মিলগুলির মধ্যে কোনো রকম কার্যকরী চুক্তিতে উপনীত হওয়া আরও শক্ত হয়ে পড়ে।[৫৫] নতুন মিলগুলি এমন একটি সময়ে স্থাপিত হতে শুরু করে যখন প্রয়োজনীয় মূলধন-দ্রব্যের দাম ছিল অত্যন্ত বেশি এবং তাদের পুরনো মিলগুলির মতো মজুতসামগ্রীও ছিল না যার উপর প্রয়োজনে নির্ভর করা যায়। পাটের দাম কমে যাওয়া রোধ করতে আই জে এম এ ৩০শে জুন ১৯৩০-এর পর আবার সপ্তাহ প্রতি ৫৪ ঘণ্টা কাজ চালু করে। ১লা অক্টোবর ১৯৩০ থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট মিলগুলি সপ্তাহ পিছু ৫৪ ঘণ্টা কাজ ছাড়াও প্রতি মাসে এক সপ্তাহ কাজ বন্ধে রাজি হয় এবং ১৯৩১-এর ২রা মার্চ থেকে সপ্তাহে মাত্র ৪০ ঘণ্টা কাজ চালু রাখতে ও মিলের ১৫ শতাংশ তাঁত বন্ধ রাখতে স্বীকৃত হয়। স্বভাবত এ সমস্ত নিয়মকানুনগুলি মেনে চলা নতুন মিলগুলির পক্ষে ছিল অলাভজনক। ১৯৩১-এ আই জে এম এ দুটি মিলকে অতিরিক্ত সময় কাজের জন্যে বিশেষ অনুমতি না দেওয়ায় তারা সদস্যপদ ত্যাগ করে। অ্যাসোসিয়েশনের অস্তিত্ব ক্রমশ বিপন্ন হতে থাকে। মিলের মোট উৎপাদনের উপর আই জে এম এ-এর প্রভাব আগের তুলনায় হ্রাস পায় এবং তার সদস্যভুক্ত মিলগুলিই নিয়ন্ত্রণমূলক বিধি-নিষেধের চাপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাটজাত সামগ্রীর মজুতের পরিমাণ হ্রাস পেলেও ১৯৩২-এ পাটশিল্পের চরম অবনতি ঘটে। শেষ পর্যন্ত ১৯৩২-এর মে মাসে বাংলার গর্ভনরের হস্তক্ষেপে আই জে এম এ-এর সদস্যভুক্ত মিলগুলির সঙ্গে বাইরের মিলগুলির চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির ফলে অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যভুক্ত মিলগুলি আগের ব্যবস্থামতো সপ্তাহে ৪০ ঘন্টা কাজ ও ১৫ শতাংশ তাঁত বন্ধের শর্তে রাজি হয়। চুক্তির অন্যান্য শর্তগুলি ছিল এই রকম :

(ক) অ্যাসোসিয়েশনের বাইরের মিলগুলি তাদের সমস্ত যন্ত্রপাতি চালু রেখে সপ্তাহে ৫৪ ঘন্টা কাজ করতে পারবে।

(খ) আগড়পাড়া মিলকে ৬৪-টি তাঁত বাড়াবার অনুমতি দেওয়া হবে;

(গ) অন্য কোনো মিল চুক্তিটি বলবৎ থাকার কালে উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াবে না;

(ঘ) প্রেমচাঁদ জুট ও শ্রী হনুমান জুট মিলস্ (দুটি মিলই ভারতীয় পরিচালনায় ছিল)

অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য থেকেও সপ্তাহ প্রতি ৫৪ ঘন্টা কাজ ও সমস্ত যন্ত্র চালু রাখার বিশেষ সুবিধা ভোগ করবে। আই জে এম এ অন্যান্য সদস্যদের অনুরূপ দাবি বিবেচনা করতে পারে যদি ঐ সুযোগ উপরোক্ত মিল দুটি সহ সমস্ত সদস্যভুক্ত মিলগুলির ৪ শতাংশ পর্যন্ত তাঁত ব্যবহারেব মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।[৫৬]

চুক্তিটি ভারতীয় পাটজাত পণ্য-প্রস্তুতকারকদের সামগ্রিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছিল এবং ১৯৩৩ থেকে পাট শিল্পে মুনাফার হাব উন্নত হতে শুরু কবে যদিও এর ব্যতিক্রম ঘটেছিল ১৯৩৭ ও ১৯৩৮-এ। চুক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল দু'টি দিক থেকে। প্রথমত, এটি পথ দেখায় কী উপায়ে কোনো সংস্থার চুক্তিবদ্ধ সদস্যদের পার্শ্ব লেনদেন অন্যান্য উৎপাদকদের লাভজনকভাবে প্রণোদিত করে কিছু নির্দিষ্ট খেলার সূত্র মেনে চলতে। দ্বিতীয়ত, একচেটিয়া ব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সরকারি মধ্যস্থতা যে কত প্রয়োজনীয় হতে পারে তা এই চুক্তিটি প্রকাশ করে। আই জে এম এ-এর কাজের সময়-সীমা বেঁধে দেওয়ার চুক্তিটি সফল হয় মূলত পাটের চাহিদার স্বল্পকালীন স্থিতিস্থাপকতার মান নিচু ছিল বলে।[৫৭]

১৯৩৪-এর ১লা নভেম্বর থেকে বন্ধ হয়ে যাওয়া ১৫ শতাংশ তাঁতের মধ্যে ২½ শতাংশ চালু করা হয়। তাৎক্ষণিকভাবে দামের উপর এর কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। ১৯৩৪ ও ১৯৩৫-এ চটকলগুলির মুনাফা বেড়ে যায়। ১৯৩৬-৩৭-এ পাটজাত পণ্যের দাম কমে এবং আই জে এম এ-এর সদস্য ও তার বাইরের মিলগুলির মধ্যে কাজের সময় নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত চুক্তিটি ভেঙে পড়ে। বন্ধ হয়ে যাওয়া অনেকগুলি তাঁতে দ্রুত কাজ শুরু হয় এবং ১৯৩৬-এর ৩১শে মার্চের পর থেকে সমস্ত তাঁত নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত হয়। কাজের ঘণ্টার সংখ্যাও বেড়ে যায়। তার ফলে দামসমূহ হ্রাস পায় এবং বিদেশে মোট চাহিদা ভাল সাড়া দেওয়া সত্ত্বেও মিলগুলির মুনাফা কমতে শুরু করে ১৯৩৬-এ। ১৯৩৭-এ মুনাফার পরিমাণ আরও কমে। চাহিদা ও যোগদানের অসমতার আরও বৃদ্ধি বোধ করার জন্যে বাংলার সরকার ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বরে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে সমস্ত চটকলে কাজ চালু রাখার সময় সপ্তাহ প্রতি সর্বোচ্চ ৪৫ ঘণ্টায় বেঁধে দেয়। সরকারের আইনের হুমকিতে সব মিলগুলি এবং আই জে এম এ-এর সমর্থনে সব মিলগুলি আবার চুক্তিবদ্ধ হয়। এই চুক্তির দ্বারা সমস্ত চটকলে কাজের সর্বোচ্চ সময় সপ্তাহ প্রতি ৪৫ ঘণ্টা করা হয়। ছোট আয়তনের কিছু চটকলকে এই নিয়মের অধীনে আনা হয়নি। ১৯৩৮-এর শেষ দিক থেকে মিলের উৎপাদনের উপর যুদ্ধজাত চাহিদা জোরালো প্রভাব ফেলতে শুরু করে। কিন্তু ১৯৩০-এর দশকের শেষ দিকে এই সত্য স্পষ্ট হয় যে, স্বাভাবিক অবস্থায় বিশ্বের পাট শিল্পে উৎপাদন-ক্ষমতা পাটজাত পণ্যের বিশ্ব চাহিদার তুলনায় বেশি ছিল। মোট উৎপাদনের উপর নিয়ন্ত্রণ বাতিল করার চেষ্টার ফলে অবাঞ্ছিত মজুতের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় (এমন কি ১৯৩৯-এ, যুদ্ধের কয়েক মাস আগেও অবাঞ্ছিত মজুত ঘটতে দেখা গেছে)।[৫৮]

দ্বিতীয় যে সমস্যাটি মন্দার ফলে ঘনীভূত হয় তা হলো পাটের আগাম বাজার ও ফাটকা বাজারের সঙ্গে চটকল শিল্পের সম্পর্ক। আই জে এম এ যখনই কাঁচা পাটের দাম পাটজাত পণ্যের চাইতে বেশি বলে মনে করত তখনই ভবিষ্যৎ বাণিজ্যের উপর আইনগত বিধি নিষেধের দাবি উত্থাপন করত। কিন্তু সমস্যাটির কারণে কোনো হস্তক্ষেপের প্রয়োজন

ঘটেনি মন্দার বছরগুলির আগে। আগাম বাজারের প্রশ্নটি আলোচনার জন্যে ১৯৩২-এ বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের ব্যবস্থাপনায় পাট ব্যবসায়ীদের একটি বিধিবহির্ভূত সভা অনুষ্ঠিত হয।[৫৯] সভায় ব্যবসাযীরা বিভক্ত ছিল ভারতীয় ও ইয়োরোপীয়দের দু'টি দিকে। ভারতীয় বণিকদের পক্ষে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি, এন আর সরকার, পাটের আগাম বাজারের প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব দেন পাটেব সারা বছরের চাহিদা ও মরশুমী যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্যেব অভাব দূব কবাব উদ্দেশ্যে। ডি পি খৈতান অভিযোগ কবেন যে, পাটের মান নির্ণয়ে মিলগুলি কারচুপির আশ্রয় নিত এমনভাবে যে উচ্চতম মানের পাটও যেন খারিজ হয়ে যায়। ইয়োবোপীয়দের পক্ষ থেকে ক্যালকাটা জুট ডিলার্স আসোসিয়েশনের তরফে মিঃ লিউক বলেছিলেন, ফাটকা বাজারের জন্মের আগে মফস্বল থেকে পাট কিনে কলকাতায় যে দামে বিক্রি করতে হতো তাতে খরচ পোষাত না। ফাটকা বাজার বড় আকারে গড়ে ওঠার ফলে কলকাতায় পাটের দাম মফঃস্বলের তুলনায় এমন কিছু বেশি থাকত না। এই বিশেষ অভিযোগটির যাথার্থ্যতার সমর্থন পাওয়া যায় বিপণন সম্পর্কে ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটির প্রথম রিপোর্টে।[৬০] কলকাতার বণিকরা তাদের মফঃস্বলের এজেন্টদের কাছে পাটের যে দাম জানাত তার মধ্যে ভবিষ্যতের অনুমিত দামও ধরা থাকত এবং এই পদ্ধতিটি আবার প্রাথমিক স্তরের পাটের ব্যাপারীদের প্রাপ্ত দামকে প্রভাবিত করত। আরও বলা হয়েছে: 'ইয়োরোপীয় কারবাবীবা, অপর দিকে, তাদেব বেশিব ভাগ ব্যবসা চালায় সাচ্চা যোগান চাহিদার ওঠানামা অনুসারে, ফাটকার উপব সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে নয়। তারা মনে করে, ফাটকা বাজার বাণিজ্য পরিস্থিতির সঠিক নির্দেশক নয়।'[৬১] 'সাচ্চা যোগান ও চাহিদা' বলতে এই প্রসঙ্গে যে কী বোঝায়, তা স্পষ্ট নয়। ধবে নেওয়া যায়, তা পাটজাত পণ্যের বাৎসরিক প্রকৃত চাহিদার ও যোগানের পবিমাপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই পরিমাপ সম্ভবত আরও নিশ্চিতভাবে করতে পারত আই জে এম এ-এর সদস্যভুক্ত পাটকলগুলিব সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ব্যবসায়ীরা, বাঁধা-নয এমন ব্যবসায়ীরা নয।

তৃতীয় সমস্যাটি ছিল পাটকল ও পাট চাষীদের সম্পর্ক ঘটিত যা মন্দার আগে জনসাধাবণের আলোচনার পর্যায়ে ছিল তিরিশের দশকে তা হয়ে দাঁড়াল বাংলার সব থেকে বেশি বিতর্কিত অর্থনৈতিক সমস্যা। যেখানে পাটকলগুলি সংগঠিত হয়েছিল অত্যন্ত কার্যকবী কার্টেলে, সেখানে চাষীরা ছিল বিচ্ছিন্ন, তাদের প্রতিযোগিতা পূর্ণ প্রতিযোগিতার থেকে অনেকটাই ভিন্ন ছিল। বেসরকারি কিছু প্রচার ছিল যে, পাট চাষীরা শিল্পের উপার্জনে নিজেদের প্রাপ্য অংশ পাচ্ছিল না।[৬২] ১৯৩০-এ পাটের দামের বিপর্যয়কারী পতন ঘটল। তখন কৃষকরা যাতে তাদের পাট চাষের এলাকাকে সীমিত রাখে তার জন্যে প্রচার চলতে থাকল, কিন্তু এই প্রচার বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেনি। ১৯৩০-৩১ ও ১৯৩১-২, এই দুই বছরে পাট চাষের এলাকা ৫০ শতাংশ হ্রাস পায়, কিন্তু ১৯৩৩-৩৪-এ তা আবার ২৫ শতাংশ বেড়ে যায় এবং ১৯৩৪-৩৫-এ ঐ একই স্তর বজায় থাকে, যদিও ১৯৩২, ১৯৩৩ ও ১৯৩৪-এ কাঁচা পাটের দামের অধোগতি অব্যাহত থাকে।[৬৩] ১৯৩৪-এর দি বেঙ্গল জুট এনকোয়্যারি কমিটি গ্রাহকদের আয়ের স্থিতিশীলতা রক্ষার প্রকৃত পন্থা বিষয়ে ঐকমত্যে আসতে ব্যর্থ হয়। বাংলার সরকার ১৯৩৫ থেকে স্বেচ্ছা-সীমাবদ্ধকরণ পরিকল্পনা চালু করে। চাষীদের বলা হয় যে, তারা আগের বছরে যতটা জমি চাষ করেছিল তার অংশমাত্র যেন এখন থেকে চাষ করে। পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনাটি আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা সাফল্য লাভ

করলেও একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত সংকটকালের বছরগুলিতে পাওয়া সুফলের মূলে ছিল পূর্ববর্তী সময়ে পাটের দাম কমে যাওয়া অথবা প্রতিকূল আবহাওয়া। দ্বিতীয় বেঙ্গল জুট চাষ এনক্যোয়ারি কমিটি ১৯৩৯-এ বাধ্যতামূলক সীমাবদ্ধকরণ সুপারিশ করে এবং বাংলার সরকার পাট-চাষের জমির পরিমাণ নির্ধারণে রেগুলেশন অব জুট এরিয়া অ্যাক্ট (১৯৪০) অনুযায়ী লাইসেন্স প্রথা চালু করে।

প্রথমে প্রচার ও তারপরে বাধ্যতামুলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে কৃষকদের আয় স্থিতিশীল রাখার সরকারি পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে সফল হতে পারে না তা যথেষ্ট মনোযোগী দৃষ্টি না দিলেও বোঝা যায়।[৬৪] প্রথমত, চাষীদের নির্দেশ দেওয়া ও প্রণোদিত করার কাজের পরিমাণের তুলনায় কৃষি দপ্তরে কর্মীর সংখ্যা কম ছিল। ১৯৩৭-এ নির্বাচিত প্রাদেশিক সরকার গঠনেব আগে বাংলার সরকার প্রস্তুত ছিল না বাধ্যতামূলক চাষ-নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত সংগঠন চালানোর সামান্য ব্যয়ভারও বহন করতে। দ্বিতীয়ত, যেকোনো যুক্তিসম্পন্ন চাষী ভাবতে পাবত, সরকারি নির্দেশ লঙ্ঘন করে চাষের এলাকা বাড়ালে তার লাভ হবে, যেহেতু অন্যান্য চাষীরা নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ মেনে উৎপাদন কমালে পাটের দাম বাড়বে।

তৃতীয়ত, এমন-কি স্বাভাবিক বছরগুলিতেও চাষীকে কোনো-না-কোনোভাবে প্রচুর পরিমাণ কমিশন দালালদের দিতে হতো এবং কলকাতার বাজারে পাটের দাম বৃদ্ধির ক্ষীণ প্রতিফলন ঘটত চাষীদের প্রাপ্ত দামে। প্রথম অবস্থায় দালালদের যে কমিশন দেওয়া হতো তা সম্ভবত অতিরঞ্জিত ছিল : চূড়ান্ত দামের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত দালালদের দেওয়া হতো বলে অনেকবার উল্লেখ করা হয়েছে এবং মনে করা হতো অন্যান্য কৃষি-পণ্যের তুলনায় পাটের ক্ষেত্রে মোট আয়ে দালালের অংশ বেশি ছিল।[৬৫] ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটির প্রথম বিপণন সমীক্ষার রিপোর্টে বিভিন্ন সমীক্ষার ভিত্তিতে দেখানো হয়েছে, ১৯৩৭-এর অক্টোবরে পাট-উৎপাদকদের প্রাপ্ত দামসমূহ কলকাতায পৌছনো দামের ৭৬.৪ থেকে ৮২ শতাংশের মধ্যে ছিল। অন্যদিকে গম তিসি উৎপাদকরা পেত কলকাতার দামের যথাক্রমে ৫৮.৬ শতাংশ ও ৮৩.২ শতাংশ এবং ভোগকারীদের দেয় দামের যথাক্রমে ৬৭.৭ ও ৯১.২ শতাংশ।[৬৬] যাইহোক, দালালদের পণ্য পরিচালনার খরচ অনেক সময়ে টাকার মূল্যে নির্দিষ্ট হতো এবং রেল ও স্টীমারে পরিবহণের ব্যয় মন্দার বছ্বগুলিতেও অপেক্ষাকৃতভাবে অনমনীয় ছিল, ফলে দাম কম-থাকার বছরগুলিতে পাট-চাষীদের আয়ের আরও বেশি অংশ কমিশন-বাবদ দিতে হতো।

এ সবের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, পাটচাষীদের ফসল ধরে রাখা বা মজুত করার ক্ষমতা নানা কারণে অতি সামান্যই ছিল। পূর্ববাংলার রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো ছিল না, তাই নদী-নালা শুকিয়ে যাওয়ার আগেই পাট-চাষীদের বড় বড় বাজারে পাট চালানের ব্যবস্থা করতে হতো। তাছাড়া, চাষীদের মজুত রাখার সুবিধা ছিল খুবই নগণ্য। পাটে আগুন লাগার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকত। মজুত রাখার উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে পাটের রঙ নষ্ট হওয়ার এবং তার দাম কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকত। এছাড়া ক্ষুদ্র ও ভূমিহীন চাষীদের নগদ টাকার প্রয়োজন মজুত ধরে রাখতে না-পারার আর সব কারণকে অতিক্রম করে যেত। ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটি তার প্রথম বিপণন অনুসন্ধানের সময়ে দেখেছিল, ১৯৩৭-৩৮-এ ক্রয়-বিক্রয়ের মরশুমে পূর্ববাংলার চাষীরা তাদের উৎপাদিত পাটের দুই-তৃতীয়াংশ জুলাই থেকে অক্টোবরের মধ্যে বিক্রি করে দিত। এই সময়ে জলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা সুবিধাজনক

থাকা সত্ত্বেও এরকম দেখা গেছে যে, ৩৮ শতাংশ পাট সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ বিক্রি হয়ে যেত।[৬৭] চাষীরা সাধারণত প্রভূত ঋণের ভার বহন করত এবং এই ঋণের বোঝা মন্দার বছরগুলিতে সম্ভবত বৃদ্ধি পেয়েছিল। মহাজনরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় ব্যবসায়ী হওয়ার ফলে চাষীদের উপর তাদের গভীর প্রভাব ছিল। সরকার বা জমিদারদের খাজনা আদায়ের সময়ও পড়ত পাট কাটার মরশুমে এবং পাটই ছিল প্রধান বাণিজ্যিক শস্য। এই পরিস্থিতিতে ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই চাষীরা তা বিক্রয়ে বাধ্য হতো, বিশেষ করে যখন তারা ফসল জামিন রেখে ঋণ নিত।[৬৮]

ফসল তোলার সময়ে পাটের গড় দাম ও খোলা পাটের গড় দামের মধ্যে তুলনা করে আই জে এম এ একটি রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্ট প্রকাশ করে যে, চাষীরা দালালদের মাধ্যমে পাট বিক্রি না করে ফসল তোলার সময়ে সরাসরি বিক্রি করলে অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতো।[৬৯] নিচের সারণিতে বাংলার পাটের (ওজনমুক্ত) গড় দাম স্তম্ভ ১-এ এবং খোলা পাটের (ওজনমুক্ত) গড় দাম স্তম্ভ ২-এ দেওয়া হলো।

সময়কাল	(১) টাকা	(১) আনা	(২) টাকা	(২) আনা
১৯১১-১২—১৯২০-২১	৭	৬	৯	১২
১৯২১-২—১৯৩০-১	৯	৭	১২	৬
১৯১৩-২—১৯৪০-১	৫	১	৬	১২

উপরের পরিসংখ্যান থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, কলকাতায় খোলা পাটের দাম বাংলায় ফসল তোলার সময়ের দামের তুলনায় ১৯১১-১২ থেকে ১৯২০-২১ পর্যন্ত ৩২ শতাংশ, ১৯২১-২২ থেকে ১৯৩০-৩১ পর্যন্ত ৩১ শতাংশ এবং ১৯৩১-৩২ থেকে ১৯৪০-৪১ পর্যন্ত ৩৩ শতাংশ বেশি ছিল। চাষীরা তাদের বেশির ভাগ পাট ফসল ওঠার সময়ে (যখন পাটের দাম সব থেকে কম থাকত) বিক্রি করে দিত, ফলে বছরের পরবর্তী সময়ে যখন পাটের দাম বাড়ত তখন সেই দামে বিক্রির সুযোগ তারা নিতে পারত না। ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটির প্রথম বিপণন সংক্রান্ত অনুসন্ধানের উপর ভিত্তি করে এবং মার্জিত পরিসংখ্যানের অভাব মেনে নিয়ে এই তথ্য পেশ করা যায় যে, ফসল তোলার সময়ে পাটের দাম এবং কলকাতার (ওজনযুক্ত) বার্ষিক গড় দামের মধ্যে পার্থক্যের তুলনায় ঐ সময়ে মফঃস্বলের দামের সঙ্গে কলকাতার দামের পার্থক্যের পরিমাণ বেশি ছিল। অনুসন্ধান কমিটির এই তথ্য আগেও উল্লেখ করা হয়েছে।

পাটের দাম স্থিরীকরণ সম্পর্কিত বিতর্কের অধিকাংশে চাষীদের প্রশ্নটি অনুক্ত ছিল, সালিসির মাধ্যমে পাটকলের মালিক ও পাট ব্যবসায়ীদের মধ্যে লাভের ভাগ-বাটোয়ারার বিষয়টি তাতে বেশি স্থান পেত। দাম-পতনের কালে এক পক্ষ অপর পক্ষকে সন্দেহ করত আগের তুলনায় এখন মুনাফার বেশি অংশ পাচ্ছে বলে। পূর্ব ভারতে বিনিয়োগের ধারা বিশ্লেষণে সমস্যাটি তাৎপর্যপূর্ণ যেহেতু নতুন বিনিয়োগের একটি বড় অংশের অর্থ আসত পাট ব্যবসায় মুনাফা থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। বস্তুত ভারতীয়দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সমস্ত নতুন পাটকলগুলি গড়ে উঠেছিল পাট ব্যবসার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তায়।[৭০]

তিরিশের দশকের মন্দার পরিস্থিতি হুগলি নদীর তীরবর্তী পাটকলগুলির কারিগরি দক্ষতার নমনীয়তা ও স্তর সম্পর্কে গভীর সন্দেহের কারণ ঘটাল। পাট শিল্প তার বাজারের জন্যে বিদেশের ফার্মের চেষ্টার উপর নির্ভর করত। কর্মী নিয়োগের ব্যাপারে ডাণ্ডির সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। ডাণ্ডির নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে শিক্ষানবিশরা আসত এবং তারাই কারিগরি ও পরিচালনার কাজের দায়িত্ব পেত। যতদিন পর্যন্ত পাটকলগুলি সম্প্রসারণশীল বাজার পেয়েছে ততদিন বিপণন বা কারিগরি গবেষণার দিকে নজর দেওয়া হয়নি। মন্দা আসার সময়ে দেখা গেল মিলগুলি অতিরিক্ত পরিমাণে অমসৃণ দ্রব্য এবং অতি সামান্য বিভিন্ন ধরনের মসৃণ দ্রব্য (যেগুলির উৎপাদনে ডাণ্ডির মিলগুলির বিশেষীকরণের মাত্রা উচ্চ পর্যায়ে ছিল) উৎপাদন করছে। সময়ের সাথে সাথে উৎপাদনের দিক থেকে পণ্য নির্বাচনে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। থলে তৈরির মোটা চটের কাপড় (Sacking) থেকে শক্ত ও মোটা চটের কাপড়ে (Hessian) এবং গানি ব্যাগ থেকে পাটের কাপড়ে। কিন্তু এই পরিবর্তনগুলি ঘটানো তুলনামূলকভাবে সহজ ছিল। উত্তর আমেরিকায় বাজারের প্রসার ঘটায় এবং হেসিয়ানের তুলনায় গানি ব্যাগের উপর আমদানি শুল্কের হার বেশি থাকায় উৎপাদনগত এই পরিবর্তনসমূহ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

তিরিশের দশকের মন্দা পাটশিল্পে জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। পাটজাত পণ্যের পরিবর্তসামগ্রীর উৎপাদন থেকে যে প্রতিযোগিতার উৎপত্তি ঘটে তার মোকাবিলার প্রশ্নটি বিবেচনা করার জন্যে আই জে এম এ ১৯৩৩-এ একটি সাব-কমিটি গঠন করে। অনুসন্ধান থেকে দেখা যায় যে, কাপড়ের থলে, সিসল গাছের আঁশজাত পণ্য (Sisal kraft), তুলোর কাপড়ের থলে শস্য উত্তোলক যন্ত্র এবং সিসল ও মেস্তার আঁশ পাটের বাজারকে উল্লেখযোগ্যভাবে সংকুচিত করেছিল।[৭১] এরকমও বলা হয়েছিল যে, 'পৃথিবীতে পাটের মতো আর কোনো শিল্প নেই যে নিজের ব্যবসা সম্পর্কে এত কম জানে।'[৭২] পাটের বিপণন সমস্যা তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে লন্ডনে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠনের পরামর্শ আই জে এম এ-এর সাব-কমিটি দিয়েছিল। এর সঙ্গে ১৯৩৪-এ ডঃ এস জে বেকারকে ভারতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল পাট শিল্পের পণ্য প্রস্তুতিকরণের বিষয়গুলি সম্পর্কে রিপোর্ট তৈরির জন্যে।

ড. বেকার দেখেছিলেন পাটজাত পণ্যের মূল প্রস্তুত প্রণালীগুলির প্রকৃতি ছিল যান্ত্রিক এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে এর পরিবর্তন ঘটেছে অতি সামান্যই। বহু যন্ত্র ছিল অত্যন্ত প্রাচীন, কিন্তু সেগুলির ব্যবহারে যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হতো এবং সাধারণ পণ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যের পক্ষে যন্ত্রগুলি উপযুক্ত ছিল। সহজসাধ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং পরিদর্শকদের বৈজ্ঞানিক ধারণার অভাব সীমিত করেছিল উদ্যোগ ও কারিগরি উন্নতিকে। পাটকলগুলি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করত যুক্তরাজ্যের যন্ত্র-প্রস্তুতকারীদের উপর, যে কারণে রসায়ন প্রযুক্তির উন্নতি সীমাবদ্ধ থেকে যায়। তাছাড়া ভারতের নিজস্ব প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে যন্ত্র তৈরি করা হতো না। ড. বেকার আরও লক্ষ্য করেছিলেন, মিলগুলির কারিগরি কর্মীদের পাটতন্তুর রাসায়নিক এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব ছিল। সর্বশেষে, শিল্পটিকে কারিগরি, শিল্প ও বাণিজ্য অথবা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় খবরাখবর দেওয়ার মতো কোনো সংস্থাও ছিল না। উন্নত দেশের গবেষণা ও শিল্পের কেন্দ্রগুলি থেকে

দূরত্ব এমন এক বিচ্ছিন্নতাবোধ সৃষ্টি করে যা থেকে পাটকলের কারিগরি কর্মীদের মধ্যে আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব গড়ে ওঠে।[৭৩]

ড. বেকারের রিপোর্ট অত্যন্ত আকর্ষণপূর্ণ। প্রথমত, তাঁর অনুসন্ধান থেকে জানা যায় যে, ব্রিটিশ পরিচালনকর্মী কারিগরি কর্মীদের প্রাধান্যের মূল কারণ তাদের কারিগরি জ্ঞানের উৎকর্ষতা নয়,[৭৪] এবং দ্বিতীয়ত, উন্নত দেশের সাহায্য ছাড়া প্রযুক্তিগত উন্নতি রুদ্ধ থাকার মূল কারণগুলি বিদেশী বা ভারতীয় নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত যে কোনো শিল্পের ক্ষেত্রেই একভাবে বর্তায়।

বিলম্বে হলেও পাটকলগুলি যখন পণ্য প্রস্তুতিকরণের পদ্ধতির উন্নতি সাধনের এবং নতুন পণ্য উদ্ভাবনের উপায় অন্বেষণ করছে (ডান্ডির মিলগুলি আগেই বিভিন্ন ধরনের মসৃণ দ্রব্য উৎপাদনে বিশেষত্ব অর্জন করেছিল), ভারত সরকারও সে সময়ে পাট শিল্পের ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহ ও গবেষণা সম্পর্কিত সংগঠনের উন্নতি ঘটানোর প্রয়াস নিয়েছিল। ১৯২৮-এ রয়্যাল কমিশন অন এগ্রিকালচার নীলের বাণিজ্যের সাদৃশ্যমূলক উদাহরণ দিয়ে পাটজাত পণ্যের বাণিজ্যে ভারতের একচেটিয়ামূলক অবস্থান সম্পর্কে অতিবিক্ত আত্মসন্তুষ্টির মনোভাবের বিরুদ্ধে সাবধান হতে বলেছিল। অতএব কমিশনের মতে একটি জুট কমিটি গঠন করাই সব থেকে বেশি কাম্য, যার কাজ হবে মাঠ থেকে কারখানা পর্যন্ত ব্যবসার সব শাখার স্বার্থের উপর নজর রাখা'।[৭৫] কমিশন পরামর্শ দেয়, আরও গবেষণা ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্যে যে ব্যয় হবে তা যেন কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে মেটানো হয়—যেহেতু পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি থেকে বিপুল রাজস্ব (১৯২৬-২৭-এ ৪৫ মিলিয়ন টাকা) ভারত সরকার পেয়ে থাকে।[৭৬]

১৯৩৬ পর্যন্ত ভারত সরকার এই বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। ঐ বছরে ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়। কমিটির কাজ হবে ভারতের পাট শিল্পের স্বার্থে 'কৃষি, প্রযুক্তি ও অর্থনীতি সংক্রান্ত গবেষণার দায়িত্ব নেওয়া, শস্য উৎপাদনের পরিমাণের আগাম অনুমান ও পরিসংখ্যানের মানোন্নয়ন, উন্নতি ঘটানো পাট উৎপাদনের, বীজ সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ও তার বন্টন-ব্যবস্থাব, ব্যাঙ্ক পরিষেবা ও পরিবহণের সুযোগ-সুবিধার এবং বিপণন ব্যবস্থার। দি ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটি প্রকৃতপক্ষে গঠিত হয়েছিল ১৯৩৭-এর জানুয়ারিতে, (ভারত সরকারের প্রারম্ভিক অনুদানের পরিমাণ, ১৯৩৬-৩৭-এর জন্যে ছিল ২৫০,০০০ টাকা)। আই জে এম এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কলকাতায় একটি ছোট আকারের গবেষণাগার স্থাপনের, তথ্য ও পরিসংখ্যান দপ্তর প্রতিষ্ঠার এবং বিদেশের প্রতিনিধি নিয়োগের। সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর হয়েছিল ১৯৩৭ থেকে। আশা করা হয়েছিল, প্রস্তাবগুলি রূপায়ণের ব্যয় ১৭৫,০০০ টাকার বেশি হবে না। আই জে এম এ-এর গবেষণা দপ্তর ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটির[৭৮] সহযোগে কাজ করতে থাকে কিন্তু ১৯৩৯-এর আগে এই গবেষণা থেকে কোনো উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যায়নি।

অনুবাদক : শ্যামল কুমার ঘোষ, সমর অধিকারী,
উজ্জ্বল দাস ও মনোজ কুমার সান্যাল।

উৎস ও টীকা

১। D. R. Walace, *The Ramance of Jute* (লন্ডন, ১৯২৮), পৃ. ৫৭।

২। *Handbook and Guide to Dundee and District* Published for the Dundee meeting of the British Association, ১৯১২ (ডান্ডি, ১৯১২), পৃ. ২৭৮

৩। *ঐ*, পৃ. ২৭৯-৩০১।

৪। দি সুরা জুট মিল্স্ কয়েক বছর ভারতীয় পরিচালনায় চলেছিল, কিন্তু কোম্পানিটির পরিচালনা হস্তান্তরিত হয় ১৯০৭-এ মাকলিয়ড অ্যান্ড কোম্পানিব কাছে। দ্রষ্টব্য Wallace, *The Romance of Jute* পৃ. ৩৫ এবং *IIYB, 1911*, পৃ. ৯৬।

৫। *Report of IIC* (PP 1919, XVII), পৃ. ১৫

৬। শ্যামনগর ও হেস্টিংসের মতো মিলগুলির পাটজাত পণ্যের নতুন বাজার সন্ধানের কাজ সম্পর্কে আলোচনার জন্যে দেখুন Wallace, *The Romance of Jute*, পৃ. ৩৭-৮।

৭। উপরে অধ্যায় ৬ দ্রষ্টব্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ও পরে ভারতীয় নিয়ন্ত্রণে ছিল এমন যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ জাহাজ ও স্টিমারের কোম্পানি নিবন্ধযুক্ত হতো বোম্বাইতে। দি বম্বে স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি লিমিটেড ১৯০৬-এ নিবন্ধভূক্ত হয়েছিল। কোম্পানিটির ম্যানেজিং এজেন্টস ছিল কিলিক, নিক্সন অ্যান্ড কোম্পানি, কিন্তু ১৯১৩-এ তার পরিষদ্‌বর্গের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন ভারতীয়। এই সময় তার নীট থোক ব্যয় হয়েছিল ৬,৬০৩,০০০ টাকা এবং তার ছিল ২৫ টি স্টিমার, ১৯টি স্টিম লঞ্চ, তাছাড়া ১৭৮টি ছোট নৌকা। ১৯০৬-এ এই কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠিত হয় শেপার্ড্স স্টিমার্স নামে একটি চালু নৌ-ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্রয় করার জন্যে। এই প্রতিষ্টানটির মালিক ও বিক্রেতা, হাজী ইসমাইল হাসমের ভগ্নস্বাস্থ্য এই হস্তান্তরের কারণ ছিল। দ্রষ্টব্য : *IIYB, 1914*, পৃ. ৪০০-২।

৮। ১৯১০-এ প্রধান স্টিমার কোম্পানিগুলির মধ্যে ছিল দি বেঙ্গল আসাম স্টিমশিপ কোম্পানি, এবং পোর্ট শিপিং কোম্পানি লিমিটেড (উভয়ই অ্যানড্রু ইয়ুল অ্যান্ড কোম্পানির পরিচালনাধীন ছিল), ক্যালকাটা স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি লিমিটেড (হোর মিলার অ্যান্ড কোম্পানির পরিচালনাধীন), ইন্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন অ্যান্ড রেলওয়ে কোম্পানি লিমিটেড (একটু অন্য নামে ১৮৪৪-এ নিবন্ধভক্ত হয়; ১৮৯৯-এ লন্ডনে বর্তমান নামে নিবন্ধভুক্ত হয়; *Investors Year Book*-এর ১৯১১ সালের সংস্করণে এর বিশদ বিবরণ উদ্‌ধৃত হয়) এবং রিভার্স স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি (স্টার্লিং কোম্পানি)। দেখুন *IIYB, 1922*, এবং Blake, *B. I. Centenary 1856-1956*।

৯। কলকাতার সঙ্গে পাট উৎপাদনকারী জেলগুলির প্রধান রেলপথের সংযোগ রক্ষা করত Eastern Bengal State Railway। কিন্তু কিছু পাট আসত আসাম

থেকেও। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে আংশিক পথের মাল পরিবহণের কাজ করত। দি ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে পশ্চিম বাংলার ও উত্তর বিহারের অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ পাট উৎপাদনকারী জেলাগুলির সঙ্গে কলকাতার সংযোগ রাখত। দ্রষ্টব্য Gov. India, Railway Department (Railway Board), *History of Indian Railways constructed and in progress, corrected up to 31st March 1945* (দিল্লী, ১৯৪৭), পৃ. ৭৮।

১০। যেমন ১৯০৩-এ ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের নতুন পরিচালক (বিদায়ী পরিচালকদের পদে) হলেন George Henderson and Company-র J. C. Shorrock, Gillanders, Arbuthnot and Company-র A. S. Gladstone এবং Turner, Morrison and Company-র J. M. G. Prophit দ্রষ্টব্য; *Bankers' Magazine*, জুলাই-ডিসেম্বর ১৯০৩, পৃ. ৩৮৭।

১১। A Wigglesworth, India's Commercial Fibres, *JRSA*, খণ্ড ৭৯, সংখ্যা ৪০৭৫, ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৩০, পৃ ১৩৬-৭। পাটের গুণগত মান সম্পর্কিত বিরোধগুলির বিচার-বিবেচনার দায়িত্ব ইটালি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশগুলি পাটের গুণগত মান সম্পর্কিত বিরোধগুলির বিচার-বিবেচনার দায়িত্ব The London Jute Association ও The Dundee Jute Association-এর উপর।

১২। নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ঢাকা এবং আরও কয়েকটি পাট উৎপাদনকেন্দ্রের বৃহত্তর বণিক প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম ছিল Duffus, Steel, Landale and Clark, Ralli Brothers, Sarkies and Company, David and Company এবং R. Sim and Company। এদের কাঁচা ও পাকা পাট বাঁধার পেষণযন্ত্র ছিল। কাঁচা গাঁট পাঠানো হতো কলকাতার মিলগুলির ব্যবহারের জন্যে অথবা রপ্তানির উদ্দেশ্যে। পাকা গাঁট সরাসরি সমুদ্রগামী জাহাজে বোঝাই করা হতো। ঐ সব পাট উৎপাদনকেন্দ্রের ইয়োরোপীয় বণিকরা সংগঠিত হয়েছিল বিভিন্ন বাণিজ্যিক অ্যাসেসিয়েশনের (যেমন, The Naraingaunge Chamber of Commerce) মারফৎ এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে তাঁদের শক্তিশালী প্রতিনিধিত্ব থাকায় ঐ সব অঞ্চলের যে কোনো ব্যাপারে তাঁরা যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলেন। দ্রষ্টব্য C.C. Mclead, The Indian Jute Industry, *JRSA*, খণ্ড ৬৪, সংখ্যা ৩২৯২, ২৪ শে ডিসেম্বর, ১৯১৫, পৃ. ১১০-১১; Eastern Bengal District Gazetteers, *Dacca*—B.C. Allen (এলাহবাদ, ১৯১২), পৃ. ১১০-১১ ১৮৮-৯, ১৫৭-৮; Bengal District Gazetteer's, *Pabna*—L.S.S. O' Malley (কলকাতা, ১৯২৩), পৃ. ১২৭। মৈমনসিংসহ প্রধান পাট উৎপাদনকারী জেলাগুলিতে পেষণযন্ত্রে গাঁইট বাঁধার ব্যবস্থা ছিল এবং বহুক্ষেত্রেই এই ব্যবসার মালিকানা লাভ করেন মাড়োয়ারী বণিকরা, বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে।
দ্রষ্টব্য : Mcleod, 'The Indian Jute Industry; Bengal District Gazetteers : *Pabna*, পৃ. ৬১ এবং *ঐ, Mymensingh*—F.A—Sachse (কলকাতা, ১৯১৭), পৃ. ৭৪।

১৩। উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য, *Proceedings of the Inter provincial Jute Conference held at Calcutta form the 2nd to 4th August, 1915*, Appendix C, (কলকাতা, ১৯১৫। পাট ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সরকারি অফিসারদের সভায় এ আর ম্যুরে, চেয়ারম্যান, আই জে এম এ, পাট ব্যবসায়ীদের নেতৃত্ব দেন। আবার যখন ১৯১৭-এ ডাণ্ডি চেম্বার অব কমার্স এবং লন্ডন জুট অ্যাসোসিয়েশন বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সে একটি স্মরণসভায় ব্রিটেন ছাড়া অন্য কোনো দেশে পাট রপ্তানির উপর শুল্ক আরোপ সুপারিশ করে, আই জে এম এ তখন পাট ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য পেশ করে। দ্রষ্টব্য : Imperial Institute, *Indian Trade Enquiry Reports on Jute and Silk* (লন্ডন, ১৯২১), পৃ. ৬-৯ এবং ২৭-৩২। বিভিন্ন সংগঠনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের জন্যে দ্রষ্টব্য Tyson, *The Bengal Chamber of Commerce and Industry 1853-1953*, পৃ. ৫৯-৭১। আরও দেখুন H. Sinha, 'Marketing of Jute in Calcutta,' *Indian Journal of Economics*, Conference Number, জানুয়ারি ১৯২৯, পৃ. ৫১৩-৪৭, বিশেষ করে পৃ. ৫৩৪-৯।

১৪। প্রায় প্রতি বছরই যে এই ধরনের বিরোধের মীমাংসা হতো পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে তার উদাহরণ পাওয়া যাবে। IJMA-র ১৯০০ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত *Reports of the Committee* থেকে।

১৫। উদাহরণের জন্যে দ্রষ্টব্য.: Calcutta Jute Dealers' Association, *Report of the Committee from 1st January to 31st December 1927* (কলকাতা, ১৯২৮), পৃ. ১২-১৭। এই রিপোর্টে অ্যাসোসিয়েশনের সভ্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিবদ্ধতার বিবরণ আছে।

১৬। উদাহরণের জন্যে Harrison, *Bird and Company of Calcutta*, পৃ. ৮২-৭ দ্রষ্টব্য। বার্ড অ্যান্ড কোম্পানি নতুন পাটকল স্থাপন করছিল এবং একই সঙ্গে বিপুল পরিমাণ কাঁচা পাট রপ্তানিও করছিল। ১৯১৪ সালে বার্ড অ্যান্ড কোম্পানি ছিল চটের থলির তৃতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক। দ্রষ্টব্য, IJMA, *Report of the Committee for the year ended 31st December 1914*, (কলকাতা, ১৯১৫), Statement XIX। Birknyre Brothers পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন ছাড়াও কাঁচা পাটের ব্যবসায়ে নিযুক্ত হলো। দ্রষ্টব্য, Playne and Wright , *Bengal and Assam Behar and Orissa*, পৃ. ৮৫।

১৭। ইন্ডিয়া জেনারেল স্টিম নেভিগেশন কোম্পানির বোর্ডে অ্যানড্রু ইয়ুলের প্রতিনিধিত্ব ছিল। ইনল্যান্ড ফ্লোটিলা কোম্পানি এই নেভিগেশন কোম্পাটির কুক্ষিগত হয় এবং ১৮৯৫-এ বেঙ্গল আসাম স্টিমশিপ কোম্পানি লিমিটেড উক্ত কোম্পানিগুলির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। দ্রষ্টব্য, Andrew Yule & Company, *Andrew Yule & Co. Ltd. 1863-1963*।

১৮। দ্রষ্টব্য, *Report of the Labour Enquiry Commission 1895* (কলকাতা ১৮৯৬), পৃ. ১, ৪৯-৫০; IJMA-র চেয়ারম্যান জে নিকলের ঐ

অ্যাসোসিয়েশনেব বার্ষিক সাধাবণ সভায বক্তৃতা . *Report of the Committee for the year ended 31st December 1905* (কলকাতা ১৯০৬), পৃ ii-iii।

১৯। দৃষ্টান্তেব জন্যে দেখুন IJMA-ব সাধাবণ বার্ষিক সভায জে ডি নিম্মোব বক্তৃতা, *ঐ,* পৃ ix-x, পাট চায বাড়ানোতে উৎসাহদানেব প্রযোজনেব সমর্থনে নিম্মো ডেভিড ইযুল থেকে উদ্ধৃতি দেন।

২০। Mackenna, *Agriculture in India* পৃ. ১২, ম্যাকেন্না উদ্ধৃত বিভাগীয কাজেব ১৮৯৩-৯৪-এ সবকারি বিভিয়্য থেকে।

২১। *ঐ,* পৃ ১-৪ এবং ৬০-৪; *Idem,* 'Scientific Agriculture in India', পৃ. ৫৩৭-৯ ও ৫৪২।

২২। ভারতে পাট চাষের বিভিন্ন দিকগুলির বিষযে সব থেকে ভালো গ্রন্থ N. C Choudhury, *Jute and Substitutes* (কলকাতা, ১৯৩৩) এবং এর পূর্ববর্তী খণ্ড *Jute in Bengal* (কলকাতা, ১৯০৮)।

২৩। দ্রষ্টব্য : Narain, *Impact of Price Maovements,* অধ্যায ৫।

২৪। IJMA, *Reports of the Committee*, বিভিন্ন বছবেব। ঐ রিপোর্টগুলিব পবিশিষ্ট থেকে মিলগুলির প্রকৃত উৎপাদন ও উপকরণ ব্যবহাবেব ব্যয সংক্রান্ত পরিসংখ্যান নেওয়া হয়েছে।

২৫। IJMA, *Report of the Comittee for the year ended 31st December 1914* (Calcutta, 1915), পৃ. ৩-৫ এবং ৪৮-৫১। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের কাছে মূল অভিযোগটি পেশ করেছিল নারায়ণগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স যেটি সংগঠিত হয়েছিল ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীদের দ্বারা। এই বিষয়ে বেঙ্গল চেম্বাব অব কমার্স আই জে এম এ-এর মতামত জানতে চেয়েছিল। কৃষিতে সবকারি ভূমিকার ক্ষেত্রে বোম্বাই ও বাংলার মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। বোম্বাইয়ে সরকার সাধারণত প্রতি বছরেই বহু কোটি টাকা কৃষি ঋণের ব্যবস্থা রাখত অথচ বাংলায় ঐ ধরনের ঋণ অতি সামান্যই দেওয়া হতো। ঢাকার কালেক্টারের কাজটিও এ ক্ষেত্রে অসাধারণ। ঋণ দানের প্রস্তাব দেওয়ার আগে তিনি নারায়ণগঞ্জ চেম্বার অব কমার্সকে বিষয়টি জানানোর প্রয়োজন বোধ করেছিলেন।

২৬। রেললাইন ও ওয়াগনের চূড়ান্ত অভাব সম্বন্ধীয় দৃষ্টান্তের জন্যে দ্রষ্টব্য ***Report of the Committee on the administration and working of Indian Railways*** **(PP. 1921, x), PP. 7-8; অন্যান্য প্রতিযোগী ব্যবসায়ের তুলনায় পাটের বাণিজ্যের প্রাধান্য সম্পর্কিত দুটি বিশেষ দৃষ্টান্তের জন্যে দ্রষ্টব্য IJMA,** ***Report of the Committee for the Year ended 31st December, 1912*** **(Calcutta, 1913), PP. iv-v। ইস্টার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ের প্রতিনিধি আশ্বাস দেন যে, তিনি কয়লার অভাবে (অর্থাৎ কয়লা পরিবহণযোগ্য ওয়াগনের অভাবে) একটি কারখানাও বন্ধ হতে দেবেন না। স্যার হেনরি বার্ক পাট পরিবহণ ঘটিত অভিযোগ জানার পরে উত্তর-পশ্চিম রেলওয়ে থেকে ৭০০ ওয়াগন সরিয়ে ইস্টার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ের হাতে দেন।**

২৭। ১৯০৫-এ কিছু সময়ের জন্যে চুক্তিটি অকেজো থাকে, কিন্তু অল্প কালের মধ্যে নতুন চুক্তি সম্পাদিত হয়। দ্রষ্টব্য, IJMA-র বার্ষিক সাধারণ সভায় ১৯০৫-এর ২৭শে ফেব্রুয়ারিতে প্রদত্ত চেয়ারম্যানের বক্তৃতা *Report of the Committee for the year ended 31st December 1904* (কলকাতা ১৯০৫), পৃ. viii-ix, এবং *Report of the Committee for the year ended 31st December 1911* (কলকাতা ১৯১২), পৃ. iv (চেয়ারম্যানের ভাষণ, ইনি জানান যে, পরিবহণ কোম্পানিগুলির সঙ্গে আরও ৫ বছর মেয়াদী একটি নতুন চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছে।

২৮। দ্রষ্টব্য Wallace, *Romance of Jute*, পৃ. ৪৭-৫১; IJMA, *Report of the Committee for the years before World War I* ('Decision' শিরোনামাযুক্ত অনুচ্ছেদটি); Tyson, *The Bengal Chamber of Commerce and Industry*, পৃ. ৬৭-৮।

২৯। উদাহরণস্বরূপ দেখুন জুট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের ১৯০২-র বার্ষিক সাধারণ সভায় এবং ১৯২৯-এ IJMA-র বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রদত্ত চেয়ারম্যানের ভাষণ : *Report of the Commitee for the years 1901, and 1928*, যথাক্রমে পৃ. ১ ও ১৩।

৩০। শ্রমের সময় সম্পর্কিত চুক্তিসমূহ ও সে গুলির ফলাফলের বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য : *Report of the Jute Enquiry Commission* (দিল্লী,১৯৫৪), পরিশিষ্ট iv এবং Sir Alexander R. Murray, ' The Jute Industry', *JRSA*, ৮২, সংখ্যা ৪২৬৩, অগাস্ট ৩,১৯৩৪, পৃ. ৯৮১-২।

৩১। IJMA, *Report of the Committee for the year ended 31st September 1910* (কলকাতা, ১৯১১) পৃ. iii-iv, এবং *Report of the Committee for the year ended 31st December 1911* (কলকাতা, ১৯১২), পৃ. iii।

৩২। ১৯০৭-৮ এ ফসলের প্রকৃত পরিমাণ পূর্বাভাষের (৯,৭৬০,০০০ বেল) তুলনায় ১,০৮০,০০০ বেল কম ছিল। ১৯০৮-৯ এ পূর্বাভাসের (৬,৪০০,০০০ বেল) তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ ২,৩৮০,০০০ বেল বেশি ছিল। ১৯০৯-১০-এ পূর্বাভাষের (৭,৩০০,০০১ বেল) তুলনায় ১,৪৭০,০০০ বেল বেশি ছিল। ১৯১০ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত পাট শিল্পে মন্দার প্রধান কারণ হিসাবে উপরোক্ত পার্থক্যের বিষয়টিকে সম্ভবত উল্লেখ করা যায়।

৩৩। দৃষ্টান্তের জন্য দেখুন Mc Leod (IJMA'র সভাপতি) : 'The Indian Jute Industry', পৃ. ১০৭ : ' ইতিমধ্যে বর্তমানের ব্যবস্থা থেকে কলকাতা ও লন্ডনে চালু হয়েছে এক ধরনের বেশ স্বাস্থ্যকর জুয়াখেলা যা পাটের ব্যবসায়ীদের সুযোগ করে দিয়েছে বিস্তর অর্থ উপার্জনের অথবা ক্ষতি স্বীকারের। *IIYB*'র (১৯১১, পৃ. ৬৮) মতানুসারে , কোনো পাটকলে চালু অবস্থায় তিন ধরনের কাজ করতে হয়: কাঁচা পাট কেনা, বয়ন করা এবং প্রস্তুত করা পণ্য বিক্রয় করা। এর মধ্যে প্রথম ও শেষ কাজটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং দূরদর্শিতা ও বিচার বিবেচনার ক্ষমতা যথেষ্ট মাত্রায় দাবি করে।'

৩৪। এই তথ্যটি সংগৃহীত হয়েছে *IIYB*, ১৯১১, (পৃ. ৭১) থেকে।

৩৫। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে নতুন ইউনিটগুলির উৎপাদন-ক্ষমতা বিবেচনা করে ধরে নেওয়া হতো ৪০০ তাঁত-যুক্ত কোনো কারখানার আয়তন আরম্ভ করার পক্ষে নিবাপদ। অর্থ-বিনিয়োগের পরিমাণের দ্বারা আয়তন নির্ধারণ করা যেত না যেহেতু একই পরিচালনার অধীনস্থ বিভিন্ন ইউনিটগুলির আয়তন কম-বেশি একই রকমের হতো। বার্ড অ্যান্ড কোম্পানির পরিচালনায় ডালহাউসির নিবন্ধভুক্তি হয় ১৯০৩-এ, অকল্যান্ডের ১৯০৮-এ। ১৯০৯-এ অকল্যান্ডের ৪০০ টি এবং ডালহাউসির ৪৩০টি তাঁত ছিল (আরম্ভে ডালহাউসি তাঁতের সংখ্যা ছিল ৪০০টি)। *HYB*, ১৯১১-এ পরিমাপ (পৃ. ৬৮) করে যে, সে সময়ে একটি পাটকলে তাঁত-পিছু বিনিযোগের প্রয়োজনীয় পবিমাণ ছিল ৬,০০০ টাকা থেকে ৭,০০০ টাকা। এই হিসাবের ভিত্তিতে দেখানো হয় যে, কোন পাটকলে ন্যূনতম মোট স্থায়ী বিনিযোগের পরিমাণ দাঁড়াত ২,৪০০,০০০ টাকা থেকে ২,৮০০,০০০ টাকা—কার্যকরী মূলধন বাদ দিয়ে। *Capital* (কলকাতা, ২০শে জানুয়ারি, ১৯১২), পত্রিকায় 'Our Jute Mills শিরোনামায প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে অবশ্য বলা হয় যে, কারখানা স্থাপনার ব্যয় বাড়ছে, এবং সে সময়ে ৪০০টি তাঁত যুক্ত কারখানায় তাঁত-পিছু ব্যয়ের পরিমাণ ৮,২৫০ টাকা (এর মধ্যে কারখানা তৈরির মেয়াদ পর্যন্ত ঋণের দরুন ১০ শতাংশ হারে হিসাব করা সুদ-ব্যয় ধরা হয়েছে, এটি বাদ দিয়ে তাঁত-পিছু মূল ব্যয় দাঁড়ায় ৭,৫০০ টাকা। এই ভাবে হিসাব করলে যে কোনো কার্যকরী ইউনিট স্থাপনের ব্যয় উঠে যাবে ৩,৩০০,০০০ টাকায়।

৩৬। Wallace. *Romance of Jute*, পৃ. ৬৩-৭০। ভারতে নিবন্ধভুক্ত মিলের তালিকা প্রস্তুত করেছিল *IIYB*। মিলগুলির ইতিহাস-সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল *Capital* (কলকাতা) থেকে (মার্চ ৩, ১৯০৪; জানুয়ারি ৫, ১৯০৫; জানুয়ারি ১২,১৯০৫; ফেব্রুয়ারি ২২,১৯০৬; জানুয়ারি ১৯,১৯০৬; মার্চ ১৯,১৯০৮ এবং জুন ২০,১৯১২)।

৩৭। *IIYB*, ১৯১১, পৃ. ৬৩-৪।

৩৮। ১৯০৮ও ১৯০৯-এ স্কটল্যান্ডে নিবন্ধভুক্ত কোম্পানিগুলির সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ পণ্যে (কাঁচা পাটসহ) বিনিয়োগ এবং মোট সম্পত্তির আর্থিক মূল্য নিচে দেওয়া হলো :

	হাতে থাকা মজুত			মোট সম্পত্তি		
	£	s	d	£	s	d
চাঁপদানি (এপ্রিল ৩০,১৯০৮)	২৯৬,৬৯০	১৮	৩	৪৯৬,৩১৫	৬	৬
অ্যাংলো ইন্ডিয়া (ফেব্রুয়ারি ২৮,১৯০৯)	২৮০,৮৬৮	১৯	৬	৯৭৩,৪৩৩	২	৬
ইন্ডিয়া জুট (ডিসেম্বর ৩১,১৯০৮)	১৩১,৬২৩	১০	১	৪০৮,৮৬৬	৩	১১
শ্যামনগর (ডিসেম্বর ৩১,১৯০৮)	২০৮,০৫০	১৬	০	৬১৭,৬৬৮	৬	৫
টিটাগড় (ডিসেম্বর ৩১,১৯০৮)	৪০০,৩০৮	৪	২	১,০৮৯,৪৯৯	১৫	২
ভিক্টোরিয়া (ডিসেম্বর ৩১,১৯০৮)	২২৩,৫২৫	১৫	০	৬১৮,৫৯১	১২	১০

৩৯। জুট কোম্পানিগুলি প্রত্যক্ষভাবে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নিতে পারত এবং তারা যে-সমস্ত ম্যানেজিং এজেন্টস্‌দের পরিচালনায় চলত তাদের কাছ থেকে ঋণ নেওয়া রীতি-বিরুদ্ধ ছিল। দ্রষ্টব্য : *Capital* (কলকাতা) জানুয়ারি১২,১৯০৫। নগদের চাহিদা এবং সুদের হার পাটের বাণিজ্যিক অস্থিরতায় কীভাবে সাড়া দিত তা জানা যায় ১৮৯৯ ও ১৯১৩ সালে ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের কার্যকলাপ সম্বন্ধীয় রিপোর্ট থেকে। দ্রষ্টব্য, যথাক্রমে *Bankers' Magazine*, জানুয়ারি-জুন ১৯০০, পৃ. ৭৬১-২ এবং জানুয়াবি-জুন ১৯১৪, পৃ ৬৪৬।

৪০। পুনবপ্তানির সম্ভাবনা ধবে : যুক্তরাজ্যকে প্রেরিত রপ্তানির এক তৃতীয়াংশেব পুনর্রপ্তানি ঘটত ইয়োরোপীয় কন্টিনেন্টে । দ্রষ্টব্য, Imperial Institute , *Indian Trade Enquiry Reports on Jute and Silk*, পৃ. ৪।

৪১। কাজের সময়-সংখ্যার জন্যে দেখুন Sir Alexander R. Murray , 'The Jute Industry', *JRSA*, ৮২, সংখ্যা ৪২৬৩, অগাস্ট ৩, ১৯৩৪, রেখা-চিত্র ১, পৃ. ৯৮২; অন্যান্য তথ্যের জন্যে Gov. India, CISD : *Review of the trade of India* (Calcutta) for the war years. আরও দেখুন Indian Munitions Board, *Industrial Handbook, 1919* (কলকাতা, ১৯১৯), পৃ ৩৬৩-৭।

৪২। Gov. India, CISD · *Review of the trade of India for 1917-18* (কলকাতা, ১৯১৮), পৃ. ২১।

৪৩। দ্রষ্টব্য *IIYB*, ১৯২১।

৪৪। নিচে লেখা সংখ্যাতথ্য থেকে দেখা যায় যে ভারতে প্রস্তুতিকৃত কাঁচা পাটের পরিমাণ যুদ্ধের সময়ে বিস্ময়করভাবে বৃদ্ধি পায়, যুদ্ধের আগেও যদিও তা উর্ধ্বমুখী ছিল।

সময়	ভারতীয় মিলে ব্যবহৃত পাটের পরিমাণ (মোট পরিমাণের শতাংশে)
১৮৯৩-৭ (গড়)	৩১
১৮৯৮-১৯০২ (গড়)	৩৯
১৯০৩-৭ (গড়)	৪২
১৯০৮-১২ (গড়)	৪৭
১৯১৩	৪৯
১৯১৪	৫৯
১৯১৫	৬১
১৯১৬	৬৩
১৯১৭	৭১
১৯১৮	৬৫
১৯১৯	৫৭
১৯২০	৬৬

সূত্র : IJMA , ***Report of the Committee for the year ended 31st December 1921*** **(কলকাতা, ১৯২২), পৃ. ১৬৩।**

৪৫। দ্রষ্টব্য IJMA , *Report of the Committee for the year ended 31st December 1911*, পৃ. ৯-১০, এবং *Report of the Committee for the year ended 31st December 1912,* পৃ. ৫-৬। অভিযোগ ছিল, গোলাপী ও সাদা পাট কেনা-বেচার চুক্তি সম্পূর্ণ কাল্পনিক, এবং ভিতরেব বাইরেব এই ফাটকা ছিল বিশুদ্ধভাবে এক রকমের জুয়া। 'জুয়াড়িদের' পাটের ব্যবসার সঙ্গে যথেষ্ট যোগাযাগ ছিল, তা না-হলে অলীক হস্তান্তর পাটেব দামের গতি-প্রকৃতিকে প্রভাবিত করতে পারত না।

৪৬। যেমন দেখুন IJMA, *Report of the Committee for the year ended 31st December 1928*, (কলকাতা, ১৯২৯) পৃ. ১৮-১৯ এবং ১২০-১।

৪৭। ১৯২২-এ মাড়োয়ারী অ্যাসোসিয়েশন (কলকাতা) প্রদত্ত লিখিত সাক্ষ্য দাবি করে যে, পাটকলে ভারতীয়দেব শেয়ার যখন ৬০শতাংশেব কম ছিল না তখনও ইয়োরোপীয় ম্যানেজাররা ভারতীয় ব্যবসায়ী মারফৎ পাট কিনত না : *Evidence* (Report of the Indian Fiscal Commission), খণ্ড ২ (কলকাতা, ১৯২৩), পৃ. ৪১৯। আরও দেখুন উপরের ৬.৯ এবং ৬.১০ অনুচ্ছেদগুলি।

৪৮। অ্যানড্রু ইয়ুল অ্যান্ড কোম্পানি ও বার্ড অ্যান্ড কোম্পানি পরিচালিত মিলগুলি, অর্থাৎ দুটি সব থেকে বড় গ্রুপের মিলগুলি প্রায়শই ১০০ শতাংশ ও তারও বেশি বাৎসরিক ডিভিডেন্ড ঘোষণা করত। এমন কি ক্যালেডোনিয়ানের (১৯১৬-এ নিবন্ধভুক্ত) নতুন মিলও ১৫০ শতাংশ হাবে ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছিল ১৯২০-র নভেম্বরে সমাপ্ত অর্ধবছরের জন্যে। কিন্তু শুধুমাত্র এই মিলগুলিই যে উঁচু হারে ডিভিডেন্ট দিচ্ছিল তা নয়। কেট্‌লওয়েল, বুলেন অ্যান্ড কোম্পানি পরিচালিত ফোর্ট গ্লস্টার নামের অন্য একটি মিলও ১৯২০-র অক্টোবর থেকে ১৯২৫-র সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যে পরিমাণ ডিভিডেন্ড দিয়েছিল তা গড়ে দাঁড়ায় বাৎসরিক ১১৫.৫ শতাংশে। কিনিসন (এফ ডব্ল্যু হিলজার্স অ্যান্ড কোম্পানি পরিচালিত) ৩৫০ শতাংশ হারে ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছিল ১৯২১-এর ৩১শে মার্চে সমাপ্ত অর্ধবছরের জন্যে।

৪৯। দ্রষ্টব্য Tyson, *Bengal Chamber of Commerce and Industry*, পৃ. ১১২।

৫০। East India Jute Association Limited, Calcutta : *Annual Report for the year ended 30th June, 1928* (অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম রিপোর্ট) কলকাতা, ১৯২৮, পৃ. ২।

৫১। বিড়লা ব্রাদার্স, স্যার স্বরূপচাঁদ হুকমচাঁদ, ছাজুরাম, আদমজি হাজি দায়ুদ এবং অন্যান্য ভারতীয় ফার্মগুলি যুদ্ধের পর থেকে পাট ও পাট বস্ত্রের রপ্তানির সূত্রে জাহাজকে অনুমতিপত্র (শুল্কবিভাগের দাবিদাওয়া পূরণ সংক্রান্ত) দেওয়ার বিবরণে (accounts of clearaces) উল্লেখযোগ্য স্থান পেয়েছে। কোনো কোনো বছরে বিড়লা ব্রাদার্স কাঁচা পাটের ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় স্থান (প্রথম র‍্যালি ব্রাদার্স) পেয়েছে।

৫২। দ্রষ্টব্য, Gov. India, CISD : *Review of the trade of India in 1926-27*, পৃ. ৫৮-৯; *IIYB, 1926-7*, পৃ. ১৮১।

৫৩। *IIYB*, *1928-9*, পৃ. ১৮৩।

৫৪। ঐ, পৃ. ১৮৩। বেগ, ডানলপ অ্যান্ড কোম্পানি পাটকল পরিচালনার ক্ষেত্রে নবাগত ছিল না; এরা অ্যালায়েন্স জুট মিলস্ কোম্পানি লিমিটেডের (১৮৯৫-এ নিবন্ধভুক্ত) ম্যানেজিং এজেন্টস্ হিসাবে কাজ করেছিল। অ্যালায়েন্স কোম্পানিটি খুবই লাভজনক উদ্যোগ হিসাবে চিহ্নিত ছিল এবং, এমনকি ১৯২৫ সালেও ১০০ শতাংশ হারে বাৎসরিক ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছিল।

৫৫। হিসাবের খাতায় যেখানে মজুত ছাড়ার বহু মিল মজুত আড়াল করে রাখত 'ব্যয়ের সমান বা তার থেকে কম' মূল্যের পাটের মজুত হিসাবে। আবার অনেক মিলের তাঁতের প্রকৃত সংখ্যা প্রকাশিত হিসাবের তুলনায় বেশি থাকত। ১৯৩০-এ IJMA-র তাঁতের গণনায় এই তথ্য সমর্থিত হয়। গণনা থেকে প্রকাশ পায়, মিলগুলির তাঁতের প্রকৃত সংখ্যা ৫৮,৬৩৯ যেখানে প্রকাশিত হিসাব ৫২,৯২৯। অর্থাৎ তাঁতের প্রকৃত সংখ্যা প্রকাশিত তথ্যের তুলনায় ১০.৭৯ শতাংশ (নতুন নির্মাণ ধরে নিয়ে) বেশি। দ্রষ্টব্য IJMA. *Report of the Committee for the year ended 31st December 1930* (কলকাতা, ১৯৩১), পৃ. ২১-৩; *IIYB*, *1929-30*, পৃ. ১৮৮।

৫৬। বিতর্ক ও চুক্তিটির বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য Gov. India, CISD : *Review of the trade of India in 1931-32*, পৃ. ৮২-৪, এবং *idem*, *Review of the trade of India in 1932-33*, পৃ ৮১-২; Bengal National Chamber of Commerce, *Report of the Committee for the Year 1932* (কলকাতা, ১৯৩৩), পৃ. ৬২-৩।

৫৭। চ্যাটার্জি ও সিন্‌হার পরিমাপ অনুসারে প্রথম শ্রেণীর (First Marks) কাঁচাপাটের ক্ষেত্রে রপ্তানির দাম (লন্ডনে)-স্থিতিস্থাপকতা ছিল-০.৩৭ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পোৎপাদন সাপেক্ষে কাঁচা পাটের রপ্তানি স্থিতিস্থাপকতা ছিল ০.৪৫। T. P. Chatterjee ও A. R. Sinha, 'A Staistical Study of the Foreign Demand for Raw Jute', *Sankhya*, খণ্ড ৫, ১৯৪০-৪১, পৃ. ৪৩৩-৮। (এই পরিমাপের ক্ষেত্রে ১৯২০ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত প্রাপ্ত পরিসংখ্যান (time Series) ব্যবহার করা হয়েছে)। Nanda K. Choudhury তাঁর 'An Econometric Analysis of the Import Demand Function for Burlap (Hessian) in the U.S.A', (*Econometrica*, খণ্ড ২৬, ১৯৫৮, পৃ. ৪১৬-২৮) প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, বার্লাপের (ক্যানভাসজাতীয় মোটা চটের কাপড়) চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (ক) বার্লাপেরও ম্যানিলা ক্রাফট্ র‍্যাপিং পেপারের দামের অনুপাত সাপেক্ষে ১৯১৯-২৯ ও ১৯৩০-৪০ সময়কালে যথাক্রমে —০.৩০৬ এবং—০.৭৪১, (খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি পণ্য বিক্রয়ের সাপেক্ষে ১৯১৯-২৯ ও ১৯৩০-৪০ এ যথাক্রমে ০.২৬৭ ও ০.৪৮৫ এবং (গ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পোৎপাদনে পরিবর্তনের সাপেক্ষে ১৯১৯-২৯-এ ০.৮৫২ ও ১৯৩০-৪০-এ ১.৩১৪ ছিল।

৫৮। ১৯৩১-৩২ থেকে পাটজাত পণ্যের ভারতীয় চাহিদার স্পষ্ট উর্ধ্বমুখী প্রবণতা ছিল, শুধুমাত্র ১৯৩৪-৩৫-এ এর ব্যতিক্রম দেখা যায়; IJMA-র সদস্য মিলগুলি

পশ্চিমের প্রদেশে জলপথে যে পরিমাণ পণ্য পাঠিয়েছিল তার পরিমাণ ১৯৩১-২-এর ৬০,০০০ টন থেকে বেড়ে ১২১,০০০ টনে দাঁড়ায় ১৯৩৮-৩৯-এ এবং ১৩০,০০০ টনে ১৯৩৯-৪০-এ।

৫৯। ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ের প্রতিনিধিত্বে ছিল বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স, দি বেল্ড্ জুট অ্যাসোসিয়েশন, দি বেল্ড্ জুট শিপার্স, অ্যাসোসিযেশন, দি ক্যালকাটা জুট ডিলার্স অ্যাসেসিয়েশন, দি ক্যালকাটা জুট ফেব্রিক্স্ সিপার্স, অ্যাসোসিয়েশন, আই জে এম এ, এবং জুট ফেব্রিক্স্ ব্রোকার্স অ্যাসোসিযেশন; ভারতীযদেব পক্ষে ছিল দি বেঙ্গল জুট ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন, দি বেঙ্গল জুট গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিযেশন, দি বেঙ্গল ন্যাশেনাল চেম্বার অব কমার্স, দি ইস্ট ইন্ডিযা জুট অ্যাসোসিযেশন দি গানি ট্রেডার্স, অ্যাসোসিয়েশন, দি ইন্ডিয়ান চেম্বাব অব কমার্স, দি জুট বেলার্স, অ্যাসোসিয়েশন এবং দি মাড়োয়ারী অ্যাসোসিযেশন। বিভিন্ন সভার কার্যবিববণীব জন্যে দ্রষ্টব্য · East India Jute Association Ltd , *Proceedings of the Sixth Annual General Meeting* (কলকাতা, ১৯৩৪), পৃ. ১৫-১৯।

৬০। Indian Central Jute Committee, *Report on the Marketing and Transport of Jute in India, First Report* (কলকাতা, ১৯৪০), অধ্যায় ৭, 'Prices'।

৬১। *ঐ*, পৃ. ২০৪।

৬২। পাট চাষের এলাকা হ্রাসের যে প্রচার এগ্রিকালচাবাল অ্যান্ড কমার্সিয়াল ডেভলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন করছিল সে বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত দিতে থাকে IJMA-র কমিটি। কমিটিটি সঙ্গতভাবেই ঐ প্রচারকে অকার্যকর বলে মনে করে যেহেতু চাষী প্রতিযোগী শস্যের দামসমূহে প্রভাবিত হয়। IJMA, *Report of the committee for the year ended 31st December 1921* (কলকাতা, ১৯২২), পৃ. ৭-৮।

৬৩। ব্রিটেনেব শাসনাধীন ভারতবর্ষে পাটের বিভিন্ন দাম ও পাট-চাষেব এলাকা সম্পর্কে তথ্যসমূহের উপোযোগী সারাংশের জন্যে দ্রষ্টব্য . Narain, *Impact of Price Movements*, পৃ. ১৬৫-৬ এবং ১৮১-২।

৬৪। বাংলাদেশে পাটচাষের বিশেষ প্ররিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দাম ও আয়ের স্থিতিশীলতা রক্ষার সমস্যার আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য A. I. Macbean, 'Problems of Stabilization Policy in Underdeveloped Countries,' *Oxford Economic Papers*, N.S., খণ্ড ১৪, ১৯৬২, পৃ. ২৫১-৬৬। চাষীদের প্রাপ্ত দামের বিভিন্নতা, রপ্তানির দামসমূহ, অথবা দামের ঋতু অনুযায়ী ওঠানামা এবং প্রস্তুত করা পণ্যগুলির দামের উপর প্রভাব—এই বিষয়গুলির প্রতি ম্যাকবিয়ান যথেষ্ট মনোযোগ দেননি।

৬৫। দৃষ্টান্তের জন্যে উল্লেখযোগ্য ভারত সরকারের কৃষি-উপদেষ্টা B. Coventry-র বক্তৃতা : *Proceedings of the Interprovincial Jute Conference held at Calcutta from the 2nd to the 4th August, 1915* (কলকাতা, ১৯১৫),

পৃ. ৩; তাছাড়া, Bengal District Gazetteers, *Pabna*, পৃ. ৬৯, এবং M. Azizul Huque. *The Man Behind the Plough* (কলকাতা, ১৯৩৭), অধ্যায় ৪, 'Jute' (পৃ. ৫৮-৭৮)

৬৬। Indian Central Jute Committee, *Report on the marketing and transport of Jute in India, First Report*, পৃ. ২১৬-১৮; গম ও তিসির তথ্য উদ্‌ধৃত হয়েছে এই সূত্র থেকে . Directorate of Marketing and Inspection, Agricultural Marketing Series : No 1 : *Report on the marketing of wheat in India* (দিল্লী, ১৯৩৭); পৃ. ৪৪০, এবং No. 8 : *Report on the marketing of linseed in India* (দিল্লী, ১৯৩৮), পৃ. ৩২৮।

৬৭। Indian Central Jute Committee, *Report on the marketing and transport of Jute in India, First Report*, পৃ. ৬৫।

৬৮। *ঐ*, পৃ. ৬১-৮৬।

৬৯। দ্রষ্টব্য IJMA. *Report of the Committee for the year ended 31st December 1949* (কলকাতা, ১৯৫০) পৃ. ১১৬-১৭।

৭০। এই সময়কালে চাষীর প্রতিক্রিয়ার যুক্তিগ্রাহ্যতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করা হয়নি। দামের পতন চাষীর বিকৃত সাড়ার কোনো সাক্ষ্যও ছিল না। এ আর সিনহার পরিমাপ অনুসারে বিগত বছরের পাটের দাম সাপেক্ষে বাংলায় পাটের যোগান-স্থিতিস্থাপকতা ছিল ০.৬৫। A.R. Sinha, 'A Preliminary Note on the Future Supply of Raw Jute', Sankhya, খণ্ড ৫, ১৯৪০-১, পৃ. ৪১৩-১৬। পরবর্তীকালে রব্বানি দেখিয়েছেন, ব্যাখ্যামূলক চলনরাশি হিসাবে আগের বছরের পাটের এলাকা ও আগের মরশুমের পাট ও চালের দামের অনুপাত ধরা হলে সমীকরণটি ১৯১২-১৩ থেকে ১৯৩৮-৯ সময়কালের মধ্যে বাংলায় পাট চাষের এলাকার ওঠানামার সবথেকে ভালো ব্যাখ্যা দেবে। এই 'নিয়ন্ত্রিত (adjestment) মডেলটি' অনায়াসে ব্যাখ্যা করতে পারে ১৯৩১-২-এ পাটের দামের আকস্মিক পতনের পরের আবস্থায় পাটের যোগানের আপেক্ষিক অস্থিতিস্থাপকতার বিষয়টি। রব্বানির পরিমাপ অনুসারে পাট ও চালের দামের অনুপাত সাপেক্ষে পাট চাষ এলাকার স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন স্থিতিস্থাপকতা যথাক্রমে ০.৫২ এবং ০.৯০ : Rabbani, 'Economic determinates of jute production in India and Pakistan'. এই গ্রন্থের অধ্যায় চারও দ্রষ্টব্য।

৭১। *Report of the Bengal Jute Enquiry Committee 1933* (Finlow Committee), খণ্ড ১ (আলিপুর, ১৯৩৪), পরিশিষ্ট ৭ : 'Competition, Research and the Expansion of Markets for Jute Goods', Circular No. 64-D, dated 5 June 1933, from IJMA to all members of the association.

৭২। *ঐ*, পৃ. ৬৪।

৭৩। S. G. Barker, *Report on the Scientific and technical development of the jute manufacturing industry in Bengal* (কলকাতা, ১৯৩৫), বিশেষত পৃ. ৩৮-৪০। তাছাড়াও উল্লেখযোগ্য রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টসের একটি সভায় পেশ করা ডঃ বার্কারের মন্তব্য, এই সভায পাট সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন Sir Alexander Murray, *JRSA* ৮২, সংখ্যা ৪২৬৩, পৃ. ৯৯৪-৫।

৭৪। বস্ত্রশিল্পে কাজের ক্ষেত্রে উচ্চতব মাত্রার বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ও কারিগরি নৈপুণ্যেব প্রয়োজন ছিল, এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতীয়রা কাপড়ের মিলে উঁচু পদগুলি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছিল। দ্রষ্টব্য : Mehta, *Cotton Mills of India,* অধ্যায় ৮; Buchanan, *Development of Capitalistic Enterprise*, পৃ. ২১০-১১ এবং ২৫৪; Rutnagar, *Bombay Industries : The Cotton Mills*, পৃ. ২৮৮-৩১৪।

৭৫। Rc on Agriculture in India, *Report* (লন্ডন, ১৯২৮), পৃ. ৬৩।

৭৬। *ঐ*

৭৭। IJMA, *Report of the Committee for the year ended 31st December 1936* (কলকাতা, ১৯৩৭), পৃ. ২৯২ (গেজেট অব ইন্ডিয়ায় ২৮শে মে ১৯৩৬ তারিখে প্রকাশিত ভারত সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্তের উদ্‌ধৃতি)।

৭৮। IJMA, *Report of the Committee for the year ended 31st December 1938* (কলকাতা, ১৯৩৯), পৃ. ১৩৪।

অনুবাদক : মনোজ কুমার সান্যাল ও মন্দিরা সান্যাল।

৯

লোহা ও ইস্পাত শিল্পের প্রসার

৯.১ TISCO-র অস্তিত্ব রক্ষার ও প্রসারের ক্ষেত্রে যেসব শক্তি কাজ করেছে

ভারতের ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে বিশ শতকে পথিকৃত্তের ভূমিকা পালনেব সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি (TISCO)। ইস্পাত শিল্পের ক্ষেত্রে এই কোম্পানিটির কৃতিত্বে পঞ্চমুখ ছিলেন ব্রিটিশ সরকার ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের প্রতিনিধিবৃন্দ।[১] সংরক্ষণের রক্ষাকবচ ছাড়াই কোম্পানিটি শৈশব অতিক্রম করে। ১৯২৩ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত বছরগুলির সংকট কোম্পানিটি মোকাবিলা করেছিল সংরক্ষণের ছাতির তলায় থেকে, তারপর থেকে সে সংরক্ষণের প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে কাটিয়ে ওঠে। পৃথিবীর সর্বত্র ইস্পাত শিল্প যখন সংকটে আকীর্ণ টাটা কোম্পানি সেই দুঃসময়ে গড়ে উঠেছে ভবিষ্যতে অস্তিত্ব রক্ষায় সমর্থ একটি উদ্যোগ হিসাবে। উদ্যোগটিকে সম্ভাবনাময় করে তোলার পেছনে যে উপাদানগুলি কাজ করেছিল তাদেব অনুসন্ধান প্রয়োজনীয়।

ইস্পাত কোম্পানিটির অস্তিত্ব রক্ষা যে উপাদানগুলির অবদানে সম্ভবপর হয়েছিল সেগুলির মধ্যে থেকে প্রধান ক'টির বিবরণ দেওয়া হলো : (ক) কারখানাটির অবস্থানগত সুবিধা ছিল। (খ) প্রতিষ্ঠানটি শুরু থেকে সরকারি আনুকূল্য লাভ কবে, ভারতীয় বাজাবে বিলাতি ইস্পাতের আমদানি কমে যাওয়ার ঘটনাটি এই আনুকূল্যের একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে। (গ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে TISCO সবকারকে বিশ্বস্তভাবে সেবা করে। তার পুরস্কার হিসাবে কোম্পানিটি সংরক্ষণের সুযোগ পায়, তাছাড়া আরও একটি সম্ভাব্য বৃহৎ যুদ্ধের মোকাবিলা করার প্রস্তুতি হিসাবেও সরকারি পক্ষ থেকে কোম্পানিটিকে প্রশ্রয় দেওয়ার তাগিদ ছিল। (ঘ) ১৯২৩ থেকে ১৯৩৩-এর মধ্যে কোম্পানিটি উৎপাদন-ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘটাতে পেরেছিল। এই পরিচ্ছেদে TISCO-র উন্নতির বিভিন্ন দিকগুলির একে একে আলোচনা হবে। আমাদের বিবরণে লোহা ও ইস্পাত থেকে প্রস্তুত করা সামগ্রী একত্রে স্থান পাবে। তার কারণ, যে কোনো ইস্পাত কারখানা সাধারণত বহুবিধ সামগ্রী উৎপাদনে সক্ষম—লোহা ও ইস্পাত, এই উভয় ধাতু থেকে পণ্য উৎপাদন সেখানে সম্ভবপর। প্রকৃতপক্ষে, ছোট ও অস্থির বাজারের মর্জি বুঝে চলার উপযুক্ত নমনীয়তা লাভ করা যায় উৎপাদনের বৈচিত্র্যসাধন থেকে। আমরা পরে আলোচনা করব, লোহা থেকে দ্রব্য প্রস্তুতকারী ভারতীয় উদ্যোগগুলির তুলনায় TISCO-র মূল সুবিধা নিহিত ছিল তার

উৎপাদনেব বহুমুখিনতায ও নমনীযতায। উপবন্তু, পববর্তী বিববণে আমবা গুকত্ব দেব, ইস্পাত শিল্পেব প্রসাবে প্রভাব ফেলেছে এবকম বাজনৈতিক শক্তিগুলিকে যেহেতু, এব আগে এ বিষযটিব উপব যথেষ্ট জোব দেওযা হযনি।[২]

৯.২ TISCO-র প্রসারে কিছু সুবিধা ও বাধা

TISCO প্রাথমিকভাবে অনেক সুবিধা ভোগ কবেছে আকব, কযলা ও জলেব মতো কাঁচামালেব সুলভতা থেকে। টাটা কোম্পানিব ইস্পাত উৎপাদনেব কমপক্ষে তিবিশ বছব আগে থেকে জানা ছিল যে ভাবতে উন্নতমানেব আকবিক লোহা পর্যাপ্ত পবিমাণে আছে, কিন্তু আধুনিক ইস্পাত কাবখানা গডে তোলাব জন্যে উপযুক্ত স্থান নির্বাচনেব কাজে অনেক বছব কেটে যায। নিস্পাদকেব সংজ্ঞা নিৰূপণে আমবা যদি মূল শুমপিটাবীয ধাবণাটি ব্যবহাব কবি[৩] তাহলে স্বীকাব কবতে হয যে ১৯০০ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত কোম্পানিটিব কর্মোদ্যোগ অতি উচ্চমানেব ব্যবস্থাপণাব ফলশ্রুতি। কিন্তু খনি সংক্রান্ত নিযম-কানুনেব বদবদলেব আগে থেকে অন্তত্পক্ষে প্রযুক্তিবিদবা এবং তাব পবে সবকাব খনিজ পদার্থেব অনুসন্ধানকাবীদেব কাজে বাধা দেযনি।[৪]

টাটা কোম্পানি যে বাধাগুলিব সম্মুখীন হযেছিল তাদেব উদ্ভব এক ধবনেব উপাদান-সমষ্টি থেকে। এই উপাদানগুলি খুঁজে পাওযা যায ভাবতেব বাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনেব ঔপনিবেশিক চবিত্রেব মধ্যে। ভাবতবর্ষ কখনই বিক্রযযোগ্য মানেব ইস্পাত উৎপাদন কবতে পাববে না—এই অবজ্ঞাসূচক ধাবণাটিব প্রভাবে লন্ডনেব অর্থেব বাজাব এবং ইংল্যান্ডেব প্রযুক্তিবিদবা নতুন উদ্যোগটিকে সাহায্য কবেনি।[৫] ১৮৬৫ সাল থেকে মার্কিনী এবং ইযোবোপীয ইস্পাত উৎপাদিত হতে থাকে—এই নজিব সামনে থাকলেও ভাবতেব অক্ষমতা সম্পর্কিত বিশ্বাসটিকে লালন কবা হয। যে দেশে ব্যবহাবযোগ্য আকবিক লোহা ও খনিজ কযলা পাওযা গেছে সে দেশে ইস্পাতেব আভ্যন্তবীণ বাজাব মিলেছে এবং ইস্পাত উৎপাদনও হযেছে। কম বা বেশি ফসফবাসযুক্ত আকবিক লোহাকে ব্যবহাবযোগ্য কবাব মূল প্রযুক্তিগত সমস্যাগুলিব সমাধান হযেছে বহুদেশে। সে-সব দেশ ইস্পাতেব বিশ্ববাজাবে যুক্তবাজ্যেব সঙ্গে পাল্লা দিযেছে যোগ্যতাব সঙ্গে এবং তা-ও আবাব বর্ধিষ্ণু প্রতিযোগিতাব মুখে।

অতএব, ব্রিটিশ অর্থ-লগ্নীকাবী এবং 'বিশেষজ্ঞদেব' দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বার্থপবতা ও সংকীর্ণতায দুষ্ট[৭]। অপবপক্ষে টাটা যে স্বভাবতই অর্থেব যোগান এবং প্রযুক্তিবিদদেব সংগ্রহেব জন্যে প্রথমে যুক্তবাজ্যেব দিকে চোখ ফেবায তাবও কাবণ ছিল ভাবতেব সঙ্গে তাব অর্থনৈতিক আধিপত্যেব দৃঢ বন্ধন।

ভাবতে কর্মবত ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ টাটা উদ্যোগেব প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু সবাই তা ছিলেন না। ভাবতে ইস্পাত দ্রব্যেব সব থেকে বড ক্রেতা ছিল বেলওযে কোম্পানিগুলি, কিন্তু এদেশে উন্নতমানেব ইস্পাত-বেল উৎপাদনেব সম্ভাবনা সম্পর্কে বেল-বিশেষজ্ঞবা গভীব সন্দেহ পোষণ কবতেন।[৮] তাছাডা, ভাবতীয পবিচালনায় এদেশে ইস্পাত

উৎপাদন সম্ভবপর করে তোলার উপযুক্ত পরিবেশ ছিল না। ভারতের বেশির ভাগ ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশদের হাতে ছিল এবং এ সব সংস্থা তত্ত্বাবধায়কের পদে ভারতীয়দের কদাচিৎ নিয়োগ করত। রেল কোম্পানিগুলিকে এবং সরকারি পূর্তবিভাগে ইঞ্জিনীয়ার এবং কারিগর নিয়োগের কাজটি অনেকাংশেই সম্পন্ন হতো ইংল্যান্ডে (দ্রষ্টব্য ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)। ১৮৭০-এর দশক থেকে ভারত সবকার বহু অর্থব্যয়ে সারে-র (Surrey) কুপার্স হিলে অবস্থিত রয়াল ইন্ডিয়ান ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেয়। উদ্দেশ্য ছিল, এদেশে কাজের উপযুক্ত কিছু শিক্ষণপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার সৃষ্টি করা। এই কলেজের পরিচয় পত্রে বিশেষভাবে নির্দেশ করা ছিল যে, কিছু বিশিষ্ট প্রার্থী ছাড়া ভারতীয় ছাত্রদের প্রবেশাধিকার নেই।[৯]

সাধারণভাবে বলা যায়, (ক) ইয়োরোপীয় বিশেষজ্ঞ ও পরিচালকদের আধিপত্য থাকার ফলে এদেশের বড় ক্রেতাদের কাছে ভারতীয় ইস্পাত সমাদর পায়নি[১০] এবং (খ) এদেশে দক্ষ কর্মচারীর অভাব থাকায় TISCO ভারতীয় তত্ত্বাবধায়ক ও কারিগর নিয়োগে অক্ষম ছিল।[১১] এই ধরনের ঔপনিবেশিক পরিবেশে টাটা কোম্পানির পরিচালনার কাজ চলত। কোম্পানিটির প্রথম অভিপ্রায় ছিল ভারতের সেক্রেটারি অব স্টেট এবং ভারত সরকারের শুভেচ্ছা লাভ করা।[১২] ভারতের সেক্রেটারি অব স্টেট লর্ড ক্রিউ-সাকৃচি পরিদর্শন করেন ১৯১১-র ৬ই জানুয়ারিতে যখন সেখানে ঢালাই না করা লোহা-পিণ্ড উৎপাদনের কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে।[১৩] ভারত সরকার কোম্পানিটিকে জমি সংগ্রহের কাজে এবং গুরুমাইশিনি থেকে কালিমাটি পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণে সাহায্য করে। তাছাড়া কালিমাটি থেকে সাকৃচি পর্যন্ত একটি স্বল্প দূরত্বের রেল যোগাযোগের কাজেও সরকার সাহায্য করে। রাষ্ট্রীয় রেলওয়েজের পক্ষ থেকে ভারত সরকার দশ বছরের মেয়াদী চুক্তিতে প্রতি বছরে ২০,০০০ টন ইস্পাত-রেল ক্রয় করত। শর্ত ছিল যে, রেলগুলি সরকাবের বিনির্দেশ অনুযায়ী প্রস্তুত হবে এবং তাদের দাম ভারতীয় বন্দরে উপনীত সমতুল্য দ্রব্যের দাম থেকে অতিরিক্ত হবে না।[১৫] কারখানা পর্যন্ত কাঁচামাল পরিবহণের ক্ষেত্রে রেল ভাড়ায় কিছু ছাড় দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া কলকাতা বন্দরের জাহাজে মাল তোলার জন্যে যে সমস্ত প্রস্তুত পণ্য আনা হতো তাদের ক্ষেত্রেও পরিবহণ ব্যয়ে কিছু ছাড়ের ব্যবস্থা ছিল।[১৬] (এক সঙ্গে বেশি মাল পরিবহণের মাশুলের উপর ছাড় দেওয়ার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা ছিল না, অনেক বড় সংস্থা এই সুবিধা পেত।[১৭]

উঁচু মানের পর্যাপ্ত পরিমাণ আকরিক লোহার সন্ধান পাওয়া, বিশ শতকের গোড়ায় (সারণি ৯.১) লোহা ও ইস্পাত দ্রব্যের (রেলের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসহ) চাহিদা বৃদ্ধি এবং ১৯০৪ থেকে ১৯০৬-র মধ্যে ভারতে বিদেশ থেকে আমদানি করা লোহা ও ইস্পাতের দাম বৃদ্ধি[১৮] — এই বিষয়গুলি ভারতে ইস্পাত শিল্প গড়ে তোলার প্রেরণা দেয়। বেঙ্গল আয়রণ অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি ইতিমধ্যে প্রমাণ করে দিয়েছিল যে ভারতে পিণ্ডাকার লোহা উৎপাদন খুবই লাভজনক এবং ইস্পাত উৎপাদনের সংকল্প অতি দুরূহ। কিন্তু তখন স্পষ্টই বোঝা গেছে যে ভবিষ্যৎ নিহিত আছে ইস্পাত উৎপাদনে—লোহাজাত পণ্য উৎপাদনে নয়। তার কারণ, লোহার পরিবর্ত হিসাবে ইস্পাতের ব্যবহার তখন ক্রমাগত বাড়ছে (উদাহরণ : জল সরবরাহের ক্ষেত্রে ঢালাই করা লোহার পাইপের পরিবর্তে ইস্পাত

টিউবেব ব্যবহাব তখন বাড়ছিল)।[১৯] ঢালাই না করা লোহা-পিণ্ডের উৎপাদকরা সাধারণত নির্ভর করত অত্যন্ত অস্থির রপ্তানি-বাজাবেব উপব। অপরপক্ষে, একটি ইস্পাত কোম্পানি বড় দেশীয় বাজাবের উপব নির্ভব কবে চলতে পারত, বিশেষ কবে, যখন বৈদেশিক প্রতিযোগিতা অতিক্রম বা পবিহাব কবা সম্ভব হতো। ১৯০৬ সালে যখন টাটা কোম্পানি লন্ডন থেকে মূলধন সংগ্রহের চেষ্টা করছে তখন লোহা ও ইস্পাত শিল্পটি বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। ১৯০৬ সালের ২৪ শে নভেম্ববে *দি ইকনমিস্ট্* পত্রিকায় লেখা হয়—ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় লোহা ও ইস্পাত শিল্পগুলির পক্ষে বিগত বারো মাস ছিল অতি সমৃদ্ধির কাল।[২০]

সারণি ৯.১ ভাবতে লোহা ও ইস্পাতেব আমদানি, ১৮৯৪ থেকে ১৯২৪-৫ (সংখ্যাগুলি টনে প্রকাশিত)

বছর	বেসরকাবি ব্যবসা		সরকারি মজুত		মোট	
	সমস্ত দেশ থেকে	যুক্তবাজ্য থেকে	সমস্ত দেশ থেকে	যুক্তবাজ্য থেকে	সমস্ত দেশ থেকে	যুক্তরাজ্য থেকে
১৮৯৪-৫	২০৭,৭৮৭	১১৬,৩২৪	২১,২৩৭	২১,২৩৭	২২৯,০২৪	১৩৭,৫৬১
১৮৯৫-৬	২৮৫,১২৫	১৫৯,৫০২	২৮,৮৯২	২৮,৮৯২	৩১৪,০১৭	১৮৮,৩৯৪
১৮৯৬-৭	২৭২,২৯৬	১৫৬,৭৩৪	৩৮,০৭৭	৩৮,০৭৬	৩১০,৩৭৩	১৯৪,৮১০
১৮৯৭-৮	২৮৯,৭০০	১৭৭,১৫০	৪০,৩৫০	৪০,৩০০	৩৩০,০৫০	২১৭,৪৫০
১৮৯৮-৯	২৪৮,৬৫০	১৪২,৫০০	১৭,৪০০	১৭,৪০০	২৬৬,০৫০	১৫৯,৯০০
১৮৯৯-১৯০০	২২১,৭৫০	১৪৪,৮৫০	৩২,৪৫০	২৯,২৫০	২৫৪,২০০	১৭৪,১০০
১৯০০-১	২৬২,৬০০	১৪৯,৩৫০	২৩,৯৫০	২৩,৯৫০	২৮৬,৫৫০	১৭৩,৩০০
১৯০১-২	৩৩৯,০৫০	১৬৫,৬৫০	৩১,৭৫০	৩১,৭০০	৩৭০,৮০০	১৯৭,৩৫০
১৯০২-৩	৩৬৭,৩০০	২০০,০৫০	৩৭,৫৫০	৩৭,৩৫০	৪০৪,৮০০	২৩৭,৪০০
১৯০৩-৪	৪৫৫,১৫০	২৬৫,৫০০	৩৭,৫৫০	৩৭,৫০০	৪৯২,৭০০	৩০৩,০০০
১৯০৪-৫	৪৬৭,৪৫০	২৮৩,০০০	২৭,৮৫০	২৭,৮৫০	৪৯৫,৩০০	৩১০,৮৫০
১৯০৫-৬	৫২০,৫০০	২৮১,১০০	৪২,৪৫০	৪২,৪০০	৫৬২,৯৫০	৩২৩,৫০০
১৯০৬-৭	৫২৩,৭৫০	৩৩৪,৩০০	৩৪,০৫০	৩৪,০৫০	৫৫৭,৮০০	৩৬৮,৩৫০
১৯০৭-৮	৬১৬,৯০০	৩৪৭,৩০০	২৮,৬০০	২৮,৬০০	৬৪৫,৫০০	৩৭৫,৯০০
১৯০৮-৯	৬১১,০০০	৩৪৫,৩৫০	২৩,৩৫০	২৩,২৫০	৬৩৪,৩৫০	৩৬৮,৬০০
১৯০৯-১০	৬০২,৩০০	৩৭০,০৫০	২৮,৫৫০	২৮,৩৫০	৬৩০,৮৫০	৩৯৮,৪০০
১৯১০-১১	৬৪২,৭৫০	৩৮৫,০৫০	২৪,৬৫০	২৪,৫৫০	৬৬৭,৪০০	৪০৯,৬০০
১৯১১-১২	৬৮৪-০৪৭	৪০৮,১৯৮	১৬,০৬০	১৬,০৬০	৭০০,১০৭	৪২৪,২৫৮
১৯১২-১৩	৭২৯,৩১১	৪৩৬,৯২২	১৬,২১১	১৬,২১১	৭৪৫,৫২২	৪৫৩,১৩৩
১৯১৩-১৪	১,০১৮,২৪৮	৬১১,২৮৬	১৭,২১০	১৭,২১০	১,০৩৫,৪৫৮	৬২৮,৪৯৬
১৯১৪-১৫	৬০৮,৬৩৫	৪২১,৫০৩	১৬,১৬৬	১৫,৯৭৭	৬২৪,৮০১	৪৩৭,৪৮০
১৯১৫-১৬	৪২৪,৫৯৭	২৮৯,৩৫১	১৭,০৩৪	১৬,৮৪৪	৪৪১,৬৩১	৩০৬,১৯৫
১৯১৬-১৭	২৫৭,১৬৯	১৭৬,৭২৫	১৬,৮৮১	১৬,৮৮১	২৭৪,০৫০	১৯৩,৬০৬
১৯১৭-১৮	১৫২,০৪৯	৭৬,৮২৯	১৩,৪৫০	১৩,৩৩৫	১৬৫,৪৯৯	৯০,১৬৪
১৯১৮-১৯	১৮১,৪০৬	৭৬,৯৩২	১৫,৩০৩	১৫,১৩১	১৯৬,৭০৯	৯২,০৬৩

বছর	বেসরকারি ব্যবসা		সরকারি মজুত		মোট	
	সমস্ত দেশ থেকে	যুক্তরাজ্য থেকে	সমস্ত দেশ থেকে	যুক্তরাজ্য থেকে	সমস্ত দেশ থেকে	যুক্তরাজ্য থেকে
১৯১৯-২০	৪২৬,৯৪৬	২৬৯,৩৪৬	১৮,৫১৪	১৫,৭০৭	৪৪৫,৪৬০	২৮৫,০৫৩
১৯২০-১	৭১১,৮৯০	৪৯৮,২৯১	২৫,০১৬	২৪,৯২৬	৭৩৬,৯০৬	৫২৩,২১৭
১৯২১-২	৬১২,৭৮১	২৮০,৫৪৮	২০,৭৮০	২০,১৬৬	৬৩৩,৫৬১	৩০০,৭১৪
১৯২২-৩	৭৪৬,৪৬৭	৩৫৯,৩৯৩	২৪,৭৩০	২৩,৯৫৯	৭৭১,১৯৭	৩৮৩,৩৫২
১৯২৩-৪	৭৫৬,০৫৩	৪২৮,৯০২	২১,৯১৫	২০,৯৯৫	৭৭৭,৯৬৮	৪৪৯,৮৯৭
১৯২৪-৫	৮৬৮,৯২৩	৪৩৯,৪৩০	১৯,৯১৪	১৬,৪৭০	৮৮৮,৮৩৭	৪৫৫,৯০০

উৎস : *Accounts of the seabome trade of Britısh India,* Gov. India, CISD : প্রাসঙ্গিক বছরগুলির জন্যে (কলকাতা, বার্ষিক)। ১৮৯৭-৮ থেকে ১৯১০-১১ সময়সীমাব সংখ্যাতথ্যে কিছু 'roundıng errors' ছিল যেহেতু সেগুলি হাজার cwt-র নিকটতম সংখ্যা থেকে টনে রূপান্তর করা হয়েছিল। ১৯১২-১৩ পর্যন্ত বিভাজনের বকম ছিল এই : 'লোহা' ও 'ইস্পাত' ; তারপর থেকে 'লোহা' 'লোহা অথবা ইস্পাত' এবং 'ইস্পাত'।

৯.৩ TISCO-কে কাঁচামালের যোগান

TISCO-র কারখানার অবস্থানটি ছিল অনবদ্য—প্রয়োজনীয় কাঁচামালেব উৎস এবং ভারতের সব থেকে বড় ইস্পাতের বাজার অর্থাৎ কলকাতা—উভয়ই ছিল কারখানাটির কাছে[২১] (কলকাতা ও হাওড়ার কাছে অবস্থিত ছিল বেশির ভাগ ব্রিটিশ ইঞ্জিনীয়াবিং কারখানা এবং রেল কোম্পানি বাদে সব থেকে বড় বেসরকারি সংস্থাসমূহ)। টাটানগর (আগে নাম ছিল কালিমাটি) স্টেশন কলকাতা থেকে প্রায় ১৫৫ মাইল পশ্চিমে বেঙ্গল-নাগপুর মেন লাইনের উপর। TISCO কয়লাখনি ও আকরিক লোহার খনি ক্রয় করত বা ইজারা নিত। কয়লাখনিগুলির অবস্থান ছিল কারখানার উত্তবে, রেলপথে প্রায় ১১৫ মাইল দূরে। প্রথমে ময়ূরভঞ্জ খনি (গুরুমাইশিনি এদের মধ্যে একটি) থেকে আকর সংগ্রহ করা হতো। কারখানা থেকে এই খনিগুলির দূরত্ব ছিল গড়ে পঞ্চাশ মাইল। পরবর্তী এক সময়ে আকর সংগ্রহ করা হতো জামশেদপুরের (আগে নাম ছিল সাকৃচি) দক্ষিণ-পশ্চিমে সিংভূমের নোয়ামুণ্ডি থেকে।[২২] প্রায় আশি মাইল দূরে অবস্থিত মারুত চুল্লীর বিগালক ডোলোমাইট টাটানগরের একশ মাইল পশ্চিমে গাঙ্গপুর রাজ্যের পানপোশে পাওয়া যেত। প্রায় একশ ছাব্বিশ মাইল দূরে রাজগাঙ্গপুরেও ডোলোমাইট খনি ছিল। এছাড়া, TISCO অন্য কোম্পানিকে ডোলোমাইট সরবরাহ করার দীর্ঘকালীন চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল।[২৩] টাটানগর থেকে পাঁচশ মাইল দূরে কাট্নির কাছে জুকেহিতে কোম্পানিটির মালিকানাধীন চুনাপাথরের খনি ছিল। ইস্পাত-চুল্লীতে বিগালক হিসাবে ব্যবহৃত এই চুনাপাথর জুকেহি থেকে আনা হতো। পরে জুকেহি খনিটি বন্ধ হয়ে যায়। চুনাপাথর তখন কাটনি থেকে সংগ্রহ করা হতো। ডোলোমাইট খনির কাছে কোম্পানির মালিকানাধীন আর একটি চুনাপাথরের খনি ছিল, কিন্তু তা কাটনির

চুনাপাথরের মতো উঁচু মানের ছিল না।[২০] জলসরবরাহের দিক থেকেও কারখানাটির অবস্থান ছিল আদর্শস্থানীয়। স্থান নির্বাচনের পরিকল্পনা মাফিক কারখানার উত্তর দিকটি ঘিরে থাকল সুবর্ণরেখা। পশ্চিমে পড়ল খোরকাই। প্রখর গ্রীষ্মেও সুবর্ণরেখা কখনো শুকনো থাকত না। জলের অভাবজনিত সমস্যার কথা ভেবে সুবর্ণবেখার উপর একটি নিচু বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল। একটি জলাধারও সৃষ্টি করা হয়। পাম্প করার যন্ত্রের সাহায্যে ব্যবহৃত জলকে ঠাণ্ডা করে ঐ জলাধারে ফেরত পাঠানো হতো।[২১] প্রাথমিক পরিকল্পনায় কারখানা স্থাপনের কথা ছিল সিনিতে, কিন্তু সেখানে জমি সংগ্রহেব অসুবিধা দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে, জলের প্রাচুর্যের কথা বিবেচনা করে সাক্‌চিকে নির্বাচন করা হয় কারখানা স্থাপনের জন্যে।[২২] বালাঘাটে কোম্পানিটির ম্যাঙ্গানিজেব খনি ছিল। কারখানা থেকে স্থানটির রেলপথে দূরত্ব ছিল ৩২ মাইল (আকর সংগ্রহের জন্যে রেলপথ তৈরি করা হয়)। খনিটি থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যেত, পরিমাণে তা এত বেশি ছিল যে কোম্পানির প্রয়োজন মিটিয়েও ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানি সম্ভবপর হতো।[২৭] কোম্পানিটি মহীশূরে অবস্থিত ম্যাগ্নেসাইট খনিও ক্রয় করে। টাটানগর থেকে তার দূরত্ব এক হাজার তিনশো উনত্রিশ মাইল। কিন্তু শেষে দেখা গেল মাদ্রাজ থেকে অথবা বিদেশ থেকে ম্যাগ্নেসাইট ক্রয়ের খরচ অপেক্ষাকৃত কম।[২৮] TISCO-র সব থেকে বড় সুবিধা ছিল সস্তায় আকরিক লোহা পাওয়া। টাটা কোম্পানির একজন ইঞ্জিনীয়ারিং উপদেষ্টা জুলিয়ান কেনেডির দেওয়া তথ্য অনুসারে—এক টন ঢালাই না করা লোহা-পিণ্ডের উৎপাদন-ব্যয় (প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে) টাটাতে ৭৫ সেন্ট্‌স্‌, পিট্‌স্‌বার্গে ৮ ডলাব।[২৯] কারখানাটির আর একটি বড় সুবিধা ছিল। সারা বছ্ব স্রোতস্বিনী থাকে এমন এক নদীর ধারে তার অবস্থান।[৩০] উঁচুমানেব চুনাপাথর প্রাপ্তির স্থান ছিল কারখানা থেকে অনেক দূরে, কিন্তু পানপোশ এলাকার চুনাপাথর, মানে খাটো হলেও, সুলভে পাওয়া যেত TISCO-র ব্যবহারের জন্যে। সুতরাং চুনাপাথরের যোগান-ঘটিত তেমন কোনো সমস্যা কোম্পানিটিকে সম্ভবত ক্লিষ্ট করেনি।[৩১]

কারখানায় ব্যবহৃত কোক কয়লার মান খুব ভালো ছিল না। TISCO-র জেনারেল ম্যানেজার টাট উইলারের মতে—জামশেদপুরে ব্যবহৃত (কোক) কয়লায় ছাই ছিল শতকরা ১৮ ভাগ।[৩২] সুতরাং এই ছাইয়ের পরিমাণ উচ্চতম মানের বেশ কয়েক টন ব্রিটিশ কোক কয়লার সমানুপাতিক। তাছাড়া, এই কোক কয়লায় অনেকটা ফসফরাসও ছিল। শুধুমাত্র আকরিক লোহায় নিহিত ফসফরাসই নয়, কোক কয়লার ফসফরাসও বিপুল পরিমাণে ঢালাই না-করা লোহা-পিণ্ডে সঞ্চারিত হতো। সে কারণে ইস্পাত উৎপাদন করা হতো মৌল মুক্ত-হার্থ প্রক্রিয়ায়।[৩৩]

১৯১৭-র আগে TISCO শুধুমাত্র ছোট ছোট কয়লাখনির মালিকানা ছিল (জামাদোবার খনি ক্রয় করা হয় ১৯১৭-এ এবং সিজুয়ারটির ১৯১৮-য়)।[৩৪] আত্মরক্ষার প্রয়োজনে কোম্পানিটিকে বিভিন্ন কোলিয়ারির সঙ্গে চুক্তি করতে হয়। ভারত সরকারের রেলওয়ে বোর্ড কোলিয়ারিগুলিকে যে দাম দিত, এই চুক্তিতে কয়লার দাম সেই হারে ধার্য হয়। শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি এবং উপযুক্ত যানবাহনের অভাব কয়লা উত্তোলন ও পরিবহণের ব্যয়কে উর্ধ্বমুখী করে। ফলে, খোলা বাজারে কয়লার দাম বাড়ে এবং রেলওয়ে বোর্ড ও তার সঙ্গে TISCO-কেও বেশি দামে কয়লা কিনতে হয়।[৩৫]

শুল্ক সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের সময়ে অভিযোগ ওঠে যে, চুক্তির মাধ্যমে TISCO যে কয়লা ক্রয় করে তার দাম ছিল খুব বেশি। শুধুমাত্র তাব নিজের কয়লাখনির উপর নির্ভর করলে TISCO-র এই অর্থব্যয় হতো না। দু'টি কারণে এই মন্তব্য সঠিক নয়। প্রথমত, অন্য কোম্পানির কাছ থেকে চুক্তির মাধ্যমে কয়লা কিনে TISCO ঠিক কাজই করেছিল, কারণ তাদেব জানা ছিল না নতুন কেনা খনি থেকে কত কয়লা পাওয়া যাবে। রেল কোম্পানিগুলি ছিল ভারতবর্ষের বৃহত্তম কয়লা ব্যবহারকারী সংস্থা। স্বভাবত, অন্য কোম্পানি ও রেলওয়েজের ক্ষেত্রে কোলিয়ারির পক্ষ থেকে আরোপ করা শর্তগুলির মধ্যে সম্পর্কেব সূত্র ছিল, যদিও সেগুলি রেল কোম্পানির তুলনায় অন্যদের ক্ষেত্রে কম অনুকূল ছিল।[৩৬] দ্বিতীয়ত, TISCO-র মালিকানাধীন কয়লাখনির ঐতিহাসিক মূল্যের ভিত্তিতে ঐ খনি থেকে প্রাপ্ত কয়লার দাম নির্ধারণের প্রক্রিয়াটি সঠিক ছিল না। ইস্পাত-উৎপাদন থেকে অর্জিত মুনাফার সঠিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বাজার দরই ঐ কাঁচামালের ধরা উচিত। টাটা কোম্পানিব দ্বারা নির্ধারিত কয়লার বাজার দর তার অন্য কোলিয়ারি থেকে কেনাদামের তুলনায় বেশি ছিল।[৩৭]

৯.৪ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগের আমলের TISCO : সরকার ও রেল কোম্পানির সাহায্যের প্রকৃতি

শুধুমাত্র যোগানের দিক দিয়েই নয়, তার থেকেও বেশি চাহিদার দিক থেকেও TISCO-র ভবিষ্যৎ জড়িয়ে ছিল রেলের সঙ্গে। রেল কোম্পানিগুলি ছিল আবার ভারতের একমাত্র বৃহত্তম ইস্পাত-দ্রব্য ব্যবহারকারী সংস্থা। ইস্পাত কারখানাকে লাভজনক কারখানায় পরিণত করার জন্যে প্রয়োজন ছিল রেলওয়ে বোর্ডের আনুকূল্য। রাষ্ট্র-পরিচালিত রেলওয়ে এবং অন্যান্য রেল কোম্পানির দায়িত্ব এই বোর্ডের উপর ন্যস্ত ছিল।[৩৮] এই কাজটি ছিল দুঃসাধ্য। ভারতীয় দ্রব্যের গুণাগুণ ব্রিটিশ দ্রব্যের সমতুল্য হলেও তার প্রতি প্রথমে অনাস্থা দেখা দিতে বাধ্য। স্বভাবতই, রেলওয়ে বোর্ড এবং কোম্পানি পরিচালিত রেলওয়েজ শুধু ব্রিটিশ রেল ক্রয় করত, অন্য কোনো রেল কেনার কথা বিবেচনা করত না। 'যদি তোমরা ইয়োরোপীয় রেল এবং ফিশ প্লেট্‌স ক্রয় করে থাকো অথবা ক্রয়ের প্রস্তাব দিয়ে থাকো তা হলে দয়া করে বিস্তৃতভাবে জানাও কোন্ বিবেচনায় তোমরা ও কাজে অগ্রসর হয়েছ'—এই প্রশ্নের আপোষহীন উত্তর এল পূর্ব বাংলা রেলওয়ে কোম্পানি এবং পূর্ব ভারত রেলওয়ে কোম্পানি থেকে। প্রথমে, কোম্পানিটি জানাল : ১৯২১-২২ থেকে ১৯২৫-২৬ পর্যন্ত কোনো ইয়োরোপীয় রেল ক্রয় করা হয়নি এবং ভবিষ্যতে তা ক্রয় করার প্রস্তাবও পেশ করা হয়নি। দ্বিতীয়টি থেকে জবাব এল : '১৯২১-২২ থেকে ১৯২৫-২৬-এর মধ্যে কোনো দেশীয় রেল ক্রয় করা হয়নি এবং ভবিষ্যতে সে রকম কোনো ক্রয়ের ইচ্ছার কথাও আমার জানা নেই'। বেশির ভাগ রেল কোম্পানির পরিচালক সভার সভ্যরা ব্রিটেনে থাকতেন এবং তাঁরাই ক্রয় সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করতেন। ১৯২০-র দশকে জার্মান মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটে এবং তখন মাত্র কয়েক হাজার টন রেল জার্মানি থেকে ক্রয় করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে কয়েক বছর (যেমন—১৯০৩-৪, ১৯০৯-১০ এবং ১৯১১-১২) সমস্ত রেল এবং

ফিশ প্লেট্স্ সরকারি খাতে যুক্তরাজ্য থেকে আমদানি করা হয়। অন্যান্য বছরগুলিতে যুক্তরাজ্য থেকে রেল ও ফিশ প্লেট্স-এর আমদানির পরিমাণ মোট প্রয়োজনেব ৯০ শতাংশেরও বেশি ছিল। বেসরকারি খাতে বেল এবং ফিশ প্লেট্স আমদানি সংক্রান্ত পবিস্থিতি একই বকম ছিল। সম্ভবত, যুক্তবাজ্য ছাড়া অপব দেশ থেকে বেসরকারি খাতে আমদানিব শতকরা ভাগ সামান্য বেশি ছিল।[৩৯]

দাম নিয়ে প্রতিযোগিতা অথবা যে কোনো ধবনেব প্রতিযোগিতাব সুযোগ কোনো ভারতীয় ইস্পাত উৎপাদকের ক্ষেত্রে অল্পই ছিল, বিশেষ করে, যতক্ষণ না পর্যন্ত ভারতীয় ইস্পাত সম্পর্কে ক্রেতার প্রতিকূল ধাবণা দূর কবা সম্ভবপব হতো। এই পবিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দেখতে হবে কীভাবে TISCO ভারত সরকার তথা রেলওয়ে বোর্ড পরিচালিত রেল কোম্পানিব আনুকূল্য লাভেব চেষ্টা কবেছে।

এই সূত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, পণ্য উৎপাদন সম্পর্কে ভারত সরকাবেব এই ঘোষিত নীতি টাটা কোম্পানির পক্ষে উপযুক্ত ছিল কিনা। এব উত্তবে অবশ্যই বলতে হয, 'না'। তাব কাবণ, লন্ডনেব ইন্ডিয়া অফিসেব টেন্ডারেব ডাক শুধুমাত্র যুক্তরাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তার ক্রযেব উপব এই সবকাবি নীতি সামান্যই প্রভাব ফেলেছিল। যুক্তরাজ্যেব মধ্যে টেন্ডার সীমাবদ্ধ রাখার প্রথা চালু ছিল শুধুমাত্র লোহা ও ইস্পাত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এবং ভারতীয় ইঞ্জিনীযাবিং কোম্পানির (যাদের বেশির ভাগই ছিল ইযোবোপীয়দের নিয়ন্ত্রণাধীনে) প্রসার এতে ব্যাহত হযেছিল।[৪০] ১৯০৪-এ বেঙ্গল আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানিব মূল ওপেন হার্থ প্রক্রিয়ায় ইস্পাত উৎপাদনের চেষ্টা ব্যর্থ হলো। এই অমোঘ ব্যর্থতার কারণ হিসারে শুধু একথা বলা যায় না যে কাবখানাটি ছোট ছিল এবং তাব উৎপাদন-ক্ষমতা ছিল বছরে ২০,০০০ টন যা বাজার-সম্পর্কিত অনিশ্চয়তার ফলশ্রুতি বলে আশঙ্কা করা হয়। রেল এবং অন্যান্য গঠনগত উপাদান সম্পর্কে সরকাবের নির্দেশেব বিভিন্ন ধারায় বিপুল তারতম্য ব্যর্থতার আরও এক কারণ।[৪১] বেঙ্গল আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানির সভাপতি রেলওয়ে বোর্ডের সাহায্য চেয়ে ব্যর্থ হন। রেলওয়ে বোর্ডের এক সদস্য এই প্রসঙ্গে বলেন, 'আমরা আপনাদের কোনো ভাবেই সাহায্য করতে পারব না। কিন্তু আপনাদের এই উপদেশ দিতে পারি যে, আপনারা যেমন করে চায়ের বিজ্ঞাপন দেন ঠিক সেভাবে সমস্ত রেলপথ ধরে ইস্পাতেব বিজ্ঞাপন দিন।'[৪২]

প্রফেসর সেনের মতে, ভারত সরকারের সিদ্ধান্তের মূল পরিবর্তনের ঘটনাটি বিভিন্ন বেসরকারি বাণিজ্য সংস্থা কর্তৃক ব্রিটিশ স্টিলের পরিবর্তে বেলজিয়ান ও ইয়োরোপীয় স্টিলের ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।[৪৩] কিন্তু সরকারি এবং রেল কোম্পানির ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ লোহা এবং ইস্পাত প্রাধান্য পেয়েছে, কারণ সরকারি বিভাগ ও রেল সাধারণ কারণে অন্য কোনো রকম ইস্পাত কিনতে নারাজ ছিল। সারণি ৯.১ এবং ৯.২ থেকে জানা যায়, ব্রিটিশ উৎপাদকদের লোহা ও ইস্পাতের ভারতীয় বাজারের বিভিন্ন অংশগুলি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য ছিল। কোম্পানি পরিচালিত রেলওয়েজের প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে লোহা ও ইস্পাত দ্রব্যের বেসরকারি আমদানির ক্ষেত্রে ব্রিটিশ লোহা ও ইস্পাত দ্রব্যের আমদানি অনেকাংশে অপসারিত হয় অপর ইয়োরোপীয় দেশ থেকে আমদানির মাধ্যমে। প্রকৃতপক্ষে, ১৯১১-১২-য় খাঁটি ইস্পাত পণ্যের ক্ষেত্রে বাজারে ব্রিটিশ পণ্যের

ভাগ বেসরকারি ক্রয়ের ১/২ অংশ কমে যায়। ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাবে এই পণ্যগুলি প্রথম পৃথকভাবে দেখানো হয়।[৪৪] ১৯২৪-২৫-এ যুক্তরাজ্য থেকে আমদানির পরিমাণ বেসরকারি খাতে ইস্পাত দ্রব্য আমদানির প্রায় আট ভাগের এক ভাগ ছিল।[৪৫] যাই হোক, সরকার ব্রিটিশদের প্রস্তুত-করা লোহা ও ইস্পাত দ্রব্য ছাড়া অন্য কিছু কদাচিত ক্রয় করত। স্বীকার করতে হয়, লোহা ও ইস্পাত দ্রব্যের (রেলের ক্রয় বাদ দিয়ে) মোট আমদানিতে সরকারি আমদানির ভাগ সামান্য ছিল। কিন্তু রেলের জন্যে ইস্পাত ক্রয়ের কথা ধরলে ঘটনাটি দাঁড়ায় অন্যরকম : রেলপথ নির্মাণে ব্যবহৃত বিবিধ লোহার ও ইস্পাতের দ্রব্য সমূহ যদি রেল কোম্পানিগুলি কর্তৃক ঐ দ্রব্যগুলির মোট ব্যবহারে অন্তর্ভুক্ত করা না হয়, তাহলে ১৮৯৬-৯৭-র মতো বছরে তাদের লোহা ও ইস্পাতজাত দ্রব্যের মোট আমদানি বেসরকারি সংস্থার (রেল কোম্পানি বাদে) সমতুল্য দ্রব্যের আমদানির পরিমাণের থেকে বেশি (সারণি ৯.১ এবং ৯.২ দ্রষ্টব্য) হবে। রেলওয়েজের প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ব্রিটিশ যোগানদারদের স্থান ছিল শীর্ষে। এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার কোনো প্রশ্নই ছিল না যেহেতু রেল-কর্তৃপক্ষের চোখে ব্রিটিশরা ছিল সব সময়েই শ্রেষ্ঠ।

সারণি ৯.২ লোহা ও ইস্পাত নির্মিত রেলওয়ের উপাদানগুলির ভারতে আমদানি, ১৮৯৪-৫ থেকে ১৯২৪-৫ (সংখ্যাগুলি টনে প্রকাশিত)

বছর	'অন্য ধরনের' বা নির্মাণ কার্যে ব্যবহৃত দ্রব্য ছাড়া		'অন্য ধরনের' বা নির্মাণ কার্যে ব্যবহৃত দ্রব্য সহ	
	সমস্ত দেশ থেকে	যুক্তরাজ্য থেকে	সমস্ত দেশ থেকে	যুক্তরাজ্য থেকে
১৮৯৪-৫	১২০,০৫৬	১১৯,৫৭৯	১৫০,৭১৩	১৫০,১৫৫
১৮৯৫-৬	১৬২,৮১৮	১৬১,৫০৩	২০৬,৬৮০	২০৫,৩৬৬
১৮৯৬-৭	৩২০,৯২৪	৩২০,০৬৯	৩৮৮,৯০৫	৩৮৭,৩২৭
১৮৯৭-৮	২৫২,৫৫০	২৪৭,৯০০	৩৩৫,৬৫০	৩৩০,৯৫০
১৮৯৮-৯	১৮১,৯৫০	১৭৫,৭৫০	২৪১,৩০০	২৩৫,১০০
১৮৯৯-১৯০০	১৩২,১৫০	১২৭,৮০০	১৮৪,৬৫০	১৭৯,০৫০
১৯০০-১	৯৯,৪০০	৮৯,৫৫০	১৩৩,১৫০	১২৩,১৫০
১৯০১-২	১১৪,৯০০	১০৫,২৫০	১৫০,৯৫০	১৪১,৩৫০
১৯০২-৩	১৪৯,৪৫০	১৪৮,২৫০	১৭৪,৪০০	১৭৩,১৫০
১৯০৩-৪	১৮১,৮৫০	১৭৭,৯০০	২২২,১৫০	২১৮,০০০
১৯০৪-৫	২১২,০৫০	২০৩,৪০০	২৮৩,৩০০	২৭৩,৩৫০
১৯০৫-৬	২৪৪,৭০০	২৩১,০০০	৩০৭,৫৫০	২৯৩,৬০০
১৯০৬-৭	১৭৬,৯০০	১৭২,০০০	২৫৬,৯৫০	২৫১,৯০০
১৯০৭-৮	১৫৪,৫০০	১৪৭,৫০০	২১০,৮৫০	২০৩,৫০০
১৯০৮-৯	১৭৭,৯৫০	১৬৫,৯০০	২২৪,৮০০	২১২,৩০০
১৯০৯-১০	১৮৯,৯৫০	১৮১,০০০	২৫৪,৯৫০	২৪৩,৭৫০
১৯১০-১১	১৮১,৭০০	১৮০,০০০	২৩২,৭০০	২৩০,০৫০

বছর	'অন্য ধরনের' বা নির্মাণ কার্যে ব্যবহৃত দ্রব্য ছাড়া		'অন্য ধরনের' বা নির্মাণ কার্যে ব্যবহৃত দ্রব্য ছাড়া	
	সমস্ত দেশ থেকে	যুক্তরাজ্য থেকে	সমস্ত দেশ থেকে	যুক্তরাজ্য থেকে
১৯১১-১২	১৮১,৭৫০	১৭৪,৯৫০	২৩৭,৩০০	২২৯,২৫০
১৯১২-১৩	২২৪,৫৫০	২২১,৪৫০	২৮৮,৩৫০	২৭৫,৬৫০
১৯১৩-১৪	২৪৭,৪০০	২৪৪,৮০০	৩১৪,৪০০	৩০৯,৯৫০
১৯১৪-১৫	২৪০,৬০০	২৩৯,০০০	২৮৬,৯৫০	২৮৩,৯০০
১৯১৫-১৬	৭০,১০০	৬৬,৩৫০	৮৮,৯৫০	৮৪,৯০০
১৯১৬-১৭	২১,১৮১	১৮,৩৪৭	৩১,৪৪৯	২৮,০৫৯
১৯১৭-১৮	১৯৪	১৪	১,৭২০	১,৫৪০
১৯১৮-১৯	৬১	৬১	৫১১	৫০৯
১৯১৯-২০	৬০,১৪৭	৬২,৯৮৭	৬৯,৯৮৩	৬৯,৭৫৩
১৯২০-১	৭১,৫০০	৭১,২২৭	৯১,৮৪২	৮৯,৬২৪
১৯২১-২	১১২,২৬২	১১০,৫২৫	১৩৯,৪৩৬	১৩৪,১৭৬
১৯২২-৩	১৭৬,০৩২	১৬৫,২৭১	২০০,৫৩৩	১৮৭,৮৫৮
১৯২৩-৪	১১০,২১৯	১০১,৮৫৫	১৫৭,৮৯৮	১৪৫,৪৭১
১৯২৪-৫	৪৯,০৯৫	৪২,৭৫২	৮০,৭৬৪	৬৫,৬৩৪

উৎস : Gov. India, CISD : *Accounts of the seaborne trade of British India* (কলকাতা, বার্ষিক)।

১৮৯৬-৭ পর্যন্ত 'অন্য ধরনের' উপকরণ বলতে কাঠের স্লিপারের পৃথক উল্লেখ ছিল না। উপরন্তু, অন্য ধরনের উপকরণের সরকারি ক্রয়ের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে শুধু ওজনের হিসাবে—যেখানে বেসরকারি ক্রয়ের উল্লেখ আছে ওজনে ও মূল্যে। ১৮৯৭-৮ থেকে ১৮৯৯-১৯০০ পর্যন্ত ঐ উপকরণ আমদানির চালু গড়-দাম দিয়ে সংকোচন ঘটিয়ে সরকারি ক্রয়ের মূল্য নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে এখানে। ১৯৮৪-১৯০০ সময়সীমার মধ্যে প্রচলিত অন্য ধরনের রেলের সরঞ্জামের বেসরকারি আমদানির টন প্রতি দাম নির্ণয় করা হয়েছে বেসরকারি বাণিজ্য-পণ্য সম্পর্কিত সংখ্যাতথ্য থেকে। এই সমস্ত দাম বেড়ে চলেছিল সময়ের সাথে সাথে। অতএব, ১৮৯৪-৫ থেকে ১৮৯৬-৭ পর্যন্ত কালের ক্ষেত্রে আমাদের হিসাবে অধোগতির প্রবণতা থাকতে পারে এবং তার কারণ সংকোচনের অনুসৃত পদ্ধতির মধ্যে নিহিত। ১৮৯৪-৭ সময়সীমার বছরগুলিতে রেলের আমদানির পরিসংখ্যানের সঙ্গে পরবর্তী কালের সংখ্যাতথ্যের নিখুঁত তুলনা সম্ভবপর নয়। ইন্ডিয়া অফিস চেম্বারলেইন কমিশনকে (১৮৯৫) যে র্ভৎসনা করে তা থেকে সাম্রাজ্য করায়ত্ব রাখার একটি সহজ ফলাফল প্রকাশ পায় :

ইন্ডিয়া অফিস ভালভাবেই জানে যে বেলজিয়ামের লোহা ও ইস্পাতের মান নিচু পর্যায়ের। ৮ই জানুয়ারি, ১৮৯১-তে লেখা লর্ড ক্রসের ৩নং অর্থিক ডেসপ্যাচে বলা হয়েছিল

এক মাত্র সরকারি উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ড থেকে ধাতুটি ক্রয় করা যেতে পারে যেহেতু ইয়োরোপ মহাদেশীয় লোহা ও ইস্পাত নিম্নমানের। ভারতীয়রা অবশ্য মনে করতেন ইয়োরোপীয় লোহা ও ইস্পাতেব মান যথেষ্ট ভালো এবং দাম কম থাকায় হালের বছরগুলিতে ভারতীয় বাজারে ইংল্যান্ডের লোহা ও ইস্পাতের পরিবর্তে বেলজিয়ামের ধাতুগুলির চল উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়।[১৬]

বেসরকারি রেল কোম্পানিগুলি এই একই নীতি অনুসবণ করতে থাকে তখনও, TISCO-র পণ্য সম্পর্কে সরকারি মনোভাব যখন যথেষ্ট অনুকূল। তথ্যটির সমর্থন মেলে ১৯২৬ সালের ভারতীয় ট্যারিফ বোর্ডকে দেওয়া এই কোম্পানিগুলির সাক্ষ্য থেকে (আগে এ রকম কিছু সাক্ষ্য থেকে উদ্‌ধৃতি দেওয়া হয়েছে এই বইয়ের ২৯৯ পৃষ্ঠায়)।

সারণি ৯.২-তে প্রদত্ত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে বলা চলে, লোহা ও ইস্পাতের মোট আমদানির মধ্যে রেলের সরঞ্জামের ভাগ কমে আসছিল এবং ভারতীয় বাজারের এক বড় অংশ করায়ত্তের জন্যে TISCO-র পক্ষে শুধুমাত্র সংরক্ষণের সুবিধাই যথেষ্ট ছিল। এই পরিস্থিতির ব্যাখ্যায় প্রথমত বলা চলে, ভারতীয় রেল কোম্পানিগুলির দেশীয় লোহা ও ইস্পাত দ্রব্যের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একক ক্রেতা ছিল যতক্ষণ না পর্যন্ত তিরিশের দশকের গোড়ায় রেলওয়েজের নিট বিনিয়োগ শূন্যাঙ্ক স্পর্শ করে। রেল কোম্পানির এই দৃষ্টিভঙ্গি TISCO-র বাজারকে নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত করে। দ্বিতীয়ত, লোহা ও ইস্পাত পণ্যের বেসরকারি আমদানির অনেকটাই ছিল সরকারি কাজের জন্যে এবং সেখানে আবার, TISCO-র পণ্যের প্রতি ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার ও প্রশাসকদের ধারণা বেসরকারি উৎপাদকদের ক্রয়কে প্রভাবিত করার একটি মূল উপাদান হিসোবে কাজ করেছে। ভারত সরকার দেশীয় ইস্পাত কারখানাকে যথাবিধি শুল্ক সংরক্ষণের সুযোগ দিতে পারত এবং সরকারি পূর্ত বিভাগ ও রেলকে বেশি দামের ইস্পাত ব্যবহারের অনুমতি দিত এই যুক্তির ভিত্তিতে যে, তার গুণগত মান তুলনামূলকভাবে উঁচু। বিকল্পে, যদি সরকার মজুত বাজারে ব্রিটিশ ইস্পাতের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিযোগিতা না চাইত এবং একই সঙ্গে সরকারি কাজে এবং রেল বিভাগের নির্মাণের কাজে ব্যয় বৃদ্ধি পরিহার্য মনে করত, তাহলেও সে ভারতীয় ইস্পাতের ক্ষেত্রে শুল্ক-সংরক্ষণের অথবা ভারতীয় ইস্পাত কারখানাগুলির পৃষ্ঠপোষকতার দায়ভার অগ্রাহ্য করতে পারত। ইয়োরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও ব্রিটিশ লোহা ও ইস্পাত প্রশাসনের আনুকূল্যে ভারতীয় বাজারে তার মুখ্য ভাগ বজায় রাখতে পেরেছিল। লক্ষ্য করার বিষয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত যুক্তরাজ্য থেকে আমদানিজাত ইস্পাতের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়ছিল।

ভারতে ব্রিটিশ ইস্পাতের ব্যক্তিগত ব্যবহার কমে যাওয়াতে যে ভারত সরকার নিষ্ক্রিয় ছিল তা অনুমান করা যায় না। নীতির পরিবর্তন অবশ্যই হয়েছিল—যদি তা না ঘটে থাকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে (যখন সরকার TISCO-র কাছ থেকে বছরে ২০,০০০ টন রেল কেনার প্রতিশ্রুতি দেয়) তবে নিশ্চিতভাবে তার পরে। সুয়েজের পূর্বদিকে ব্রিটিশদের নিরঙ্কুশ দখলভুক্ত এলাকায় (অস্ট্রেলিয়া বহুকাল যাবৎ স্বয়ংশাসিত ছিল) একমাত্র লোহা ও ইস্পাত শিল্প হিসাবে TISCO-র সামরিক গুরুত্বের এবং সরকারের কাছে থেকে কোম্পানিটির আদায় করা অনুচ্চারিত প্রতিশ্রুতি থেকে শিল্পটির ভবিষ্যতের যে আভাস পাওয়া যায় তার সঙ্গে

বিভেদমূলক সংরক্ষণ নীতির ভিত্তিতে মেনে নেওয়া শর্তগুলি ছিল সংগতিপূর্ণ। স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত করেছিল সরকারি সিদ্ধান্তকে।

৯.৫ TISCO : প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং সরকারের সঙ্গে আপোষের কাল

রেলকোম্পানির সঙ্গে মাল সরবরাহের চুক্তি এবং সরকারের কাছ থেকে পাওয়া অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা (ল্যান্ড অ্যাক্যুইজিশন আইন অনুসারে TISCO-র জন্যে পাঁচ বর্গমাইল জমির সরকারি বিলিব্যবস্থা সমেত)[৪৭] কোম্পানিটিকে এগিয়ে যাওয়ার সবুজ সংকেত দেয়। কিন্তু তা কোনোভাবেই প্রকৃত দুঃসময়ে কোম্পানিটিকে সাহায্যের নীতি অনুসরণে সরকারকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেনি, যদিও শিল্পের ক্ষেত্রে যে কোনো বিশ্বব্যাপী মন্দার কালে সরকারের পক্ষে এরকম কোনো নীতি গ্রহণ করা প্রায় বাধ্যতামূলক বলা চলে। ইয়োরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ভারতীয় শিল্পটি ছিল বামন-সদৃশ, কোনো ঘটনা পরম্পরার উপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা শিল্পটির অতি-সামান্যই ছিল এবং ক্রেতাদের শুভেচ্ছার নগণ্য সম্বল নিয়ে টিকে থাকাও ছিল প্রায় অসম্ভব। যুদ্ধের সমগ্র সময়ে টাটা কোম্পানির অনুসৃত নীতিকে কেউ গণ্য করতে পারেন এমন একটি প্রচেষ্টা হিসাবে যার নিহিত উদ্দেশ্য ছিল সরকারের তরফ থেকে প্রয়োজন-কালে সাহায্য পাওয়াব প্রতিশ্রুতি আদায় করা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে TISCO ভারত সরকারকে ইস্পাত বিক্রি করত ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রিত ইস্পাতের দামে। যুদ্ধের দ্বিতীয় বছব এবং তারপর থেকে উৎপাদিত ইস্পাতের সমগ্র পরিমাণ সবকারি নিয়ন্ত্রণের আওতায় এল। ১৯১৬-তে স্বল্পকালের জন্যে কারখানাগুলি নানান ধরনের পণ্য (যেমন রেল, ইস্পাত খোলক ও ফেরো ম্যাঙ্গানিজ) সরকারকে সরবরাহ করত। এ সময়ে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে এই মিশ্র ধাতুর অভাব ঘটে।[৪৮] ভারতে আমদানিজাত ইস্পাতের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় ; প্রথমত, ব্রিটেনে উৎপাদিত পণ্যসমূহ ইয়োরোপে যুদ্ধকালীন ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তায় ; দ্বিতীয়ত, ডুবো জাহাজের দৌরাত্ম্যে (জার্মান ডুবো জাহাজের কার্যকলাপের ফলে টাটা কারখানার প্রসারের জন্যে প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ নির্মাণকারী উপাদান ও যন্ত্রপাতি হারিয়ে যায়) ; এবং তৃতীয়ত, মালবাহী জাহাজের অভাব থাকায়। ১৯১৮-র দ্বিতীয়ার্ধে সরকার টাটায় উৎপাদিত দ্রব্যের ৯০ শতাংশ ক্রয় করে এবং এক মাসের মধ্যে এই ক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৭ শতাংশ। টাটা কোম্পানিকে ইস্পাত সরবরাহ করতে হতো ব্রিটিশদের স্বতন্ত্র মান অনুসারে এবং তার দাম পেত নিয়ন্ত্রিত হারে। পরিবহণ ব্যয় যার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। মুক্ত বাজারে ইস্পাতেব দাম—এমন কি পরিদর্শকদের নাকচ করা ইস্পাতও—সরকারের ধার্য দামের তুলনায় দুই থেকে চারগুণ বেশি হতো (টন প্রতি ১৫০ টাকা)।[৪৯] যেহেতু এই বছরগুলিতে টাটা কোম্পানির ইস্পাতের সরবরাহ এসে দাঁড়িয়েছিল ২৯০,০০০ টনে, স্পষ্টতই তাকে তার মুনাফার একটা বড় অংশ (এর উদ্‌ধৃত মূল্যায়ন ছিল ৬০ মিলিয়ন টাকা)[৫০] ত্যাগ করতে হয়েছিল।

যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় TISCO-র ইস্পাত উৎপাদন তার সামর্থ অনুযায়ী বৃদ্ধি পায় : ১৯৯২-র জুলাই থেকে ১৯১৪-র জুন পর্যন্ত যত পরিমাণ ঢালাই না-করা লোহা-পিণ্ড উৎপাদিত হয়েছিল তার বেশির ভাগই বিক্রি করা হয়েছিল কারখানাটির নিজের ইস্পাত

উৎপাদনের কাজে না লাগিয়ে।[৫১] এমনকি ১৯১৪-র জুলাই থেকে ১৯১৫-র জুন পর্যন্ত মোট ১৬০,৫৮৭ টন ঢালাই না-করা লোহা-পিণ্ডের মধ্যে ৮৩,৮৩২ টন বিক্রি হয়েছিল বাইরে। ইস্পাত উৎপাদনের উদ্দেশ্যে সাজসরঞ্জাম স্থাপনে কাল-ব্যয় অনিবার্য (প্রথমার্ধে কোম্পানি ঢালাই না করা লোহা-পিণ্ড উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল নিরাপত্তার কথা ভেবে এবং ঐ উৎপাদন থেকে নিশ্চিত ছিল কিছু আয়—যা থেকে স্থির ব্যয় ও সুদের খরচ মেটানো সম্ভবপর ছিল)। ওপেন হার্থ চুল্লীর কাজে ভুলভ্রান্তি থেকেও কিছু অসুবিধা দেখা দিয়েছিল।[৫২] প্রথমদিকে, রেলওয়ে বোর্ড TISCO কৃত রেলের যোগানের বেশ বড় অংশ প্রত্যাখ্যান করেছিল ; রেল কোম্পানিগুলিকে ইস্পাত বিক্রির ক্ষেত্রেও TISCO সমস্যায় পড়ত এমনকি যখন তা নির্দিষ্ট মানের সমতুল্য হতো।[৫৩]

যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওপেন-হার্থ চুল্লীর কাজের অসুবিধা বহগুণ বৃদ্ধি পেল, কারণ ঐ চুল্লির চালনার ভার ছিল জার্মানদের উপর। প্রথমে তাদের কাজ চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কীনানের মতে, যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে থেকে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ বা অন্তত কাজে ব্যাঘাত ঘটানোর চেষ্টা চলতে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত জার্মানদের অপসারণ করা হয় অনেক বেশি ব্যয় সাপেক্ষ অ্যালাইড ও মার্কিনী শ্রম নিয়োগের মাধ্যমে এবং জনৈক মার্কিনী র‍্যাল্‌ফ ওয়াটসন্ কারখানা চালানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৫৪] ১৯১৫-১৬ থেকে ইয়োরোপীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ইস্পাত আমদানির দারুণ পতন ঘটে, এবং মধ্য প্রাচ্যে যুদ্ধরত ভারতীয় ব্রিটিশ সৈন্যের প্রয়োজন অনেকটাই বৃদ্ধি পায়। চাহিদার এই বৃদ্ধিতে TISCO সাড়া দেয় বিভিন্ন ভাবে : উৎপাদন হতে থাকে ইস্পাত-খোলক, গাড়ির চাকা এবং এক সময়ে ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ ; মারুত চুল্লী থেকে উৎপাদন চলল দৈনিক ২৫০ ঢালাই না-করা লোহা-পিণ্ডর যেখানে উৎপাদন হওয়ার কথা দৈনিক ১৭৫ টন।[৫৫] কিন্তু কোম্পানিব পরিচালকগণ অনুধাবন করেছিল ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধির প্রভূত সম্ভাবনা। মোট ১৫০,০০০ টন থেকে ২২৫,০০০ টনে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রাথমিক পরিকল্পনা পরিমার্জিত[৫৬] হলো এবং পরবর্তী সময়ে তা চিহ্নিত হলো 'বৃহত্তর সম্প্রসারণ' হিসাবে। কারখানার উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশ্নে কোম্পানির ইঞ্জিনীয়ারিং উপদেষ্টা মিস্টার পেরিনের পরামর্শ ছিল, ১৯১৫ থেকে অতিরিক্ত ফুৎকার শক্তি-সৃষ্টি, ওপেন-হার্থ চুল্লী অথবা ডুপ্‌লেক্স টিলটিং সরঞ্জাম নিয়োগের ব্যবস্থা এবং তৃতীয় মারুত চুল্লী বসানো। প্রথমে সরকার এবং সামরিক কর্তৃপক্ষ সম্প্রসারণ প্রকল্পকে উৎসাহ দিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন, কিন্তু আসলে সাহায্য করেননি।[৫৭] যুদ্ধের প্রলম্বন এবং সামরিক প্রয়োজনের তুলনায় ইস্পাত ও গোলাবারুদের ইয়োরোপীয় যোগানের ঘাটতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মহা সম্প্রসারণের প্রকল্পটি সম্পর্কে ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি আরও বেশি ইতিবাচক হয়ে ওঠে। ১৯১৭ সালের ১৯শে জানুয়ারি TISCO-র জেনারেল ম্যানেজার মি. টাটউইলার ভারতীয় সামরিক বাহিনীর কম্যান্ডার-ইন-চীফ জেনারেল বিঙ্গলে, বাণিজ্য ও শিল্প-দপ্তরের সেক্রেটারি স্যার জর্জ বার্নেস এবং রেলওয়ে বোর্ডের সদস্য স্যার রবার্ট গিলাম এবং মিঃ অ্যান্ডারসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। টাটউইলারকে ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা চালাতে বলা হয় এবং তার সঙ্গে তিনি প্রতিশ্রুতি পান—সর্বাত্মক সহযোগিতার। ১৯১৭-র জুনে বৈদেশিক দপ্তর মার্কিনী কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে যে ইস্পাত কারখানার সম্প্রসারণের জন্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি এবং উৎপাদনের যেন যোগান দেওয়া হয়। ১৯১৮-র জানুয়ারিতে ভারত সরকারের মিউনিশন্‌স বোর্ড ইংল্যান্ড ও

আমেরিকা থেকে যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম আমদানির পূর্ণ সম্প্রসারণের সুপারিশ দানে সম্মত হয় যুদ্ধকালীন জরুরি প্রয়োজনের অগ্রাধিকার দিয়ে। একই সঙ্গে সুপারিশ মিলল প্লেট মিল এবং একটি ডুপ্লেক্স ওপেন-হার্থ ফার্নেস আমদানির। কিন্তু মাল পাঠাতে দীর্ঘ সময় লাগল। তাছাড়া, সরঞ্জাম আমদানির একটি বড় অংশ নষ্ট হয়ে গেল অক্ষ শক্তির উপদ্রবে। কিছু প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম যুদ্ধের প্রয়োজনে ইংল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে বরাদ্দ করা হলো। ১৯১৮-র নভেম্বরে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে অগ্রাধিকারের সমগ্র তালিকাটি তুলে নেওয়া হলো। শেষ পর্যন্ত সম্প্রসারণের কাজ সমাধা হলো ১৯২৪ নাগাদ। বৃহত্তর সম্প্রসারণ প্রকল্পটির প্রতি সরকারের অনুমোদন ব্যক্ত হয়েছিল ১৯১৮-র ২১শে অক্টোবর তারিখে প্রদত্ত মূলধন বিনিয়োগ বৃদ্ধিব (৭০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত) অনুমতিপত্রে।[৫৮]

TISCO এবং ভারত সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যে পত্র বিনিময় হয় তা থেকে বোঝা যায় যে, ভারত সরকারের সামরিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কোম্পানিটি ছিল দক্ষ আপোষকারী এবং উৎসাহী সহযোগী। 'TISCO কর্তৃপক্ষের উন্মুখ সম্মতিতে সরকারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এল ইস্পাত পণ্যের বন্টনের উপর, সরকারি খাতে যে পণ্য সরবরাহ হয় তার দরুন অনুকূল হারে দাম পাওয়া গেল এবং এসব কিছুর জন্যে সরকারকে ভারত রক্ষা আইনের বাধ্যবাধকতার শরণ নিতে হয়নি।'[৫৯] ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদন আশ্চর্য রকমের লাভজনক হওয়া সত্ত্বেও কোম্পানিটি এর উৎপাদন বন্ধ করে দেয় ইস্পাত ও গোলাবারুদ উৎপাদনের জন্যে ঢালাই না-করা লোহা-পিণ্ডের ভবিষ্যতের প্রয়োজনেব কথা ভেবে।[৬০] ১৯১৭-র ডিসেম্বরে যখন ভাবত সরকার লোহা-পিণ্ডের ঘাটতির সম্মুখীন হয়, কোম্পানিটি ঐ পণ্য বন্টনের উপর নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি মিউনিশন্স বোর্ডের হাতে স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেয়, অথচ খোলা বাজারে পণ্যটির বিক্রয় সরকারেব কাছে ক্লীভল্যান্ডের লোহার দামে বিক্রয়ের থেকে অনেক বেশি লাভজনক ছিল, (মালবহনের ব্যয় বাদে)। [৬১] মূলপণ্যের দাম নির্ধারণ এবং বন্টনেব ব্যাপারে TISCO সরকারের ইচ্ছা পূরণ করত এবং তার সম্প্রসারণ পরিকল্পনার সরকারের কাছ থেকে কোম্পানিটি সুনাম পাওয়ার চেষ্টা করতে থাকল কোনো সাহায্য প্রার্থনার আগে। ১৯১৫-র ৩০শে নভেম্বর কোম্পানির প্রতিনিধিরা তাঁদের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনাসমূহ ব্যাখ্যা করার জন্যে ভারতের তদানীন্তন সেক্রেটারি অব স্টেট অস্টেন চেম্বারলেইনের সঙ্গে দেখা করেন। 'সুয়েজের পূর্বদিকে অবস্থিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থে একটি স্থায়ী যুদ্ধোপকরণের ভাণ্ডার' সৃষ্টি করার জন্যে প্রস্তাব করা হলো যে, শেল স্টিলের দৈনিক উৎপাদন ৩৫০ টন থেকে বৃদ্ধি করে ৬০০ এবং ৮০০ টনের মধ্যে দাঁড় করানো হবে। ঐ উৎপাদন পর্যন্ত ৩০০০ টনে পরিণত করার প্রস্তাবও করা হয়। মি. চেম্বারলেইন এই পরিকল্পনায় উৎসাহী ছিলেন না। এই মনোভাবের কিছু সহজবোধ্য কারণ ছিল: বিশেষত, সে সময়ের সামরিক সম্ভারের প্রকৃত প্রস্তুতকারকরা যে সাহায্য পেতেন, ভবিষ্যতের কোনো যুদ্ধের জন্যে TISCO-র মতো সামরিক উপকরণের উৎপাদককে ঐ একই সাহায্য দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু তিনি সুপারিশ করেন যে, বিষয়টি ভারত সরকারের কাছে তুলে ধরা যেতে পারে।[৬২]

১৯১৬-র সেপ্টেম্বরে একই রকমভাবে সমগ্র প্রস্তাবটি পেশ করা হয় ভারত সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তর এবং রেলওয়ে বোর্ডের কাছে। উদ্দেশ্য ছিল, সরকারি বদান্যতা লাভ

নয়, 'তাদের কাছ থেকে সমর্থন ও উৎসাহ মেলা'।[৬৩] TISCO-র প্রতিনিধি মিস্টার পাডশাহ (Padshah) রেলওয়ে বোর্ডেব সদস্য অ্যান্ডারসনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তাঁকে আশ্বাস দেন যে, রেলওযে বোর্ডের কাছ থেকে পাওয়া দামে ইস্পাত কোম্পানিটি যথেষ্ট সন্তুষ্ট। মিস্টার অ্যান্ডারসান স্বীকার করেন যে, কম দাম নেওযায TISCO-র পক্ষে ব্যয় কমানো সম্ভবপর হচ্ছে। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন 'একটি পাল্টা স্বীকারোক্তি এই মর্মে যে, সরকারেব কাছ থেকে প্রাপ্ত সুবিধাব বিনিময়ে TISCO মুনাফার হ্রাস ঘটাচ্ছে'। মিস্টার পাডশাহ্ আরো বলেন, 'ইস্পাত কোম্পানিটি মুনাফা হ্রাসে যথেষ্ট পরিমাণে সন্তুষ্ট হবে যদি তা স্বীকার করা হয় এবং রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক নথিভুক্ত হয়। যখন পড়তির সময় আসবে, এই স্বীকারোক্তিটি কাজে লাগবে'।[৬৪]

TISCO মুনাফা বিসর্জন দিয়েও সরকারের থেকে যথেষ্ট দুবদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিল। যে পরিমাণ মুনাফা সে হারিযেছিল তা পরবর্তীকোলে ক্ষয়প্রাপ্ত ও সেকেলে যন্ত্রপাতির প্রতিস্থাপন এবং কারখানা সম্প্রসারণের জরুরি প্রয়োজনে নিয়োগ করা যেত। জানা ছিল, ইস্পাত অর্থনৈতিক অবস্থার ওঠা-নামায় বেশি সাড়া দেয় এবং ঐ কারণে টাটা যুদ্ধের পরে গোলমাল আশঙ্কা করতে পারতেন বিশেষ করে যখন সব ইয়োরোপীয় ও মার্কিনী উৎপাদকরা ভারতের বাজারে টাটা কোম্পানির একচেটিয়া প্রভাব খর্ব করার উদ্দেশ্য নিয়ে ফিরে এল। উপরন্তু, টাটা নির্ভর করেছিলেন সরকারি শুভেচ্ছার উপর, তার কারণ ভারতে দশ ভাগের মধ্যে ন'ভাগ ইস্পাত বিক্রয় হতো 'শেষ পর্যন্ত যে-কোনো আকারে সরকার, রেল কোম্পানি এবং সরকারি সংস্থাগুলির কাছে'।[৬৫]

৯.৬ ইস্পাত শিল্পকে শুল্ক-সংরক্ষণ : যুদ্ধোত্তর কালে TISCO-র অসুবিধার কারণসমূহ

টাটা আয়বন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি শুল্ক-সংরক্ষণের জন্যে দরখাস্ত পেশ করে ১৯২৩-এ (এর আগে মার্চ, ১৯২২-এ ভারতীয় ফিসক্যাল কমিশনকে দেওয়া সাক্ষ্যে কোম্পানিটি ইস্পাত শিল্পকে সংরক্ষণের সুযোগ দেওয়ার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে) এবং ১৯২৪-এ ইস্পাত-রেলের জন্যে বিধিবদ্ধ সংরক্ষণ ও দানের ব্যবস্থা করা হয়। এর পর থেকে টাটা কোম্পানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সংরক্ষণের সুযোগ ক্রমাগত পেতে থাকে, যদিও বাণিজ্য-শুল্কের ভিত্তিতে প্রদত্ত সংরক্ষণের মাত্রার তীব্র হ্রাস ঘটে।

TISCO-র সমস্যা বিশ্লেষণে যোগান ও চাহিদার উপাদানগুলির মধ্যে স্পষ্ট সীমারেখা টানা দরকার। কারখানার সরঞ্জাম ও কর্মচারীদের দক্ষতা, শ্রমের দরুন ব্যয়, কাঁচামাল, জ্বালানি, করিগরি কর্মী ও যন্ত্রপাতি—এই উপাদানগুলি যোগানের দিক থেকে উল্লেখ্য। চাহিদার সপক্ষে উপাদানগুলি এরকম : রেল কোম্পানিগুলির কাছ থেকে দীর্ঘকালীন চুক্তির ভিত্তিতে পাওয়া দাম-সমূহ ; ইয়োরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপেক্ষাকৃত বেশি দক্ষ এবং বৃহত্তর কারখানাগুলি থেকে আসা প্রতিযোগিতা, বিশ্বের লোহা ও ইস্পাত উৎপাদকদের ব্যাপকভাবে অনুসৃত দাম-পৃথকীকরণের নীতি ; পূর্তবিভাগের কাজ ও রেলপথ নির্মাণ

সম্বন্ধীয় নীতিগুলি থেকে সৃষ্ট চাহিদার স্তর এবং ভারতীয় উৎপাদক ও অন্যান্য যোগানদারদের মধ্যে ঐ চাহিদার বন্টন।

সারণি ৯.৩ থেকে বোঝা যায় যে ১৯১৬-১৭ পর্যন্ত উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পেয়েছিল। এই ব্যয়ের প্রদত্ত সংজ্ঞায় ধরা হলো, 'ইস্পাত উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রম, শক্তি ও উপাদানের ব্যয়, তাছাড়া তত্ত্বাবধানকারী কর্মচারীদের মাহিনা বাবদ ব্যয়।'[৬৬] ব্যয়-হ্রাস পেতে থাকে মূলত যন্ত্রপাতি ও তত্ত্বাবধানকারী কর্মচারীদের দক্ষতার উপযুক্ত ব্যবহারের ফলে। ব্যয়-হ্রাসকারী উপাদানগুলিব মধ্যে আরও ছিল জ্বালানির যোগান যা উৎপাদনের পরিবর্তনের সঙ্গে সমানুপাতে অনেক সময়েই ওঠা-নামা করেনি।[৬৭] এর পর থেকে উৎপাদন-ব্যয় বাড়তে আরম্ভ করে। অনুমান করা যায়, এই ব্যয়-বৃদ্ধি চুক্তি বহির্ভূত শ্রমের অর্থাৎ ভারতীয় শ্রমের মজুরি বৃদ্ধির ফল নয়, তার কারণ ১৯২০-১ পর্যন্ত শ্রমিকপিছু মজুরির কোনো উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেনি।[৬৮] ১৯১৬-১৭ থেকে বেশিরভাগ দপ্তরে চুক্তিবদ্ধ শ্রমের মজুরি ও বোনাস যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছিল। এর ফলাফলের তীব্রতা কিছু পরিমাণ কমানো হয় চুক্তিবদ্ধ শ্রমের বদলে দক্ষ ভারতীয় কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে, ইয়োরোপীয় বা মার্কিনী শ্রমিকেরা আগে যা পেত তার থেকে অনেক কম মজুরি এই কর্মীদের দেওয়া হতো।[৬৯]

শ্রমের এই প্রতিস্থাপন সত্ত্বেও চুক্তিবদ্ধ শ্রমের মজুরি যথেষ্ট বেড়েছিল। ১৯১৫-১৬ এবং ১৯২২-২৩-এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মারুত চুল্লী বিভাগে পণ্যের টন প্রতি চুক্তিবদ্ধ শ্রমের ব্যয় সামান্য বেড়েছিল, ১৯১৫-১৬ এবং ১০২০-১-এর মধ্যে ওপেন-হার্থ বিভাগে ঐ ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে (প্রায় তিরিশ শতাংশ)।[৭০] কিন্তু প্রথমে এই ব্যয়-বৃদ্ধির বেশিরভাগ অংশের জন্যে দায়ী ছিল কারখানার শ্রম, জ্বালানি এবং কাঁচামালের প্রয়োজন বৃদ্ধি। অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে কারখানার যন্ত্রপাতির অংশবিশেষ অনেক সময়ে সমস্যা সৃষ্টি করত মেরামত করে সেগুলিকে কাজের উপযুক্ত রাখতে হতো। ১৯১৯-২০-র পর থেকে কয়লাব দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে থাকে।[৭১] ১৯২০-২১ থেকে ভারতীয় শ্রমিকদের বেতনও (বেতন বৃদ্ধির দাবি মেনে নেওয়ার আগে শ্রমিকরা ধর্মঘট করে জীবন ধারণের ব্যয় প্রভৃত পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে) বাড়তে থাকে।[৭২] TISCO-র মতে যুদ্ধের পরে মাথা পিছু উৎপাদন হ্রাস পায় এই সব কারণে : 'আমরা আমাদের যন্ত্রপাতি তেমন কঠোর ভাবে চালনা করছিলাম না, কাঁচামালের উৎকর্ষতা হ্রাস পেয়েছিল এবং ইস্পাতের জন্যে নির্দিষ্ট করা মানের কঠোরতা বেড়েছিল।'[৭৩] ১৯২২-২৩-এর ধর্মঘটের জন্যেও মাথাপিছু উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোম্পানিটি অতিরিক্ত শ্রমিকদের ছাঁটাই করতে অসুবিধায় পড়ে, তার কারণ ছিল ধর্মঘটের ভয়।

পুরনো যন্ত্রপাতির ব্যবহারে ব্যাঘাত ঘটার ফলে নতুন যন্ত্রপাতি বসানো হলো, কিন্তু সেগুলি আরো বেশি ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়াল এই সমস্ত কারণে : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইয়োরোপের থেকে পণ্যের যোগানে দীর্ঘসূত্রতা, যন্ত্র ও যন্ত্রাংশের আমদানির সময়ের মধ্যে সামঞ্জস্যের দামের বিস্ময়কর বৃদ্ধি।[৭৪] যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের দাম বেড়ে যাওয়া একটি সার্বজনীন ঘটনা ছিল, কিন্তু তার ফলে অপেক্ষাকৃত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় কোম্পানিটি যার সেকেলে ও ছোট কারখানার পরিবর্তে আধুনিক ও বড় আয়তনে উৎপাদনক্ষম কারখানা গড়ে তোলার প্রয়োজন জড়িত ছিল অস্তিত্ব রক্ষার দায়ের সঙ্গে। বৃহত্তর সম্প্রসারণের তাগিদে বেশির ভাগ যন্ত্রপাতি

সারণি : ৯.৩ TISCO-র প্রতি টন ইস্পাতের উৎপাদন-ব্যয় (Works-cost), ১৯১২-১৩ থেকে ১৯২৫-২৬ পর্যন্ত (টাকায়)

	১৯১২-১৩	'১৩-১৪	'১৪-১৫	'১৫-১৬	'১৬-১৭	'১৭-১৮	'১৮-১৯	'১৯-২০	'২০-২১	'২১-২২	'২২-২৩	'২৩ ২৪	'২৪-২৫	'২৫-২৬
ওপেন হার্থ লোহাপিণ্ড	৬৯.৬৮	৫৪.৬০	৪৫.৬৬	৪২.৭৭	৪১.১৩	৪৫ ১১	৫৮.৯০	৫৩.৪৫	৬৫.৪৮	৬৮.৮২	৭২.৫০	৬৮ ৬৪	৬০.৫৭	৫৫.৫২
ডুপ্লেক্স প্ল্যান্ট লোহাপিণ্ড	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৯৭.৬৪	৮২ ০৮	৭০.৮১	৫৮ ৮৪
ব্লুমিং মিল (পুরনো)	৮৭.৩০	৬৮.২৩	৫৬.২০	৫৩.১৮	৫৯ ৯৫	৫৪ ৩৬	৭১.৭১	৬৫.২২	৭৯.০৫	৮৩.৬৭	৮৯ ১১	৮৫ ৭৭	৭৭.০২	৭৩.২৪
২৮ ইঞ্চি মিল (পুরনো)	১৪৭.১৩	৯৪ ১২	৮২.১১	৭৮.০০	৭৫.১৭	৮২ ১৩	১০৭ ১৫	৯৩.৯১	১১২.১০	১১৬ ০০	১২৫.০৭	১২০.৯৩	১১০.৩০	১১২.৯৯
বার মিল (পুরনো)	১৫০.৫৭	১১৮ ৯২	৯৭ ৩২	৮৬.৫৯	৮১.৯৯	৮৭.৭৯	১১১.৬১	১০২.২৭	১২৩.৭২	১৩৫.৫০	১৩৮ ৫৩	১৩২ ৫৫	১২৩ ২৭	১২৫.১০
প্লেট মিল	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১৪৫ ৮৪	১৪২.১৩	১৪৫ ৭৬	১২১.৩৩
নতুন ব্লুমিং মিল	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৯৩ ৯৬	৮৫ ৪৫	৬৮.৩৩
নতুন রেল মিল	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	১১৩.২৪	৯৬.০২
নতুন বার মিল	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১৩৪.১২	১০৪ ৫৯
শিটবার এবং বিলেট (billet) মিল	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১১৫.৮৪	৯৬ ০৯	৭৭.৭৬
কাল শিট্	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	২০৩ ৯০	১৮১ ১৬
গ্যাল্‌ভানাইজ্‌ড প্লেন শিট্	-	-			-		-	-	-		-	-	৩৩২ ০৯	২৯৮ ৮০
গ্যাল্‌ভানাইজ্‌ড করুগেটেড শিট	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	৩৫৭ ৪৮	৩১৪ ১৯
স্লিপার	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১১৯ ৫২

উৎস : ITB : *Evidence (Report on steel), 1924*, খণ্ড ১, পৃ. ১৩৭ (Statement XX); ITB : *Statutory Enquiry 1926, steel*, খণ্ড ২ (কলকাতা, ১৯২৭), পৃ. ৬৫ (Statement No. 5)

তাকে কিনতে হয়েছিল অতিরিক্ত চড়া দামে, কিন্তু ১৯২৩-এ দাম পড়ে গেল বেশ কিছু পরিমাণ। এতে উন্নত দেশের ফার্মগুলির তুলনায় TISCO-র অসুবিধা হলো অনেক বেশি। তার কারণ, ঐ সব দেশে ফার্মগুলি যন্ত্রপাতি কেনার ক্ষেত্রে সময়োচিত সরবারহ না-ঘটার সমস্যায় পড়ত না, যানবাহনের দরুন অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ের সুবিধা পেত এবং দাম কমার অপেক্ষায় থাকতে পারত।[৭৫] অবশ্য ১৯১৯ ও ২০, এই দুটি বছরে TISCO টাকার বৈদেশিক বিনিময় মূল্যের অতি বৃদ্ধির সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, কিন্তু এই অনুকূল পরিস্থিতি অনেকাংশেই অপসৃত হয় যখন টাকার বহির্মূল্য আগের স্তরে ফিরে যায়।

এই উপাদাগুলির সঙ্গে যুক্ত হলো ইয়োরোপীয় মুদ্রা বিনিময় হারের অবমূল্যায়ন যার ফলে TISCO-র পক্ষে ইয়োরোপীয় দামে ইস্পাত বিক্রয় অসুবিধাজনক হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত TISCO রেলওয়ে বোর্ড এবং তথাকথিত পামার রেলওয়েজের (বেসরকারি কোম্পানির দ্বারা পরিচালিত রেলওয়েজ) সঙ্গে কিছু চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এই চুক্তি অনুসারে TISCO তার উৎপাদন-ব্যয় এবং ঐ পণ্যের আমদানি-দামের তুলনায় অনেক কম দামে রেল সরবরাহ করবে। রেলওয়ে বোর্ড দামের হার সংশোধন করল তা বাড়িয়ে দিয়ে (আমদানি-দাম ও চুক্তিবদ্ধ দামের মধ্যে পার্থক্যের তুলনায় এই বৃদ্ধির পরিমাণ অনেক কম ছিল), কিন্তু পামার রেল কোম্পানি তাদের ক্রয়-দাম বাড়াতে রাজি হয়নি। অতএব, বেসরকারি ভারতীয় কোম্পানির কাছ থেকে সম্পদের নীট হস্তান্তর ঘটল—জনসাধারণ, সরকার, এমনকি ব্রিটিশ কোম্পানিগুলির দ্বারা পরিচালিত রেলওয়ে কোম্পানির কাছে।[৭৭]

TISCO সব রকমের আমদানিকৃত ইস্পাতের উপর ৩৩.৩৩ শতাংশ সংরক্ষণমূলক শুল্ক ধার্য করার দাবি রাখে। এই দাবি পেশ করতে গিয়ে কোম্পানিটি যুক্তি দেখায় যে, সে সরকার, রেলওয়ে এবং সাধারণত দেশকে অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা দিয়ে থাকে। তাছাড়া, আমদানিকৃত শ্রমের ব্যয়বহুলতা, জলবায়ুর উগ্রতা, বিশেষ করে তাপ প্রতিরোধে ব্যয়সাপেক্ষ ব্যবস্থা নেওয়া, সেকেলে এবং অকেজো যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অসুবিধা, নতুন যন্ত্রপাতির আমদানি-সরবরাহে বিলম্ব, ইয়োরোপীয় দেশগুলির মুদ্রার অবমূল্যায়ন এবং বড় বড় ইস্পাত উৎপাদকদের ডামপিং-এর নীতি অনুসরণ—এই সব বিষয়গুলিও যুক্তি হিসাবে পেশ করা হয়। TISCO-ই ছিল ইস্পাতের একমাত্র উৎপাদক যে সুয়েজের পূর্ব দিকে অবস্থিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রয়োজন মেটাতে পারত। এদিক থেকে টাটা কোম্পানির যে সামরিক গুরুত্ব ছিল তা সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি হিসাবে উল্লেখ করা হয়।[৭৮] ভারতীয় ট্যারিফ বোর্ড ইস্পাতের উপর সংরক্ষণমূলক শুল্ক এবং রেলের জন্যে দান সুপারিশ করার সময় TISCO-র সামরিক গুরুত্বের উপর জোর দেয়। প্রস্তাবিত শুল্কের বিশেষভাবে হারগুলি পণ্য বিশেষে নির্দিষ্ট ছিল এবং আশা করা হয়েছিল এগুলি মূল্য অনুসারে প্রায় ১৫ শতাংশে দাঁড়াবে—অর্থাৎ, লোহা ও ইস্পাতের উপর শুল্কের সাধারণ হার বাড়বে মাত্র ৫ শতাংশ। যেহেতু TISCO-কে এক দীর্ঘকালীন চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট দামে রেল বিক্রি করতে হতো এবং এই দাম ট্যারিফ বোর্ডের হিসাব মতো ১৮০ টাকার সমান ন্যায্য দামের থেকেও অনেক কম ছিল, কোম্পানিটি সুপারিশ করা শুল্কসমূহ থেকে সুবিধা পেতে পারত না। রেল বিক্রির খাতে প্রস্তাবিত টন-প্রতি দামের পরিমাণ ছিল ১৯২৪-২৫-এ ৩২ টাকা, ১৯২৫-২৬-এ ২৬ টাকা এবং ১৯২৬-২৭-এ ২০ টাকা। নির্মিত ইস্পাতের উপরও শুল্ক ধার্য করা হতো মূল্যের ২৫ শতাংশ পর্যন্ত (১৯২৪ সালের বাণিজ্য শুল্ক মূল্যায়নের ভিত্তিতে)। কিন্তু স্টিমার, লঞ্চ,

বজরা, মালবাহী নৌকা এবং অন্যান্য জলযান এই শুল্কের আওতার বাইরে রাখা হয়েছিল এবং তাদের অংশবিশেষ অপেক্ষাকৃত ভারি হওয়ার দরুন স্বাভাবিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারত।[৭৯] এ সব প্রস্তাবের কার্যকরী সময় ছিল তিন বছর, অবস্থার পুনর্বিবেচনা হওয়ার কথা তার পরে। কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন না ঘটিয়ে সরকার প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করে। ব্রিটিশ পণ্যের বাজার সঙ্কুচিত হয়ে যাওয়ার ঘটনাটিতে সরকার প্রভাবিত হয়েছিল, এ রকম ইঙ্গিত মেলে প্রস্তাবগুলির সমর্থনে। ১৯০৯ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত সময়ের তুলনায় [দ্রষ্টব্য সারণি ৯.৪, স্তম্ভ (৪) এবং (৫)] ১৯১৯ থেকে ১৯২৪ পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে সব দেশ থেকে লোহা ও ইস্পাতের ভারতীয় আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। পূর্ববর্তী কালে মোট আমদানিতে যুক্তরাজ্যের ভাগ ছিল ০.৭০ শতাংশ, পরে তা ০.৬৫ শতাংশে কমে যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের তুলনায় লোহা ও ইস্পাতের ভারতীয় আমদানিতে যুক্তরাজ্যের অংশ কমে যাওয়ার ঘটনাটি আরো বেশি লক্ষ্যণীয়।

যাই হোক, ইয়োরোপের দেশগুলিতে ইস্পাত শিল্পে মন্দা অব্যাহত ছিল, সেখানে মুদ্রার সর্বজনগত অবমূল্যায়ন ঘটেছিল এবং ভারতীয় টাকার স্টার্লিং মূল্য ১ শিলিং ৪ পেন্সের থেকেও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল (এই হারের উপর ভিত্তি করে ছিল ইস্পাত শিল্পের (সংরক্ষণ) আইনের [১৯২৪ এর XIV] ধারা)। TISCO অতিরিক্ত সংরক্ষণের জন্যে আবেদন করে, এবং সরকার ট্যারিফ বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী সমতা রক্ষার দায়িত্বের পরিবর্তে ঢালাই লোহার ক্ষেত্রে টন-প্রতি ২০ টাকা হারে অনুদান দেবার প্রস্তাব পেশ করে। ১৯২৪-এর অক্টোবর মাসে, সব রকম সরকারি সাহায্যের মোট পরিমাণ ১৯২৪-এর ১লা অক্টোবর থেকে ১৯২৫-এর ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৫ মিলিয়ন টাকার বেশি হবে না।

আরও অনুসন্ধানের পর ট্যারিফ বোর্ড ১৯২৫-এর সেপ্টেম্বরে ১৮ মাস সময়কালের জন্যে ভারতীয় ঢালাই-লোহার কারখানাকে অনুদানস্বরূপ উৎপাদিত ৭০ শতাংশ লোহা-পিণ্ডের উপর টন-প্রতি ১৮ টাকা হারে অতিরিক্ত সাহায্য দেবার জন্যে সুপারিশ করে।[৮০] ভারত সরকার এই অনুদান টন-প্রতি ১৮ টাকা থেকে কমিয়ে ১২ টাকা করে। সর্বাধিক সাহায্যের পরিমাণ ৯ মিলিয়ন থেকে ৬ মিলিয়নের মধ্যে রাখা হয়।[৮১] ট্যারিফ বোর্ড নির্মিত ইস্পাতের উপর শুল্ক তার মূল্যের ২৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩২.৫ শতাংশ ধার্য করার জন্যে সুপারিশ রাখে, কিন্তু সরকার এই সুপারিশ মানেনি।

সারণি ৯.৪ ভারতে লোহা ও ইস্পাত এবং রেলওয়ে সামগ্রীর মোট আমদানি, ১৮৯৪-৫ থেকে ১৯২৪-৫ পর্যন্ত (সংখ্যাগুলি টনে প্রকাশিত)

সময়কাল	'অন্য রকমের' রেলওয়ে সামগ্রী বাদে		'অন্য রকমের' রেলওয়ে সামগ্রী সমেত	
	সব দেশ থেকে	যুক্তরাজ্য থেকে	সব দেশ থেকে	যুক্তরাজ্য থেকে
১৮৯৪-৫	৩৪৯,০৪০	২৫৭,১৪০	৩৭৯,৭৩৭	২৮৭,৭১৬
১৮৯৫-৬	৪৭৬,৮৩৫	৩৪৯,৮৯৭	৫২০,৬৯৭	৩৯৩,৭৩০
১৮৯৬-৭	৬৩১,২৯৭	৫১৪,৮৭৯	৬৯৯,২৭৮	৫৮২,১৩৭

সময়কাল	'অন্য রকমের' রেলওয়ে সামগ্রী বাদে		'অন্য রকমের' রেলওয়ে সামগ্রী সমেত	
	সব দেশ থেকে	যুক্তরাজ্য থেকে	সব দেশ থেকে	যুক্তরাজ্য থেকে
১৮৯৭-৮	৫৮২,৬০০	৪৬৫,৩৫০	৬৬৫,৭০০	৫৪৮,৪০০
১৮৯৮-৯	৪৪৮,০০০	৩৩৫,৬৫০	৫০৭,৩৫০	৩৯৫,০০০
১৮৯৯-১৯০০	৩৮৬,৩৫০	৩০১,৯০০	৪৩৮,৮৫০	৩৫৩,১৫০
১৯০০-১	৩৮৫,৯৫০	২৬২,৮৫০	৪১৯,৭০০	২৯৬,৪৫০
১৯০১-২	৪৮৫,৭০০	৩০২,৬০০	৫২১,৭৫০	৩৩৮,৭০০
১৯০২-৩	৫৫৪,২৫০	৩৮৫,৬৫০	৫৭৯,২০০	৪১০,৫৫০
১৯০৩-৪	৬৭৪,৫৫০	৪৮০,৯০০	৭১৪,৮৫০	৫২১,০০০
১৯০৪-৫	৭০৭,৩৫০	৫১৪,২৫০	৭৭৮,৬০০	৫৮৪,২০০
১৯০৫-৬	৮০৭,৬৫০	৫৫৪,৫০০	৮৭০,৫০০	৬১৭,১০০
১৯০৬-৭	৭৩৪,৭০০	৫৪০,৩৫০	৮১৪,৭৫০	৬২০,২৫০
১৯০৭-৮	৮০০,০০০	৫২৩,৪০০	৮৫৬,৩৫০	৫৭৯,৪০০
১৯০৮-৯	৮১২,৩০০	৫৩৪,৫০০	৮৫৯,১৫০	৫৪০,৯০০
১৯০৯-১০	৮২০,৮০০	৫৭৯,৪০০	৮৮৫,৮০০	৬৪২,১৫০
১৯১০-১১	৮৪৯,১০০	৫৮৯,৬০০	৯০০,১০০	৬৩৯,৬৫০
১৯১১-১২	৮৮১,৮৫৭	৫৯৯,২০৮	৯৩৭,৪০৭	৬৫৩,৫০৮
১৯১২-১৩	৯৭০,০৭২	৬৭৪,৫৮৩	১,০৩৩,৮৭২	৭২৮,৭৮৩
১৯১৩-১৪	১,২৮২,৮৫৮	৮৭৩,২৯৬	১,৩৪৯,৮৫৮	৯৩৮,৪৪৬
১৯১৪-১৫	৮৬৫,৪০১	৬৭৬,৪৮০	৯১১,৭৫১	৭২১,৩৮০
১৯১৫-১৬	৫১১,৭৩১	৩৭২,৫৪৫	৫৩০,৫৮১	৩৯১,০৯৫
১৯১৬-১৭	২৯৫,২৩১	২১১,৯৫৩	৩০৫,৪৯৯	২২১,৬৬৫
১৯১৭-১৮	১৬৫,৬৯৩	৯৬,১৭৮	১৬৭,২১৯	৯১,৭০৪
১৯১৮-১৯	১৯৬,৭৭০	৯২.১২৪	১৯৭,২১১	৯৩,৬৮৩
১৯১৯-২০	৫০৮,৬০৭	৩৪৮,০৪০	৫১৫,৪৪৩	৩৫৪,৮০৬
১৯২০-২১	৮০৮,৪০৬	৫৯৪,৪৪৪	৮২৮,৭৪৮	৬১২,৮৪১
১৯২১-২২	৭৪৫,৮২৩	৪১১,২৩৯	৭৭২,৯৯৭	৪৩৪,৮৯০
১৯২২-২৩	৯৪৭,২২৯	৫৪৮,৬২৩	৯৭১,৭৩০	৫৭১,২১০
১৯২৩-২৪	৮৮৮,১৮৭	৫৫১,৭৫২	৯৩৫,৮৬৬	৫৯৫,৩৬৮
১৯২৪-২৫	৯৩৭,৯৩২	৪৯৮,৬৫২	৯৬৯,৬০১	৫২১,৫৩৪

মন্তব্য : প্রথম স্তম্ভটি সারণি ৯.২-র প্রথম ও দ্বিতীয় স্তম্ভের যোগফল। দ্বিতীয় স্তম্ভটি সারণি ৯.১-এর পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তম্ভের যোগফল। তৃতীয়টি সারণি ৯.২-র তৃতীয় ও চতুর্থ স্তম্ভের যোগফল। চতুর্থটি সারণি ৯.১-এর পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তম্ভের যোগফল।

ইস্পাত শিল্প (সংরক্ষণ) আইন (১৯২৪)অনুযায়ী শিল্পটিকে তিন বছর সময়ের জন্যে সংরক্ষণ অনুমোদন করা হয়, সময়সীমা ৩১ শে মার্চ ১৯২৭ সাল পর্যন্ত। সে কারণে ১৯২৬-এর এপ্রিল মাসে সরকার ট্যারিফ বোর্ডকে পুনর্বার শিল্পটির অবস্থা অনুসন্ধানের নির্দেশ দেয়

এবং শুল্কের মাধ্যমে অথবা অন্য কোনো উপায়ে শিল্পটির সংরক্ষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলে। অবশ্য যদি কখনও ঐ ধরনের সাহায্যের প্রয়োজন থাকে। ট্যারিফ বোর্ডের পরামর্শ মেনে নেওয়া হয় এবং বিভিন্ন রকম ইস্পাতের উপর মূল শুল্ক ধার্য করা হয় ১৯২৪ এবং ১৯২৭-এর মধ্যে যে হার চালু ছিল তার থেকে কম হারে। কিন্তু ইয়োরোপীয় (ব্রিটিশ থেকে স্বতন্ত্র) ইস্পাতের উপর কিছু অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য করা হয়। এই নতুন পরিকল্পে ইস্পাত রেলের উপর অনুদান বন্ধ করা হয়। সংরক্ষণের সময়কাল স্থির করা হলো সাত বছর। ইস্পাতের উৎপাদন ৪২০,০০০ টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬০০,০০০ টন হওয়াতে টাটা কারখানার উৎপাদন ক্ষমতায় যে সম্প্রসারণ ঘটে তার ফলাফল মূল্যায়নের জন্যে ঐ সময়ের প্রয়োজন ছিল।[৮২]

১৯২৭-এর ইস্পাত শিল্প (সংরক্ষণ) আইন ভারত সরকারকে বিভিন্ন ধরনের ইস্পাতের উপর শুল্কের হার পরিবর্তনের অনুমতি দেয়। শর্ত ছিল, আমদানিজাত ইস্পাতের দামের মধ্যে খুব বেশি তারতম্য ঘটলে এই অনুমতি কার্যকর হবে। ১৯৩০-এর সেপ্টেম্বরে TISCO তড়িৎলেপিত ইস্পাতের চাদরের উপর শুল্ক বৃদ্ধি করার জন্যে আবেদন করে। কারণ হিসাবে বলা হয়, যে দামের ভিত্তিতে শুল্ক ধার্য করা হয়েছিল তার তুলনায় ঐ ইস্পাত-চাদরের আমদানি-মূল্য অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। অনুসন্ধানের পর ট্যারিফ বোর্ড রেলের জন্যে সরকার চুক্তি অনুযায়ী যে দান দেয় তা বাড়ানোর পরামর্শ দেয়, কারণ ১৯২৬ সালের অনুসন্ধান-কালে সরকারের ক্রয়ের পরিমাণ যতখানি হবে আশা করা হয়েছিল তার থেকে মোট ক্রয়ের পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। সরকার ট্যারিফ বোর্ডের এই পরামর্শ মেনে নেয়।[৮৩]

১৯৩৩-৪-এ ভারতীয় ট্যারিফ বোর্ড আরও একটি অনুসন্ধান চালায়, বিবরণে[৮৪] তারা যুক্তরাজ্য থেকে আমদানিজাত রেল, স্টিল স্লিপার, ফিস প্লেট, সেমিস (semis) এবং পরীক্ষিত অবয়বযুক্ত ইস্পাত ও প্লেটের (tested structural steel and plates) উপর থেকে শুল্ক তুলে নেওয়ার জন্যে সুপারিশ করে। শুধুমাত্র ইয়োরোপীয় অবয়বযুক্ত ইস্পাতেব ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি শুল্ক ধার্য করার সুপারিশ আসে। যেহেতু ইয়োরোপীয় ইস্পাত অপরীক্ষিত ইস্পাতের প্রায় সমতুল্য ছিল এবং এই অপরীক্ষিত ইস্পাত সংরক্ষণমূলক শুল্ক নীতির আওতায় ছিল, ১৯২৭ সালে প্রবর্তিত সাম্রাজ্যিক অগ্রাধিকারের (Imperial preference) নীতিটি বলবৎ থাকে। কিন্তু ট্যারিফ বোর্ড এছাড়া সুপারিশ করেছিল, রেল কোম্পানিগুলিকে তাদের প্রয়োজনীয় ইস্পাত টন পিছু ৯৫ টাকা দামে ভারতবর্ষেই কিনতে হবে ৩১শে মার্চ, ১৯৪১ তারিখ পর্যন্ত চালু একটি ব্যবস্থা অনুসারে এবং সংরক্ষণের প্রচলিত নীতিটির পুনর্বিবেচনা হবে ঐ তারিখে। ঘটনাক্রমে এই পুনর্বিবেচনার কাজ কখনও হয়নি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় তার প্রয়োজন দূর হয়।

৯.৭ সংরক্ষণের ছত্রছায়ায় ইস্পাতের উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস

ভারতীয় ট্যারিফ বোর্ডের সুপারিশ বরাবর নির্ভর করেছিল সংরক্ষণের সময়ে প্রচলিত ইস্পাতের গড় উৎপাদন-ব্যয়ের উপর, বছরের ঠিক মধ্যবর্তী সময়কে ধরা হতো গড়-ব্যয় নির্ণয়ের ভিত্তি হিসাবে। যেহেতু গড়-ব্যয়ের হিসাব নির্ভর করত উৎপাদনের সঠিক অনুমানের

উপর, ইস্পাত উৎপাদনের যন্ত্রপাতির অপূর্ণ ব্যবহার সংরক্ষণের কার্যকরী মাত্রার হ্রাস ঘটাত। ট্যারিফ বোর্ডগুলি এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে চলত যে, কারখানার সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রসারণেব এবং ভারতীয় তত্ত্বাবধায়কদের পবিবর্তে বিদেশী কর্মচারীদের নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে গড় উৎপাদন-ব্যয় কমতে থাকবে। অনুমানটি আবার নির্ভর করেছিল এই দাবির উপর যে, তার পক্ষে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস সম্ভবপর হবে শুধুমাত্র যখন কারখানার নবরূপায়ণ, সম্প্রসারণ এবং পুনর্বাব সংগঠনের অবকাশ মিলবে। ঘটনাচক্রে ১৯২৩-২৪ থেকে ১৯৩৩-৩৪ পর্যন্ত উৎপাদনের গড়-ব্যয় অবিচ্ছিন্নভাবে কমতে থাকে, তার ফলে সরকার সমর্থ হয় সংরক্ষণমূলক শুল্কের পরিমাণ ১৯২৭ থেকে কমিয়ে ফেলতে। ১৯২৩-২৪ থেকে ১৯৩৩-৩৪ পর্যন্ত TISCO-র উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি ট্যারিফ বোর্ডের আগাম হিসাবকে অতিক্রম করে যায়। এই বৃদ্ধি অংশত ঘটেছে রেল বোর্ড কর্তৃক রেল ক্রয়ে প্রচণ্ড হ্রাসের ফলে এবং কিছু রেল কোম্পানি যারা ব্রিটিশ রেলের ক্রয় অব্যাহত রেখেছিল তাদের পক্ষপাতিত্বের কারণে। প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় রেলওয়েজ কর্তৃক ভারতীয় ইস্পাত ক্রয়ের তালিকা সারণি ৯.৫ এবং TISCO-র কাছে যে রেলের ফরমায়েশ আসে তার তালিকা সারণি ৯.৬-এ দ্রষ্টব্য। ৭ ই মে, ১৯২৬-এর ভারতীয় ট্যারিফ বোর্ডের সকাশে TISCO তার বিবৃতিতে অনুযোগ করে যে, দাম (টন-প্রতি ১০৫ টাকা) হওয়া সত্ত্বেও বার্মা রেলওয়েজ, সাউথ ইন্ডিয়ান রেলওয়ে এবং ম্যাড্রাস অ্যান্ড সাদার্ন মাহ্‌রাট্টা রেলওয়ে ভারতীয় রেল ক্রয় করতে সম্মত হয়নি। বার্মা রেলওয়েজের ক্ষেত্রে কোম্পানি টন প্রতি ১০০ টাকা হারে টেন্ডার পেশ করে, কিন্তু তা অগ্রাহ্য হয়।[৮৬] বার্মা রেলওয়েজ তাদের সাক্ষ্যে বলে যে, হোম বোর্ড (যুক্তরাজ্যে অবস্থিত) রেলের সমস্ত চুক্তি সম্পাদন করত।[৮৭] ম্যাড্রাস অ্যান্ড সাদার্ন মাহ্‌রাট্টা রেলওয়ে জানায় যে, ১৯২৬-২৭-এ তারা তাদের রেলের প্রয়োজনের প্রায় ৮৭ শতাংশ এবং সমস্ত ফিশ প্লেট যুক্তরাজ্য থেকে ক্রয় করত।[৮৭ক] বার্মা রেলওয়জে এবং ম্যাড্রাস অ্যান্ড সাদার্ন মাহ্‌বাট্টা রেলওয়ে উভয়ই কোনো কারণ নির্দেশ না করেই জানায় যে, টাটা রেল ব্রিটিশ রেলের তুলনায় নিচু মানের।[৮৭খ] টাটা ইস্পাত কতটা ক্ষয়-প্রতিরোধে গুণ-সম্পন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। নানান রেলওয়ে কোম্পানি এবং আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি সন্দিহান হয়েছিল। এই বিশেষ তথ্যের ভিত্তিতে TISCO যে নিজেই মাল খারিজ করেছিল ব্রিটিশ মানের নিরিখে উপযুক্ত নয় বলে।[৮৭গ] গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়ে কোম্পানির এজেন্ট রেলওয়ে বোর্ডকে তা সত্ত্বেও একটি চিঠিতে জানায় : '১৯২৫-এ টাটা এবং ব্রিটিশ রেলের মধ্যে ওজনের ভিত্তিতে একটি তুলনা করা হয় এবং তার ফলাফল প্রকাশ করে যে, উভয়ের মধ্যে ক্ষয়ের দিক থেকে কোনো উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই'।[৮৭ঘ]

সারণি ৯.৩ এবং ৯.৭ থেকে কারখানার উৎপাদন-ব্যয় হ্রাসের মাত্রা পরিমাপ করা যায়। সারণি ৯.৭-এর ৬ এবং ৯ স্তম্ভের মধ্যে আমরা তুলনা করে দেখি যে উৎপাদনের বিভিন্ন দিকে ১৯২৬ থেকে ১৯৩৩-এর মধ্যে ব্যয়ের প্রকৃতপক্ষে যে হ্রাস ঘটে তা ট্যারিফ বোর্ডের স্বীকৃত ব্যয়-হ্রাসের পরিমাণের থেকেও বেশি যদিও ঐ সময়কালের উৎপাদন-ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার কখনও সম্ভবপর হয়নি।

অনেক রকমের সুযোগ সুবিধা, যেমন শক্তির যোগান অথবা তত্ত্বাবধান (general supervision), ইস্পাত উৎপাদনের বহু ক্ষেত্রে একই রকম ছিল, এবং যেহেতু এই ব্যয়গুলি

সারণি ৯.৫ প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় রেলওয়ে কর্তৃক ইস্পাত রেল ক্রয়

তিন-বছর সময়কাল	ইস্পাত রেলের মোট ক্রয়ের পবিমাণ ('০০০ টাকায়)	মোট ইস্পাত রেল ক্রযেব মধ্যে ভারতে উৎপাদিত ইস্পাত রেল ক্রয়ের শতকরা অংশ
১৯২২-৩ — ১৯২৪-৫	৪৬,৯৬৮	৬১.১৭
১৯২৫-৬ — ১৯২৭-৮	৫৮,৯৮৫	৭২.১১
১৯২৮-৯ — ১৯৩০-১	৪৩,৯২৯	৮৯.৩৫
১৯৩১-২ — ১৯৩৩-৪	১৯,৫৬১	৯২.৯০
১৯৩৪-৫ — ১৯৩৬-৭	২২,১৯৭	৯৬.৭৮
১৯৩৭-৮ — ১৯৩৯-৪০	১৭,২৪১	৯৯.১৯

উৎস : Gov. India : *Railway Board : Administration Report* খণ্ড ২ (সিমলা এবং কলকাতা, বার্ষিক)। ১৯৩৬-৭ পর্যন্ত তথ্যগুলিতে বার্মা রেলওয়েজের ক্রয়ের পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

সারণি ৯.৬ ভারতীয় রেলওয়েজের কাছ থেকে TISCO যে ফরমায়েশ পায় তার তালিকা, ১৯২৩-৪ থেকে ১৯৩৩-৪

বছর	পরিমাণ ('০০০ টনে)	TISCO কর্তৃক গৃহীত গড় দাম (টন প্রতি দাম-টাকায়)	
১৯২৩-৪	৭৬.৬	১৩৩.৭	
১৯২৪-৫	১০৪.৮	১২৪.৯	এ ছাড়া রেলের অনুদান ৩২/- টাকা
১৯২৫-৬	১১৭.৪	১২২.৯	এ ছাড়া রেলের অনুদান ২৬/- টাকা
১৯২৬-৭	১৩৯.৮	১২১.১	এ ছাড়া বেলের অনুদান ২০/- টাকা
১৯২৭-৮	১৮২.৮	১১০.০	
১৯২৮-৯	৫৯.৭	১১০.০	
১৯২৯-৩০	১১৯.৭	১১০.৮	
১৯৩০-৩১	৯৫.৬	১২৯.৬	
১৯৩১-২	৮০.৮	১২৮.২	
১৯৩২-৩	৩৬.৫	১১৩.৫	
১৯৩৩-৪	৪০.০	পাওয়া যায় নি	

উৎস : ITB : *Statutory enquiry 1933 : steel,* খণ্ড ১ : *Written evidence given by the Tata Iron and Steel Company Limited* (দিল্লী, ১৯৩৪), পৃ. ৭৪।

উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের বরাদ্দ অনেকাংশে স্থূল বিচারের মাধ্যমে করা হতো, বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন-ব্যয়ের সম্পর্ক থেকে অতিরিক্ত কিছু বোঝার চেষ্টা করা উচিত নয়। কিন্তু উৎপাদন-ব্যয়ের হ্রাস সব পণ্যের ক্ষেত্রেই ঘটেছিল। সম্ভবত সে কারণে কিছু সাধারণ ব্যয়-হ্রাসকারী উপাদান নজরে পড়ে।

প্রথমত, নতুন সাজ-সরঞ্জাম বসানোর ফলে যন্ত্রপাতির ব্যবহারগত উন্নতি ঘটেছিল : নতুন বার মিল, নতুন ব্লুমিং মিল এবং নতুন রেল মিল প্রতিষ্ঠার ফলে কারখানার উৎপাদন ব্যয় পুরনো কারখানার তুলনায় কমে গিয়েছিল। এসব কিছু ঘটে নতুন কারখানা স্থাপনের দু'এক বছরের মধ্যে।[৮৮] পুরনো কারখানায় প্রস্তুত করা ইস্পাতের উৎপাদন-ব্যয় ১৯২২-২৩ থেকে ১৯২৫-২৬ পর্যন্ত কম থাকার ধারণাটি অনেকাংশে ভ্রমাত্মক, যেহেতু ইস্পাত পিণ্ডের উৎপাদন ব্যয় ১৯২৩-২৪ থেকে ১৯২৬-এর অগাস্ট পর্যন্ত টন প্রতি প্রায় ২০ টাকা কমে। অবিচ্ছিন্নভাবে চালু রাখার ফলে প্রাচীন মিলগুলির উৎপাদন-ব্যয় বেড়ে গিয়েছিল[৮৯] (ওপেন হার্থ চুল্লীতে খারিজ করা মালের ব্যবহার বেড়ে যাওয়াতে ব্যয় কমে যায়)।[৯০] ১৯২৬ এবং ১৯৩০-এর মধ্যে মারুত চুল্লীগুলির মধ্যে দু'টিকে অনেকটা প্রসারিত করা হয় এবং চারটি 'অসাধারণ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন' হাপর স্থাপন করা হয়। একটি তৃতীয় পরিবর্তক এবং তৃতীয় সমাপক চুল্লী স্থাপন করা হয় ডুপলেক্স (উভয় দিগবর্তী মুখ) কারখানায় এভাবে ডুপলেক্স পক্রিয়া (দ্বৈত প্রক্রিয়া) এবং সাধাবণ ওপেন হার্থ প্রক্রিয়া দুটির আপেক্ষিক নৈপুণ্যের পরিবর্তন ঘটে।

নতুন হাপরশালার এবং ২৮ ইঞ্চি মিলে নতুন নতুন সরঞ্জাম বসানো হয়েছিল। উৎপাদনক্ষম বিভাগগুলির জন্যে অন্যান্য সহায়ক সরঞ্জাম (auxiliary equipment) ও যোগানদারী বিভাগগুলির (service departments) জন্যে আরও ইঞ্জিন এবং শক্তি-উৎপাদনকারী যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা হলো। এই পরিবর্তন সমূহের ফলে ১৯৩২-এর মে মাসের পর থেকে কোম্পানিটি প্রাচীন হাপরশালা এবং ২৮-ইঞ্চি মিল সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হয় এবং গড় উৎপাদন-ব্যয়ের উপর এরও প্রভাব অনুকূল ছিল।[৯১]

উৎপাদনের মাত্রার সম্প্রসারণ (extensions in scale) এবং কারখানার উন্নতি সাধন থেকে দক্ষতা বৃদ্ধি ছাড়া 'কাজের মাধ্যমে শেখার' সূত্রটির অনুসরণ ফলদায়ী হয়েছিল। ১৯২৪ থেকে ১৯২৬-এর মধ্যে কোক চুল্লী, মারুত চুল্লী এবং ওপেন হার্থ চুল্লীর ক্ষেত্রে ব্যবহারগত কুশলতার যথেষ্ট উন্নতি ঘটে—বিশেষ করে জ্বালানির ব্যবহারের দিক থেকে।[৯২] 'কাজের মাধ্যমে শেখার' এবং শিক্ষণ ব্যবস্থার আংশিক ফল হিসাবে তত্ত্বাবধায়কের পদগুলিতে ইয়োরোপীয় ও মার্কিনীদের (চুক্তিবদ্ধ কর্মচারী) পরিবর্তে ভারতীয়দের নিয়োগ সম্ভব হয়েছিল। বৃহত্তর সম্প্রসারণ পরিকল্পনার সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যেহেতু অনেকগুলি নতুন ইউনিট চালু করা হয়েছিল, চুক্তিবদ্ধ কর্মচারীদের সংখ্যা ১৯২৪-এ নিয়োজিত সর্বোচ্চ ২২৪ থেকে কমে ১লা জুন ১৯২৬-এ ১৬১-তে পরিণত হয় এবং ক্রমান্বয়ে সংখ্যাটি নেমে এসে ১লা এপ্রিল ১৯৩৩-এ ৭০-এ দাঁড়ায়। কর্মরত অবস্থায় শিক্ষণ-প্রাপ্তি ছাড়া, বেশির ভাগ ভারতীয় কর্মচারী যাঁরা তত্ত্বাবধায়কের পদে ছিলেন তাঁরা জামশেদপুর টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের কারিগরি শিক্ষা পান। ১৯৩০-৩১-এ সামান্য অবনতি ছাড়া চুক্তিবদ্ধ কর্মচারীদের গড় বেতন প্রায় অপরিবর্তিত ছিল। কিন্তু ঐ পদগুলিতে যে ভারতীয়রা এলেন তাঁদের বেতন চুক্তিবদ্ধ কর্মচারীদের বেতনের মাত্র ৫০ থেকে ৭০ শতাংশের মধ্যে ছিল। ১৯২৭-২৮ থেকে ১৯৩২-৩৩-এর মধ্যে চুক্তিবদ্ধ কর্মচারীদের সংখ্যা কমিয়ে প্রতি একক বিক্রয়যোগ্য ইস্পাতের দরুন ৪ টাকা পরিমাণ ব্যয় হ্রাস করা সম্ভবপর হয়েছিল। এর সঙ্গে সঙ্গে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যাও যথেষ্ট কমেছিল : সমস্ত বিভাগে নিয়োজিত শ্রমিকের

সারণি ৯.৭ TISCO-তে প্রতি টন ইস্পাতের উৎপাদন-ব্যয়, ১৯২৫-৬ থেকে ১৯৪০-৪১ (টাকায়)

	প্রকৃত, আগস্ট ১৯২৬	প্রকৃত, ১৯৩৪	১৯৩৩-৪ ১৯৩৪-এর হিসাব অনুযায়ী	১৯৪০-১ ১৯৩৪-এর হিসাব অনুযায়ী	১৯২৭-৮ ১৯২৬-এর হিসাব অনুযায়ী	১৯৩৩-৪ ১৯২৬-এর হিসাব অনুযায়ী	প্রকৃত, হিসাব অনুযায়ী ১৯২৫-৬	প্রকৃত, হিসাব অনুযায়ী ১৯২৭-৮	প্রকৃত, জানুয়ারি-জুন ১৯৩৩
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
রেল	৭৯.৬	৫৬.০০	৬১.৬	৪৪.২৩	৬৩.২	৫৪.৫	৮৯.৭	৭২.৭	৬৬.২
ফিস-প্লেট	১১৬.৪	৮৬.৫২	৯০.০	৬৯.০০	৯৫.২	৮২.৯	১১২.৯	১১৯.৬	৯৫.০
সংযুক্তি-সংক্রান্ত অংশ	১০৫.৩	৬০.০০	৬৯.১	৪৮.২৩	৭৩.২	৬২.০	১০২.৪	৯৫.৩	৬৭.৪
বার	৯৯.০	৫৯.৬৩	৭৭.০	৪৯.০০	৮০.২	৬৯.৯	৯৯.৯	৮৪.৫	৭২.০
প্লেট	১০৩.৩	৬২.৫৭	৮০.৩	৫০.৫৮	৮৪.২	৭৩.২	১১৩.৬	৮৮.৫	৭২.০
কাল শিট	১৬৪.০	৮৫.৫৪	১২২.০	৬৫.১২	১৩৫.২	১১৪.৯	১৭০.০	১৩৪.২	৯৮.০
গ্যালভানাইজড় শিট	২৬৩.৭	১১৫.৫৪	২০০.০	৯৫.১২	১৯৬.৮	১৬৫.৫	২৩৭.৫	১৯৩.৬	১২৮.৪
স্লিপার	—	৫৫.৮৬	৭২.০	৪৬.০৬	৬৬.২	৬৪.৯	১০৯.৩	৭৮.৮	৬১.৭

উৎস ও টীকা : কল্যাম (১) থেকে (৪)-এর জন্যে, ITB : *Statutory enquiry 1926, steel,* খণ্ড ১ (কলকাতা, ১৯২৬), পৃ. ৩১, এবং *Report on the iron and steel industry* (দিল্লী, ১৯৩৪), পৃ. ২৮, ২৯ এবং ৩৪। কল্যাম (৫) থেকে (৯)-এর জন্যে, ITB : *Statutory enquiry 1933, steel,* খণ্ড ১ : *Written evidence given by the Tata Iron and Steel Company Ltd.* (দিল্লী, ১৯৩৪), পৃ. ৩৪। ১৯২৬ থেকে ১৯৩৩-এর মধ্যে কয়লা ও দস্তার দাম হ্রাসের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে কল্যাম (৫) থেকে (৯) পর্যন্ত তথ্যগুলি পাওয়া গেছে।

সংখ্যা ১৯২৫-২৬-এ ছিল ২৬২৯০, ১৯৩৩-এর জানুয়ারি থেকে জুনের মধ্যে সংখ্যাটি হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১৭৫১৭-তে। সেবামূলক বিভাগগুলির (service department) তুলনায় তথাকথিত উৎপাদনশীল বিভাগগুলিতে শ্রমিকের সংখ্যা অনেক বেশি সঙ্কুচিত হয়। চুক্তিবর্হিভূত কর্মচারীদের গড় মজুরি (বাৎসরিক) ১৯২৭-২৮-এ ছিল ৪৯৭ টাকা, ১৯৩২-৩৩-এ তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬৮৮ টাকায। কিন্তু এই বৃদ্ধির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে ভারতীয় তত্ত্বাবধায়কদের বেতনও, এঁরা ক্রমাগত নিযুক্ত হচ্ছিলেন চুক্তিবদ্ধ কর্মচারীদের পরিবর্তে। বিক্রয়যোগ্য ইস্পাতের প্রতি টনের জন্যে শ্রম-ব্যযেব নিট হ্রাস (চুক্তিবদ্ধ কর্মচারীদের পরিবর্তে ভারতীয়দেব নিয়োগ করার ফলে এই ব্যয়ের যে মোট হ্রাস হয় তা বাদ দিয়ে) ১৯২৭-২৮ থেকে ১৯৩২-৩৩-এর মধ্যে ছিল ৩ টাকা। যেহেতু ঐ সময়কালের মধ্যে বিক্রযযোগ্য ইস্পাতের উৎপাদন প্রায় একই রকম ছিল (১৯২৭-২৮-এ ৪২৯,০০০ টন এবং ১৯৩২-৩৩-এ ৪২৭,০০০ টন), এই পরিবর্তন প্রকৃত ব্যয় সঙ্কোচেরই প্রতিফলন।[৯৩]

শ্রম এবং অন্যান্য বিভাগের ক্ষেত্রে ব্যয়-সংকোচ সম্ভবপব হয়েছিল সচেতনভাবে নেওয়া একটি নীতির মাধ্যমে : সমস্ত বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে এবং জেনারেল ম্যানেজারের সভাপতিত্বে একটি ছাঁটাই কমিটি এবং একটি মাসিক ব্যয় কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ১৯২৫-এ ধাতুবিদ্যা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়, এই বিভাগটি বিভিন্ন পণ্যের পরিমাণ ও গুণাগুণ পুঙ্খানুপঙ্খ পরীক্ষা করত। একটি জ্বালানির ব্যয়-সংকোচ সংক্রান্ত বিভাগও খোলা হয়েছিল ১৯২৮-এ; তার সামান্য কাল পরে প্রতিষ্ঠিত হলো একটি লুব্রিকেটিং ইঞ্জিনীয়ারের দপ্তর।[৯৪] ১৯২৭-৮ থেকে ১৯৩২-৩-এর মধ্যে ঢালাই কারখানায় লোহা পিণ্ড থেকে উন্নতমানের যে ইস্পাত ঢালাই হতো তার পরিমাণ অন্যান্য কারখানা (শুধুমাত্র সওদাগরী কারখানা বাদে) থেকে অনুপাতে শতকরা ০.৭ ভাগ থেকে ০.৮ ভাগ বেশি ছিল। কার্যত প্রতিটি বিভাগে উৎপাদনের একক প্রতি যে কয়লা খরচ হতো তা প্রচুর পরিমাণে হ্রাস পায়।[৯৫] কয়লার ব্যবহারে ২০শতাংশ হ্রাসকে কোম্পানি আদর্শ তথ্য হিসাবে গণ্য করল।[৯৬]

এক দিকে থেকে দেখলে, উৎপাদন-ব্যয় হ্রাসের একটি বড় অংশের জন্যে কৃতিত্ব দাবি করতে পারে ভারত সরকার কর্তৃক উপর্যুপরি নিযুক্ত ট্যারিফ বোর্ডগুলি : TISCO ব্যয় হ্রাস করতে বাধ্য হয়েছিল তার কারণ, প্রতি ক্ষেত্রেই প্রস্তাবিত বাণিজ্য-শুল্ক অথবা অনুদানের সাহায্যে কোনো রকমে উৎপাদনের স্থির ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হতো। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল মূলধনের প্রতিস্থাপন এবং কার্যকরী মূলধন বাবদ ব্যয় যা ট্যারিফ বোর্ড সুপারিশ করত।[৯৭] প্রতিটি ক্ষেত্রেই উৎপাদন-ব্যয় হ্রাসের দরুন ট্যারিফ বোর্ডের বিবেচনা অনুসারে কিছু অনুমোদনের ব্যবস্থাও থাকত। ১৯২৪ থেকে ১৯৩৩-এর মধ্যে বেশিরভাগ সময়ে প্রতিযোগীদের ধার্য দাম—অর্থাৎ TISCO'র প্রাপ্ত দাম—ট্যারিফ বোর্ডগুলির আগাম হিসাবের থেকেও অনেক কম ছিল। অপর দিকে TISCO উৎপাদিত ইস্পাতের চাহিদা অনুমিত চাহিদার মূল্যের থেকেও যথেষ্ট কম ছিল, তার প্রধান কারণ নিহিত ছিল রেলপথ নির্মাণ এবং সরকারের সাধারণ বিনিয়োগ বাবদ ব্যয়ের অতিরিক্ত হ্রাস। তাই ইস্পাত উৎপাদন থেকে TISCO'র লাভের অঙ্ক বেশিরভাগ সময়েই ট্যারিফ বোর্ডের নির্ধারিত সর্বনিম্ন পরিমাণের থেকেও কম ছিল। অতএব TISCO-কে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে চলতি ব্যয় যথা সম্ভব কমাতে হয়েছিল।

শুল্ক সংরক্ষণের আংশিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও কোম্পানির অস্তিত্ব ছিল, তার বিভিন্ন কারণগুলির পারস্পরিক সংঘঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিল উৎপাদন ব্যয়ের ব্যাপক পতন। ইস্পাতের চাহিদা সঙ্কোচনের বছরগুলিতে TISCO উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঢালাই না করা লোহা পিণ্ড বিক্রি করতে পারত এবং করেও ছিল। ঢালাই না করা লোহা পিণ্ডের ভারতীয় বাজার ছিল ছোট, বেশিব ভাগ লোহা পিণ্ড বিদেশে চালান যেত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং যুক্ত রাজ্যে—গুরুত্ব অনুসারে সাজানো এই দেশগুলি ছিল দ্রব্যটির মূল ক্রেতা। পণ্যের এই রপ্তানি বাজার ছিল চূড়ান্তভাবে প্রতিযোগিতামূলক এবং TISCO উৎপাদিত ঢালাই না করা লোহা পিণ্ড কোনো এক সময় যুক্তরাষ্ট্রের কাউন্টারভেলিং ডিউটির আওতায় পড়ে। তার কারণ, সেদেশে তখন ডাম্পিং বিরোধী আইন পাশ হয়।[৯৮]

দ্বিতীয়ত, ১৯২৭ থেকে ১৯৩৩—এই সময়সীমার মধ্যে কয়লা ও দস্তার দাম কমে, তার ফলে কোম্পানি বৃহত্তর উদ্বৃত্ত লাভে সমর্থ হয়।

সবশেষে বলা যেতে পারে, কোম্পানিটি সমস্যায় পড়ল এমন সময় (১৯২২-এর কাছাকাছি) যখন সে আর্থিক দিক থেকে শক্তিমান। কোম্পানিটি সাধারণ শেয়ার, ডেফার্ড শেয়ার এবং দ্বিতীয় প্রেফারেন্স শেয়ার (৭$^{১}/_{২}$ শতাংশ ক্রমপুঞ্জিত লভ্যাংশ সহ) বাজার ছেড়ে প্রভূত পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করে ১৯১৭ থেকে ১৯২২ সালের অন্তবর্তী বছরগুলিতে, যার ফলে শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১৯১৬-১৭-র আর্থিক বছরের শেষ দিকে ২৩,১৭৫,০০০ টাকা থেকে বেড়ে ১৯২২-২৩-এর অন্তিমে দাঁড়ায় ১০৩,২২৮,০০০ টাকা।[৯৯] বাজারে ডিবেঞ্চারও (৭ শতাংশ সুদে) ছাড়া হয়েছিল ১৯১৭,১৯১৮ এবং ১৯১৯ সালে (এভাবে সংগৃহীত মোট অর্থের পরিমাণ ছিল ৯,৯০০,০০০ টাকা)। কোম্পানিটি আবার ডিবেঞ্চার ঋণ (ন্যূনমূল্যে) সংগ্রহ করে ১৯২২-এ ৩১ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯২৩-এ ১.৫ মিলিয়ন টাকা, ১৯২২-এর ডিবেঞ্চার ঋণকে ব্যবহার করা হয় ঐ ধরনের পুরনো ঋণ—যার পরিমাণ ছিল ২০ মিলিয়ন টাকা পবিশোধ করার জন্যে।[১০০] যেহেতু টাটার শেয়ার ১৯১৭ থেকে ১৯২২ সালের মধ্যের বছরগুলিতে খুব উঁচু প্রিমিয়ামে বিক্রি হয়, কোম্পানিটি তার প্রয়োজনীয় মূলধন অল্প ব্যয়ে সংগ্রহ করতে পারত।[১০১] যখন সাধারণ শেয়ারের লভ্যাংশ (ডিভিডেন্ড) যথেষ্ট কম ছিল, ডেফার্ড শেয়ারের লভ্যাংশ (২৩৩ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছিল) অনেক সময় খুব বেশি হতো, যেহেতু চূড়ান্ত রকমের অনুকূল শর্তে উদ্বৃত্ত মুনাফার ভাগ বরাদ্দ করা হতো ঐ শেয়ারের ক্ষেত্রে। উঁচু হারে মুনাফা বণ্টনের পেছনে যুক্তি ছিল এ'রকম : ডেফার্ড শেয়ার তাকেই বরাদ্দ করা হতো যে দশটি সাধারণ শেয়ার ইতিমধ্যে কিনে ফেলেছে। অতএব এক্ষেত্রে বেশি বারে ডিভিডেন্ড দেওয়া বিষয়টিকে বিধিবর্হিভূত পক্ষপাতিত্ব বলা যাবে না। কোম্পানিটি শেয়ারের এই নতুন প্রচলন থেকে প্রভূত পরিমাণ প্রিমিয়াম লাভ করে।[১০২]

অধিকন্তু, TISCO অত্যন্ত সর্তকভাবে অবচয়ের নীতি অনুসরণ করেছিল। ১৯২১-২ পর্যন্ত আয়কর বিভাগের হিসাবমতো অবচয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৬ মিলিয়ন টাকা, কোম্পানিটি তার থেকে বেশি অর্থ তার জমা খরচের হিসাব থেকে বাদ দিতে পেরেছিল এবং এভাবে মূলধন প্রতিস্থাপন এবং কারখানা সম্প্রসারণের উপযুক্ত অর্থিক ভাণ্ডার সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল।[১০৩]

৯.৮ ইস্পাত শিল্পের কাঠামো এবং সরকারি নীতির প্রভাব

ভারত সরকারের সতর্কতাপূর্ণ নীতি TISCO-র কর্মদক্ষতার উপর সম্ভবত অনুকূল প্রভাব বিস্তার করেছিল, কিন্তু তার সাথে সাথে আবার ইস্পাত এবং তার আনুষঙ্গিক শিল্পের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেছিল। এ কথা বলা সঠিক নয়, সরকার TISCO-র অস্তিত্বকে শুধুমাত্র নিশ্চিত করতে চেয়েছিল এবং আনুষঙ্গিক শিল্পের দিকে নজর দেয়নি। কিছু আনুষঙ্গিক শিল্পের তদানীন্তন উদ্যোগগুলির ক্ষেত্রে সরকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিয়েছিল, কিন্তু প্রস্তাবিত কোনো নতুন শিল্প বা ফার্মের সংরক্ষণের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে।

ঢালাই না-করা লোহাপিণ্ড ও ইস্পাত উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ১৯১৮ সালে ভারতীয় লোহা ও ইস্পাত কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, যদিও তখন স্থির করা হয়েছিল যে ইস্পাত উৎপাদন শুরু হবে পরে। আশা করা হয়েছিল, ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড ওয়াগন কোম্পানির প্রয়োজনীয় ইস্পাতের সমস্ত যোগান IISCO থেকে সরবরাহ করা হবে, কারণ তার অদূরেই স্থাপন করা হয়েছিল কোম্পানিটির বিপণন কেন্দ্র।[১০৪] একইভাবে কলকাতার বার্ড অ্যান্ড কোম্পানি এবং শেফিল্ড ও লন্ডনের ক্যামেল লেয়ার্ড অ্যান্ড কোং লিমিটেড উভয়ের সমন্বয়ে ১৯২১-এ গঠিত হলো দি ইউনাইটেড স্টিল করপোরেশন অব্ এশিয়া লিমিটেড। ঢালাই না-করা লোহা পিণ্ড, ফেরোম্যাঙ্গানিজ, কোক এবং অন্যান্য উপজাত দ্রব্য ছাড়াও ঢালাই ইস্পাতের বাৎসরিক উৎপাদন এই কোম্পানির পরিকল্পনা অনুসারে ৪৫০,০০০ টন হওয়ার কথা[১০৫] (সুতরাং এই কোম্পানির পরিকল্পিত উৎপাদনের পরিমাণ ১৯২১-২-এ TISCO উৎপাদিত ইস্পাত পিণ্ডের পরিমাণের দ্বিগুণেরও বেশি)। উভয় কোম্পানিই অবশ্য ইস্পাত শিল্পের মন্দাভাব দেখে তাদের পরিকল্পনায় ভীত হয়ে পড়ে এবং উভয়েই সংরক্ষণের প্রয়োজন বোধ করে, যদিও ইউনাইটেড স্টিল করপোরেশন এব্ এশিয়ার কাজের পরিকল্পনা বৃহৎ আকারের ছিল এবং তাতে সর্বাধুনিক উৎকৃষ্ট প্রযুক্তির ব্যবস্থা ছিল।[১০৬]

ভারতবর্ষ থেকে উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন আকর্ষণের জন্যে, স্থির হলো, বিনিয়োগকারীকে ১০ থেকে ১২ শতাংশ মুনাফা দিতে হবে।[১০৭] ১৯২৪ থেকে ইস্পাত শিল্প মাত্র তিন বছর মেয়াদী সংরক্ষণের সুযোগ পেয়েছিল, ভবিষ্যতের জন্যে সংরক্ষণের কোনো প্রতিশ্রুতি ছিল না, এমন কি তার প্রয়োজন হলেও। উপরন্তু ভারতীয় ট্যারিফ বোর্ড TISCO-কে তার বিনিয়োজিত মূলধনের উপর শুধুমাত্র ৮ শতাংশ হারে মুনাফার প্রতিশ্রুতি দেয়, এই অনুমানের ভিত্তিতে যে কোম্পানিটি দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন ব্যয়ের হ্রাস ঘটাতে পারবে। সুতরাং ইস্পাত শিল্পে প্রবেশার্থী কোনো নতুন কোম্পানির প্রাথমিক অসুবিধার ক্ষেত্রে বিশেষ সাহায্যের ব্যবস্থা করা হলো না, যথেষ্ট দীর্ঘ সময়ের জন্যে সংরক্ষণ প্রতিশ্রুত হলো না। ১৯২৬-এ IISCO এবং বার্ড অ্যান্ড কোম্পানি উভয়ই ইউনাইটেড স্টিল করপোরেশন অব্ এশিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে দাবি করে যে, সংরক্ষণের সুযোগ যেন স্থায়ী হয় দশ বছর পর্যন্ত। সংভার (stocks) এবং শেয়ারে বিনিয়োগের জন্যে যদিও আর্থিক সঞ্চয় যথেষ্ট পরিমাণে ছিল (সরকারি ঋণপত্রের মূল্যবৃদ্ধি সেদিকে নির্দেশ করে)। কিন্তু লোহা ও ইস্পাত শিল্পে যুক্তিসম্মত আর্থিক সাফল্যের সম্ভাবনা দেখা না যাওয়া পর্যন্ত বিনিয়োগকারীদের তাতে টাকা ঢালার কথা নয়।[১০৮]

সারণি ৯.৮ ভারতে ব্যবহৃত ইস্পাত, ১৯২৩-৪ থেকে ১৯৩২-৩৩

বছর	মোট ব্যবহৃত ইস্পাত ('০০০ টন)	
১৯২৩-৪	৮৩৯.৬	১৭.৬
১৯২৪-৫	৮৩৯.৪	২৮.৫
১৯২৫-৬	১০৩৮.০	৩১.৩
১৯২৬-৭	১০০৪.৬	৩৭.৩
১৯২৭ ৮	১৪০২.৬	৩০.১
১৯২৮-৯	১১৪৫.৯	২৩.৭
১৯২৯-৩০	১০৭৮.৭	৩৫ ৪
১৯৩০-১	৮১১.৪	৫১.২
১৯৩১-২	৬২৭.২	৬৫.৪
১৯৩২-৩	৫৭৪.১	৭২.৩

উৎস : ITB : Statutory enquiry 1933 : steel, খণ্ড ১, Written Evidence given by the Tata Iron and Steel Company Limited (দিল্লী, ১৯৩৪), পৃ. ৫৭-৮।

আশা করা হয়েছিল প্রাক-যুদ্ধকালীন হারে ভারতে ইস্পাত ব্যবহাব বৃদ্ধি পাবে, এই আশা পূরণ হয়নি (সারণি ৯.৪ এবং ৯.৮ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু বার্ড অ্যান্ড কোম্পানির প্রতিনিধিরা তবুও মনে করতেন যে, ভারতে আর একটি ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠার সুযোগ আছে, শুধু যদি সরকার বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত থেকে তাকে রক্ষা করে।[১০৯] সরকার অবশ্য দশ বছরের জন্যে শুল্ক-সংরক্ষণে রাজি হয় নি। তদুপরি এল মন্দা এবং ইস্পাত ব্যবহারের পরিমাণে দ্রুত হ্রাস। তার ফলে নতুন কোনো উদ্যোগের কথা ঐকান্তিক ভাবে চিন্তা করা যায় নি অন্তত ১৯৩৭ পর্যন্ত, উন্নতির কাল শুরু হওয়া অবধি। তখন স্টিল করপোরেশন অব বেঙ্গল কাজ শুরু করল তাঁদেরই পরিচালনায় যাঁরা IISCO-কে নিয়ন্ত্রণ করতেন।

ঢালাই না করা লোহা-পিণ্ড শিল্পের ভবিষ্যৎ জড়িত ছিল ইস্পাত এবং ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের অবস্থার সঙ্গে। ১৯৩৯ পর্যন্ত একমাত্র টাটা ইস্পাত কারখানাতেই ঢালাই না-করা লোহা-পিণ্ড এবং ইস্পাত উৎপাদন একসঙ্গে হতো। লোহা পিণ্ড উৎপাদনের সবথেকে পুরনো কোম্পানি ছিল বেঙ্গল আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি (পরবর্তী কালের নাম বেঙ্গল আয়রন কোম্পানি) যা তৈরির মূলে ছিল বরাকর আয়রন ওয়ার্কসের সম্পত্তির অধিগ্রহণ।[১১১] কোম্পানিটি লোহা-পিণ্ড উৎপাদন, বিক্রয় এবং নিজেদের ঢালাই-কারখানায় নানান ধরনের ঢালাই লোহা-দ্রব্য উৎপাদনের কাজে তা ব্যবহার করতে থাকে এবং শুরু থেকেই লাভজনক সংস্থায় পরিণত হয়। কিন্তু ১৯২০ সাল নাগাদ এর চারটি মারুত চুল্লীই যথেষ্ট পুরনো এবং উৎপাদন ক্ষমতার দিক থেকে কিছুমাত্রায় ছোট ছিল (তিনটি চুল্লীর উৎপাদন-ক্ষমতা দিনে প্রায়৯০ টন এবং আরেকটির তার থেকে সামান্য বেশি ছিল)।[১১২]

১৯২০-তে একটি নতুন ইংলিশ মারুত চুল্লী সংযোজিত হলো যার উৎপাদন-ক্ষমতা দিনে ১৫০ থেকে ২৫০ টন।[১১৩] অর্থাৎ এই নতুন মারুত-চুল্লীটিও দৈনিক ৩৫০ থেকে ৪০০ টন উৎপাদনক্ষম TISCO এবং IISCO-র নতুন চুল্লীগুলির তুলনায় অনেক কম ক্ষমতা-সম্পন্ন ছিল।

১৯২৩-এ বেঙ্গল আয়রন কোম্পানি ভারতীয় ট্যারিফ বোর্ডের কাছে তার সাক্ষ্যে অনুযোগ করে যে, TISCO লোহা-পিণ্ডের দাম কমিয়ে দিয়েছে, বিশেষত বিদেশী বাজারে। এই কোম্পানি পরবর্তীকালে অভিযোগ করতে থাকে যে, 'ইস্পাতের উপর সংরক্ষণমূলক শুল্ক এবং অনুদান টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানিকে সমর্থ করেছে খুব সস্তায় লোহা-পিণ্ড বিক্রি করতে এবং যে দামে তারা এখন ঐ দ্রব্য দিতে চাইছে তা উৎপাদন-ব্যয়ের থেকে কম।'[১১৪] যাই হোক, ইন্ডিয়ান ট্যারিফ বোর্ড অনুসন্ধান করে জানতে পারে TISCO কখনো স্বাভাবিক দামের চেয়ে কম দামে বিক্রি করেনি। দাম কমেছিল প্রধানত এমন সব কারণে যেগুলি TISCO-র নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল।

প্রথমত, ভাবতবর্ষে বিক্রয়-যোগ্য লোহা-পিণ্ডর উৎপাদন-ক্ষমতা দ্বিগুণ বেড়েছিল যখন IISCO বছরে ৩০০.০০০ টনের বেশি উৎপাদনে সক্ষম মারুত চুল্লী স্থাপন করল (বেঙ্গল আয়রন কোম্পানির উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১৫০,০০০ থেকে ২০০,০০০ টন পর্যন্ত এবং ১৯১২-১৩ থেকে ১৯২২-২৩ অবধি লোহা-পিণ্ডের গড় ব্যৎসরিক বিক্রয় ছিল ৭৫,০০০ টন)। এই লোহা-পিণ্ডের মূল বাজার ছিল স্বদেশে, জাপানে ও যুক্তারাষ্ট্রেও। জাপানের এবং ঐ দেশের নিয়ন্ত্রণাধীন দক্ষিণ মানচুরিয়া এবং চীনের ফার্মগুলোর ক্ষমতা তখন বেড়েছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজাবে লোহা-পিণ্ডের দাম সে সময়ে কমেছে। মার্কিনী দামের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী যেহেতু সে দেশটি তখন ডাম্পিং করছে সন্দেহ হলেই ফার্মগুলির ঘাড়ে নিয়ন্ত্রণমূলক বাণিজ্য শুল্কের বোঝা চাপিয়ে দিত। ভারতে ঐ লোহা-পিণ্ডের ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ১৫০,০০০ টন এবং তাও আবার ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের ব্যাপক মন্দার দ্বারা প্রভাবিত হয়। ১৯২০ থেকে ১৯২৫-এর মধ্যে লোহা-পিণ্ডের দাম ৫০ শতাংশেরও বেশি কমে, টন প্রতি (কম-বেশি) ৮৫ টাকা থেকে কমে দাঁড়ায় টন প্রতি কম-বেশি ৪০ টাকা। অতএব বেঙ্গল আয়রন কোম্পানি বেশ বেকায়দায় পড়ে এবং তাকে লোহা-পিণ্ড উৎপাদন বন্ধ করতে হয়;—প্রথমে আংশিকভাবে, পরে সম্পূর্ণভাবে, যদিও ভারতীয় ট্যারিফ বোর্ডের মতে নতুন মারুত চুল্লী থেকে লোহা-পিণ্ডর উৎপাদন করতে সর্বসাকুল্যে যে ব্যয় হতো তা তখনও বিক্রয়-দামের তুলনায় কম ছিল। এমনকি পুরনো চুল্লী থেকে উৎপাদনের ব্যয়ও মুনাফা লভ্যতার সীমার ভেতরেই ছিল।

১৯২৫-এর পরে লোহা-পিণ্ডের প্রধান দু'টি উৎপাদক ছিল TISCO এবং IISCO, এদের সঙ্গে কনিষ্ঠ উৎপাদক হিসাবে উল্লেখ করা যায় মাইসোর আয়রন অ্যান্ড স্টিল ওয়ার্কসকে, যার কারখানাটির অবস্থান ছিল ভদ্রাবতীতে। শেষোক্ত কারখানাটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল; বাবাবুদান পাহাড়ের আকরিক লোহার সম্ভারটির (যেখানে আকরের ভেতরে গড়ে ৬০ শতাংশ লোহা ছিল) এবং মহীশূরের উত্তরে অবস্থিত বিশাল বনজ সম্পদের ব্যবহার (এই অঞ্চলের কাছেই পাওয়া গেল চুনাপাথর)। এটি ছিল ভারতের যে কোনো অঞ্চলের সরকার পরিচালিত প্রথম বড় আয়তনের শিল্পোদ্যোগগুলির অন্যতম। উদ্যোগটির

উপদেষ্টা ছিলেন TISCO-র মুখ্য ইঞ্জিনীয়ার এবং টেকনিক্যাল উপদেষ্টা সি পি পেরিন। কারখানাটি পরিকল্পিত হয়েছিল বছরে ২৮,০০০ টন লোহা উৎপাদনেব জন্যে (১৯২৩-এর জানুয়ারিতে উৎপাদন শুরু হয়)। এর সঙ্গে একটি কাঠ পাতন কারখানা স্থাপন করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, কাঠকে মারুত চুল্লীর ব্যবহার্য কাঠকয়লায় রূপান্তরেব প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট উড টার (wood tar), মিথাইল অ্যালকোহল এবং ক্যালসিয়াম অ্যাসিটেট্ জাতীয় মূল্যবান উপজাত দ্রব্যগুলির পুনরুদ্ধার।[১২৬] কাঠকয়লা চালিত এই কারখানার মারুতচুল্লীটি ছিল সম্ভবত ঐ ধরনেব শেষতম চুল্লীগুলির একটি।

যে-সমস্ত কারণ উপরোক্ত উৎপাদন প্রকল্পটিকে অত্যন্ত ব্যয়-বহুল করে তুলেছিল ঠিক সেগুলিই TISCO-র বৃহত্তব সম্প্রসারণের সময়ে কাজ করেছিল। উপরন্তু, প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে কাঠ পাতনের মাধ্যমে রাসায়নিক পদার্থগুলির উৎপাদন যখন অর্থনৈতিক নয় ঠিক সেই সময়ে যখন ঐ যন্ত্রপাতি বসানো হলো উৎপাদনের জন্যে। সবশেষে উল্লেখ্য, লোহা-পিণ্ডের দামের পতন তা সত্বেও মহীশূর সরকার কর্তৃক এই মর্মে গ্রহণ যে, কারখানাটিতে উৎপাদনের কাজ চালু থাকবে এবং ঐ লোহা-পিণ্ড ব্যবহারের উপায় খোঁজা হবে। প্রথমে, ১৯২৬-এ ঢালাই লোহার পাইপ তৈরির কারখানা স্থাপিত হয়। তারপরে, ১৯৩৪-এ বছরে ৩০,০০০ টন ইস্পাত উৎপাদনে সক্ষম দুটি চুল্লী স্থাপিত হয় লোহা-পিণ্ড ব্যবহারের উপায় হিসাবে (পাইপ এবং ইস্পাত কারখানাগুলির নকশা তৈরি করেছিল জার্মান ফার্ম)।[১১৭]

ইতিমধ্যে লোহা-পিণ্ডের প্রধান দুটি উৎপাদক IISCO এবং TISCO এবং বেঙ্গল আয়রন কোম্পানি, মনে করল আভ্যন্তরীণ দাম সম্পর্কে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া লাভজনক হবে। কিন্তু বিদেশের বাজারে বিক্রয়ের দাম আভ্যন্তরীণ দামের তুলনায় প্রায়শই কম থাকত।[১১৮] প্রথম দিকে কোম্পানিগুলি মিলিতভাবে লোহা-পিণ্ডের যে দাম ধার্য করত, বিশেষ করে ছোটখাটো ক্রেতাদের ক্ষেত্রে, তা রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে আরোপিত দশ শতাংশ মূল্যানুগ (ad valorem) শুল্ক সমেত আমদানি-দামের সমান ছিল। কিন্তু খবরের কাগজে সমালোচনার ফলে এবং মাইসোর আয়রন অ্যান্ড স্টিল ওয়ার্কসের সঙ্গে প্রতিযোগিতার চাপে তারা দাম কমিযে দেয়।[১১৯] লোহা-পিণ্ডের ক্রেতাদের অভিযোগে ভারত সরকার সাড়া দিল এবং ঐ লোহা-পিণ্ডের ক্ষেত্রে রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে ধার্য শুল্ক বহাল থাকবে, না তুলে দেওয়া হবে—এই প্রশ্নটি খতিয়ে দেখার জন্যে একটি ট্যারিফ বোর্ড নিযুক্ত করল। ট্যারিফ বোর্ডের মতে লোহা-পিণ্ডের ক্ষেত্রে শুল্ক তুলে দিলে বড় ক্রেতারা সম্ভবত প্রভাবিত হবে না যেহেতু তারা প্রতিষ্ঠিত এবং দীর্ঘকালীন চুক্তিগুলির বলে সুরক্ষিত। বাজারে বিক্রির দাম (যার পরিমাণ ৪০,০০০টন যখন লোহা-পিণ্ডের মোট ভারতীয় ক্রয়ের পরিমাণ ১৫০,০০০ টন) প্রায় ৫ টাকা পরিমাণ কমতে পারত। কিন্তু তার ফলে উদ্বৃত্ত লোহা-পিণ্ড থেকে মুনাফা হ্রাসের পরিমাণ দাঁড়াত ১০০,০০০ টাকা। যেহেতু ১৯২৬-এ গঠিত ট্যারিফ বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী ইস্পাত-শিল্প সংরক্ষণ পরিকল্পনায় এ ধরনের মুনাফা বিবেচনা করা হয়েছিল, তার কোনো হ্রাস ঘটালে শুল্ক-সংরক্ষণের সমগ্র পরিকল্পনাটিই বানচাল হয়ে যেত। বোর্ড আরো লক্ষ্য করে যে, লোহার পিণ্ডের ক্ষেত্রে শুল্ক হ্রাস পেলে যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারীদের লাভের পরিমাণ সামান্যই হবে। এ সব যুক্তির ভিত্তিতে ট্যারিফ বোর্ড

লোহার-পিণ্ডর উপর রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে আরোপিত শুল্ক তুলে নেওয়ার আবেদনটি নাকচ করে। বোর্ড আশা করেছিল, এই পদ্ধতিতে মহীশূর আয়রন অ্যান্ড স্টিল ওয়ার্কসের অস্তিত্ব অটুট থাকবে।[১২২] বোর্ডের বিবেচনায় আভ্যন্তরীণ বাজারে লোহা-পিণ্ড উৎপাদনকারী তিনটি কোম্পানির পক্ষে একচেটিয়ামূলক শোষণ অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়, তার কারণ, আভ্যন্তরীণ বাজারের দাম-সমূহ রপ্তানি-দামগুলির তুলনায় অনুকূল ছিল এবং একার্থ-সঙঘটির পক্ষে আকর্ষণীয় দাম ধার্য করে দেশীয় বাজারের বিস্তার ঘটানো লাভজনক ছিল।[১২৩]

পিণ্ডাকার লোহা উৎপাদকদের একার্থসঙঘটি বিজয়ওয়াড়ার দক্ষিণে অবস্থিত মাদ্রাজ এবং হায়দ্রাবাদ রাজ্য মাইসোর আয়রন ওয়ার্কসকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে খর্ব না করার বিষয়ে সম্মত হয়। তার ফলে যে, কোম্পানিটির সমস্যা মিটেছিল, তা নয়। পণ্যটির ঐ অঞ্চলে (সিংহল এবং রেলওয়েজ বাদ দিয়ে) মোট ভোগের পরিমাণ ২,৫০০ টনের বেশি ছিল না, যখন কোম্পানিটিকে ১২,০০ থেকে ১৫,০০০ টন পরিমাণ উদ্বৃত্তের পণ্যের বাজার খুঁজে বের করতে হতো।[১২৪] মাইসোর আয়রন ওয়াকর্সের সমস্যা থেকে সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে দেশের ভেতরে পিণ্ডাকার লোহার উন্নত বাজারের অভাব, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে। অপর দিকে তা প্রতিফলিত করে বাংলার বাইরে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের সামান্য উন্নয়ন। পিণ্ডাকার লোহার সব থেকে বড় ভারতীয় ক্রেতারা ছিল ইস্ট ইন্ডিয়ান এবং নর্থ-ওয়েস্টার্ন রেলওয়েজ এবং মাইসোর আয়রন ওয়ার্কসের নিকটবর্তী একমাত্র বড় ক্রেতা ছিল গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনসুলা বেলওয়ে।[১২৫] লোহা-পিণ্ড উৎপাদকদের একার্থসঙঘটি অতি সহজেই এই বাজারকে নিজের আওতায় রাখছিল।

মন্দার কাল আরম্ভ হলো ১৯২৯-এর শেষ দিক থেকে, এর ফলে সমস্ত ভারতীয় কোম্পানির দেশীয় ও রপ্তানির বাজার সঙ্কুচিত হলো। মাইসোর আয়রন ওয়ার্কস যোগ দিল পূর্ব ভারতের পিণ্ডাকার লোহার উৎপাদকদের একার্থসঙঘটির সঙ্গে। ভারতীয়দের এই লোহা-পিণ্ড বিক্রি কার্যকর হলো একটি চুক্তির মাধ্যমে : বোম্বাই প্রেসিডেন্সি (সিন্ধু বাদে) হায়দ্রাবাদ রাজ্য, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি (বিজওয়াড়া পর্যন্ত) এবং ভারতীয় রাজ্যগুলিতে ঐ লোহার সমগ্র বিক্রয়, যার সর্বোচ্চ পরিমাণ ছিল বছরে ৭,০০০ টন, চালিত হলো মাইসোর আয়রন ওয়ার্কসের উদ্দেশ্যে। ভারতের অন্যান্য অংশের এবং দক্ষিণাঞ্চলের ৭,০০০ টনের উপর সমস্ত বিক্রি পূর্ব ভারতের উৎপাদকদের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট হলো। প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা চালু রাখা হলো পার্থক্যমূলক পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণের (differential quota) মাধ্যমে, পার্থক্যের পরিমাণ ছিল টন প্রতি ৪ টাকা ক্রেতার নিকটতম রেল-স্টেশনে পৌঁছে দেওয়া মালের জন্যে। মাইসোরের কারখানার জন্যে বিক্রির যে অংশ নির্দিষ্ট থাকত না তা সমভাবে বণ্টিত হতো একদিকে TISCO এবং অপরদিকে IISCO ও বেঙ্গল আয়রন কোম্পানির মধ্যে। শেষোক্ত কোম্পানিটি ১৯৩১-এর নভেম্বর থেকে পিণ্ডাকার লোহা উৎপাদন বন্ধ করে দেয় এই বোঝাপড়ার ভিত্তিতে যে IISCO (যার উৎপাদিত পিণ্ডাকার লোহার সব থেকে বড় খরিদ্দার বেঙ্গল আয়রন কোম্পানি এবং যে কোম্পানিতে আর্থিক ব্যাপারে তার স্বার্থ জড়িয়ে ছিল) উৎপাদন-ব্যয় দামে পিণ্ডাকার লোহার সমস্ত প্রয়োজন মেটাবে। তারপর, TISCO উত্তর ভারতের বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সমানভাবে অংশ নেয় সাধারণত একই বিজ্ঞাপিত দাম মেনে। ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্মগুলিতে বিক্রয়ের দায়িত্ব পায় IISCO এবং

ছোট ঢালাইয়ের কারখানাগুলিতে TISCO (এই কোম্পানিটি সাধারণত বিক্রয় করে ঢালাই করা লোহার তুলনায় কম সিলিকন আছে এমন মৌলিক লোহা)। দক্ষিণ ভারতে মাইসোর আয়রন ওয়ার্কর্স কর্তৃক বছরে প্রায় ৬,০০০ টন বিক্রয় নিশ্চিত ছিল। কোম্পানিটি বেঙ্গল আয়রন কোম্পানির সঙ্গে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং এই চুক্তির ফলে তার বছরে প্রায় ৮,০০০ টন পাইপ বিক্রয়ের বাজার মেলে (বেঙ্গল আয়রন কোম্পানির ঢালাই লোহার উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৬০,০০০ টন এবং পাইপ ঢালাই কারখানার সম্প্রসারণের পরে মাইসোর আয়রন ওয়ার্কসের উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছিল ১৫,০০০ টনে)।[১২৬]

পিণ্ডাকার লোহা উৎপাদনের একার্থসঙ্ঘটি রপ্তানির ক্ষেত্রে কতকগুলি স্পষ্টভাষিত চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। রপ্তানি-ব্যবসা প্রায় সম্পূর্ণভাবে এবং TISCO এবং IISCO-র কব্জায় ছিল। প্রথমোক্ত কোম্পানিটি দ্বিতীয়টির তুলনায় যুক্তরাজ্যেকে বেশি পরিমাণে রপ্তানি করত, পক্ষান্তরে TISCO-র তুলনায় IISCO বেশি রপ্তানি করত জাপানে। ওটাওয়া চুক্তি অনুসারে যুক্তরাজ্যে TISCO-র পিণ্ডাকার লোহার ন্যূনতম রপ্তানির পরিমাণ বাঁধা ছিল বছরে ৭০,০০০ টনে যখন IISCO অনুমতি পেয়েছিল বছরে প্রায় ৩০,০০০ টন রপ্তানির।

একার্থসঙ্ঘটি ভিন্ন ভিন্ন আভ্যন্তরীণ এবং বহির্দেশীয় দাম ধার্য করত, কিন্তু ইণ্ডিয়ান ট্যারিফ বোর্ড এই প্রথাটিকে স্বাভাবিক মনে করেনি। পিণ্ডাকার লোহার আভ্যন্তরীণ দাম আমদানিজাত সামগ্রীটির দামের তুলনায় অনেক কম ছিল। কিন্তু ঢালাই লোহার ছোট কাবখানাগুলির ক্ষেত্রে ধার্য আভ্যন্তরীণ দাম এবং জাপানে রপ্তানির দামের মধ্যে পার্থক্য তখনও এত ব্যাপক ছিল যে, জাপানের পক্ষে ভারতীয় পিণ্ডাকাব লোহার ব্যবহার সম্ভবপব হয়েছিল। এদেশের ঢালাই লোহার উৎপাদকদেরও জাপান দাবিয়ে রাখতে পেরেছিল। ট্যারিফ বোর্ড এই কারণে ইঙ্গিত দেয়, 'এমন ব্যবস্থা থাকা উচিত যার ফলে ঢালাই লোহার যোগান-দাম এবং সহযোগী কোম্পানিগুলির (ঢালাই লোহার পাইপ, স্লিপার ইত্যাদির উৎপাদনকারী) ক্ষেত্রে ধার্য দামের মধ্যে পার্থক্য থাকবে না এবং ঐ দাম রপ্তানি দামসমূহের তুলনায় টন প্রতি ১০ টাকার অতিরিক্ত হবে না'।[১২৭]

এই সময়ে অবলম্বিত উপায়গুলির বেশির ভাগই ছিল আভ্যন্তরীণ মন্দা এবং বর্হিবাণিজ্যের পরিস্থিতির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক প্রতিক্রিয়াবিশেষ : আন্তর্জাতিক চাহিদা অপেক্ষাকৃত বেশি দাম-স্থিতিস্থাপক ছিল, এদিক থেকে বিবেচনা করলে দাম পৃথকীকরণকে ন্যায্য বলে মানতে হয়। কিন্তু ভারতীয় লোহা-পিণ্ডের সব থেকে বড় খরিদ্দার জাপান ঐ দ্রব্যের উপর আমদানি-শুল্ক চাপিয়ে দেয়, তার ফলে ভারতীয় উৎপাদকদের অসুবিধা বাড়তে থাকে। বেঙ্গল আয়রন কোম্পানি বাধ্য হয় পিণ্ডাকার উৎপাদন বন্ধ করতে এবং ঢালাই লোহা থেকে তৈরি পণ্যের উৎপাদনে নিয়োজিত হতে। মাইসোর আয়রন ওয়ার্কস উৎপাদনে বৈচিত্র্যসাধনের চেষ্টা করে—প্রথমে ঢালাই পাইপ এবং পরে ইস্পাত উৎপাদনের মধ্যে দিয়ে। তা সত্ত্বেও সীমিত উৎপাদন-ক্ষমতা সম্পন্ন মাইসোর আয়রন ওয়ার্কসের অবস্থাকে দৃশ্যত জটিল করে তোলে এমন সময় যখন মোট চাহিদা এবং দামের বিপর্যয়কর পতন ঘটছে। তখন বৃহত্তর উৎপাদন-ক্ষমতা থেকে দায়ের আশঙ্কা পাওনার প্রত্যাশাকে অতিক্রম করে যায়, অন্তত IISCO-র অবস্থা স্পষ্টভাবে এরকম পরিস্থিতির-ই ইঙ্গিত দেয়। শুধুমাত্র TISCO এই প্রতিকূল সময়কে আয়ত্তে আনে, তার কারণ, কোম্পানিটির ধাক্কা

সামলানোর নির্ভবযোগ্য উপায় ছিল সংরক্ষিত ইস্পাতেব বাজাব থাকায়। মাইসোর আয়রন ওযার্কস টিকে ছিল সবকাবের সেখানে অর্থ লগ্নী কবার ইচ্ছেব ফলে। সবকারেব এই বিনিযোগ ছিল আত্মবক্ষামূলক, বিশেয করে যখন কাঠকয়লা এবং কাঠপাতনজাত দ্রব্যেব সুবিধাসমূহ প্রযুক্তিব পরিবর্তনে এবং মন্দাব আঘাতে নিশ্চিহ্ন হযে যায়।[১২৮]

৯.৯ সংরক্ষণমূলক বাণিজ্যশুল্ক হ্রাস এবং স্টিল করপোরেশন অব্ বেঙ্গলের প্রতিষ্ঠা

১৯৩৪ সালে ভাবতীয় ট্যাবিফ বোর্ড সব বকম ইস্পাতজাত দ্রব্যেব ক্ষেত্রে সংবক্ষণমূলক শুল্ক হ্রাসেব সুপাবিশ করে। বেশিব ভাগ দ্রব্যের ক্ষেত্রে সাধাবণ বাজস্ব-শুল্কই যথেষ্ট বিবেচনা কবা হতো। বেল, ফিসপ্লেট্স্, সেনিস এবং স্লিপারসেব সব দেশ থেকে আমদানিব ক্ষেত্রে এবং যুক্তবাজ্য থেকে গঠন সংক্রান্ত পরীক্ষিত সবঞ্জাম ও প্লেট্স্ আমদানিব ক্ষেত্রে সংরক্ষণমূলক শুল্ক সম্পূর্ণভাবে তুলে দেওযা হয। যুক্তবাজ্য ও ইয়োবোপীয় দেশগুলি থেকে ধাতব দণ্ড, কালো ধাতব চাদব ও তড়িৎলেপিত ধাতব চাদব আমদানিব ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ থেকে ৩৯ শতাংশ পর্যন্ত পার্থক্যমূলক সংরক্ষণ শুল্ক সুপারিশ করা হলো।[১২৯] শুধুমাত্র ইয়োবোপ থেকে গঠন-সরঞ্জাম আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক-বৃদ্ধির সুপারিশ (৪৩ শতাংশ মূল্যানুগ শুল্কের হার পর্যন্ত) হয। ট্যারিফ বোর্ডের ধারণা ছিল, যেহেতু ভারতীয় ইস্পাত উৎপাদকরা অত্যন্ত অল্প ব্যযে লোহা-পিণ্ড উৎপাদনের বিপুল সুবিধা লাভ করে, তাবা শুধুমাত্র ব্রিটিশদের সঙ্গেই নয় অন্যান্য ইয়োবোপীয় উৎপাদকদেব বিরুদ্ধেও প্রতিযোগিতা চালিযে নিজেদের বাজার ধরে রাখতে পারবে, যদি ঐ দেশগুলি 'অর্থনৈতিক' দাম অর্থাৎ পূর্ণ ব্যয়ভিত্তিক দাম ধার্য করে।

ভারত সরকার ট্যারিফ বোর্ডের এই সুপারিশ মেনে নেয়, কিন্তু বাণিজ্য-শুল্ক হ্রাসের দরুন সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণ করার উদ্দেশ্যে ইস্পাত পিণ্ডের ক্ষেত্রে টন প্রতি ৪ টাকা হারে আবগারী শুল্ক ধার্য করতে সবকার তৎপর হয়ে ওঠে। অতএব ইস্পাত শিল্পকে ট্যারিফ বোর্ড যে হারে শুল্ক সংরক্ষণের সুযোগ দিতে ইচ্ছুক ছিল, সরকার তার সঙ্গে যোগ করে অতিরিক্ত কিছু শুল্ক যার পরিমাণ ছিল আবগারী শুল্কের থেকে ১½ অথবা ১⅓ গুণ বেশি। এ ধরনের শুল্ক-সংরক্ষণ ব্যবস্থার মেয়াদ সম্প্রসারিত হয়েছিল সাত বছর, ১৯৩৪ থেকে আরম্ভ করে। লোহা ও ইস্পাত থেকে প্রস্তুত করা সামগ্রীর ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১০ শতাংশ রাজস্ব শুল্ক ধার্য করা হয়েছিল। যুক্তরাজ্য থেকে ইস্পাত আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক থেকে অন্যূন ১০ শতাংশ পক্ষপাতমূলকভাবে অতিরিক্ত ছাড়ের অনুমতি দেওয়া হলো এবং এই ব্যবস্থা কার্যকর করার উপায় হিসাবে যুক্তরাজ্য ছাড়া অন্য যে কোনো দেশ থেকে ইস্পাত দ্রব্যের আমদানির ওপর ১০ শতাংশ রাজস্ব শুল্ক আরোপ করা হলো ঠিক সেই সময়ে যখন ঐ দ্রব্যগুলির ক্ষেত্রে সংরক্ষণমূলক শুল্কের শর্ত পালনের দায় ছিল না।[১৩০]

সারণি ৯.৯ ভারতে বিক্রয়যোগ্য ইস্পাতের ব্যবহার—১৯৩১-২ থেকে ১৯৩৮-৯ (সংখ্যাগুলি '০০০ টনে প্রকাশিত)

সময়কাল	উৎপাদন		আমদানি	রপ্তানি এবং পুনর্বার রপ্তানি (re-exports)	
	TISCO	MISW			
১৯৩১-২	৪৫৬	-	৩৬৯	১৫	৮১০
১৯৩২-৩	৪৩১	-	৩২৪	৩০	৭২৫
১৯৩৩-৪	৫৩৫	-	৩২৩	৪৭	৮১১
১৯৩৪-৫	৬১০	-	৩৬৭	১	৯৭৬
১৯৩৫-৬	৬৬১	-	৪৪৬	২	১,১০৫
১৯৩৬-৭	৬৮০	৩	৩৬০	৩	১,০৪০
১৯৩৭-৮	৬৭৪	১৫	৩৬৫	২৬	১,০২৮
১৯৩৮-৯	৭১৫	২৩	২৬৪	২৪	৯৭৮

উৎস : W.A. Johnson : *The Steel Industry of India* (কেম্ব্রিজ, ম্যাস, ১৯৬৬), পৃ. ১৪-১৫। MISW Mysore Iron and Steel Works-এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

ভারতীয় ট্যারিফ বোর্ডের অনুমান অন্তত TISCO-র ক্ষেত্রে যে সঠিক তা প্রমাণিত হলো। সারণি ৯.৯ থেকে দেখা যায়, ভারতে বিক্রয়যোগ্য ইস্পাতের ক্রয় ১৯৩২-৩৩-এ সর্বনিম্ন ৭২৫,০০০ টনে নেমে গিয়ে আবার বাড়তে আরম্ভ করল। TISCO দ্বিতীয় অগ্রাধিকারমূলক শেয়ারের দরুন ডিভিডেন্ডের পরিমাণ বাড়াতে সক্ষম হয়েছিল। এই বৃদ্ধির হার ছিল এই রকম : ১৯৩২-৩৩-এ শেয়ার পিছু ডিভিডেন্ড ১ টাকা দেওয়া হয়েছিল, ১৯২৩-৩৩-এ এই হার বেড়ে হলো ৫ টাকা (প্রাথমিক মূল্য ১০০ টাকা), ১৯৩৩-৩৪-এ ১৫ টাকা এবং ১৯৩৪-৩৫-এ ২২-৮-০ টাকা। ১৯৩৫-৩৬-এ কোম্পানিটি সাধারণ শেয়ারের (অর্থমূল্য : ৭৫ টাকা) প্রতি ইউনিট পিছু ৬ টাকা ডিভিডেন্ড দেওয়ার ঘোষণাও করে।[১৩১] TISCO প্রতি বছরে তার উৎপাদনও বৃদ্ধি করছিল, কিন্তু দেশে বিক্রয়যোগ্য ইস্পাত আমদানির পরিমাণ ৩০০,০০০ টন থেকে এমন কি দু-বছরের সময়েও কমল না এবং TISCO-র উৎপাদন বাড়া সত্ত্বেও আমদানির পরিমাণ ঊর্ধ্বমুখী হলো ১৯৩৪-৩৫ ও ১৯৩৫-৩৬-এ।[১৩২] অতএব এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে, ২৫০,০০০ অথবা ৩০০,০০০ টন উৎপাদনে সক্ষম এমন কারখানা নির্মাণের সুযোগ আছে, যদি এই আয়তনকে সর্বনিম্ন অর্থনৈতিক আয়তন হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

এ'কথাও জানা ছিল যে, মহীশূর আয়রন ওয়ার্কস (পরে যার নাম হয় মহীশূর আয়রন অ্যান্ড স্টিল ওয়ার্কস) ইস্পাত উৎপাদন করতে চেয়েছিল মূলত তার উৎপাদিত পিণ্ডাকার লোহা ব্যবহার করার উপায় হিসাবে। যদি এই কোম্পানিটি বৃহত্তর কারখানা স্থাপন করতে চাইত, ভদ্রাবতীকে তার আদর্শ অবস্থা হিসাবে গণ্য করা যেত না। কোম্পানিটির প্রস্তাবিত ইস্পাত কারখানার উৎপাদন-ক্ষমতা ছিল, ২০,০০০ টন প্রস্তুত ইস্পাত।[১৩৩]

প্রদত্ত পরিস্থিতি এবং উৎপাদনের বৈচিত্র্য সাধনের চাপ সৃষ্টির বিষয়টি (যা আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি) বিবেচনা করলে IISCO-র পরিচালকদের নতুন ইস্পাত কারখানা স্থাপনের প্রস্তাবে বিস্ময় জাগে না। স্টিল করপোরেশন অব বেঙ্গল কোম্পানিটি রেজিস্ট্রিভুক্ত হয়েছিল ১৯৩৭-এ। কোম্পানিটি স্থাপনের সময়ের সঙ্গে TISCO-র সমৃদ্ধি এবং সমগ্র ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার অর্থনীতির সার্বিক পুনরুদ্ধার জড়িত ছিল।[১৩৪] এই কোম্পানির প্রস্তাবিত কর্মপন্থার বিবরণ অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করেছিল তার অস্তিত্বের নিমিত্ত। দেখানো হয়েছিল, ভারতে নতুন ইস্পাত কারখানা নির্মাণের সুযোগ আছে। উদ্যোক্তারা স্পষ্টতই রক্ষণশীলতার পরিচয় দিচ্ছিল : কারখানার প্রাথমিক উৎপাদন-ক্ষমতার পরিমাণ পরিকল্পনা অনুসারে ২০০,০০০ টন প্রস্তুত করা ইস্পাত। স্টিল করপোরেশন অব বেঙ্গলের কারখানাটি (SCOB) তৈরি হয়েছিল হীরাপুরে অবস্থিত IISCO-র কাছে। SCOB, IISCO-র সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয় জল, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের যোগান লাভের এবং শহরে সুযোগ-সুবিধা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। IISCO, SCOB এবং বার্ন অ্যান্ড কোম্পানির মধ্যে একটি শক্তিশালী পারস্পরিক আর্থিক সম্পর্ক ছিল যার মাধ্যম হিসাবে কাজ করেছে ম্যানেজিং এজেন্টরা যারা IISCO এবং SCOB পরিচালনার দায়িত্বে ছিল। IISCO ও SCOB-এর মধ্যে আরও ক'টি চুক্তি সম্পাদিত হয় যার ফলে শেষোক্ত কোম্পানিটি প্রথমে উল্লিখিত সংস্থাটির কাছ থেকে পিণ্ডাকার লোহা কিনতে পাবে। দাবি করা হয়েছিল যে, 'এই ভারতীয় কোম্পানিটির লোহা উৎপাদনের ব্যয়-সমূহ পৃথিবীর যে কোনো লোহা-উৎপাদনকারী কোম্পানির তুলনায় সম্ভবত কম ছিল' এবং এই ইস্পাত করপোরেশনটি স্বল্প ব্যয়ের সুযোগ পাবে।[১৩৫] SCOB-এর উদ্যোক্তারা আশা করেছিল সাধারণ মূলধন থেকে ১১ শতাংশ প্রতিদান আসবে। এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয়েছিল ইস্পাত দ্রব্যের উপর আরোপিত শুধুমাত্র রাজস্ব-শুল্কগুলি।

এদের কারখানার আয়তন সম্ভবত নির্ধারিত হতো ভারতের ইস্পাত বাজারে সেই অংশের আয়তনের উপর যে অংশটিতে TISCO যোগান দিত না । আর্থিক নিয়ন্ত্রণসমূহ চূড়ান্ত কিছু ঘটাতে পারত না দুটি কারণে : প্রথমত, ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর (বার্ন অ্যান্ড কোম্পানি এবং মার্টিন অ্যান্ড কোম্পানি) শক্তিশালী আর্থিক অবস্থা,[১৩৬] দ্বিতীয়ত, SCOB স্থাপনের সময়ে লোহা ও ইস্পাতের দরুন ঋণপত্রগুলির বাজারে প্রতিষ্ঠা। ১৯৩৩-এর সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৩৭-এর মার্চ পর্যন্ত লোহা ও ইস্পাত সংশ্লিষ্ট ঋণপত্রের দামসূচি ১৩৫.৫ থেকে বেড়ে ৫৮১.৩-এ (ভিত্তি : ১৯২৮-২৯ = ১০০) দাঁড়ায়। পরবর্তীকালে ঐ দামসূচির পতন ঘটে, কিন্তু কখনও তা ৩০০-র নিচে নামেনি এবং দামগুলি আবার বেড়ে যেতে থাকে ১৯৩৯-এর মে মাস থেকে যতক্ষণ না পর্যন্ত তা ৫৬২-তে দাঁড়াল ১৯৩৯-এর ডিসেম্বরে।

SCOB-এর কারখানার আয়তনের কারণ[১৩৭] যাই হোক না কেন, দীর্ঘকালের প্রেক্ষাপটে এটি ছিল প্রায় নিশ্চিতভাবে অতিরিক্ত ছোট এবং এই আয়তন উৎপাদন-ব্যয়কে সম্ভাব্য সর্বনিম্নস্তর থেকে অনেক উপরে তুলে দিয়েছিল। উপরন্তু, IISCO এবং SCOB-এর মধ্যে সাংগঠনিক ও বাহ্যিক বিচ্ছিন্নতা ইস্পাত উৎপাদন-ব্যয়কে অহেতুকভাবে বাড়িয়ে দেয়। IISCO-র অংশীদারদের ব্যবসায়িক স্বার্থকে একটি নতুন কোম্পানির অস্তিত্বের মধ্যে মিশিয়ে দিতে পারার সমস্যাটি ম্যানেজিং এজেন্টরা সম্ভবত সামলাতে পারেনি, অথবা বিনিয়োগকারী জনসাধারণকে IISCO-তে বিনিয়োগ প্ররোচিত করতে তারা অক্ষম ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় SCOB প্রতিষ্ঠানটি ভারত সরকারকে নিশ্চিতভাবে সাহায্য করেছিল, যখন ইস্পাত উৎপাদনের বেশিরভাগই জোর করে লাগানো হতো সামরিক উদ্দেশ্য সাধনে। প্রতিষ্ঠানটি ভারতীয় শিল্পে নিয়োজিত ভোগরকারীদের সাহায্যও করেছে অব্যবহিত যুদ্ধোত্তরের দিনগুলিতে যখন অধিকাংশ দেশগুলি পুনর্গঠনের কাজে ব্যস্ত। কিন্তু SCOB-এর কারখানাটির ছোট আয়তন এবং সব থেকে অনুকূল নয় এমন (non-optimal) নকশা ভবিষ্যতের জন্যে প্রভূত সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। এই সমস্যাগুলি সরকারি পরিকল্পনার অভাব এবং অংশীদারদের অতীতের ঘটনাবলীকে বিস্মৃত হওয়ার অক্ষমতাকে নির্দেশ করে। ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের জোরালো মাত্রা অর্জনকারী কোনো শিল্পের ক্ষেত্রে চাহিদার শম্বুক গতি স্বভাবতই বিভিন্ন সমস্যাকে বাড়িয়ে তোলে।[১৩৮]

অনুবাদক : মনোজ কুমার সান্যাল

উৎস ও টীকা

১। দৃষ্টান্তের জন্যে পড়ুন ভাইসরয় লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড প্রদত্ত বক্তৃতা। জানুয়ারি ২, ১৯১৯-এ TISCO পরিদর্শনকালে এই ভাষণ দেওয়া হয়। ভাষণটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে নিম্নোক্ত গ্রন্থে : Lovat Fraser, *Iron and Steel in India* (বোম্বাই, ১৯১৯), পৃ. ১০৩-৪। টাটা কোম্পানির তরফ থেকে সংরক্ষণের দাবি উত্থাপনের সময়েও সরকারের এই আবেগ স্তিমিত হয়নি। স্টিলের উপর শুল্ক-সংরক্ষণের প্রশ্নে Sir Charles Innes-এর ভাষণ (*Legislative Assembly Debates* (নিউ দিল্লী), ২৭ মে ১৯২৪, পৃ. ২৩২৭-৮) প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। জাতীয়তাবাদী মতামতের নমুনা হিসাবে পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের বক্তৃতা দ্রষ্টব্য : *ঐ*, পৃ ২৩২০-১।

২। লোহা ও ইস্পাতের শিল্পের প্রসারের অকপট বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য : Buchanan, *Development of Capitalistic Enterprise in India*, অধ্যায় ১৩। ১৯২৪-এ ভারতীয় স্টিলকে সংরক্ষিত করার রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন অধ্যাপক অমর্ত্য সেন তাঁর এই প্রবন্ধে : 'The Commodity Pattern of British Enterprise in Early Indian Industrialization, 1854-1914', in *Deuxieme Conference Internationale D'Histoire Economique, Aix-en-Provence 1962* (প্যারিস, ১৯৬৫), পৃ. ৭৮০-৮২৮।

৩। J.A. Schumpeter, *The Theory of Economic Development* (কেম্ব্রিজ, ম্যাস, ১৯৩৪), বিশেষত অধ্যায় ২, পৃ. ৬৬।

৪। *Quinquennial Review* এবং জিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার অন্যান্য প্রকাশণা থেকে ব্রিটিশ ভারতের খনিজ সম্পদ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। স্যার টমাস হল্যান্ড-সহ অন্যান্য ভূতত্ত্ববিদরা ভারতে লোহা ও ইস্পাত শিল্পের বিকাশকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

৫। টাটা ফার্ম কর্তৃক লন্ডনে অর্থ সংগ্রহের প্রযাস সম্পর্কে দ্রষ্টব্য : Fraser, *Iron and Steel in India*, পৃ. ৫১-২। ইংল্যান্ড থেকে মারুত চুল্লী সংগ্রহে এবং স্টিল কারখানার ম্যানেজার নিয়োগে টাটাদের ব্যর্থতার উপর আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য : The evidence of Sir Fuzulbhoy Currimdhoy in *Evidence* (*Report of IIC*) খণ্ড ২ (PP ১৯১৯, ১৮), পৃ. ৩৬৯।

৬। উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য : Duncan Burn, *The Economic History of Steel-Making* (কেম্ব্রিজ, ১৯৪০), অধ্যায় ৫-১০।

৭। একটি নতুন ভারতীয় স্টিল শিল্প গঠনের মধ্যে ভারতে বাজার হারানোর ভয় যে নিহিত ছিল তা ইংরেজ কারিগরি বিশারদদের পক্ষে বোঝা বস্তুত সম্ভব ছিল। কিন্তু শিল্পটি গঠনের প্রয়াসে তা সত্ত্বেও তাঁরা সহযোগিতা থেকে বিরত হলেন না কেন, বিশেষত যখন তাঁরা কারখানার মালিক বা ম্যানেজার ছিলেন না ? এবং ব্রিটিশ ফার্মের মুনাফা হ্রাস পাবে, এই আশঙ্কায় সমস্ত অর্থলগ্নীকারীরাই বা কেন এই প্রয়াসে সামিল হলো না? বিশ্বাস করা শক্ত যে, পুঁজিপতিরা শ্রেণীগতভাবে, এমনকি ছোট-খাটো বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও, একজোট হয়ে অর্থলগ্নী করতে পারে এবং তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা নেই। অর্থলগ্নীকারীরা হয়ত বিনিয়োগে প্রস্তুত থাকত যদি নতুন উদ্যোগগুলির উপর এর মাধ্যমে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হতো। এই বক্তব্যের সমর্থনে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় যে প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় উদ্যোগে বিনিয়োগের প্রশ্নটিকে তারা বিবেচনা করত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার দিক থেকে, লাভজনক সহযোগিতার দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। দ্রষ্টব্য : Fraser, *Iron and Steel in India*, পৃ. ৫১-২।

৮। দ্রষ্টব্য : H.M. Surtees Tuckwell, 'The Tate Iron and Steel Works : Their Origin and Development', *JRSA*, ৬৬, সংখ্যা ৩৪০২, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮, পৃ. ১৯৩।

৯। দ্রষ্টব্য : *Reports and Correspondence relating to the expediency of maintaining the Royal Indian Engineerning College, and other matters* (PP ১৯০৪, ৬৪), বিশেষত পরিশিষ্ট ১। আরও দেখুন এই গ্রন্থের অধ্যায় ২ ও ৫।

১০। ভারতে নিচু স্তরের অবেক্ষণমূলক কর্মচারীদের জন্যে রেলে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু মাত্র কয়েকজন ভারতীয় এই সুযোগ পেয়েছিল। ভারতে বসবাসকারী ইয়োরোপীয় বা ইয়োরেশীয়রাই প্রশিক্ষণের সুযোগ পেত। দ্রষ্টব্য : *Report of IIC* (PP ১৯১৯, ১৭), পৃ. ১০৩-৪, *Report of the Committee appointed by the secretary of State for India to enquire into the administration and working of Indian Railways* (PP ১৯২১, ১০), অনুচ্ছেদ ১৮২-৪।

১১। ইস্পাত তৈরি হতো সরকারি অস্ত্র নির্মাণের কারখানাগুলিতে। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এইচ এ ইয়ং (১৯১৭ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত ভারতে অস্ত্র নির্মাণের

কারখানাগুলির পরিচালক ছিলেন) স্পষ্টভাবে বলেছিলেন : 'অস্ত্র তৈরির কারখানাগুলিতে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের জন্যে ভারতীয়দের প্রশিক্ষণের চেষ্টা সামান্যই হয়েছে'। H.A. Young, 'The Indian Ordnance Factories and Indian Industries', *JRSA,* ৭২, সংখ্যা ৩,৭১৫, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪, পৃ. ১৮১।

১২। Fraser, *Iron and Steel in India,* পৃ. ১৫-১৮।

১৩। ঐ, পৃ. ৬৯-৭০।

১৪। ঐ, পৃ. ৫৪-৫। অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা ভারতীয লোহা ও ইস্পাত শিল্পকেও দেওয়া হয়েছিল। দ্রষ্টব্য : সাক্ষ্য : G.A. Young, General Manager, Indian Iron and Steel Company Limited in RC on Libour in India, 1931, *Evidence,* খণ্ড ৫, অংশ ২ (লণ্ডন, ১৯৩১), পৃ. ৩২।

১৫। Tuckwell, 'Tate Iron and Steel Works', পৃ. ১৯৪ ; Cumming [*IPG Pub.], Review of the Industrial Position,* পৃ. ২৩। Keenan'র বক্তব্য, সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল 'লন্ডনের কমেডিয়ানটির মতো যিনি কিছু বছর পরে ৫,০০০ পাউন্ড দিতে চেয়েছিলেন অপরিচিত সৈনিকের বিধবার উদ্দেশ্যে'। J.L. Keenan, *A Steel Man in India* (লন্ডন, ১৯৪৫), পৃ. ৩৫।

১৬। Anstey, *The Economic Development of India,* পৃ. ২৪৩।

১৭। উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য ভারতীয় লোহা ও ইস্পাত কোম্পানির প্রতিনিধি হিসাবে G.H Fairhurst-এর মৌখিক সাক্ষাৎ : ITB, *Evidence (Report on steel)* খণ্ড ৩ (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ১৫৭।

১৮। দ্রষ্টব্য : Gov. India, CISD : *Review of the trade of India, for the years 1904-5 to 1906-7* (কলকাতা, বার্ষিক) : লোহা ও ইস্পাত আমদানির উপর অনুচ্ছেদগুলি।

১৯। দ্রষ্টব্য : *ঐ*।

২০। উদধৃতাংশটি Sen (১৯৬৫) থেকে : 'The Commodity Pattern', পৃ. ৮০৫।

২১। Gov, India, CISD : *Annual Statement of seaborne trade,* খণ্ড ১ ও ২ (কলকাতা, বার্ষিক)।

২২। R.H. Mather, 'The Iron and Steel Industry in India', *JRSA* ৭৫, সংখ্যা ৩,৮৮৬, ১৩ মে ১৯২৭, পৃ. ৬০০-১৬, বিশেষত ৬০৪।

২৩। ITB, *Evidence on Steel,* খণ্ড ১, *The Iron and Steel Industry* (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ২৭৮ ; Harris, *Jamsetji Nusserwanji Tata,* পৃ. ২০৪-৫।

২৪। Tuckwell, *The Tata Iron and Steel Works* পৃ. ১৯৪ ; ITB, *Evidence (Report on steel),* খণ্ড ১ (কলকাতা, ১৯২৪) পৃ. ২৭৮।

২৫। Harris, *Jamsetji Nusserwanji Tata,* পৃ. ১৯২।

২৬। *ঐ*, পৃ. ১৯১-২।

২৭। *ঐ*, পৃ. ২০৫। কোম্পানিটি সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস সিন্ডিকেটের কাছ থেকে দশ-বছর মেয়াদী চুক্তিতে ম্যাঙ্গানিজ (২০,০০ টন বছরে) ক্রয় করা লাভজনক মনে করেছিল। দ্রষ্টব্য ITB, *Evidence (Report on steel),* খণ্ড ১ (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ২৯৭।

২৮। *ঐ*, পৃ ২৭৯।

২৯। Harris, *Jamsetji Nusserwanji Tata*, পৃ. ২০৪।

৩০। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, Mr. H. Fitzpatrick বেঙ্গল আয়রন কোম্পানির প্রতিনিধি হিসাবে ১৯২৩-এর ৮ই নভেম্বর বলেছিলেন যে, বরাকর নদী, যার তীরে তাদের কারখানা অবস্থিত (টাটার কারখানার অনেক কাল আগে নির্মিত), গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায়, এবং যখন গুদামের সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে কেবল তখন ইস্পাত উৎপাদন সম্ভবপর হবে। দ্রষ্টব্য : ITB, *Evidence (Report on steel)* খণ্ড ৩ (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ২১৮।

৩১। ITB, *Report on steel* (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ১৩-১৪ ও ১০২-৩। ইউনাইটেড করপোরেশন অব এশিয়া লিমিটেডের হিসাব অনুসারে এক টন পিণ্ডাকার লোহা উৎপাদনের জন্যে এক টন চুনাপাথর ব্যবহার করা হতো এবং টন প্রতি উৎপাদন-ব্যয় ছিল ৩২ টাকা ৮ আনা যার মধ্যে চুনাপাথর বাবদ ব্যয় ছিল ১ টাকা ৮ আনা। ITB. *Evidence (Report on steel)* খণ্ড ৩ (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ১৬৮-৯ ও ১৭৩। চুনাপাথর ডোলোমাইট কোনো সময়েই প্রধান উপকরণ-ব্যয় হিসাবে পরিগণিত হয়নি।

৩২। *ঐ*, খণ্ড ১ (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ২২৭।

৩৩। ITB, *Report in steel* (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ৯৭ (জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ড. ফক্সের রিপোর্ট), এবং পৃ. ৪। মূল Bessemer প্রক্রিয়াটি ব্যবহার করা যায়নি। তার কারণ, পিণ্ডাকার লোহায় ফসফরাসের ভাগ কম ছিল। মূল Bessemer প্রক্রিয়া-অনুসারে তাপ সৃষ্টির জন্যে ফসফরাসের প্রয়োজন হয়। দ্রষ্টব্য : Peter Temin, *Iron and Steel in Nineteenth Century America* (কেম্ব্রিজ, ম্যাস, ১৯৬৪), পৃ. ১৪৪-৫। ছাইয়ের অংশ বেশি থাকায় চুনাপাথরের প্রয়োজন হতো বেশি। দ্রষ্টব্য : ITB, *Evidence (Report on steel)* খণ্ড ৩ (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ১৬১ (IISCO-এর মিস্টার ফেয়ারহার্স্টের সাক্ষ্য)।

৩৪। ITB, *Evidence (Report in steel)* (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ১৫১।

৩৫। কয়লা উত্তোলন, মজুত ও পরিবহণের বর্ধিষ্ণু ব্যয় সম্পর্কে সাক্ষ্যের জন্যে দ্রষ্টব্য : *ঐ*, খণ্ড ৩, পৃ. ২০৫-৮ (বার্ড অ্যান্ড কোম্পানির অংশীদার E. S. Tarlton প্রদত্ত সাক্ষ্য)।

৩৬। কয়লা কেনার ব্যাপারে IISCO-রও একই রকমের চুক্তি ছিল। *ঐ*, খণ্ড ৩, পৃ. ১৫৩।

৩৭। *ঐ*, খণ্ড ১, Statement Nos. XXXVI (পৃ. ১৪৯), XLVIII (পৃ. ১৬১)।

৩৮। জুলাই ১৯৯২ থেকে মার্চ ১৯২৩ পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে যে পরিমাণ (১,০৩৫,৬৫৯ টন) ইস্পাত উৎপাদিত হয়েছিল তার শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি পরিমাণ (৫৭২,৪০৯ টন) ছিল রেল লাইট রেল্‌স্‌ ও ফিসপ্লেট্‌স্‌। *ঐ*, খণ্ড ১, পৃ. ৬৯।

৩৯। ITB, *Statement enquiry in 1926 : steel*, খণ্ড ৫, (কলকাতা, ১৯২৬) : কন্টিনেন্টাল রেল ও ফিসপ্লেট্‌স্‌ ক্রয়ের প্রশ্নে রেলওয়ে বোর্ড (পৃ. ২), আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি লিমিটেড (পৃ. ১০১) বম্বে বরোদা অ্যান্ড সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি লিমিটেড (পৃ. ১০৮), ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে (পৃ. ১১৩) ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে (পৃ. ১১৫), ম্যাড্রাস অ্যান্ড সাদার্ন মাহরাট্টা রেলওয়ে কোম্পানি লিমিটেড (পৃ. ১২১), নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে (পৃ. ১২১), সাউথ ইন্ডিয়ান রেলওয়ে লিমিটেড (পৃ. ১২৪)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

৪০। ভারতীয় শিল্পের উন্নয়নের দিক থেকে ভারত সরকাবের ক্রয় নীতির ত্রুটিগুলির উপর আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য : Report of IIC (PP ১৯১৯, ১৮), অধ্যায় ১২, পৃ. ১২, পৃ. ১২৬-৭ ; এবং Sen, *Studies in Economic Policy*, পৃ. ১৯-২০।

৪১। ITB, *Evidence (Report on steel)*, খণ্ড ৩ (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ২১০ ও ২১৮-১৯। চাহিদাব ঘাটতির একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে বেঙ্গল আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানিকে দেওয়া সরকারি বরাত্তের মোট পরিমাণ ছিল ৬০০ টন ইস্পাত যার মধ্যে ৭০ রকমের বিভিন্ন বিভাগ ছিল। Tuskwell, 'The Tata Iron and Steel Works', পৃ. ১৯০ ; এবং E.R. Watson [*IPG Pub.*], *A Monograph on Iron and Steel Work in the Province of Bengal* (কলকাতা, ১৯০৭), পৃ. ৫৬-৭। বেঙ্গল আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানিটি সরকারের কাছ থেকে ১,৫০০ পাউন্ড ভর্তুকি পেয়েছিল এই শর্তে যে, সরকারকে ইস্পাত বিক্রি করবে টন প্রতি ৩ টাকা ছাড় দিয়ে। কিন্তু কোম্পানিটিব ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০,০০০ পাউন্ডের বেশি। তাছাড়া, কারখানা স্থাপনের ব্যয় দাঁড়িয়েছিল ১,৭৫০,০০০ টাকা। কোম্পানিটিকে শেষ পর্যন্ত ইস্পাত উৎপাদনের চেষ্টা বাতিল করতে হয়। দ্রষ্টব্য : *ঐ*, পৃ. ৫৬, এবং Buchanan, *Development of Capitalistic Enterprise*, পৃ. ২৮১-২। ১৯০৪-এ বেঙ্গল আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি ক্ষীণ আকরিক লোহার (লোহার ভাগ ৪৬ শতাংশ) ব্যবহার আরম্ভ করে এবং ১৯১০-এর পর থেকে Pansira Buru-এর ও Nota Buru-র উন্নত মানের আকরিক লোহা ব্যবহার করতে থাকে। কিন্তু ইস্পাত উৎপাদনের ব্যর্থতার প্রধান কারণ হিসাবে উপরোক্ত বিষয়টিকে সম্ভবত গণ্য করা যায় না। দ্রষ্টব্য : IISCO, *Growth and Perspective* (কলকাতা, ১৯৬৮), পৃ. ৫-১০।

৪২। ITB, *Evidence (Report on steel)*, খণ্ড ৩, পৃ. ২৩৫। আরও দেখুন : *ঐ*, পৃ. ১৫৯ বেখানে IISCO'র প্রতিনিধি Mr. Fairhurst-র এই অভিযোগ লিপিবদ্ধ হয়েছে যে প্রায়শই দামগুলি চাওয়া হতো শুধুমাত্র ইংল্যান্ডের দরপত্রের উদ্দেশ্যে।

৪৩। Sen, 'The Commodity Pattern', পৃ ৮০৩-৭।

৪৪। ১৯১১-১২-তে বেসরকারি খাতে ইস্পাত পণ্যের ১৫৬,৭৮২ টন মোট আমদানির মধ্যে যুক্তরাজ্য থেকে আমদানির পরিমাণ ছিল ৩২,৭৯৫ টন।

৪৫। ১৯২৪-২৫-এ বেসরকারি খাতে ইস্পাত পণ্যের মোট আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ২২৮,২৬৭ টনে, যুক্তরাজ্য থেকে আমদানির পরিমাণ ছিল ২৭,৯৫৪ টন।

৪৬। *Trade of the British Empire and Foreign Competition,* C. 8449 of 1897, পৃ. ৫৭৭। প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতাংশের জন্যে দ্রষ্টব্য : Saul, *Studies in British Overseas Trade,* পৃ. ১৯৯।

৪৭। Tuckwell, 'The Tata Iron and Steel Works', পৃ. ১৯৩।

৪৮। *ঐ,* পৃ. ১৯৭।

৪৯। রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টসের সভায় প্রদত্ত Sir Thomas Holland'র ভাষণ পড়ুন : *JRSA*, ৭৫, সংখ্যা ৩৮৮৬, ১৩ মে ১৯২৭, পৃ. ৬১৭-১৮। এই একই সভায় Mather-র প্রবন্ধ, 'The Iron and Steel Industry in India' পঠিত হয়। যুদ্ধের সময়ে জার্মানির বৈরিতার ফলে টাটা কোম্পানির যে ক্ষতি হয় তার হিসাবের জন্যে দ্রষ্টব্য : *Jamsetji Nusserwanji Tata,* পৃ. ২১৬।

৫০। সরকারকে যোগান দেওয়া ইস্পাতের পরিমাণ জানার জন্যে দেখুন : ITB, *Evidence (Report on steel),* খণ্ড ১ (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ১৭। সরকারের ৬০ মিলিয়ন টাকা বেঁচে যাওয়ার ধারণাটির পেছনে এই অনুমান কাজ করেছে যে, ইস্পাতের দরুন ব্যয় টন প্রতি আরও ২০০ টাকা বেশি লাগত। ২৭শে মে ১৯২৪ থেকে ৫ই জুন ১৯২৪ পর্যন্ত আইন সভায় স্টিল প্রোটেকশন বিলের উপর বিতর্কে উপরোক্ত পরিসংখ্যান উদ্ধৃত হয়েছিল।

৫১। *ঐ,* খণ্ড ১, পৃ. ৬৯।

৫২। সাক্ষ্য : Dr. A. Mc William, Govenment Metallurgical Inspector, Railway Department, Railway Board : *Evidence (Report of IIC),* খণ্ড ২, (PP ১৯১৯, ১৭) Mc William-এর বক্তব্যের সমর্থনে দেখুন . ITB, *Evidence (Report on steel),* খণ্ড ১ (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ২২৬।

৫৩। Sir Fazulbhoy Currimbhoy ও Dr. William'র মধ্যে মত বিনিময়ের জন্যে দ্রষ্টব্য : *Evidence (Report of IIC),* খণ্ড ২ (PP ১৯১৯, ১৭), পৃ. ৩৭০। আরও দেখুন : V. Elwin, *The Story of Tata Steel* (বোম্বাই, ১৯৫৮), পৃ. ৪৩-৪।

৫৪। J.L. Keenan, *A Steel Man in India* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৩), পৃ. ৩৯-৪৪। ওপেন-হার্থ বিভাগে নিযুক্ত বিদেশি শ্রমিকদের গড় মজুরি (বোনাস সহ) ১৯১৪-১৫ সালে ছিল ৩,৯৭০.১ টাকা যা ১৯১৫-১৬-তে বেড়ে দাঁড়ায় ৯,০৩৬.৪ টাকা। সংখ্যাতথ্যের উৎস : ITB, *Evidence (Report on steel),* খণ্ড ১ (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ১১০।

৫৫। দ্রষ্টব্য : Keenan, *A Steel Man,* অধ্যায় ৪ ; Harris, *Jamsetji Nusserwanji Tata,* পৃ. ২১৭-২১৮।

৫৬। দ্রষ্টব্য : Keenan, *A Steel Man,* অধ্যায় ৪।

৫৭। ITB, *Evidence (Report on steel),* খণ্ড ১ (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ৭৭।

৫৮। TISCO ও ভারত সরকারের (ও ভারতের সেক্রেটারি অব স্টেট) মধ্যে বৃহত্তর সম্প্রসারণের বিষয়টি সম্পর্কে বোঝাপড়ার বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য, *ঐ,* পৃ. ৭৭-৯৭।

৫৯। *India's contribution to the Great war* (কলকাতা, ১৯২৩), পৃ. ১২৮-৯।

৬০। Keenan, *A Steel Man,* অধ্যায় ৪।

৬১। Harris, *Jamsetji Nusserwanji Tata,* পৃ. ২১৬, এবং *India's contribution to the Great war,* (কলকাতা, ১৯২৩), পৃ. ১২৮-৯।

৬২। ITB, *Evidence (Report on steel)* ; খণ্ড ১ (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ৭৯-৮০।

৬৩। *ঐ,* পৃ. ৮১।

৬৪। *ঐ,* পৃ. ৮১।

৬৫। *ঐ,* পৃ. ২২৯।

৬৬। ITB, *Stationary enquiry 1926 : steel,* খণ্ড ১ (কলকাতা, ১৯২৭), পৃ. ১৮।

৬৭। Burn, *Economic History of Steel Making,* পৃ. ৯৭ ও পরিশিষ্ট ২।

৬৮। ITB, *Evidence (Report on steel),* খণ্ড ১ (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ১০৯-১১।

৬৯। আর ডি টাটা ট্যারিফ বোর্ডকে দেওয়া তাঁর মৌখিক সাক্ষ্যে বলেছিলেন যে, একই পদে প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত ভারতীয়দের ইয়োরেপীয়দের বেতনের এক-তৃতীয়াংশের বেশি দিতে হতো না। প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত ভারতীয় শ্রমিক সহজে পাওয়াও যেত না। *ঐ,* খণ্ড ১, পৃ. ২৮০। Tutwiler'র সাক্ষ্যও প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, মার্কিনী ও ইরোয়োপীয়দের তাঁদের দেশের বেতনের তুলনায় ভারতে একই কাজে ৫০ শতাংশ বেশি পারিশ্রমিক দিতে হতো। বিদেশ থেকে শ্রমিক আনলে তাদের মালপত্রের মাশুল এবং দেশে যাওয়ার সবেতন ছুটিও দিতে হতো। *ঐ,* পৃ. ২২৩, এবং Buchanan, *Development of Capitalistic Enterprise,* পৃ. ২৮৭-৮। Gilbert Slater সাঁওতালদের কথা বলেছেন, যাঁরা ইস্পাতের রেল তৈরির কাজে ইয়র্কশায়ারের শ্রমিকদের অপসারণ করতে পেরেছিলেন। Salter, *Southern India,* পৃ. ২৩৫-৬। এই গ্রন্থের অধ্যায় ৫-ও দ্রষ্টব্য।

৭০। ITB, *Evidence (Report on steel),* খণ্ড ১ (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ১০৯-১১।

৭১। আপাতদৃষ্টিতে কয়লার মানেরও অবনতি ঘটেছিল, কোকের মধ্যে ছাইয়ের ভাগ ২০ শতাংশে দাঁড়িয়েছিল। ITB, *Report on steel*, খণ্ড ১ (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ৩১।

৭২। ITB, *Evidence (Report on steel)*, খণ্ড ১ (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ১০৯-১১ ও ১৪৯।

৭৩। *ঐ*, খণ্ড ১, পৃ. ২৪১।

৭৪। *ঐ*, খণ্ড ১, পৃ. ৮৩-৪। বৃহত্তর সম্প্রসারণ প্রকল্প বাবদ ২৪শে মার্চ পর্যন্ত অনুমিত ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৩২.৯ মিলিয়ন টাকা, এর মধ্যে ৩১শে মার্চ ১৯২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছিল ১৮.৪ মিলিয়ন টাকা এবং ৩১শে মার্চ ১৯২৩ পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৫৬.৩ মিলিয়ন টাকা। অধিকাংশ বরাত দেওয়া হয়েছিল পূর্ববর্তীকালে। *ঐ*, পৃ. ২১২।

৭৫। TISCO'র হিসাব অনুসারে ২০০ টনের ওপেন-হার্থ টিলটিং ফার্নেস স্থাপনের ব্যয় ভারতে ৫,৫৭৫,০০০ টাকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪,৩১০,০০০ টাকা। ৫০ টনের ব্লাস্ট ফার্নেসের দরুন ব্যয় ভাবতে ৮,৩৪৩,০০০ টাকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৫, ৯৭৬,০০০ টাকা, এবং ১৮" মিল স্থাপনের ব্যয় ভারতে ১৮,২৪২,০০০ টাকা, মার্কিন যুক্তারাষ্ট্রে ১৫,৩৯২,০০০ টাকা। *ঐ*, খণ্ড ১ , পৃ. ২১৬-১৮। IISCO'র মূল বাজেটে (মার্চ ১৯১৮) কারখানা নির্মাণের (দৈনিক ৩৫০ টন উৎপাদনে সক্ষম, এই রকম দুটি ব্লাস্ট ফার্নেস) দরুন ব্যয় ধরা হয়েছিল ১৫ মিলিয়ন টাকা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সর্বসাকুল্যে ব্যয় দাঁড়িয়েছিল ৩০ মিলিয়ন টাকায়। ১৯২৩-এ অনুমান করা হয় ঐ ব্যয় ১৫ থেকে ২০ মিলিয়নে দাঁড় করানো যাবে। *ঐ* ; খণ্ড ৩, পৃ. ১৬০। ১৯২৫-এ TISCO তার কারখানার লিখিত মূল্য ৩০ মিলিয়ন থেকে ২২.৫ মিলিয়নে কমিযে আনে, এই মূল্য চলতি দামে কারখানা স্থাপনেব ব্যয়ের সমান ছিল। ITB, *Statutory enquiry 1926 : steel*, খণ্ড ৪ (কলকাতা, ১৯২৭), পৃ. ৭-৮। ইন্ডিয়ান ট্যারিফ বোর্ডের পরিমাপ অনুসারে ১৯২১-২-ও পণ্য উৎপাদনে স্থির মূলধনের দরুন TISCO'র প্রকৃত পক্ষে ব্যয় ছিল ৪০ মিলিয়ন টাকা, অথচ কারখানার যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনের মূল্য দাঁড়িয়েছিল ৬০ মিলিয়ন টাকায়। প্রতিস্থাপনের মূল্যের ভিত্তিতে অবচয়ের ব্যয় নির্ণয় করা হতো। দ্রষ্টব্য : ITB, *Report on steel* (কলকাতা ১৯২৪), পৃ. ৩৬-৮। অবশ্য ট্যারিফ বোর্ড উল্লেখ করে যে ৬০ মিলিয়ন টাকায় স্থাপিত কারখানা সচল রাখার ব্যয় তুলনামূলকভাবে অনেক কম ছিল। *ঐ*, পৃ. ৩৭।

৭৬। ইয়োরোপীয় মহাদেশ ও ব্রিটেনের ইস্পাত পণ্যের দামসমূহ অপেক্ষাকৃত কম থাকার বিষয়টি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য : ITB, *Evidence (Report on steel)* ; খণ্ড ১ (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ১৪-১৫। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দাম পৃথকীকরণের বিষয়টির জন্যে দ্রষ্টব্য : ITB, *Evidence (Report on steel)*, খণ্ড ১, পৃ. ৫২-৬।

৭৭। *ঐ*, খণ্ড ১, পৃ. ২৮১ (মি. পিটারসনের মৌখিক সাক্ষ্য)। ১৯২০-১ ও ১৯২১-২ এই দুই বছরে আমদানিজাত রেলের দামের ভিত্তিতে নির্ণীত মোট দাম এবং

TISCO-কে প্রকৃত পক্ষে প্রদত্ত মোট দামের মধ্যে পার্থক্যের পরিমাণ রেলবোর্ডের ক্ষেত্রে ৫,২৪৭,০০০ টাকা এবং রেল কোম্পানিগুলির (পামার রেলওয়েজ, বি এন রেলওয়ে ও জি আই পি রেলওয়ে) ক্ষেত্রে ৮,৯৫৫,০০০ টাকা। *ঐ*, খণ্ড ১, পৃ. ২৫।

৭৮। *ঐ*, খণ্ড ১, পৃ. ১৩-১৮।

৭৯। জাহাজ নির্মাণ শিল্পের জন্যে সংরক্ষণের আবেদন অগ্রাহ্য হয়।

৮০। ITB, *Report regarding the grant of supplementary protection to the steel industry* (কলকাতা, ১৯২৫), পৃ. ২২।

৮১। দ্রষ্টব্য : ITB, *Statutory enquiry 1926 : steel*, খণ্ড ১ (কলকাতা, ১৯২৬), পৃ. ৮-৯।

৮২। *ঐ*, অধ্যায় ৩ ও ৬।

৮৩। B.N. Adarkar [Gov. India pub.], *The History of the Indian Tariff, 1924-39*, পৃ. ১৫।

৮৪। ITB, *Report on the iron and steel industry* (দিল্লী, ১৯৩৪)।

৮৫। *ঐ*, অধ্যায় ৬।

৮৬। ITB, *Statutory enquiry 1926 : steel*, খণ্ড ২ (কলকাতা, ১৯২৭), পৃ. ১০।

৮৭। ITB, *Statutory enquiry 1926 : steel*, খণ্ড ৫ (কলকাতা, ১৯২৭), পৃ. ১১০।

৮৭(ক)। *ঐ*, পৃ. ১২১।

৮৭(খ)। *ঐ*, পৃ. ১১১ ও ১২১।

৮৭(গ)। *ঐ*, পৃ. ১২৭।

৮৭(ঘ)। *ঐ*, পৃ. ৫।

৮৮। ITB, *Statutory enquiry 1926 : steel*, খণ্ড ১ (কলকাতা, ১৯২৬), পৃ. ১০-১১, সারণি ১ ও ২। ১৯৩৩-এ স্থাপিত একটি শিট মিলের উৎপাদন ব্যয় পুরনো মিলগুলির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম। ITB, *Report on the iron and steel industry* (দিল্লী, ১৯৩৪), পৃ. ৩১।

৮৯। ITB, *Statutory enquiry 1926 : steel*, খণ্ড ১ (কলকাতা, ১৯২৬), পৃ. ১১।

৯০। *ঐ*, পৃ. ১১, এবং ITB, *Statutory enquiry 1926 : steel* খণ্ড ৩ (কলকাতা, ১৯২৭), পৃ. ৮-৫১।

৯১। ITB, *Statutory enquiry 1933 : steel*, খণ্ড ১ (দিল্লী, ১৯৩৪), পৃ. ৩৯-৪০।

৯২। ITB, *Statutory Enquiry 1926 : steel*, খণ্ড ৩ (কলকাতা, ১৯২৭), পৃ. ৮-৫১।

৯৩। ITB, *Statutory enquiry 1933 : steel,* খণ্ড, ১ (দিল্লী, ১৯৩৪), পৃ. ৪১-২, ৫৬, ৭৫-৬ ও ৯৪।

৯৪। *ঐ,* অধ্যায় ১০, এবং বিশেষত পৃ. ৩৮।

৯৫। *ঐ,* পৃ. ৮১।

৯৬। *ঐ,* পৃ. ৩৮।

৯৭। স্থির মূলধনের দরুন অনুমোদিত মুনাফার হার ছিল ৮ শতাংশ, কার্যকবী মূলধনেব উপর অনুমোদিত সুদের হার ৭ শতাংশ বা ৬ শতাংশ ছিল (১৯৩৪-র রিপোর্টে প্রাপ্ত)।

৯৮। ITB-র হিসাব অনুসারে ১৯২৪-৫ থেকে ১৯২৬-৭ পর্যন্ত সময়কালে বিক্রয়যোগ্য ঢালাই না-করা লোহার পরিমাণ ছিল ৪০,০০০ টন, কিন্তু একইসময়ে TISCO-র উৎপাদন (বিক্রয়যোগ্য) ছিল প্রায় ৪৫০,০০০ টন। শেষোক্ত পবিমাণ উৎপাদন বাবদ ব্যয় ব্যতিরেকে মোট রেভিনিউ-এ উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ৬,৩০০,০০০ টাকা অথচ ট্যারিফ বোর্ডের হিসাবে ৩,২০০,০০০ টাকা। ITB, *Statutory enquiry 1926 : steel,* খণ্ড ১ (কলকাতা, ১৯২৬), পৃ. ১৫। ১৯২৭-৯ সময়কালে উৎপাদিত পিণ্ডাকার লোহার বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ ট্যারিফ বোর্ডের পরিমাপের (বছরে ৬০,০০০ টন) তুলনায় যথেষ্ট বেশি ছিল। ITB, *Report on the removal of the revenue duty on pig iron including the evidence recorded during the enquiry* (কলকাতা, ১৯৩০), পৃ. ৬-৭। ১৯২৮-৯ থেকে ১৯৩২-৩ পর্যন্ত সময়কালের বছর গুলিতে TISCO'র পিণ্ডাকার লোহার মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ('০০০ টনে) দেওয়া হলো।

১৯২৮-৯	১১৪.৯	১৯২৯-৩০	১৪৩.৩	১৯৩০.১	১১৫.১
১৯৩১-২	১৭৪.০	১৯৩২-৩	১০৩.৬		

অতএব ট্যারিফ বোর্ডের অনুমানের তুলনায় TISCO অনেক বেশি পরিমাণ পিণ্ডাকার লোহা বিক্রয় করেছিল, এবং অধিকাংশ বিক্রয় ঘটেছিল বিদেশের বাজারে। দ্রষ্টব্য : ITB, *Report on the iron and steel industry* (দিল্লী, ১৯৩৪), পৃ. ১৩৭-৮। ভারতে পিণ্ডাকার লোহার ভোগের পরিমাণ ১৯২৫-এ ছিল ১৫০,০০০ টন : ITB, *Report regarding the grant of supplemeetary protection of the steel industry* (কলকাতা, ১৯২৫), পৃ. ২৮। TISCO কর্তৃক পিণ্ডাকার লোহা বিক্রয়ের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবলম্বিত পদক্ষেপের সাক্ষ্যের জন্যে দেখুন, ITB, *Statutory enquiry 1926 : steel,* খণ্ড ৬, (কলকাতা, ১৯২৭), পৃ. ৬-৭ (IISCO-র Mr. Fairhurst-এর মৌখিক সাক্ষ্য)।

৯৯। *Annual Report of the Tata Iron and Steel Company.*

১০০। ITB, *Evidence (Report on steel),* খণ্ড ১ (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ২৬-৭, ৬৬ ও ৭১-২। ডিবেঞ্চার-মূলধনের কিছু অংশ লন্ডন থেকে ৮.২৬ শতাংশ হার সুদে সংগ্রহ করা হয়েছিল। *ঐ,* পৃ. ২৪৭-৮।

১০১। বিভিন্ন শেয়ারের দাম ও প্রিমিয়াম সম্পর্কে তথ্যের জন্যে দ্রষ্টব্য : *IIYB 1925-6* (কলকাতা, ১৯২৫), পৃ. ৪০১-২।

১০২। ITB, *Evidence (Report on steel),* খণ্ড ১ (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ২২০-২।

১০৩। ITB, *Report on steel* (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ৩৬।

১০৪। ITB, *Evidence (Report on steel),* খণ্ড ৩ (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ১৪৫-৬।

১০৫। *ঐ,* পৃ. ১৬৬-৭।

১০৬। *ঐ,* পৃ. ১৪৫, ১৪৭ ও ১৬৯।

১০৭। *ঐ,* পৃ. ১৫৫-৬।

১০৮। ITB, *Statutory enquiry 1926 : steel,* খণ্ড ৬ (কলকাতা, ১৯২৭), পৃ. ১৯ ও ৩১। ট্যারিফ বোর্ডের ১৯২৬-র রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ইস্পাতের বাণিজ্যে অনিশ্চয়তা ও মন্দা এত বেশি যে আইনের মাধ্যমে, শুধুমাত্র অগ্রণী কোম্পানিকেই নয়, সমগ্র শিল্পটিকে পরিস্থিতির উন্নতি না ঘটা পর্যন্ত সংরক্ষণের সুযোগ অব্যাহত রাখার স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি না দিলে নতুন মূলধন বিনিয়োগের সম্ভাবনা দেখা দেবে না। ITB, *Statutory enquiry 1926 : steel,* খণ্ড ১ (কলকাতা, ১৯২৬), পৃ. ৮১।

১০৯। *ঐ,* পৃ. ৩০।

১১০। ভারতীয় ইস্পাত ব্যবহারের প্রবণতা কিছুটা বোঝা যায় এই গ্রন্থের সারণি ৯.৮ ও ৯.৯ থেকে। সারণি দু'টির সংখ্যা তথ্যাদির মধ্যে নিখুঁত তুলনা সম্ভবপর নয় যেহেতু ভারতের সমুদ্রগামী বাণিজ্যের তথ্যাদি থেকে সংগৃহীত লোহা ও ইস্পাত আমদানির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অনুমানের (assumptions) বিভিন্নতা আছে। মন্দার বছরগুলিতে ইস্পাতের হ্রাসমান ব্যবহারের বর্ধিষ্ণু অংশ TISCO যোগান দিত (সারণি ৯.৮)।

১১১। দ্রষ্টব্য : Stock Exchange : *Burdett's Official Intelligence for 1890* (লন্ডন, ১৮৯০), পৃ. ১২০৯।

১১২। ITB, *Report regarding the grant of supplementary protection to the steel industry* (কলকাতা, ১৯২৫), পৃ. ২৯।

১১৩। ১৯২৩-এ ইস্পাত শিল্পের সংরক্ষণের বিষয়টির উপর ভারতীয় ট্যারিফ বোর্ডের অনুসন্ধানকালে বেঙ্গল আয়রন কোম্পানির প্রতিনিধি H. Fitzpatrick মৌখিকভাবে সাক্ষ্য দেন যে, নতুন ব্লাস্ট ফার্নেসের উৎপাদন-ক্ষমতা মাত্র ১০০ টন। ITB, *Evidence (Report on steel),* খণ্ড ৩ (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ২২৩।

১১৪। ITB, *Report regarding the grant of supplementary protection to the steel industry* (কলকাতা, ১৯২৫)।

১১৫। দীর্ঘকালীন চুক্তির ক্ষেত্রে দামগুলি চলতি দামের তুলনায় প্রায়শই যথেষ্ট পরিমাণে কম হতো, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিক্রয় সব সময়েই লাভজনক ছিল।

দ্রষ্টব্য : ITB, *Evidence (Report on steel)*, খণ্ড ১ (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ১৩৯।

১১৬। দ্রষ্টব্য : Mather, 'The Iron and Steel Industry in India', এবং Chatterton, "Industrial Progress of the Mysore State'। ১৯২৫-এ Chatterton পূর্বাভাষ দেন যে, কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে, তার কারণ, দু'বছর উৎপাদনেব পরে চলতি ব্যয় উৎপাদিত লোহার মূল্যের থেকে বেশি হবে এবং সুদ-ব্যয় ও অবচয়েব দরুন কম পক্ষে টন প্রতি ১০০ টাকা সংযোজিত হবে মোট ব্যয়ের সঙ্গে। *ঐ*, পৃ. ৭৩০।

১১৭। Baldwin, *Industrial Change in South India*, পৃ. ৭০-১।

১১৮। দ্রষ্টব্য : ITB, *Statutory enquiry 1926 : steel*, খণ্ড ৬, পৃ. ২৯ (G.H. Fairhurst'র মৌখিক সাক্ষ্য যা থেকে জানা যায় যে, IISCO জাপানের বাজারে পিগুাকার লোহা বিক্রয় কবছিল টন প্রতি ২৮ দামে (f.o.b) যখন কলকাতায় দাম ছিল টন প্রতি ৪৫ থেকে ৫০ টাকা। পিগুাকাব লোহা উৎপাদকদের মধ্যে বোঝাপড়া সম্পর্কে তথ্যের জন্যে দ্রষ্টব্য : ITB, *Report on the removal of the revenue duty on pig iron including the evidence recorded during the enquiry* (কলকাতা, ১৯৩০), পৃ. ২-৪। দেশীয় ও বিশ্ববাজাবের দামের পার্থক্যজনিত TISCO-র সুবিধা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য : *ঐ*, পৃ. ৭।

১১৯। *ঐ*, পৃ ৪।

১২০। অপর দুটি কোম্পানির তুলনায় TISCO স্থানীয বাজারে বিক্রয় বেশি করেছে। তার কারণ নিম্ন-মানের পিগুাকার লোহা উৎপাদনে উদ্বৃত্ত অন্য দুটি কোম্পানির তুলনায় TISCO-র বেশি ছিল। *ঐ*, পৃ. ১৪৫-৪৭।

১২১। *ঐ*, পৃ. ৫।

১২২। ট্যারিফ বোর্ড লক্ষ্য কবে যে, স্থির মূলধনের লিখিত মূল্য ২০ মিলিয়ন টাকা থেকে ১০ মিলিয়ন টাকায় কমানো, ৩১/২ শতাংশ অবচয়ের দরুন ছাড় এবং কার্যকরী মূলধনের উপর ৫ শতাংশ সুদ ধরা সত্ত্বেও Mysore Iron works-এর টন প্রতি পিগুাকার লোহা উৎপাদনের পূর্ণ ব্যয় ৫১.৪২ টাকায় পরিণত হয় ; অথচ কোম্পানিটি দাম পেত গড়ে টন প্রতি ৪৯ টাকা। কাজ চালু রাখার যুক্তি ছিল এই যে, কারখানা-স্তরে টন প্রতি স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতায় ভূমিকা নেওয়ার এবং উৎপাদকদের বিক্রয়-দাম অথবা আমদানি-দামের তুলনায় কম দামে ক্রেতাদের (বিশেষত দক্ষিণ ও পশ্চিত ভারতে) জন্যে যোগান অব্যাহত রাখার দিক থেকে কোম্পানিটির অবদান স্বীকার্য মহীশূরের এই লোহার কারখানাটির একটি উপজাত পণ্য ছিল acetate of lime যা আধুনিক বিস্ফোরক উৎপাদনের মূল উপাদান, এবং ট্যারিফ বোর্ড সংস্থাটির উৎপাদনের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিল ভবিষ্যতের কোনো জরুরি পরিস্থিতির প্রয়োজনের কথা ভেবে। *ঐ*, পৃ. ৮-১১।

১২৩। *ঐ*, পৃ. ৬।

১২৪। দ্রষ্টব্য : *ঐ*, পৃ. ২৯, TISCO মারফৎ জোটবদ্ধ কোম্পানিগুলির প্রস্তাবের জন্যে, এবং পৃ. ৩৮ দক্ষিণ ভারতে চাহিদার তথ্যের জন্যে (সম্ভবত রেলের চাহিদা বাদ দিয়ে পরিমাণটি ছিল ২৫,০০০ টন।

১২৫। Mysore Iron works-এর পক্ষ থেকে ১৯২৮-র ১২ই নভেম্বরে M. Veckatanaranappa প্রদত্ত মৌখিক সাক্ষ্য : *ঐ*, পৃ. ৬৪-৭৬, বিশেষত পৃ. ৬৭-৮।

১২৬। দ্রষ্টব্য : ITB, *Statutory enquiry 1933 : steel*, খণ্ড ৩ (দিল্লী, ১৯৩৫), পৃ. ৩৪৯-৬০ ; ITB, *Report on the iron and steel industry* (দিল্লী, ১৯৩৪), অধ্যায় ১২, পৃ. ১৩৬-৮।

১২৭। *ঐ*, পৃ. ১৪৩।

১২৮। ১৯৩৫ পর্যন্ত, কারখানাটির দরুন সরকারের ব্যয় হয়েছিল ৪০ মিলিয়ন টাকা। ট্যারিফ বোর্ডের ১৯৩৪-র রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকার ২,১০০,০০০ টাকা ব্যয়ে একটি ইস্পাত উৎপাদনের কারখানা স্থাপন অনুমোদন করেছিল। রিপোর্ট অনুসারে এই কারখানাটির সংযোজনের সুদ-ব্যয় মেটানোর পরেও ৮০০,০০০ টাকা অবশিষ্ট থাকবে অবচয় ও মুনাফার দাবির জন্যে'। দ্রষ্টব্য : Ranghanath Rao Sahib, 'The Recent Industrial Progress of Mysore', *JRSA*, ৮৩, সংখ্যা ৪২৯২, ৮ মার্চ ১৯৩৫, পৃ. ৩৮৪।

১২৯। ১৯২৬ পর্যন্ত রাং ঝালাই করা ইস্পাতের চাদর আমদানি করা হতো একমাত্র যুক্তরাজ্য থেকে, এবং ১৯২৭-এর স্টিল ইন্ডাস্ট্রি প্রোটেকশন অ্যাক্ট অনুসারে ঐ ধরনের পণ্য আমদানির ওপর শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল টন প্রতি ৩০ টাকা হারে। ১৯২৮-২৯-এ বেলজিয়াম থেকে যখন ঐ পণ্যের আমদানি শুরু হলো অত্যন্ত কম দামে তখন প্রাসঙ্গিক শুল্কের হার বাড়িয়ে টন প্রতি ৬৭ টাকা করা হয়েছিল। ১৯২১-এর সেপ্টেম্বরে ২৫ শতাংশ সারচার্জ আরোপের ফলে আমদানি-শুল্ক বেড়ে দাঁড়াল টন প্রতি ৮৩ টাকা ১২ আনা। ১৯৩২-এ ওটাওয়া চুক্তি সম্পাদনের পর থেকে যুক্তরাজ্য থেকে আমদানি করা ইস্পাতের চাদরের উপর শুল্কের হার তুলনামূলকভাবে কমে গেল। ওটাওয়া চুক্তির শর্ত অনুসারে ঐ পণ্যের যুক্তরাজ্য থেকে আমদানি ও অন্যান্য দেশ থেকে আমদানির মধ্যে টন প্রতি ৩০ টাকার পার্থক্য রক্ষা করা আবশ্যিক হয়ে দাঁড়াল। উপরন্তু, ভারতীয় ইস্পাতের-দণ্ড থেকে উৎপাদিত তড়িৎলেপিত চাদরের আমদানির ক্ষেত্রে পক্ষপাতমূলক নীতি গ্রহণ করা হলো। টাটা কোম্পানিও যুক্তরাজ্যের ওরিয়েন্টাল কোম্পানির সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হলো। এই চুক্তি অনুসারে ওরিয়েন্টাল কোম্পানি টাটা কোম্পানির পণ্য ব্যবহার করে চাদর উৎপাদন করবে শেষোক্ত কোম্পানিটির নামে। ১৯৩৪-এ চুক্তির এই সংযোজিত অংশটি বাতিল করা হয়েছিল, কিন্তু ব্রিটেনে উৎপাদিত তড়িৎলেপিত ইস্পাতের চাদরের আমদানি প্রাধান্য পেতে থাকল বিশেষত যখন যুক্তরাজ্যের সরকারের কাছ থেকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি মিলল যে, ভারতীয় পিণ্ডাকার লোহার আমদানি শুল্ক-মুক্ত

থাকবে। অবশ্য অল্পকালের মধ্যেই তড়িৎলেপিত ইস্পাত-চাদরের ভারতীয় বাজারের প্রধান অংশটি টাটা কোম্পানির আয়ত্তাধীন হয়। দ্রষ্টব্য Adarkar [Gov. India Pub.],*History of the Indian Tariff,* পৃ. ১৬-২২।

১৩০। *ঐ,* পৃ. ১৯-২০

১৩১। টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি লিমিটেডের *Fifty-ninth annual report (1965-6)* থেকে তথ্যগুলি নেওয়া হয়েছে।

১৩২। ১৯৩৪ থেকে ১৯৪১-এর মধ্যে কারখানার উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে TISCO ৮৫ মিলিয়ন টাকা ব্যয় করে। এর ফলে তার বিক্রয়যোগ্য ইস্পাতের উৎপাদন ৬১১,০০০ টন (১৯৩৪-৩৫) থেকে ১৯৪১-৪২-এ ৮৩৯,০০০ টনে (যুদ্ধকালীন সর্বোচ্চ উৎপাদন) পরিণত হয়। দ্রষ্টব্য : ITB, *Report on the continuance of protection to the iron and steel industry* (বোম্বাই, ১৯৪৭), পৃ ৮-৯, পরিশিষ্ট ৫। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকে TISCO-র ইস্পাত কারখানার বিক্রয়যোগ্য ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষমতা ছিল ৮০০,০০০ টনেব সামান্য কম। দ্রষ্টব্য : Elwin, *The Story of Tata Steel,* পৃ. ৭৮।

১৩৩। ITB, *Report on the iron and steel industry* (দিল্লী, ১৯৩৪), পৃ. ১৪৫।

১৩৪। ভারতে ইস্পাত বিক্রয়ের পরিসংখ্যান থেকে এই পরিস্থিতির পূর্ণ চিত্র ফুটে ওঠে না।

১৩৫। *IIYB,* ১৯৩৮-৯, পৃ. ৪৭৬-৭৮

১৩৬। স্বাধীনতার পরে মার্টিন বার্ন কোম্পানিব অভ্যুদয় ঘটেছিল তৃতীয় বৃহত্তম ব্যবসায়িক গোষ্ঠী হিসাবে : *Report of the Monopolies Inquiry Commission* ১৯৬৫ ও (দিল্লী, ১৯৬৫), পৃ. ১১৯।

১৩৭। প্রকৃত পক্ষে ১৯৪০ পর্যন্ত কাবখানাটি ইস্পাত উৎপাদন করেনি।

১৩৮। সহজেই দেখানো যায় যে, চাহিদা বৃদ্ধির হার যত বেশি হবে কারখানার চলতি ব্যয় তত কম হবে।

অনুবাদক : মনোজ কুমার সান্যাল ও মন্দিরা সান্যাল

১০

বেসরকারি ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থার প্রসার

ব্রিটিশরা ভারতে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করার সাথে সাথে জেসপ অ্যান্ড কোম্পানি এবং বার্ন অ্যান্ড কোম্পানির মতো প্রাচীনতম ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থাগুলি ভারতে ইমারত, নৌকা এবং নানা ধরনের কাঠামো নির্মাণের চাহিদা পূরণ করতে গড়ে উঠেছিল।[১] বাংলায় পাট শিল্প ও বোম্বাইয়ে বস্ত্র শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের কাঠামো গঠনের যে চাহিদা সৃষ্টি হয়েছিল তা স্বভাবতই ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছিল। কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থাগুলি টিকে থাকার জন্য মূলত নির্ভর করত রাস্তা, সেতু, সেচখাল নির্মাণ এবং রেলপথ (সরকারি ও বেসরকারি) প্রভৃতি সরকারি পূর্তকর্মের উপর। বিশেষত, যখন দুর্ভিক্ষ বা বাণিজ্যিক মন্দার ফলে বেসরকারি চাহিদায় ঘাটতি দেখা দিত।

প্রকৃতপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সমস্ত ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থারই মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ ইয়োরোপীয়দের হাতে ছিল। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের সরকারি পূর্তকর্ম এবং রেলপথ নির্মাণের কাজে তাদের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল না। যখন ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানির কাজ প্রায় শুরু হওয়ার মুখে রেলের কামরাগুলি হুগলীর মোহনায় বালির চড়ায় আটক হয়ে থাকে। তখন ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের লোকোমোটিভ বিভাগের উদ্যোগী চীফ ইঞ্জিনীয়ার জন হজসন দুটি স্থানীয় সংস্থার সহায়তায় রেলগাড়ি নির্মাণের ব্যবস্থা করেন এবং সেগুলির সাহায্যে ১৮৫৪-তে হাওড়া থেকে পাণ্ডুয়া পর্যন্ত রেল চলাচল শুরু হয়।[২] কিন্তু প্রথম যুগের বেসরকারি উদ্যোগের এই কর্মতৎপরতা পরবর্তী কালে অব্যাহত থাকেনি। রেল কোম্পানিগুলি তাদের নিজস্ব কারখানা গড়ে তুলেছিল। সেখানে মূলত মেরামত, পুনর্নির্মাণ ও একত্রীকরণের কাজ চলত। চাপে পড়ে (যেমন, দুই বিশ্বযুদ্ধের সময়ে) তারা নিজেদের জন্যে এমনকি রেলইঞ্জিনও তৈরি করত। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর সমগ্র কাল জুড়ে রেলইঞ্জিন ও রেলগাড়ির অন্যান্য অংশগুলির বেশির ভাগই ব্রিটেন থেকে আমদানি করা হতো।[৩] রেল , স্লিপার এবং লোহা ও ইস্পাতের খিলান প্রায় পুরোপুরিই আমদানি করা হতো ব্রিটেন থেকে। কোনো কোনো বছর অবশ্য অস্ট্রেলিয়া থেকেও এসব সরঞ্জাম আমদানি করা হয়েছিল।

প্রথমদিকে ভারত সরকার দেশীয় লোহা ও ইস্পাত পণ্য ক্রয়ে যথেষ্ট অনিচ্ছুক ছিল, এমনকি ১৮৮৩-তে মজুত ক্রয়নীতি (new stores purchase policy) ঘোষণার পরেও। স্থানীয় ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থাগুলি ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যের মজুত সরবরাহের টেন্ডার পেশ করার সুযোগ আদায়ের উদ্দেশ্যে ইঞ্জিনীয়ারিং অ্যান্ড ট্রেড্‌স্ অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে সরকারের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করতে থাকল।[৪] ভারত সরকার এই যুক্তির দোহাই দিত যে স্থানীয় সংস্থাগুলি যেহেতু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমদানিকৃত যন্ত্রাংশ ও কাঁচামাল ব্যবহার করত তাদের উৎপাদিত দ্রব্যকে খাঁটি ভারতীয় পণ্য হিসাবে গণ্য করা যায় না। স্পষ্টতই

মাল যোগানের ধারাবাহিক বরাত (order) প্রাপ্তির আশা না থাকলে এবং সেই বরাত যথেষ্ট পবিমাণ না হলে দেশীয় ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থাগুলির পক্ষে তাদের ব্রিটিশ প্রতিযোগীদের সঙ্গে যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ উৎপাদনে পাল্লা দিতে গেলে যে পরিমাণে বিনিয়োগ করা প্রয়োজন ছিল— তা সম্ভব ছিল না। একইভাবে, সহযোগী শিল্পগুলির বিকাশও সম্ভবপর হতো না যদি শিল্প পণ্যের জন্য সরকারি চাহিদা পূরণের উপযোগী শিল্পগুলির গড়ে না উঠত।

কলকাতার বার্ন অ্যান্ড কোম্পানি এবং বোম্বাইয়ের রিচার্ডসন অ্যান্ড ক্রুড্ডাসের মতো সংস্থাসমূহেব আন্দোলনের ফলে ইঞ্জিনীযারিং ফার্মগুলি ছোট আয়তনে রেলের গার্ডার জাতীয় সহজতর কাঠামো তৈরির কাজের টেন্ডার পেশ করার অধিকার ক্রমশ অর্জন করেছিল।[৫] ভারতীয় ইঞ্জিনীযাবিং সংস্থাগুলির প্রতি সরকাবি অফিসাররা অনেক সময় সহানুভূতিশীল থাকতেন[৬] এবং দেশীয় সংস্থাগুলিব কাছ থেকে মাল কেনার ব্যাপারেও ১৮৯৮ নাগাদ উল্লেখযোগ্য উন্নতিও ঘটেছিল। কিন্তু সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইন্ডিয়া, জন মর্লের বিরোধিতায় তা আর বেশি দূর এগোয়নি।[৭] যদিও তত্ত্বগতভাবে নতুন নীতি অনুসারে সরকারি অফিসারদের দেশীয় দ্রব্য কেনার ব্যাপারে মনোযোগ দিতে বলা হয়েছিল। ১৯৯২ সালের ১২ই সেপ্টেম্ববের আদেশের রুল ৮-এর একটি ধাবায় উল্লেখ করা হয়েছে :

ইন্ডিয়া অফিসের মাধ্যমে মাল সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সময় দিয়ে যাতে বরাত পেশ করা যায় তার জন্যে সংশ্লিষ্ট অফিসারকে পণ্যের মোট প্রয়োজন কত, তা সঠিকভাবে আঁচ করতে হবে। কোনো অফিসার যদি এই দায়িত্ব পালনে বারবার ব্যর্থ হয় তা হলে তা স্থানীয় সরকার বা কর্তৃপক্ষের নজবে আনতে হবে এবং দোষী অফিসারের উপর ন্যস্ত ক্ষমতা হ্রাস বা নাকচ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

এইভাবে শাস্তির ভয় দেখানো হলো মূলত সেই সমস্ত অফিসারদের যাঁরা ইন্ডিয়া অফিসের মাধ্যমে বরাত পাঠাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং এর ফলে অনেক অফিসারই সরাসরি ইন্ডিয়া অফিসকে বরাত তৈরি করতে দেওয়াকে সহজ ও নিরাপদ মনে করেছিলেন (যেহেতু তার ফলে মূল্যবেদন পত্র (tenders) পরীক্ষার ঝামেলা থেকে রক্ষা পাওয়া যেত)।[৮] এজন্য স্থানীয় ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থাগুলি কেবলমাত্র তাড়াহুড়ো আছে এমন এবং কদাচিৎ ছোটখাটো মাপের বরাতগুলো পেত।[৯] এই অবস্থা চলেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত। তারপরে অবশ্য সরকারি চাহিদা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় অবস্থা পুরোপুরি বদলে গিয়েছিল।

যুদ্ধের সময় ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থাগুলি ব্যস্ত ছিল মুখ্যত সরকারের সামরিক প্রয়োজন সরবরাহে, যার মধ্যে ছিল গোলাবরুদের বাক্স, বিভিন্ন ধরনের ঢালাই দ্রব্য এবং বেশ কিছু সংখ্যক জলযান।[১০] যদিও এই চাহিদা সমস্ত ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানাকে কর্মব্যস্ত করে রাখে এবং নতুন সংস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দীপণা যোগায়, সরকার নিজের প্রয়োজনে প্রায় সমস্ত ইস্পাতের যোগান কুক্ষিগত করে রাখায় ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানাগুলি কাঁচামালের অভাবে পড়ে এবং কাজকর্ম বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়।[১১]

১৯১১ এবং ১৯২১ সালের আদমসুমারির সাথে সাথে গৃহীত শিল্প-সুমারি কিছু স্পষ্ট কারণেই সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য না হলেও (যেমন, বিভিন্ন পেশার বা বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের যথাযথ সংজ্ঞার অভাব, বারমেসে বা ঋতুকালীন পেশায় নিয়োগের পরিমাণে ওঠানামা প্রকাশে ব্যর্থতা), অন্তত এটুকু বলা যায়, ১৯১১ এবং ১৯২১-এর মধ্যে মেশিন ও

ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানায় নিয়োজিতের সংখ্যা ২৩,১৪৭ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৮২,১৮২-তে এবং ধাতুশিল্পে ৭১,০৪৫ থেকে ১৬৯,৬৯৩-এ। তুলনীয় অঙ্কের ভিত্তিতে বলা যায়, ধাতুশিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১৯১১-য় ছিল ৭১,০৪৫, ১৯২১-এ ১৬৪,৬৮০ এবং ঐ সময়ের ব্যবধানে ধাতু, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদির কারখানায় নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ২৩,১৪৭ থেকে বেড়ে হয়েছিল ৮১,৫৯৮ (এর মুখ্য কারণ ছিল কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি, অবশ্য কারখানা পিছু শ্রমিকের সংখ্যাও কিছুটা বেড়েছিল)।[১২]

যুদ্ধেব অব্যবহিত পরেই ইঞ্জিনীয়ারীং শিল্পে অনেক নতুন কোম্পানি গড়ে উঠেছিল হয় পুরনো সংস্থাগুলিকে অধিগ্রহণ করে তার সম্প্রসারণ ঘটাতে বা নতুন বস্ত্রশিল্পের যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ উৎপাদন করার জন্যে। কিছু সংখ্যক কোম্পানি গড়ে উঠেছিল টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানির জামশেদপুরের কাবখানার সহায়ক হিসাবে। এই কোম্পানিগুলিতে যে TISCO'র প্রত্যক্ষ আর্থিক স্বার্থ জড়িত ছিল তা নয় : সাধারণত TISCO সংশ্লিষ্ট কোম্পানিকে প্রয়োজনীয় জমি ইজারা দিত এবং তার সাথে বিদ্যুৎ, লোহা ও ইস্পাত পিণ্ড বা ইস্পাত দণ্ডের মতো কাঁচামাল সরবরাহের জন্য দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিতে আবদ্ধ হতো। এইভাবে ১৯২৩ সাল অবধি যে কোম্পানিগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলি হলো : (১) এনামেল্ড আয়রনওয়্যার লিমিটেড, (২) দি ইন্ডিয়ান কেবল্ কোম্পানি লিমিটেড, (৩) দি টিনপ্লেট কোম্পানি অব ইন্ডিয়া লিমিটেড, (৪) দি কালমনি ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড (পাট-বয়ন যন্ত্র প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে), (৫) দি এগ্রিকালচারাল ইম্‌প্লিমেন্ট্‌স্ কোম্পানি লিমিটেড, (৬) দি ইন্ডিয়ান স্টিল ওয়্যার প্রোডাক্ট্‌স্ লিমিটেড, এবং (৭) দি পেনিন্‌সুলার লোকোমোটিভ কোম্পানি লিমিটেড। ১৯১৮-য় আরও অনেক বড় প্রকল্প বিবেচিত হয়েছিল কিন্তু, হয়তো আভ্যন্তরীণ চাহিদার পরিমাপ সম্পর্কে সঠিক ধারণা ছিল না এবং বৈদেশিব প্রতিযোগিতার তীব্রতা প্রতিহত করার মতো বাহ্যিক ব্যয়-সঙ্কোচের সুযোগ যথেষ্ট প্রবল ছিল না।[১৩] কাঠামো বানানোর ইস্পাতের ক্ষেত্রে ইয়োরোপীয় দেশগুলি থেকে প্রতিযোগিতা মূল ধাতুসমূহ ও মেশিনারি দ্রব্যের মূল্য হ্রাস; বাজেট ঘটিত প্রতিবন্ধকতায় বিড়ম্বিত সরকারি পুনর্নির্মাণের দ্বিধাগ্রস্ত নীতি, বিনিময় হারে অস্বাভাবিক রকমের ওঠানামা এবং ১৯২৪ পর্যন্ত কোনো রকম সরকারি সহায়তার অভাব অনেক নতুন কোম্পানিকেই গুটানোর পথ দেখতে হয়েছিল।[১৪]

TISCO যখন বৈদেশিক প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে ভারতীয় ইস্পাত শিল্পের সংরক্ষণের দাবি জানায় ঠিক একই সময় অনেক ইঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠানও ইন্ডিয়ান ট্যারিফ বোর্ডে কাছে আবেদন করেছিল প্রকৃতি বা অন্তত ক্ষতিপূরণমূলক সংরক্ষণের জন্যে। এ প্রতিষ্ঠানগুলি উৎপাদন (বা তার প্রস্তাব) করত কাঠামো বানানোর ইস্পাত ও জোড়া লাগানো (Structural or fabricated steel) ইস্পাত (বার্ন অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড, জেসপ অ্যান্ড কো. লি.), রেলওয়ে ওয়াগন (যেমন, বার্ন অ্যান্ড কোম্পানি লি., জেসপ অ্যান্ড কোম্পানি লি., ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড ওয়াগন কো. লি.), এনামেল্ড আয়রনওয়্যার (জামশেদপুরে এনামেল্ড আয়রনওয়্যার লি. এবং হাওড়া জেলার সালকিয়ায় অবস্থিত পাইওনিয়ার এনামেল অ্যান্ড আয়রন ওয়ার্কস লি.), তার ও পেরেক (দি ইন্ডিয়ান স্টিল ওয়াইয়ার প্রোডাক্ট্‌স্ লি.), কৃষি ও খনির কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি (দি এগ্রিকালচারাল ইম্‌প্লিমেন্ট্‌স্ কোম্পানি লিমিটেড এবং কিরলোস্কার ব্রাদার্স), রেল ইঞ্জিন (দি পেনিনসুলার লোকোমোটিভ কোম্পানি লি.) এবং ঢালাই ইস্পাত (হুকমচাঁদ স্টিল ওয়ার্ক্‌স কোম্পানি, কলকাতা)। ভারতের বৃহৎ

ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থাগুলির প্রতিনিধি, ইন্ডিয়ান ইঞ্জিনীয়ারিং অ্যাসোসিয়েশন চেয়েছিল ইস্পাতশিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়া হোক কিন্তু কেবলমাত্র অনুদানের মাধ্যমে : TISCO'র কারখানা যদি সংরক্ষণের অভাবে বন্ধ হয়ে যেত তাহলে তাদের মতে, 'ভারতের শিল্পোন্নয়ন অন্তত পঁচিশ বছর পিছিয়ে যাবে।'[১৫] এই অ্যাসোসিয়েশন সামগ্রিকভাবে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের জন্যেও সংরক্ষণ দাবি করেছিল, তবে তারা চেয়েছিল নিশ্চিত দামের প্রতিশ্রুতি, আমদানি শুল্ক বা অনুদানের ভিত্তিতে সংরক্ষণ নয়।[১৬]

১৯২৩-এ ভারতীয় রেলওয়ের জন্যে প্রস্তুতকারী ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের অবস্থা খতিয়ে দেখেছিল ভারতীয় আইনসভার সদস্যদের একটি কমিটি। পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে রেলওয়েকে পূর্বের মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত একটি বিশাল অঙ্কের (১,৫০০ মিলিয়ন টাকা) বরাদ্দ অর্থ ব্যয়ে ও প্রয়োজনীয় শিল্প সমূহের প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দানে ভারত সরকারের কী কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত তা বিবেচনার জন্যে ঐ কমিটি নিয়োজিত হয়েছিল।[১৭] কমিটি সরকারি ক্রয় নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নিয়মকানুনকে (যেগুলি গৃহীত হয়েছিল ১৯২০সালের স্টোর্স পারচেজ কমিটির সুপারিশক্রমে) কিছুটা শিথিল করার ও সমস্ত ক্রীত দ্রব্যের মুল্য স্থিবীকরণে পরিবহন ব্যয় ও চলতি আমদানি শুল্কাদিতে হিসাবের মধ্যে ধরার জন্যে সুপারিশ করেছিল। শেষোক্ত সুপারিশটি অবশ্য চলতি নিয়মকানুনেই (স্টোর পারচেজ রুলসের ১০ নম্বর ধারা) স্বীকৃত ছিল।[১৮] এই কমিটি আরও লক্ষ্য করে যে বিধিগুলির প্রয়োগ অনেক অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে সেই সব শিল্পগুলিতে 'যেগুলি নিযুক্ত ছিল জোড়া লাগানোর কাজে এবং বিশাল পরিমাণে দক্ষ শ্রমিকের নিয়োগে'। ফিসকাল কমিশনের রিপোর্টের অনুচ্ছেদ ৬৫-তে প্রধান অসুবিধাটির বর্ণনা আছে : 'এই ধরনের শিল্পগুলির উন্নয়নে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হয়।'[১৯] তাদের প্রাথমিক মূলধনেরও বেশ প্রয়োজন ছিল। স্বল্প পরিমাণ উৎপাদন শুরুতে অতিরিক্ত অপরিহার্য ব্যয় (overhead costs) এবং বিদেশ থেকে দক্ষ শ্রম আমদানি, এই সব সমস্যাও শিল্পগুলির ছিল। 'বস্তুত রেলের প্রয়োজনীয় কাঠামো জাতীয় সরঞ্জাম উৎপাদনের উদ্দেশ্যে নির্মিত ভারতের নতুন শিল্পগুলি বিদেশের প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলির সাথে কোনো সাহায্য ছাড়া প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে সক্ষম হবে না।'[২০] রেলওয়ে বোর্ডের দেওয়া ৩,১৩২টি ওয়াগানের যে টেন্ডার ডাকা হয়েছিল তাতে দেখা গেল, সবচেয়ে কম ভারতীয় দরটিও ইংরেজদের সর্বনিম্ন টেন্ডারের দরের (যে দরের মধ্যে বহিঃ শুল্ক ও পরিবহন ব্যয় ধবা হয়েছিল) তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ বেশি। এই উদাহরণ দেখিয়ে কমিটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় : 'বর্তমানে দেশীয় শিল্পগুলির উন্নয়ন ঘটাতে হলে বা তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হলে সাময়িক ভাবে কোনো প্রকার সংরক্ষণ বা সরকারি সহায়তা ছাড়া উপায় নেই।'[২১] অতএব, ১৯২৩-এর মধ্যে সাধারণভাবে স্বীকৃত হলো যে ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পকে বিলুপ্তির পথ থেকে রক্ষা করতে হলে সরকারি সহায়তার একান্ত প্রয়োজন।

ইন্ডিয়ান ইঞ্জিনীয়ারিং অ্যাসোসিয়েশন যাদের প্রতিনিধিত্ব করত, সেই বৃহৎ ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থাগুলিতে নিযুক্ত পুঁজির পরিমাণ ছিল ১৯২৩-এ ১২০ মিলিয়ন টাকা এবং ক্ষুদ্রতর কারখানাগুলি সহ মোট শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৭৫,০০০ জন।[২২] এই সমস্ত কারণে ইন্ডিয়ান ট্যারিফ বোর্ড মনে করেছিল যে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প বাস্তবিকই সংরক্ষণের দাবি রাখে। এছাড়া

অন্যান্য কারণও ছিল—যেমন, এই শিল্প ভারতীয় ইস্পাতের এক সম্ভাবনাময় আভ্যন্তরীণ বাজার হিসাবে কাজ করত এবং দীর্ঘদিন ভারতের সেবায় নিয়োজিত ছিল।

দ্রব্যের সংখ্যাধিক্য, উৎপাদনের আসল ব্যয় ও হিসাবরক্ষার পদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব এবং প্রতিযোগিতার ভয়ে সংস্থাগুলির মধ্যে গোপনীয়তা রক্ষার চেষ্টা, ইত্যাদি কারণে বোর্ডের পক্ষে বিভিন্ন প্রকার ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যের গড় ব্যয়ের হিসাব পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। বোর্ড সেজন্য বার্ন অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড বা জেসপ অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেডের মতো বড় বড় সংস্থাগুলির ব্যয়ের হিসাবের উপর আস্থা রাখত। বোর্ড লক্ষ্য করেছিল যে, ইস্পাতজাত দ্রব্যগুলির মধ্যে সেতু ও গৃহনির্মাণ সামগ্রীর ক্ষেত্রে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা ছিল সবচেয়ে তীব্র। ভারতীয় সংস্থাগুলির পক্ষে টিকে থাকাই কষ্টকর ছিল। বোর্ড কয়লাখনির টব বা ঐ ধরনের চাদর নির্মিত ইস্পাত দ্রব্য প্রস্তুতকাবী শিল্পকেও সংরক্ষণের আওতায় নিয়ে এল এবং ভারতীয় প্লেটের বাজার তৈরির সুযোগ ঘটল। TISCO সেদিকে তখন আকৃষ্ট হচ্ছিল।

বোর্ডের হিসাবে সেতু নির্মাণে প্রয়োজনীয় ইস্পাত দ্রব্যের গড় আমদানি-দাম টন প্রতি ২৫০ টাকা এবং এরকম ভারতীয় দ্রব্যের গড় উৎপাদন-ব্যয় ছিল টন প্রতি ৩১০ টাকা। সুতরাং, ট্যারিফ বোর্ড নানা আকারের ইস্পাত দ্রব্যের উপর ২৫ শতাংশ হারে শুল্কের প্রস্তাব করেছিল। টন প্রতি ৬২ টাকা শুল্কের মধ্যে ৩৩ টাকা শুধুমাত্র অবিন্যস্ত ইস্পাতের (Unfebricated Steel) উপর দেয় শুল্কের জন্যে ক্ষতিপূরণ হিসাবে গণ্য করা যায়। বাকি ২৯ টাকা ছিল ইস্পাত দ্রব্য উৎপাদনে প্রদত্ত সংরক্ষণের প্রকৃত পরিমাণ। (সব রকমের লোহা ও ইস্পাতজাত পণ্য এবং কাঁচামালের উপর ধার্য শুল্কের হার ১৯২২ সালেই ২$^{১}/_{২}$ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১০ শতাংশ করা হয়েছিল)।[২৩]

ওয়াগন নির্মাণ শিল্পকে ইন্ডিয়ান ট্যারিফ বোর্ড আলাদাভাবে বিবেচনা করেছিল। যুদ্ধের আগে কলকাতার বার্ন অ্যান্ড কোম্পানি ও জেসপ অ্যান্ড কোম্পানি এবং করাচির হারম্যান অ্যান্ড মোহাট্টা কোম্পানি তাদের ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানাতে ওয়াগান প্রস্তুত করলেও স্বতন্ত্র ওয়াগান শিল্পের প্রকৃত সূচনা হয়েছিল ১৯১৮ সালে বার্ন অ্যান্ড কোম্পানির পরিচালনায় ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড ওয়াগান কোম্পানি লিমিটেডের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে। এই শিল্প প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষভাবে প্রেরণা যুগিয়েছিল ভারত সবকারের ১লা মার্চ, ১৯১৮ তারিখের একটি ঘোষণা। আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, ঐ তারিখ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত বছরে ২,৫০০ ব্রডগেজের উপযুক্ত ওয়াগন ও ৫০০ মিটার ন্যারোগেজের উপযোগী ওয়াগান ভারত থেকে কেনার।[২৪] ওয়াগন তৈরির কারখানাটি স্থাপিত হয়েছিল IISCO'র বার্নপুর কারখানার কাছেই এবং IISCO থেকে কারখানাটিকে ওয়াগন নির্মাণের উপযুক্ত লোহা পিণ্ড সরবরাহের চুক্তিও হয়েছিল। স্ট্যান্ডার্ড ওয়াগন কোম্পানি বুঝতে পেরেছিল যে, ব্রিটিশ উৎপাদকদের সঙ্গে দামের প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারবে না এবং রেলের কিছু মূল্যবান বরাত তার হাতছাড়া হয়ে যায়১৯২২-এ। ব্রিটিশ উৎপাদকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠার জন্য উৎপাদন ব্যয়ের যে পরিমাণ হ্রাস ঘটানোর প্রয়োজন ছিল কোম্পানিটি তা ঘটাতে পারেনি। বছরে কম পক্ষে ১,৫০০ ওয়াগান তৈরি করতে না পারলে উৎপাদন-ব্যয় যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে ফেলা সম্ভবপর ছিল না এবং ঐ লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে হলে প্রাথমিক স্তরে রেলের কাছ থেকে বিশেষ শর্তে বরাত পাওয়া আবশ্যকীয় ছিল।[২৫] কিন্তু রেলওয়ে বোর্ড সে রকম কোনো বিশেষ শর্তে রাজি হয়নি। ইতিমধ্যে ওয়াগানের

আমদানি-দাম আরও কমে যায় এবং তার ফলে, ওয়াগান-প্রস্তুতকারী সমস্ত সংস্থা শুল্ক সংরক্ষণ বা অনুদানের জন্যে সরকারি সাহায্যের আবেদন করে।

ভারতীয় ফার্মগুলি দাবি করল, ১৯১৪ পর্যন্ত তারা ব্রিটিশ ফার্মগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারত। কিন্তু তারা শেষে দেখল, ১৯২৩-এ একটি নির্দিষ্ট ধরনের ওয়াগনের সর্বনিম্ন ব্রিটিশ টেন্ডার ৩,৫০০ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে ভারতীয়দের ওয়াগন প্রতি সর্বনিম্ন উৎপাদন-ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৫,০০০ টাকা। ব্রিটেনে মজুরি বৃদ্ধির হার ভারতের তুলনায় বেশি হওয়া সত্ত্বেও পরিস্থিতি ঐরকমই ছিল। এই বিষয়টিকে ভারতীয় ফার্মগুলি দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরে বলে যে ব্রিটিশ উৎপাদকরা ভারতীয় ওয়াগন শিল্পকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ধ্বংস করতে চেয়েছিল।

ট্যারিফ বোর্ডের অবশ্য যুক্তি ছিল, যুদ্ধের আগে ভারতীয় সংস্থাগুলি কেবলমাত্র জরুরি অথবা এত ছোট বরাত পেত যেগুলি ব্রিটিশ উৎপাদকদের পক্ষে লাভজনক ছিল না। তাছাড়া, ব্রিটেন ওয়াগন-প্রস্তুতপ্রণালীতে যে অগ্রগতি ঘটেছিল তা ভারতীয় ফার্মগুলির হিসাবের মধ্যে ছিল না যদিও তার ফলেই ব্রিটিশ-উৎপাদকরা প্রচুর পরিমাণে ব্যয় কমাতে ও অত কম হারে টেন্ডার দিতে সক্ষম হয়েছিল। তীব্র প্রতিযেগিতার কালে সস্তায় কাঁচামাল কেনার ক্ষমতাকেও হিসাবের মধ্যে ধরতে হতো।

ট্যারিফ বোর্ড ওয়াগান নির্মাণ শিল্পকে অনুদানের মাধ্যমে সরকারি সহায়তা দেওয়ার সুপারিশ করল কারণ অন্যথায় রেলের ব্যয় বেড়ে যেত। বোর্ড মনে করেছিল, ভারতীয় ওয়াগান প্রস্তুতকারকদের জন্যে মোটামুটি একটা ধারাবাহিক বরাতের নিশ্চয়তা থাকা দরকার। সময়ের সাথে সাথে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বে এবং বেশি সংখ্যক বরাতের যোগান দেওয়াও সম্ভব হবে। তারা আরও আশা করেছিল, যখন অভিজ্ঞতা বাড়বে ও উৎপাদনও বাড়বে তখন উৎপাদন-ব্যয কমতে থাকবে। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে বোর্ড ভারতে প্রস্তুত ওয়াগনেব উপর সারণি ১০.১-এ বর্ণিত হারে অনুদান সুপারিশ করেছিল।[২৬]

সারণি ১০.১ ১৯২৪ সালে রেলওয়ে ওয়াগান শিল্পের জন্যে আই. টি. বি. প্রস্তাবিত অনুদানের হার

	অনুদান দেওয়া হবে এমন ওয়াগনের সংখ্যা	ওয়াগন প্রতি অনুদানের পরিমাণ (টাকায়)	অনুদানের জন্যে মোট ব্যয় (হাজার টাকা)
প্রথম বছর	৮০০	৮৫০	৬৮০
দ্বিতীয় বছর	১০০০	৭০০	৭০০
তৃতীয় বছর	১২০০	৫৮০	৬৯৬
চতুর্থ বছর	১৪০০	৫০০	৭০০
পঞ্চম বছর	১৬০০	৪০০	৭০৪

ভারতীয় রেল ইঞ্জিন শিল্পকে শুল্ক-সংরক্ষণের সুযোগ দেওয়া উচিত কিনা, এই প্রশ্নের মীমাংসায়, ইন্ডিয়ান ট্যারিফ বোর্ড তীব্রভাবে ইন্ডিয়ান ফিসক্যাল কমিশনের দ্বারা নির্ধারিত একটি শর্তের বিরোধিতা করে। শর্তটি অনুযায়ী সংরক্ষণের যোগ্যতা অর্জন করতে হলে

সংশ্লিষ্ট শিল্পটির হাতে বড় দেশীয় বাজার থাকা চাই। ১৯২১-এর ৩০ শে সেপ্টেম্বরের ভারত সরকাবের ঘোষণায় প্রত্যক্ষভাবে সাড়া দিয়ে দি পেনিনসুলার লোকোমোটিভ কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ঘোষণা অনুসারে সরকার প্রতিশ্রুতি দেয় যে, রেল ইঞ্জিন ও ইঞ্জিনের বয়লারের প্রয়োজন মেটাতে বাৎসরিক টেন্ডার আহ্বান করা হবে ১৯২৩ থেকে শুরু করে বারো বছর পর্যন্ত। সরকারের হিসাব ছিল, ১৯২৩ ও ১৯২৪-এ ১৬০ টি রেল ইঞ্জিন ও সমসংখ্যক অতিরিক্ত বয়লার এবং তার পরবর্তী সময়ে ৪০০ টি ইঞ্জিন ও ৪০০-টি অতিরিক্ত বয়লারের প্রয়োজন হবে।[২৭]

কার, স্টুয়ার্ট অ্যান্ড কোম্পানি নামে এক ব্রিটিশ ওয়াগন ও রেল ইঞ্জিন প্রস্তুতকারী সংস্থার (যাদের কারখানা ছিল স্টোক-অন-ট্রেন্ট-এ) পরিচালনায়, ৬ মিলিয়ন টাকার পুঁজি নিয়ে, ১৯২১-এর ডিসেম্বর ৬-এ দি পেনিনসুলার লোকোমোটিভ কোম্পানি লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কোম্পানিটির পরিকল্পনা ছিল শেষতক বাৎসরিক ৩০০-টি রেল ইঞ্জিন তৈরির। তার কারখানা স্থাপনের প্রারম্ভিক ব্যয়ের পরিমাণ (৫ মিলিয়ন টাকা) ব্রিটেনে অনুরূপ কারখানা স্থাপনের ব্যয়ের চেয়েও ৩৫ শতাংশ বেশি ছিল। ১৯২৩-এ ২-৮-০ ধরনের রেল ইঞ্জিনের উৎপাদন-ব্যয় বা ইংল্যান্ডের বন্দরে টেন্ডার f.o.b. মূল্য ছিল ৬,৪০০ পাউন্ড। কোম্পানির হিসাবে ভারতে তার অতিরিক্ত ব্যয় ছিল ২৭৫৩ পাউন্ড (ট্যারিফ বোর্ড অবশ্য এই হিসাবকে অতিরঞ্জিত মনে করেছিল)। শুরুতে কোম্পানিটিকে রেল ইঞ্জিনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের (বিশেষ করে বয়লার) একটি বড় পবিমাণ আমদানি করতে হতো, যদিও ওজনের হিসাবে যন্ত্রাংশের ৫০ শতাংশের বেশি তার নিজের কারখানায় তৈরি কবতে পাবত অথবা দেশের অন্য ঢালাই ও পিটাই ইস্পাত-দ্রব্য প্রস্তুতকারী সংস্থা থেকে কিনত। কিন্তু কোম্পানিটি অবশ্য আশা করেছিল, এক সময়ে রেল ইঞ্জিনের পার্টস বা যন্ত্রাংশের বেশির ভাগই ভারতে প্রস্তুত করা যাবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করে ও উচ্চতর পদগুলিতে ভারতীযদেব নিয়োগ বাড়িয়ে উৎপাদন-ব্যয় কমিয়ে ফেলতে পারবে। ইতিমধ্যে প্রতিযোগিতামূলক দাম উদ্‌ধৃত করা সম্ভবপর ছিল না, অর্ডার নেওয়াও হচ্ছিল না এবং এই সব কারণে যুক্তরাজ্যে নিয়োজিত তত্ত্বাবধায়ক ও কারিগরি কর্মীদের ফিরিয়ে আনা হয়নি কাজে। এই সময়ে কোম্পানিটি শুল্ক-সংরক্ষণ বা দান পাওয়ার আবেদন জানায়।[২৮]

ভারতীয় ট্যারিফ বোর্ড রেল ইঞ্জিন শিল্পের সংরক্ষণের পক্ষে প্রায় সব যুক্তিকেই সমর্থন করেছিল। তাদের মোটামুটি আন্দাজ ছিল যে শিল্পটির জন্যে সংবক্ষণের প্রয়োজনীয় মাত্রা অস্ট্রেলিয়া (যেখানে আমদানিকৃত রেল ইঞ্জিনের উপর মূল্যানুসারে ২৭$^{1}/_{2}$ শতাংশ শুল্ক ধার্য ছিল) ও কানাডার (২২$^{1}/_{2}$ শতাংশ শুল্ক) মতো দেশে চালু সংরক্ষণের থেকে বেশি হবে না। অবশ্য বোর্ডের মতে চাহিদার অবস্থার আমুল পরিবর্তন ঘটেছিল ১৯২১ থেকে। তার কারণ,সরকার ব্যয়সংকোচ সংক্রান্ত কমিটির (ইনচকেপ কমিটির) সুপারিশে রেল খাতে মূলধন বিনিয়োগ কর্মসূচি ব্যাপকভাবে কাটছাঁট করে। মি. হিন্ডলে রেলওয়ে বোর্ডের পক্ষে প্রামাণিক তথ্য দিয়ে ট্যারিফ বোর্ডে জানিয়েছিলেন যে ১৯২৪-২৫ বছরটিতে মাত্র ৬০-টি রেলওয়ে ইঞ্জিনের প্রয়োজন ছিল এবং পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে কখনও এই সংখ্যা ১০০-তে পৌঁছবে কিনা বলে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়।

অর্থনৈতিক দিক থেকে সফল হতে হলে একটি রেল ইঞ্জিন কারখানায় বছরে অন্তত ২০০টি ইঞ্জিন অবশ্যই তৈরি হওয়া দরকার। কিন্তু রেলের আনুমানিক চাহিদা এর তুলনায়

অনেক কম ছিল। এমনকি কারখানাটি দেশের প্রয়োজনীয় সমস্ত রেল ইঞ্জিনের বরাত পেলেও যুক্তিসঙ্গত ব্যয়ে উৎপাদন সম্ভবপর ছিল না। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে দেশের প্রধান তিন ধরনের গেজের রেলপথে চালানোর উপযোগী বিভিন্ন নকশার ইঞ্জিন তৈরি করতে হতো। অদূর ভবিষ্যতে চাহিদা বেড়ে যাওয়ার সে রকম কোনো আশা ছিল না। ফলে, ভারতীয় ট্যারিফ বোর্ড রেল ইঞ্জিন শিল্পের জন্য সংরক্ষণের সুপারিশ করতে পারেনি এবং স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত কোনো বেসরকারি (বা সরকারি)রেল-ইঞ্জিন কারখানা শিল্পের উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটেনি।[২৯]

ট্যারিফ বোর্ড ইঞ্জিনীযারিং শিল্পের আরও দুটি শাখায় শুল্ক-সংরক্ষণের সুযোগ দিতে অস্বীকার করেছিল। যেমন, ঢালাই ইস্পাত দ্রব্য ও এনামেল দ্রব্য (কলাইয়ের বাসন কোসন)। ঢালাই ইস্পাতদ্রব্য দুরকম পদ্ধতিতে তৈরি হতো। পরিবর্তক পদ্ধতিতে ('Converter' process) কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হতো অত্যন্ত নিম্নমাত্রার ফসফরাস বিশিষ্ট লৌহপিণ্ড এবং অন্যটিতে (বৈদ্যুতিক পদ্ধতি) কাঁচামাল ছিল ইস্পাতের ছাঁট। বোর্ডের মতে পরিবর্তক পদ্ধতি অবলম্বন করলে সংরক্ষণের একটি শর্ত পূরণ হতো না। শর্তটি হলো ভারতীয় কাঁচামাল ব্যবহার করা। কিন্তু অত্যন্ত নিম্নমাত্রার ফসফরাসযুক্ত লৌহ পিণ্ড ভারতে কখনও তৈরি হবে এমন সম্ভাবনা ছিল না। বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে উৎপাদনের জন্য যে কাঁচামালের প্রয়োজন ছিল তা কলকাতা বা আশেপাশের রেলওয়ে বা অন্যান্য শিল্প থেকে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। এর গড় দাম (টন প্রতি ৩০ টাকা) ছিল অন্যান্য দেশে ঐ ধরনের কাঁচামালের চলতি দামের চেয়ে কম।[৩০] বোর্ডের পক্ষে ঢালাই ইস্পাতদ্রব্যের চাহিদার পরিমাপ করা বেশ মুশকিল ছিল। বিভিন্ন রেলওয়ে কারখানায় ঢালাই ইস্পাতদ্রব্যের প্রকৃত উৎপাদন এবং রেলওয়ে ওয়াগন (ঢালাই ইস্পাতদ্রব্য ওয়াগন এবং যাত্রীবাহী রেলগাড়ি উৎপাদনে প্রধান উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হতো) শিল্পের সম্ভাব্য বৃদ্ধির হারকে হিসাবের মধ্যে এনে বোর্ড সন্দেহ প্রকাশ করে, সম্ভাব্য চাহিদা ঢালাই ইস্পাতদ্রব্যের দুই প্রধান উৎপাদকদের (যাদের সম্মিলিত মাসিক উৎপাদন ছিল ৪৫০ টন) পুরোপুরি নিয়োজিত থাকার পক্ষে যথেষ্ট কিনা। এছাড়াও সমস্যা ছিল ঢালাই ইস্পাত দ্রব্য সব সময়েই ব্যবহৃত হতো অন্য কোনো দ্রব্যের অংশ হিসাবে। রেলইঞ্জিনে ব্যবহৃত কোনো যন্ত্রের জন্যে কোনো নীতি বা বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রাংশ ও যন্ত্রকে পৃথকভাবে দেখার কোনো বিশেষ নীতি গ্রহণ না করে ট্যারিফ বোর্ডের পক্ষে সাধারণভাবে সুপারিশ করা সম্ভব ছিল না। বোর্ড সমস্যাটিকে এইভাবে সংক্ষেপে দেখায় : 'ঢালাই ইস্পাত দ্রব্যের মোট উৎপাদন স্পষ্টতই চাহিদার পরিমাণের দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং উৎপাদন-ব্যয়ও একই সঙ্গে নির্ভর করে মূলত উৎপাদনের পরিমাণের উপর। উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা ছাড়া উৎপাদন-ব্যয় সম্পর্কেও ধারণা করা যায় না। সেই জন্যে এখন আমরা কোনো সাধারণ সুপারিশ পেশ করতে পারছি না।'[৩১]

এনামেল দ্রব্যের ক্ষেত্রে কোনো সংরক্ষণের সুযোগ না দেওয়ার কারণগুলিকে আই. টি. বি. সংক্ষেপে নিম্নলিখিতভাবে বিবৃত করেছিল :

'বাজারটি তেমন কিছু বড় নয়, এবং যদি তাকে আরও নিয়ন্ত্রিত করা হয়, শিল্পটির উন্নতি হবে না, বরং তার সম্ভবনাকে নষ্ট করা হবে। কার্মগুলিকে শুল্ক ছাড়াই ইস্পাতের চাদর আমদানি করতে দেওয়ার প্রস্তাবকেও আমরা সমর্থন করতে পারছি না। কিছু ব্যবহারিক সমস্যা বড় হয়ে দেখা দেবে যেহেতু চূড়ান্ত দ্রব্যগুলি উৎপাদনের পরিমাণের অনুপাতে

ইস্পাত চাদরের উপর ধার্য আমদানি-শুল্কের উপর সংস্থাগুলিকে কী ভাবে ছাড় বা রিবেট দেওয়া হবে তা বলা হয়নি। তাছাড়া, জামশেদপুরে তৈরি হতে পারে এমন ধরনের ইস্পাতের চাদরের ক্ষেত্রে শুল্ক থেকে ছাড় দেওয়ার প্রস্তাবটি ইস্পাত শিল্পের সংরক্ষণের ব্যবস্থাটির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হবে। TISCO এনামেল দ্রব্যের উৎপাদনোপযোগী চাদরের যোগান দেওয়ার উদ্দেশ্যে এনামেলড্ আয়রন ওয়্যার লিমিটেডের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে এবং এই কাজে তাদের ক্ষমতা সম্পর্কে যে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে তার কোনো সুনির্দিষ্ট ভিত্তি নেই বলেই আমরা মনে করি। টিনপ্লেট কোম্পানি ইতিমধ্যেই জামশেদপুরেই তৈরি ইস্পাত থেকেই প্রয়োজনীয় ও উন্নতমানের চাদর তৈরি করেছে এবং TISCO-রও সে ক্ষেত্রে সফল না হওয়ার কোনো কারণ নেই।'[৩২]

এই রকম স্পষ্ট কিছু কারণ ছাড়াও, প্রাসঙ্গিক অধ্যায়ে প্রদত্ত যুক্তিগুলি থেকে বোঝা যায় যে আই টি বি প্রকৃত উৎপাদকদের (তিনটি সংস্থা যাদের সম্মিলিত পুঁজি জামশেদপুরের TISCO'র সহায়ক এনামেলড্ আয়রন ওয়্যার লিমিটেডের পুঁজির (৯,০০০ টাকা) থেকেও কম) আর্থিক বা তাদের নিজেদের চাহিদার সম্পর্কে আগাম অনুমান করার ক্ষমতাকে সন্তোষজনক বলে মনে করেনি। সম্ভবত তারা এও সন্দেহ করেছিল যে, TISCO'র সহায়ক কারখানাটি পুরোপুরি চালু হলে এই সব ছোটখাটো সংস্থাগুলি সমস্যায় পড়বে। বস্তুত পক্ষে, দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে কোনো শক্তিশালী সংগঠনের সাহায্য ছাড়া কোনো ছোট সংস্থার পক্ষে সংরক্ষণের জন্যে আবেদন করে সফল হওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল ছিল।[৩৩]

ভারতে টিনপ্লেটের একমাত্র উৎপাদক ছিল টিনপ্লেট কোম্পানি অব ইন্ডিয়া লিমিটেড। এটি ছিল বার্মা অয়েল কোম্পানি এবং TISCO'র সহযোগী সংস্থা। বার্মা ওয়েল কোম্পানি ছিল তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের সবচেয়ে বড় ক্রেতা এবং TISCO ছিল টিনপ্লেট তৈরির উপযুক্ত শিটের একমাত্র ভারতীয় যোগানদার। এমনকি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেও ভারতে প্রচুর পরিমাণে টিনপ্লেট আমদানি করা হতো (সারণি ১০.২ দ্রষ্টব্য)। স্বভাবতই, ভারতে টিনপ্লেটের সব থেকে বড় ক্রেতা বার্মা অয়েল কোম্পানি TISCO'র সঙ্গে গোড়া থেকেই চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। বার্মা অয়েল কোম্পানি টিনপ্লেট কোম্পানির সঙ্গে একটি পঁচিশ বছর মেয়াদী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল যার শর্তানুযায়ী ঐ কোম্পানি টিনপ্লেটের সমস্ত উৎপাদন ক্রয় করবে দ্রব্যটির আমদানি-দামে। TISCO শর্তসাপেক্ষে অবাধ পোতাহরণ বা f.o.b দামে স্টিলের শিট-বার সরবরাহ করতে রাজি হয়েছিল। শর্তটি ছিল, টিনপ্লেটের গড় উৎপাদন ব্যয় আমদানি-দামের বেশি হলে ক্ষতির অর্ধেকটা TISCO বহন করবে এবং ঐ ব্যয় আমদানি-দামের কম হলে লাভের অর্ধাংশ TISCO পাবে। স্পষ্টতই, প্রথম দিকে টিনপ্লেট কোম্পানি ওয়েলশের উৎপাদকদের সাথে প্রতিযোগিতায় সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত TISCOকে টিনপ্লেট কোম্পানির জন্যে বেশ ভালো রকমের ভর্তুকি দিতে হয়েছিল।

দক্ষিণ ওয়েলসের উৎপাদনকারীদের তুলনায় টিনপ্লেট কোম্পানির অসুবিধাজনক অবস্থায় থাকার প্রধানত দুটি কারণ ছিল। প্রথমত, উষ্ণ আবহাওয়ায় একটানা উৎপাদন চালাতে তাদের মূলধনী ব্যয় হতো অনেক বেশি। দ্বিতীয়ত, সুপারভাইজার ও দক্ষ কর্মীদের দরুন কোম্পানিটিকে যথেষ্ট বেশি ব্যয় বহন করতে হতো। তার কারণ,সে রকম কর্মী ভারতীয়দের মধ্যে থেকে পাওয়া সম্ভবপর ছিল না। শেষোক্ত অসুবিধাটি অবশ্য সময়ে দূর হয়ে যাবে বলে আশা করা হয়েছিল। কিন্তু শুল্ক সংরক্ষণের বিষয়টি এক্ষেত্রে স্পষ্টতই

সারণি ১০.২ ভারতে টিনপ্লেটের বেসবকারি ভোগ, ১৯১১-১২ থেকে ১৯৩২-৩৩ (পরিমাণ টনের হিসাবে)

বছর	আমদানি	টিনপ্লেট কোম্পানি অব ইন্ডিয়ার বিক্রয়	মোট ভোগ
১৯১১-১২	৪২,৩৩৭	—	—
১৯১২-১৩	৪৩,০৯৩	—	—
১৯১৪-১৫	৫২,৮৩৬	—	—
১৯১৫-১৬	৫০,৪৪২	—	—
১৯১৬-১৭	৪৭,৪০০	—	—
১৯১৭-১৮	৪৪,১২৬	—	—
১৯১৮-১৯	৩১,৯৬৬	—	—
১৯১৯-২০	৪২,১৬৯	—	—
১৯২০-২১	৪৯,৯৩৪	—	—
১৯২১-২২	২৪,৭৪৭	—	—
১৯২২-২৩	৪৩,৬২১	—	—
১৯২৩-২৪	৪৪,০৯০	—	—
১৯২৪-২৫	৩৬,৫২৯	—	—
১৯২৫-২৬	২৯,৭৫৮	—	—
১৯২৭-২৮	—	৪২,৮০৬	৬৬,৬৬৩
১৯২৮-২৯	—	৩৫,১৫০	৬২,১২৪
১৯২৯-৩০	—	৩৫,৬৮১	৬৬,৭৬৮
১৯৩০-৩১	—	৩৭,৮৬৮	৫৫,০৯৭
১৯৩১-৩২	—	৩৮,৩০৬	৪৫,৮৯০
১৯৩২-৩৩	—	৩৮,৯৬৭	৪৫,৯৭০

সূত্র : ১৯১১-১২ থেকে ১৯২৫-২৬ পর্যন্ত, ITB : *Evidence* (Report on Steel), খণ্ড ২ (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ২৪ এবং *Statutory enquiry* 1926: Steel, খণ্ড ১ (কলকাতা,১৯২৬), পৃ. ১৭০; ১৯২৭-২৮ থেকে ১৯৩২-৩৩ পর্যন্ত, ITB, *Statutory enquiry 1933: Steel*, খণ্ড ৩ (দিল্লী,১৯৩৫), পৃ. ২৩৮

প্রয়োজনীয় ছিল। যেহেতু ভারতে দক্ষিণ ওয়েলসে তৈরি টিনপ্লেটের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাজার ছিল। তাছাড়া, টিনপ্লেট উৎপাদনের চেষ্টা ইটালি, স্পেন, কানাডা, নরওয়ে, রাশিয়া এবং জাপানের মতো বহু দেশেই ব্যর্থ হয়েছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তা সফল হয়েছিল ১৮৯০-র অক্টোবরে ম্যাককিনলে ট্যারিফ অ্যাক্ট পাশ হওয়ার পরে যখন টিনপ্লেট আমদানির উপর অত্যন্ত উঁচু হারে শুল্ক আরোপ করা হলো।[৩৪]

টিনপ্লেট উৎপাদনের ক্ষেত্রে আরও কিছু জটিলতা ছিল : যেমন, টিনপ্লেটের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেলে কেরোসিনেরও ব্যয় বৃদ্ধি ঘটত যা দরিদ্র শ্রেণীর পক্ষে ক্ষতিকর ছিল। আসন্ন কিছু সময়ের জন্যে সংরক্ষণের সুফল একমাত্র বার্মা ওয়েল কোম্পানি সম্ভবত ভোগ

করত। টিনপ্লেট কোম্পানির প্রস্তাবিত চূড়ান্ত উৎপাদন-ক্ষমতা ছিল ২৮,০০০ টন যেখানে বার্মা ওয়েল কোম্পানিরই নিজস্ব প্রয়োজন ছিল ২১,০০০ টন টিনপ্লেট। স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানিসহ তেল কোম্পানিগুলির মিলিত চাহিদা ছিল প্রায় ২৮,০০০ টন টিনপ্লেট যা মোট ভারতীয় চাহিদার প্রায় অর্ধেক। সুতরাং পূর্ণ ক্ষমতায় উৎপাদন করলেও টিনপ্লেট কোম্পানি খোলাবাজারের মাত্র ২০ শতাংশকে যোগান দিতে পারত (বার্মা ওয়েল কোম্পানিকে ২১,০০০ টন দেওয়ার পরে)। কিন্তু টিনপ্লেট কোম্পানি তাদের উৎপাদন-ক্ষমতার সম্প্রসারণ ঘটাবে না অথবা ভারতে টিনপ্লেট উৎপাদন লাভজনক প্রতিপন্ন হলে নতুন কোনো সংস্থা গড়ে উঠবে, এমন মনে করারও কোনো কারণ ছিল না। [৩৫]

আই টি বি ভারতে একটি টিনপ্লেট শিল্প গড়ে তোলার বিষয়টিকে জরুরি বলে মনে করেছিল। মোটামুটি একটা নিশ্চিত বাজার পেলে ও টিনপ্লেট কোম্পানি পূর্ণ ক্ষমতায় উৎপাদন শুরু করলে উৎপাদন-ব্যয় কমে যাওয়ার সম্ভাবনাও যে উজ্জ্বল তা আই টি বি অনুধাবন করেছিল। টিনপ্লেট কোম্পানি TISCO'র তৈরি শিট বারেরও একজন ভাল ক্রেতা হিসাবেও কাজ করতে পারত। অবশ্য TISCO'র ভাগ্য এমনিতে কিছুটা বাঁধা ছিল টিনপ্লেট কোম্পানির ভালোমন্দের উপর। তার কারণ,তাদের মধ্যে শিট-বার যোগানের ব্যাপারে একটি দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি ছিল। কিন্তু কোম্পানিটির সামান্য অভিজ্ঞতার কথা বিবেচনা করে আই টি বি ন্যূনতম শুল্কের হারে সংরক্ষণ সুপারিশ করেছিল। সমস্ত আমদানিকৃত টিনপ্লেটের উপর টন প্রতি ৬০ টাকা ছিল প্রস্তাবিত শুল্কের হার এবং এই শুল্ক আরোপিত হয়েছিল ১৯২৪ সালের স্টিল ইন্ডাস্ট্রি (প্রোটেক্‌শন) অ্যাক্টের মাধ্যমে। ১৯২৬-এর ফেব্রুয়ারিতে, আই টি বি-র একটি অনুসন্ধানের পরে,সরকার শুল্কের হার বাড়িয়েছিল টন প্রতি ৮৫ টাকাতে। কিন্তু একই সঙ্গে আমদানিকৃত টিনপ্লেটের উপর প্রচলিত মূল্যানুগ ১৫ শতাংশ হারে শুল্কের পরিবর্তে সরকার চালু করেছিল টন প্রতি ২৫০ টাকার বিশেষ (specific) শুল্কের, যার অর্থ ছিল আগের মূল্যানুগ ১৫ শতাংশ শুল্কের তুলনায় টন প্রতি ৩০৫ টাকা হ্রাস।[৩৬]

১৯২৬-এর আই টি বি-র বিধিসম্মত অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছিল, 'বিভেদমূলক সংরক্ষণ নীতি অনুসৃত হওয়া থেকে তুলনামূলকভাবে কম সময়ের মধ্যে শিল্পোন্নতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছিল টিনপ্লেট শিল্প।'[৩৭] বছরে ২৮,০০০ টন উৎপাদনের জন্যে পরিকল্পিত একটি কারখানা নিয়ে ১৯২২-এর শেষ দিকে উৎপাদন শুরু করে টিনপ্লেট কোম্পানি। কোম্পানিটি ১৯২৩-এ ৭,০০০ টনের কিছু বেশি এবং ১৯২৪ ও ১৯২৫-এ যথাক্রমে ২০,৭৬৩ টন ও ২৯,৫৫৫ টন উৎপাদন করেছিল এবং ১৯২৬-এ তার উৎপাদন ৩৫,০০০ টন হবে বলে আশা করা হয়েছিল। টিনপ্লেটের টন প্রতি উৎপাদন ব্যয় ১৯২৪-এ ছিল ৪৫৯ টাকা, ১৯২৬-এ তা কমে ৩১৩ টাকায় দাঁড়ায়। টিনবারের দাম হ্রাসকে বাদ দিয়ে ধরলে অবশিষ্ট ব্যয় ২১৩ টাকা থেকে কমে দাঁড়াত ১৩৮ টাকায়। ব্যয় হ্রাসের (টন প্রতি ৪৪.৯ টাকা) একটি বড় কারণ ছিল শ্রম ব্যয়ের সংকোচন এবং তা সম্ভবপর হয়েছিল কিছুটা চুক্তিবদ্ধ ইয়োরোপীয় কর্মচারীর সংখ্যা হ্রাসের ফলে এবং কিছুটা ভারতীয় শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে। চুক্তিবদ্ধ ইয়োরোপীয় কর্মচারীর সংখ্যা ১৯২৪-এ ছিল ৮৪। ১৯২৫-এ তা কমে দাঁড়িয়েছিল ৭১-এ এবং ১৯২৬-এ ৫৯-এ। ১৯২৪-এ ভারতে টন প্রতি শ্রম ব্যয় ৫৮ টাকা ছিল,১৯২৬-এ ৩৪ টাকা।[৩৮]

১৯২৭ সালে টিনপ্লেট কোম্পানির উৎপাদন ৪১,৫২১ টনে উত্তীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু ১৯২৮-এ TISCO-তে ও ১৯২৯-এ টিনপ্লেট কোম্পানিতে ধর্মঘট এবং তার পরবর্তী

দু'বছর টিনপ্লেটের সীমিত চাহিদা উৎপাদনকে ব্যাহত করেছিল। কিন্তু ১৯৩২-এ উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৪২,১৫১ টনে।[৩৯]

টিনপ্লেট কোম্পানি হিসাব করেছিল, ১৯৩৩-এর শেষে উৎপাদন ব্যয় দাঁড়াবে টন প্রতি ২৮৫ টাকায়। আই টি বি অবশ্য মনে করেছিল এই উৎপাদন ব্যয় অত্যন্ত বেশি এবং পরামর্শ দিয়েছিল কীভাবে টিনবার ব্যবহার ও ভারতীয় শ্রম বাবহারের রীতিতে উন্নতি বিধানের মাধ্যমে ব্যয় কমানো যায় এবং ১৯৩৩-এ উৎপাদন ব্যয়, তাদের হিসাবে, দাঁড়াতে পারে টন প্রতি ২৭৯.১ টাকায়। আই টি বি-র হিসাবে সাত বছর কালের অনুমিত গড় উৎপাদন ব্যয় ২৯৩ টাকা। এই অঙ্কটি পাটীগাণিতিক গড় ৩১০.৬ টাকা (টিনবারের উপর শুল্কহ্রাসকে ধরে ১৯২৬-এর উৎপাদন-ব্যয়) এবং ২৭৯ টাকার সামান্য কম ছিল। টিনপ্লেটের ন্যায্য বিক্রয় দামে উপনীত হাতে গিয়ে আই টি বি টিনপ্লেট কোম্পানির কারখানা ও গৃহসম্পত্তির বুক ভ্যালু বা লিখিত মূল্য ১৬.২ মিলিয়ন টাকা থেকে ৮.৫ মিলিয়ন টাকায় কমিয়ে এনেছিল। শেষোক্ত সংখ্যাটি কারখানার ন্যায্য প্রতিস্থাপন মূল্য হিসাবে ধরা হয়েছিল। TISCO'র কারখানার বৃহত্তর সংযোজিত অংশের বুক ভ্যালু ১৫০ মিলিয়ন টাকা থেকে ১০০ মিলিয়ন টাকায় নিয়ে আসতে ITB যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল সেই একই পদ্ধতির প্রয়োগ এই ক্ষেত্রে করা হয় এবং তার যুক্তিও ছিল একই : যুদ্ধোত্তরকালীন তেজী অবস্থায় অত্যন্ত চড়া দামে কারখানার যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছিল। এই ভিত্তিতে ন্যায্য বিক্রয় দাম ধরা হয়েছিল টন প্রতি ৩৬৮.২২ টাকা এবং আমদানি-দাম টন প্রতি ৩২০ টাকা (কয়লা উৎপাদন বন্ধের দরুন ব্রিটেনে টিনপ্লেটেব দামে যে বৃদ্ধি ঘটে তা ধরা হয়নি)।[৪০] আই টি বি বিশেষ শুল্কের হার টন প্রতি ৮৫ টাকা থেকে ৪৮ টাকা কমিয়ে আনার জন্যে সুপারিশ করেছিল এবং ওয়েলসেব অনুকূলে কোনো পক্ষপাতিত্বের জন্যে সুপারিশ করা হয়নি, কারণ ভারতীয় টিনপ্লেটের প্রতিযোগিতা ছিল মুখ্যত ওয়েলসে উৎপাদিত টিনপ্লেটের সাথে।[৭১] ভাবত সরকার এই সুপাবিশ মেনে নিয়েছিল এবং ইস্পাত শিল্প (সংরক্ষণ) আইনেব (১৯২৭) মাধ্যমে তা কার্যকরী কবা হয়েছিল। ১৯৩১-এ ২৫ শতাংশ অতিবিক্ত শুল্ক আরোপের ফলে শুল্কের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছিল টন প্রতি ৬০ টাকায়।

১৯৩৩-এ আই টি বি-র বিধিসম্মত অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছিল যে উৎপাদন ও দক্ষতার দিক থেকে অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে। ১৯৩২-এ লেপিত পাতসহ (৪,০০০ টন) মোট উৎপাদন ৪৬,০০০ টন অতিক্রম করে গিয়েছিল, যেখানে উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৩৬,০০০ টন। তিরিশের দশকে মন্দা ভারতে টিনপ্লেটের চাহিদার উপর প্রতিকূল প্রভাব ফেললেও টিনপ্লেট কোম্পানির বিক্রয় এতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি (সারণি ১০.২ দ্রষ্টব্য)। ১৯২৯-৩০ পর্যন্ত ভারতে ব্যবহৃত মোট টিনপ্লেটের পরিমাণের মধ্যে টিনপ্লেট কোম্পানির বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ, ১৯৩২-৩৩-এ বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৮০ শতাংশের বেশি।[৪২] ইতিমধ্যে চুক্তিবদ্ধ কর্মচারীর সংখ্যা ষাট (১৯২৭) থেকে কমে ১৯৩২-এ হয়েছিল তেইশ, যা ছিল মোট কর্মচারীর এক শতাংশ। ১৯২৭ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত সময়কালে ধর্মঘটের ফলে উৎপাদন ব্যয ওঠা-নামা করেছিল, কিন্তু তারপর থেকে ঐ ব্যয় নিয়মিতভাবে পড়ে যায় এবং ১৯৩২-এ উৎপাদন ব্যয় দাঁড়িয়েছিল ২২৭.৫ টাকায়, যেখানে ১৯২৭-এ ছিল ২৯২.১ টাকা (সারণি ১০.৩ দ্রষ্টব্য)।

১৯২৬-এ বোর্ড আশা করেছিল, ব্যয়-সংকোচনের ফলে ১৯৩৪ নাগাদ ধাতু ব্যবহারের ব্যয় ছাড়া অন্যান্য ব্যয় কমে যাবে টন প্রতি ১১৭ টাকায়, ঐ ব্যয় ১৯২৬-এ ছিল ১৩৮

টাকা। ১৯৩২-এ ধাতুর উপর ব্যয় কমে হয়েছিল ৮৩ টাকা। ইস্পাত ও টিনের দাম হ্রাসের জন্যে টন প্রতি ৩০ টাকা এবং গুদাম বাবদ ব্যয় হ্রাসের জন্যে আরও ১৫ টাকা বাদ দিলেও ব্যয় হ্রাসের পরিমাণ দাঁড়ায় টন প্রতি ১০ টাকা।[৪৩] এই ব্যয় হ্রাস বহুলাংশে সম্ভবপর হয়েছিল ইয়োরোপীয় শ্রমের পরিবর্তে ভারতীয় শ্রম নিয়োগের মাধ্যমে মজুরি-ব্যয়ে হ্রাস ঘটিয়ে। শ্রমের ব্যবহারও কিছুটা হ্রাস করা হয়েছিল। ১৯২৭-এ মোট কর্মচাবীব সংখ্যা ছিল ২৯৯০ ও ১৯৩২ সালে ২৯৫১, অথচ টিনপ্লেটের টন প্রতি মজুরি-ব্যয় ছিল ১৯২৭-এ ৫৫ টাকা ও ১৯৩২-এ ৪৬ টাকা (১৯৩২-এ উৎপাদন কিছুটা বেশি ছিল)।[৪৪] যন্ত্রপাতির আরও নিপুণ ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যয় সংকোচন যে সম্ভবপর হতে পারে কোম্পানিটি তা আশা করতে পারেনি। ITB, TISCO ও টিনপ্লেট কোম্পানির মধ্যে যে চুক্তিটি ছিল ITB তা পুনর্বিবেচনার প্রস্তাব করেছিল, কারণ TISCO যে টিমবার সরবরাহ করত তার মূল্য স্থিরীকৃত হয়েছিল ওয়েলসের টিনপ্লেটেব মূল্যের নিরিখে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে TISCO আরও অনেক কম দামে টিনবার সরবরাহ করতে পারত।

সারণি ১০.৩ ভারতে টিনপ্লেটের উৎপাদন ব্যয় ১৯২৭ থেকে ১৯৩২

বছর	টিনপ্লেটের উৎপাদন (টনে)	টন প্রতি উৎপাদন ব্যয় (টাকায়)	টন প্রতি মোট ব্যয় (টাকায়)
১৯২৭	৪১,৫২১	২৯২.১৩৮	২৯৪.২৪৩
১৯২৮	৩৬,৮১৫	২৭১.৯৯১	২৭৪.৮১৭
১৯২৯	৩৩,১১৩	২৯৮.১৯৯	৩০০.৮৪৮
১৯৩০	৩৮,৪৮২	২৫৪.৫৯৪	২৫৬.৭৪২
১৯৩১	৩৭,৩২০	২২৯.৮১৪	২৩২.৬২৭
১৯৩২	৪২,১৫১	২২৭.৫১৪	২৩০.৪৯৯

সূত্র : ITB : *Statutory enquiry 1933: steel,* খণ্ড ৩ (দিল্লী, ১৯৩৫) পৃ. ২৩১।

টিনপ্লেটের ক্ষেত্রে আই টি বি প্রচলিত শুল্কে কাটছাঁট সুপারিশ করেছিল। প্রস্তাবিত হার ছিল, যুক্তরাজ্য থেকে আমদানিকৃত টিনপ্লেটের উপর টন প্রতি ৩৮ টাকা এবং অন্যান্য দেশ থেকে আমদানির উপর টন প্রতি ৫৯ টাকা (যুক্তরাজ্য ছাড়া ভারতীয় টিনপ্লেট শিল্পের অন্যান্য মুখ্য প্রতিযোগীরা ছিল যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি ও ইটালি)।

ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের অপর একটি শাখা, যেমন তার ও পেরেক উৎপাদন, শুরুতে দুর্বল ছিল। ইন্ডিয়ান স্টিল ওয়্যার প্রোডাক্টস্ লিমিটেড স্থাপিত হয়েছিল ১৯১৯-এ। ১৯২৪-এ তার ও পেরেক শিল্পকে শুল্ক-সংরক্ষণের (কাঁটা তার ও পাকানো তার বাদে তার ও পেরেকের উপর ৬০ টাকা হারে বিশেষ শুল্ক এবং তারদণ্ডের উপর ৪০ টাকা হারে শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল) সুবিধা দেওয়া হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই একমাত্র ভারতীয় কোম্পানিটিকে অসুবিধায় পড়তে হয়। তার কারণ, কোম্পানিটিকে বিদেশ থেকে তারদণ্ড আমদানি করতে হতো। ক্রমবর্ধমান ইয়োরোপীয় প্রতিযোগিতার সাথে সাথে তার ও

পেরেকের উপর শুল্কের হার টন প্রতি ৯০ টাকায় পরিণত করা হয় এবং পরবর্তীকালে আই টি বি-র সুপারিশক্রমে তারদণ্ডের উপর বিশেষ শুল্কের পরিবর্তে টন প্রতি ১০ টাকা হারে মূল্যনুগ রাজস্ব শুল্ক বসানো হয়েছিল। তখন পর্যন্ত বা TISCO অন্য কোনো ভারতীয় কোম্পানি তার-দণ্ড প্রস্তুত করত না। ইন্ডিয়ান স্টিল ওয়্যার প্রোডাক্ট্স্ লিমিটেড আর্থিক অসুবিধার মধ্যে পড়ার ফলে কেবলমাত্র অনিয়মিতভাবে কাজ করতে পেরেছিল এবং অবশেষে ১৯২৮-এ কোম্পানিটি দেউলিয়া হযে যাওযায শুল্ক-সংরক্ষণের ব্যবস্থাও তুলে নেওয়া হয়েছিল। একটি নতুন কোম্পানি, ইন্ডিয়ান স্টিল অ্যান্ড ওয়্যার প্রোডাক্ট্স্ (টাটানগর), কারখানাটিকে অত্যন্ত কম দামে ক্রয় করে এবং ১৯২৮ থেকেই উৎপাদন শুরু করে। ১৯৩৩-এর বিধিসম্মত অনুসন্ধানকালে আরেকটি সংস্থা, করাচিব মেসার্স দেবীদাস জেঠানন্দ, তার, পেরেক ও স্ক্রু উৎপাদন শুরু করেছিল এবং বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান হিউম পাইপ কোম্পানি লৌহযুক্ত কংক্রিটের পাইপ তৈরির উদ্দেশ্যে তার ক্রয় শুরু করেছিল। অবশ্য তার ও পেরেকেব অধিকাংশ পরিমাণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বহির্ভূত দেশগুলি থেকে আমদানি করা হতো। ১৯৩১-এ এক নতুন অনুসন্ধানের পব আই টি বি তাব ও পেরেকের উপর টন প্রতি ৪৫ টাকা হারে বিশেষ শুল্কের প্রস্তাব করেছিল। তা ছাড়া আমদানিকৃত তারদণ্ডের উপর শুল্ক-ছাড়ের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার সুপারিশ করা হয়েছিল এই ধারণার ভিত্তিতে যে ইন্ডিয়ান স্টিল অ্যান্ড ওয়্যার প্রোডাক্ট্স্ তারদণ্ড তৈরির একটি কারখানা স্থাপন করবে যেহেতু TISCO ঐ পণ্য উৎপাদনে তাদেব অক্ষমতা জানিয়েছিল।

১৯৩৪ সালে ট্যারিফবোর্ড এই প্রধান কোম্পানিটিব সংরক্ষণের দাবিকে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেছিল যেহেতু ১৯৩৩-এর সেপ্টেম্বরে তারদণ্ডের কাবখানাটি স্থাপিত হয় এবং উৎপাদন শুরু করে। তাব ও পেরেকের প্রধান কোম্পানিটির উৎপাদন-ক্ষমতা ছিল প্রায় ১২,০০০ টন যেখানে ১৯৩২-৩৩ সালেই আমদানির পরিমাণ (বেড়া দেওয়ার সরঞ্জাম বাদে) ছিল ২২,৮২৯ টন। অতএব, ইন্ডিয়ান স্টিল অ্যান্ড ওয়্যার প্রোডাক্টসের একটি উল্লেখযোগ্য আভ্যন্তরীণ বাজার ছিল। কোম্পানিটি প্রায় ৩০,০০০ টন ছোট দণ্ড বা ছাঁট প্রস্তুত করেত পারত এবং এর একটি তড়িৎলেপন কারখানা ছিল যেখানে ২,০০০ টন তার উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা সম্ভবপর ছিল। ছোট দণ্ড ও ছাঁটের চাহিদা সারা ভারতে ৭০,০০০ টন এবং শুধু বাংলাতেই ২০,০০০ টন বলে হিসাব করা হয়েছিল। সুতরাং এই সমস্ত দ্রব্যেরও বেশ বড় বাজার ছিল।

ইন্ডিয়ান স্টিল অ্যান্ড ওয়্যার প্রোডাক্ট্স্ ব্রিটেনে উৎপাদিত তার ও পেরেকের বিপক্ষে সংরক্ষণের আবেদন করেনি। আই টি বি ছোট দণ্ড ও ছাঁটের উপর শুল্ক সুপারিশ করেছিল। প্রস্তাবিত শুল্কের হার ছিল সংরক্ষিত তার দণ্ডের উপর প্রযুক্ত শুল্কের হারের সমান : যুক্তরাজ্য থেকে আমদানির উপর টন প্রতি ১০ টাকা এবং অন্যান্য দেশ থেকে আমদানির উপর টন প্রতি ৩৯ টাকা। ট্যারিফ বোর্ড যুক্তরাজ্য থেকে আমদানিকৃত তার ও পেরেকের উপর টন প্রতি ২৫ টাকা এবং অন্যান্য দেশ থেকে আমদানিকৃত ঐ পণ্যগুলির ক্ষেত্রে ৬০ টাকা হারে শুল্ক আরোপের সুপারিশ করে। তার দ্রব্যের প্রতিযোগিতা সব থেকে তীব্র ছিল জাপানের সঙ্গে, এবং ট্যারিফ বোর্ড প্রস্তাব করেছিল যে জাপানের কমিয়ে রাখা রপ্তানি-দামের (dumping prices) তুলনায় তাদের অনুমিত দাম কম হলে ক্ষতিপূরণমূলক শুল্ক আরোপের মাধ্যম পরিস্থিতির মোকাবিলা করা হবে।[৪৫]

স্টিলের কাঠামো নির্মাণসহ ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সাধারণ ক্ষেত্রে পূর্ব ও উত্তর ভারতের অধিকাংশ সংস্থার পক্ষে সমগ্র বিশের দশক ছিল দুঃসময়ের কাল। সংস্থাগুলি আশা করেছিল যে যুদ্ধোত্তর তেজী ব্যবসা আরও কিছুকাল চলবে, কিন্তু তা বাস্তবে ঘটেনি। বেশির ভাগ সংস্থাকেই উৎপাদন করতে হলো সৃষ্ট ক্ষমতার তুলনায় অনেক কম হারে। তবে আসল সংকট এসেছিল মহামন্দার অনুষঙ্গে যখন রেলের কাঠামো সংক্রান্ত কাজ সমেত সমস্ত পূর্তকর্ম চূড়ান্তভাবে ছেঁটে ফেলা হলো। এমনকি বার্ন অ্যান্ড কোম্পানির মতো প্রতিষ্ঠিত সংস্থাও ১৯৩১ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত সমস্ত বছরগুলিতে সাধারণ শেয়ারের উপর লভ্যাংশ বিতরণ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯৩১-৩২-এর *IIYB* অনুসারে বার্ন অ্যান্ড কোম্পানির ইতিহাসে ১৯৩১ ছিল তৃতীয় বর্ষ যখন তারা সাধারণ শেয়ারের উপর লভ্যাংশ অনুমোদনে বাধ্য হয়।

আই টি বি তাদের ১৯২৬ সালের অনুসন্ধানের পর বিন্যস্ত ইস্পাতের উপর ১৯২৪-এ আরোপিত ২৫ শতাংশ মূল্যানুগ শুল্কের পরিবর্তে ১৭ শতাংশ মূল্যানুগ মূল শুল্ক প্রবর্তন সুপারিশ করে। বিন্যস্ত ইস্পাতের আমদানি-দাম ভারতীয় উৎপাদন-ব্যয়ের সমানুপাতে পরিবর্তিত না হওয়ার কারণে শুল্কের হার কমানো হয়। ১৯২৬-এ আই টি বি-র নজরে পড়ে যে সংরক্ষণ-প্রার্থী কোনো সংস্থাই তার উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করছে না। অবশ্য এর কারণ ছিল ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থাগুলির উৎপাদন ক্ষমতার সার্বিক বৃদ্ধি, বর্ধিত ইয়োরোপীয় প্রতিযোগিতা নয়। আই টি বি আশা করেছিল যে, ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থাগুলির কারবার ক্রমাগত বাড়বে যেহেতু রেলপথ নির্মাণ কর্মসূচির দ্রুত প্রণয়ন ঘটছিল।[৪৬] যাই হোক, রেল নির্মাণ থেকে উদ্ভূত চাহিদা স্বল্পস্থায়ী প্রমাণিত হয়েছিল এবং মন্দা শুরু হতে পূর্ব ভারতের ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প সংকটাপন্ন হয়ে পড়ল। ১৯৩৪-এ ট্যারিফ বোর্ড বিবেচনা করল যে, বিন্যস্ত ইস্পাত শিল্পের অতিরিক্ত সংরক্ষণ শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, ক্ষতিকারকও। সংরক্ষণের মাত্রা বাড়লে শিল্পটিতে আরও বেশি পুঁজির আকর্ষণ ঘটত এবং তার ফলে উদ্বৃত্ত উৎপাদন ক্ষমতার সমস্যা আরও তীব্র হতো। আই টি বি-র হিসাবে দেশে আকার-প্রাপ্ত ইস্পাতের উৎপাদন-ক্ষমতা ছিল বছরে ১৫,০০০ টনেরও কিছু বেশি, অথচ ১৯৩১-৩২ ও ১৯৩২-৩৩ সালে গড় চাহিদা ছিল ৭০,০০০ টন বা তার সামান্য কম-বেশি। তাদের মতে, শিল্পটির প্রকৃত প্রয়োজন ছিল বিন্যস্ত ইস্পাতের চাহিদার উন্নয়ন যার সংঘটন সংরক্ষণের মাধ্যমে সম্ভবপর ছিল না। সরকারের আর্থিক নীতির ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকভাবে নাক গলিয়ে মন্তব্য করেছিল :

'পুঁজির বাজারে ভারত সরকার প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ অতিরিক্ত বেশি এবং টাকা পর্যাপ্ত ও সস্তা। এমন সময়ে মূলধনী ব্যয়ের সরকারের বলিষ্ঠ ঋণ-নীতি, কাঠামো নির্মাণে ব্যবহৃত ইস্পাত সদৃশ মূলধন-দ্রব্যের বাজারকে চাঙ্গা করতে বিস্তর সাহায্য করবে। আমরা বিশ্বাস করি, এই নীতির সুফল শুধুমাত্র ইস্পাত শিল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, দেশের অর্থনৈতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনুভূত হবে।'[৪৭]

আই টি বি লক্ষ্য করেছিল যে, ডরম্যান লঙের মতো যুক্তরাজ্যের কিছু সংস্থা ইস্পাত উৎপাদন ও কাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত কাজের মধ্যে সংহতি সাধনের মাধ্যমে ভারতীয় প্রতিযোগীদের তুলনায় বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত হয়। অতএব কাঠামো নির্মাণের ইস্পাতের উপর ডাম্পিং-বিরোধী ব্যবস্থামূলক শুল্ক আরোপের প্রয়োজন ছিল। সমস্ত দেশ থেকে আমদানিকৃত বিন্যস্ত ইস্পাতের উপর ৪০ টাকা হারে শুল্ক আরোপের সুপারিশ করেছিল ট্যারিফ বোর্ড।[৪৮]

বোম্বাইয়ের সাধারণ ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থাগুলি (যেমন অ্যাল্কক, অ্যাশডাউন অ্যান্ড কোম্পানি, জস্টস ইঞ্জিনীয়ারিং ইত্যাদি) কলকাতার নিকটবর্তী অনুরূপ সংস্থাগুলির তুলনায় কিছুটা ভালোভাবে চলতে পেরেছিল সম্ভবত তারা সরকার ও রেলের বরাতের উপর কম নির্ভরশীল ছিল বলে। তাছাড়া, মন্দার সময়ে তুলোকল শিল্প পাটশিল্পের তুলনায় অনেক কম ক্ষতিগ্রস্ত হযেছিল। ১৯২৮-এর পরে পাট-দ্রব্যের চাহিদা বিশ্বের বাজারে ভীষণভাবে কমে গিয়েছিল। চা ও কয়লা শিল্পও মন্দার ফলে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং পূর্ব ভারতের ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থাগুলির সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। মুজফ্ফরপুরের আর্থার বাটলার অ্যান্ড কোম্পানি ও সারান ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানির মতো চিনি উৎপাদনের বলযের অন্তর্ভুক্ত ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থাগুলি বিহার ও যুক্তপ্রদেশের চিনি শিল্পেব উন্নয়নের সাথে সমৃদ্ধ হতে শুরু করেছিল।

ওয়াগন নির্মাণ শিল্প সংক্রান্ত আই টি বি-র প্রস্তাবগুলি গৃহীত হওযার পরে ঐ শিল্পেব অন্তর্গত ফার্মগুলি একটি নিশ্চিত বাজার লাভ করে, ফলত, তারা আয়তন-জনিত ব্যয়সংকোচের সুবিধা কাজে লাগাতে পারে এবং প্রসারণ ও উন্নয়নের কাজে প্রচুর পরিমাণ ব্যয় করতে সক্ষম হয়। ১৯২৬-এ অনুদানের পরিমাণ কমানো হয়েছিল ওয়াগন প্রতি ২২৮ টাকা যদিও আই টি বি-র মূল সুপারিশে বলা হয়েছিল তৃতীয় বছরে ওয়াগন প্রতি অনুদানের পরিমাণ হবে ৫৮০ টাকা।[৪৯] রেল কোম্পানিগুলি তাদের ওয়াগন ও বগির সমস্ত বরাত ক্রমশ ভারতীয় উৎপাদকদের দেওয়ার নীতি গ্রহণ করেছিল। ১৯৩৪-এ ভারতে বছরে ৩,০০০ টি ওয়াগনের চক্রাকার মজুতের প্রয়োজন হবে বলে ধরা হয়েছিল অথচ তখন ভারতীয় উৎপাদকদের আনুমানিক উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৮,৫০০ টি ওয়াগন। তা সত্ত্বেও, ভারতেব অগ্রণী ওয়াগন উৎপাদক সংস্থা, ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড ওয়াগন কোম্পানি পুরো তিরিশের দশক জুড়ে বছরে ৫ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত ডিভিডেন্ড বিতরণ করেছিল। কিন্তু পূর্ববর্তীকালে সংস্থাটির ব্যবসায়িক পরিস্থিতি অপেক্ষাকৃত মন্দ ছিল[৫০] (একই শিল্পে বার্ন অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড ও IISCO'র মতো সংস্থাগুলি তুলনামূলকভাবে অনেক পিছিয়ে ছিল)।

ইঞ্জিনীয়ারিঙের অন্যতম শাখা জাহাজ বা অন্তর্দেশীয় চলাচলের উপযুক্ত স্টিমার নির্মাণ শিল্পটিকে আই টি বি প্রথমে অসতর্কভাবে সংরক্ষণের সুযোগ দিয়ে ফেলেছিল। ১৯২৪-এ আই টি বি স্টিমার, জাহাজ টেনে নিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত শক্তিশালী বাষ্পীয় পোত, মালবাহী নৌকা, বজরা প্রভৃতির নির্মাণকে ইস্পাতের উপর বর্ধিত শুল্কের আওতার বাইরে রেখেছিল (তখন পর্যন্ত বিন্যস্ত ইস্পাতের উপর মূল্যানুগ ১০ শতাংশ এবং যন্ত্রপাতির উপর $২^১/_২$ শতাংশ শুল্ক কার্যকর ছিল) এই যুক্তিতে যে উৎপাদনের উক্ত শাখাটির ক্ষেত্রে বিদেশী প্রতিযোগিতা আশঙ্কাজনক ছিল না। কিন্তু এই নতুন শুল্ক তালিকা কার্যকর করার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিল। তার কারণ, জাহাজ বা স্টিমার কদাচিৎ আমদানি করা হতো একত্রিকৃত অবস্থায়, বিভিন্ন অংশগুলি পৃথকভাবে আমদানি করাই ছিল প্রচলিত রীতি। সেন্ট্রাল রেভিনিউ বোর্ডের একটি নির্দেশ অনুযায়ী জলযানের কাঠামো তৈরিতে ব্যবহৃত বিন্যস্ত ইস্পাতের উপর ২৫ শতাংশ হারে সংরক্ষণমূলক শুল্ক বাধ্যতামূলকভাবে আরোপ করে হয়েছিল। কোনো জলযানের কাঠামোর অখণ্ড আমদানি অথবা ভাসমান অবস্থায় জুড়ে দেওয়ার মতো নির্মিত কাঠামোর অংশগুলির আমদানির ক্ষেত্রে উক্ত শুল্ক প্রয়োগযোগ্য ছিল না। শুল্ক দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন আমদানি-পণ্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিন্যস্ত ফলক, কড়ি, লোহার বাতা,

লোহার পাত, প্রভৃতি এবং আর কোনোভাবেই জলযান আমদানি করা হতো না। অতএব নির্দেশ বলবৎ থাকার ফলে নদীপথে চলাচলকারী জলযান আমদানির প্রতিটি ক্ষেত্রেই সংরক্ষণমূলক শুল্ক দিতে হতো যা ট্যারিফ বোর্ড সুপারিশ করেনি।[৫১]

ব্রহ্মদেশে আধুনিক জলযানে সমগ্র নদী-পরিবহণ প্রকৃতপক্ষে নিয়ন্ত্রণ করত ইরাবতী ফ্লোটিলা কোম্পানি। নদী-পরিবহনের ক্ষেত্রে ইন্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন অ্যান্ড রেলওয়ে কোম্পানি লিমিটিড ছিল পূর্ব ভারতের সব থেকে বড় সংস্থা। এই দুটি সংস্থা ভারত সরকারের কাছে সেন্ট্রাল রেভিনিউ বোর্ডের নির্দেশের বিরুদ্ধে দরবার করেছিল। ভারতের অন্যান্য ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থা, যেমন বার্ন অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড, দি শালিমার ওয়ার্কস্ লিমিটিড এবং জন কিং অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড, উক্ত দুটি কোম্পানির আবেদনের বিরোধিতা করে। তাদের প্রধান যুক্তি ছিল, ১৯২৪-এ ইস্পাত ও বিন্যস্ত ইস্পাতের উপর শুল্ক বাড়ানোর ফলে ভারতে জলযান নির্মাণের ব্যয় বেড়ে গিয়েছিল।

১৯২৬ সালে আই টি বি অনুধাবন করে যে যুদ্ধ-পূর্ব ভারতে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের জন্যে কোনো সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়নি এবং যুদ্ধোত্তর কালেও তার বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু বিনিময়-হার বৃদ্ধি ও অবিন্যস্ত ইস্পাতের উপব শুল্ক বৃদ্ধির দরুন ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থাগুলিকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত। ট্যারিফ বোর্ড প্রস্তাব করেছিল, জাহাজ ও আভ্যন্তরীণ নদীপথে চলাচলকারী জলযান নির্মাণে ব্যবহৃত বিন্যস্ত ইস্পাতের অংশগুলির উপর ১০ শতাংশ হারে শুল্ক ধার্য করা উচিত, তবে শুল্কের পরিমাণ যেন কোনো মতেই টন প্রতি ৩৫ টাকার কম না হয় (শেষের শর্তটি রাখা হয়েছিল বিনিময় হারের কোনো প্রতিকূল পরিবর্তনের প্রভাব রোধ করার উদ্দেশ্যে)। অতএব, প্রস্তাব অনুসারে, ভারতের জাহাজ নির্মাণকারীদের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে প্রস্তুত-পণ্য আমদানিকারকদের তুলনায় বেশি শুল্ক দেওয়ার কোনো আশঙ্কা থাকবে না।[৫২]

স্বাধীনতার আগে ভারতের জাহাজ নির্মাণ শিল্পের বস্তুত কোনো উন্নতি ঘটেনি। শুধুমাত্র জলযান আমদানির উপর শুল্ক চাপানো উন্নয়নের উদ্দেশ্য সাধন করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল কিনা সন্দেহ থাকে। উল্লেখযোগ্য আকারে জাহাজ নির্মাণ শিল্প গঠনের জন্যে প্রয়োজন ছিল একটি বড় বাণিজ্যিক নৌবহরের যা ভারতীয়দের ছিল না। পূর্ব ভারত ও ব্রহ্মদেশের আভ্যন্তরীণ নদী-পথে পরিবহণে নিয়োজিত অধিকাংশ স্টিমার ছিল ব্রিটিশ কোম্পানির বা ব্রিটেনে নিবন্ধভুক্ত কোম্পানির পরিচালনাধীন। ১৯২১-এ উপকূলীয় বাণিজ্যের প্রায় ৯০ শতাংশ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রায় ৯৮ শতাংশ পরিবাহিত হয়েছিল বিদেশী জাহাজে।[৫৩] জলপরিবহণ সভা (liners' Conferences) এবং পুরনো অন্তর্দেশীয় স্টিমার কোম্পানিগুলি বিলম্বিত-অবহার (deferred rebates), প্রচণ্ড দাম-হ্রাস ইত্যাদি কৌশল অবলম্বন করত। ফলে ভারতীয় জলপরিবহণ কোম্পানিগুলিকে তীব্র ও অন্যায় প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বম্বে স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি লিমিটেড এবং সিন্দিয়া নেভিগেশন কোম্পানি লিমিটেডের মতো বোম্বাই-ভিত্তিক কিছু কোম্পানি উপকূলীয় বাণিজ্যে লিপ্ত হতে পেরেছিল, কিন্তু তাদেরও যোগ দিতে হয় জলপরিবহণ সভায় অস্তিত্ব বজায় রাখার তাগিদে। তাদের বেশ বড় রকমের আর্থিক সম্পদেরও দরকার হয়েছিল। (১৯৩৬-এর ৩০শে জুনে সিন্দিয়া নেভিগেশন ও বম্বে স্টিম নেভিগেশন নীট অবরুদ্ধ ও তরল বা নগদ-সম্পত্তির (liquid assets) পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৯,৫৭৯,৪৬১ টাকা ও ১১,০০৩,৭৫২ টাকা)। ছিটেফোঁটা

সাহায্যের সবটুকুই ডাকপরিবহণ বাবদ সাহায্য হিসাবে চলে যেত ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি, পেনিনসুলার অ্যান্ড ওরিয়েন্টাল স্টিম নেভিগেশন কোম্পানির মতো ব্রিটিশ সংস্থাগুলির কাছে। ১৯২৩-এ দি ইন্ডিয়ান মারক্যানটাইল মেরিন কমিটি ভারতে জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ-পরিবহণে উৎসাহদানে একটি বৃহৎ ব্রিটিশ পরিবহণ কোম্পানির জাতীয়করণ সুপারিশ করে। কমিটি আরও সুপারিশ করে, উপকূলীয়, জলপথ পরিবহণে লিপ্ত ভারতীয় কোম্পানিগুলির সংরক্ষণ, ডাকপরিবহণে চুক্তি এবং আরও কিছু পদক্ষেপ যা যুক্তরাজ্য (অতীতে ও যুদ্ধকালে), যুক্তরাষ্ট্র জাপান, ইটালি ও অন্যান্য স্বাধীন ও উন্নত দেশগুলি সাধারণত গ্রহণ করত। কিন্তু মূল সুপারিশগুলির কোনোটিই গৃহীত হয়নি। ভারতীয় জাহাজ পরিবহণকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় আইনসভায় এস এন হাজীর প্রস্তাবিত আইনের খসড়া সবকারের বিরোধিতায় নাকচ হয়ে যায়। সুতরাং ভারতীয় জাহাজ নির্মাণ ও পরিবহণের উন্নতিবিধানে কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করার ফলে ঐ শিল্পগুলি স্বাধীনতার আগে উন্নত হতে পারেনি।[৫৪]

উপসংহারে বলা যেতে পাবে, ভারতের অর্থনীতিতে সরকারি বা বেসবকারি বিনিয়োগের স্তরের উপর নির্ভরশীলতাব মাত্রা ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের বিভিন্ন শাখার বিভিন্ন রকম ছিল। তিরিশের দশকের মন্দায় মূলধনী দ্রব্য শিল্পের সমস্ত শাখাই—তা সে যতই ছোট বা নবীন হোক না কেন—ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু যে সমস্ত দ্রব্য একটি ন্যূনতম আয়তনের দেশীয় বাজারের উপর নির্ভরশীল ছিল (কাবণ, এই পণ্যগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভোগের প্রয়োজনে লাগত অথবা উৎপাদনশীল সম্পত্তিগুলিব রক্ষণাবেক্ষণের অপরিহার্য ব্যয়ের দ্বারা যেগুলির চাহিদা পুষ্ট হতো, যেমন টিনপ্লেট ও কাঁচা ইস্পাত) সেগুলির উৎপাদকরা সংকোচনশীল বাজারের বৃহত্তর অংশটিকে কোনো রকমে ধবে রাখতে পেরেছিল। কিছু দ্রব্য (যেমন, বিভিন্ন ধরনের বিন্যস্ত ইস্পাত) প্রত্যক্ষভাবে সরকারি বিনিয়োগের উপর নির্ভরশীল ছিল, এগুলির উৎপাদকরা সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তাব কাবণ, চূড়ান্ত রক্ষণশীল আর্থিক নীতিব দ্বারা পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপে সরকারি বিনিয়োগ-ব্যয়ের কাটছাঁট। তুলোকল, কাগজ ও চিনির মতো কিছু শিল্প সংরক্ষণের সুযোগ পাওয়ার ফলে বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিল, কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থাগুলিকে কোনো রকমে ব্যবসা চালাতে হচ্ছিল বেসরকারি শিল্পে নির্মাণের কাজের উপর নির্ভর করে। বেসরকারি বিনিয়োগ সরকারি বিনিয়োগ হ্রাসকে কখনও পূরণ করতে পারেনি। কিছু শিল্প বন্দর বা তার পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে দেশের অভ্যন্তরে সরে যাওয়ার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের তুলনায় প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের বিনিয়োগ কম হ্রাস পাওয়ায় ছোট বা অঞ্চলভিত্তিক বেসরকারি ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থাগুলি বড় সংস্থার তুলনায় কিছুটা কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, এমনকি কোনো কোনো অঞ্চলে ছোট সংস্থাগুলি সমৃদ্ধ হয়েও উঠেছিল মন্দা সত্ত্বেও। এতে নিচু স্তরের কারিগরি দক্ষতা বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তারিত হয়, কিন্তু তা থেকে সামান্য কিছু সুবিধা প্রধান মূলধনী দ্রব্যের শিল্পগুলির মন্দাজনিত সংকোচন রোধ করতে পারেনি। এই পরিস্থিতির সৃষ্টিতে ভারত সরকারের ভ্রান্ত আর্থিক নীতির অবদান ছিল স্পষ্ট।

অনুবাদক : নিত্যানন্দ মণ্ডল

উৎস ও টীকা

১। জেসপ অ্যান্ড কোম্পানি শুরু হয়েছিল ১৮২০ নাগাদ, যদিও তাদের কারবার শুরু হয়েছিল অনেক আগেই অন্য নামে। ১৯০১ সালে তাদের ঠিকানা ভারতের পরিবর্তে ইংল্যান্ডে করা হয়। ১৯২৩-এ শেয়ার হোল্ডারদের বেশির ভাগই ছিল ইংরেজ, কিন্তু তাঁরা সকলেই সারাজীবন ভাবতেই কাটিয়েছেন। দ্রষ্টব্য : ITB ; *Evidence (Report on steel)*, খণ্ড ২ (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ৪৪৬। বার্ন অ্যান্ড কোম্পানি শুরু হয়েছিল ১৭৭৪ বা ১৭৮১ সালে। প্রথমদিকে তারা দালান তৈরি ও ঠিকাদারি কাজের সাথে যুক্ত ছিল। তাছাড়া, তাদের ঢালাইয়ের কারখানাও ছিল। ভারতে রেল নির্মাণের পর থেকে সংস্থাটির পরিচয় ঘটে একটি প্রধান ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে। হাওড়ায় কারখানা নির্মাণের মাধ্যমে এরা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিঙের ক্ষেত্রেও প্রবেশ করেছিল : *Burn & Co. Ltd. Howrah* (মার্টিন বার্ন লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৬১), আরও দ্রষ্টব্য : Playne & Wright ; *Bengal and Assam*, পৃ. ৯১-৯৫।

২। Sahni [Gov. India pub.], *Indian Railways, One Hundred Years, 1853 to 1953*, পৃ. ৫।

৩। *ঐ,* অধ্যায় ১৪ এবং ১৫।

৪। Sen, *Studies in Economic Policy and Development*, পৃ. ১৯-২১।

৫। মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাস্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান ও চিফ্ ইঞ্জিনীয়াব Sir Francis J. E. Spring-এর সাক্ষ্য দেখুন, *Evidence (Report of IIC)*, খণ্ড ৩, (PP 1919, XIX), পৃ. ৬৮-৬৯।

৬। উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য : Watson [IPG pub.], *Monograph on Iron and Steel work*, পৃ. ৫৪-৫৭।

৭। Sen, *Studies in Economic Policy and Development*, পৃ. ১৯-২০। ভারত সরকার কর্তৃক রেলগাড়ির জন্য ক্রমবর্ধমান ব্যয় সম্ভবত বার্ন অ্যান্ড কোম্পানি এবং জেসপ অ্যান্ড কোম্পানির ওয়াগন নির্মাণ বিভাগ স্থাপনে উদ্দীপনা জুগিয়েছিল। রেলগাড়ির উপর প্রস্তাবিত ব্যয় ছিল নিম্নরূপ :

	মিলিয়ন টাকা
১৯০৩-৪	২৯.১
১৯০৪-৫	২৯.২
১৯০৫-৬	২৭.৯
১৯০৬-৭	৩৮.২
১৯০৭-৮	৫৬.৮

Indian financial statement for 1907-8 and proceedings দ্রষ্টব্য (PP 1907, LVIII), পৃ. ১৯৮ এবং ২১৬।

৮। রিচার্ডসন অ্যান্ড ক্রুড্ডাস কোম্পানির অংশীদার এইচ. ডি. গিলের সাক্ষ্য দেখুন : *Evidence (Report of IIC)*, খণ্ড ৪ (PP 1919, XIX), পৃ. ৭৬-৭৮, বিশেষত গিল ও প্রেসিডেন্ট টমাস হল্যান্ডের মধ্যে মত বিনিময়, পৃ. ৭৮।

৯। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, কলকাতার বার্ন অ্যান্ড কোম্পানি ১৯০৩-৪-এ কোনো ওয়াগন বা রেলগাড়ির বরাত পায় নি। ১৯০৭-৮ থেকে ১৯১৩-১৪ পর্যন্ত কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত ববাতেব পবিমাণ কিছুটা অনিয়মিতভাবে বাড়তে থাকে। আগের বছরটিতে কোম্পানি ১৪৭টি ওয়াগন ও ৪০টি গাড়ি এবং পরের বছরটিতে ১৩৫৪টি ওয়াগন ও ৯৬টি গাড়ির জন্যে বরাত পেয়েছিল। যুদ্ধের সময় অবস্থা পুরোপুবি বদলে গিযেছিল কারণ রেলওয়ের সম্প্রসাবণ কর্মসূচি ভীষণভাবে বিঘ্নিত হয়েছিল। দ্রষ্টব্য ঃ ITB, *Evidence (Report on steel)*, খণ্ড ২ (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ৩১৬-১৮। অন্য ওয়াগন প্রস্তুতকারী সংস্থা, জেসপ অ্যান্ড কোম্পানি একেবারেই কোনো বরাত পায় নি। *ঐ*, পৃ. ৪৩৫।

১০। দ্রষ্টব্য ঃ *India's Contribution to the Great War* (কলকাতা, ১৯২৩)।

১১। উদাহরণস্বরূপ ITB-তে জেসপ অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেডের সাক্ষ্য দেখুন : *Evidence (Report on steel)*, খণ্ড ২ (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ৪৩৫।

১২। Gov. India, CISD : *Statistical abstract for British India*, 7th Issue (১৯১৩-১৪) (কলকাতা, ১৯১৫), এবং *Statistical abstract for British India 1913-14 to 1922-3* (কলকাতা, ১৯২৪)। ১৯১১-র শিল্প সুমারিতে কেবলমাত্র ২০ বা তার বেশি সংখ্যক লোক নিয়োগকারী কারখানাগুলিকে ধরা হযেছিল এবং ১৯২১-এর সুমাবিতে ১০ বা তার বেশি লোক কাজ করে এমন কাবখানাগুলিকেও ধরা হয়েছিল। দ্রষ্টব্য ঃ *Census of India, 1921*, খণ্ড ১, *Report* (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ২৬৬।

১৩। ITB, *Evidence (Report on steel)*, খণ্ড ১ (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ৬৬ এবং ৭০ ; ১৯১৮-র পরিকল্পনাগুলির জন্যে, *ঐ*, পৃ. ৮৭।

১৪। কার্পাসবয়ন যন্ত্রাদি উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির মধ্যে Angus and Company এবং Fairbairn Lawson, Combe and Barbour (India) Limited ছিল অন্যতম। পূর্ণক্ষমতায় তাদের ইস্পাতের প্রয়োজন ছিল যথাক্রমে ২০০০ ও ২০০ টন। দ্রষ্টব্য : *ঐ*, খণ্ড ২, পৃ. ৯-১১ এবং ৫৪০। কিছু ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থার পক্ষে অস্তিত্ব রক্ষা আর সম্ভবপর ছিল না এবং সেগুলি ১৯১৯ ও ১৯২০-র মধ্যে উঠে গিয়েছিল। এই রকম সংস্থাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য অটোমেটিক টুল্‌স্ লিমিটেড (কলকাতা), দি বেঙ্গল ব্রিজ অ্যান্ড বোল্ট কোম্পানি লিমিটেড (একত্রিত হওয়ার আগে এটি ছিল অন্যতম প্রধান ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানি যার পরিচালনায় ছিল মেসার্স জে.সি.ব্যানার্জি অ্যান্ড কোম্পানি), বেঙ্গল লেড মিল্‌স্ কোম্পানি (চায়ের বাক্সে সীসার প্রলেপ দেওয়ার জন্যে এটি স্থাপিত হয়েছিল) এবং দি ডক ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড।

১৫। ITB, *Evidence (Report on steel)*, খণ্ড ২ (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ৫৮৩-৪।

১৬। *ঐ*, পৃ. ৫৮৫।

১৭। *Report of the Railway Industries Committee* (দিল্লী, ১৯২৩), পৃ. ১।

১৮। *ঐ*, পৃ. ৩-৪।

১৯। *ঐ*, পৃ. ৪।

২০। *ঐ*, পৃ. ৪।

২১। *ঐ*, পৃ. ৫।

২২। ITB, *Report on steel* (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ১১২।

২৩। *ঐ*, পৃ. ১১৩-১৫।

২৪। ITB. *Evidence (Report on steel)*, খণ্ড ২ (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ৩১৫।

২৫। *ঐ*, পৃ. ৩১৭-১৮।

২৬। ITB, *Report on steel* (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ১১৭-১২০।

২৭। ITB, *Evidence (Report on steel)* ১৯২৪, খণ্ড ২,পৃ. ২৮৮।

২৮। *ঐ*, পৃ. ২৮০-৯৩।

২৯। দ্রষ্টব্য ঃ ITB, *Report on steel* (কলকাতা, ১৯২৪), Third Report, অধ্যায় ২, পৃ. ১৬৯-৭১। লক্ষ্যণীয় যে ১৮৯৬ থেকে জি. আই. পি. রেলওয়ের আজমীরের কারখানায় এবং ১৮৯৯ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়ান বেলওয়েজের জামালপুরের কারখানায় রেল-ইঞ্জিন তৈরি হয়েছে। দুই বিশ্বযুদ্ধেব সময়ে এই উৎপাদন ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। যাই হোক, এই প্রয়াস সফল হলেও বৃহদায়তনে রেল-ইঞ্জিন নির্মাণ গৃহীত রেলওয়ে নীতির অংশ হতে পারে নি। যদিও দুই যুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ে পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচির সাথে সাথে রেল-ইঞ্জিন উৎপাদনে স্বয়ম্ভবতা প্রভূত পরিমাণ ব্যয় ও বিদেশী মুদ্রা বাঁচাতে পারত। দ্রষ্টব্য : Sahni [Gov. India pub.], *Indian Railways*, পৃ. ১০৭-৯; এবং Lehmann. 'Great Britain and the Supply of Railway Locomotives for India'.

৩০। ITB : *Report on steel* (কলকাতা,১৯২৪), পৃ. ১৭৬।

৩১। *ঐ*, পৃ. ১৭৯। দুটি প্রধান ঢালাই ইস্পাত সংস্থা, হুকমচাঁদ ইলেক্টিক স্টিল কো. এবং দি কীর্ত্যানন্দ আয়রন অ্যান্ড স্টিল ওয়ার্কস্ লিমিটেডে ১৯২৩ সালে নিয়োজিত মোট পুঁজির পরিমাণ ছিল প্রায় ২ মিলিয়ন টাকা।

৩২। *ঐ*, পৃ. ১৮২।

৩৩। *ঐ*, পৃ. ১৮০-৪। ইস্পাত চাদরের উজ্জ্বলতা সাধনে ব্যবহৃত অত্যাবশ্যকীয় কাঁচামাল আমদানির উপর শুল্ক লোপের আবেদনকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করার কথা ট্যারিফ বোর্ড বলেছিল, কিন্তু কোনো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব তারা পেশ করে নি।

৩৪। ITB, *Evidence (Report on steel)*, খণ্ড ২ (কলকাতা,১৯২৪), পৃ. ১৬-২০।

৩৫। ITB, *Evidence (Report on steel)* খণ্ড ৩ (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ৭২৯-৩০।

৩৬। ITB, *Statutory enquiry 1926: steel*, খণ্ড ১ (কলকাতা, ১৯২৬), পৃ. ১০১।

৩৭। *ঐ*, পৃ. ১০৭।

৩৮। *ঐ*, পৃ. অধ্যায় ১৪ এবং ১৫।

৩৯। IIB, *Statutory enquiry 1933 steel* খণ্ড ৩ (দিল্লী, ১৯৩৫), পৃ ২৩৪।

৪০। টিনপ্লেট কোম্পানি তাদেব সম্পত্তিব বুকভ্যাল্যু ১৯২৫-এব শেষে ১৬, ১৫৯, ৭৩৬ টাকা থেকে ১৯২৭-এ ১২,০০০,০০০ টাকায নামিযে আনাব জন্যে তাদেব পুঁজিব পুনর্গঠন কবেছিল, ডিবেঞ্চাব ও সাধাবণ শেয়াবেব চলতি মূল্যও সেইমতো পবিবর্তন কবা হযেছিল। দ্রষ্টব্য IIB, *Statutory enquiry 1933 steel,* খণ্ড ৩ (দিল্লী, ১৯৩৫), পৃ ২৪৩।

৪১। *ঐ,* অধ্যায ১৫,১৬ এবং ১৯।

৪২। তিবিশেব দশকেব মন্দাব আগে এবং মন্দা চলাকালীন সময়ে ভাবতে ব্যবহৃত মোট ইস্পাত ব্যযে IISCO' ব বিক্রযেব অংশ তুলনা কবা যেতে পাবে।

৪৩। ITB, *Report on the iron and steel industry* (দিল্লী, ১৯৩৪), পৃ ১০৬-৭।

৪৪। IIB *Statutory enquiry 1933 steel* খণ্ড ৩ (দিল্লী, ১৯৩৫) পৃ ২৪২।

৪৫। IIB, *Report on the iron and steel industry* (দিল্লী, ১৯৩৪), অধ্যায ১১ এবং *Statutory enquiry 1933 steel* খণ্ড ৩ (দিল্লী, ১৯৩৫), পৃ ২৬৬ ৩২৬।

৪৬। *Statutory enquiry 1926 steel,* খণ্ড ১ (কলকাতা, ১৯২৬), পৃ ৮৮।

৪৭। ITB, *Report on the iron and steel industry* (দিল্লী, ১৯৩৪), পৃ ৯৭-৮।

৪৮। *ঐ,* অধ্যায ৯।

৪৯। *Statutory enquiry 1926 steel* খণ্ড ৪ (কলকাতা, ১৯২৭), পৃ ১০১-২।

৫০। ITB, *Report on the iron and steel industry* (দিল্লী, ১৯৩৪), পৃ ১০৪। লভ্যাংশেব পবিসংখ্যান IIYB'ব বিভিন্ন সংখ্যা থেকে নেওযা হযেছে।

৫১। ITB, *Report regarding the grant of protection to the ship building industry* (কলকাতা, ১৯২৬), পৃ ১-৩।

৫২। *ঐ,* পৃ ১-১৩।

৫৩। S N Haji, *State Aid to Indian Shipping* (Indian Shipping Series, Pamphlet No 1, Bombay, 1922), পৃ ৬।

৫৪। *ঐ,* পৃ ৭-১৮ , *IIYB, 1936-7, Evidence of the Fiscal Commission, 1949-50* (the memorandum of the Indian National Steamship Owners' Association,Bombay), খণ্ড ৩ (দিল্লী, ১৯৫২), পৃ. ১৮৫-২৭৬।

অনুবাদক · নিত্যানন্দ মণ্ডল

১১

সিমেণ্ট শিল্প

পোর্ট ল্যান্ড সিমেণ্ট শিল্প ভারতে বিকাশ লাভ করেছিল কিছুটা দেরিতে।[১] যদিও ভাবতে ১৯১৪-এ সিমেণ্টের ব্যবহার ছিল খুবই কম (১৬৬, ৬৬৮ টন মাত্র) তবুও তা সঠিক আয়তনেব বেশ কয়েকটি কারখানা স্থাপনের পক্ষে যথেষ্টই ছিল (সারণি ১১.১ দ্রষ্টব্য)। এরকম অনুমান করা যায়, ভারতীয় বা ইয়োরোপীয় শিল্পপতিদের সিমেণ্ট কারখানা স্থাপনের ঝুঁকি নেওয়ার আগে প্রয়োজন ছিল গৃহ নির্মাণের পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটানো এবং পশ্চিম ভারতে সিমেণ্টের বিপুল পরিমাণ চাহিদা সৃষ্টি করা। প্রথম যে তিনটি কোম্পানি বড় আকারে সিমেণ্ট উৎপাদন শুরু করেছিল সেগুলি হলো : ইন্ডিয়ান সিমেণ্ট কোম্পানি লিমিটেড, কাট্‌নি সিমেণ্ট কোম্পানি লিমিটেড এবং বুন্দি পোর্টল্যান্ড সিমেণ্ট কোম্পানি লিমিটেড। এগুলি সবই চালু হয়েছিল যথাক্রমে টাটা সন্স্‌, সি ম্যাকডোনাল্ড অ্যান্ড কোম্পানি, এবং কিলিক, নিক্সন অ্যান্ড কোম্পানি, এই তিনটি ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসের উদ্যোগে। এদের কারখানাগুলি ছিল বোম্বাইয়ের কাছে—কাথিয়াওয়ারের পোরবন্দরে মধ্যপ্রদেশের কাটনিতে এবং রাজপুতানার বুন্দিতে।[২] মাদ্রাজে ১৯০৪-এ সাউথ ইন্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল্‌স লিমিটেড গড়ে তুলেছিল সিমেণ্টের আদি কোম্পানিটি। কিন্তু এতে মৌল কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করা হতো শঙ্খ এবং এর উৎপাদন-ক্ষমতা ছিল বছরে মাত্র ১০,০০০ টন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতে কোম্পানিটি কার্যত উঠে গেল।[৩] দক্ষিণ ভারতে সিমেণ্টের বাজার ছিল ছোট। ফলে কাঁচামালের যোগান থাকা সত্ত্বেও এবং মাদ্রাজের শিল্প-দপ্তর প্রয়োজনীয় তথ্য এবং পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করলেও কোয়েম্বাটুরের মাদুকারাই-এ কোয়েম্বাটুর সিমেণ্ট কোম্পানি লিমিটেড তৈরি হওয়ার আগে পর্যন্ত কোনো সিমেণ্ট কোম্পানি গড়ে ওঠেনি।[৪]

সারণি ১১.১ ভারতে সিমেণ্টের উৎপাদন, আমদানি ও ব্যবহার, ১৯১৪ থেকে ১৯৩৮ (সংখ্যাগুলি টনে প্রকাশিত)

বছর	ভারতের উৎপাদন	ভারতে মোট (সরকারি ও বেসরকারি) আমদানি	ভারতের মোট ব্যবহার
১৯১৪	৯৪৫	১৬৫,৭২৩	১৬৬,৬৬৮
১৯১৫	১৭,৯১২	১৪২,৪৬৯	১৬০,৩৮১
১৯১৬	৩৮,৬৭২	৯৭,৫৪৩	১৩৬,২১৫

বছব	ভাবতেব উৎপাদন	ভাবতে মোট (সবকাবি ও বেসবকাবি) আমদানি	ভাবতেব মোট ব্যবহাব
১৯১৭	৭৩,৭২৮	৮৫,৫৯৪	১৫৯,৩২২
১৯১৮	৮৪,৩৪৪	২৭,১৭৭	১১১,৫২১
১৯১৯	৮৬,৮১২	৯২,৭৮৭	১৭৫,৫৯৯
১৯২০	৯১,২৫৩	১৩৮,৬৯৮	২২৯,৯৫১
১৯২১	১৩২,৮১২	১২৯,৮১৩	২৬২,৬২৫
১৯২২	১৫১,৩৩৬	১৩৬,৯২০	২৮৮,২৫৬
১৯২৩	২৩৪,৯৩৬	১২৪,৮২২	৩৫৯,৭৫৮
১৯২৪	২৬৩,৭৪৬	১১৭,৯৫০	৩৮১,৬৯৬
১৯২৫	৩৬০,৫৪৯	১৩৪,২৯২	৪৯৪,৮৪১
১৯২৬	৩৮৮,০০০	১০৬,৯১৬	৪৯৫,০০০
১৯২৭	৪৭৮,০০০	১২১,২৯৯	৫৯৯,০০০
১৯২৮	৫৫৮,০০০	১৩৭,৪২৮	৬৯৫,০০০
১৯২৯	৫৬১,০০০	১২৯,৮৭৮	৬৯১,০০০
১৯৩০	৫৬৩,৯২৯		
১৯৩০-১	৫৭০,০০০	১২০,৫৭৫	৬৯১,০০০
১৯৩১-২	৫৮৩,০০০	৯১,৭৪৪	৬৭৫,০০০
১৯৩২-৩	৫৯২,৫৩১	৮৫,৪৮৫	৬৭৮,০১৬
১৯৩৩-৪	৬৪২,৯৪৪	৬৫,৯১৫	৭০৮,৮৫৯
১৯৩৪-৫	৭৮০,৭৯৪	৬৯,১১১	৮৪৯,৯০৫
১৯৩৫-৬	৮৯০,৬৮৩	৫৮,৭৯৬	৯৪৯,৪৭৯
১৯৩৬-৭	৯৯৭,৪১৪	৫২,১৬৪	১,০৪৯,৫৭৮
১৯৩৭-৮	১,১৬৯,৮৯৪	৩১,৯১৬	১,২০১,৮১০

উৎস : ১৯৩৭-৮-এব আগে ব্রহ্মদেশে কোনো সিমেন্ট কাবখানা ছিল না (পবিসংখানে ব্রহ্মদেশ অন্তর্ভুক্ত)। আমদানিব পবিসংখ্যান আর্থিক বছবেব হিসাবে আছে। ১৯২৪ পর্যন্ত উৎপাদনেব পবিসংখ্যান ITB *Report on cement* (কলকাতা, ১৯২৫) থেকে গৃহীত হযেছে। ১৯২৩-৪ পর্যন্ত আমদানিব পবিসংখ্যানও ঐ একই সূত্র থেকে গৃহীত হয়েছে, পববর্তী পবিসংখ্যান Gov India, CISD *Annual statements of seaborne trade* (কলকাতা, বার্ষিক) থেকে গৃহীত। ১৯২৪-এব পব ১৯২৬ থেকে ১৯৩১-২ পর্যন্ত পবিসংখ্যানেব উৎস, *Sastry, Statistical Study of India's Industrial Development* , ১৯২৫ ও ১৯৩০, এই দুই বছবেব তথ্যের জন্যে *The History of the Cement Industry in India,* প্রকাশ (১৯৩৭) করেছিল Associated Cement Companies , এব থেকে উদ্‌ধৃতিব জন্যে দ্রষ্টব্য · Mukerjee and Dey, *Economic Problems of Modern India,* পৃ ৩৯। প্রাসঙ্গিক বছরের অন্যান্য পরিসংখ্যানের জন্যে দ্রষ্টব্য Gov. India, CISD · *Statistical abstracts for British India* (কলকাতা, বার্ষিক)।

উত্তর ও দক্ষিণ ও ভারতে অবশ্য সিমেণ্ট কারখানা গড়ে উঠেছিল খুব দ্রুত গতিতে— এর কারণ ছিল সিমেণ্ট ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং যুদ্ধোত্তর কালে বিনিয়োগ ও নির্মাণের কাজের পরিমাণ ফেঁপে ওঠা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই জানা গিয়েছিল যে, উত্তব ভারতেব অনেক অঞ্চলে কাঁচামালের সহজলভ্যতার জন্যে পোর্টল্যান্ড সিমেণ্ট লাভজনকভাবে উৎপাদন করা সম্ভবপর ছিল, কিন্তু যুদ্ধের কারণে বিনিয়োগ থেমে গিয়েছিল।[৫] যুদ্ধের পরে বিনিয়োগ দ্রুত হারে বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে সিমেণ্ট শিল্পে উদ্বৃত্ত উৎপাদন ক্ষমতাব সৃষ্টি হলো এবং তারা শুল্ক-সংরক্ষণের জন্যে প্রার্থনা জানাল। আই টি বি-ব তদন্তকালে দেখা গেল যে, ভারতে সিমেণ্টের মোট চাহিদা প্রায় ৩৯০,০০০ টন ছিল, অথচ ভাবতীয় সিমেণ্ট কারখানাগুলির উৎপাদন-ক্ষমতা ইতিমধ্যেই ৫৫০,০০০ টনে পৌঁছে গিয়েছিল এবং টাটা সন্‌সের শাহাবাদ কোম্পানি চালু হলে ৬০০,০০০ টন উৎপাদনের আশা ছিল। বিদেশ থেকে সিমেণ্ট আমদানির ফলে দেশীয় সিমেণ্টের বাজার আরও সঙ্কুচিত হয়েছিল। ভারতে সিমেণ্ট ব্যবহারকারীদের ব্রিটিশ সিমেণ্টের জন্যে চাহিদা খুব প্রবল ছিল (অবশ্য ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের সিমেণ্টের ক্ষেত্রে একথা বলা চলে না)।

সমস্যা এই নয় যে, কারখানাগুলির উৎপাদন-ক্ষমতার তুলনায় চাহিদার ঘাটতি ছিল। শিল্পপতিরা একে অন্যের থেকে স্বাধীনভাবে এই শিল্পে বিনিয়োগ করছিলেন বলেই উদ্বৃত্ত ক্ষমতা সৃষ্টি হয়েছিল। প্রতিটি বিনিয়োগকারীই বাজারের আয়তন সম্পর্কে ভুল ধারণা করেছিলেন এবং একটি নতুন এলাকায় কারখানা স্থাপনের সম্ভাব্য সুবিধাগুলিকে অতিরঞ্জিত করে দেখেছিলেন।

সিমেণ্টের উৎপাদনের মোট ব্যয়ে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল পরিবহণ ব্যয়, সে কারণে এই অতিরঞ্জন স্বাভাবিক ছিল। এই সমস্যার সমাধান শুধুমাত্র শুল্ক-সংরক্ষণের মাধ্যমে সম্ভবপর ছিল না। শুল্ক সংরক্ষণের ফলে সিমেণ্টের দামের সম্ভাব্য বৃদ্ধি তার চাহিদাকে আরও বেশি সঙ্কুচিত করতে পারত কেননা গৃহনির্মাণের কাজে উপাদান হিসাবে সিমেণ্ট ছিল নবাগত এবং দাম বাড়লে গৃহনির্মাণের কাজে সিমেণ্টের বিকল্প হিসাবে পুরনো উপাদানগুলি ব্যবহার করার প্রবণতা বাড়ত। অন্যদিকে গৃহ নির্মাণের উপাদান হিসাবে সিমেণ্টের উজ্জ্বল সম্ভাবনা সম্পর্কে সকলে ক্রমশ বেশি সচেতন হওয়ার ফলে বিশের দশকে এটা আশা করা খুবই সঙ্গত ছিল যে, সিমেণ্টের ব্যবহার সময়ের সঙ্গে অবিচলভাবে বাড়বে।[৬] সিমেণ্টের চাহিদার এই প্রত্যাশিত বৃদ্ধির কারণ অবশ্য শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ বা কৃষিক্ষেত্রে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির মধ্যে নিহিত নয়। হয়ত গৃহনির্মাণের অন্যান্য উপাদানের তুলনায় পোর্টল্যান্ড সিমেণ্টের দাম আপেক্ষিকভাবে কমে যাওয়ার জন্যেই সিমেণ্টের চাহিদা বৃদ্ধি সম্পর্কে প্রত্যাশা করা যেত।

যদি আমরা কারখানার যন্ত্রপাতি আমদানির সঙ্গে ভারতে সিমেণ্ট ব্যবহারের পরিসংখ্যান তুলনা করি (সারণি ১১.১ দ্রষ্টব্য), তাহলে দেখব যে, যখন সিমেণ্টের ব্যবহারের পরিমাণ ১৯২০ সালে ২৩০,০০০ টন থেকে বেড়ে ১৯২৯-এ ৬৯১,০০০ টন হলো, ঠিক একই সময়ে শিল্প-যন্ত্রপাতি আমদানির মূল্য ১০৭ মিলিয়ন টাকা থেকে কমে গিয়ে হলো .৭৭ মিলিয়ন টাকা। ১৯২০-২১ থেকে ১৯২২-২৩ ও ১৯২৭-২৮ থেকে ১৯২৮-২৯পর্যন্ত, এই দুটি সময়ের ব্যবধানে শিল্প-যন্ত্রপাতির আমদানি হ্রাস এবং সিমেণ্ট ব্যবহারের পরিমাণে বৃদ্ধির বৈপরিত্য ছিল আরো বেশি তীব্র।

আবার ১৯৩১-৩২ থেকে ১৯৩৬-৩৭-এর মধ্যে সিমেন্টে ব্যবহারের পরিমাণ ৬৭৮,০০০ টন থেকে বেড়ে ১ মিলিয়ন টনেরও বেশি হয়েছিল যদিও ১৯৩৬-এর মে পর্যন্ত সিমেন্টের দাম একই স্তরে থেকে গিয়েছিল।[৭] একই সময়ে শিল্প-যন্ত্রপাতি আমদানির মূল্য ৪৯ মিলিয়ন টাকা থেকে বেড়ে হয়েছিল ৬৪ মিলিয়ন টাকা। মোটের উপর একথা স্পষ্ট যে, দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী বছরগুলিতে সিমেন্ট ব্যবহারের পরিমাণ শিল্প-যন্ত্রপাতি আমদানির তুলনায় আর্থিক ও প্রকৃত মূল্যের উভয় দিক থেকেই দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। সিমেন্টের দাম হ্রাস না পাওয়া সত্ত্বেও এই বৃদ্ধি ঘটেছিল।

উপরোক্ত সমস্ত বিষয়গুলি একসঙ্গে বিবেচনা করলে অনুমান করা সঙ্গত যে, অন্যান্য শিল্পের বিকাশের উপর নির্ভরশীল না হয়েও সিমেন্টের ব্যবহারে বৃদ্ধি ঘটেছিল। সিমেন্টের চাহিদা বৃদ্ধির পেছনে সাধারণভাবে শিল্পের বিকাশের তুলনায় নির্মাণ প্রযুক্তির পরিবর্তন বেশি দায়ী ছিল বলে মনে হয়।[৮] ১৯২২ থেকে ১৯২৫ পর্যন্ত সিমেন্টের ব্যবহার বৃদ্ধি ভারতীয় সিমেন্টের দাম কমে যাওয়ার সাথেও সম্পর্কিত ছিল। ১৯২২-এ টন প্রতি ৭০ টাকারও বেশি থেকে ১৯২৫-এর জানুয়ারিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দাম টন প্রতি ২৫ টাকায় নেমে এসেছিল।[৯] আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা এবং উদ্বৃত্ত উৎপাদন-ক্ষমতার অস্তিত্বই দাম কমে যাওয়ার কারণ ছিল এবং আই টি বি-র মতে ১৯২৫-এ সিমেন্টের প্রচলিত দাম ছিল 'সম্পূর্ণভাবে অলাভজনক'[১০] এবং তা উৎপাদন ব্যয় পুষিয়ে নেওয়ার পক্ষেও যথেষ্ট ছিল না। বিভিন্ন কোম্পানির পক্ষে ভারতীয় সিমেন্টের ন্যায্য বিক্রয় দাম ছিল, আই টি বি-র হিসাব অনুসারে, টন প্রতি ৪৬ টাকা থেকে ৬০ টাকা।[১১]

১৯২০-র প্রায় শুরু থেকে ভারতীয় সিমেন্ট শিল্প উদ্বৃত্ত উৎপাদন-ক্ষমতা নিয়েই কাজ করছিল। ১৯২৪-এ সিমেন্ট কোম্পানিগুলির মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২৬৪,০০০ টন যদিও সৃষ্ট উৎপাদন-ক্ষমতা ছিল ৫৬১,০০০ টন। সুতরাং ১৯২৪-এ উৎপাদন-ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, ভারতীয় সিমেন্ট কোম্পানিগুলি ১৯২৯-এর আগে পর্যন্ত পূর্ণ উৎপাদন-ক্ষমতার স্তরে পৌঁছাতে পারেনি। একটি হিসাব অনুসারে[১২] ১৯৩৬-৩৭ নাগাদ এই শিল্পের উৎপাদন-ক্ষমতা ১.৪৬৫ মিলিয়ন টনে উন্নীত হয়েছিল যদিও প্রকৃত উৎপাদন ছিল ১ মিলিয়ন টনেরও কম। ১৯৩৮-এ ডালমিয়া গোষ্ঠীর কোম্পানিগুলি উৎপাদন শুরু করে এবং ১৯৪০-এ মোট উৎপাদন-ক্ষমতা বেড়ে গিয়ে হয় ২.৫ মিলিটন টন যদিও ঐ বছরে প্রকৃত উৎপাদন ছিল মাত্র ১.৫ মিলিয়ন টন।[১৩]

আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার চাপে ১৯২৫-এর পর থেকে সিমেন্টের দাম ক্রমাগত হ্রাস পেতে লাগল এবং তিনটি কোম্পানির অস্তিত্ব লোপ পেল। অনেকগুলি আধা-একচেটিয়া ধরনের সংস্থার জন্ম হলো যেমন, ১৯২৬-এ তৈরি হলো ইন্ডিয়ান সিমেন্ট ম্যানুফাক্চারার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং ১৯৩০-এ কংক্রিট অ্যাসোসিয়েশন অব্ ইন্ডিয়া এবং সিমেন্ট মার্কেটিং কোম্পানি অব্ ইন্ডিয়া লিমিটেড। শেষোক্ত কোম্পানিটি অধিকাংশ কোম্পানি বিক্রি হয়ে যাওয়ার জন্য দায়ী ছিল এবং সিমেন্টের দাম স্থিতিশীল করার কাজে সফল-ও হয়েছিল যদিও মোট উৎপাদনের পরিমাণের উপর এর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না।[১৪]

১৯৩৬-এ ১২টি চালু কোম্পানির মধ্যে ১০টি কোম্পানির সংযুক্তির ফলে তৈরি হলো অ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানি (এ সি সি)। সিমেন্ট মার্কেটিং কোম্পানি তার ছয় বছরের অস্তিত্বকালে প্রত্যেক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে পূর্ব নির্ধারিত কোটা অনুসারে

সিমেণ্ট বিক্রয়ের একটি ন্যূনতম মাত্রা বেঁধে দিতে সমর্থ হয়েছিল এবং অন্যান্য ধরনের সিমেণ্টের পরিবর্তে পোর্টল্যান্ড সিমেণ্ট জনপ্রিয় করে তোলার কাজে প্রচুর অর্থ ব্যয়ও করেছিল। কিন্তু কোটা বেঁধে দেওয়ার অনিবার্য ফল হলো কারখানার নিহিত উৎপাদন ক্ষমতার অদক্ষ ব্যবহার এবং পরিবহণ ব্যয়ের অযৌক্তিক বৃদ্ধি। ফলে মূলত এফ. ই. ডিন্‌শ-র নেতৃত্বে সিমেণ্ট কোম্পানিগুলির সংযুক্তিকরণের পরিকল্পনা নেওয়া হলো।[১৫] নবগঠিত অ্যাসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানি লিমিটেড-এর পরিচালকমণ্ডলীতে পশ্চিম ভারতের প্রায় সমস্ত বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরাই ছিলেন (বোর্ডে ছিলেন স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, স্যার চুনীলাল মেহতা, অম্বালাল সারাভাই, এবং আরও কয়েকজন পার্শী ব্যবসায়ী প্রতিনিধি।[১৬] কিন্তু খুব শীঘ্রই এই কোম্পানির একচেটিয়া অবস্থান চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলো পূর্ব ভারতের একটি কোম্পানির কাছ থেকে—যে কোম্পানিটি হলো ডালমিয়া জৈন গোষ্ঠী। যদিও ১৯৩৬ পর্যন্ত কয়েকটি সিমেণ্ট কোম্পানির সাফল্য তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না, কিছু কোম্পানির কাজকর্ম মন্দার বছরগুলিতেও খুব ভালো ছিল। ১৯৩৪ এবং ১৯৩৫-এ বুন্দি, ইন্ডিয়ান, কাটনি, শাহাবাদ এবং ওখা এই সমস্ত কোম্পানিগুলির ঘোষিত লভ্যাংশ ছিল শতকরা ১০ থেকে ২০-র মধ্যে।[১৭] যেহেতু সিমেণ্ট কারখানা স্থাপনের প্রারম্ভিক ব্যয় খুব বেশি ছিল না, সুতরাং এটা স্বাভাবিক যে, অ্যাসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানির একচেটিয়া অবস্থানকে খুব দ্রুত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হতে হলো।

১৯৩৮-এর মে মাসে ডালমিয়া গোষ্ঠীর কোম্পানি উৎপাদন শুরু করার সাথে সিমেণ্টের দাম টন প্রতি ৪৩ টাকা থেকে (কলকাতায়) ১৯৩৮-এর অক্টোবরে টন প্রতি ৩০ টাকায় দ্রুত নেমে এল। শেষপর্যন্ত দাম বেড়ে টন প্রতি ৩৩ টাকা হলেও সিমেণ্টের দাম ও বিক্রির পরিমাণ কমে যাওয়ার ঘটনা এসিসি-র নীট মুনাফার পরিমাণে প্রতিফলিত হলো : ১৯৩৮ এর ৩১ শে জুলাই যে বছর শেষ হলো, সে বছরে নীট মুনাফার পরিমাণ ছিল ৭,৬৩০,০০০ টাকা। পরের বছর তা কমে হলো ৩,১৭৮,০০০ টাকা এবং ১৯৪০-এর ৩১ শে জুলাই-এ দাঁড়াল ৩,৬০৬,০০০ টাকা। শেষ পর্যন্ত এসিসি এবং ডালমিয়া সিমেণ্ট কোম্পানির মধ্যে একটি যৌথ বিক্রয়-সংস্থা গড়ার চুক্তি হলো। ঠিক হলো যে, সিমেণ্টের দাম এই যৌথ সংস্থা স্থির করবে এবং দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মোট বিক্রির পরিমাণ সহমতের ভিত্তিতে ভাগ করে নেওয়া হবে।[১৮]

অতএব চিনি এবং ইস্পাত শিল্পের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনই সিমেণ্ট শিল্পের ক্ষেত্রেও চাহিদার অতিরিক্ত প্রকৃত বা সম্ভাব্য উৎপাদন-ক্ষমতার চাপে আধা-একচেটিয়া সংস্থার উদ্ভব ও চুক্তির ঘটনা লক্ষ্য করলাম।[১৯] একটি আংশিকভাবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নীতি-প্রণেতাদের কাছে ভারতের সিমেণ্ট শিল্পের বিকাশের ইতিহাস কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করে। উদ্বৃত্ত উৎপাদন-ক্ষমতার উদ্ভব এবং সীমিত পুঁজির অপচয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই শিল্পের প্রসারকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা কি সরকারের উচিত ছিল? এই প্রশ্নের সদর্থক উত্তর দেওয়া কঠিন। কারণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সিমেণ্ট শিল্পের উৎপাদন-ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার ঘটেছিল। কোনো কোনো বছরে মোট উৎপাদনের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ সরকার নিজেই ভোগ করত।[২০] উদ্বৃত্ত উৎপাদন-ক্ষমতার সমস্যার সমাধান বিনিয়োগের সঙ্কোচন নয়, বরং তা চাহিদার সম্প্রসারণের মধ্যেই নিহিত। বিশেষ করে যে পরিস্থিতিতে অন্যান্য শিল্পে বিনিয়োগের তুলনায় এই শিল্পে বিনিয়োগ বেশি লাভজনক ছিল এবং পুঁজি বা বিদেশি

মুদ্রার স্বল্পতা শিল্পটিতে বিনিয়োগের সামাজিক মুনাফার স্তরকে ব্যক্তিগত মুনাফার স্তরের নিচে নামাতে পারেনি।

অনুবাদক : জয়ন্ত আচার্য

উৎস ও টীকা

১। গোড়ার দিকের ইতিহাসের জন্যে দ্রষ্টব্য : H. A. P. Musgrave ও H. F. Davy : 'The Portland Cement Industry', Indian Munitions, *Industrial Handbook*, ১৯১৯, পৃ. ৩১৩-১৮।

২। কাটনি সিমেন্টের একজন বাদে আর সব পরিচালকরাই ছিলেন ভারতীয়, যদিও এর ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসের নাম ছিল সি ম্যাকডোনাল্ড অ্যান্ড কোম্পানি। অনুরূপভাবে বুন্দি সিমেন্টের (কিলিক, নিক্সন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন) অধিকাংশ পরিচালক ছিলেন ভারতীয়। দ্রষ্টব্য *IIYB*, ১৯১৪ ও ১৯২২, 'Miscellaneous Companies'। ১৯২৫-এ কাটনি সিমেন্ট কোম্পানির কারখানার অবস্থান ছিল বোম্বাই থেকে ৬৭৩ মাইল এবং কলকাতা থেকে ৬৭৪ মাইল দূরে। অপর দুটি কোম্পানির কারখানাগুলি কলকাতার তুলনায় বোম্বাইয়ের সন্নিকটবর্তী ছিল। ITB, *Report regarding the grant of protection to the cement industry* (কলকাতা, ১৯২৫), পৃ. ৫০।

৩। ITB , *Report on cement* (কলকাতা, ১৯২৫), পৃ. ৪ ; এবং Ian Scott Mackenzie'র সাক্ষ্য : *Evidence* (*Report of IIC*), খণ্ড ৩ (PP 1919, XIX), পৃ ৩৯। আরো দেখুন · *Report of the Department of Industries, Madras, for the year ended 31 March, 1920* (মাদ্রাজ, ১৯২১), পৃ. ১১।

৪। *Report of the Department of Industries, Madras for the year ended 31 March 1924* (মাদ্রাজ, ১৯২৫), পৃ. ১২। কোয়েম্বাটুর সিমেন্ট কোম্পানিটিকে প্রতিষ্ঠা করেছিল পশ্চিম ভারতের ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। শাহাবাদ ফ্যাক্টরি যে অঞ্চলে লাভজনক ব্যবসায়ে অক্ষম ছিল সেই অঞ্চলটিকে করায়ত্ত করার উদ্দেশ্যে কোম্পানিটির প্রতিষ্ঠা ঘটে। ১৯৩৬-৩৭-এ অন্ধ্র সিমেন্ট কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে এই উদ্যোগগুলি গড়ে ওঠার পেছনে শিল্প-দপ্তরের কোনো ভূমিকা ছিল না যদিও মাদ্রাজে সিমেন্ট শিল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে ঐ দপ্তর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। (১৯২৮ পর্যন্ত কয়েক বছরে মাদ্রাজে সিমেন্টের আমদানির পরিমাণ ছিল ২৫,০০০ টনের কাছাকাছি। দ্রষ্টব্য : *Report of the Department of Industries, Madras*, ১৯২৭-২৮ ও ১৯৩৬-৩৭, এই দুই বছরের জন্যে, যথাক্রমে পৃ. ১৪ ও ২৭।

৫। উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য : ১৯১৬-তে IIC-কে দেওয়া জন হোয়াইটের (ক্রিস্টি হোয়াইট অ্যাণ্ড (কোম্পানির প্রতিনিধি) সাক্ষ্য। তিনি বলেন, 'শাহাবাদের

ডেরিঅনসনে অবস্থিত অত্যাধুনিক সিমেন্টের কারখানাগুলির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে।' *Evidence (Report of IIC)*, খণ্ড ৬, *Confidential Evidence* (কলকাতা, ১৯১৮), পৃ. ২১-২।

৬। দ্রষ্টব্য : ITB , *Report on cement* (কলকাতা, ১৯২৫), পৃ. ৬-১০। ভারতীয় সিমেন্ট শিল্পকে শুল্ক সংরক্ষণের সুযোগ অনুমোদিত হয়নি। ট্যারিফ বোর্ডের বিবেচনায় বিদেশী প্রতিযোগিতার তুলনায় অতিরিক্ত আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতাই শিল্পটির প্রকৃত সমস্যা (১৯২৪-এ)। তাছাড়া অতিরিক্ত যানবাহনের ব্যয়ের দরুন শিল্পটি স্বাভাবিক সংরক্ষণের সুযোগ ভোগ করে।

৭। দ্রষ্টব্য : Gov. India, CISD : Review of the trade of India, 1937-8 (কলকাতা, ১৯৩৮), পৃ. ৫৪।

৮। এই প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য সিমেন্টের পরিবর্তে চুন ব্যবহারের সম্ভাবনা : *Report on cement* (কলকাতা, ১৯২৫), পৃ. ৯-১০।

৯। *ঐ*, পৃ. ১১।

১০। *ঐ*, পৃ. ১১।

১১। *ঐ*, পৃ. ২৭-৮।

১২। M. C. Munshi (K.P. Karnik'র সহকারিতায়) : *Industrial Profits in India (1936-44)* (নিউ দিল্লী, ১৯৪৮), পৃ. ২০৭।

১৩। দ্রষ্টব্য : George Rosen , *Industrial Change in India* (গ্লেনকো, ইলিনয়, ১৯৫৮), পৃ. ২১।

১৪। দ্রষ্টব্য : B. S. Rao , *Surveys of Indian Industries*, খণ্ড ২ (মাদ্রাজ, ১৯৫৮), পৃ. ১৮৯-৯০।

১৫। *Indian Finance Year-Book, 1936* (কলকাতা, ১৯৩৬), পৃ. ২৮২-৩।

১৬। *IIYB, 1938-39*, পৃ. ৩৬৩।

১৭। *Indian Finance Year-Book*, ১৯৩৬, পৃ. ২৮৩।

১৮। উপরোক্ত বিবরণটির সূত্র : Gov. India, CISD : *Review of the trade of India এবং Statistical abstract for British India* (কলকাতা, বার্ষিক) ; Munshi , *Industrial Profits in India*, অধ্যায় ৮।

১৯। বাজারে মিলিতভাবে পণ্য বন্টনের চুক্তি হয় TISCO ও SCOB-এর মধ্যে যখন শেষোক্ত সংস্থাটি পণ্য বিক্রয় শুরু করে।

২০। দ্রষ্টব্য : Rosen, *Industrial Change*, পৃ. ২২।

অনুবাদক : মনোজ কুমার সান্যাল।

১২

চিনি শিল্পের বিকাশ

১২.১ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে আখের উৎপাদন এবং চিনির চাহিদা

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ভারত থেকে প্রচুর পরিমাণে মূলত অশোধিত চিনি রপ্তানি হতো যদিও সেই সময়ে চীন ও মিশর থেকে কিছু পরিমাণ চিনি আমদানি করাও হতো। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে আমদানি করা চিনির তুলনায় ভারত থেকে আমদানিকৃত চিনির উপর বেশি হারে শুল্ক চাপানোর ফলে (শুল্কের হার ছিল হন্দর পিছু ৩০ শিলিং-এর মতো) গ্রেট ব্রিটেনে ভারতীয় চিনির রপ্তানি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অবশ্য পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে দাসত্ব প্রথা বিলোপের ফলে এবং এই দুই দেশ থেকে আমদানি করা চিনির উপর আরোপিত শুল্কের হারে সমতা আসার ফলে, চিনির রপ্তানি বাণিজ্য উর্ধ্বমুখী হতে শুরু করে। ১৮৪০ থেকে ১৮৪৫ এই সময়ের মধ্যে চিনি রপ্তানির পরিমাণ সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছয়। এরপর ব্রিটিশ সরকার চিনির ক্ষেত্রে অবাধ বাণিজ্যের নীতি চালু করে এবং তার ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বলয়ের বাইরের কোনো দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে ওঠা ভারতের পক্ষে আর সম্ভবপর ছিল না। সরকারি আনুকূল্যে গড়ে ওঠা বীট চিনি শিল্পই চিনির আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতের অবস্থার অবনতির প্রধান কারণ।[১]

সারণি ১২.১ ভারতে চিনি আমদানির সূচক সংখ্যা
(ভিত্তি : ১৮৮৪-৮৫ থেকে ১৮৮৮-৮৯ পর্যন্ত বছরগুলির গড় ১০০ ধরা হয়েছে)

কয়েকটি বৎসরের বা কোনো বিশেষ বৎসরের বার্ষিক গড়	পরিমাণ			মূল্য		
	শোধিত	অশোধিত	মোট	শোধিত	অশোধিত	মোট
১৮৮৪-৫ থেকে ১৮৮৮-৯	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
১৮৮৫-৬ " ১৮৯০-১	১২১	১৮৩	১২৩	১২০	১৮৮	১২১
১৮৯০-১ " ১৮৯৫-৬	১৪১	২২০	১৪৫	১৪৬	১৬৫	১৪৬
১৮৯৫-৬ " ১৯০০-০১	২৪২	৪৯৬	২৫৩	২১৯	৩৬১	২১৯
১৯০০-১ " ১৯০৫-০৬	৩৯৬	৮২৭	৪১৫	৩২৭	৯৩১	৩৩৫
১৯০৬-৭	৬০৮	২৬৭০	৬৯৭	৪২২	৩৩০৯	৪৫৬
১৯০৭-৮	৬২৬	২৩৯৮	৭০২	৪৫০	৩১০৫	৪৮১
১৯০৮-৯	৬৫৪	৩০৮৬	৭৫৮	৫২৩	৪৪১১	৫৬৯
১৯০৯-১০	৭১৮	২৪২৫	৭৯২	৫৭৯	২৪৪৭	৬০১

উৎস : F. Noel-Paton : *Notes on Sugar in India* (কলকাতা, ১৯১১)

সারণি থেকে এটা দেখা যাচ্ছে যে, উনিশ শতকের প্রায় সমস্ত সময় জুড়েই ভারতে শোধিত চিনির আমদানির পরিমাণ ছিল খুবই অকিঞ্চিৎকর। ভারতে অশোধিত চিনি যা উৎপাদিত হতো তাই ভোগ করা হতো। এই শতকের শেষ লগ্ন থেকে ভারতের চিনি আমদানির পরিমাণ বাড়তে থাকে দ্রুত গতিতে। ১২.১ সংখ্যক সারণিতে দেখা যাচ্ছে ১৮৮৪-৮৫-র পর থেকে ভারতে (বর্মা সহ) চিনির আমদানির পরিমাণ কীভাবে বেড়ে গেছে।

বেড়ে যাওয়ার পেছনে যে কারণগুলি কাজ করেছে সেগুলি কিন্তু খুব সরল : পৃথিবীতে যেখানেই বীট এবং আখ থেকে চিনির উৎপাদনের শিল্প গড়ে উঠেছিল সেখানেই প্রযুক্তিগত বিপুল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। এই পরিবর্তন যতখানি বীট ও আখ চাষের পদ্ধতি সং ক্রান্ত, ততখানি বীট ও আখ থেকে চিনি নিষ্কাষণের কৌশল সম্পর্কিত-ও। তাছাড়া রপ্তানিকারী দেশগুলির মধ্যে যেগুলি বিশেষ করে বীটের চিনি উৎপাদন করত, সেগুলিকে চিনি শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভর্তুকি দেওয়া হতো। এই সমস্ত দেশগুলির বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বীট অথবা আখ চাষের উন্নততর পদ্ধতি প্রচার করার ব্যাপারে বা আখ ও বীটের উন্নততর বীজ সহজলভ্য করার কাজে সরকার সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল। জাভা, ফরমোজা, ইত্যাদি দেশের সরকার চাষীদের একটি কেন্দ্রীভূত এলাকায় আখ চাষ করতে উৎসাহিত কিংবা প্রয়োজনে বাধ্য করেছে যাতে মিল মালিকদের এভাবে সাহায্য করা যায় এবং ফ্যাকটরিগুলিকে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক করে তোলা যায়।

বিপরীতক্রমে, ভারতে কী আখের চাষের পদ্ধতিতে, কী আখ থেকে চিনি নিষ্কাষণের কৌশলে প্রকৃতপক্ষে কোনো অগ্রগতিই ঘটে নি। একমাত্র মাদ্রাজে কৃষি-বিভাগ আখের কিছু নতুন জাতের চাষ সম্পর্কে প্রচার করা ছাড়া, কেন্দ্র বা বিভিন্ন প্রদেশের সরকার চিনি শিল্পের বিকাশের অনুকূলে কোনো রকম ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয় নি।

ভারতে চিনির আমদানি রোধ করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার প্রথম যে পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা হলো ১৮৯৯ সালের মার্চ মাসে চিনির আমদানির উপর শুল্ক আরোপ করা। এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল ভারত, মরিশাস ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের চিনি উৎপাদকদের আবেদনে সাড়া দিয়ে।[২] এই পদক্ষেপের ফল দাঁড়াল এই যে, ইয়োরোপ থেকে বীট-চিনির আমদানি কমে গেল কিন্তু মরিশাস, জাভা ও চীন থেকে আখের চিনির আমদানি গেল বেড়ে। চিনি উৎপাদক গোষ্ঠীর চাপে চিনি রপ্তানকারী দেশে রপ্তানির উপর ভর্তুকির পরিমাণ বাড়ানোর প্রতিক্রিয়া হিসাবে ভারতে চিনি আমদানির উপর শুল্কের পরিমাণ ১৯০২-এর মে মাসে আরও বৃদ্ধি করা হলো। ১৯০৩-এ অনুষ্ঠিত ব্রাসেল্স কনভেনশানের চুক্তি যে সব দেশ সমর্থন করে, সে সব দেশে চিনি রপ্তানির উপর ভর্তুকি লোপ করে দেওয়া হলো এবং ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই এই সব দেশের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে যে শুল্ক চাপানো হয়েছিল তাও লোপ করে দেওয়া হলো। কেবলমাত্র ডেনমার্ক, চিলি, আর্জেন্টিনা ও রাশিয়া, ইত্যাদি যে সব দেশ ব্রাসেলস্ কনভেনশানের প্রস্তাব মানে নি, সে সব দেশ থেকে চিনি আমদানির উপর শুল্ক আগের মতোই থেকে গেল। পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে শুল্ক চাপানো সত্ত্বেও, বিশেষ করে শুল্ক লোপ করার পর তো আরও বেশি মাত্রায় জাভা, মরিশাস ও অন্যান্য আখ উৎপাদনকারী দেশ থেকে চিনি আমদানির পরিমাণ বেশ দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল (১২.১ নং সারণি দ্রষ্টব্য)।

দেশীয় চিনি শিল্পের উপর এ সব ঘটনার ফল প্রতিকূল হলেও নাটকীয় কিছু ঘটে নি। দেশীয় শিল্পের সব স্তরেই অদক্ষ কৌশল ও পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই ভারতের প্রায় সর্বত্রই আখ পেষাইয়ের পুরনো কাঠ বা পাথরের তৈরি যন্ত্র বাতিল কবে এসে গেছে লোহার তৈরি রোলার-মিল্ কিন্তু এগুলি সাধারণভাবে খুব উন্নতমানের ছিল না। যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনটি রোলার-মিল ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন হতো, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চাষীরা একটি বা দুটি রোলাব মিল ব্যবহার করতেন যা দিয়ে আখের রসের শতকার ৬০ ভাগ পর্যন্ত নিষ্কাষণ করা যেত। তাছাড়া, ঐ রসকে গুড় বা অশোধিত চিনিতে রূপান্তরিত করেও হলেও বাষ্পীভবনের ফলে অথবা সুক্রোজের গ্লুকোজে রূপান্তরের ফলে অথবা উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে রসের অনেকটা অংশ নষ্ট হয়ে যেত। আর যে সব মিলগুলিতে গুড় বা রাব (ঘন রস)-কে শোধন করে সাদা চিনি উৎপাদন করা হতো, অদক্ষ উৎপাদন প্রক্রিয়ার দরুন সেখানেও কিছু অংশ নষ্ট হতো।[৩]

অনেক বেশি উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি অনুসরণকারী দেশ থেকে চিনির ক্রমবর্ধমান আমদানি অবশ্য এ দেশের চিনি-শিল্পকে ধ্বংস করে দেয় নি (ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে আখ চাষের এলাকা কমে যাওয়ার ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, অশোধিত চিনির উৎপাদন কমে গিয়েছিল)। দেশীয় চিনি শিল্পের টিকে যাবার পিছনে অনেকগুলি কারণ ছিল। প্রথমত, শোধিত চিনি এবং গুড়ের বাজার ছিল ভিন্ন। গুড়কে পছন্দ করা হতো বেশি কারণ গুড় গ্লুকোজ জাতীয় পদার্থের সঙ্গে মেশানো হতো এবং চিনির চেয়ে একে অনেক বেশি পুষ্টিদায়ক মনে করা হতো। মিষ্টান্ন তৈরির উদ্দেশ্যেও গুড়ের ব্যবহার হতো এবং এর আঠালো গুণের জন্যে চিনির থেকে বেশি পছন্দ করা হতো।

দেশীয় চিনি উৎপাদন ব্যবস্থা টিকে যাওয়ার আরও দুটি কারণ ছিল। প্রথমত, কৃষকেরা আখ চাষ করতেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জমিতে। আধুনিক চাপের পদ্ধতিব তুলনায় এই সমস্ত কৃষকেরা যে পদ্ধতি ব্যবহার করতেন তা দক্ষতার নিরিখে অনেক নিম্নস্তরেব হলেও, কৃষকের মোট উপার্জিত আয় কোনো চিনি কল বা চিনি শোধনাগার বা খান্দসারি (পুরনো প্রথায় যেখানে চিনি প্রস্তুত হতো)-কে আখ বিক্রয় করে কৃষকের সম্ভাব্য লাভ থেকে বেশি হতো। তাছাড়া যতক্ষণ পর্যন্ত আখ উৎপাদন করাটাই যদি কৃষকের শ্রম বা জমির সর্বোত্তম ব্যবহারের উপায় হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কৃষক তার জমিতে পরিবারের ও নিজের শ্রম ব্যয় করে আখ উৎপাদন করে যাবে। অবশ্য প্রচলিত বাজার দরে যদি তার ও পরিবারের প্রদত্ত শ্রমের মজুরি হিসাব করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, কৃষকের আখ উৎপাদন করে ক্ষতি হচ্ছে।[৪]

খান্দসারি উৎপাদন বহাল থেকে যাওয়ায় দ্বিতীয় যে কারণটি ছিল তা হলো কৃষকের উপর খান্দসারির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব। প্রত্যক্ষ প্রভাব বলতে কৃষকের উপর জমিদার, মহাজন ও ব্যবসায়ীর নিয়ন্ত্রণ (খান্দসারি উৎপাদনে এই তিন শক্তির প্রায়শই সম্মিলন ঘটত) এবং পরোক্ষ প্রভাব বলতে বোঝানো হচ্ছে খান্দসারি এবং কৃষকের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে জমিদারের মাধ্যমে যে নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হতো।[৫] ফলে কৃষকের দিক থেকে কিছু ইতিবাচক উৎসাহ এবং জমিদার ও ব্যবসায়ীর দিক থেকে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা— দুটো কারণেই দেশীয় চিনি শিল্পে উৎপাদন অব্যাহত ছিল, বিশেষ করে, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও বিহারে।

অবশ্য আমদানিকৃত চিনির সঙ্গে প্রতিযোগিতা তীব্রতর হওয়ার সাথে সাথে ব্রিটিশ ভারতে আখ চাষের মোট এলাকা কমে গিয়েছিল।[৬]

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল দেশীয় উৎপাদন পদ্ধতি উন্নত করার জন্যে। এই প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে সবচেয়ে যেটা বিখ্যাত হয়েছিল তা হলো যুক্তপ্রদেশের কৃষি বিভাগের একজন পদস্থ আমলা, সৈয়দ মহম্মদ হাদি প্রবর্তিত একটি উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি-যা 'হাদি পদ্ধতি' নামে সুপরিচিত হয়েছিল। এই পদ্ধতিতে আখ পেষাইয়ের জন্যে বাষ্পীয় ইঞ্জিন এবং জল গরম করার আরও বিস্তৃত কৌশলের ব্যবহার করা হতো এবং এতে চিনি শোধন করা হতো একটি কেন্দ্রাতিগ শক্তিসম্পন্ন যন্ত্রের সাহায্যে। যদিও দেশীয় পদ্ধতির তুলনায় এই পদ্ধতির সাহায্যে চিনির পরিমাণ পাওয়া যেত অনেক বেশি, তবু এতে বেশি মূলধন নিয়োগের প্রয়োজন হতো। অন্যদিকে কেন্দ্রীভূত চিনি কলগুলির তুলনায় দক্ষতার বিচারে এই পদ্ধতি ছিল অনেক পশ্চাৎপদ কারণ এই কলগুলিতে যে প্রযুক্তি ব্যবহৃত হতো তার ফলে আখ থেকে সুক্রোজ নিষ্কাষণের মাত্রা ছিল শতকরা ৯০ ভাগ পর্যন্ত এবং যার মধ্যে সুক্রোজের গ্লুকোজে রূপান্তরিত হওয়ার প্রবণতা প্রতিহত করার ব্যবস্থা ছিল।[৭] ফলত হাদি পদ্ধতি আর্থিক দিক থেকে সফল বলে দাবি করা হলেও ব্যাপকভাবে গৃহীত ও অনুসৃত হয় নি।[৮]

১২.২ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সাদা চিনি শিল্পের বিকাশ

উনিশ শতকের শেষ অর্ধে মাদ্রাজের নেল্লিকুপ্পম ফ্যাক্টরি এবং যুক্তপ্রদেশের রোজা ফ্যাক্টরিতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক পদ্ধতিতে সাদা চিনির উৎপাদন চলতে থাকল। এটা দেখা যাচ্ছে যে, অর্থের যোগান, আখ ও গুড়ের আপেক্ষিক দাম এবং শোধিত চিনির চাহিদার অবস্থার উপর নির্ভর করে আখ পেষাই করা হতো বা গুড়কে শোধন করে সাদা চিনি তৈরি করা হতো। চিনি শোধন করার কাজ সাধারণভাবে করা হতো স্পিরিট পরিশ্রুত করার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে।[৯] দক্ষিণ-ভারতে বিনী অ্যান্ড কোম্পানি যখন তাদের চিনি উৎপাদনের যাবতীয় স্বত্ব প্যারী অ্যান্ড কোম্পানির কাছে বাধ্য হয়ে হস্তান্তরিত করল, তার পর থেকে সাদা চিনি ও স্পিরিট উৎপাদন করার ক্ষেত্রে প্যারী অ্যান্ড কোম্পানিই প্রকৃতপক্ষে একচেটিয়া অবস্থানের সুবিধা ভোগ করতে লাগল। সাদা চিনির ক্ষেত্রে অবশ্য বিদেশী প্রতিযোগিতা থাকার ফলে এই একচেটিয়া অবস্থার কতটা বাস্তব সে বিষয় সন্দেহ ছিল। স্পিরিটের বেলা একচেটিয়া অবস্থানের ঘটনা অনেক বেশি বাস্তব ছিল কারণ প্যারী অ্যান্ড কোম্পানি অনেক স্থানীয় সরকার ও কর্তৃপক্ষের কাছে স্পিরিট যোগান দেওয়ার একমাত্র উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

চিনি শিল্পে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছিল অবশ্য বিহার ও যুক্তপ্রদেশে। ইয়োরোপীয়দের তৈরি কিছু ফ্যাক্টরি— যেগুলি চিনি উৎপাদনের জন্য গড়ে উঠেছিল, সেগুলিতে নীল চাষ লাভজনক হয়ে ওঠার সাথে সাথে চিনির পরিবর্তে নীল উৎপাদন শুরু করা হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কৃত্রিম রঙ তৈরির শিল্প গড়ে ওঠার সাথে সাথে যখন প্রাকৃতিক নীল চাষ অ-লাভজনক হয়ে উঠল, তখন আবার এই সব এলাকায় নীলের জমিতে আখ চাষ এবং নীলের ফ্যাক্টরিতে চিনি উৎপাদন শুরু হয়ে গেল।[১০]

যদিও কিছু কিছু নীলকর চিনিকলের মালিক অথবা ম্যানেজার হয়েছিলেন, তাঁদের বেশিরভাগই কিন্তু তাঁদেব জমি প্রজাচাষীদের উপস্বত্ব দিয়ে জমিদার হিসাবে থেকে গেলেন। আবার তাঁদের অনেকে চিনিকলগুলিতে আখের নিয়মিত যোগান দেওয়ার জন্যে আখ চাষে আত্মনিয়োগ কবলেন।[১১] বিহার ও যুক্তপ্রদেশে ১৯০০ সালের পর কেন্দ্রীয় চিনি কলগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রদূত হলো কানপুরের বেগ, সাদারল্যান্ড অ্যান্ড কোম্পানি। এই কোম্পানি শুরু হয়েছিল নীলেব বীজ এবং সাধারণ পণ্যের ব্যবসাদার হিসাবে এবং পরে শিল্পে এল বড় আকারে। ১৮৯৪-এ এরা কানপুর সুগার ওয়ার্কস নামে কোম্পানি স্থাপন করল এবং গুড় শোধন করার এমন পদ্ধতি অনুসরণ করল যাতে অস্থিজাত পোড়া কয়লার ব্যবহার প্রয়োজন হতো না। এর ফলে এদের উৎপাদিত চিনি গোঁড়া হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল। এছাড়া আরও অনেকগুলি চিনি কল প্রধানত ভারতীয়দের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল। বেগ, সাদারল্যান্ড অ্যান্ড কোম্পানি ১৯০৫-এ বিহারের সারণ জেলাব বড়া-তে একটি চিনি কল স্থাপন করে (চম্পারণ সুগার কোম্পানি লিমিটেড) এবং ঐ একই বছরে সারণ জেলারই মারহৌরাতে কানপুর সুগার ওয়ার্কসের একটি শাখা চালু করা হলো। ১৯১৩-য় বিহারেব দ্বারভাঙ্গা জেলার রায়ামে ফ্যাক্টরি চালু করে এবা স্থাপন করে রায়াম সুগার কোম্পানি লিমিটেড। এই তিনটি কোম্পানিই এদের অধীনস্থ জমিতে অথবা বড় জমিদারদের বা সাধারণ চাষীদের উৎপাদিত আখ পেষাই করত এবং শোধিত চিনি উৎপাদন করত।[১২] বেগ, সাদারল্যান্ড অ্যান্ড কোম্পানি আসার আগে শাহজাহানপুব জেলায় রোজা ফ্যাক্টরি নামে ইয়োবোপীয় মালিকানাধীন একটি ফ্যাক্টরি ছিল যেখানে প্রথমে চিনি শোধন এবং স্পিরিট পরিশ্রুত করার কাজ করা হতো। ১৯০২-এর পর এই ফ্যাক্টরিতে আখ পেষাইয়ের ব্যবস্থা করা হলো যাতে এখানে প্রতিদিন ১০ থেকে ১২ হাজার মণ আখ পেষাই করা সম্ভব হতো। শাহাজাহানপুর জেলা বহুকাল ধরে একটি প্রধান আখ উৎপাদনকারী অঞ্চলে হওয়াতে রোজা ফ্যাক্টরির অবস্থানের গুরুত্ব এভাবে নির্ণীত হয়েছিল।[১৩] আরও কয়েকটি বড় চিনি উৎপাদক সংস্থা ছিল যেগুলি যৌথ মূলধনী কারবার হিসাবে গড়ে ওঠে নি—যেগুলি ছিল একেবারেই ব্যক্তিগত কারবার। ১৯১৬ সালে দ্বারভাঙ্গা সুগার কোম্পানির অধীনে ছিল সম্ভবত সবচেয়ে বড় চিনি ফ্যাক্টরি। এটি মুজফ্ফরপুরের কাছে ওট্টারে অবস্থিত ছিল কিন্তু আর্থিক দিক থেকে এটি সফল হতে পারে নি, ফলে এটিকে দ্বারভাঙ্গা জেলায় স্থানান্তরিত করা হয় কারণ এখানে বিশাল এলাকা জুড়ে আখের চাষ হতো।[১৪]

বিহারের তুলনায় যুক্তপ্রদেশে আখ উৎপানের জমির পরিমাণ অনেক বেশি হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে যে সব চিনিকল গড়ে উঠেছিল সেগুলির বেশির ভাগই হলো বিহারে।[১৫] এর পিছনে যে সব কারণ কাজ করেছিল সেগুলি হলো : (১) মীরাট ও বেরিলিতে ইতিমধ্যেই খান্দসারি উৎপাদনের ব্যাপক প্রচলন ছিল ফলে, চিনিকলগুলির পক্ষে সে অঞ্চলে আখের যোগান পাওয়ার ব্যাপারে খান্দসারির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে ওঠা খুব শক্ত ছিল, কারণ আখচাষীদের উপর খান্দসারি উৎপাদকদের প্রভাব ছিল খুব গভীর। (২) বিহারে জমিদারদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গড়ে উঠেছিল ফলে, বিশাল বিশাল ভূখণ্ড একসঙ্গে চিনিকলগুলিকে অথবা আখের যোগানদারদের লীজ দেওয়া সম্ভব হতো। (৩) তাছাড়া নীলচাষ উঠে যাওয়ার সাথে সাথে যুক্তপ্রদেশের তুলনায় বিহারে নীল চাষ ছিল অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ— অনেক

নীলকর আখ চাষ শুরু করেছিলেন এবং অনেক ক্ষেত্রে চিনিকলগুলির ম্যানেজারের দায়িত্বও নিয়েছিলেন। [১৬] এবং (৪) যুক্তপ্রদেশের তুলনায় বিহারে গুড়ের দাম ছিল অপেক্ষাকৃত কম ফলে, বিহারে চিনিকলগুলির পক্ষে চিনি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে গুড় অথবা আখ কেনা অনেক লাভজনক হতো। [১৭]

প্রথমে বিশ্বযুদ্ধের আগে চিনি শিল্পে মোট মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল কম এবং চিনি কলগুলির উৎপাদন ক্ষমতাও ছিল খুব সীমিত। [১৮] এই শিল্পকে উৎসাহিত করার ব্যাপারে সরকারের ভূমিকা ছিল চিনি আমদানির উপর শুল্ক বসানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ— যে শুল্ক ১৮৯৯ সালে আরোপ করে ১৯০৩-এ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। তাছাড়া ১৯১১-য় আইন পরিষদে অনেক বিতর্কের ফলশ্রুতি হিসাবে সরকার নবাবগঞ্জে একটি পরীক্ষা-মূলক ছোট ফ্যাক্টরি স্থাপন করে। আখ বিশেষজ্ঞ হিসাবে ডা. বারবার কিছু কাজ শুরু করলেও সে প্রচেষ্টা তেমন ফলপ্রসূ হয় নি। কোনো কোনো অঞ্চলে কেন্দ্রীয়ভাবে চিনিকল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুবাদে ঐ সব ফ্যাক্টরিকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত অঞ্চলে আখ চাষ বিস্তার লাভ করেছিল এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আখ চাষের এলাকা ও উৎপাদনের পরিমাণেও বৃদ্ধি ঘটেছিল। [১৯] যে সব নীলকর নীল চাষ ছেড়ে আখ চাষে মন দিয়েছিলেন, তাঁরা সাধারণ আখচাষীদের তুলনায় অনেক বেশি সার ব্যবহার এবং বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদনের আরও ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করতেন। ম্যাক গ্লশানের মতো কিছু ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা সরকারি দাক্ষিণ্যের সুযোগ নিয়ে আরও ব্যাপক আকারে আখ চাষের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। কিন্তু আখ উৎপাদনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি না ঘটার ফলে চিরাচরিত ধরনের আখ উৎপাদন করে আর্থিক প্রতিদানের হার ক্রমশই হ্রাস পেতে লাগল। তাছাড়া ফ্যাক্টরি থেকে একটা যুক্তিসঙ্গত দূরত্বের মধ্যে আখের যোগান যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া সম্ভব হলেও সরকারের তরফ থেকে সংরক্ষণমূলক সাহায্য ছাড়া চিনি শিল্পের দ্রুত বিকাশ সম্ভব ছিল না।

১২.৩ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত চিনি শিল্পের অবস্থা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়েই ভারতে সাদা চিনি তৈরির শিল্প কার্যকরভাবে সংরক্ষিত হয়েছিল কারণ, বিদেশ থেকে চিনি আমদানির পরিমাণ এই সময় কমে গিয়েছিল। ফলে সাদা চিনির উৎপাদনের পরিমাণ এবং আখ চাষের এলাকা দুটোই বৃদ্ধি পেয়েছিল, যদিও এই বৃদ্ধির পরিমাণ খুব বেশি ছিল না। বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির আমদানির ব্যাপারে অনেক বিধি-নিষেধ ছিল এবং অন্যান্য শিল্পের মতো চিনি শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রেও এটি ছিল একটি প্রতিবন্ধক।[২০] মহাযুদ্ধ অবশ্য এই শিল্পে সরকারের আগ্রহ উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল। ভারত সরকারের কৃষিবিষয়ক উপদেষ্টা, স্যার জেমস ম্যাককেনা সরকারের কাছে একটি 'সুগার ব্যুরো' গঠন করার প্রস্তাব রাখলেন যাতে থাকবেন একজন ফ্যাক্টরি বিশেষজ্ঞ, একজন ইঞ্জিনীয়ার, একজন রসায়নবিদ, একজন উদ্ভিদবিদ্যা বিশারদ্ এবং ব্যুরোর সম্পাদক হিসাবে থাকবেন একজন উচ্চপদস্থ আমলা। [২১] শেষ পর্যন্ত অবশ্য ব্যুরোর সম্পাদকই কেবল নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং এই শিল্পের ব্যবসায়িক দিক সম্পর্কিত বহু তথ্য সংগ্রহ করে এবং বিহারে কোয়েম্বাটুরের আখ সম্পর্কে তথ্য প্রচার করে তিনি মূল্যবান কাজ করেছিলেন।[২২]

১৯১৯ সালে চিনি উন্নয়নের স্বার্থে সমস্ত প্রাসঙ্গিক দিক সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়ার জন্য কানপুরের 'ইন্ডিয়ান সুগার প্রডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশন' ভারত সরকারকে একটি 'সুগার কমিটি' গঠন করতে চাপ দেয়। এই কমিটি দেখল যে, ভারতীয় চিনি কলগুলির স্বল্প উৎপাদন-ক্ষমতা এবং অদক্ষতার প্রধান কারণ হলো যথেষ্ট পরিমাণে আখের যোগান পাওয়ার অসুবিধা। কমিটি যখন অনুসন্ধান চালায় তখন ভারতে প্রধানত আখ পেষাইয়ের কাজে নিযুক্ত ফ্যাক্টবির সংখ্যা ২২ টি; এব মধ্যে ১০ টি ছিল বিহারে, ৫টি যুক্ত প্রদেশে এবং ৩টি মাদ্রাজে। ১৯১৯-২০ সালে প্রকৃতপক্ষে চালু ১৮ টি ফ্যাক্টরির উৎপাদন ছিল মাত্র ২৩,১০০ টন চিনি যা ছিল জাভায় তিনটি ফ্যাক্টরির গড় উৎপাদনের কাছাকাছি। ভারতীয় ফ্যাক্টরিগুলির কোনোটাই পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতায় কাজ করত না এবং এই ফ্যাক্টবিগুলিব অর্ধেক অংশ কাজ করত তাদের উৎপাদনক্ষমতার শতকরা ৫০ ভাগ ব্যবহার করে।[২৩] কমিটি এও লক্ষ্য করেছে যে, অনেকগুলি ফ্যাক্টরিতেই আখ ব্যবহার করার পদ্ধতি ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ, প্রয়োজনের অতিরিক্ত জ্বালানি ব্যবহার হতো এবং যন্ত্রপাতিও ছিল খুব প্রাচীন ও জীর্ণ। কমিটির বিবেচনায় ফ্যাক্টবিগুলির দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রথম যে কাজটি করা দরকাব তা হলো রাসায়নিক প্রয়োগের ও পরিচালনার বিষয়টি আরও ভালো করা এবং দ্বিতীয় পদক্ষেপ যা নিতে হবে তা হলো : শ্রমিক নিয়োগে আরও ব্যয় সংকোচ; ঘটানো। গুড় উৎপাদন কেন্দ্রগুলি ও শোধনাগারগুলি কমিটির মতে উন্নয়ন বা সংস্কারের অযোগ্য।

কমিটিকে কয়েকটি বিতর্কিত প্রশ্নের উত্তরও খুঁজতে হয়েছিল যেমন, কেন্দ্রীয় চিনি কলগুলির জন্যে জমি অধিগ্রহণ বা জাভা, ফরমোজা এই সব দেশের অনুকরণে বিভিন্ন ফ্যাক্টবির জন্যে নির্দিষ্ট জমি সংরক্ষিত করে রাখা, ইত্যাদি।[২৪] কমিটি এ ব্যাপাবে একমত হতে পেরেছিল যে, চিনি ফ্যাক্টরিব জন্যে বাধ্যতামূলক জমি অধিগ্রহণ নীতিগত দিক থেকেও বাঞ্ছনীয় নয় এবং বাস্তবেও রূপায়ণ করা অসুবিধাজনক। অবশ্য আখ চাযের উন্নত প্রণালী প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে কিছু পরিমাণ ভূখণ্ড অধিগ্রহণ কবার পক্ষে এই কমিটি মত দিয়েছিল। এই সিদ্ধান্তেব সঙ্গে কমিটির দুজন সদস্য ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন—ওয়েন মেযার, সুগার ব্যুবোব সম্পাদক যিনি বিভিন্ন চিনির কলগুলিব জন্যে আলাদা ভাবে জমি সংরক্ষিত করে বাখতে চেয়েছিলেন এবং টাটা সন্‌স্ অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেডেব বি. জে. পাদশাহ যিনি আখ উৎপাদন উন্নত করাব স্বার্থে আবও জোরালো ও কঠোর নীতি অনুসরণেব পক্ষপাতী ছিলেন বিশেষ করে, অন্যান্য পদক্ষেপের সাথে তিনি এই উদ্দেশ্যে জমির বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণের নীতি সরকার স্বীয় ক্ষমতাবলে প্রয়োগ করুক তা চেয়েছিলেন। জলসেচেব প্রচলিত খালগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতি তিনি চেয়েছিলেন যাতে কৃষক আরও বিচক্ষণতার সাথে সেচের জল ব্যবহার করার উৎসাহ পায়। এছাড়াও তাঁর মত ছিল যে, সেচ ও জলনিকাশী ব্যবস্থায় আরও বেশি বিনিয়োগ করা হোক যাতে অনেক বেশি এলাকায় আখের চাষ স্বল্প খরচে করা সম্ভব হয়।[২৫] পাদশাহ ও মেয়ার উভয়েই চেয়েছিলেন যে, চিনি ফ্যাক্টরিগুলিকে সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স নিতে হবে যাতে সেগুলির অবস্থান যথাযথভাবে নির্ণয় করা যায় এবং যথেষ্ট বড় আকারে সেগুলি নির্মিত হয়। পক্ষান্তরে 'ইন্ডিয়ান সুগার কমিটি'র পরামর্শগুলি ছিল অনেকটা নরম প্রকৃতির। সরকারকে বলা হলো একটি 'সুগার বোর্ড' গঠন করতে, যাতে পাঁচজন সরকারি ও ছয়জন

বেসরকারি সদস্য থাকবেন একটি 'সুগার রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট' স্থাপন করতে, যার তিনটি বিভাগ থাকবে—কৃষি, রাসায়নিক ও ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ। এছাড়াও উত্তর ভারতে একটি আদর্শ চিনি ফ্যাক্টরি স্থাপন করার কথা বলা হলো এবং 'সুগার স্কুল' চালু করার প্রস্তাবও দেওয়া হলো যেখানে চিনি বিশেষজ্ঞ ও প্রযুক্তিবিদদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এছাড়াও আখ উৎপাদকদের স্বার্থে বিভিন্ন ধরনের আখের গুণমান অনুসারে মূল্য কাঠামো স্থির করার প্রস্তাবও কমিটি দিয়েছিল যাতে চিনি ফ্যাক্টরিগুলি আখচাষীদের শোষণ করতে না পারে।

'সুগার কমিটি'র কোনো প্রস্তাবই পরবর্তী দশ বছরে রূপায়িত হয় নি। ১৯৩১ অবধি এই শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল খুবই ধীর গতিতে—সারণি ১২.২ পরিসংখ্যানেই সেকথা স্পষ্ট।

সারণি ১২.২ ভারতে চিনি শিল্পের যন্ত্রপাতির আমদানি ১৯২০-১ থেকে ১৯৩৯-৪০

বৎসর	চিনি শিল্পের যন্ত্রপাতির আমদানি ('০০০ টাকায়) (১)	চিনি শিল্পের যন্ত্রপাতির মূল্য সূচক (টনে পরিমাপ করা হয়েছে) (২)	ঐ যন্ত্রপাতির আমদানি (স্থির দামে) ('০০০ টাকায়) (৩)
১৯২০-১	১,৭৫৫	১০০.০০	১,৭৫৫
১৯২১-২	৮,৮৪৬	১০৬.৬৫	৮,২৯৪
১৯২২-৩	১,৬৮৯	৭৭.৪০	২,১৮২
১৯২৩-৪	১,২৭৮	৫৭.৭৩	২,২১৪
১৯২৪-৫	১,৬৬২	৫৭.৭০	২,৮৮০
১৯২৫-৬	১,৫৯৭	৫১.৮৪	৩,০৮১
১৯২৬-৭	৬২১	৪৫.৬৮	১,৩৫৯
১৯২৭-৮	৯১৩	৬৪.০৫	১,৪২৫
১৯২৮-৯	১,৭৫২	৪৭.৬২	৩,৬৭৯
১৯২৯-৩০	৯২১	৫০.১৯	১,৮৩৫
১৯৩০-৩১	১,৩৬৮	৬১.০৬	২,২৪০
১৯৩১-২	৩,০১৪	৬২.৯২	৪,৭৯০
১৯৩২-৩	১৫,৩১১	৪১.৮৯	২৬,৫৫০
১৯৩৩-৪	৩৩,৬৩৯	৩৮.৬৩	৮৭,০৮০
১৯৩৪-৫	১০,৫৪৫	৪৪.২১	২৩,৮৫২
১৯৩৫-৬	৬,৫৭২	৪১.২৭	১৫,৯২৪
১৯৩৬-৭	৯,৫১৬	৪৪.১৮	২১,৫৩৯
১৯৩৭-৮	৬,৯৮৬	৪৭.৭৬	১৪,৬২৭
১৯৩৮-৯	৬,১৩৭	৬৪.১৭	৯,৫৬৪
১৯৩৯-৪০	৫,০৮৪	৫৯.৭৪	৮,৫১০

উৎস : ১নং কলমের জন্যে, ভারত সরকার, CISD : *Annual statement of the seaborne trade of British India* (কলকাতা, বার্ষিক); ২ নং কলমের জন্যে, *Annual statements' of the United Kingdom*।

টীকা : (ক) মূল্যসূচক সিরিজগুলি ক্যালেন্ডার বর্ষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত; ১৯২০ সালের মূল্যসূচক ১৯২০-১ আমদানিসংক্রান্ত পরিসংখ্যান সিরিজে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং ঠিক একইভাবে অন্যান্য বছরের ক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছে। (খ) ৩ নং কলামের পরিসংখ্যান পাওয়া গিয়েছে ১ নং কলামের রাশিকে ২ নং কলামের রাশি দিয়ে ভাগ করে এবং তারপর ১০০ দিয়ে গুণ করে।

চিনি শিল্পে রাজস্ব করের হার শতকরা ৫ ভাগ থেকে বাড়িয়ে ১৯১৬ সালে শতকরা ১০ ভাগ করা হয়েছিল। ১৯২১-এ এটা আরও বাড়িয়ে করা হলো শতকরা ১৫ ভাগ, ১৯২২-এ শতকরা ২৫ ভাগ এবং ১৯২৫-এ করের হার হলো ৪ টাকা ৮ আনা অর্থাৎ শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি।[২৬] ভারত সরকারের আরও বেশি অর্থের প্রয়োজন থেকেই এই পরিবর্তনগুলি সংঘটিত হয়েছিল। ভবিষ্যতে সরকার এই শিল্পকে সংরক্ষণ দেবে এমন কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। তাছাড়া সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমদানিকৃত চিনির দাম ক্রমশ কমে যাচ্ছিল।

কুড়ি দশকে উন্নত জাতের আখের চাষের প্রসারও ঘটেছিল খুব ধীরে। বৃষ্টি ও সেচের জল যা পাওয়া যেত তা দিয়ে কিছু কিছু উন্নত ফলনশীল আখের চাষ সম্ভব হতো না বিশেষ করে সাধারণ কৃষকের জমিতে যে পদ্ধতিতে আখ চাষ হতো তার সাথে সঙ্গতি রেখে। বিহারে যে সব নীলকর সাহেবরা আখচাষ করতেন তাঁরা আখের জন্যে অনেক বেশি অর্থব্যয় করতেন এবং আখ ও অন্যান্য ফসল চাষের মধ্যে পর্যায় বা ক্রম যথাযথভাবে বজায় রাখতেন। কিন্তু ১৯২০ সালের ইন্ডিয়ান সুগার কমিটি এই রিপোর্ট দেয় :

ইতিমধ্যেই যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে নীলকর সাহেবরা যে প্রথায় আখের চাষ করছেন, তাতে আখের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা দেখা গিয়েছে। আখ উৎপাদক বা স্থানীয় কৃষি দপ্তর কোনো পক্ষ থেকেই মাঝারি বা মোটা পুষ্ট জাতের আখের চাষের প্রচলন কিংবা আবহাওয়ার সাথে একাত্মকরণের বিষয়ে কোনো গবেষণা বা অনুসন্ধান না থাকায় দেশীয় আখের চাষের ক্ষেত্রেই তাঁরা এই নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির প্রযোগ ঘটান এবং এর ফলে দেখা গিয়েছে যে, কোনো বছর আখের প্রচুর ফলন পাওয়া গেলেও আখের মধ্যে সুক্রোজের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম নিবিড় পদ্ধতিতে উৎপাদিত আখের থেকে অনেক কম।[২৭]

ভারতে কৃষি সম্পর্কিত রয়্যাল কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে ১৯২৫-৬ ও ১৯২৬-৭-এ উন্নত প্রজাতির আখ চাষের এলাকা ছিল মোট আখ চাষের এলাকার যথাক্রমে শতকরা ৬.৫ ও ৭.২ ভাগ।[২৮] উন্নত ধরনের আখের চাষের উল্লেখযোগ্য ভাবে বিস্তার ঘটল ত্রিশের দশকে। এটা বলা যায় যে, যুক্ত প্রদেশে সারদা ক্যানেলের এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান ছিল। হয়ত এটাও সম্ভব যে কোয়েম্বাটুরের সরকারি আখ-বীজ খামারের মত অগ্রণী সমস্ত সরকারি খামারগুলিতে যে নতুন ধরনের আখ হচ্ছিল তা পুরনো দেশী জাতের আখের তুলনায় অনেক উন্নত মানের এবং কৃষক তার চাষের পদ্ধতিতে মৌলিক কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়েই এই উন্নত জাতের আখ চাষ করতে পারত।[২৯]

এতে অবশ্য কোনও সন্দেহ নেই যে, ১৯৩১-এ যে শুল্ক সংরক্ষণ নীতি নেওয়া হয়েছিল তা উন্নত জাতের আখের চাষ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিয়ে এবং প্রায় সব আখ-উৎপাদনকারী রাজ্যেই আখের একর-পিছু উৎপাদনের হার উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়িয়ে দিয়ে চিনি শিল্পকে একটা জোর ধাক্কা দিতে পেরেছিল। সাদা চিনির উৎপাদন এবং আখের চাষের এলাকা বাড়ানোর ব্যাপারে শুল্ক সংরক্ষণের প্রবল ক্ষমতাকে সরকারি মহল ছোট করে দেখেছিল। যেমন দেখা যায়, ম্যাককেন্নার প্রশ্ন ছিল :

> যাঁরা ওই ধারণা পোষণ করেণ যে, শুল্কেব ক্ষমতা নিঃশোষিত হয়ে যায় নি, তাঁদের কাছে প্রশ্ন, জাভার মতো দেশের সঙ্গে দক্ষতায় এঁটে উঠতে গেলে কী হাবে শুল্ক বসানো উচিত? চিনি উৎপাদনে জাভার সাফল্যের ভিত্তি হচ্ছে সম্পূর্ণতই তাদের উৎপাদনগত দক্ষতা। ভারতে জাভার চিনি আমদানিব বিরুদ্ধে শুল্কেব প্রাচীর বারে বারে বাড়ানো সত্ত্বেও জাভা থেকে চিনি আমদানিব পরিমাণ বছরে বছরে নিশ্চিতভাবে বেড়েই চলছে।[৩০]

অনেক হয়ত এবকম যুক্তি দেখাবেন যে, আখ উৎপাদনে যে পশ্চাৎপদ অবস্থা ছিল তা সত্ত্বেও অন্যান্য প্রধান আখ উৎপাদনকারী দেশগুলির সঙ্গে ভারতের প্রতিযেগিতায় নামা সম্ভব হতো যদি চিনি কলগুলি আয়তনে যথেষ্ট বড় এবং উৎপাদনে দক্ষতা অর্জন করতে পারত। জাভা সহ সমস্ত আখ উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে ভারতে শ্রমের জন্যে ব্যয় সম্ভবত সবচেয়ে কম ছিল।[৩১] কিন্তু শুল্ক সংরক্ষণের সাহায্য ব্যতিরেকে ভাবতে সাদা চিনি উৎপাদন শিল্প গড়ে ওঠার বিপক্ষে তিনটি কাবণ কাজ করেছিল : (ক) চিনিব দাম বিশ্বের সব বাজারেই কমে যাচ্ছিল[৩২] এবং এই ঘটনা বড় আকারেব বিনিয়োগে বাধা সৃষ্টি কবেছিল। বিশেষ করে যখন অন্যান্য শিল্প বা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে বেশি হাবে প্রতিদান নিশ্চিতভাবে পাওয়া সম্ভব ছিল। (খ) অন্যান্য দেশের মতো—যেখানে আখ উৎপাদন সবকারি আর্থিক সহায়তা ও সমর্থনে পুষ্ট সুসংগঠিত গবেষণার ফলে উন্নতি লাভ কবেছে—ভারতে প্রকৃত অর্থে সেরকম কোনো গবেষণা সংস্থা ছিল না; এবং (গ) চিনি কলগুলিব মধ্যে প্রতিযোগিতাব ফলে বেশিরভাগ প্রদেশেই আয়ের দামে উর্ধ্বগতি লক্ষ্য কবা গিয়েছিল। সুতরাং আখের চাষের এলাকা না বাড়লে বা একরপিছু আখ উৎপাদনেব হারে উন্নতি না হলে বড় চিনি কলগুলির পক্ষে আখের যোগান পাওয়া খুব শক্ত হতো।

১২.৪ শুল্ক সংরক্ষণ এবং চিনি শিল্পের বিকাশ

মন্দার সূচনার সাথে সাথে পরিস্থিতির আমুল পরিবর্তন ঘটে গেল। ভারত সরকার প্রথমে আমদানি করা চিনির উপর শুল্কের হার ১৯৩০-এ হন্দর পিছু বাড়িয়ে ৬ টাকা করেছিল। এই ব্যবস্থা অবশ্য শুধুমাত্র সরকারি আয় বাড়ানোর জন্যেই নেওয়া হয়েছিল। ১৯২৯-এ চিনি শিল্পের বিষয়ে সমস্ত প্রাদেশিক সরকারকেই বক্তব্য জানাতে ভারত সরকার বলেছিল। চিনি শিল্প আগ্রহী তিনটি প্রাদেশিক সরকার—যথা, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ এবং বিহার ও উড়িষ্যার সরকার সঙ্গে বোম্বাইয়ের সরকারকে নিয়ে এই বিষয়ে 'ট্যারিফ বোর্ড'কে দিয়ে অনুসন্ধান করার আর্জি জানাল। এ বিষয়ে সরকারের চিঠির জবাবে তথ্য পাওয়ার পর

চিনি শিল্পের প্রশ্নটি বিবেচনা ও অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে। এই কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, 'আমদানি শুল্কের প্রশ্নটি অনুসন্ধানের জন্যে ভারত সরকার ট্যারিফ বোর্ডকে নির্দেশ দিক'। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই চিনি শিল্পে সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়ার প্রশ্নটি বিবেচনার জন্যে 'ইন্ডিয়ান ট্যারিফ্ বোর্ড'-কে নিযুক্ত করা হয়। অনুসন্ধান চলাকালেই ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল ভারতের চিনি শিল্পে সংরক্ষণের পক্ষে জোরালো সওয়াল করে। ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের যুক্তি ছিল যে, ভারতে আখের চাষের উন্নতি করতে হলে চিনি শিল্পে সংরক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন এবং আখ উৎপাদকদের জন্যে একটি ন্যূনতম যুক্তিসঙ্গত জীবনধারণের মান নিশ্চিত করতে হলে আখ চাষের উন্নতি করা প্রয়োজন। তারা এত যুক্তি দেখিয়েছিল যে, চিনি শিল্পের সমস্ত শাখার উন্নয়নের স্বার্থে শিল্পে সংরক্ষণ দেওয়া দরকার কারণ শুধুমাত্র সরকারের আয় বাড়ালেই প্রত্যয় সঞ্চারিত হয় না।[৩৩] ১৯৩০ সালের মে মাসে চিনি শিল্পে শুল্ক সংরক্ষণ দেওয়ার প্রশ্নটি ইন্ডিয়ান ট্যারিফ বোর্ডের কাছে পাঠানো হয় এবং ১৯৩১ সালেই বোর্ড এই শুল্ক বসানোর সুপারিশ করে। ট্যারিফ বোর্ডের মত অনুসারে, যতখানি আখচাষীদের দিকে তাকিয়ে, বিশেষ করে, যুক্তপ্রদেশের চাষী যাঁরা তাদের জমির বিশাল এলাকা এই চাষের আওতায় এনেছিলেন, ততখানি সাদা চিনি শিল্পের অস্তিত্ব ও বিকাশের স্বার্থে চিনি শিল্পে সংরক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন।

ট্যারিফ্ বোর্ড ১৫ বছরের জন্যে সংরক্ষণ দেওয়ার কথা সুপারিশ করে। প্রথম ৭ বছরের জন্যে শুল্কের হার হবে হন্দর পিছু ৭ টাকা ৪ আনা এবং পরবর্তী ৮ বছরের জন্যে হন্দর পিছু ৬ টাকা ৪ আনা। এই দীর্ঘ সময়ের জন্যে সংরক্ষণ দেওয়ার যুক্তি হিসাবে বোর্ডের বক্তব্য ছিল যে, চিনি উৎপাদনের খরচের একটা বড় অংশ হলো আখ উৎপাদনের খরচ; আখ উৎপাদনের খরচ হ্রাস পেলে কৃষকরা ব্যাপকভাবে উন্নত জাতের আখ চাষ করবেন এটাই স্বাভাবিক কিন্তু নতুন ও উন্নত জাতের আখ চাষের পদ্ধতি অবলম্বন একটি দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। ফলে সংরক্ষণ দীর্ঘ সময় ধরে দেওয়া প্রয়োজন।

ট্যারিফ্ বোর্ড-এর সুপারিশ কিছু শর্ত সাপেক্ষে গ্রহণ করা হলো—যেমন, সাত বছর ধরে সংরক্ষণ দেওয়ার পর বিধিবদ্ধ তদন্তের মাধ্যমে পরিস্থিতির পর্যালোচনা করা হবে। আইন সভার সিলেক্ট কমিটি অবশ্য ১৯৩২ সালের ইন্ডিয়ান সুগার (প্রোটেকশন) বিল এর মুখবন্ধে একটি ঘোষণা যুক্ত করে দিয়েছিল এই মর্মে যে, ১৯৪৬-এর ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত সংরক্ষণ দেওয়া চলবে এবং ১৯৩৮-এর ৩১ শে মার্চ-এর আগে যে বিধিবদ্ধ তদন্ত হবে তার কাজ হবে কী আকারে এবং কোন্ মাত্রায় সংরক্ষণ দেওয়া হবে তা নির্ণয় করা।

১৯৩১-এর অর্থ-আইনে উন্নত মানের চিনির উপর শুল্কের হার বাড়িয়ে করা হলো ৭ টাকা ৪ আনা; ১৯৩১-এর সংযোজনী বাজেটে অনেক ধরনের আমদানি শুল্কের উপর শতকরা ২৫ ভাগ হারে সারচার্জ বসানো হয়েছিল, ফলে চিনির উপর শুল্কের হার বেড়ে দাঁড়াল হন্দর পিছু ৯ টাকা ১ আনা। ১৯৩২ সালের দি সুগার ইন্ডাস্ট্রি (প্রটেকশন) অ্যাক্ট চালু হলে ট্যারিফ বোর্ড-এর সুপারিশ বিধিবদ্ধ শক্তি লাভ করল কারণ চিনি ও চিনিজাত মিষ্টান্ন দ্রব্যের উপর ধার্য করকে রাজস্ব করের বদলে সংরক্ষণ-শুল্কের মর্যাদা দেওয়া হলো। কিন্তু ট্যারিফ বোর্ড যা সুপারিশ করেছিল তার থেকে শুল্কের হার অনেক বেশি থেকে গেল। কার্যকরী শুল্কের হার দাঁড়াল পণ্যের মূল্যের ভিত্তিতে প্রায় শতকরা ১৮৫ ভাগ—

বোম্বাইয়ের বন্দরে নামানো ও অন্যান্য খরচ এবং ধার্য শুল্ক ধরে জাভার চিনির দাম ছিল হন্দর পিছু ১৫ টাকা।[৩৪]

বেশি হারে আমদানি শুল্ক বসানোর তাৎক্ষণিক ফল হিসাবে দেখা গেল চিনির আমদানি দ্রুত অনেকখানি কমে গেল এবং অন্যদিকে চিনিকলের যন্ত্রপাতির আমদানির পরিমাণ বিস্ময়করভাবে বৃদ্ধি পেল। এই দুই ভিন্ন প্রবণতার ছবি আমরা যথাক্রমে সারণি ১২.৩ ও সারণি ১২.২ থেকে পাই। চিনির নীট আমদানির পরিমাণ ১৯২৯-৩০ সালে ছিল ৯৩৩,০০০ টন, তা কমে ১৯৩১-৩২ এ হোলো ৫১০,০০০ টন, এবং ১৯৩২-৩৩ এ আরও কমে হলো ৩৬৬,০০০ টন। আমদানির হ্রাস অংশত মন্দার কারণে হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সবটা নয়। ১৯৩০-৩১ সালেও ভারতে চিনির মোট ভোগের চাহিদা বিশের দশকের থেকেও বেশি ছিল। ১৯২৫-২৬ থেকে ১৯২৯-৩০ পর্যন্ত এই বছরগুলিতে চিনি উৎপাদনের যন্ত্রপাতি আমদানি গড়ে বাৎসরিক ১,১৬০,০০০ টাকা থেকে বেড়ে ১৯৩২-৩৩-এ হয়েছিল ১৫,৩১১,০০০ টাকা, এবং ১৯৩৩-৩৪-এ তা আরো বেড়ে হয়েছিল ৩৩,৬৩৯,০০০ টাকার সমান। অর্থাৎ, বিশের দশকের শেষ পাঁচ বছরে চিনি কলের যন্ত্রপাতির আমদানির মূল্য যা ছিল, তা প্রায় ত্রিশ গুণ বেড়ে গিয়েছিল। পুরো ত্রিশের দশক ধরে চিনি উৎপাদনের যন্ত্রপাতির আমদানির মূল্য এমন একটা স্তরে ছিল যা সংরক্ষণ মঞ্জুর করার আগের স্তরের থেকেও বেশি ছিল। চিনির যন্ত্রপাতির দাম কমে যাওয়ায় এবং ভারতে অন্যান্য শিল্পের বেশিরভাগই মন্দার কবলে পড়ায় চিনি শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল।[৩৫] ত্রিশের দশকে চিনি শিল্পের যে সব যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়েছে তার আর্থিক মূল্যের চেয়ে প্রকৃত মূল্য যে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল তার কারণ ছিল যন্ত্রপাতির দাম কমে যাওয়া— আমরা স্থূল মূল্যসূচক থেকেই এ কথা স্পষ্ট।

চিনির আমদানির ওপর শুল্ক আরোপ এবং তার সঙ্গে উন্নত জাতের আখ চাষের প্রচলন ও প্রসারের ফলে ভারতে সামগ্রিকভাবে আখ চাষের অধীন মোট জমির পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল।[৩৬] ত্রিশের দশকে অধিকাংশ শস্যের দাম ভীষণভাবে কমে গিয়েছিল। সুতরাং যে সব অঞ্চলে আখ চাষ হতো সেখানে অন্যান্য ফসলের তুলনায় আখ চাষ অনেক বেশি লাভজনক হয়ে উঠেছিল কারণ অন্যান্য কোনো ফসলের ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো ধরনেরই সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়া না হলেও চিনির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সংরক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। আখ চাষের এই মুনাফাযোগ্যতার উন্নতি প্রতিফলিত হয়েছিল ভারতে সামগ্রিকভাবে আখ-চাষের এলাকা বেড়ে যাওয়ার ঘটনায়। ১৯২৮-২৯-এ আখ-চাষের এলাকার পরিমাণ ছিল ২.৭ মিলিয়ান একর; এটা বেড়ে ১৯৩৬-৩৭-এ হলো ৪.৬ মিলিয়ন একর। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪০ এর মধ্যে আখ চাষের এলাকা কমে গেলেও ১৯২০ সালের তুলনায় তা যথেষ্ট বেশিই ছিল (সারণি ১২.৪ দ্রষ্টব্য)।

চিনি শিল্পে সংরক্ষণ চালু করার পর ভারত সরকারকে প্রথমেই সে সব সমস্যার সমাধান করতে হয়েছিল তার মধ্যে একটি হলো—আখ উৎপাদক এবং চিনি ফ্যাক্টরিগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কজনিত সমস্যা। চিনি শিল্পে সংরক্ষণ দেওয়ার একটি প্রধান যুক্তি ছিল যে, এর ফলে আখের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং কৃষকের অবস্থার উন্নতি ঘটবে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু চিনি কলগুলির মালিকের তুলনায় আখ চাষীর অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক দুর্বল হয়ে পড়ল—বিশেষ করে সেই সব এলাকায় যেখানে গুড় উৎপাদনের ব্যাপক চল ছিল না

সারণি ১২.৩ ১৯২৬-৭ থেকে ১৯৩৯-৪০ পর্যন্ত ভারতে সাদা চিনি ও গুড়ের উৎপাদন ও ভোগ ('০০০ টনে)

বছর	আখ থেকে সরাসরি চিনি উৎপাদনের পরিমাণ	গুড় থেকে শোধন করে চিনির উৎপাদন	ফ্যাক্টরি থেকে উৎপাদিত মোট চিনি	খান্দসারি চিনির উৎপাদন	'গুড়ের নীট' উৎপাদন	ভারতে সাদা চিনির নীট আমদানি	ভারতে সাদা চিনির ভোগের মোট পরিমাণ =(৪)+(৭)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১৯২৬-৭	৬৩	৫৮	১২১	×	২,৩১৩	৮১৫	৯৩৬
১৯২৭-৮	৬৮	৫২	১২০	×	২,২৭৬	৭০৬	৮২৬
১৯২৮-৯	৬৮	৩১	৯৯	×	১,৭৭৮	৮৫৯	৯৫৮
১৯২৯-৩০	৯০	২৩	১১৩	২০০	১,৮৩৭	৯৩৩	১,০৪৬
১৯৩০-১	১২০	৩০	১৫০	২০০	২,২৪১	৮৯৮	১,০৪৮
১৯৩১-২	১৫৯	৬২	২২১	২৫০	২,৭৫৮	৫১০	৭৩১
১৯৩২-৩	২৯০	৭৮	৩৬৮	২৭৫	৩,২৪০	৩৬৬	৭৩৪
১৯৩৩-৪	৪৫৪	৬৫	৫১৯	২০০	৩,৪৮৬	২৪৯	৭৬৮
১৯৩৪-৫	৫৭৮	৪৪	৬২২	১৫০	৩,৭০১	২২০	৮৪২
১৯৩৫-৬	৯৩২	৪৮	৯৮০	১২৫	৪,১০১	১৯৮	১,১৭৮
১৯৩৬-৭	১,১১১	২৬	১,১৩৭	১০০	৪,২৬৮	—১৭	১,১২০
১৯৩৭-৮	৯৩১	১৭	৯৪৮	১২৫	৩,৩৬৪	—৩৫	৯১৩
১৯৩৮-৯	৬৫১	১৫	৬৬৬	১০০	২,১৩১	—৪	৬৬২
১৯৩৯-৪০	১,২৪২	২৭	১,২৬৯	১২৫	২,৪৪১	১৯৮	১,৪৬৭

—এই চিহ্ন নির্দেশ করছে যে, তথ্য পাওয়া যায় নি।

উৎস : (ক) *Reviews of the sugar industry in India, Indian Trade Journal*-এর বার্ষিক ক্রোড়পত্র;

(খ) ১৯৩০-১ থেকে ১৯৩৯-৪০ পর্যন্ত গুড়ের নীট উৎপাদনের জন্যে, ITB : *Report on Sugar*, প্রথম খণ্ড (বোম্বাই, ১৯৫০), পৃ. ৬২।

অথবা থাকলেও তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফ্যাক্টরি থেকে বহু দূরে অবস্থিত কোনো অঞ্চলে আখ বিক্রি করা যেত না কারণ আখ পরিবহণের ব্যয় পড়ে যেত অত্যধিক। তাছাড়া আখ কাটার পর যত সময় যেত তত তার মধ্যে সুক্রোজের পরিমাণও কমে যেত। উপরন্তু ফ্যাক্টরিগুলির নিজেদের মধ্যে এলাকাভিত্তিক চুক্তি থাকত, ফলে চাষীর কাছ থেকে আখ কেনার ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে কোনো প্রতিযোগিতা ছিল না। প্রথম দিকে উন্নত প্রজাতির আখের চাষের এলাকা ফ্যাক্টরিগুলির কার্যকরী উৎপাদন-ক্ষমতার তুলনায় অনেক দ্রুতহারে বেড়েছিল।

এই সব সমস্যার কিছু কিছু উদ্ভূত হয়েছিল কারণ সাদাচিনি শিল্প দ্রুত বিকাশ লাভ করলেও তা আখ-উৎপাদনের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না।

আবার কিছু সমস্যা ছিল একান্তভাবে আখ-চাষের সঙ্গে সম্পর্কিত। উত্তর ভারতের ছোট চাষীদের অবস্থা এই সমস্ত সমস্যাকে আরও তীব্র করে তুলেছিল। এই সব চাষীরা এতই দরিদ্র ছিলেন যে তাঁদের পক্ষে দুটি ফসলের মধ্যবর্তী সময়ে ঋণ না করে জীবন যাপন করা খুবই কষ্টকর ছিল। আখ চাষে জমি প্রায় আঠারো মাস থেকে দু' বছরের জন্যে আটকে থাকার অর্থ হলো আখ চাষীকে অন্যান্য শস্যের চাষীর তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে ঋণ করতে হতো। সাধারণভাবে আখ চাষী মহাজন, ব্যবসায়ী, জমিদার অথবা মিল-মালিকদের কাছ থেকে ঋণ করত । ঋণের উৎস যাই হোক না কেন, কৃষকের এই ঋণগ্রস্ততা তাঁর প্রতিযোগিতা করার অবস্থাকে অনেক দুর্বল করে দিয়েছিল। এর ফলে যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারের কৃষকেরা আখের যে দাম পেতেন তা অনেক সময় মণ-প্রতি তিন আনায় নেমে যেত, যা দিয়ে উৎপাদনের চলতি খরচও মিটত না।[৩৭]

সারণি ১২.৪ ভারতে কাঁচা চিনির উৎপাদন, ১৯২৫-৬ থেকে ১৯৩৯-৪০

বছর	আখ চাষের অধীন এলাকা ('০০০ একরে)	কাঁচা চিনির উৎপাদন ('০০০ টনে)
১৯২৫-৬	২,৮০৬	৩,১৪৩
১৯২৬-৭	৩,০৭৫	৩,৪২০
১৯২৭-৮	৩,১০৫	৩,৩৭৬
১৯২৮-৯	২,৭১৯	২.৮২৭
১৯২৯-৩০	২,৬২৪	২,৮৮৫
১৯৩০-৩১	২,৯০৫	৩,৩৫৯
১৯৩১-২	৩,০৭৭	৪,১১৬
১৯৩২-৩	৩,৪২৫	৪,৮৫৯
১৯৩৩-৪	৩,৪২২	৫,০৫৫
১৯৩৪-৫	৩,৬০২	৫,২৯২
১৯৩৫-৬	৪,১৫৪	১,১০২
১৯৩৬-৭	৪,৫৮২	৬,৯৩২
১৯৩৭-৮	৩,৯৯৭	৫,৫৭৯
১৯৩৮-৯	৩,২৭০	৩,৫৭২
১৯৩৯-৪০	৩,৭৮৮	৪,৮৪৯

সূত্র : *Reviews of the sugar industries of India, Indian Trade Journal*-এর পরিশিষ্ট।

কাঁচা চিনি হচ্ছে আখের গুড়ের সমগোত্রীয়।

১৯৩৩-এর গ্রীষ্মে ভারত সরকার আহূত এক কনভেনশনে আলোচনায় প্রকাশ পেল যে বিষয়গুলি সেগুলি হলো দ্রুত হারে চিনি শিল্পের বিকাশ বা বৃদ্ধি, উন্নত জাতের আখ চাষ প্রসারের ফলে আখের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস এবং অনেক চিনি ফ্যাক্টরি কর্তৃক আখের অলাভজনক মূল্যপ্রদান। কৃষকদের কিছু পরিমাণে মূল্য সংরক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৩৪

সালে ভারত সরকার 'সুগার কেন অ্যাক্ট' প্রবর্তন করে যার দ্বারা প্রাদেশিক সরকারগুলিকে আখের ন্যূনতম দাম স্থির করার এবং উপযুক্ত বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে এই দামকে কার্যকরী করার জন্য ক্ষমতা দেওয়া হয়। সেই অনুসারে যুক্ত প্রদেশ ও বিহাব সরকার স্ব স্ব এলাকায় আখের ন্যূনতম দাম ঘোষণা করে (বিহারের ক্ষেত্রে আইনটি কেবল উত্তর বিহারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল কারণ বিহারে চিনিকল গুলির বেশিরভাগই ছিল গঙ্গাব উত্তরে অবস্থিত)। ভ্যাকুয়াম প্যান্ বিশিষ্ট ফ্যাক্টরির জন্য আখেব ন্যূনতম দাম প্রথমে ধার্য করা হয়েছিল মণ প্রতি পাঁচ আনা করে। এর পিছনে এই অনুমান কাজ করেছিল যে, অতি উত্তম মানের চিনির দাম হবে মণ প্রতি আট টাকা আট আনা। এর পর ধাপে ধাপে আখ ও চিনির দামের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থির করা হয়েছিল — প্রতি মণ চিনির দামে আট আনা বৃদ্ধি বা হ্রাস হলে আখের দাম প্রতি মণে তিন পয়সা বৃদ্ধি বা হ্রাস করা হবে। খান্দসারি ও ওপেন প্যান বিশিষ্ট ফ্যাক্টরির জন্য আখের ন্যূনতম দাম কিছুটা কম ধার্য করা হয়েছিল — মণ প্রতি তিন আনা ছ' পাই। খান্দসারি বা ওপেন প্যান বিশিষ্ট ফ্যাক্টরিতে দেওয়া আখের দামের বৃদ্ধি বা হ্রাসের পরিমাণ এমনভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল যে তা হবে ভ্যাকুয়াম প্যান বিশিষ্ট ফ্যাক্টরিকে দেওয়া আখের দামের বৃদ্ধি বা হ্রাসের দুই-তৃতীয়াং শ। আখ সংক্রান্ত আইন ও বিধিনিষেধ কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে এই দুটি প্রদেশেই 'কেন্-ইনস্পেক্টব' (আখ-পরিদর্শক) নিযুক্ত করা হয়েছিল।[৩৮]

বিহাব ও যুক্তপ্রদেশ সরকার ন্যূনতম দাম বেঁধে দেওয়ার ফলে আখের দামে স্থিবতা এসেছিল বলে মনে হয় না। ১৯৩৫-৩৬-এ আখের ফলন চিনিকলগুলির উৎপাদন-ক্ষমতার তুলনায় অনেক অঞ্চলেই কম হয়েছিল এবং ভ্যাকুয়াম প্যান মিলগুলি আখের ন্যূনতম দাম অপেক্ষা বেশি দাম চাষীদের দিয়েছিল। অথচ ১৯৩৬-৩৭-এ, যে বছর আখের ফলনে প্রাচুর্য দেখা দিল, আখের প্রকৃত দাম ঘোষিত ন্যূনতম দামের চেয়ে কমে গিয়েছিল,[৩৯] এবং সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক সবকারগুলি নিজেরাই আখের ন্যূনতম দাম সংশোধন করে কমিয়ে দিয়েছিল যাতে আখেব কলগুলি আরও কিছুদিন আখ পেষাইয়ের কাজ চালিয়ে যেতে পারে।

আখেব চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা আরও তীব্র হয়ে উঠেছিল যখন ১৯৩৭-এ ভারত সরকার চিনির উৎপাদনের উপর অন্তঃশুল্কের হার বাড়িয়ে করলেন হন্দর পিছু দু' টাকা। ১৯৩৪-এ ভারত সরকার ভ্যকুয়াম-প্যান ফ্যাক্টরিতে উৎপাদিত চিনিব উপর অন্তঃশুল্ক ধার্য করেছিলেন হন্দর পিছু ১ টাকা ৮ আনা। শুল্কের পরিমাণ ছিল চিনিব উপর প্রচলিত আমদানি শুল্ক(হন্দর পিছু ৯ টাকা ১ আনা) ও সুপারিশকৃত শুল্কের পার্থক্যের সমান (ট্যারিফ বোর্ড ১৯৩১ সালে সুপারিশ করেছিল যে আমদানি শুল্ক আট আনা হারে বাড়ানো উচিত কারণ সে সময় কলকাতায় জাভা থেকে আমদানি করা প্রাক শুল্ক চিনির দাম মণ প্রতি ৪ টাকারও নিচে নেমে গিয়েছিল। ফলে ১৯৩৪-এ প্রস্তাবিত শুল্কের হার ছিল ৭ টাকা ৪ আনার পরিবর্তে ৭ টাকা ১২আনা)। অন্তঃশুল্ক বসানোর মূল উদ্দেশ্যে ছিল চিনির আমদানি দ্রুত কমে যাওয়ার ফলে বাণিজ্য শুল্ক আদায়ে যে ঘাটতি হয়েছিল তা পূরণ করা, তাছাড়া এর একটি গৌণ উদ্দেশ্যও ছিল— তা হলো, চিনি শিল্পের অগ্রগতি কিছুটা রোধ করা, কারণ এই অগ্রগতি খুব বেশি দ্রুতহারে ঘটছিল বলে মনে করা হতো।

১৯৩৪-এ যে অন্তঃশুল্কের প্রবর্তন হলো, তা হয়ত চিনি শিল্পের স্বাভাবিক মুনাফা কমিয়ে দেয় নি, কিন্তু ১৯৩১-এর শেষভাগ থেকে এই শিল্প স্বাভাবিকের থেকে যে অতিরিক্ত

মুনাফা হচ্ছিল তার বিলোপ ঘটিয়েছিল। [৪০] ১৯৩৪-৩৫-এ চিনি শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানি ভীষণভাবে কমে গিয়েছিল। অবশ্য ১৯৩২ ও ১৯৩৩-এ দেশে চিনি উৎপাদন ক্ষমতা দ্রুত সৃষ্টি হওয়ার পর যন্ত্রপাতি আমদানি যে কিছুটা কমে যাবে এটা প্রত্যাশিতই ছিল। ১৯৩৪-এ অন্তঃশুল্কের সামান্য অংশ বর্ধিত মূল্যের আকারে চিনির ভোগকারীদের উপর স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, যদিও সেটা ছিল সাময়িক ঘটনামাত্র। ১৯৩৭-এ যখন অন্তঃশুল্ক বেশি হারে ধার্য করা হলো তখন ফ্যাক্টরির উৎপাদিত চিনির দাম ইতিমধ্যেই কিছুকাল হলো কমতে আরম্ভ করেছে। ফলে অনেক ফ্যাক্টরিতেই আখ পেষাইয়ের কাজ স্থগিত রাখা হয়েছিল। চিনির দামের চুক্তির ব্যাপারেও চিনি ব্যবসায়ী ও চিনি কলগুলির মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা গিয়েছিল। ইতালি ও আবিসিনিয়ার সংঘর্ষ একটি গুরুতর আন্তর্জাতিক বিরোধে পরিণত হতে যাচ্ছে এই আশায় অনেক চিনি ব্যবসায়ী অপেক্ষাকৃত বেশি দামে চিনি ক্রয় করার চুক্তি করে ফেলেছিল। যখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সহজ হয়ে এল এবং চিনির দাম কমে গেল, তখন চিনি ব্যবসায়ীরা আগের চুক্তিতে মাল নিতে অস্বীকার করল [৪১] এবং যুক্তপ্রদেশ সরকারকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল এবং চিনির ফ্যাক্টরি ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটা রফার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

১৯৩৭ সালে যখন আখের চাহিদার তুলনায় অত্যধিক উৎপাদন হলো, তখন যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের সরকারকে আখের ন্যূনতম দাম যা ১৯৩৬-এর নভেম্বর ছিল মণ প্রতি ৪ আনা ৯ পাই তা ১৯৩৭-এব মে মাসে কমিয়ে মণ প্রতি ৩ আনার করতে হয়েছিল।[৪২] চিনিব উপর বর্ধিত হারে অন্তঃশুল্ক বসানোর প্রতিক্রিয়াতেও আখের ন্যূনতম দাম আরও কমানোর ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল। বিহারে ভ্যাকুয়াম-প্যান ফ্যাক্টরিতে যোগান দেওয়া আখের ন্যূনতম দাম মণ প্রতি ৩ পাই এবং ওপেন-প্যান ফ্যাক্টরির জন্য আখের দাম মণ প্রতি ২ পাই করে কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল।[৪৩] যুক্তপ্রদেশেও আখের দামে অনুরূপ সংশোধন করা হয়েছিল।[৪৪]

অন্তঃশুল্ক প্রবর্তনের ফলে চিনির দাম কিন্তু বাড়ে নি। বর্ধিত শুল্কের ভার প্রায় সম্পূর্ণতই আখ চাষী এবং ফ্যাক্টরি বহন করেছিল এবং পক্ষান্তরে কারখানাগুলি আখের জন্য কম দাম দেওয়ার মাধ্যমে শুল্কের বোঝার প্রায় সবটাই আখচাষীদের উপর চালান করে দিতে সমর্থ হয়েছিল।

১৯৩৭-এ আখচাষীরা আখের দাম কম পাওয়ার ফলে সে বছর আখের আবাদ কমে গিয়েছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে প্রতিকূল মৌসুমী ঋতু এবং বন্যার কারণে আখেব ফলন আরও কমে গিয়েছিল। এই কারণে আখচাষীদের দাম বেশি দেওয়া হচ্ছিল এবং আখের ন্যূনতম দাম বেশ উচ্চস্তরে গিয়ে পৌঁছল। যুক্তপ্রদেশে আখ উৎপাদকরা পেলেন মণ প্রতি ৬ আনা থেকে সাড়ে ৮ আনা পর্যন্ত দাম। আখের মরসুমে কারখানাগুলি সরকারকে মণ প্রতি আখের জন্য ৬ পাই এবং সমবায় সমিতিগুলি থেকে কেনা আখের জন্য মণ প্রতি অতিরিক্ত ৩ পাই কর দিত। তবে চিনির দাম বেশি থাকার জন্যে কারখানাগুলি তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি।[৪৫]

তাহলে এটা স্পষ্ট যে, সরকারের আখের সর্বনিম্ন দাম বেঁধে দেওয়ার নীতি আখচাষীদের চিনি কলগুলির একচেটিয়া সুলভ শোষণ থেকে রক্ষা করতে পারে নি বা আখচাষের এলাকার পরিমাণে তীব্র ওঠানামার প্রবণতাকেও রোধ করতে পারে নি। অনেক

ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন দামটাই প্রকৃতপক্ষে সর্বোচ্চ দামে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।[৪৬] চাষীদের বঞ্চনা করা হতো আরও নানা উপায়ে— যেমন, আখের ফড়েরা ওজন কমিয়ে অথবা আখ শুকিযে গেছে এই অজুহাতে দাম থেকে অত্যধিক পরিমাণে একটি অংশ কেটে নেওয়া হতো। কখনও বা ফড়ে বা চিনি কলের ম্যানেজার বা নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের কমিশন বা উপহাব দিতে বাধ্য করা হতো। মিলগুলির সঙ্গে চাষীদের যে সব চুক্তি হতো তা প্রায়শই ছিল একপেশে। চুক্তিকারী মিলগুলিকে আখ বিক্রয় করতে চাষীদের বাধ্য করা হলেও, মিলগুলি কিন্তু তাদের দিক থেকে সংশ্লিষ্ট চাষীর আখ কিনতে বাধ্য ছিল না। বিভিন্ন আখের জমি থেকে চিনিকলগুলিতে আখ এনে জমা দেওয়ার কোনো নির্দিষ্ট সময়সূচী ছিল না এবং এর ফলে কৃষকদের অশেষ কষ্ট ভোগ করতে হতো কারণ মিলের দরজায় তাদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হতো, আখ শুকিয়ে যাওয়ার জন্যে আর্থিক ক্ষতি হতো এবং তাড়াতাড়ি তাদের আনা পণ্য কিনে নেওয়ার জন্যে মিলের অধস্তন কর্মচারীদের ঘুষও দিতে হতো। পার্শ্ববর্তী মিলগুলির মধ্যে অঞ্চল ভিত্তিক চুক্তি থাকত ফলে কোনো চিনি মিলেব অধীনস্থ অঞ্চলের চাষীরা সাধারণভাবে সেই মিলের করুণার পাত্র হয়ে থাকতেন।[৪৭]

কিন্তু আখ আইন এবং এই আইন প্রয়োগের দায়িত্বে যে সব আখ পরিদর্শক ছিলেন— আখচাষীদের স্বার্থ কিছু পরিমাণে সুরক্ষিত করতে পেরেছিলেন। আইনগতভাবে যে ন্যূনতম দাম ধার্য করা হযেছিল তা আখচাষীরা অনেকটাই পেয়েছিলেন যা উপরোক্ত আইন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা না থাকলে সম্ভব হতো না। আইনগতভাবে যে সর্বনিম্ন দাম ঘোষণা করা হয়েছিল তার ফলে আখের প্রকৃত দাম ১৯৩৭ সালে আরও নিচে নেমে যেতে পারে নি। স্থানীয় সরকারগুলির সমবায় দপ্তর আখ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতি সংগঠিত করে চাষীদের স্বার্থে কিছুটা ভালো কাজ করেছিল যদিও কারখানাগুলি এই ধরনেব সমবায় সমিতির সাথে কোনো রকম লেনদেন কবতে অস্বীকার করত এবং সাধারণ চাষীদেব অধিকাংশই এই সব সমিতির আওতার বাইরেই থেকে গিয়েছিল।

১২.৫ সরকার এবং চিনি শিল্পের মধ্যে সম্পর্ক-১৯৩১-৩৯

ইন্ডিয়ান ট্যারিফ্ বোর্ড (আই. টি. বি.) ১৯৩১ সালে ভারত সরকারের কাছে সুপারিশ করেছিল যে, চিনি সংক্রান্ত গবেষণা কাজের জন্যে ১০ লক্ষ টাকা আলাদা করে বরাদ্দ করা উচিত। ভারত সরকার এই সুপারিশ আইনগতভাবে কার্যকর না করলেও কেন্দ্রীয় আইনসভাকে আশ্বাস দিয়েছিল যে, চিনি শিল্পের সমস্যা বিষয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত অর্থ দেওয়া হবে। ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ কর্তৃক ১৯৩০ সালেই একজন চিনি প্রযুক্তি-বিশেষজ্ঞকে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং তাঁর অধীনেই সুগার ব্যুরোর দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল। কানপুরের হারকোর্ট বাটলার টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের টেকনোলজি বিভাগকে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছিল প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি কারখানা স্থাপনের জন্যে। এ ছাড়া ঐ একই বিভাগকে বাৎসরিক ২০ হাজার টাকার পৌনঃপুনিক অনুদান দেওয়া হয়েছিল এই শর্তে যে, ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ এগ্রিকালচারাল রিসার্চের সুপারিশক্রমে সেখানে অন্যান্য প্রদেশ থেকে আগত কিছু সংখ্যক

ছাত্রকে অবৈতনিক হিসাবে ভর্তি করে নেওয়া হবে। ১৯৩৬ সালে ভারত সরকার হারকোর্ট বাটলার টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের চিনি বিভাগ ও চিনি প্রযুক্তি-বিশেষজ্ঞের দপ্তরকে সংযুক্ত করে গঠন করল অল-ইন্ডিয়া ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউট্ অব্ সুগার টেকনোলজি। এই প্রতিষ্ঠানটির উপরে চিনি প্রযুক্তিবিদ্‌দের প্রশিক্ষণ এবং চিনি শিল্পের এবং চিনি শিল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা উভয় কাজেরই দায়িত্ব এসে পড়ল।[৪৮]

১৯৩৪-এ চিনির উপর অন্তঃশুল্ক চালু হাওয়া পর ভারত সরকার কর্তৃক সুগার এক্সাইজ ফান্ড নামে একটি তহবিল গড়ে তোলা হয়। এই তহবিল থেকে নানা ধরনের অনুমোদিত প্রকল্পে অর্থ সাহায্য করার জন্যে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে অনুদান দেওয়া হয়। যেমন—গবেষণা প্রকল্প, আখের দাম নিয়ন্ত্রণ, উন্নত জাতের আখ ও উন্নত পদ্ধতির চাষের প্রসার, আখের সমবায় ভিত্তিতে বিপণন, ইত্যাদি। ১৯৩৪-৫ এবং ১৯৩৫-৬ এই দু' বছরে এই উদ্দেশ্যে অনুমোদিত অর্থবরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল মোট ৯,৭২, ৫০০ টাকা এবং ১৯৩৬-৩৭ এ ৮৩৫,৫০০ টাকা; ১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত মাদ্রাজ ও বাংলা সরকারকে তিন বছরে মোট ১৩৪,০০০ টাকা অনুদান দিলেও তারা কোনো উপযুক্ত প্রকল্প রচনা করতে পারে নি।[৪৯]

কোয়েম্বাটুর, শাজাহানপুর এবং অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারি আখ চাষ কেন্দ্রগুলিতে পরিচালিত গবেষণাকর্মও ১৯৩০-এর পর থেকে বৃদ্ধি পেতে লাগল। এই সব গবেষণা কর্মই চিনি শিল্পের উপর সর্বাধিক প্রভাব ফেলেছিল কারণ এর ফলে আখের উৎপাদন ব্যয় কমে গিয়েছিল, বিশেষ করে উত্তর ভারতে যেখানে উৎপাদন খরচ প্রায় বৃদ্ধি না করেই আখের একরপিছু উৎপাদশীলতা বাড়ানো সম্ভব হয়েছিল। ভারতের সুগার মিলস্ অ্যাসোসিয়েশন ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউট সম্পর্কে অভিযোগ এনেছিল যে, বড় বড় চিনিকলগুলিতে যে সব চিনি প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা কাজ করেন তাঁদের ক্ষমতা বা সাধ্যের অতীত কোনো ধরনের কারিগরী সাহায্যই ইনস্টিটিউট চিনিশিল্পকে দিতে পারে নি।[৫০] অন্যদিকে চিনি প্রযুক্তি-বিদ্‌দের অভিযোগ ছিল যে, ভ্যাকুয়াম-প্যান্ ফ্যাক্টরির পক্ষে উপযুক্ত উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা চালানোর মতো যোগ্য কর্মী ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি হারকোর্ট বাট্‌লার টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটে ছিল না এবং "বস্তুত বিশেষ বিশেষ সমস্যা নিয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার জন্যে কোনো চাহিদা চিনি শিল্পের তরফ থেকেও ছিল না।"[৫১]

তবে এটা ঠিক যে, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি যে গবেষণার কাজ করছিল এবং চিনি প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞের দপ্তর থেকে যে সব তথ্য সরবারাহ করা হচ্ছিল তা থেকে ওপেন-প্যান ফ্যাক্টরি অর্থাৎ খান্দসারি, গুড় তৈরির কল এবং ছোট ছোট ফ্যাক্টরিগুলি বেশ উপকৃত হয়েছিল। সৈয়দ মহম্মদ হাদি অনেক বছর আখ পেষাইয়ের জন্যে উন্নত ধরনের রোলার ব্যবহার, আখের রস অবিরাম ফুটিয়ে রাখার ব্যবস্থা এবং গুড় থেকে চিনি আলাদা করে বার করে নেওয়ার জন্যে সেন্ট্রিফিউগ্যাল মেশিনেব ব্যবহার সম্বন্ধে সক্রিয়ভাবে প্রচার করে আসছিলেন।[৫২] চিনি শিল্পে সংরক্ষণ চালু করার পর্ব অবধি খান্দসারি টিকে থাকার মূলে ছিল উপরোক্ত উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ। স্থানীয় সরকারগুলির বড় বড় চিনি কলগুলিকে কোনো রকম প্রত্যক্ষ আর্থিক বা কারিগরী সাহায্য দেওয়ার মতো অবস্থায় ছিল না (দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এটা উল্লেখ কারার মতো যে, মাদ্রাজ সরকার একমাত্র যে চিনি কারখানাকে

১৯৩০-এর পব ঋণ দিয়েছিল তা হলো কিরলামপুড়ির শ্রীরামকৃষ্ণ সুগার মিল লিমিটেড, যার উৎপাদন-ক্ষমতা ছিল দৈনিক ৮০ টন। ঋণের এই টাকা দেওয়া হয়েছিল ঐ মিলের পুরনো দেনা শোধ করা এবং উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক ১২০ টন পর্যন্ত বাড়ানোর জন্যে। একটি চিনি ফ্যাক্টরির উৎপাদন-ক্ষমতা অর্থনীতিগত বিচারে যা হওয়া উচিত অর্থাৎ দৈনিক ৪০০ টন—প্রাগুক্ত মিলটির উৎপাদন-ক্ষমতা ছিল তার থেকে অনেক নিচে।[৫৩]

বড় বড় কেন্দ্রীয় চিনি কলগুলির তুলনায় খান্দসারি ও গুড় উৎপাদনের অবস্থার শুল্ক সংরক্ষণ চালু হওয়ার এবং কেন্দ্রীয় মিলগুলির দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে নিশ্চিত ভাবেই অবনতি ঘটছিল। ১৯২৮ সালে উইনি সেয়ার একটি হিসাব করেছিলেন যে, ভারত মোট যে ৩০ মিলিয়ন টন আখ উৎপাদিত হয়, তার শতকরা মাত্র ২.৫ ভাগ ব্যবহৃত হয় আধুনিক পদ্ধতিতে সাদাচিনি উৎপাদনের জন্যে, শতকরা ৭.৫ ভাগ হয় গুড় তৈরির কলগুলিতে (খান্দসারি সহ) এবং বাকিটা গুড় অথবা বীজ হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার জন্যে অথবা চিবিয়ে খাওয়ার উদ্দেশ্যে।[৫৪] ১২.৩ নং সারণি অনুসারে, ১৯২৯-৩০ সালে খান্দসারি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ২০০,০০০ টন এবং আধুনিক কলগুলিতে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৯০,০০০ টন। ১৯৩৪-৩৫-এর মধ্যেই ফ্যাক্টরি থেকে উৎপাদিত চিনিব পরিমাণ বেড়ে হয়েছিল ৫৭৮,০০০ টন এবং খান্দসারির উৎপাদন কমে হয়েছিল ১৫০,০০০।[৫৫] খান্দসারি সম্পর্কিত হিসাবের মধ্যে হয়ত আতিশয্য আছে—কারণ খান্দসারি উৎপাদন হিসাবে গণ্য করা যায় আর বাকি অংশ সম্পর্কে কেবল অনুমান করে নেওয়া সম্ভব। যুক্তপ্রদেশ খান্দসারি উৎপাদন সম্পর্কে চিনি প্রযুক্তি-বিশেষজ্ঞ যে অনুসন্ধান চালিয়েছেন তা থেকে দেখা যায় যে, ১৯৩৩-৩৪ সালে এর উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১০০,০০০ টনের কিছু কম। যেহেতু যুক্ত প্রদেশেই খান্দসারির উৎপাদনেব বেশিরভাগ ছিল কেন্দ্রীভূত, সমগ্র ভারতের উৎপাদন নিঃসন্দেহে ২০০,০০০ টনের কম ছিল। এই তথ্যের সঙ্গে সরকারি ভাষ্য হিসাবে পরিগণিত ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ প্রদত্ত তথ্যের বিরোধ আছে। পক্ষান্তরে, খান্দসারি উৎপাদনে নিযুক্ত ছিল প্রখর ব্যবসায় বুদ্ধিসম্পন্ন গোষ্ঠী এবং তাদের প্রকৃত উৎপাদনকে কিছুটা গোপন করার চেষ্টা থাকা স্বাভাবিক কারণ যে সব উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকে ফ্যাক্টরি শ্রেণীভুক্ত করা হবে তাদের অন্তঃশুল্ক দেওয়ার দায়ও থাকবে। সুতরাং তথ্য নানা দিক থেকে যাচাই করে নিলেও উপরোক্ত হিসাবের মধ্যে অসম্পূর্ণতা থাকতে বাধ্য। তাছাড়া যে সব অঞ্চলে চিনি ফ্যাক্টরিগুলির উৎপাদন ক্ষমতা যুক্তপ্রদেশের মতন অত ব্যাপক প্রসার লাভ করে নি, সে সব জায়গায় খান্দসারির উৎপাদন সম্ভবত কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কীভাবে এই সমস্ত পরস্পর বিরোধী ঘটনার মধ্যে সমন্বয় আনা যায় তা কিছুটা ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছানির্ভর হওয়া স্বাভাবিক। অবশ্য গুড়ের নীট উৎপাদন তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে নি। মোট আখ উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশ থেকে এক পঞ্চমাংশের মধ্যে ব্যবহৃত হতো কারখানাগুলিতে যদিও আখ ব্যবহারের ক্ষেত্রে গুড়েব প্রাধান্যই ছিল বেশি (আখ থেকে যা গুড় বা সাদা চিনি পাওয়া যেত তা মোটামুটি ভাবে ছিল আখের ওজনের এক দশমাংশ যদিও গুড়ের মধ্যে সুক্রোজের পরিমাণ ছিল অনেক কম)।

ভ্যাকুয়াম-প্যান্ ফ্যাক্টরি থেকে উৎপাদিত সাদা চিনির উপর যখন হন্দর প্রতি ১ টাকা ৫ আনা হারে অন্তঃশুল্ক বসানো হলো, তখন খান্দসারি চিনির উপর অন্তঃশুল্কের হার ছিল

হন্দর প্রতি মাত্র ১০ আনা ১৯৩৭ সালে যখন সাদাচিনির উপর শুল্কের হার বাড়িয়ে করা হলো হন্দর প্রতি ২ টাকা তখন খান্দসারি চিনিব উপর শুল্ক বেড়ে হলো হন্দর প্রতি ১ টাকা ৫ আনা। পরবর্তী সময়ে এই হার কমিয়ে করা হলো হন্দর প্রতি ১ টাকা। অনেক ক্ষেত্রে খান্দসারি উৎপাদনের কাজকর্মকে ছোট ছোট ভাগে ভেঙে নেওয়া হলো যাতে কোনো একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন কেন্দ্রে কুড়ি জনের কম লোক নিযুক্ত থাকে এবং ফ্যাক্টরি হিসাবে রেজিস্ট্রি করা এবং অন্তঃশুল্ক প্রদান করার প্রয়োজন না হয়।[৫৬] এছাড়াও আখ কেনার ব্যাপারেও ন্যূনতম দাম দেওয়ার ক্ষেত্রে খান্দসারিগুলি অনেক বেশি সুবিধা ভোগ করত।

খান্দসারি উৎপাদন টিকে থাকার জন্যে সরকারি নীতিও কিছুটা দায়ী। চিনি শিল্পে সংরক্ষণ চালু হওয়ার পর প্রথম দুই বা তিন বছরে খান্দসারি উৎপাদন অবশ্যই কমে থাকতে পারে—যা ১৯৩৪-৩৫ থেকে ওপেন-প্যান ফ্যাক্টরিগুলির ব্যাপক সংখ্যায় বন্ধ হয়ে যাওয়াব ঘটনা থেকে বোঝা যায়। এতদ্‌সত্ত্বেও যুক্তপ্রদেশের শিল্প দপ্তরের ১৯৩৯ সালের প্রশাসনিক রিপোর্টে[৫৭] নিম্নোক্ত যে মন্তব্যটি করা হয়েছে—'আধুনিক চিনি কলগুলির দ্বারা এই শিল্পটি (খান্দসারি) ধীরে ধীরে বিতাড়িত হচ্ছে'—সেটি প্রচলিত মতের অনুসারী হলেও পরবর্তী ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে যে তা যথাযথ ও বিবেচনাপ্রসূত ছিল না। সাধারণভাবে জমিদার বা মহাজন বা ব্যবসায়ী থেকে পুঁজিপতিতে পরিণত হওয়া ব্যক্তিটি পুঁজিপতি হিসাবে ছোট হলেও আখের উৎপাদকের উপর তার প্রবল ক্ষমতা ও প্রভাব ছিল এবং স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে কেউ কেউ খান্দসারি পছন্দ করার ব্যাপারে এতটাই নিষ্ঠাবান ছিলেন যে, এই শিল্পটির দ্রুত ও স্বাভাবিক মৃত্যু সম্ভব ছিল না।

গুড় উৎপাদন যে প্রবলভাবে অব্যাহত ছিল তার মূলে কিন্তু সরকাবি নীতির কোনো অবদান ছিল না। গুড় তৈরির সুযোগ আখচাষীদের কাছে মিলমালিকদের সঙ্গে দরকযাকষির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হিসাবে পবিগণিত হয়েছিল। গুড়েব দামের ওঠানামাব সঙ্গে চিনির দামের কোনো সম্পর্ক ছিল না।[৫৮] এছাড়া দরকষাকষিব প্রশ্ন বা গুড়ের বেশি দাম ধার্য করে, মুনাফা করার কথা বাদ দিলেও, মোট আখ উৎপাদনের কিছু বা সমস্ত অংশই রেখে দেওয়ার ব্যাপাবে চাষীর একটা স্বার্থ ছিল এবং তা হলো গুড় হিসাবে ভোগ করা। তবে স্থানীয় চিনি ও গুড়ের বাজার আরও ভালোভাবে সংহত হওযার ফলে, গুড় এবং ফ্যাক্টরি উৎপাদিত চিনির মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল বিশেষ করে যখন আবাদ কম বা চিনির দাম অপেক্ষাকৃত বেশি হওযার জন্যে ফ্যাক্টবিতে যোগান দেওয়া আখের দাম বেড়ে যেত। তিরিশের দশকের শেষ বছরগুলিতে গুড় উৎপাদনের পরিমাণ যে ব্যাপক অস্থিরতা দেখা যায় তা থেকে এই ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মাথাপিছু সাদাচিনির ভোগের পরিমাণে বৃদ্ধির দীর্ঘকালীন প্রবণতা ফ্যাক্টরি ভিত্তিক চিনি শিল্পের বিকাশে সাহায্য করেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের প্রাদেশিক সরকার ফ্যাক্টরিভিত্তিক চিনি শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল বিশেষত ১৯৩৬-৭ এর সংকটের পর। এই সংকটের কারণ ছিল আখের পর্যাপ্ত আবাদ, চিনির কম দাম এবং অন্তঃশুল্কের হার বৃদ্ধি। চিনি কলগুলি ১৯৩৭-এর ৩০ শে জুন প্রতিষ্ঠা করল ইন্ডিয়ান সুগার সিন্ডিকেট। মূলত এটা ছিল বিক্রেতাদেব সিন্ডিকেট। ১৯৩৭-এর অক্টোবর মাস শুরু হওয়ার মধ্যেই ৯২ টি মিল সিন্ডিকেটে যোগ দেয়; কিন্তু উত্তর ভারতের ১৯ টি বড় ফ্যাক্টরি ও ১৭ টি অপেক্ষাকৃত ছোট ফ্যাক্টরি,

বোম্বাইয়ের ৪টি ফ্যাক্টরি এবং মাদ্রাজের সমস্ত ফ্যাক্টরি সিন্ডিকেটে যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকে। সিন্ডিকেটের সদস্য ফ্যাক্টরিগুলি যা চিনি উৎপাদন করত তার সবটাই সিন্ডিকেটকে বিক্রয় করার কথা : অন্যদিকে সিন্ডিকেট ফ্যাক্টরিইগুলির কাছে মজুত (যদিও সিন্ডিকেটকে বিক্রি করে দেওয়া) চিনির ভাণ্ডার থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণে বিক্রয়ের নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী বাজারে বিক্রয় করবে—এ রকমই ছিল ব্যবস্থা। ঐ সময়ে বাজারে যে দাম প্রচলিত ছিল তা থেকে সিন্ডিকেট বেশি দামে বিক্রয় করত। সিন্ডিকেট গঠিত হওয়ার পর প্রথম তিন মাসে চিনির বিক্রয়ের গতি ছিল খুব ধীর কারণ সদস্য মিলগুলিতে চিনির মজুত পরিমাণ এবং তাদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বেড়ে গিয়েছিল। যদিও সিন্ডিকেট চিনির দাম প্রায় এক টাকার মতো বাড়াতে সফল হয়েছিল তবু যতদিন পর্যন্ত বিরাট সংখ্যক চিনিকল এর আওতার বাইরে থেকে গিয়েছিল ততদিন পর্যন্ত সিন্ডিকেট এ কাজে সফল হতে পারে নি। সুতরাং বিহার ও যুক্ত প্রদেশের সরকার এই অবস্থায় একজোট হয়ে সিন্ডিকেটকে আইনগত স্বীকৃতি দিল। ঠিক হলো যে, ইন্ডিয়ান সিন্ডিকেটের সদস্যদেরই কেবল আখ পেষাইয়ের লাইসেন্স দেওয়া হবে।[৫৯]

সুগার সিন্ডিকেট তার একচেটিয়াগত অবস্থানকে ব্যবহার করে চিনির দাম বাড়িয়ে দিল এবং ১৯৩৯ সালের প্রথম দিকেই দাম ১৯৩৭ সালের সর্বনিম্ন দামের দ্বিগুণ হয়ে গেল। ১৯৪০-এর জুন মাসে যুক্তপ্রদেশ ও বিহার সরকার চিনি উৎপাদানের লাইসেন্স পাওয়ার জন্যে সুগার সিন্ডিকেটের সদস্য হওয়ার শর্তসংক্রান্ত আইন বাতিল করল। এর ফলে সিন্ডিকেট থেকে পদত্যাগ করার জন্যে সদস্যদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল এবং চিনি শিল্পে সংকট দেখা দিল। চিনির মজুত ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ায় অনেক ফ্যাক্টরি আর্থিক সমস্যার মধ্যে পড়ে গেল। সিন্ডিকেট সংশ্লিষ্ট সরকারগুলির কাছে তাদের আইনগত স্বীকৃতি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে আবেদন জানাল। এই আবেদন মঞ্জুর করা হলো একটি শর্তে যে, বাজারে চিনি কতটা ছাড়া হবে এবং চিনির দাম কি হবে তা ঠিক করবে সরকার। এইভাবে শিল্পের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা শেষ হয়ে গেল এবং সরকারি সাহায্যের প্রয়োজন হয়ে পড়ল অধিকাংশ ফার্মের স্বার্থের বিরুদ্ধে একটি ফার্মের বিশেষ সুবিধে নেবার প্রবণতা সদস্য ফার্মগুলির লোলুপতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে, অথচ এই অধিকাংশ ফার্মগুলিই সমন্বয়ের জন্যে ঐকমত্যের দ্বারা বাধানিষেধের জেরে বাঁধা ছিল।[৬০]

১২.৬ তিরিশের দশকে চিনি শিল্পের দক্ষতা

কোনো একটি শিল্পে একটি উপযুক্ত মাপের কারখানা থাকার অর্থ এই নয় যে, ঐ শিল্পে ফার্মের আয়তনও প্রযুক্তিগত দিক থেকে উপযুক্ত মানের হয়েছে। বিপণন ও অর্থবিনিয়োগের ব্যয়সংকোচের ফলে ফার্মের আয়তন এমন এক স্তরে পৌছায় যা প্রযুক্তিগত দিক থেকে উপযুক্ত আয়তন থেকে আলাদা।[৬১]

যে সব শিল্পে উল্লেখযোগ্য হারে ব্যয়সংকোচের সুবিধা পাওয়া যায়, সে সব শিল্পে ফার্মের কাম্য আয়তন সম্পর্কিত ধারণা সেখানে খুবই অস্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায়। সেক্ষেত্রে আমরা ফার্মের এক বিশেষ আয়তনের কথা বলতে পারি যা উৎপাদন ব্যয়ের চলতি স্তরে ও বাজারের

বর্তমান অবস্থায় ফার্মটিকে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করতে সাহায্য করবে। এই অর্থেই ভারতীয় রাজস্ব পর্ষদ্ একটি ফার্মের 'অর্থনৈতিক আয়তন'-এর কথাটি প্রায়শই ব্যবহার করেছে। ১৯৩১-এ রাজস্ব পর্ষদ দৈনিক ৪০০ টন আখ নিষ্কাশনের ক্ষমতাসম্পন্ন কারখানাকেই অর্থনৈতিক একক বলে ধরেছে। ১৯৩৮-এ অর্থনৈতিক আয়তন বলে ধরা হয়েছিল ৫০০ টন আখ নিষ্কাশনের ক্ষমতাসম্পন্ন কারখানাকে।[৬২]

রাজস্ব বিষয়ে অনুসন্ধান চলাকালে যাঁরা স্বাক্ষ্য দিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই এই প্রশ্নে একমত ছিলেন যে চিনিকলের কোন নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক আয়তন থাকতে পারে না। বস্তুত, এই আয়তনের মাত্রা নির্ভর, করবে যে বিষয়গুলির উপর সেগুলি হলো : (ক) সন্নিহিত অঞ্চলে আখ উৎপাদনেব কেন্দ্রীভবন ও উৎপাদন ব্যয়ের স্তর; (খ) আখ ও চিনির পরিবহণ ব্যয়; (গ) বাজাব থেকে মিলটির দূরত্ব; (ঘ) আখ পেষাই-এর মরশুমেব স্থায়িত্ব যা নির্ভব করত প্রধানত আখের জাত এবং গুণের উপব। এবং (ঙ) উৎপাদন ব্যায়েব মধ্যে স্থায়ী ব্যয়ের আপেক্ষিক গুরুত্ব। সাদা চিনি উৎপাদনের দু ধরনের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল—এক, 'সালফিটেশন' পদ্ধতি এবং দুই, 'কার্বোনিটেশন' পদ্ধতি। শেষোক্ত পদ্ধতিতে উৎপাদিত সাদা চিনি গুণগতভাবে অনেক বেশি উন্নত ছিল এবং প্রতিকূল আবহাওয়া-জনিত কারণে এতে ক্ষতিও হয় কম। এই পদ্ধতিতে উৎপাদন বেশি হলেও ইউনিট পিছু মূলধনী ও পরিচালন ব্যয়ও বেশি হতো। কার্বোনিটেশন পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল চুনাপাথবের পরিবহণ মাশুল অত্যাধিক হওয়ার ফলেই এই পদ্ধতিতে চিনির উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছিল। যেসব অঞ্চলে চুনাপাথর অপেক্ষাকৃত সস্তায় পাওয়া যেত, সে সব অঞ্চলে এই প্রক্রিয়ায় চিনি উৎপাদনের চল বেশি ছিল। ১৯৩১ এবং ১৯৩৯ সালে ভারতের রাজস্ব পর্ষদের অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, সারা ভারতে চিনি উৎপাদনে অন্য পদ্ধতির তুলনায় 'সালফিটেশন' পদ্ধতির প্রচলনই ছিল ব্যাপক। উৎপাদন পদ্ধতি এবং কারখানার আয়তনের মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায় নি ফলে আমরা এই অনুচ্ছেদের বাকি অংশে তার কোনো উল্লেখ করছি না।

চিনি কলের আয়তনের প্রশ্নের সঙ্গে অবস্থানের প্রশ্নটিও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। আখ উৎপাদনের দিক থেকে সমগ্র ভারতকে দুটি অঞ্চলে ভাগ করা যেতে পারত—ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চল। বোম্বাই, মহীশূর এবং মাদ্রাজ এগুলি হলো ক্রান্তীয় এবং যুক্তপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব ও বাংলা এগুলি উপক্রান্তীয় অঞ্চলভুক্ত। ১৯৩৭ এবং তার কাছাকাছি সময়ে আখ চাষের এলাকার নব্বই শতাংশেরও বেশি ছিল উপক্রান্তীয় অঞ্চলভুক্ত।[৬৩] ক্রান্তীয় অঞ্চলের একটি সুবিধা ছিল—তা হলো, আখ পেষাই-এর ঋতুটি ছিল বেশ দীর্ঘ। তার ফলে অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকলে, একটি ফার্ম-এর পক্ষে উপক্রান্তীয় অঞ্চলের তুলনায়, ক্রান্তীয় অঞ্চলে ছোট ফ্যাক্টরিও পূর্ণ ক্ষমতার বিন্দু পর্যন্ত চালানো সম্ভবপর হতো। তাছাড়া বোম্বাই ও মাদ্রাজে স্থানীয় উৎপাদনের পরিমাণের তুলনায় স্থানীয় ভোগের পরিমাণ অনেক বেশি হওয়ায়, এই অঞ্চলের মিলগুলির উৎপন্ন দ্রব্য (চিনি) বিপণনের পরিবহণ ব্যয় অনেক কম হতো। তুলনায় উত্তর ভারতের মিলগুলির পরিবহণ ব্যয় হতো অনেক কম কারণ স্থানীয় বাজার ছাড়াও পণ্য বিক্রয়ের জন্যে তাদের বাজার খুঁজতে হতো পশ্চিম, পূর্ব বা দক্ষিণ ভারতে। তাছাড়া উত্তর ভারতের তুলনায় মাদ্রাজ, বোম্বাই ও মহীশূরে আখের একরপিছু উৎপাদন এবং আখের 'সুক্রোজ্' উপাদান ছিল অনেক বেশি।[৬৪]

অবশ্য যুক্তপ্রদেশ ও বিহাবে আখ চাষেব এলাকাব পবিমাণ বিস্তৃত হওযাব ফলে অনেক ফ্যাক্টবী এসব অঞ্চলে গড়ে ওঠা ছাড়াও আব একটি বিষয উল্লেখযোগ্য ছিল—তা হলো বোম্বাই ও মহীশূবেব তুলনায এই সমস্ত প্রদেশে আখেব একবপিছু উৎপাদন ব্যয ছিল অনেক কম। আখেব একব পিছু গড় উৎপাদন ব্যযেব নিচেব সাবণিটি ১৯৩৮ সালেব ইন্ডিযান ট্যাবিফ বোর্ডেব দেওযা

প্রদেশ	মণ প্রতি আযেব গড় উৎপাদন ব্যয (টাকায)
যুক্তপ্রদেশ	০-৩-৭
বিহাব	০-৩-৪
পাঞ্জাব	০-৫-০
বাংলা	০-৪-০
বোম্বাই	০-৫-১০
মাদ্রাজ	০-৫-০

সূত্র : ITB : *Report on Sugar* (দিল্লী, ১৯৩৮), পৃ ৩৩-৬

আখ বা সেই অর্থে যে কোনো ফসলেব—যাব আবাদ হয ক্ষুদ্র চাষ ব্যবস্থাব মাধ্যমে—উৎপাদন ব্যয নির্ণয কবাব অনেক সমস্যা আছে। সাধাবণভাবে চাষী তাব জমিতে নিজেব ও পবিবাবেব শ্রম ভাল পবিমাণে প্রযোগ কবে এবং আখ চাষেব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা ধবনেব কাজ কবাব উদ্দেশ্যে তাব নিজস্ব গরু-বলদ বা অন্যান্য পশুব শ্রমও ব্যয কবত। এই সমস্ত পাবিবাবিক শ্রমেব খবচ বাজাব দামে হিসাব কবা ভুল হবে কাবণ এই উপাদানগুলিব অধিকাংশই ব্যয কবা হতো এমন সমযে যখন চাষেব মবশুম গত হযে গেছে অর্থাৎ পাবিবাবিক চাষে এই উপাদানগুলি ব্যযিত না হওযাব একমাত্র বিকল্প ছিল কর্মহীনতা। প্রকৃতপক্ষে, চাষেব খবচ হিসাব কবতে হলে এই বিকল্প খবচ-ই ধবা উচিত। কিন্তু কেউ চাষেব বিভিন্ন ঋতুতে পাবিবাবিক ইনপুটগুলিব বণ্টন বা চাষেব মন্দ ঋতুতে গৃহস্থেব পশুসহ পাবিবাবিক শ্রম প্রযোগেব ফলে কতটা অতিবিক্ত খবচ হলো তাব হিসাব কবাব ঝুঁকি নিতে চাইত না। তাছাড়া কৃষকেব জমিব খাজনা কত হবে সে হিসাব কবাবও অসুবিধা ছিল। একজন সর্বাধিক মুনাফা অর্জনকাবী পুঁজিবাদীব তুলনায একজন কৃষক তাব নিজেব চাষেব জমিতে অপেক্ষাকৃত কম আয পেযেও সন্তুষ্ট থাকতে পাবে কাবণ কৃষক বা তাব পবিবাবকে যতদূব সম্ভব কাজে নিযুক্ত বাখতে জমি ছিল প্রধান প্রযোজনীয উপাদান। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০-এব বছবগুলিতে ইম্পিবিযাল কাউন্সিল অব্ এগ্রিকালচাবাল বিসার্চ ভাবতেব প্রধান আখ ও তুলো উৎপাদনকাবী অঞ্চলগুলিতে উৎপাদন ব্যয সম্পর্কিত তথ্যানুসন্ধানেব ফলাফলগুলি নযটি মূল খণ্ড এবং নযটি পবিপূবক খণ্ডে প্রকাশ কবে। উপবে যে ত্রুটিব উল্লেখ আমবা কবেছি, তাদেব হিসাবও সেগুলি থেকে মুক্ত নয। তাদেব হিসাব আই টি বি, বিপোর্ট অন স্যুগাব (১৯৩৮)[৬৫] -কে সমর্থন কবে যতক্ষণ পর্যন্ত না পাবিবাবিক শ্রম বলদ-গরু ইত্যাদি গৃহস্থেব নিজস্ব উপাদানেব জন্য ব্যয কত হচ্ছে তা যোগ কবাব ব্যবস্থা করা হচ্ছে। গুড় তৈবিব খবচেব সঙ্গে তুলনা কবা আবশ্যিক হযে পড়ে কাবণ মাদ্রাজেব বিভিন্ন অঞ্চলেব জন্যে আখেব খবচ আলাদাভাবে দেওযা হয নি। ১৯৩৩-৪

থেকে ১৯৩৫-৬ এর মধ্যে বছরগুলিতে মাদ্রাজের কোয়েম্বাটুর, বেলারী এবং বিশাখাপত্তনম জেলাগুলিতে গুড় তৈরির মণ প্রতি খরচ ছিল গড়ে যথাক্রমে টা. ৪-১-৯, টা. ৩-৫-২ এবং টা. ৩-০-১। ১৯৩৪-৫ থেকে ১৯৩৬-৩৭ পর্যন্ত সময়ে বিহারেব পাটনা এবং সারণ জেলায় আখের গড় উৎপাদনব্যয় ছিল মণ প্রতি যথাক্রমে টা. ০-৩-৩ এবং ০-৪-৫। শেষোক্ত মণ-প্রতি খরচকে ১০ দিয়ে গুণ করলে (১০ মণ আখ থেকে ১ মণ গুড় তৈরি হয় এই অনুমানে) এবং ঐ সময়ে পাটনা জেলায় গুড় উৎপাদনে অন্যান্য খরচ যা হতো তা এর সঙ্গে যোগ করে আমরা যা পাই তা হলো বিহারের পাটনা ও সারণ জেলায় গুড় উৎপাদনেব মণ প্রতি গড় ব্যয়—যথাক্রমে টা ২-২-১ এবং টা. ২-১৪-৩। এর সঙ্গে পারিবারিক শ্রম ও অন্য উপাদানের খরচ হিসাব করে যুক্ত কবলে খবচ বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে টা. ৩-৩-২ এবং টা. ৩-১৪-১০।[৬৬]

সীমিত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি উৎপাদন ব্যয়ের হিসাবের যৌক্তিকতা সম্পর্কে যে সংশয় ব্যক্ত হয়েছে তার প্রভাব শিল্পপতিদের সিদ্ধান্তের উপর পড়েছে। অনেক শিল্পপতিই স্বীকার কবেছেন যে, ক্ষুদ্র চাষ ব্যবস্থায় একজন কৃষক ফসলের যে দামকে লাভজনক বলে স্বীকার করে নেবেন, তা একজন পুঁজিবাদী কৃষকের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না—কাবণ পুঁজিবাদী কৃষক জমির জন্য অর্থনৈতিক খাজনা ধার্য করবে, সমস্ত ধরনের শ্রমের জন্য বাজার দবে পূর্ণ মজুরি দাবি করবে এবং উৎপাদনের কাজ দেখাশোনার প্রত্যক্ষ মজুরি মোট ব্যয়েব অন্তর্ভুক্ত করবে।[৬৭]

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আখ উৎপাদনের খরচের যে হিসাব আমরা তৈরি করেছি, যদি ধবে নিই যে, সেগুলিতে পক্ষপাতিত্বের মাত্রা একই, তাহলে স্বভাবতই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, ঐ সময়ের পরিস্থিতিতে একটি চিনিকলের পক্ষে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা বিহার বা যুক্তপ্রদেশে অনেক কম খরচে আখ সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল।[৬৮] যদি আখ চাষের পরিস্থিতি অন্যরকম হতো, তাহলে আখ চাষের প্রচলিত বিন্যাস ও বণ্টন মিলগুলির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একইরকম লাভজনক থাকত না। যদি ফ্যাক্টরির নিজস্ব মালিকানায় বিরাট ভূখণ্ডে আখের চাষ হতো, তাহলে ফ্যাক্টরিগুলির ন্যূনতম ব্যয়সূচক অবস্থানটি হতো সম্ভবত ক্রান্তীয় অঞ্চলে। সাধারণ চাষীদের তুলনায় ফ্যাক্টরিগুলি চাষের কাজে এবং জমিতে সার দেওয়ার ব্যাপারে অনেক বেশি খরচ করতে সক্ষম হতো এবং মিলের কর্মচারীদেরই চাষআবাদ দেখাশুনার কাজে নিয়োগ করা যেত। বোম্বাই-এ ১৯৩২-এর পর চিনিকলগুলির উন্নতিতে বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়েছিল বোম্বাই সরকার যখন সরকারের পক্ষ থেকে মিলগুলিকে 'ডেকান ক্যানাল'-সেবিত এলাকার বিশাল ভূখণ্ড হস্তান্তর করা হয়েছিল।[৬৯] মহীশূর ও হায়দ্রাবাদেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল।[৭০] সাধারণভাবে বলতে গেলে, দেশীয় রাজ্য বা প্রাদেশিক সরকারগুলি থেকে যখন চিনিকল স্থাপনের জন্য কোনো বিশেষ ধরনের সাহায্য পাওয়া যেত না, তখন কেন্দ্রীয় চিনি ফ্যাক্টরিগুলি প্রতিষ্ঠা করা লাভজনক হতো সেই এলাকাগুলিতেই যেখানে ইতিমধ্যেই চাষের এলাকার একটা বড় অংশে আখ উৎপাদন হতো। যে এলাকায় আখ একটি প্রধান শস্য হিসাবে চাষ হতো, সেখানে একবার ফ্যাক্টরি স্থাপিত হয়ে গেলে কৃষকদের পক্ষে একটি বড় সুবিধা ছিল এই যে, তারা সরাসরি ফ্যাক্টরির কাছে বিক্রয় করতে পারত এবং এতে পরিবহণ ব্যয়ও কম পড়ত। সুতরাং, আমরা এখানে দুটি অনুপাতের মধ্যে একটি সহসম্পর্ক পাচ্ছি—অনুপাত

দুটি হলো যথাক্রমে, আখ চাষের অধীন এলাকা ও সংশ্লিষ্ট প্রদেশে মোট চাষের এলাকার অনুপাত এবং ফ্যাক্টরিব কাছে দেওয়া আখের পরিমাণ ও মোট পেষাই হওয়া আখের পরিমাণের অনুপাত।[৭১] সুতরাং ক্ষুদ্র চাষ ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে, যা ছিল ভারতে আখচাষের চালু ব্যবস্থা, চিনি ফ্যাক্টরির অবস্থানগত বণ্টন পুঁজিপতিদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যথার্থই ছিল।[৭২]

এই সিদ্ধান্ত আরও জোরদার হয় যখন আমরা দেখি যে, আখ থেকে চিনি তৈরির খরচ সাধারণভাবে ক্রান্তীয় অঞ্চল অপেক্ষা উপক্রান্তীয় অঞ্চলে কম ছিল। প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি নিচে দেওয়া হলো :

অঞ্চল	মণ প্রতি উৎপাদন খরচ (টাকায়)
পশ্চিম যুক্তপ্রদেশ	১-০-৭
মধ্য যুক্তপ্রদেশ	১-৩-৮
পূর্ব যুক্তপ্রদেশ	১-২-৬
উত্তর বিহার	১-৪-২
দক্ষিণ বিহার	১-৭-৬
বোম্বাই	১-১০-৭
মাদ্রাজ	২-৩-৮
মহীশূর	১-৩-১০

সূত্র : ITB : *Report on Sugar* (দিল্লী, ১৯৩৮), পৃ. ৬৭।

অবশ্য যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের অভ্যন্তরে ফ্যাক্টরিগুলির অবস্থান ছিল অত্যন্ত অপরিকল্পিত এবং ফ্যাক্টরির কাম্য ও প্রকৃত অবস্থানের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য ছিল। এমন কিছু অঞ্চল ছিল যেখানে চিনিকলগুলির উৎপাদন-ক্ষমতার অনুপাতে আখের উৎপাদন হতো অনেক বেশি। অন্যদিকে কিছু অঞ্চল ছিল যেখানে ফ্যাক্টরিগুলির জন্য প্রয়োজনীয় আখের তুলনায় উৎপাদন ছিল বেশ কম। ফ্যাক্টরিগুলির অবস্থান সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা করলে পরিবহণ ব্যয় যেমন কমানো সম্ভব হতো, তেমনই চাষীর আয়ও বাড়ানো যেত। কিন্তু অন্তত ১৯৩৭ সাল অবধি যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে সাধারণভাবে ফ্যাক্টরিগুলির সংখ্যা তেমনভাবে বাড়ে নি।[৭৩]

এখন আমরা ফ্যাক্টরির অর্থনৈতিক আয়তনের প্রশ্নটির সম্মুখীন হতে পারি। এটা সত্য যে, বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে যেমন, ফ্যাক্টরির নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে বিরাট এক আখচাষের ভূখণ্ড আছে এবং ফ্যাক্টরির কাছাকাছি তার সমস্ত উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় করার মতো একটি বাজার আছে—সেক্ষেত্রে একটি বড় ফ্যাক্টরির তুলনায় ৩০০ টন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ছোট আয়তনের ফ্যাক্টরিও অনেক লাভজনক হতে পারে, কারণ আখের সীমিত যোগানের জন্য বড় ফ্যাক্টরিটির উৎপাদন-ক্ষমতার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়ত সম্ভব হয় না কিংবা দূর অঞ্চল থেকে তাকে হয়ত আখ আমদানি করতে হয় বা দূরের বাজারে তার উৎপন্ন চিনি বিক্রির জন্য নিয়ে যেতে হয়। তবে ১৯৩৭-এ এটা সাধারণভাবে স্বীকার করা হতো যে, স্থির ব্যয়ের আয়তনগত অর্থনৈতিক সুবিধার ফলে বড় আয়তনের ফ্যাক্টরিগুলির দক্ষতা ছোটগুলির তুলনায় অনেক বেশি ছিল। অনেকে অবশ্য মনে করতেন যে, চিনির দাম এতই

কম ছিল যে বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনো মিলই দক্ষতার শীর্ষবিন্দুতে পৌছতে পারত না।[৭৪] বিহারের কৃষি অধিকর্তার অভিমত ছিল যে, ফ্যাক্টরির অর্থনৈতিক আয়তন এমনভাবে নিরূপণ করতে হবে যে স্বাভাবিক বৎসরে এতে নিয়োজিত মূলধনের উপর যেন শতকরা দশ ভাগ মুনাফা আসে। তাঁর মতে, যে ফ্যাক্টরির আখ পেষাই ক্ষমতা দৈনিক ৬৫০ থেকে ৮০০ টনের মতো, সে ফ্যাক্টরি অর্থনৈতিক আয়তনের উপরোক্ত শর্তপূরণ করতে পারবে।[৭৫] কিন্তু তিনি বা অন্য কেউ অর্থনৈতিক আয়তনের মাপকাঠি হিসাবে কেন একটি বিশেষ মাত্রার উৎপাদনক্ষমতাকে বেছে নেওয়া হলো তার পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করেন নি।

ফ্যাক্টরিগুলিতে নিয়োজিত মূলধনের উপর কী হারে প্রতিদান হতো তা নির্ণয় করার চেষ্টা করা যেতে পারে এবং দেখা যেতে পারে যে, ফ্যাক্টরির আয়তনের সঙ্গে তার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটত কী না। ১৯৩৬-৭ থেকে ১৯৪১-২ এই বছরগুলির জন্যে *ইণ্ডিয়ান ইনভেস্টরস্ ইয়ারবুক* প্রকাশিত তালিকা থেকে ২৯ টি চিনিমিলের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, লভ্যাংশ ঘোষণা করার ব্যাপারে মিলগুলির মধ্যে, এমনকি একই গোষ্ঠী পরিচালিত মিলগুলির নিজেদের মধ্যেও বিস্তর পার্থক্য থেকে গেছে। বেগ, সাদারল্যান্ড এন্ড্ কোম্পানি সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মিল পরিচালনা করত যেমন,—বলরামপুর, কানপুর, চম্পারণ, পুর্ত্তবপুর, রায়ম এবং সমস্তিপুর—এর মিলগুলি। এর মধ্যে কেবলমাত্র বলরামপুর মিলের রেজিস্ট্রি হয়েছিল ১৯৩০ এর পর (১৯৩২-এ)। এই কোম্পানিটির লভ্যাংশের হার ১৯৩৪ থেকে ১৯৪০-এর মধ্যে ছিল ৫.১৮ শতাংশ। অন্য পাঁচটি মিলের ক্ষেত্রে ১৯৩১ থেকে ১৯৪০ এই এক দশকে লভ্যাংশের গড় হার ছিল এইরকম (বাৎসরিক শতকরা হারে) : কানপুর, ১৬.৫৫ ; চম্পারণ, ১১ ; পুর্ত্তবপুর, ৩.৫ ; রায়ম, ১২ ; সমস্তিপুর, ২.৭৫। অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যে নারং ব্রাদার্স-এর সাথে যুক্ত বা পরিচালিত কোম্পানিগুলিতে সবচেয়ে বেশি লভ্যাংশ ঘোষিত হয়েছিল। যেমন, দুটি কোম্পানি, বাস্তি সুগার এবং পাঞ্জাব সুগার—যাদের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৩০ এর আগেই—১৯৩১-৪০ এই দশকে গড়ে বার্ষিক লভ্যাংশ ঘোষণা করেছিল যথাক্রমে ১৭.৯ ও ২২.১ শতাংশ হারে। কিন্তু ১৯৩২-এ রেজিস্ট্রিকৃত কোম্পানি, নবাবগঞ্জ স্যুগার ১৯৩৫-থেকে ১৯৪০ এই সময়ের জন্য গড়ে বাৎসরিক লভ্যাংশ দিয়েছিল ৮$\frac{১}{৬}$ শতাংশ হারে। প্যারী এন্ড কোম্পানি-র পরিচালনাধীন দুটি কোম্পানি—ই. আই. ডি এবং ডেকান স্যুগার এন্ড আবকারি গড়ে লভ্যাংশ দিয়েছিল যথাক্রমে ৯.২৫ ও ১৭.৫ শতাংশ হারে। অন্যান্য কোম্পানির মধ্যে, সাউথ বিহার (এন. কে. জৈন এন্ড কোম্পানির পরিচালনাধীন), মাইসোর সুগার, বেলাপুর (ডব্লিউ. এইচ. ব্র্যাডি এন্ড কোম্পানি-র পরিচালনাধীন), এবং রাজা এবং বুলন্দ্ (দুটোই গোভান ব্রাদার্স-র দ্বারা পরিচালিত)—ইত্যাদি কোম্পানিগুলি খুবই লাভজনক ছিল। সাধারণভাবে দেখা যাচ্ছে যে মিলগুলি ১৯৩১ বা ১৯৩২ এর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং যেগুলি ন্যূনতম অর্থনৈতিক আয়তনের ছিল সেগুলি প্রথম কয় বৎসরে খুব বেশি হারে মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। লভ্যাংশের হার থেকে যতটা প্রতীয়মান হয়, মুনাফার হার তার থেকেও বেশি ছিল, কারণ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে যা বিনিয়োগ হতো তার অনেকটাই আসত কোম্পানিগুলির আভ্যন্তরীণ তহবিল থেকে। ১৯৩৩ বা ১৯৩৪-এর পর যে সব কোম্পানি চালু হয়েছে সেগুলি সাধারণভাবে খুব বেশি লাভজনক ছিল না। এমনকী বেশ নামী ম্যানেজিং এজেন্ট, যথা, জেমস্ ফিনলে (বেলসান্ড) বা অ্যানড্রু

ইউল (নিউ সাভান) দ্বারা পরিচালিত কোম্পানিগুলিও ব্যবসায়িক সাফল্য দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে।

অবশ্য কতকগুলি সফল কোম্পানি যেমন, দ্বারভাঙ্গা সুগার কোম্পানি এবং সারায়া সুগার ফ্যাক্টবি ছিল একক মালিকানাধীন অথবা অংশীদারী কোম্পানি এবং বাকি অন্যান্য কোম্পানিগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। আমি বরং ১৯৩৭-এ ইন্ডিয়ান সুগার মিলস্ এসোসিয়েশন্ ফ্যাক্টরির যে বিস্তৃত তালিকা দিয়েছে তা থেকে দেখার চেষ্টা করেছি কীভাবে ফ্যাক্টরিব আয়তনগত বণ্টন প্রকৃতপক্ষে পরিবর্তিত হয়েছে।

সারণি ১২.৫ চিনি ফ্যাক্টরির আয়তনগত বন্টনে পরিবর্তন

আখ পেষাই ক্ষমতা অনুসারে চিনিকলগুলির শ্রেণীবিন্যাস (দৈনিক টনের হিসাবে)	প্রাথমিক বণ্টন (অর্থাৎ ফ্যাক্টরিটির প্রতিষ্ঠা হয়)	১৯৩৭-এর এপ্রিলে বণ্টন-এর অবস্থা
০-১০০	১১	১০
১০১-২০০	১৪	৮
২০১-৩০০	১৪	১১
৩০১-৪০০	৩৩	১০
৪০১-৫০০	১৮	১৩
৫০১-৬০০	৬	১৮
৬০১-৭০০	৮	৬
৭০১-৮০০	৩	১৮
৮০১-১০০০	৪	২২
১০০১-১৫০০	৩	৭
১৫০১-২০০০	—	৬
২০০০ এব উপর	—	১
মোট	১১৪	১৩০

সূত্র : ITB : *Evidence (Report on Sugar),* ১৯৩৮ ১ম খণ্ড, পৃ. ২-৮

১২.৫ নং সারণি থেকে এটা স্পষ্ট যে, সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে বৃহদায়তন ফ্যাক্টরির আনুপাতিক সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৭৬] পুরনো এবং নতুন বণ্টনের মধ্যে যে বৈষম্য ছিল তা সারণি থেকে খুব স্পষ্ট নয়, কারণ ফ্যাক্টরির পুরনো বণ্টনে প্রাচীনতম থেকে সদ্যোজাত— সব বয়সের ফ্যাক্টরিকেই ধরা হয়েছে এবং অনেকগুলি তথাকথিত পুরনো ফ্যাক্টরির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল মাত্র কিছু সময় আগে। অনেক ফ্যাক্টরি ৪০০ টন বা তার বেশি উৎপাদনক্ষমতা বাড়িয়ে নিয়ে করেছিল ৬০০ টন বা তারও বেশি। তার চেয়েও বড় কথা, সাধারণভাবে বড় আকারের ফ্যাক্টরিগুলিই তাদের উৎপাদনক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে পেরেছিল। উৎপাদনক্ষমতায় নিম্নতম স্তরে যে সব ফ্যাক্টরি ছিল তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকটি তার থেকে উঠে আসতে সক্ষম হয়েছিল। আয়তনগত অর্থনৈতিক অসুবিধা ছাড়াও এর পিছনে আরও একটি কারণ সম্ভবত ছিল—

তা হলো : ছোট আয়তনের ফ্যাক্টরিগুলি সাধারণভাবে বিহার ও যুক্তপ্রদেশের প্রধান চিনি-বলয়ের বাইরে অবস্থিত ছিল। আমরা যদি যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি তাহলে দেখব যে, মাঝারি আয়তনের ফ্যাক্টরিগুলির বৃহদায়তন হওয়ার বেশ উল্লেখযোগ্য প্রবণতা ছিল।

ফ্যাক্টরিগুলির সম্প্রসারণ ও বৃদ্ধির পেছনে দুটি প্রভাব কাজ করেছিল। প্রথমত, শুল্ক সংরক্ষণ পাওয়ার দু' তিন বছরের মধ্যে যে সমস্ত ফ্যাক্টরি ভালো লাভ করেছিল, সেগুলির কাছে সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় মূলধন সহজলভ্য ছিল। দ্বিতীয়ত, ১৯৩৬-৩৭-এ যখন চিনিব দাম পড়তে শুরু করেছিল তখন একমাত্র উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়িযে বা স্থায়ী কাঠামো তৈরি করেই ফ্যাক্টরিগুলি ক্ষতির পরিমাণ কমাতে পারত। যতক্ষণ পর্যন্ত শুল্ক সংবক্ষণ নতুন ফার্মের যোগদানকে উৎসাহিত করত বা বৃহদায়তন ফ্যাক্টরি তৈরিতে সাহায্য করত, ততক্ষণ পর্যন্ত বলা যায় যে, নিম্নহারে শুল্কেব পরিবর্তে উচ্চহারে শুল্ক সংরক্ষণ চিনির উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে আনার ব্যাপারে অনেক বেশি কার্যকরী পদক্ষেপ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

ফ্যাক্টরিগুলিব অবস্থান ও আয়তন মূলত নির্ণীত হতো আখের যোগান এবং কত তাড়াতাড়ি আখের মোট ও একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় তার উপর। সাধারণভাবে, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও বোম্বাই বাদে অন্যান্য প্রদেশে ক্ষুদ্র আয়তনের ফ্যাক্টরির অনুপাত ছিল বেশি। যদিও মাদ্রাজের মতো একটি ক্রান্তীয় প্রদেশে ঠিকমতো সেচের ব্যবস্থা করলে একরপিছু আখেব উৎপাদন ছিল বেশি, উৎপাদন খরচও এখানে বেশি ছিল এবং তাছাড়া এ অঞ্চলে অনেকগুলি বিকল্প বাণিজ্যিক ফসল হতো। তাছাড়া একরপিছু উৎপাদন এমনিতেই বেশি থাকাব জন্য তা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে নি। ফলে কৃষি ও শিল্প দপ্তরের কারবার আবেদন-নিবেদন কবা সত্ত্বেও আখের চাষ প্রসারলাভ করেনি এবং ছোট ফ্যাক্টরিগুলি ছোটই থেকে গেল।

প্রশাসক, এমনকী মিল মালিকদের পক্ষ থেকে ফ্যাক্টরির বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করার দাবি উঠেছিল। কিন্তু এটা খুব স্পষ্ট নয় যে, ক্ষুদ্র চাষব্যবস্থার মধ্যে অথবা চাষীদের অবাধে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে ফ্যাক্টরির অবস্থানে কোনো পরিবর্তন আনা সম্ভব ছিল কি না।[৭৭] ফ্যাক্টরি স্থাপনের ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ চালু করলে মিলমালিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা সঙ্কুচিত হতো কিন্তু তাতে চাষীদের অবস্থার উন্নতি বা চিনিশিল্পের দক্ষতার বৃদ্ধি ঘটত না।

১৯৩৮ সালে ভারতীয় রাজস্ব পর্ষদ অভিমত প্রকাশ করেছে যে, পক্ষপাতমূলক সংরক্ষণের নীতি চিনি শিল্পে আশাতীতভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সফল হয়েছে যার ফলে চিনির আমদানি প্রায় একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ১৯৩৬-৩৭-এ সাদা চিনির উৎপাদনের হিসাব করা হয়েছিল ১,২৫৪,০০০ টন—যা অনুমিত মোট ভোগের পরিমাণের চেয়ে ৫৩০০০ টন বেশি। অবশ্য এই বছরটিকে ব্যতিক্রমী বছর বলেই গণ্য করা হয় কারণ এবছর খুব ভালো ফসল হয়েছিল ; তাছাড়া বৈদেশিক প্রতিযোগিতা ধীরে ধীরে লোপ পাওয়ার ফলে গুড় ও চিনি উৎপাদনের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছিল।[৭৮] রাজস্ব পর্ষদের অনুসন্ধানের ফলে এও দেখা গেল যে, ভারতীয় চিনি ফ্যাক্টরিগুলির পরিচালনগত দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে ; এর পেছনে প্রধানত আয়তনগত ব্যয় সংক্ষেপের সুবিধা কাজ করেছে। আয়তনগত ব্যয়সংক্ষেপের ফলে একটি মিলের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরনের

কাজকর্মের মধ্যে উন্নততর ভারসাম্য এসেছে এবং উৎপাদনের স্থায়ী কাঠামোগত ব্যয় ইউনিট পিছু কমে গিয়েছে। পরিচালনগত দক্ষতার উন্নতি আরও একটি কারণে ঘটেছিল—তা হলো : উত্তর ভারতে 'বাগাসি'-র ব্যাপক ব্যবহারের ফলে ফ্যাক্টরির জ্বালানি বাবদ ব্যয়সংক্ষেপ। শেষত, উন্নত জাতের আখ উৎপাদন চালু এবং একরপিছু আখের উৎপাদনশীলতা বেড়ে যাওয়ার ফলে আখেব উৎপাদন ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছিল। ফ্যাক্টরির কাছে আখ জমা দিলে যে দাম পাওযা যেত তা হল মণ প্রতি ৫ আনা ৬ পাই—যদিও ১৯৩১ সালে রাজস্ব পর্ষদ যখন এ বিষয়ে অনুসন্ধান চালায় তখন আখের জন্যে দাম পাওয়া যেত মণ প্রতি ৮ আনা।

১৯৩৮-এ রাজস্ব পর্ষদ পরবর্তী আট বছরের জন্য ভারতে উৎপন্ন চিনির উপর হন্দর পিছু ৭ টাকা ৪ আনা হারে রক্ষণমূলক শুল্ক বসানোর সুপারিশ করে। ভারত সরকার অবশ্য এত দীর্ঘ সময় ধরে নির্দিষ্ট হারে শুল্ক বসানোর পক্ষপাতী ছিল না এবং জাভা চিনির সম্ভাব্য দাম হিসাব করে ও দু ধরনের চিনির গুণগত মানের পার্থক্যের কথা চিন্তা করে রক্ষণমূলক শুল্কের হার ধার্য করেন হন্দর পিছু ৬ টাকা ১২ আনা। তাছাড়া এই শুল্কের হার কার্যকরী করা হয় অল্প সময়ের জন্যে—১৯৩৯-এর ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৪১-এব ৩১শে মার্চ পর্যন্ত[১৯] (শুল্কের পুরনো হার কার্যকরী ছিল ১৯৩৮-৩৯ এব আর্থিক বছরে)।

অনুবাদক : জয়ন্ত আচার্য

উৎস ও টীকা

১। Noel Deerr : *The History of Sugar,* প্রথম খণ্ড (লন্ডন, ১৯৪৯), পঞ্চম পরিচ্ছেদ ; Sir James Mac Kenna, 'The Indian Sugar Industry', *JRSA,* ৭৭, সংখ্যা ৩৯৭০, ২১ ডিসেম্বর, ১৯২৮, পৃ. ১৪২-৪ ; Hilton Brown. *Parry's of Madras,* পৃ. ৮২-৮৩ : এবং B.C. Burt, 'The Indian Sugar Industry', *JRSA,* ৮৩, সংখ্যা ৪৩১৮, ১৬ অগাস্ট ১৯৩৫, পৃ. ৯২১। ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত এবং Burt উল্লেখিত House of Commons-এর চিনি ও কফি উৎপাদন সম্পর্কিত সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট অনুসারে ১৮৩৯ থেকে ১৮৪৭-এর মধ্যে ইংল্যান্ডের চিনির মোট প্রয়োজনের এক চতুর্থাংশ যোগাত ভারত। ঐ সময়ে ভারত থেকে চিনি রপ্তানির বাৎসরিক গড় পরিমাণ ছিল ৫৯,৩৭৩ টন।

২। ভারত সরকার, CISD : *Review of the trade of India,* ১৯০১-২, (কলকাতা, ১৯০২), পৃ. ৫। ১৮৯৭-এ আমেরিকার বাজার বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণেই বিদেশ থেকে বীট-চিনির যোগান বৃদ্ধি পেয়েছিল। Mac Kenna লিখিত 'The Indian Sugar Industry', পৃ. ১৪৪ দ্রষ্টব্য।

৩। Mac Kenna (*ঐ,* পৃ. ১৪৭) পরিমাপ করে দেখেছিলেন যে, ভারতে ৩৫০ মিলিয়ন টাকার মূল্যের গুড় প্রস্তুত হলে, একই পরিমাণ আখের উৎপাদনের ভিত্তিতে উন্নততর পদ্ধতির প্রয়োগ চিনির উৎপাদনের মূল্য দাঁড়াবে ৬৯৮ মিলিয়ন

টাকার মতো। অর্থাৎ ঐ সময়ে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় শতকরা ১০০ ভাগের মতো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে আরও প্রাচীন পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে ক্ষতির পরিমাণ ছিল আরও বেশি।

৪। এটা খুবই উল্লেখযোগ্য যে, ১৮৪৬ সালেই Disraeli ভারতে ক্ষুদ্র কৃষককেন্দ্রিক চিনি উৎপাদনের ব্যবস্থার ধরনটি লক্ষ্য করেছিলেন এবং অনুন্নত উৎপাদন পদ্ধতির ব্যবহার সত্ত্বেও উৎপাদনের উপর কৃষকেব নিয়ন্ত্রণ থাকার সুবাদে বাড়তি আয উপার্জন করার ক্ষেত্রে কৃষকের যে সুবিধা ছিল তাও তাঁর নজরে এসেছিল। Deerr, *The History of Sugar*, প্রথম খণ্ড (পৃ. ৫৭) উল্লেখিত *Hausard,* ১৮৪৬, Lxxxiii, পৃ. *১৫১,* দ্রষ্টব্য। ভারত থেকে ব্রিটেনে আমদানিকৃত চিনির উপর পক্ষপাতিত্বমূলক শুল্ক আরোপের ব্যাপারে Disraeli ছিলেন একজন মুখ্য প্রবক্তা।

৫। আগ্রা ও অযোধ্যার যুক্তপ্রদেশের District Gazetteers উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য, খণ্ড ১৩, *Barielly* (এলাহাবাদ, ১৯১১), পৃ. ৪০ ; District Gazetter's of Agra and Oudh, খণ্ড ১৮, *Shahjahanpur* (এলাহাবাদ ১৯১০), পৃ. ৫৪-৫৫।

৬। Mac Kenna লিখিত প্রবন্ধ : 'The Indian Sugar Industry', *JRSA*, ৭৭, সংখ্যা ৩৯৭০, ২১ ডিসেম্বর, ১৯২৮, পৃ. ১৫৭-এর উপর W. H. Moreland-এর note দ্রষ্টব্য।

৭। হাদি পদ্ধতির বর্ণনা পেতে হলে দ্রষ্টব্য Ghosh, *The Advancement of Industry,* পৃ. ১০১-৫। হাদির বক্তব্য অনুসারে, Ghosh যার উল্লেখ করেছেন, সম্পূর্ণ যন্ত্রপাতির খরচ ৫০০০ টাকার বেশি হবে না। অবশ্য এই কারখানা চালাতে গেলে উদ্যোগী ছোট পুঁজিপতিদের অথবা জমিদারদের যদি নিজস্ব চাষের অধীন অনেক জমি থাকে তো আলাদা কথা, নতুবা কৃষকদের যেভাবেই হোক, এমন কী প্রয়োজনে ঋণ দিয়েও প্রভাবিত করতে হতো যাতে তারা তাদের উৎপন্ন আখ বা আখের রস এই কারখানায় নিয়ে আসে। যুক্তপ্রদেশে চিনি উৎপাদনের জন্যে সাধারণভাবে যে ধরনের পদ্ধতির ব্যবহার হতো, সেগুলির বিবরণ পেতে হলে দ্রষ্টব্য, Chatterjee [IPG প্রকাশনা], *Notes,* পৃ. ৯১-৯৫। দেশীয় পদ্ধতিতে উৎপাদনের ফলে যে-সব কারণে ক্ষয়ক্ষতি হতো, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হিসাবে Chatterjee উল্লেখ করেছেন যে, লোহার কলগুলি প্রায়শই জীর্ণ হয়ে যেত, খুব তাড়াতাড়ি খারাপও হয়ে পড়ত এবং সেগুলি দ্রুত সারানোর কোনো উপায়ও ছিল না। পাঞ্জাবে যে ধরনের পদ্ধতির ব্যবহার চালু ছিল সেগুলির বিবরণ পেতে হলে দ্রষ্টব্য : Latifi [IPG প্রকাশনা], *The Industrial Punjab : A Survey of Facts, Conditions: and Possibilities* (বোম্বাই ও কলকাতা, ১৯১১), পরিচ্ছেদ ১৩। Latifi অবশ্য Ghosh অথবা Chatterjee-র মতো হাদি পদ্ধতি বিষয়ে ততখানি উৎসাহী নন।

৮। Mac Kenna-র 'The Indian Sugar Industry'-র উপর Moreland-এর note দ্রষ্টব্য।

৯। Hilton Brown, *Parry's of Madras,* পৃ. ৮৩-৮৬, ১৩৮-৪৮, ১৫৯-৭১। Playne and Wright, *Southern India,* পৃ. ১৬৬-৮।

১০। Bengal District Gazetteers, *Champaran* (কলকাতা, ১৯০৭), পৃ. ৭২ এবং ১০২। উনিশ শতকের মাঝামাঝি যখন ভারতীয় চিনি শিল্পে স্বল্পস্থায়ী উন্নতির জোয়ার এসেছিল, তখন নীলচাষের কিছু কোম্পানি আখচাষের দিকে ঝুঁকেছিল। অবশ্য উন্নতির সংক্ষিপ্ত পর্ব শেষ হওয়ার সাথে সাথে তারা পুনরায় নীলচাষে ফিরে এসেছিল। দ্রষ্টব্য : D. J. Reid, *Indigo in Behar,* Playne and Wright রচিত *Bengal and Assam, Behar and Orissa*-গ্রন্থে সংকলিত। পৃ. ২৫৫।

১১। ১৮৮৫ সালের Bengal Tenancy Act-এর ধারাবলে ইয়োরোপীয়রাও দখলীসত্ত্ব প্রজায় পরিণত হতে পারত এবং এই ধারার প্রয়োগ ঘটিয়ে তাদের অনেকেই দীর্ঘ মেয়াদে, কখনও বা প্রায় অফেরতযোগ্য শর্তে জমি লীজ নিত। ভারতীয় জমিদারদের পথ অনুসরণ করে, ইয়োবোপীয়দের মধ্যে অন্য জমিদারদের কাছ থেকে জমি লীজ নিয়ে জমিদার হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত আমরা পাই। যথা, নরাইপুর এস্টেটের জমিদার-এর ক্ষেত্রে এরকম ঘটেছিল। Playne and Wright, *Bengal and Assam, Behar and Orissa,* পৃ. ৩২৯ দ্রষ্টব্য। ১৮৯৭-এর সংকটের সময় অনেক নীলচাষের কোম্পানি ভীষণভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল—জার্মানির রাসায়নিক রঙ বিক্রি শুরু হওয়ার ফলে ঐ সংকট শুরু হয়েছিল। অংশত এই কারণেও অনেক নীলচাষের কোম্পানির পক্ষে চিনি শিল্পে বৃহৎ উদ্যোক্তা হয়ে ওঠা সম্ভব হয় নি। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : Reid, 'Indigo in Bihar'

১২। এই তথ্য আহরণ করা হয়েছে Disctrict Gazetteers of the United Provinces of Agra and Oudh, খণ্ড ১৯, *Cawnpore* (এলাহাবাদ, ১৯০৯) থেকে, পৃ. ৮১-৮৩ তাছাড়াও দ্রষ্টব্য : *IIYB, 1911,* পৃ. ৩০১-৩০২ ; ৩০৪ ; ITB, *Evidence* (*Report on Sugar*) (কলকাতা, ১৯৩২), প্রথম খণ্ড, পৃ. ৯৩-১০৫।

১৩। District Gazetteers of the United Provinces of Agra and Oudh, খণ্ড ১৭ *Shahjahanpur,* (এলাহাবাদ, ১৯১০), পৃ. ৫৬-৭।

১৪। Evidence (*Report of IIC*), প্রথম খণ্ড (PP 1919, XVII) পৃ. ৩৮৫-এ দ্বারভাঙ্গা সুগার কোম্পানি লিমিটিড-এর ম্যানেজার J. Henry-র প্রদত্ত সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য।

১৫। Noel-Paton প্রদত্ত তথ্য অনুসারে বিহার প্রদেশে চিনি কলের সংখ্যা ছিল নয়টি এবং যুক্তপ্রদেশে চারটি। দ্রষ্টব্য Noel-Paton (ভারত সরকার প্রকাশনা) : *Notes on Sugar in India,* পৃ. ৫২-৫৯।

১৬। *Evidence* (*Report of IIC*), খণ্ড ১ (PP 1919, XVII), পৃ. ৩৮২-৯৬ এ J. Henry, G. R. Mac Donald এবং H. C. Finzall-এর সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য।

১৭। বিহারে (ভাগলপুর) গুড়ের দাম যুক্তপ্রদেশের (মীবাট) তুলনায় সাধারণভাবে কম যে ছিল তার প্রমাণ পেতে হলে দ্রষ্টব্য : ITB, *Report on Sugar* (দিল্লী, ১৯৩৮) পৃ. ৫১-৫৩।

১৮। *Evidence* (*Report of IIC*), খণ্ড ২ (PP 1919 ; XVIII), পৃ ৬৮৪-৭০৪ এ J. Mac Glashan এর সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য।

১৯। *ঐ* দ্রষ্টব্য। Mac Glashan-এর সাক্ষ্য, পৃ. ৬৯১।

২০। ভারতীয় শিল্পের উন্নতির উপর যুদ্ধের প্রভাব সম্পর্কে জানতে হলে দ্রষ্টব্য : S. G. Panandikar, *Some Aspects of the Economic Consequences of the War for India* (বোম্বাই, ১৯২১), তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

২১। Mac Kenna, 'The Indian Sugar Industry', পৃ. ১৪৮।

২২। RC on Agriculture in India, Vol X, *Evidence taken in England* (কলকাতা, ১৯২৭) পৃ. ৭৫২-এ Dr. C.A. Barber প্রদত্ত সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য।

২৩। *Report of the Indian Sugar Committee 1920* (সিমলা, ১৯২১), অধ্যায় ১৯ দ্রষ্টব্য।

২৪। ফরমোজা এবং জাভার মডেল ভারতের পক্ষে অনুসরণের যোগ্য বলে বার বার তুলে ধরা হতো : দৃষ্টান্ত হিসাবে, উল্লেখ করা যেতে পারে, *Report of the Indian Sugar Committee 1920* (সিমলা, ১৯২১), অধ্যায় ২ এবং Neol-Paton (ভাবত সরকার প্রকাশনা), *Notes on Sugar in India*। অবশ্য এটা খুব স্পষ্ট নয় যে এই সব দেশের মডেল অনুসরণ করতে হলে কৃষকের জমির উপব নিয়ন্ত্রণ যে কঠোবভাবে খর্ব করার প্রয়োজন হতো, তার ফলে কৃষকদের অবস্থাব কোনো উন্নতি হবে কিনা। অন্ততপক্ষে, প্রাথমিকভাবে তার অবস্থার অবনতিও ঘটতে পারত। দ্রষ্টব্য : G. F. Keatinge, *Agricultural Progress in Western India* (লন্ডন, ১৯২১) পৃ. ৩৫-৩৬।

২৫। *Report of the Indian Sugar Committee, 1920* (সিমলা, ১৯২১), পৃ. ৪০৮-৬২। এই সময়কালে সরকারের অর্থনৈতিক নীতি সম্বন্ধে ভারতীয় পুঁজিপতিদের দৃষ্টিভঙ্গি কী রকম ছিল সে বিষয়ে Padshah-র note হচ্ছে সবচেয়ে সঠিক ও সুচিন্তিত অভিমত। অবশ্য এঁদের সুপারিশকৃত নীতি ভারত সরকারের পক্ষে অনুসরণ করা সম্ভব ছিল না কারণ তার ফলে জনসংখ্যার এক বিশাল অংশের সাথে বিরোধ বেধে যেত।

২৬। Dey, *The Indian Tariff Problem,* অধ্যায় ৮।

২৭। *Report of the Indian Sugar Committee 1920* (সিমলা, ১৯২১), পৃ. ৭১-৭২।

২৮। RC on Agriculture in India, *Report* (কলকাতা, ১৯২৮), পৃ. ৯৫।

২৯। RC on Agriculture in India-তে (Vol. X, *Evidence taken in England,* কলকাতা : ১৯২৭, পৃ. ৭৫৪) Dr. C. A. Baorber-এর মতামত এ প্রসঙ্গে তুলনীয় : "......... যে ধরনের আখের চাষ এখন হচ্ছে, তার তুলনায়

নতুন জাতের আখ নিশ্চয়ই অনেক ভাল এবং এর চাষ করতে হলে কৃষকদের চিরাচরিত চাষের পদ্ধতির খুব সামান্যই পরিবর্তন প্রয়োজন হয়।" (Burt-এর মত অনুসারে, যদিও S.48 নামে এক উন্নত প্রজাতির আখ শাজাহানপুরে উৎপাদিত হয়েছিল এবং যুক্তপ্রদেশে সেটি চাষের উপযুক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছিল, তবুও ১৯২৭ সালে কোয়েম্বাটুরে Co. 290 নামে নতুন এক জাতের আখ উৎপাদন হওয়ার আগে পর্যন্ত S.48 জাতের চেয়ে উন্নততব আখের চাষ শুরু হওয়া সম্ভবপর ছিল না)। দ্রষ্টব্য : Burt, 'The Indian Sugar Industry', পৃ. ৯২৬ (১৯৩৭ সালে ITB'র কাছে পেশ করা সাক্ষ্যে যুক্তপ্রদেশের কৃষি অধিকর্তা তথ্য ও পরিসংখ্যান সহযোগে দেখিয়েছেন যে, সে-সব জেলায় নলকূপ থেকে সেচের সুবিধা ছিল (যেমন, মোরাদাবাদ) অথবা সারদা ক্যানাল থেকে সেচের জল পেত (যেমন, হরদই) অথবা যেখানে চিনি-কল ছিল (যথা, গোরক্ষপুর), যে-সব জেলায় ১৯২৯-৩০ থেকে ১৯৩৫-৩৬-এর মধ্যে আখ চাষের এলাকা বেড়েছিল শতকরা ৭৫ ভাগ থেকে ১৩০ ভাগ পর্যন্ত। অন্যদিকে, বেনারসের মতো জেলায় যেখানে না ছিল সেচের সুবিধা, না ছিল চিনিকলের অস্তিত্ব আখ চাষের এলাকা বেড়েছিল অতি সামান্য।) দ্রষ্টব্য : ITB, *Evidence (Report on Sugar)* (দিল্লী, ১৯৩৮-৩৯), খণ্ড ৩ ক, *Replies received from the Local Government and Indian States*, পৃ. ১৮০।

৩০। তাঁর নিজস্ব প্রবন্ধ 'The Indian Sugar Industry'-র উপর আলোচনার প্রসঙ্গে Mac Kenna-র প্রত্যুত্তর, *JRSA*, ৭৭, সংখ্যা ৩৯৭০ (ডিসেম্বর ২১, ১৯২৮), পৃ. ১৫৬।

৩১। দ্রষ্টব্য : Mac Kenna-র বক্তব্য বিষয়ে Barber-এর মতামত, *ঐ*, পৃ. ১৫৩।

৩২। কানপুরে চিনির দাম ১৯২০-র অগাস্টে ছিল মণপ্রতি ৩৮ টাকা। ১৯২৬-এর মার্চে তা নেমে এসেছিল মণ প্রতি ১২ টাকা ৬ আনায়। দ্রষ্টব্য : পুসার সুগার ব্যুরোর সম্পাদক, Wynne Sayer-এর RC on Agriculture in India-র কাছে প্রদত্ত সাক্ষ্য। খণ্ড ১, অংশ ২, *Evidence of Officers Serving under the Government of India* (কলকাতা, ১৯২৭), প ১৭৬।

৩৩। দ্রষ্টব্য : ITB, *Evidence (Report on sugar)* (কলকাতা, ১৯৩২), খণ্ড ১, পৃ. ১-২ এবং ১৮-৬০।

৩৪। দ্রষ্টব্য : Dey, *The Indian Tariff Problem*, অধ্যায় ৮।

৩৫। দ্রষ্টব্য : Burt, 'The Indian Sugar Industry', পৃ. ৯৩৪।

৩৬। বিভিন্ন প্রদেশের উপর প্রভাবের জন্যে দেখুন ঐ বইয়ের অধ্যায় ৪।

৩৭। ITB, *Evidence (Report on Sugar)* (দিল্লী, ১৯৩৮-৩৯), খণ্ড ৩ খ, পৃ. ৩৭৭-৮-তে শুল্ক পর্বদের কাছে All-India Sugar Merchants' Conference-এর পক্ষ থেকে প্রদত্ত স্মারকলিপি দ্রষ্টব্য।

৩৮। *ঐ*, খণ্ড ৩ খ, পৃ. ৬৬-৭০ (Imperial Council of Agricultural Research কর্তৃক লিখিত ১৮ই অগাস্ট, ১৯৩৭ তারিখের চিঠি)।

৩৯। *ঐ,* খণ্ড ৩ খ, পৃ. ৫৪-৬৫ এবং ৬৯।

৪০। এই প্রসঙ্গে বিহার সরকারের রাজস্ব বিভাগ, যুক্তপ্রদেশের শিল্প অধিকর্তা এবং যুক্তপ্রদেশের কৃষি অধিকর্তার সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য। *ঐ,* খণ্ড ৩ ক, পৃ. ৬২-২০৫।

৪১। *ঐ,* খণ্ড ১, *Indian Sugar Mills Association and Individual Mills in United Provinces,* পৃ. ১০৪-৫।

৪২। *ঐ,* খণ্ড ৩ খ, পৃ. ৬৮-৯ এবং খণ্ড ৩ ক, পৃ. ৬৬।

৪৩। *ঐ,* খণ্ড ৩ ক, পৃ. ৭০।

৪৪। *ঐ,* খণ্ড ৩ ক, পৃ. ২১৬-১৭।

৪৫। দ্রষ্টব্য : *The Adminstration Report of the Department of Industries, United Provinces for the year ending 31 March, 1937* (এলাহাবাদ, ১৯৩৭), পৃ. ৩-৪ ; *for the year ending 31 March, 1938* (এলাহাবাদ, ১৯৩৮), পৃ. ৮-৯ ; এবং *for the year ending 1 March 1939* (এলাহাবাদ, ১৯৪০) পৃ. ৫-৬।

৪৬। দ্রষ্টব্য, ITB. *Evidence (Report on Sugar),* (দিল্লী, ১৯৩৮-৩৯), খণ্ড ৩ ক, পৃ. ৮৬।

৪৭। সাধারণ চাষীদের সমস্যাগুলি জানতে হলে, বিহার ও যুক্তপ্রদেশ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য, *ঐ,* খণ্ড ৩ ক, বিশেষভাবে পৃ. ১০০-১, ১৩৯-৪০ ও ২০১-২।

৪৮। Burt, 'The Indian Sugar Industry', পৃ. ৯৩২-৩। আরও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে ভারতীয় রাজস্ব পর্ষদের কাছে দেওয়া Imperial Institute of Sugar Technology-র অধিকর্তা শ্রী আর. সি. শ্রীবাস্তবের সাক্ষ্যের মধ্যে : দ্রষ্টব্য, ITB, *Evidence (Report on Sugar),* (দিল্লী, ১৯৩৮-৩৯), খণ্ড ৩ খ, পৃ. ১০৪-১৮।

৪৯। *ঐ,* খণ্ড ৩ খ, পৃ. ৩২-৩৩।

৫০। *ঐ,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯-৪০ এবং *ঐ,* ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫-৭।

৫১। *ঐ,* খণ্ড ৩ খ, পৃ. ১০৮।

৫২। দ্রষ্টব্য, Burt, 'The Indian Sugar Industry', পৃ. ৯২৩ ; S. M. Hadi-কর্তৃক প্রদত্ত সাক্ষ্য : ITB, *Evidence (Report on Sugar),* (দিল্লী, ১৯৩৮-৩৯), খণ্ড ৩ খ, পৃ. ৭০৩-৬, এবং ঐ একই খণ্ডে (পৃ. ১৯৬ এবং পৃ. ২২৬-৩২) নথিভুক্ত যুক্তপ্রদেশ সরকারের সাক্ষ্য।

৫৩। ITB, *Evidence (Report on Sugar),* (দিল্লী, ১৯৩৮-৩৯) খণ্ড ৩ ক, পৃ. ৫০২।

৫৪। ITB, *Evidence (Report on Sugar),* (কলকাতা, ১৯৩২), ১ ম খণ্ড, পৃ. ২০৬।

৫৫। দ্রষ্টব্য, 'Report on Production of Khandsari Sugar, Rab and Gur in the United Provinces'। এটি পাওয়া যাবে ITB, *Evidence (Report*

on Sugar), (দিল্লী, ১৯৩৮-৩৯), খণ্ড ৩ খ, পৃ. ৯৮-১০২-এ। এছাড়াও ঐ একই খণ্ডে (পৃ. ৭১-৭২) Imperial Council of Agricultural Research এব সাক্ষ্য এবং ঐ রিপোর্টের খণ্ড ৩ ক, পৃ. ২২৩-এ যুক্তপ্রদেশ সরকারের শিল্প অধিকর্তার সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য।

৫৬। *ঐ,* খণ্ড ৩ ক, পৃ. ২২৩।

৫৭। এলাহাবাদ, ১৯৪০, পৃ. ১০।

৫৮। উদাহরণ স্বরূপ দ্রষ্টব্য : ITB, *Evidence* (*Report on Sugar*), (দিল্লী, ১৯৩৮-৩৯), খণ্ড ৩ ক, পৃ. ৭২-৭৩-এ প্রদত্ত পাটনার চিনি ও ভ্যালী গুড়ের দামের সারণি। তাছাড়া ঐ একই খণ্ডে (পৃ. ১৯৪-৯৬) যুক্তপ্রদেশ সরকারের সাক্ষ্যও দ্রষ্টব্য।

৫৯। *ঐ,* ১ম খণ্ড, পৃ. ১২২-২৩ এবং ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৭-৪৮ দ্রষ্টব্য।

৬০। CISD : *Review of the trade of India for the years 1937-38 to 1940-41* (কলকাতা, বার্ষিক)-এর চিনিশিল্প বিষয়ক পরিচ্ছেদটি দ্রষ্টব্য। এ ছাড়াও দ্রষ্টব্য : Leon V. Hirsch. *Marketing in an Underdeveloped Economy : the North Indian Sugar Industry* (এঙ্গেলউড ক্লিফ্স্, এন. জে., ১৯৬১), পৃ. ৭৬-৭।

৬১। দ্রষ্টব্য : E. A. G. Robinson, *The Structure of Competitive Industry* (লণ্ডন, ১৯৩১)।

৬২। ITB, *Report on Sugar* (দিল্লী, ১৯৩৮), ৫ম অধ্যায়।

৬৩। *ঐ,* পৃ. ২০।

৬৪। আখ চাষেব বিস্তার যে সব আবহাওয়া ও জলবায়ুগত কারণে প্রভাবিত হয়েছিল তার বিবরণ ও বিশ্লেষণ পাওযা যাবে T. R. Sharma লিখিত *Location of Industries in India,* (বোম্বাই, ১৯৪৬) নামক গ্রন্থেব সপ্তম ও অষ্টম পরিচ্ছেদে।

৬৫। দিল্লী, ১৯৩৮।

৬৬। দ্রষ্টব্য : Imperial Council of Agricultural Research, *Report on the Cost of Production of Crops in the principal sugarcane and cotton tracts in India,* ৪র্থ খণ্ড, *Madras* (দিল্লী, ১৯৩৮), পৃ. ৩৬ এবং ৫ম খণ্ড, *Bihar* (দিল্লী, ১৯৩৮), পৃ. ২১-৩।

৬৭। এইভাবে দক্ষিণ ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ চিনি কলগুলিতে নিয়ন্ত্রণ করতে মাদ্রাজের প্যারীজ্ নামক যে ম্যানেজিং এজেন্টসঙ্ঘ তারা লক্ষ্য করল যে, উন্নত প্রথায় চাষ এবং আরও বেশি সার প্রয়োগের জন্যে তারা অনেক অর্থব্যয় কবা সত্ত্বেও সাধারণ চাষীদের তুলনায় তাদের আখ উৎপাদনের ব্যয় অপেক্ষাকৃত বেশি হচ্ছে—ফলে তারা তাদের কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন আখ চাষের এলাকার পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দিয়েছিল। দ্রষ্টব্য : ITB, *Evidence* (*Report on Sugar*), (দিল্লী, ১৯৩৮-৩৯), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২৬।

৬৮। Sharma দেখিয়েছেন যে, বিভিন্ন অঞ্চলে আখ উৎপাদনের ব্যয়ের পার্থক্যের মূল কারণ হচ্ছে সেচের ব্যয়ের পার্থক্য। উত্তর ভারতে সেচের খরচ যেখানে একরপিছু ১০ বা ১১ টাকা, বোম্বাই অঞ্চলে সেখানে সেচের ব্যয় হতো একর পিছু ৬০ টাকা। (*Location of Industries in India*, ৮ম পরিচ্ছেদ)।

৬৯। সেচের ক্যানাল থেকে রাজস্ব বৃদ্ধির উপায় সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্যে বোম্বাই সরকার Decan Canals Improvement Committee (the Kamat Committee) নিয়োগ করে এবং এই কমিটির অন্যতম সুপারিশ ছিল যে, চিনিকল আরও বেশি গড়ে তুললে সরকারের সেচ থেকে রাজস্ব বাড়তে পারে। দ্রষ্টব্য : ITB, *Evidence* (*Report on sugar*), (দিল্লী, ১৯৩৮-৩৯), ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০১-২ (বোম্বাইয়ের Deccan Sugar Factories-কর্তৃক প্রদত্ত সাক্ষ্য) ; *ঐ*, ৫ ম খণ্ড, পৃ. ৪১-৮ (Deccan Irrigation Circle-এর Superintending Engineer, C.E. Aitken-এর সাক্ষ্য) ; ITB, *Report on Sugar* (দিল্লী, ১৯৩৮), পৃ. ২৬-৭।

৭০। *ঐ*, পৃ. ২৮-৯।

৭১। Sharma, Location of Industries in India, পৃ. ১২৬-৭।

৭২। মাদ্রাজের কৃষি ও শিল্প দপ্তরের পক্ষ থেকে কৃষকদের আরও বেশি আখ চাষে প্রণোদিত করার উদ্দেশ্যে প্রচার চালানো হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ জেলায় একবপিছু আখ চাষের খরচ কৃষকদের পক্ষে অত্যন্ত বেশি হওয়া ছাড়াও এ কথাও সত্য যে, এ সব এলাকায় অনেক ফসল হতো যা আখ চাষের তুলনায় অনেক লাভজনক ছিল—যথা, কলা, নারকেল বা হলুদ। উত্তর ভারতের তুলনায় দক্ষিণ ভারতের জেলাগুলিতে মণ-প্রতি আখ চাষের প্রত্যক্ষ ব্যয় কম থাকলেও এ সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে উত্তর থেকে দক্ষিণ ভাবতে আখ চাষকে স্থানান্তবিত করলে উভয় এলাকাব চাষীরাই উপকৃত হতেন। দ্রষ্টব্য : ITB, *Evidence* (*Report on sugar*), (Delhi, 1938-39), খণ্ড ৩ ক, পৃ. ৪৮৪-৫৬৪।

৭৩। দ্রষ্টব্য : ITB, *Evidence* (*Report on Sugar*) (দিল্লী, ১৯৩৮-৩৯), খণ্ড ৩ ক, পৃ. ৬৪-৬৫, ২১১-১২ এবং ২১৭।

৭৪। *ঐ*, ৪ র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪১-এ Parry and Company-র Sir William Wright-এর সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য।

৭৫। *ঐ*, খণ্ড ৩ ক, পৃ. ১২৭।

৭৬। Indian Sugar Mill Association-এর দেওয়া তালিকা থেকে যে আয়তনগত বণ্টনের হিসাব পাওয়া যায় (যার উপর আমাদের সারণি প্রতিষ্ঠিত), তার সঙ্গে ITB এর দেওয়া কারখানার আয়তন সম্পর্কিত হিসাবের অসঙ্গতি আছে [ITB, *Report on Sugar* (দিল্লী, ১৯৩৮) পৃ. ৬০]। শেষোক্ত তালিকার ১৪০টি কারখানার মধ্যে ৭৬টির উৎপাদন ক্ষমতা হলো ৫০০ টন বা তার কম ; অন্যদিকে আমাদের সারণি অনুসারে ১৯৩৭-এর এপ্রিলে এই আয়তনের কারখানার সংখ্যা ছিল মাত্র ৬২টি। এই তারতম্যের সম্ভাব্য কারণ হলো (ক) দুটি তালিকার

বিচার্য বিষয়ের পার্থক্য এবং (খ) যে দিন থেকে উল্লেখিত উৎপাদন ক্ষমতা কার্যকবী হয়েছে তার পার্থক্য।

৭৭। চিনিকলগুলির পক্ষ থেকে নিয়ন্ত্রণের আবেদন সম্পর্কে জানতে হলে দ্রষ্টব্য : ITB, *Evidence (Report on Sugar)* (দিল্লী, ১৯৩৮-৩৯), খণ্ড ৩খ, পৃ. ৩৭১-৭৫-এ নথিবদ্ধ Indian Sugar Producers' Association, Cawnpore-এব প্রদত্ত সাক্ষ্য।

৭৮। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : P. N. Nayer and P. S. B. Pillai, 'An Analysis of Sugar and Gur Prices in India in the Post-Protection Period', *Sankhya (The Indian Journal of Statistics)*। খণ্ড ৪, অংশ ৪, ১৯৩৮-৪০, প. ৪৭৩-৮।

৭৯। আন্তর্জাতিক চিনি চুক্তির মধ্যে ভারত একটি অন্যতম পক্ষ হিসাবে ১৯৩৭-এ অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তিরিশের দশকে ভারতীয় চিনি শিল্পের গতিপ্রকৃতির উপর এই প্রভাব ছিল সামান্যই।

অনুবাদক : জয়ন্ত আচার্য

১৩

ভারতীয় কাগজ শিল্পের উন্নতি

১৩.১ ১৯২৪ পর্যন্ত শিল্পের অবস্থান

ভারতবর্ষে যন্ত্রচালিত কাগজ শিল্পের উদ্ভব ঘটে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যখন খ্রিস্টান মিশনারিরা শ্রীরামপুরে একটি কাগজের কল প্রতিষ্ঠা করেন।[১] ১৮৭০ সালে ব্রিটিশ পবিচালনাধীনে যন্ত্র নিযেই বালি পেপার মিল গড়ে ওঠে। ইংল্যান্ডে কোম্পানিটির শুরু। ভারতীয় পরিচালনায় প্রথম কল প্রতিষ্ঠিত হয় লক্ষ্ণৌতে ১৮৭৮-এ। দেশীয় বাজার থেকে ক্রয়েব মাধ্যমে স্থানীয় মজুত রক্ষার নীতির ঘোষণা হয় ১৮৮৩-তে এবং তার ফলে ব্রিটিশ পুঁজিব বড় ধরনের অনুপ্রবেশ ত্বরান্বিত হয়। বিশ্ববাজারে কাগজের দাম বেড়ে যাওয়ার ফলেও কাগজ শিল্পে বিদেশী পুঁজি আসতে থাকে। পশ্চিম ইয়োরোপ এবং জাপান সহ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে সাক্ষরতার ব্যাপক প্রসার কাগজের চাহিদা ও তার দাম বাড়িয়ে দেয়। হস্তনির্মিত কাগজের পরিবর্তন এবং শিক্ষার প্রসারের ফলে ভারতে যন্ত্র নির্মিত কাগজের বাজার উন্নতি করবে আশা করা হয়েছিল। [২]

ব্রিটিশ ও ভারতীয় উভয় উদ্যোগই কাগজ শিল্পের সৃষ্টিতে নিজেদের ভূমিকা পালন করেছিল। আপার ইন্ডিয়া কুপার পেপার মিল কোম্পানি লি: ১৮৭৮ সালে যৌথ মূলধনী কোম্পানি হিসাবে লিপিবদ্ধ হয় এবং লক্ষ্ণৌতে ১৮৮২ সালে এই কল উৎপাদন শুরু করে। এর মূলে ছিল ভারতীয় ব্যবসায়ীদের একটি দল এবং সবসময়ই ছিল ভারতীয় বোর্ড অব ডিরেক্টর [১৯৯২ সালে মিলে কেবলমাত্র একজন ইয়োরোপীয় ডিরেক্টর ছিলেন, নাম এল. সি. বারে]। [৩] ১৮৮৩, ১৮৮৪ ও ১৮৮৬ ছাড়া ১৯১৪ পর্যন্ত কোম্পানি বছরে ৪ থেকে ১০ শতাংশ ডিভিডেন্ড দিতে সক্ষম হয়েছিল। এমন কি নতুন শতক শুরুর পরে বিদেশী প্রতিযোগিতা বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও ডিভিডেন্ড দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল। কল উঁচু মানের কাগজের জন্য স্থানীয় চাহিদার উপরই বেশি নির্ভর করেছিল। কিন্তু কাগজ সংযুক্ত প্রদেশ থেকে পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলিতে রপ্তানি হচ্ছিল। কিন্তু নিচুমানের কাগজের স্থানীয় চাহিদা জার্মানি এবং অন্যান্য মহাদেশীয় অঞ্চল থেকে যোগান দেওয়া হয়েছিল। কল প্রধানত সরকারকে সরবরাহ করত এবং পণ্যের কোনো বিজ্ঞাপন দিত না।[৪] এই কল ক্রমশ কর্মচারীদের মধ্যে ভারতীয়র সংখ্যা বাড়াতে পেরেছিল এবং ১৯২৪-এ ইয়োরোপীয় তত্ত্বাবধায়কের সংখ্যা মাত্র তিনে পরিণত হয়েছিল।১৯৩১ নাগাদ পরিচালনা ও তত্ত্বাবধায়ক বিভাগের সব কর্মীই ছিলেন ভারতীয়। কিন্তু (প্রথম) বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির আনুকূল্য এবং সংরক্ষিত বাজারের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও নতুন উদ্যোগের জোয়ার দ্রুত মিলিয়ে গেল।

কল না পারল উৎপাদন-ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে, না পারল উৎপাদন প্রক্রিয়ার কোনো পরিবর্তন আনতে। কলটির এই ব্যর্থতার কারণ পুবনো উৎপাদন পদ্ধতির অনুসরণ। পদ্ধতিটি অনুযায়ী কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার কবা হতো সাবাই ঘাস, পাট, সন, ন্যাকড়া ও ছেঁড়া কাপড়। কলটিব উৎপাদনব্যয় ইন্ডিয়ান পেপার পাল্প কোম্পানি, টিটাগড় পেপার মিল এবং বেঙ্গল পেপার মিলেব তুলনায বেশি ছিল। যদিও শেষ দুটি সংস্থাকে সাবাই ঘাসের জন্যে বেশি হারে মাসুল দিতে হয়েছিল। এই সাবাই ঘাস ও কাঠমণ্ড প্রথম দিকে তাদের প্রধান কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হতো।[৫] এ কথাও মনে করা যায় যে, বাজার সম্পর্কে কোম্পানির খুব সীমিত জ্ঞান ছিল। মিল বিভিন্ন রকম কাগজের চাহিদার একটা ছোট অংশ সরবরহ করত এবং সেই কারণে এর দাম আমদানিকৃত কাগজের দরপত্র এবং বাংলার মিলগুলির দেওয়া কাগজেব উপর নির্ভরশীল ছিল। এই কাগজ প্রায়শই দেশের উত্তরপশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের বাজারগুলিতে জমা হয়ে থাকত।[৬]

শতকের প্রথমে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাগজকলগুলির মধ্যে ছিল টিটাগড় পেপার মিল এবং বেঙ্গল পেপার মিল। প্রথমটি স্থাপিত হয় ১৮৮২ সালে এবং কাগজ উৎপাদন শুরু করে ১৮৮৪-তে। ১৯০৫-এ এই মিলটি বালি মিল যখন স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায় তখন এর দুটি যন্ত্র অধিগ্রহণ করে। টিটাগড় পেপার মিলও ১৯০৩-এ ইমপিরিয়াল পেপার কোম্পানির কাঁকিনাড়া মিল যখন উঠে যায় তখন একে অধিগ্রহণ করে নেয়। বেঙ্গল পেপার মিল কোম্পানি ১৮৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মিলের রাণীগঞ্জ শাখা ১৮৯১-এ উৎপাদন শুরু করে। টিটাগড় পেপার মিল এফ. ডবলু হেলিজার কোং-এর এজেন্সি ফার্ম দালাল-প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। এই ফার্ম পাটের মিলগুলিকেও নিয়ন্ত্রণ করত। বেঙ্গল পেপার মিল কোম্পানিকে নিয়ন্ত্রণ কবত বামা-লরিব এজেন্সি ফার্ম, যে ফার্মের চা-ব্যবসায় খুব উৎসাহ ছিল। টিটাগড় পেপার মিল, বেঙ্গল পেপার মিল এবং আপার ইন্ডিয়া কুপার পেপার মিলগুলির ১৯১১-১৪ সালে বাৎসরিক গড় উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ১৭,১৩৫,৬০৬১ এবং ৩০০০ টন।[৭] এই তিনটি মিল ছাড়া আবও কয়েকটি ছোট মিল ছিল যার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ভারতীয়রা। অবশ্য আর্থিক দিক থেকে এগুলি লাভজনক ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধা ছিল কোম্পানির প্রয়োজনীয় মূলধনের পরিমাণ সঠিক ধারণার অভাব। ১৮৮৭ সালে ত্রিবাঙ্কুর সরকারের আর্থিক সহায়তায় গঠিত ত্রিবাঙ্কুর পেপার মিল কোম্পানির উদাহরণ থেকে এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে। কিন্তু কোম্পনির আরো পুঁজির প্রয়োজন ছিল [বিশেষত কার্যকরী মূলধন] এবং বিভিন্ন স্তরে ঋণ ও অর্ডার সহ সরকারি আর্থিক সাহায্য প্রাপ্তির পরে ১৮৯৩ সালে এই কোম্পানিটি বন্ধ হয়ে যায়।[৮] এই উদ্যোগে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল সর্বসাকুল্যে ৫,৫৮,০০০ টাকা। ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৩ তারিখে টিটাগড় পেপার মিলের মোট মূলধন ও ঋণপত্রের আর্থিক মূল্য দাঁড়িয়েছিল।

প্রাক্ যুদ্ধ বছরগুলিতে সরকারি সাহায্য অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কেননা এই সময়ে সস্তা কাঠমণ্ড থেকে প্রস্তুত ইয়োরোপীয় কাগজ শিল্পের প্রতিযোগিতায় এই শিল্পের অস্তিত্বই বিপন্ন ছিল। কিছু কল বিভিন্ন ধরনের সরবরাহর জন্য সরকারের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পেরেছিল। সেগুলিই ছিল সফল কল।[১০]

সারণি ১৩.১ ভারতীয় কাগজের সরকারি ক্রয়ের মোট মূল্য, ১৯০১ থেকে ১৯১৩

বছর (৩১ শে মার্চে সমাপ্ত)	ভারতীয় কাগজ ও পেস্টবোর্ডের সরকারি ক্রয় (টাকা '০০০)	বছর (জানুয়ারি -ডিসেম্বর)	ভারতে উৎপাদিত কাগজের মূল্য (টাকা '০০০)
	(১)		(২)
১৯০১	২৮,৮৫	১৯০১	৬৫,৮৪
১৯০২	২৮,৭৫	১৯০২	৬৪,৩৮
১৯০৩	২৬,৯৮	১৯০৩	৫৯,১৫
১৯০৪	২২,৫৮	১৯০৪	৬১,৪৯
১৯০৫	২৭,৭৫	১৯০৫	৫১,৮৭
১৯০৬	২৭,১০	১৯০৬	৬৩,১১
১৯০৭	৩২,১৪	১৯০৭	৭২,৯০
১৯০৮	৪০,৮৬	১৯০৮	৭৫,৮৭
১৯০৯	৩৮,১১	১৯০৯	৭৯,১২
১৯১০	৩৮,৬৯	১৯১০	৮১,৫২
১৯১১	৩৯,৩০	১৯১১	৮০,০৪
১৯১২	৩৫,৯৫	১৯১২	৭৭,০৬
১৯১৩	৩৪,৫২	১৯১৩	৮০,৩৭

সূত্র ও টীকা : স্তম্ভ (১) : Sen, 'Government purchases'. স্তম্ভ (২) : Gov. India, CISD : *Statistical abstract for British India* (Seventh Issue) (কলকাতা, ১৯১৫). এটি সম্ভবপর ছিল যে, সরকারের ভারত থেকে ক্রয় করা কাগজ ও পেস্টবোর্ডের সমগ্র পরিমাণ ভারতে উৎপন্ন হতো না। এই সংশয়ের কারণ হিসাবে উল্লেখ্য যে, ইন্ডিয়ান ট্যারিফ বোর্ড মন্তব্য করেছিল ভারতীয় কাগজ-কলগুলি পেস্টবোর্ড, মিলবোর্ড ও কার্ডবোর্ড তৈরি করত না; ITB : *Report on paper and paper pulp* (কলকাতা, ১৯২৫), পৃ. ১৩।

১৮৮০ সালে স্থানীয় ভাণ্ডারের জন্যে ক্রয়ের পরিবর্তিত নীতির সুবাদে কাগজশিল্পে প্রধান ইউনিট স্থাপনে সাহায্য করার পর ভারত সরকার শিল্প-উৎপাদনের একটা বড় অংশের ক্রয় ছাড়া অন্যবিষয়ে আর কোনো উৎসাহ দেখায়নি। ১৯০১ থেকে ১৯১৪ সময়সীমার মধ্যে ভারতীয় কাগজ এবং পেস্টবোর্ডের মোট সরকারি ক্রয় ভারতীয় মোট উৎপাদনের অর্ধেকের কিছুটা কম ছিল। এই তথ্য সারণি ১৩.১ থেকে প্রকাশ প্রায়।

১৯০১ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত টিটাগড় পেপার মিল এবং বেঙ্গল পেপার মিলের পক্ষে অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভবপর হয়েছিল এই কারণে যে, তারা দাম নির্ধারণ এবং উৎপাদন নীতির মধ্যে প্রথম থেকেই সমন্বয় সাধন করতে পেরেছিল। পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে তারা মূল কাঁচামালের (অর্থাৎ সাবাই ঘাসের) যোগানকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল।[11] দুটি কোম্পানি আনুষ্ঠানিকভাবে 'ভারতীয় কাগজ উৎপাদনকারী সমিতির' সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। [ইন্ডিয়ান পেপার মেকারস অ্যাসোসিয়েশন]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তার পরবর্তী সময়ের পরিস্থিতি কাগজের কলের মুনাফার বৃদ্ধি ঘটিয়েছিল ১৯১৪ থেকে ১৯২২ পর্যন্ত বিভিন্ন বছরে তিনটি প্রধান কোম্পানি যে পরিমাণ ডিভিডেন্ড বা লভ্যাংশ বিতরণ করেছিল তা সারণি ১৩.২-এ দেখানো হয়েছে।

সারণি ১৩.২ ভারতীয় কাগজ-কলগুলি কর্তৃক প্রদত্ত ডিভিডেন্ড, ১৯১৪ থেকে ১৯২২ (বার্ষিক শতাংশ)

	আপার ইন্ডিয়া কুপার মিল্‌স্ কোম্পানি	বেঙ্গল পেপার মিল কোম্পানি	টিটাগড় পেপার মিল্‌স্ কোম্পানি
১৯১৪	৭	৬	০
১৯১৫	১০¹/₂	৮	০
১৯১৬	২৪¹/.	১০	৬
১৯১৭	৫৯	৫২	২০
১৯১৮	৫৮	৫২	৫৫ (১৫ মাস ১৯১৮-১৯)
১৯১৯	৬৫	৫২	৫০ (১৯১৯-২০)
১৯২০	৫০	৫২	৫০ (১৯২০-২১)
১৯২১	৫০	২৫	১৫ (১৯২১-২২)
১৯২২	৩২	০	০ (১৯২২-২৩)

উৎস : *IIYB,* প্রাসঙ্গিক বৎসরগুলির জন্যে। ১৯২২ সালে আপার ইন্ডিয়া কুপার মিল প্রদত্ত লভ্যাংশের উৎস ছিল সংরক্ষিত তহবিল।

ভারত সরকার পুনরায় কাগজ শিল্পের সাহায্যে এগিয়ে আসে। বেসরকারি হাতে দেওয়া দেরাদুনের বন গবেষণা সংস্থায় বাঁশ ও মণ্ড প্রক্রিয়ার উন্নতির জন্য প্রথমে সাহায্য দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, ১৯২৫-এ শুল্কসংরক্ষণের মাধ্যমে কাগজ ও মণ্ড শিল্পকে সাহায্য করা হয়। ভারতীয় কাগজ ও মণ্ড কোম্পানি [ইন্ডিয়ান পেপার পাল্প কোম্পানি] স্থাপিত হওয়ার আগে পর্যন্ত ভারতীয় পেপার মিলগুলি কাঁচামাল হিসাবে প্রধানত সাবাই ও মুঞ্জ ঘাস, ছেঁড়াকাপড়, পাট, শন, ছেড়া-নষ্ট কাগজ এবং আমদানিকৃত কাঠ-মণ্ড ব্যবহার করত। এগুলির মধ্যে 'সাবাই' ঘাস ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যুদ্ধ শেষ হবার পর মিলগুলি সাবাই-ঘাসের বিভিন্ন জানা উৎসকে ব্যবহার করা শুরু করে এবং 'সাবাই' ঘাসের সংগ্রহের ব্যয় খুব বেড়ে যায়। টিটাগড় এবং বেঙ্গল পেপার মিলকে নেপাল, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা এবং কেন্দ্রীয় প্রদেশগুলি থেকে ঘাসসংগ্রহ করতে হতো। ফলে মাঝে মধ্যে কাঁচামাল আসতে প্রায় নয়শ মাইল ঘুরতে হতো। এক টন 'সাবাই' মণ্ড তৈরি করতে আড়াই টন সাবাই ঘাসের প্রয়োজন হতো এই রকম অবস্থায় যদি মিল সাবাই ঘাসের উপর নির্ভর করত তাহলে দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভপর হতো কিনা সন্দেহ ছিল।[১২]

বাঁশমণ্ড পদ্ধতির সূচনা কাগজ উৎপাদকদের সংকট থেকে বাঁচাল। ১৯০০-১৯০৪ সময়সীমার মধ্যে ভারত সরকারের উদ্যোগে আর ডবলু স্যান্ডাল বাঁশ মণ্ড করণের প্রযুক্তিগত সম্ভাবনা পরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু পদ্ধতিটি বাণিজ্যিক দিক থেকে সফল হয়নি।[১৩] ইতিমধ্যে

বেঙ্গল পেপার মিলের ম্যানেজার ডব্লু রাইট বাঁশমণ্ড পদ্ধতিতে উৎসাহিত হন এবং একটি ছোট মণ্ডকরণ সংস্থার সূচনা করেন। তিনি তাঁর সহকর্মীদের কাছ থেকে কোনো রকম সহযোগিতা পাননি। কিন্তু সমসাময়িক ভাইসরয় তাঁর কাজে খুশি হয়েছিলেন এবং বন গবেষণা সংস্থায় [ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটে] বাঁশমণ্ড পরীক্ষা করার কাজে নিযুক্ত হন। ভারত সরকার ১৯০৯ সালে বন-অর্থনীতিবিদ আর, এস, পিয়ারসনকে ভারত ও বর্মার বাঁশসহ বনাঞ্চলের উপর একটি ব্যাপক সমীক্ষাব জন্য দায়িত্ব দেয়। পিয়ারসনের রিপোর্টকে[১৭] বাঁশবন সম্পর্কে একটি মূল্যবান তথ্যের উৎস বলা যায়। রিপোর্টটি ছিল মণ্ড তৈরির কাজে ব্যবহারের উপযুক্ত। ১৯১৯ সালে ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে, রাইটের রসাযনাগার-পরীক্ষা নমুনা প্লান্ট তৈরি করার যাথার্থ্যতা প্রমাণ করেছিল এবং পবে ১৯২৪-এ এর কাজ শুরু হয়। পরীক্ষাগার থেকে প্লান্ট পর্যন্ত উৎপাদন মাত্রার বৃদ্ধি কার্যত অনেক যান্ত্রিক সমস্যা সমাধানে সাহায্য করেছিল।[১৫] ১৯২২-এ ইন্ডিয়ান পেপার পাল্প কোম্পানি সালফাইটের সাহায্যে উৎপাদন শুরু করে। এই পদ্ধতি বন-গবেষণা সংস্থার পরীক্ষামূলক প্রকল্পে আধা-সালফাইট পদ্ধতি চালু হওয়ার আগেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু দেরাদুনে ইতিমধ্যে বাঁশ থেকে মণ্ড তৈরির সম্ভাবনা প্রনাণিত হয়েছিল।[১৬] যাই হোক, বাঁশমণ্ড উৎপাদনে বনগবেষণা সংস্থার প্রাথমিক সাফল্য সরকার বা বেসরকারি সংস্থা বেশ কয়েকবছর অনুসবণ কবেনি। সবকারেব বাণিজ্যিক স্তরে কাগজ উৎপাদন সম্পর্কে কোনো পরিকল্পনা ছিলনা এবং ১৯২৫-এ ভারতীয় শুল্ক পর্ষদের বেসরকারি উদ্যোগকে বাঁশমণ্ড প্রক্রিয়া প্রারম্ভিক স্তরে আর্থিক সাহায্য দেওযার প্রস্তাবকেও সরকার অনুমোদন করেনি।[১৭]

১৩.২ সরকারের শুল্ক সংরক্ষণ এবং কাগজ শিল্পের বিকাশ

ভারতীয় কাগজ উৎপাদক সমিতিই প্রথমে ১৯২৩ সালের জুন মাসে সরকারের কাছে সংরক্ষণের দাবি পেশ করে। আমরা ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছি, এই সংস্থায় ছিল টিটাগড় পেপার মিল কোম্পানি লিঃ এবং বেঙ্গল পেপার মিল কোম্পানি এবং প্রসঙ্গটি ১৯২৪ সালের জুন মাসে ভারতীয় শুল্ক পর্ষদের কাছে বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়। ১৯২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পর্ষদের রিপোর্টি জমা পড়ে এবং সংরক্ষণের নীতি গৃহীত হয়। পর্ষদ সংরক্ষণনীতি প্রাথমিকভাবে সুপারিশ করে। কারণ, পর্ষদ মনে করে বাঁশের মণ্ড ভারতীয় কাগজশিল্পের দীর্ঘকালীন উন্নতির ভিত গড়ে তুলতে পারে এবং যদি কোনোরকম সাহায্য না দেওয়া হয় তা হলে ভারতে কাগজ উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে। অবশ্য এইসঙ্গে বলতে হয় কাঠ মণ্ড যখন উন্নতি করেছে তখন এর পুনরুদ্ধারের একটি ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে।[১৮] পর্ষদ মনে করেছিল যে সব মিল সাবাই ঘাস ব্যবহার করে তাদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল নয়। এর প্রথম কারণ, পরিচিত উৎস থেকে সাবাই ঘাসের সীমিত সরবারহ এবং দ্বিতীয়ত কারণ, যে দুটি মিল বেশি কাগজ উৎপাদন করে তাদের অবস্থান ছিল উৎসস্থল থেকে অনেক দূরে। অতএব, পর্ষদ মনে করল যতদিন বাঁশমণ্ড পদ্ধতি বাণিজ্যিকভাবে সফল না হচ্ছে ততদিন সরকারকে কাগজ ও মণ্ডশিল্পে সংরক্ষণ চালু করার পরামর্শ দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। পর্ষদ এই মর্মে পরামর্শ দেয় যে, সরকার কেবলমাত্র মিলকে সাহায্য করবে এবং তারপর

বাঁশের মণ্ড উৎপাদনে বিশেষত ইন্ডিয়ান পেপার পাল্প কোম্পানিকে পুঁজি সরবারহ করতে পারে (ঋণ অথবা ঋণপত্রের গ্যারান্টির আকারে)। এর উদ্দেশ্য হলো উৎপাদন ক্ষমতা বছরে ২৫০০ টন থেকে ৫০০০ টন-এ বৃদ্ধি করা। দ্বিতীয়ত, পর্যদ ছাপা ও লেখার কাগজের উপর চলত শতকরা ১৫ ভাগ সমহার শুল্কের পরিবর্তে পাউন্ড প্রতি ১আনার বিশেষ কর চালু করা সুপারিশ করে। এর মধ্যে অবশ্য শতকরা ৬৫ বা তার বেশি যান্ত্রিক সাহায্যপুষ্ট নিউজপ্রিন্ট বাদ থাকবে।[১৯] কিছুটা অসঙ্গতিপূর্ণ হলেও পর্যদ জোর দিয়ে বলে যে বাঁশমণ্ড তৈরির প্রক্রিয়াগুলির উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহে ফার্মগুলিকে কোনো রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া উচিত।

'ভারত সরকার নিম্নোক্ত তিনটি কারণে বোর্ডের মিলগুলিকে বাঁশ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে টাকা দেওয়ার প্রস্তাবকে বাতিল করে। প্রথমত, ইন্ডিয়ান পেপার পাল্প কোম্পানি হলো একটি বেসরকাবি সংস্থা। দ্বিতীয়ত, সালফাইট পদ্ধতি যা ভর্তুকি দিয়ে পরীক্ষিত হওয়ার কথা তা কার্যত এই বেসরকাবি কোম্পানির অন্যতম সদস্যের পেটেন্ট রাইটের অধীনে ছিল। এবং তৃতীয়ত, কোনো শিল্পকে আর্থিক অনুদান সেই শিল্পের সব প্রতিযোগীকেই সাহায্য করা উচিত এবং কেবল একটি কলকেই সুবিধা দেওয়া উচিত নয় এবং সেই সূত্রে অন্যান্য প্রতিযোগীদেব তুলনায় অন্যায্য সুবিধা দেওয়া ঠিক নয়।'[২০]

সরকার এর বদলে পর্যদের পাঁচ বছর সংরক্ষণের সুপারিশকে সাত বছর করার দিকে সচেষ্ট হলো [৩১ মার্চ পর্যন্ত] এবং হিসাব করে দেখল ইন্ডিয়ান পেপার পাল্প কোম্পানি এবং কর্নাটিক পেপার মিল লিঃ [পরবর্তী সময়ের অন্ধ্র পেপার মিল লিঃ, রাজমন্দ্রি] এর ফলে বোর্ড সুপাবিশকৃত ভর্তুকি ও শুল্কেব প্রায় সমান অর্থই পাবে। ১৯২৫ থেকে ১৯৩১-এর শুল্ক তালিকা কেবল দুটি বড় পবিবর্তন করা হয়েছিল : শুল্ক থেকে ছাড়ের জন্যে কাগজে ব্যবহৃত যান্ত্রিক মণ্ডের শতকরা পরিমাণ নির্ণয় করা হতে থাকল আঁশের নীট অংশের ভিত্তিতে (১৯২৭ থেকে প্রাপ্ত)। তাছাডা, ছাপাব ও লেখাব কাগজের অনুকূলে পক্ষপাতিত্ব দূর কবার উদ্দেশ্যে শুল্ক তালিকার সংশোধন ঘটানো হয় এমনভাবে যাতে লাইনটানা বা ছাপানো ফর্ম (ছাপানো শিবোনামা সহ লেটার পেপার) এবং বাঁধানো হিসাবের ও অন্যান্য অমুদ্রিত পুস্তকের উপর পাউন্ড প্রতি ১ আনা অথবা ১৫ শতাংশ মূল্যানুগ শুল্ক ধার্য করা যায় (ঐ দুটি হারের মধ্যে তুলনামূলকভাবেই বেশি হারটাই বর্তাবে)।[২১] ১৯৩১-এর ১লা মার্চ থেকে মূল্যানুগ শুল্ক ১৫ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছিল [লাইনটানা অথবা মুদ্রিত ফর্ম এবং হিসাবের খাতা ও অমুদ্রিত পুস্তক ছাড়া মুদ্রিত কাগজের উপর পাউন্ড প্রতি ১ আনা শুল্ক চালু থাকল]। ১৯৩১-এর নভেম্বর মাসে বিভিন্ন রকম শ্রেণীর কাগজের উপর আরোপিত সংরক্ষণমূলক শুল্কসমূহ ও চলতি রেভিনিউয়ের উপর ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য করা হয়েছিল। এইভাবে বিশেষ সংরক্ষণমূলক শুল্ক বাড়িয়ে পাউন্ড প্রতি ১আনা ৩ পাই করা হয়েছিল এবং বিকল্প মূল্যানুগ শুল্ক বেড়ে হয়েছিল শতকরা ১৮$^{3}/_{4}$ ভাগ। [১৯৩১শে মার্চে বিশেষ কয়েকটি কাগজের উপর সংরক্ষণমূলক শুল্কবৃদ্ধির ছাড়া এটা ছিল সংরক্ষণমূলক শুল্কের হারের একটি বৃদ্ধি]।

১৯২৫ সালে কাগজ ও কাগজ মণ্ড শিল্পে প্রদত্ত শুল্ক সংরক্ষণের নীট ফল আই, টি, বি রিপোর্টের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। কাগজ ও মণ্ডশিল্পে সংরক্ষণের সময়কাল বৃদ্ধি করার যৌক্তিকতা অনুসন্ধান করার জন্য ১৯২১ সালে এই

সংস্থা নিযুক্ত হয়।[২২] ভারতে সবরকমের কাগজের ভোগের পরিমাণ ১৯২৪-২৫ সালে ১১৯, ৯৬৩ টন থেকে ১৯২৯-৩০ সালে বেড়ে হয় ১৭৫,৬২৭ টন (অর্থাৎ শতকরা ৫৬.৮৬ ভাগ বৃদ্ধি) সংরক্ষিত কাগজের মোট ভোগ ১৯২৪-২৫ সালের ৪৩,৩৩১ টন থেকে ১৯২৯-৩০ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৫৩,৫৮৪ টনে অর্থাৎ বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ২৩.৬৬ শতাংশ [১৯৩০-৩১ সালটিকে ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে কেননা এই বছরেই বিশ্বব্যপী মন্দা ও প্রায় সমস্ত ধরনের সংরক্ষিত কাগজের উপব বর্ধিত আমদানি শুল্কের প্রভাব প্রতিফলিত হযেছিল]। অর্থাৎ, সংরক্ষণ কিছু কাগজের ক্ষেত্রে ভোগ কমাতে কার্যকরী হয়েছিল। কিন্তু সেইসঙ্গে সংরক্ষণের বিকল্প অসংরক্ষিত কিছু ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছিল। কাগজের মোট ভোগে (পেস্টবোর্ডসহ) ভারতীয় উৎপাদনের অংশ ১৯২৪-২৫ সালে শতকরা ২৪.১৩ থেকে কমে ১৯২৯-৩০ সালে হয় শতকরা ২১.৯৮ ভাগ। আর সংরক্ষিত কাগজের এই অংশ ১৯২৪-২৫ সালে ছিল শতকরা ৫৩.৮৪ ভাগ, ১৯২৯-৩০ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬২.৫২ শতাংশ[২৩]। সুতরাং কাগজের মোট ভোগের তুলনায় ভারতীয় কাগজ উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটালেও সংকীর্ণ দৃষ্টি-ভঙ্গিতে শুল্কসংরক্ষণকে খুব একটা সফল বলা যায়না। যদিও এই ব্যবস্থা সংরক্ষিত কাগজের ভোগের ক্ষেত্রে ভারতীয় অংশকে বৃদ্ধি করতে পেরেছিল যা কাগজের মোট ভোগের অনুপাতে হ্রাস পাচ্ছিল।

কাগজ শিল্প সংরক্ষণের অন্যতম ফল হলো কাগজ উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঠ-মণ্ড আমদানির আনুপাতিক বৃদ্ধি। এটা স্বাভাবিক ছিল কেননা বাঁশ-মণ্ড পদ্ধতির উন্নতি ছিল বেশ মন্থর এবং কার্যত কেবল একটি মিল ইন্ডিয়ান পেপার পাল্প কোম্পানিই এ ব্যাপারে অনেকটা উন্নতি করেছিল। এমনকি ইন্ডিয়ান পেপার পাল্প কোম্পানির ক্ষেত্রে আমদানিকৃত কাঠমণ্ডের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ১৯৩০-৩১ সালে উৎপাদিত কাগজের ওজনের শতকরা ৬৩.০৪ ভাগ যা ১৯২৪-২৫ সালে ছিল শতকরা ২১.০২ ভাগ।[২৪] বড় বড় অন্যান্য কোম্পানি ১৯৩০-৩১ সালে শতকরা বেশি হারে কাঠমণ্ড ব্যবহার করেছিল যা ১৯২৪-২৫-এর থেকে কম। এই সঙ্গে আমদানিকৃত কাঠমণ্ডের ব্যয় সাবেকী কাঁচামাল যেমন সাবাই ঘাস, ছেঁড়া কাপড়, শন ও নষ্ট ছেঁড়া কাগজের তুলনায় কমে গিয়েছিল। সরকার কার্যত অ-চালু কাঠমণ্ড শিল্পকে ভালোভাবে রক্ষা করতে পারেনি।[২৫] একটি বা দুটি কারখানাকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া অন্যায্য মনে করা যেতে পারে। বন-গবেষণা সংস্থায় আবিষ্কৃত বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বাঁশ-মণ্ড প্রক্রিয়ার উন্নয়নের একমাত্র সম্ভাব্য বিকল্প সরকারের শিল্পসংক্রান্ত কাজ অধিগ্রহণ করার চূড়ান্ত আপত্তিতে বাতিল হয়ে যায়।

ভারতীয় শিল্প কাঠামোয় কাগজ শিল্পে শুল্ক সংরক্ষণের তাৎক্ষণিক ফল লক্ষ্য করা হয়নি। ১৯২৪ সালে আই টি বি-র প্রথম অনুসন্ধানের সময় ভারতে নয়টি কাগজের মিল ছিল। এর মধ্যে তিনটি মিলের চারটি করে যন্ত্র ছিল। একটির ছিল দুটি যন্ত্র এবং বাকি মিলগুলির ছিল একটি করে যন্ত্র। এগুলির মধ্যে দুটির মালিক ছিল টিটাগড় পেপার মিল কোম্পানি লিঃ যার সব মিলিয়ে আটটি যন্ত্র ছিল। ১৯২৩-এ এর ক্ষমতা ছিল ২০,০০০ টন এবং উৎপাদন ছিল ১৫,৫৮৫ টন। টিটাগড় পেপার মিল কোম্পানি লিঃ এবং বেঙ্গল পেপার মিল কোম্পানি লি: (ক্ষমতা ৮,৪০০ টন) এবং ৬,৫৬৫ টন উৎপাদন নিয়ে শিল্পে একদম প্রথম সারিতে ছিল। ইন্ডিয়া পেপার পাল্প কোম্পানি বাদে এসব সংস্থা সবচেয়ে কম ব্যয়ে উৎপাদনে সক্ষম ছিল যদিও এদের উৎপাদন শুরু হয়েছিল মাত্র ১৯২২ সালে।

এবং তার মধ্যে বেঙ্গল ও টিটাগড় পেপার মিল থেকে এই কোম্পানিগুলি উৎপাদন ব্যয় দেখিয়েছিল।[২৬]

১৩.৩ কাগজ শিল্পে ক্ষতিগ্রস্থ [Loser] সংস্থাগুলি

অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত পেপার মিলগুলির মধ্যে শুল্ক পর্যদ কেবলমাত্র আপার ইন্ডিয়া কুপার পেপার মিল এবং ডেকান মিল থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিল। ডেকান পেপার মিল এমনকি যুদ্ধের আগেও নিশ্চিতভাবে একটি উপপ্রান্তিক [Submarginal] প্রতিষ্ঠান ছিল এবং আপার ইন্ডিয়া কুপার পেপার মিল যুদ্ধের পরে উপপ্রান্তিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।[২৭] দুটি মিলই অত্যাধিক মাত্রায় স্থানীয় বাজার এবং বিশেষ করে আঞ্চলিক প্রদেশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভরশীল ছিল। ডেকান পেপার মিল ১৮৮৫ সালে বোম্বাই বাজারের সুবিধা নিতে পুণের কাছে প্রতিষ্ঠিত হয়। এইসঙ্গে পুনের বিশুদ্ধ জল এবং সস্তা শ্রমিকের সুবিধাও ছিল। প্রাথমিকভাবে এই কোম্পানি ছেঁড়া কাগজ, পাট, নষ্ট কাগজ এবং সমধর্মীয় দ্রব্য ব্যবহার করত। কিন্তু তারপর ইয়োরোপে কাঠমণ্ড উৎপাদনের প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল এবং তার ফলে শুধুমাত্র অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকতে হয়।

যদিও মিলটিকে দ্বি-যন্ত্র সমন্বিত করার পরিকল্পনা ছিল কিন্তু দ্বিতীয় যন্ত্রটি কখনোই বসানো হয়নি। সেই কারণে সবসময় মিলটির উপরিব্যয় ছিল বেশি।[২৮] কোম্পানি প্রদত্ত বাৎসরিক ডিভিডেন্ডের হার ১৮৯০-১৯০৮ সময়সীমার মধ্যে ছিল ৫ শতাংশ এবং ১৯০৯ থেকে ১৯১৭ পর্যন্ত ছিল ৬ শতাংশ (১৮৮৮-৯-এ কোনো ডিভিডেন্ড দেওয়া হয়নি এবং তারপরের বছরে ডিভিডেন্ড দেওয়া হয়েছিল ৪ শতাংশ হারে)। এমনকি যুদ্ধের বছরগুলিতে ঐ হারের লক্ষ্যণীয় উন্নতি ঘটেনি : সবকার এবং অন্যান্য ক্রেতাদের চাহিদা উপযোগী কাগজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে কাঁচামালের অভাবে কোম্পানির উৎপাদনকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল। কোম্পানির লভ্যাংশের হার ১৯১৮-১৯ সাল থেকে বৃদ্ধি পেয়েছিল কিন্তু এটা ছিল নিশ্চিতভাবে মূলধন ভোনের সময় এর জন্য মিলটিকে ডি. পুডামজী এন্ড সনকে হস্তান্তর করতে হয়েছিল এবং ১৯২৪ সালে মিলটিকে বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। অবচয়প্রাপ্ত যন্ত্রপাতির প্রতিস্থাপন এবং অন্য একটি কাগজের মেসিন বসিয়ে প্লান্টের প্রসারের লক্ষ্যেকোম্পানি ন্যূনতম হিসাবীকৃত ৩ লক্ষ টাকার পরিবর্তে কেবল ৯৩,১১৬ টাকার সংরক্ষিত তহবিল সংগ্রহ করতে পেরেছিল।[২৯] শুল্ক সংরক্ষণের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে শেয়ার মূলধন ৫০০,০০০ টাকা থেকে ৯২৫,০০০ টাকায় বৃদ্ধি এবং মিলটি যন্ত্র সংখ্যা একটি থেকে তিনটিতে পরিণত করার মধ্য দিয়ে কোম্পানির ভবিষ্যত সমৃদ্ধ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। [এর মধ্যে একটি যন্ত্র অবশ্য বোম্বাইয়ে অবস্থিত ছিল]। বোম্বাইয়ে অবস্থিত ডি পাদমজী পেপার মিলের সম্পত্তি অধিগ্রহণ ছিল মূলধন বৃদ্ধির একমাত্র কারণ। ১৯৩৯ পর্যন্ত এই নীতির থেকে সুফল পাওয়া গিয়েছিল এবং তখন থেকে পরবর্তী সংরক্ষণের ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল। এইভাবে মিলটির উৎপাদন ১৯২৪-২৫-এ ৮৭৬.৬ টন থেকে ১৯৩০-৩১-এ ২২৯০.৬ টন পর্যন্ত অবিরাম বেড়েছিল (দুটি মিলের কার্যকরী উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৪০০০ টন যদিও কাগজ-যন্ত্রগুলির ক্ষমতা ছিল ৫,৭০০ টন)। নতুন বিধানে ডিভিডেন্ড

সম্পর্কিত নীতি পাল্টানো হয়েছিল : ১৯২৪-২৫ থেকে ১৯২৯-৩০ সাল পর্যন্ত কোনো ডিভিডেন্ড দেওয়া হয়নি।[৩০] যদিও উভয়ই করা হয়েছিল আভ্যন্তরীণ কাঁচামালের সরবাবহ এবং আমদানিকৃত মণ্ড ব্যবহারের বৃদ্ধি ঘটিয়ে। আমদানিকৃত মণ্ডের অনুপাত ১৯২৫-২৬ সাল থেকে ১৯৩০-৩১ পর্যন্ত অনবরত বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৩১] কাজেই আমদানিকৃত কাঠমণ্ডের উপর বাঁশ-কাগজ শিল্প (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৩২ অনুযায়ী যখন বেশি হাবে শুল্ক ধার্য করা হচ্ছিলে তখন মিলের উপর খুব চাপ পড়ছিল। ১৯৩১-৩২ থেকে ১৯৩৪-৩৫ পর্যন্ত অর্জিত লাভ এমনকি স্বাভাবিক হারে বাড়ি ও যন্ত্রের দালান-বাড়িও যন্ত্রের অবচয় মেটানোর পক্ষেও যথেষ্ট ছিলনা। মিল কম খরচে সস্তা বাঁশ ও সাবাই ঘাস সংগ্রহ-করতে পাবছিল না যাব থেকে মণ্ড তৈরি করা যায়।[৩২]

প্রাক্‌যুদ্ধ কালের অন্য একটি মিল যেমন ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত আপাব ইন্ডিয়া কুপার পেপার মিল, তার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহারে বছরে ৪ হাজার টন উৎপাদনে সক্ষম ছিল। কিন্তু ১৯২৩ পর্যন্ত সর্বোচ্চ উৎপাদন-ক্ষমতা দাঁড়িয়েছিল ৩,৬৭৮ টনে এবং তা ঘটেছিল ১৯০৬-এ। আর্থিক দিক থেকে মিলটি ডেকান মিলের তুলনায় অনেক বেশি সফলতা অর্জন করে। মিলটি ১৮৯১-৯৫ সময়সীমায় বছরে শতকরা দশ ভাগ ডিভিডেন্ড দিয়েছিল। এমনকি ১৯০০ থেকে ১৯০২ এই হার বজায় রাখতে পেরেছিল এবং মিলটি যুদ্ধের আগে প্রায়ই ৬ শতাংশের বেশি ডিভিডেন্ড দিয়েছিল। যুদ্ধচলাকালীন সময়ে মিলটি বছরে ৫৯ শতাংশ পর্যন্ত ডিভিডেন্ড দিয়েছিল, এবং এমনকি মুনাফা অন্তর্হিত হওয়ার পরেও ১৯২২-এর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে কল বেশ উঁচু হারেই ডিভিডেন্ড দেওয়া বজায় রেখেছিল আপার ইন্ডিয়া কুপার মিল লক্ষ্ণৌ-য়ে অবস্থিত হওয়ার সুবাদে কিছু বাড়তি-সুবিধা ভোগ করেছিল। জল এবং শ্রমিক সস্তা ছিল এবং সাবাই ঘাসের যোগানের উৎসও কাছে ছিল। বন্দর থেকে দূরে অবস্থানের ফলেও কলটি সংরক্ষণের সুযোগ পেত। কিন্তু শুল্ক পর্ষদের প্রথম অনুসন্ধানের থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অংশীদাররা কোম্পানি থেকে যথাসম্ভব সুবিধা পাওয়ার চেষ্টায় ছিল এবং এক্ষেত্রে কোম্পানির ভবিষ্যতের কথা তাঁরা চিন্তা করেননি। তখন কোম্পানির মোট সংরক্ষিত তহবিল ছিল ২,১২৩,০০০ টাকা যার একটি অংশ কার্যকরী মূলধন হিসাবে অবশ্যই ব্যবহৃত হয়েছিল। কারখানার সম্প্রসারণ ও যন্ত্রপাতির প্রতিস্থাপন অর্থাৎ আধুনিকীকরণের অনুমতি ব্যয় ছিল ৪,০০০,০০টাকা। কোম্পানি ১৯২২-এ প্রয়োজনীয় প্রতিস্থাপন ঘটানো থেকে বিরত থাকল কেননা যন্ত্রাদির দামের দরপত্র খুব বেশি ছিল।[৩৩]

১৯২৫-এ কাগজ শিল্পকে সংরক্ষণের অনুমোদন দেওয়ার পর কলের উৎপাদন ১৬৯৩ টন (১৯২৪) থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত গড়ে প্রায় ২৬০০ টন বেড়ে গেল। কিন্তু এই প্রসারের কারণ ছিল চলতি উৎপাদন ক্ষমতার অপেক্ষাকৃত বেশি ব্যবহার। তার সম্প্রসারণ নয়। উৎপাদন ব্যয়ও ১৯২৮ সালে টন প্রতি ৫০৫.২২ টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৩০-এ দাঁড়ায় টন প্রতি ৪০১.৫৭ টাকা। কিন্তু এটাও সম্ভব হয়েছিল উৎপাদন পদ্ধতির প্রযুক্তিগত উন্নতি ছাড়াই চলতি প্লান্টের নিবিড় ব্যবহারের মাধ্যমে।[৩৪] কোম্পানি আধুনিক বাষ্প ও শক্তিচালিত প্লান্টের ক্রয় করেছিল এবং এতে বিদ্যুতের খরচ ব্যবহার অনেকটা কমে যাবে আশা করা হয়েছিল। আগের তুলনায় কোম্পানি বেশি রক্ষণশীল আর্থিক নীতি অনুসরণ করতে থাকে এবং ১৯২৪-এ কোনো ডিভিডেন্ড না দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। তারপর কোম্পানিটি শতকরা ৬ থেকে ১০ শতাংশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছিল ১৯২৫-৩০ সময় সীমার মধ্যে।[৩৫]

কাগজের গুণগত মানেরও উন্নতি ঘটেছিল এবং সাবাই ঘাস পরীক্ষা চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে এবং ১৯৩২-এর পর ধোঁয়া ও ব্লিচিং প্লান্ট আরম্ভ হবার পর গুণগত মান আরো উন্নত হলো। কিন্তু প্লান্টেব ক্ষমতার কোনো বৃদ্ধি ঘটল না। কোম্পানির আর্থিক নীতি রক্ষণশীলই থেকে গেল। ১৯৩২-এ ডিভিডেন্ড দেবার কথা ঘোষণা করা হয়নি এবং ১৯৩১ থেকে ১৯৩৬ সময়সীমার মধ্যে (১৯৩২ ছাড়া) ডিভিডেন্ডের হার শতকরা ২ ভাগ থেকে ৫$^{১}/_{২}$ ভাগ পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়েছিল। কাগজের উৎপাদন ব্যয় ১৯৩১ সালে ছিল টন প্রতি ৩৯৪.৪২ টাকা। ১৯৩৬-এ তা থেকে কমে দাঁড়ল ৩২৮.৫০ টাকায়।

১৩.৪ কাগজ শিল্পে স্থিতাবস্থা ও বিকাশ : ১৯৩২-৩৮

১৯৩২-৩৭ সময়কালটি ভারতীয় কাগজ ও মণ্ডশিল্পে আশ্চর্যজনক ভাবে একটা স্থিতাবস্থার সময়। অবশ্য মোট উৎপাদন প্রতি বছরেই বৃদ্ধি পেয়েছিল কিন্তু তার কারণ ছিল বার্ষিক শুল্কেব চাপে চলতি উৎপাদন ক্ষমতার উন্নততর ব্যবহাব। ১৯৩২-এ কাগজের উপর ১৮$^{৩}/_{৪}$ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশ মূল্যানুগ হারে সংরক্ষণমূলক শুল্ক কার্যকরীভাবে বাড়ানো হয়। যুক্তরাজ্যে উৎপাদিত কাগজের উপর ২০ শতাংশ পক্ষপাতমূলক হার ধার্য করা হয়েছিল। অটোয়া বাণিজ্য চুক্তির পরে নতুন শুল্ক শ্রেণী বিভাজনের ফলে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হযেছিল।[৩৬]

বাঁশ ও অন্যান্য কাঁচামাল থেকে প্রস্তুত স্বদেশজাত মণ্ডের বিকল্প সৃষ্টিতে বিশেষ উন্নতি হযেছিল। প্রাথমিকভাবে এটা ছিল ১৯৩২-এ আমদানিকৃত মণ্ডের উপর টন প্রতি ৪৫ টাকা নির্দিষ্ট শুল্ক ধার্যের পরিণতি (The Bamboo Paper Industry Protection Act of 1932 অনুযায়ী) । যেহেতু সমস্ত রকমেব সংরক্ষণ শুল্ক ১৯৩১ নভেম্বরে ধার্য রাজস্ব অতিরিক্ত করেব আওতায় ছিল সেই কারণে আমদানিকৃত মণ্ডের উপর বিশেষত নির্দিষ্ট করের কার্যকরী হার টনপ্রতি ৫৬.২৫টাকায় নেমে এসেছিল। দেশীয় মণ্ডের সাহায্যে আমদানিকৃত মণ্ডের বিকল্প সাধনও বাঁশের যান্ত্রিক ব্যবহারজনিত সমস্যা নিরসনের সূত্রে ত্বরান্বিত হয়েছিল। ১৯৩১-এ আই. টি. বি-র অনুসন্ধানের সময় কেবলমাত্র টিটাগড় পেপার মিলই সঠিক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার জন্য বাঁশের পর্ব (nodes of bamboo) কমাতে পেরেছিল বলে মনে হয়।[৩৭]

১৯৩১-১৯৩৮ সাল পর্যন্ত শুল্ক পর্যদের অনুসন্ধানের সময়ে ভারতীয় শিল্পের উন্নতি সারণি ১৩.৩ ও ১৩.৪ থেকে বোঝা যাবে। এই সারণিগুলিতে দেখানো হয়েছে যে, এমনকি ১৯৩১-৩২ সালেও আমদানিকৃত মণ্ডের পরিমাণ ভারতে মোট মণ্ডভোগের অর্ধেকের বেশি ছিল। কিন্তু এই অনুপাত ১৯৩৬-৩৭ সালে শতকরা ২৫ ভাগেরও কম হয়ে যায়। দ্বিতীয় লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হলো নিউজপ্রিন্ট বাদে ভারতে কাগজের মোট ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি। ১৯৩১-৩২ এবং ১৯৩৭-৩৮ সালের মধ্যে মোট ভোগের পরিমাণ ৮৩,০০০ টন থেকে বেড়ে হয় ১,১৪,০০০। অবাক করার ব্যাপার হলো যে, ভারতের চলতি কলগুলি এই বৃদ্ধির সুবিধা নিতে ব্যর্থ হয়েছিল, শুরুর তুলনায় শেষের দিকে মিলগুলি বাজারের একটা ছোট অংশ সরবারহ করতে পেরেছিল। যদিও বেশির ভাগ বৃদ্ধি তথাকথিত অসংরক্ষিত ক্ষেত্রেই

ঘটেছিল। কিন্তু একজন অবশ্যই আশা করতে পারেন যে, ভাবতীয মিলগুলি অসংরক্ষিত ক্ষেত্রেব ভোগকে মোকাবিলা কবার জন্য নিজস্ব সংরক্ষণের সুবিধা নিতে পারত। ভারতীয মিলগুলিব মুনাফালভ্যতার অভাবেব ঘটনা দিয়ে এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা কবা যাবেনা। টিটাগড এবং বেঙ্গল পেপাব মিল ভারতীয় বাজারের নেতৃত্বে ছিল এবং তারা সাধাবণ মূলধনেব উপর ডিভিডেন্ড ঘোষণা কবেছিল। সারণি ১৩.৫ এ তা দেখানো হয়েছে।

সারণি ১৩.৩ কাগজ ও কাগজ-মণ্ডের ভারতীয় উৎপাদন ও আমদানি, ১৯৩১-২ থেকে ১৯৩৬-৭

বছর	চালু মিলগুলির সংখ্যা	মণ্ড ব্যবহারের পরিমাণ (টনে)		মোট মণ্ড ব্যবহারে আমদানির অংশ	বোর্ডসহ কাগজের ব্যবহার (টনে) কিন্তু এর মধ্যে বাদ আছে পুরনো খবরের কাগজ, কিছু অন্যান্য ধরনেব কাগজ এবং নিউজপ্রিন্ট (টনে)			
					ভারতীয়		আমদানিজাত	
		দেশীয়	আমদানিজাত		সংরক্ষিত	অসংরক্ষিত	সংরক্ষিত	অসংরক্ষিত
১৯৩১-২	৮	১৭,৫৭১	২০,০৮১	৫৩.৩৩	৩৫,৭৩৮	৪,৮২০	১২,৩৯৩	২৯,৭৮৪
১৯৩২-২	৮	১৭,৭১৮	২১,৪২৪	৫৪.৭৪	৩৫,৩৭০	৪,৮৪৭	১১,৪৯০	৪৫,৫৯২
১৯৩০-৪	৮	২১,৮৬৭	২০,০১৬	৪৭.৭৯	৩৮,১৫১	৫,৫০৭	১৩,০০৫	৩৭,৩৭৮
১৯৩৪-৫	৮	২৩,১২৬	১৯,৭৩৭	৪৬.০৫	৪০,০৮৪	৪,৫১৭	১১,১৬৩	৪৪,৭৮৯
১৯৩৫-৬	৯	৩০,২৮৮	১৬,৬১৫	৩৫.৪৩	৪২,৮৩৯	৫,২৬০	১২,০৯৬	৫৯,০৯৬
১৯৩৬-৭	৯	৩৫,৩৭৪	১০,৯৭৬	২৩.৬৮	৪৩,৩৬৪	৫,১৬৭	১১,৮৪০	৫৩,২৮৩

উৎস : ITB : *Report on paper and paper pulp* (দিল্লী, ১৯৩৮), পৃ.-৮।

সারণি ১৩.৪ দেশীয় উপকরণ থেকে উৎপাদিত মণ্ড এবং আমদানিজাত মণ্ড ব্যবহারের পরিমাণ ১৯৩১-২ থেকে ১৯৩৬-৭ (টন)

বছর	বাঁশের মণ্ড	ঘাসের মণ্ড	অন্যান্য দেশীয় উপকরণজাত মণ্ড	মোট পরিমাণ (৪)-(১)+(২)+(৩)	আমদানিজাত মণ্ড
১৯৩১-২	৫,২২৮	৯,০৪৯	৩,২৯৪	১৭,৫৭১	২০,০৮১
১৯৩২-৩	৫,৪২৯	৯,৬৩২	২,৬৫৭	১৭,৭১৮	২১,৪২৪
১৯৩৩-৪	৬,৭২১	১১,৩৭৭	৩,৭৬৯	২১,৮৬৭	২০,০১৬
১৯৩৪-৫	৯,২২৫	১১,৩৪০	২,৫৬১	২৩,১২৬	১৯,৭৩৭
১৯৩৫-৬	১৪,৪৪১	১২,২৮০	৩,৫৬৭	৩০,২৮৮	১৬,৬১৫
১৯৩৬-৭	১৯,২৮১	১১,৫১০	৪,৫৮৩	৩৫,৩৭৪	১০,৯৭৬

সূত্র : ঐ, পৃ. ১৮।

সাবণি ১৩৫ প্রধান কাগজকলগুলি কর্তৃক ঘোষিত ডিভিডেন্ড, ১৯২৯ থেকে ১৯৩৮

বেঙ্গল পেপাব মিল		টিটাগড় পেপাব মিল্‌স্	
অর্ধবৎসব সমাপ্তিব তাবিখ	ডিভিডেন্ড % (বার্ষিক)	অর্ধবৎসব সমাপ্তিব তাবিখ	ডিভিডেন্ড % (বার্ষিক)
৩১ ডিসেম্বব, ১৯২৯	২০	৩১ মার্চ, ১৯৩০	৪০
৩০ জুন, ১৯৩০	২০	৩০ সেপ্টেম্বব, ১৯৩০	৩৫
৩১ ডিসেম্বব, ১৯৩০	২০	৩১ মার্চ, ১৯৩১	৩৫
৩০ জুন, ১৯৩১	২০	৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১	৩৫
৩১ ডিসেম্বব, ১৯৩১	২০	৩১ মার্চ, ১৯৩২	৩৫
৩০ জুন, ১৯৩২	২০	৩০ সেপ্টেম্বব, ১৯৩২	৪৫
৩১ ডিসেম্বর, ১৯৩২	২০	৩১ মার্চ, ১৯৩৩	৪৫
৩০ জুন, ১৯৩৩	২০	৩০ সেপ্টেম্বব, ১৯৩৩	৪৫
৩১ ডিসেম্বব, ১৯৩৩	২০	৩১ মার্চ, ১৯৩৪	৪৫
৩০ জুন, ১৯৩৪	২০	৩০ সেপ্টেম্বব, ১৯৩৪	৪৫
৩১ ডিসেম্বব, ১৯৩৪	২০	৩১ মার্চ, ১৯৩৫	৫০
৩০ জুন, ১৯৩৫	২৫	৩০ সেপ্টেম্বব, ১৯৩৫	৫৫
৩১ ডিসেম্বব, ১৯৩৫	২৫	৩১ মার্চ, ১৯৩৬	৫৫
৩০ জুন, ১৯৩৬	২৫	৩০ সেপ্টেম্বব, ১৯৩৬	৫৫
৩১ ডিসেম্বব, ১৯৩৬	২৫	৩১ মার্চ, ১৯৩৭	৬০
৩০ জুন, ১৯৩৭	২৯	৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭	৩২ ১/২
৩১ ডিসেম্বব, ১৯৩৭	২৯	৩১ মার্চ, ১৯৩৮	৩২ ১/৮
৩০ জুন, ১৯৩৮	২৯	৩০ সেপ্টেম্বব, ১৯৩৮	৩২ ১/৮

সূত্র : *IIYB* ১৯৩১-২ থেকে ১৯৩৯-৪০ পর্যন্ত বৎসরগুলির জন্যে আরেকটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পাবে যে, চলতি কলগুলি খবই লাভজনক হওয়া সত্বেও তাদের মিলগুলিকে বরং পবিবর্তনীয় ব্যযেব দ্রুত বৃদ্ধির সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়েছিল। এই বিশ্লেষণটি বেঙ্গল পেপার মিলের ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত মনে হতে পারে। কেননা মিলটিকে টিটাগড় পেপার মিলেব তুলনায় বেশি মাত্রায় ঘাসের মণ্ড বা আমদানিকৃত মণ্ডের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। এই ঘটনায় বেঙ্গল পেপার মিলের উৎপাদন ব্যয়ে এই নির্ভরশীলতার প্রতিফলন ঘটেছিল বলে মনে হয়। বিভিন্ন মিলের উৎপাদন ব্যয়ের সারণি [সারণি ১৩.৬] থেকে যদিও তা স্পষ্ট নয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর টিটাগড় পেপার মিল অন্যান্য চারটি মিলের থেকে বেশি উৎপাদন ব্যয় নিয়ে শুরু করেছিল। কিন্তু অনতিবিলম্বে ব্যয় কলের মতো এই ব্যয় কমাতে সফল হয়েছিল। বেঙ্গল পেপার মিল তার সাজ-সরঞ্জাম ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিবর্তন ঘটিয়ে এই পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার কাজে পিছিয়ে ছিল, কিন্তু ১৯৩০-এ তার উৎপাদন ব্যয় টিটাগড় মিলের ব্যয়ের স্তরে নেমে এসেছিল। এই পার্থক্যকে খুব গুরুত্ব দিয়ে ভাবা উচিত নয় যেহেতু বেঙ্গল পেপার মিল টিটাগড় পেপার মিলের তুলনায় কিছু পরিমাণে ভাল নমুনার কাগজ উৎপাদন সম্ভবপর করে তুলেছিল।[৩৮]

সারণি ১৩.৬ উৎপাদন-ব্যয় : টিটাগড়, বেঙ্গল, ডেকান, ইন্ডিয়া পেপার পাল্প ও আপার ইন্ডিয়া কুপার পেপার মিল্‌স্‌, ১৯১৩-৩৬ (টন প্রতি টাকা)

বছর	টিটাগড় পেপার মিল্‌স্‌ কুপার পেপার	বেঙ্গল পেপার মিল্‌স্‌	ইন্ডিয়া পেপার মিল্‌স্‌	আপার ইন্ডিয়া কুপার পেপার	ডেকান পেপার
১৯১৩	২৬১.১২১	২৪৩.৮৪*	—	২৯৭.৮৪*	৩৫০.৫৪
১৯২১	৭৭৪.৮১৮	৬৬৭.৫২	—	৬৯৯.২৫	—
১৯২২	৬৮৯.২৩২	৫৮৮.০৫	—	৬২১.৩৮	—
১৯২৩	৫৪০.৪৮১	৫১৯.০৯	৪৫৭.১২	৬৮১.০০	—
১৯২৪	৪৩১.০৬৫	—	৪৫৭.৬৩	৫০৭.৩৬	৩০৭.১
১৯২৫	৩৭৭.৫১৫	৪৬৩.৮৩৭	৪৬৩.৮৪	৪৪৫.৩৬	৩৩০.১
১৯২৬	৩৮৭.৪০৯	৪০১.৩৮৯	৪১৯.৩২	৪২১.৮২	৩২০.৬
১৯২৭	৩৮৪.৫৭২	৩৮৭.৫৩৬	৩৭৮.৮১	৪৩৬.২০	২৯৮.৭২
১৯২৮	৩৬৭.০৮৪	৩৫৮.৩২১	৩৪৬.০৩	৪১০.৭২	৩২৮.৭
১৯২৯	৩৫৫.০৮০	৩৬৪.৪৪৪	৩২৬.৯২	৪২৬.০০	৩২৭.০৭
১৯৩০	৩৬০.০৭৫	৩৫০.৮২৭	৩৩০.৬৫	৪১৭.৫৪	—
১৯৩১	৩৩৭.৯৪৯	—	৩১৩.৮৪	৪০৮.৬১	৩২০.৮৯
১৯৩২	৩১৬.২০৩	—	৩১৭.৩৮	৪৭৭.০১	৩২১.৮৭
১৯৩৩	৩০০.৭৮০	—	৩১৮.৭৯	৩৭৫.১০	২৯১.৪০
১৯৩৪	২৯৬.৬৪৭	—	৩০২.১৯	৩৮২.০৯	২৮৩.৯৭
১৯৩৫	২৯৪.২০৬	—	২৯৪.৮৩	৩৪৫.০৭	২৭৭.০৩
১৯৩৬	২৯২.৪৫৯	২৪৩†	২৯৯.৩৩	৩৪১.১৮	২৭২.৬৬

সূত্র : ITB : *Evidence* (*Report on paper and paper pulp*) (কলকাতা, ১৯২৫), খণ্ড ১; ITB : *Evidence* (*Report on paper and pulp*) (কলকাতা, ১৯৩২), খণ্ড ১; এবং ITB : *Evidence* (*Report on paper and paper* pulp) (দিল্লী, ১৯৩৯), খণ্ড ১।

টীকা : টিটাগড় পেপার মিল্‌স্‌, ইন্ডিয়া পেপার পাল্প এবং ডেকান পেপার মিল্‌স্‌-এর ক্ষেত্রে ১৯২১-২২ অর্থে ১৯২১, ১৯২২-২৩ অর্থে ১৯২২ এবং অন্যান্য বছরগুলিও একই ভাবে সাজানো হয়েছে। উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবচয়, হেড অফিসের ব্যয়, বিক্রয়-ব্যয় ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যদিও এই ব্যয়গুলি যথাসম্ভব বাদ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

* ১৯১৪

† ITB : *Evidence* (*Report on paper and paper pulp* (কলকাতা, ১৯৩৯), খণ্ড ১, পৃ. ২৭৪।

আবার ১৯৩১ সালে আমদানিকৃত মণ্ডের ওপর ধার্য নতুন শুল্কের ফলে বেঙ্গল পেপার মিলের উপর যখন পড়ে তখন কলটি তার উৎপাদন ব্যয় একতরফাভাবে কমাতে পেরেছিল। প্রাথমিকভাবে সাবাই ঘাসের নতুন উৎস বার করে এবং বাঁশমণ্ড উৎপাদনের সমস্যা সমাধান করেই তা সম্ভব হয়েছিল।

এই কারণে নেতৃত্বে থাকা দুটি মিলের ক্ষেত্রে ভারতীয় বাজারে নিজেদের অংশকে বজায় রাখার একটা সংকল্প আমরা লক্ষ্য করি। মিলদুটি চলতি উৎপাদনের উপর যথাসম্ভব উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে এই কাজ করেছিল। কিন্তু তা প্রধানত সংরক্ষিত ধরনের কাগজের ক্ষেত্রে। নতুন ধরনের উৎপাদনের উদ্যোগ নেওয়ার অনিচ্ছাও এই সঙ্গে ছিল। দুটি কোম্পানির মুনাফালভ্যতার নজির ভারতীয় উদ্যোক্তাদের আকর্ষণ করেছিল যারা ১৯৩৬ থেকে নতুন সংস্থা গড়ে তোলা শুরু করেছিল। ওরিয়েন্ট পেপার মিলসহ কিছু মিল এবং রোটাস শিল্প সংস্থার পেপার মিল ইউনিট প্রাথমিকভাবে শক্ত ও মসৃণ বাদামী রঙের কাগজ উৎপাদন করার জন্যে গঠিত হয়েছিল। এই ধরনের কাগজ সংরক্ষণ প্রকল্পর আওতাধীন ছিলনা যদিও এর উপর উঁচু হারে আমদানিশুল্ক ছিল।[৩৯] কিন্তু কেবলমাত্র চলতি মিলগুলির বেশি লাভ এবং সংরক্ষিত নমুনার কাগজের ক্ষেত্রে বাজারের অস্তিত্ব নতুন কারখানাকে আকর্ষণ করেনি। নতুন মিলগুলি ১৯৩৭-এ শুরু নতুন প্রদেশ সরকারের শাসনাধীন শিক্ষা বিস্তারের সূত্র কাগজের বর্ধিত চাহিদার জন্য আকর্ষিত হয়েছিল।[৪০]

১৯৩৬ পরবর্তী বছরগুলি পুঁজির উপর যথেষ্ট কর্তৃত্ব সহ ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বাজারে প্রবেশের জন্য লক্ষ্যণীয়। যে নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাব তারা দিয়েছিল সেগুলির সাধারণ ক্ষমতা ৬ হাজার টন বা তার একটু বেশি ছিল (শ্রী গোপাল মিলের উৎপাদন ক্ষমতা ৭৫০০ টন-ছিল)। ওরিয়েন্ট পেপার মিল বিড়লা গোষ্ঠীদের দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল রোটাস শিল্পকে ডালমিয়া গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রণ করত এবং শ্রী গোপাল মিল স্থাপন করেছিল করমচাদ থাপার। শিল্পের বৃহৎ ক্ষেত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং উঁচু হারে প্রসারের জন্যে এইসব গোষ্ঠীরই সম্ভাবনা ছিল স্বাধীন ভারতে লক্ষ্যণীয়ভাবে নিজেদের জায়গায় করে নেওয়ার।[৪১]

সারণি ১৩.৭-এ নতুন প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাব তুলনায় তাদের অনুমিত উৎপাদন ব্যয় দেখানো হয়েছে। ওরিযেন্টে ও মাইসোর পেপার মিলের উৎপাদন ব্যয় সবচেয়ে কম বলে মনে করা যেতে পারে। শ্রী গোপাল মিল্‌স্ পাঞ্জাব পেপার মিল্‌স্ অধিগ্রহণ করেছিল। এই মিলের একটি পুরনো প্ল্যান্ট ছিল এবং অন্যান্য মিলের তুলনায় এদের অনেকটা দূর থেকে বেশি দামে ঘাস আনতে হতো বিশেষত যখন তারা যুক্তপ্রদেশের পশ্চিম অঞ্চলে সাবাই ঘাস উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল স্টার পেপার মিল্‌সে্ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ফলে।[৪২] কিন্তু বেশী উৎপাদন ব্যয়ের এই অসুবিধার আংশিক ভাবে লাঘব হয়েছিল স্থায়ী মূলধনে কম ব্যয়ের জন্য।[৪৩]

গুজরাট পেপার মিলের উৎপাদন ব্যয় অন্যান্য নতুন মিলের থেকে কম ছিল। কিন্তু এই হিসাবকে খুব গুরুত্ব দিয়ে ভাবা উচিত নয় কেননা শুল্ক পর্ষদের অনুসন্ধানের সময় মিল ছোট কাপড় মণ্ড নিয়ে কাজ করছিল।[৪৪] অন্ধ্র পেপার মিল ১৯৩৮-এ পুনরায় স্থাপিত হয়েছিল। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত এই মিলে কোনো কাজ হয়নি। মাইসোর পেপার মিলকে মাইসোর সরকার সাহায্য করেছিল এবং সরকার মূলধনের কিছুটা শেয়ার হোল্ডার হিসাবে দিয়েছিল[৪৫] এবং মিল কারখানা চত্বরে টন প্রতি ১২ টাকা সস্তা দরে বাঁশ সরবরাহ করার দায়িত্ব নিয়েছিল।[৪৬] পেপার মিলে উৎপাদনের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ ক্রেতার এই বিষয়টি খুব স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছিল। কিন্তু কাগজের চাহিদা দৈনিক ক্ষমতা ১৭ টন থেকে কম হওয়ার আশঙ্কা ছিল। সেই কারণে দু টন মণ্ড বাইরে বিক্রি করার প্রস্তাব করা হয়েছিল।[৪৭]

কাগজের মানের অনেক পার্থক্যর জন্যে পুরনো মিলের উৎপাদন ব্যযকে নতুন মিলগুলির সঙ্গে সরাসরি তুলনা কবা যাবেনা। ডেকান মিলের ক্ষেত্রে মোট উৎপাদন সাধারণ বাদামির অনুপাত ১৯৩৬-৩৭ সালে ছিল ৪৫. ৩৫ শতাংশ এবং টিটাগড় পেপার মিলের ক্ষেত্রে ছিল মাত্র ৮.২৮ শতাংশ।[৪৮] ডেকান মিলের ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় হ্রাসেন সঙ্গে মোট উৎপাদনে বাদামীর অংশ বেড়েছিল, ১৯৩১-৩২-এ যা ছিল ৩৯, ৪০ তা ১৯৩৬-৩৭-এ দাঁড়াল ৪৫.৩৫ শতাংশে) সাধারণ বিচারে বলা যায় বড় বড় নতুন যেসব বিভিন্ন মানের কাগজের সংমিশ্রণ উৎপাদন করার প্রস্তাব করেছিল তার মান বেঙ্গল পেপার মিলের তুলনায় খারাপ হবে না। এর থেকে মনে হয় বড় বড় নতুন সংস্থার (শ্রী গোপাল মিল্‌স্ বাদে) উৎপাদন ব্যয় ইন্ডিয়ান পেপার পাল্প, টিটাগড় পেপার মিলের সঙ্গে ভালোভাবেই তুলনীয় ছিল। কিন্তু তার মান নিশ্চিতভাবে আপার ইন্ডিয়া কুপার মিল এবং ডেকান পেপার মিলের নিচে ছিল [পরবর্তী কাগজের কলগুলির নিচুমানের কাগজ উৎপাদন মেনে নেওয়ার পর]।[৪৯]

১৯৩৭ নাগাদ কাগজ শিল্পের আনুষঙ্গিক রাসায়নিক শিল্পে উন্নতি ঘটল। ১৯১৯-এ কগ্‌স্‌ওয়েল এই উন্নতিকে তাঁর ভারতীয় কাগজ শিল্পের সমীক্ষার অপরিহার্য বলে মনে করেছিলেন। [৫০] উত্তরদিকে ইম্‌পিরিয়াল কেমিকাল ইন্ডাস্ট্রি ক্লোরিন এবং কস্টিক সোডা উৎপাদনের জন্যে একটি কারখানা গড়ে তোলার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। [৫১] দক্ষিণে ১৯৩৭-এ মাইসোর কেমিকালস্ ও ফার্টিলাইজার লিমিটেড স্থাপিত হয়েছিল যেখানে মাইসোর সরকার অংশীদার হিসাবে মূলধন বিনিয়োগ করেছিল। কাগজের কল যে গ্লবার লবণ ও টাইটানিয়াম ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করে তা এই কারখানা উৎপাদন করবে আশা করা হয়েছিল।[৫২] ১৯৩৬-এ মেত্তুর কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল করপোরেশন চালু করা হয়। এই সংস্থা তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে কস্টিক সোডা উৎপাদনের উপযুক্ত একটি কারখানা পেয়েছিল। এই কারখানা উৎপাদন শুরু করে ১৯৪১-এর মধ্যবর্তী কাল থেকে।[৫৩] রাসায়নিক উৎপাদনের কারখানাগুলির প্রধান বাজার সৃষ্টিতে কাগজ-কলগুলির রাসায়নিক ব্যবহারের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না, তবুও এই সব শিল্পে বিনিয়োগের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কাগজকলের কাঁচামাল ব্যবহারের প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল।

১৯৩৮ নাগাদ যেসব কারখানা স্থাপিত হয়েছিল স্বাভাবিকভাবেই সেগুলি সমসাময়িক ভারতীয় মিলগুলির বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতাকে তীব্রতর করেছিল। ১৯৩৮-৩৯-এ কাগজের দামও নিচে নেমে গিয়েছিল। দাম কমে যাওয়ার আংশিক কারণ হলো বর্ধিত বিদেশী প্রতিযোগিতা। উৎপাদনের আরও বৃদ্ধি এবং ১৯৩৯-র ১লা এপ্রিল থেকে আমদানিকৃত কাগজ ও মণ্ডের উপর সংরক্ষণমূলক শুল্কের কার্যকারী হ্রাসে দাম কমে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে আরও তীব্র করে তুলেছিল। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর ঠিক আগে বেশ কিছু বছরের তুলনায় সবচেয়ে কম ছিল বলা হয়।

১৯৩৮-এ পেশ করা রিপোর্টে আইটি বি ঘাসমণ্ড ও বাঁশমণ্ড শিল্পের ক্ষেত্রে কিছুটা পরিমাণে সংরক্ষণে সুপারিশ করেছিল। যদিও গড়পরতায় ঘাসমণ্ডের টন প্রতি ১৭৩ টাকা খরচ বাঁশমণ্ডের থেকে বেশি ছিল (টন প্রতি ১৪৪ টাকা) । যেহেতু আমদানিকৃত মণ্ডের টন প্রতি খরচ ছিল ১২৬ টাকা সেই কারণে বাঁশমণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় শুল্ক হবে টন প্রতি ১৮ টাকা এবং ঘাসমণ্ডের জন্যে টন প্রতি ৪৭ টাকা। শেষ পর্যন্ত টন প্রতি ৩০ টাকা শুল্ক অথবা শতকরা ২৫ ভাগ মূল্যানুগ শুল্ক এই দুইয়ের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বেশি হারটিকে কাঠমণ্ড আমদানির ক্ষেত্রে আরোপ করা হয়েছিল।

সারণি ১৩.৭ ১৯৩৭ সালের পরে প্রতিষ্ঠিত নতুন ইউনিটগুলির প্রত্যাশিত উৎপাদন-ক্ষমতা ও উৎপাদন-ব্যয়

	উৎপাদন-ক্ষমতা (টন)		ব্লক ক্যাপিটাল (মিলিয়ান টাকা)	টন প্রতি উৎপাদন-ব্যয় (টাকায়)	
	মণ্ড	কাগজ		মণ্ড	কাগজ
১। রোটাস ইনড্রাসট্রিজ	দিন প্রতি ২৫ (বাঁশ ও ঘাস থেকে ১৭)	দিন প্রতি ২০ (বছরে (৬,০০০)	৪.০	১১৭	৩৩৭.০
২। অরিয়েন্ট পেপার মিল্‌স্‌		বছরে ক্রাফ্‌ট কাগজ ৬,০০০	৪.৮	—	৩০২.৬৩
৩। স্টার পেপার মিল্‌স্‌, সাহারাণপুর		বছরে ৬,০০০	—	—	—
৪। শ্রী গোপাল পেপার মিল্‌স্‌		বছরে ৭,৫০০	৩.৩ (+ ০.০৮)	২২৪.৯০	৩৭৭.৭৬
৫। গুজরাট পেপার মিল্‌স্‌*		বছরে ২,৫০০ (কার্যকরী ক্ষমতা নয়)	০.৩	—	২৯৪.৫০
৬। অন্ধ্র পেপার মিল্‌স্‌	বাঁশ থেকে ৩,০০০ ২৪ ঘন্টার মধ্যে	৩,০০০	১.৪ (৩.৪ প্রকৃত ব্যয়)	—	৩০৪.৩৮
৭। মহীশূর পেপার মিল্‌স্‌	১৭ ঘন্টা উৎপাদন চলত বাঁশ থেকে	দিন প্রতি ১৫ (বছরে ৪,৫০০)	৩.৪	—	৬৮৫.৪ (বোন ড্রাই কাগজের মোট উৎপাদন-ব্যয়)

সূত্র : ITB : *Evidence* (*Report on paper and paper pulp*) (দিল্লী, ১৯৩৯), খণ্ড ১।

* গুজরাট ও অন্ধ্র পেপার মিল্‌স প্রতিষ্ঠিত ১৯৩৭-এ। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে অন্ধ্র পেপার মিল্‌স কোনো কাগজ উৎপাদন করেনি। আশা করা হয়েছিল ১৯৩৮ থেকে এই মিল্‌স উৎপাদন শুরু করবে। ১৯৩৫-র মে থেকে গুজরাট পেপার মিল্‌স্‌ র‍্যাগ প্ল্যান্ট চালু করে এবং ১৯৩৬-৭-এ ৭৫৮ টন কাগজ উৎপাদন হয়। প্রত্যাশিত ২,৫০০ টন উৎপাদন ক্ষমতা অর্জনের উপযুক্ত যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ তখনও সম্পন্ন হয়নি যদিও সেগুলি কেনা হয়েছিল। দ্রষ্টব্য : ITB : *Evidence* (Report on paper and paper pulp (দিল্লী, ১৯৩৯), খণ্ড ১, পৃ. ৫২৭।

কাগজে কলমে আই টি বি সুপারিশ করেছিল পাউন্ড প্রতি ১১ পাই যা টন প্রতি ১৩৩ টাকা আমদানি দাম এবং পর্ষদের হিসাবে অনুযায়ী টন প্রতি ৩৮১ টাকা ন্যায্য বিক্রয়-দামের সমতুল্য। ভারত সরকার শুল্ক পর্ষদের হিসাবে দুবার গণনার একটা ব্যাপার নজরে এনেছিল (যা টন প্রতি ৩২ টাকায় দাঁড়ায়) এবং আমদানিকৃত কাগজের উপর শুল্ক কমিয়ে পাউন্ড প্রতি ৯ পাই করেছিল। যাতে বিভিন্ন ধরনের দামী কাগজের ক্ষেত্রে এই শুল্ক খুব কম না হয়ে যায় তার জন্যে ২৫ শতাংশ মূল্যানুগ শুল্ক প্রয়োগ করা হয়েছিল। সংরক্ষণের সময়সীমা সাত বছরের থেকে কমিয়ে তিন বছর করা হয়েছিল।

১৯৩১-৩৯ সময়সীমার মধ্যে কাগজ শিল্পে বিনিয়োগ প্রসারের প্রক্রিয়াকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা যায়: (ক) আমদানিকৃত মণ্ড থেকে বাঁশমণ্ডে অথবা ঘাসমণ্ডে পরিবর্তন করার জন্য চলতি কারখানাগুলির বিনিয়োগ (খ) চলতি কারখানাগুলির বিনিয়োগকে উৎপাদনবৃদ্ধির কাজে লাগানো যাতে সংরক্ষিত কাগজের বাজারে নিজেদের অংশকে ধরে রাখা যায় (গ) সংরক্ষিত ও অসংরক্ষিত উভয় কাগজের ক্ষেত্রে বর্ধিত আভ্যন্তরীণ বাজার যাতে কব্জা করা যায় তার জন্যে নতুন কারখানাগুলির বিনিয়োগ। প্রথম ও তৃতীয় বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়।

১৩.৫ কাগজ শিল্পে চাহিদা উৎপাদন এবং বিনিয়োগ

ভারতীয় কাগজ শিল্পে অনেক রকমের কাগজের উৎপাদন হতো। এগুলির মধ্যে কিছু ধরনের কাগজ সরকারের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়াই উৎপাদন করা যেত, কিছু কাগজ প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে আরও বেশি মাত্রায় সংরক্ষণের প্রয়োজন ছিল। যতটা সংরক্ষণ আই টি বি সুপারিশ করত অথবা ১৯২৫-এ সরকার অনুমতি দিতে প্রস্তুত ছিল তার থেকেও বেশি মাত্রার সংরক্ষণ ছাড়া ঐ সব রকমের কাগজ উৎপাদন সম্ভবপর ছিল না। কাজেই ভারতে উৎপন্ন কাগজের সম্ভাব্য বাজারের অর্থবহ পরিমাপের উদ্দেশ্যে অবস্থার বিচার সার্থক-ভাবে করতে হবে। আই টি বি তার হিসাবে ভারতীয় কাগজের উৎপাদনকে সংরক্ষিত কাগজ অথবা কাগজ ও পেস্ট বোর্ডের মোট আমদানির সঙ্গে তুলনা করেছিল।[৫৫] পরবর্তী দুটির কোনো পরিমাণই বর্তমান পরিস্থিতিতে শিল্পের সম্ভাব্য চাহিদা নির্দেশ করবে না। একদিকে সংরক্ষিত কাগজের আমদানিপ্রাপ্ত সংরক্ষণ থেকে পৃথক হতে পারত বা হয়েছিল, অন্যদিকে ইতিমধ্যে যা উল্লেখ করা হয়েছে সেইমতো কিছু কাগজ বৃহৎ সরকারি অনুদান, ঋণ অথবা জামিনযোগ্য সাহায্য নিয়ে কোনো সরকারি সংস্থা অথবা কোনো বেসরকারি সংস্থার দ্বারা উৎপাদিত হতে পারত। ১৯৩৮-এ আই-টি-বি আবার অন্যান্য ধরনের কাগজ এবং সংবাদপত্র ছাপার কাগজ ছাড়া বোর্ড সহ সমস্ত ধরনের কাগজের মোট আমদানিকে তুলনার মান হিসাবে গ্রহণ করল।[৫৬] নানান ধরনের কাগজ এই মানের অন্তর্ভুক্ত হলো না, অথচ অন্যান্য ধরনের কাগজ ভারতীয় কলগুলিতে তৈরি হতে পারত এবং হতো। উৎপাদনযোগ্য কাগজের সেই পরিমাণ এবং ধরন যেহেতু নির্দিষ্ট ছিল সেহেতু কাঁচামালের ব্যবহার ও প্রস্তুত প্রণালীর হেরফের ঘটিয়ে রকমারি কাগজ উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করা হতো।[৫৭]

সারণি ১৩৮ ভাবতে কাগজ আমদানির পবিমাণ, ১৯২৩-২৪ থেকে ১৯৩৯-৪০ পর্যন্ত (টনে)

বছব	ভারতে (ব্রহ্মদেশ বাদে) কাগজের মোট আমদানি*	ভাবতে কাগজেব প্রতিযোগিতামূলক আমদানি†	ভাবতে 'সংরক্ষিত' কাগজের বেসরকারি আমদানি†
	(১)	(২)	(৩)
১৯২৩-৪	৩৫,৬১১.১	২৭,৫৪০.৩	—
১৯২৪-৫	৪৫,৪১৫.৩	৩০,১৪০.৩	২০,০০০
১৯২৫-৬	৪৪,১১৫.২	৩৩,০৯২.৭	১৭,০০০
১৯২৬-৭	৫১,৭৫৪.৬	৩৩,৬৫৩.০	১৬,৮২৬
১৯২৭-৮	৪৫,৯২১ ১	৩৮,১৯৮.১	১৮,০৯০
১৯২৮-৯	৫৯,৩৮২.৫	৪৫,৫৪৬.৬	১৯,০৬৫
১৯২৯-৩০	৬৯,১৫১ ০	৪৮,৯৫৯.০	২০,০৯৩
১৯৩০-১	৫৫,৩৬৯ ৯	৩৭,৬০৬.২	১৪,১৭৯
১৯৩১-২	৫১,৪১৫.৯	৩৪,০৮৫.৬	১২,৩৯৩
১৯৩২-৩	৫৯,৯৫৮.২	৪০,০৫৭.৫	১১,৪৯০
১৯৩৩-৪	৬১,০৬৫ ৫	৩৮,৩৬৬.৩	১৩,০০৫
১৯৩৪-৫	৬৩,৯৫০.৮	৩৮,৬৯৮.৯	১১,১৬৩
১৯৩৫-৬	৭৯,৯৪৫.২	৪৭,৮৯১.০	১২,০৯৬
১৯৩৬-৭	৭৬,৪৫১ ০	৪৫,৪৯২.২	১১,৮৪০
১৯৩৭-৩৮	১০২,৫৪২ ৩	৫৮,০০৩ ০	১৪,৭৮০
১৯৩৮-৯	৭৯,৭২৭.৭	৪৬,৩৭৫.৬	১৩,৪৭১
১৯৩৯-৪০	৭৬,৬১৯.৫	৪২,৮০৬ ৫	১৭,৫১৯

সূত্র : স্তম্ভ (১) ও (২), Gov. India, CISD : *Annual statement of the seaborne trade of British India* (প্রাসঙ্গিক বৎসরগুলির জন্যে) (কলকাতা, বার্ষিক); স্তম্ভ (৩), ITB : *Report on paper and paper pulp* (কলকাতা, ১৯৩১), পৃ. ৬-৭, ITB : *Report on paper and paper pulp* (দিল্লী, ১৯৩৮), পৃ. ৮, এবং Gov. India, CISD · *Annual statement of the seaborne trade of British India* (প্রাসঙ্গিক বৎসরগুলির জন্যে) (কলকাতা, বার্ষিক)।

* পুরনো খবরের কাগজের আমদানি মোট কাগজ আমদানির অন্তর্ভুক্ত নয়।
† ১৯৩৬-৭ পর্যন্ত ব্রহ্মদেশ সহ।

অতএব আমরা সংজ্ঞা নিরূপণ করেছি : প্রতিযোগিতামূলক আমদানির শ্রেণীভুক্ত কাগজের, যেমন মোড়কের ও লেখার কাগজ, খাম ও নিউজপ্রিন্ট বাদে ছাপার কাগজ পুরনো খবরের কাগজ বাদে অন্যান্য রকমের কাগজ এবং সরকার কর্তৃক কাগজের আমদানি। এই শ্রেণীর আমদানির পরিমাণ ও মূল্যের বাৎসরিক হিসাব কেবলমাত্র ১৯২৩-২৪ থেকে ১৯৩৪-৩৫ পর্যন্ত *Annual statements of seaborne trade* থেকে সরাসরি পাওয়া

যায়।[৫৮] আর আগেব বছরগুলির জন্যে ঐ হিসাব কয়েকটি অনুমানের ভিত্তিতে করা যেতে পারে। সময়ের ক্রমানুবর্তিত গড়ে তোলার জন্য ব্রহ্মদেশকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। একই সংরক্ষণমূলক শুল্ক ব্রহ্মদেশের ক্ষেত্রে অনুমান করে নেওয়া হয়েছিল। ভারতে কাগজের মোট ব্যবহার (পেস্ট বোর্ড, মিলবোর্ড ইত্যাদি ছাড়া) হিসাব করার জন্যে আমরা কাগজের মোট আমদানির হিসাব নিয়েছি এবং পুরনো সংবাদপত্রের আমদানি তা থেকে বাদ দিয়েছি। ফলাফল সারণি ১৩.৮ এবং ১৩.৯-এ দেওয়া হয়েছে।

আমরা সারণি ১৩.৮ ও১৩.৯ থেকে দেখি যে ১৯২৩ ও১৯২৯ সালের মধ্যে যেখানে ভারতীয় মিলগুলির উৎপাদন ৫৭ শতাংশ বেড়েছে। একই সঙ্গে ঐ সময়কালে প্রতিযোগিতামূলক কাগজের আমদানি এবং কাগজের মোট আমদানি (পুরনো সংবাদপত্র ছাড়া) বেড়েছিল যথাক্রমে ৭৮ ও ৯৪ শতাংশ। প্রতিযোগিতামূলক কাগজের আমদানি ও অন্যান্য ধরনের কাগজ আমদানির মধ্যে পরিবর্তিতার সম্পর্ক হয়ত ছিল। [বিশেষত যেসব ক্ষেত্রে যান্ত্রিক মণ্ডের শতকরা ভাগ বেশি ছিল এবং যা প্রায়শই নিউজপ্রিন্ট হিসাবে গণ্য হতো]। সেই কারণে কিছু কাগজ যা আমাদের বিবরণে প্রতিযোগিতামূলক আমদানির অর্ন্তভুক্ত হয়নি তা

সারণি ১৩.৯ ভারতে কাগজ-আমদানিব মূল্য, ১৯১২-১৩ থেকে ১৯৩৯-৪০ পর্যন্ত (সংখ্যা তথ্য টাকায়)

বছর	ভারতে প্রতিযোগিতা-মূলক কাগজের আমদানি (ব্রহ্মদেশসহ)	ব্রহ্মদেশ বাদে ভারতেব মোট কাগজ আমদানি	ব্রহ্মদেশ বাদে ভারতের মোট বেসরকারি কাগজ আমদানি	ব্রহ্মদেশ বাদে ভারতের মোট আমদানি (৪) = (২)+(৩)
	(১)	(২)	(৩)	(৪)
১৯১২-১৩	৮,৮২৫,৭৪৮	১০,৪২২,৬১৫	৪৩০,৫৯০	১০,৮৫৩,২০৫
১৯১৩-১৪	১০,০২৮,৯৩০	১১,৫২১,৮১৫	৬৩৭,৯৮০	১২,১৫৯,৭৯৫
১৯১৪-১৫	৭,৯১২,১৫৪	৯,০১১,১৩০	৪৫১,৩২০	৯,৪৬২,৪৫০
১৯১৫-১৬	৮,৭৯৭,৭৬৯	১০,৩০৫,০৭৫	৪৫৮,২৯৫	১০,৭৬৩,৩৭০
১৯১৬-১৭	১৪,৪০৩,৩২৬	১৭,৪৭৮,৭০৫	৫৯৮,২৬০	১৮,০৭৬,৯৬৫
১৯১৭-১৮	১২,৬১৬,৬৭৫	১৫,৭৩৬,৬৯৫	৮৫০,৯৮০	১৬,৫৮৭,৬৭৫
১৯১৮-১৯	১৪,৯৪৫,৬৩০	১৮,৭৭০,৮৫০	৭৯৭,০৭০	১৯,৫৬৭,৯২০
১৯১৯-২০	১৩,৩৩৯,৯৯০	১৫,০৭৫,৫৩৩	৯৩৩,১৬০	১৬,০০৮,৬৯৩
১৯২০-২১	৪৭,২৪১,৫৯০	৫৫,৬৩৮,৩২৪	৯৬৩,০৩০	৫৬,৬০১,৩৫৪
১৯২১-২২	১৪,৮৪৪,৪২০	১৫,১৯৫,৯৭৬	২,১৫৩,৫৬৯	১৭,৩৪৯,৫৪৫
১৯২২-২৩	১৭,৮১৬,৯৭১	২০,০৯২,৫৬৪	৮৯৯,৪৬৪	২০,৯৯২,০২৮
১৯২৩-২৪	১৭,০৮৩,২০১	১৮,৭৪৯,২৭৬	১,০৬৪,৪০২	১৯,৮১৩,৬৭৮
১৯২৪-২৫	১৭,৩৭৬,০০৫	২১,৪৯৮,৩৫৭	৫১৪,০৫৬	২২,০১২,৪১৩
১৯২৫-২৬	১৭,৭১২,৬৮৮	১৯,৪৭২,৩১৪	১,৩৭৯,২৩৩	২০,৮৫১,৫৪৭
১৯২৬-২৭	১৭,৭৩৩,০৭২	২২,১০১,৮৬৯	১,৩৩৭,০১৩	২৩,৪৩৮,৮৮২
১৯২৭-২৮	১৯,৬৭৫,৭৩৩	২১,২৬৬,০৪৮	১,৬৯৯,৯১১	২২,৯২৫,৯৫৯

বছব	(১)	(২)	(৩)	(৪)
১৯২৮-২৯	২২,২৬০,৪৯৫	২৩,৬১১,৭৭৭	২,২২৪,৫৬১	২৫,৮৩৬,৩৩৮
১৯২৯-৩০	২৩,৭৯১,৪৮২	২৬,৭২৪,৮৯৫	২,৫৪০,৭৬৫	২৯,২৬৫.৬৬০
১৯৩০-৩১	১৮,০৪৭,৭৪০	২০,৪৭০,৭৯৪	২,২১৬,২৭৯	২২,৬৮৭,০৭৩
১৯৩১-৩২	১৪,৭৯৩,০৪৩	১৭,৫৪২,০৫১	১,২৩১,৭১৩	১৮,৭৭৩,৭৬৪
১৯৩২-৩৩	১৫,৪২৫,৪৬৬	১৯,১৯৬,৮০৬	৫৫৮,৪৬০	১৯,৭৫৫,২৬৬
১৯৩৩-৩৪	১৪,১৭৯,২৭৩	১৮,১৪০,২২৪	৬০৭,৬৫৬	১৮,৭৪৭,৮৮০
১৯৩৪-৩৫	১৪,১১৫,৯৬০	১৮,০২২,৩৭৪	৯০২,৪৭৮	১৮,৯২৪,৮৫১
১৯৩৫-৩৬	১৬,০৩০ ২২২	২০,৬৬৮,৪২৬	১,১৩০,৮৯২	২১,৭৯৯,৩১৮
১৯৩৬-৩৭	১৪,৭৩২,৫৪৮	১৯,২৪৬,৩৫২	৮৮১,৮৪৭	২০,১২৮,১৯৯
১৯৩৭-৩৮	২২,৪৬৫,২৮৩	৩১,২০৯,২৩৫	১,৪১০,৬৪৯	৩২,৬১৯,৮৮৪
১৯৩৮-৩৯	১৭,৯২৮,১২২	২৩,৯৭৬,০৮৭	৯৮৯,৮২২	২৪,৯৬৫,৯০৯
১৯৩৯-৪০	১৮,৭৮০,১৬৩	২৫,১০৯,৪৬৭	১,১৮৮,০৮৬	২৬,২৯৭,৫৫৩

সূত্র : India CISD *Annual statement of the seaborne trade of British India* প্রাসঙ্গিক বৎসবগুলিব জন্যে (কলকাতা, বার্ষিক)

কার্যত ভাবতীয কাগজেব প্রতিযোগী হতে পাবত। এই বর্ধিত মূল্যেব হিসাবে তুলনা কবা হলে (সাবণি ১৩ ৯ দ্রষ্টব্য) আমবা দেখি যে, যখন ভাবতীয কাগজেব উৎপাদনমূল্য ৩৩ শতাংশ বেড়েছিল তখন প্রতিযোগিতামূলক আমদানি এবং মোট আমদানি ১৯২৩-২৪ থেকে ১৯২৯-৩০ পর্যন্ত বেড়েছিল ৪৮ শতাংশ। অতএব এটা স্পষ্ট যে, ব্রহ্মদেশসহ ভাবতে প্রতিযোগী ধবনেব কাগজেব বা ব্রহ্মদেশ ব্যতিবেকে ভাবতেব সমস্ত ধবনেব কাগজেব মোট ব্যবহাব—কোনোটিব সঙ্গেই ভাবতীয মিলগুলিব মোট উৎপাদন সঙ্গতি বাখতে পাবছিল না। তাছাডা, ১৯২৩ থেকে ১৯২৯—এই বছবগুলিতে ভাবতে উৎপাদিত কাগজেব দামেব তুলনায আমদানিকৃত প্রতিযোগী কাগজেব গড দাম কমে গিযেছিল এবং সমস্ত ধবনেব কাগজেব গড দাম আমদানিকৃত কাগজ, বিশেষভাবে ভাবতীয মিলগুলিব উৎপাদিত কাগজেব তুলনায বেশ কমে গিযেছিল। ভাবতীয বাজস্ব পর্যদ যে নির্বাচনমূলক সংবক্ষণেব ব্যবস্থা সুপাবিশ কবেছিল এবং ভাবত সবকাব যা গ্রহণও কবেছিল—এই ঘটনা তাবই ফলশ্রুতি।

বাজস্ব পর্যদ তাব ১৯২৫ সালেব বিপোর্টে এই শিল্পেব সম্ভাবনা সম্পর্কে হতাশা ব্যক্ত কবেছিল। উচ্চ অথবা নিম্নমানেব—কোনো ধবনেব কাগজ উৎপাদনেব ক্ষমতা ভাবতীয় মিলগুলিব আছে কিনা—সে বিষযে সন্দেহ প্রকাশ করে বাজস্ব পর্যদ হিসাব করে দেখেছে যে, সংরক্ষণের আওতায থেকে ভাবতীয় মিলগুলি যে অতিবিক্ত চাহিদা পূরণ কবতে পারে তার পরিমাণ হলো ২০০০ টন। এই রিপোর্টে আবও বলা হয়েছে : 'যদি আমাদের হিসাব যুক্তিসঙ্গত হয় তাহলে এটা স্পষ্ট যে, অদূর ভবিষ্যতে এই শিল্পের কোনো উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ সম্ভব নয়।'[৫১] এতে এও ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, কাগজের উপর সংরক্ষণ শুল্কের হার বাডিযে টন পিছু ১৪০ টাকা করলেও নতুন কাগজকল স্থাপনে নির্বিচারে বিনিয়োগ ঘটত না। তার কাবণ:

সারণি ১৩.১০ ভারতে কাগজ-কলের যন্ত্রপাতি আমদানি, ১৯২০-১ থেকে ১৯৩৮-৯ পর্যন্ত

বছর	ব্রহ্মদেশ বাদে ভারতে কাগজ-কলের যন্ত্রপাতি আমদানি (টাকায়' ০০০)	যুক্তরাজ্য থেকে ব্রিটিশ ভারতে কাগজ তৈরির যন্ত্রপাতির টন প্রতি দাম	কাগজ তৈরির যন্ত্রপাতির দাম (৩-বছরের চলতি গড়)	কাগজে তৈরির যন্ত্রপাতির দামসূচি (১৯২০-৩ = ১০০.০০)	ভারতে কাগজ-কলের যন্ত্রপাতি আমদানির মূল্য (স্থির দামে) (টাকা '০০০)
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১৯২০-১	১,২৯৩	২৬১.২৬	—	—	—
১৯২১-২	২,২২৮	১৮৫.২০	২০৮.৯৫	১০০ ০০	২,২২৮
১৯২২-৩	১,৩৯৪	১৮০.৩৮	১৭০.৮৬	৮১.৭৭	১,৭০৫
১৯২৩-৪	৬১৬	১৪৬.৯৯	২১২.২৫	১০১.৫৮	৬০৭
১৯২৪-৫	৭২১	৩০৮.৩৯	২২৭.৮০	১০৯.০২	৬৬২
১৯২৫-৬	৩৩১	২২৭.০২	২১৪.১৩	১০২.৪৮	৩২৩
১৯২৬-৭	৬৬৯	১০৫.৯৮	১৩৯.৬৭	৬৬.৮৪	১,০০২
১৯২৭-৮	৯৪৩	৮৬.০১	১০১.৫৬	৪৮.৬০	১,৯৪১
১৯২৮-৯	৩,৪৬০	১১২.৬৯	১১৫.৩৩	৫৫.২০	৬,২৬৮
১৯২৯-৩০	৬৮৬	১৪৭.৩০	১২৩.৭৬	৫৯.২৩	১,১৫৯
১৯৩০-১	৭৩২	১১১.২৯	১১৯.২২	৫৭.০৬	১,২৮৩
১৯৩১-২	৬৩২	৯৯.০৬	১৩৫.২৯	৬৪.৭৫	৯৭৭
১৯৩২-৩	৫৩১	১৯৫.৫৩	১৩১.১১	৬২.৭৫	৮৪৭
১৯৩৩-৪	১,১০৩	৯৮.৭৫	১২৪.৭৫	৫৯.৭০	১,৮৪৭
১৯৩৪-৫	৮৯৭	১৭৯.৯৬	১২১.১১	৫৭.৯৬	১,৫৪৭
১৯৩৫-৬	৮০৬	৮৪.৬১	১৩৪.৭৩	৬৪.৪৮	১,২৫০
১৯৩৬-৭	৭৮৫	১৩৯.৬১	১০৫.৬৬	৫০.৫৭	১,৫৫৩
১৯৩৭-৮	৪,৪৮৯	৯২.৭৫	১১২.২৮	৫৩.৭৪	৮,৩৫৪
১৯৩৮-৯	২,৭৬৭	১০৪.৪৯	১১৭.০৪	৫৬.০১	৪,৯৩৯

সূত্র : স্তম্ভ (১), Gov. India, CISD : *Annual statement of the seaborne trade of British India* (প্রাসঙ্গিক বৎসরগুলির জন্যে) (কলকাতা, বার্ষিক), খণ্ড ১; স্তম্ভ (২), *Annual statement of foreign trade of the U.K.*, খণ্ড ৩।

আমরা সংরক্ষণের যে হার সুপারিশ করেছি তা বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতে কাগজ উৎপাদন লাভজনক করতে যা প্রয়োজন তার থেকে অনেক কম। অবশ্য এও হতে পারে যে, এই শুল্ক আদায়ের ফলে পাঞ্জাব পেপার মিল্‌স্ কোম্পানি সাহারানপুরের কাছে তাদের প্রস্তাবিত মিল তৈরির জন্য এবং কটকের কাছে বাঁশের মণ্ড তৈরির কারখানা স্থাপনের জন্য অন্যান্য উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহে সাহায্য করতে পারে। তা যদি হয়, তাহলে আপত্তির কোনো কারণ থাকতে পারে না, কারণ ভারতের অন্যান্য জায়গার তুলনায় এই দুটি স্থানে প্রাকৃতিক পরিবেশ সস্তায় উৎপাদন করার পক্ষে অনেক বেশি অনুকূল ছিল।[৬০]

ভাবতীয় রাজস্ব পর্ষদের ভবিষ্যদ্‌বাণী বিস্ময়করভাবে সঠিক বলে প্রমাণিত হলো—বিশেষ কবে এর নেতিবাচক পূর্বাভাষগুলির ক্ষেত্রে (যা প্রমাণ করে যে, একটি ধীরগতিসম্পন্ন অর্থনীতিতে দ্রুত বিকাশেব পূর্বাভায দেওযার থেকে মন্থর বিকাশের ভবিষ্যদ্‌বাণী কবা অনেক সহজ!) ১৯২৯-এব আগে পাঞ্জাব পেপাব মিলস্ কোম্পানি কাজ শুরু করেনি এবং তারপব পর্যাপ্ত মূলধন অভাবে শুরুর নয় মসেব মধ্যেই বন্ধও হয়ে যায়। রাজামুন্দ্রি-তে অন্ধ্র পেপার মিলস্—যা ১৯২৪-এ অংশত নির্মিত হয়েছিল-খাপছাড়াভাবে কাজ করছিল।[৬১] উড়িষ্যার প্রাকৃতিক সম্ভার ব্যবহার কবাব উদ্দেশ্যে ওরিয়েন্ট পেপার মিলস্-এব প্রতিষ্ঠা ১৯৩৮-এব আগে সম্ভব হযে নি। দেশজ মণ্ড উৎপাদনে শুল্ক সংরক্ষণ মঞ্জুর কবা বাঁশ থেকে কাগজ উৎপাদনে অনুদানেব মাধ্যমে সাহায্য দেওয়াব ক্ষেত্রে ভারত সরকারের ব্যর্থতার ফলে বিদেশ থেকে মণ্ড আমদানিব পবিমাণ বেড়ে গিয়েছিল।

সাবণি ১৩.১১ ভাবতীয কাগজ কলগুলিব উৎপাদনেব পরিমাণ ও মূল্য, ১৯০০ থেকে ১৯৩৯

বছব	পবিমাণ (টন)	মূল্য (টাকা)	বছর	পরিমাণ (টন)	মূল্য (টাকা)
১৯০০	২০,৫০৯	৬,২৫১,৭৪৮	১৯২০	২৯,৩৬৩	২২,২৭৫,৯০২
১৯০১	২০,৮৫৪	৬,৫৮৩,৭২৪	১৯২১	২৮,৬৮৯	২৩,০৬৯,৯৯৬
১৯০২	২০,৮২৮	৬,৪৩৮,৩১৯	১৯২২	২৩,৯২৮	১৫,০৪৭,৪৫৬
১৯০৩	১৯,৪৭৯	৫,৯১৪,৭৯৯	১৯২৩	২৫,৯৭০	১৪,০৫৬,৮০১
১৯০৪	২০,১৩৩	৬,১৪৯,৪৪৬	১৯২৪	২৫,৬৭০	১৩,৬১২,৯১২
১৯০৫	১৯,৭০৮	৫,১৮৬,৭২৯	১৯২৫	২৮,৫৯৬	১৪,১৭৩,৭৪৭
১৯০৬	২১,১৯৮	৬,৩১০,৯৪০	১৯২৬	৩২,১৪৪	১৫,৮৩০,১৯২
১৯০৭	২৪,৬৫০	৭,২৯০,৩৮৫	১৯২৭	৩৩,৯৪৩	১৬,৪৯৮,৬১২
১৯০৮	২৫,৩৬৯	৭,৫৮৭,২৬৭	১৯২৮	৩৮,১৪২	১৮,২৩৩,৭৬৭
১৯০৯	২৫,৪০৯	৭,৯১১,৯৪৩	১৯২৯	৪০,৭৮৭	১৮,৭০০,৯৮৪
১৯১০	২৬,৩৪০	৮,১৫১,৫৩৭	১৯৩০	৩৯,৮১৭	১৭,৪৩১,২৬৬
১৯১১	২৬,৫০০	৮,০০৪,৪৮২	১৯৩১	৪০,৭১৪	১৮,৫৪৯,৪৯২
১৯১২	২৬,৯০০	৭,৭০৬,০০০	১৯৩২	৪০,৬০৬	১৮,৮০৯,২৪৪
১৯১৩	২৭,১০০	৮,০৩৭,০০০	১৯৩৩	৪৩,৪৪৩	১৮,০২৬,৯০৭
১৯১৪	২৮,৭০০	৮,২১২,০০০	১৯৩৪	৪৪,৫০৫	১৭,২০১,৮২১
১৯১৫	৩০,৪০০	৮,৯৬২,০০০	১৯৩৫	৪৭,৬১৯	১৯,০৬৪,৭০৮
১৯১৬	৩১,৯২২	১২,৪৮৫,০০০	১৯৩৬	৪৮,৪৮৬	১৯,৩০২,৩৫৬
১৯১৭	৩১,৯০০	১৮,৭৮৬,০০০	১৯৩৭	৫৭,০৫০	২৪,৯৩১,৪৬১
১৯১৮	৩১,৪০০	২১,১১৮,০০০	১৯৩৮	৬০,৮০৩	২৪,৭৭৭,২৩৭
১৯১৯	৩০,৯০০	২০,৯৪৩,০০০	১৯৩৯	৭৩,১৩৮	৩১,১৩২,৫২৬

উৎস : Gov. India, CISD : *Statistics of British India* [পরবর্তীকালে, *Statistical abstracts for British India*] প্রয়োজনীয় বৎসরগুলি জন্যে (কলকাতা, বার্ষিক)।

এই সব ঘটনার প্রতিফলন কাগজকলের যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল? সারণি ১৩.১০ থেকে এর আংশিক উত্তর পাওয়া যাবে। ঐ সারণি থেকে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে, কাগজ কলের যন্ত্রপাতির ওজনভিত্তিক দামে বছরে বছরে অনেক ওঠানামা হয়েছে। এমনকী তিনবছরের দামের চলমান গড় ধরলেও দামের সিরিজে অনেক ওঠানামা থেকে যায়। তাছাড়া যন্ত্রপাতি আমদানির ধরনও ছিল বৈচিত্র্যময়, বিশেষ করে যখন মিলগুলিতে সাবাই ঘাসের বদলে কাঁচামাল হিসাবে আমদানিকৃত মণ্ডের ব্যবহার শুরু হলো এবং ১৯৩১-এর পর পুনরায় ঘাস বা বাঁশের মণ্ডের ব্যবহার চালু হলো। বাঁশের মণ্ড ব্যবহারেব জন্য নতুন ধরনের যন্ত্রপাতিরও প্রয়োজন দেখা দিল।[৬২] অবশ্য এটা কিছুটা স্বস্তির বিষয় যে, স্থির দামে কাগজ কলের যন্ত্রপাতির আমদানির সর্বোচ্চ মাত্রার সঙ্গে চালু দামে যন্ত্রপাতির আমদানির মধ্যে একটা সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। ১৯২১-২-এ আমদানি বাড়লেও ১৯২৮-৯ এ তা আরও উচ্চতর স্তরে পৌঁছয় এবং ১৯৩৭-৩৮ এ আমদানির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৮-৩৯-এ আমদানির মাত্রা একমাত্র ১৯২৮-২৯ ও ১৯৩৭-৩৮ সাল বাদ দিয়ে অন্যান্য সমস্ত বছরের আমদানিকে ছাড়িয়ে যায়। আগের অধ্যায়গুলিতে আমাদের বিশ্লেষণের সঙ্গে এই তথ্যের মিল আছে। কেবলমাত্র ১৯২৮-২৯-এ কাগজ কলের যন্ত্রপাতির আমদানির অত্যাধিক ঊর্ধ্বগতিই বিস্ময়কর; ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় যে, (ক) ১৯২৫-২৬-এব পর থেকে অগ্রণী কাগজকলগুলি যে উল্লেখযোগ্য মুনাফা অর্জন করতে শুরু করে,[৬৩] তার ফলে মিলগুলি উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রাথমিক শর্ত হিসাবে বাঁশ উৎপাদন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে উৎসাহিত হয়েছিল; (খ) পাঞ্জাব পেপাব মিলস্ কর্তৃক নতুন বিনিয়োগ; এবং (গ) প্রাথমিক ভাবে খড় থেকে 'ক্র্যাপ্ট' বা অনুরূপ কাগজ তৈরির জন্য পরিকল্পিত অন্ধ্র পেপাব মিলসের বাঁশ থেকে কাগজ তৈরির অনুকূলে প্রয়েজনীয় বিন্যাসের প্রচেষ্টা।[৬৪]

১৯৩১ সালের পরবর্তীকালের বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা এই অধ্যায়ের অন্যান্য বিভাগে কবা হয়েছে। দেখা যাবে (সারণি ১৩.৮, ১৩.৯ ও ১৩.১১ দ্রষ্টব্য) যে, ১৯৩১ থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে আমদানি বৃদ্ধির হার ভারতীয় মিলের উৎপাদন বৃদ্ধির হারের তুলনায় বেশি ছিল না (ওজন বা মূল্যের নিরিখে)। উপরন্তু কাগজ-কল ব্যবহৃত মণ্ডের আমদানি লক্ষ্যণীয়ভাবে কমে গিয়েছিল। সুতরাং ১৯৩১-এ উঁচু হারে শুল্ক আরোপ ও দেশীয় মণ্ড উৎপাদন সংরক্ষণের নীতি আমদানি বৃদ্ধি রোধ করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু কাগজ শিল্পে ব্যাপক বিনিয়োগের পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্যে বিশ্ববাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন এবং ভারতীয় শিল্পোৎপাদনের সম্যক বৃদ্ধির অপেক্ষায় থাকতে হয়েছিল। শিক্ষার প্রসারের দ্বারা কাগজের চাহিদা বৃদ্ধি এবং ভারতীয় উদ্যোক্তাদের আর্থিক ক্ষমতার বিকাশ না ঘটা পর্যন্ত কাগজ শিল্পের তেমন উন্নতি ঘটেনি। ইতিমধ্যে কিছু নতুন ইউনিট স্থাপিত হয়েছিল নানান ধরনের কাগজ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে। উৎপাদনের এই ইউনিটগুলি আগে শুল্ক সংরক্ষণের কোনো রকম সুযোগ পায়নি। যেমন, ক্র্যাফ্‌ট্‌ কাগজের আমদানি ১৯৩৫-৩৬-এ ছিল ৯,৫৪৪ টন, ১৯৩৭-৩৮-এ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১৩,৮০৫ টনে। ওরিয়েন্ট পেপার মিল্‌স্ ৬০০০ টন উৎপাদনের পরিকল্পনা করছিল এবং ক্রাফ্‌ট্‌ কাগজের ক্ষেত্রে শুল্ক সংরক্ষণের আবেদন জানিয়েছিল।[৬৫] আই টি বি এই আবেদন নাকচ করে। অজুহাত ছিল, ঐ ধরনের কাগজ উপযুক্ত মানে উৎপাদন করা এবং যুক্তিসঙ্গত দামে বিক্রয় করা ভারতীয় মিলের পক্ষে সম্ভবপর হবে না।[৬৬] আই টি বি-র এই মতে ভারত সরকার সায় দিয়েছিল। কিন্তু সরকারি

নীতি থেকে উদ্ভূত বিন্দু সমস্যার সমাধান পাওয়া গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আসন্ন পরিস্থিতি থেকে।

প্রথম অধ্যায়ে এই অনুকল্পটি প্রস্তাবিত হয়েছে যে কোনো শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ হবে কাম্য মজুত মূলধন এবং প্রকৃত মূলধনের পরিমাণের অন্তর্গত পার্থক্যের সমান। কাগজ শিল্পের বিনিয়োগের প্রকৃতির ব্যাখ্যায় অনুকল্পটি কী ভাবে কাজে লাগে? আমরা যদি ধরে নিই যে, ভারতের মোট কাগজের ব্যবহারের পরিমাণকে কাগজ শিল্পের প্রান্তিক মূলধন-উৎপন্নের অনুপাত দিয়ে গুণ করে কাম্য মজুত মূলধনের পরিমাণ পাওয়া যায় তা হলে এই অনুকল্প নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা যায় না। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে দেখা গেছে যে, ভারতে কাগজের মোট উৎপাদন কাগজের মোট ব্যবহারের তুলনায় দ্রুতহারে বাড়ে নি এবং বিনিয়োগের পরিমাণে বাৎসরিক যে ওঠানামা ঘটেছে তা আগের ১.১ নং রেখাচিত্রের সরল ধারা অনুসরণ করেনি (১৩.১০ নং সারণিব ১ ও ৫ নং স্তম্ভ দ্রষ্টব্য)। আমাদের অনুকল্পের মধ্যে অনেক জটিল বিষয় আনা প্রয়োজন যাতে তা একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যায় রূপান্তরিত হতে পারে।

প্রথমত, কাগজ শিল্প একটি বহুমুখী উৎপাদন-শিল্প। এমন কি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেও ভারতীয় মিলগুলি নানান রকম কাগজ (খুব বিশেষ ধরনের বা তেমন মসৃণ নয়) উৎপন্ন করত। শুল্ক-সংরক্ষণের মাধ্যমে উন্নত মানের কাগজের একটি অংশের আমদানি নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল, কিন্তু শুল্ক দিয়ে আমদানি চলতে থাকল। অর্থাৎ, ভারতীয় কাগজ শিল্পে কাম্য মজুত মূলধনের পরিমাণ পরিমাপের (ক) ভারতে কাগজ ব্যবহারের একটি অংশ মাত্রকে গণ্য করতে হবে; এবং (খ) বিভিন্ন রকম কাগজের সংরক্ষণ-পূর্ব ব্যবহারের ভিত্তিতে পরিমাপ করলে মজুত মূলধনের যে পরিমাণ হিসাবে দাঁড়ায় তার তুলনায় সংরক্ষণোত্তর কাম্য মূলধনের মজুতের পরিমাণ কম হবে। তার কারণ, অসংরক্ষিত কাগজ সংরক্ষিত কাগজের পরিবর্তে ব্যবহার করা এবং অনেক রকমের আমদানিজাত কাগজের 'অসংরক্ষিত' কাগজ হিসাবে গণ্য করা।

ব্যয়-সংক্ষেপ ও অবিভাজ্যতার কারণে একটি কাগজ-কলকে বড় আয়তন (ভারতীয় মানে) অর্জন করতে হতো। যেমন, ১৯৩৭-এর পরে প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি কাগজ-কলের আটক মূলধনের পরিমাণ ৩ মিলিয়ন টাকার বেশি ছিল। অতএব কিছু পরিমাণ বিনিয়োগের অবিভাজ্যতা যে থাকবে তা ধরে নেওয়া হয়েছিল। পুরনো কাগজ-কল (ইংরেজদের দ্বারা পরিচালিত) নতুন ধরনের কাগজ (প্রধানত অসংরক্ষিত) উৎপাদনে অনিচ্ছুক ছিল এবং সেই কারণে ভারতীয় উদ্যোক্তাদেরই এগিয়ে আসতে হতো নতুন রকমের কাগজ প্রস্তুত করার কাজে। এই উদ্যোক্তাদের অপেক্ষায় থাকতে হতো উপযুক্ত সময়ের জন্যে (বিশেষত মন্দার অবসান ও উন্নতির শুরু এবং নির্বাচিত জনপ্রিয় সরকারের চেষ্টায় শিক্ষার প্রসার) সেই সময়ের আভাস পাওয়া গেল ১৯৩৭-৩৮-এ যখন কাগজ-কলে বিনিয়োগ (সারণি ১৩.১০) ত্বরান্বিত হলো।

কারিগরি দিক থেকে কিছু পরিবর্তনও কাগজ শিল্পে বিনিয়োগকে প্রভাবিত করেছিল। অল্প ব্যয়ে মণ্ড উৎপাদনের সুযোগের দিক থেকে ভারতীয় বনজ সম্পদ সমৃদ্ধ ছিল না। তাছাড়া, কাগজ-শিল্প ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি মূলধন-নিবিড় এবং এই শিল্পে বিনিয়োজিত উপকরণগুলির মধ্যে পরিবর্ত ব্যবহারও ছিল দুঃসাধ্য। সুতারং, ইয়োরোপ থেকে কাঠের

মণ্ড ও কাগজের সুলভ আমদানিকে প্রতিহত করার উপায় হিসাবে সস্তায় মণ্ড উৎপাদন অথবা মূলধনের বদলে শ্রমের ব্যবহারের মাধ্যমে কাগজ উৎপাদন সম্ভবপর ছিল না। উপরন্তু, বিশের দশকে আমদানি অপসারণোপযোগী কাগজ উৎপাদন সম্ভবপর করে তুলতে গেলে প্রধান উপকরণ সাবাই ঘাসের চাহিদা যে পরিমাণ দাঁড়াবার কথা তার তুলনায় যোগান কম ছিল। বাঁশের মণ্ডের উৎপাদন বাড়ানোই ছিল ভারতীয় উৎপাদকদের একমাত্র উপায়, এবং এই প্রক্রিয়ায় কাগজ-শিল্পে বিনিয়োগ প্রভাবিত হয়েছিল।

কাগজ-শিল্পে বিনিয়োগ মূলত নির্ভর করত কাগজের দেশীয় ভোগ-ব্যয় ও দেশীয় বিনিয়োগের পার্থক্যের উপর, আমাদের এই অনুকল্পটিকে দীর্ঘকালের প্রেক্ষাপটে যথার্থ মনে হবে উপরের বর্ণনায় উল্লিখিত সমস্যাগুলি থাকা সত্ত্বেও। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত ইয়োরোপে কাঠের মণ্ড প্রস্তুত করার প্রক্রিয়ার দ্রুত উন্নতি ঘটার ফলে কাগজ-শিল্পের পক্ষে আমদানি-পরিবর্ত উৎপাদনের প্রাথমিক প্রয়াস দুঃসাধ্য ছিল। বিশের দশকের মধ্যবর্তী সময়ে বিভিন্ন রকমের কাগজ-আমদানির উপর সংরক্ষণমূলক শুল্ক আরোপ করা হলো এবং তখন থেকে আমদানি-পরিবর্ত উৎপাদনের প্রক্রিয়া আবার চালু হলো। সাময়িকভাবে প্রক্রিয়াটি স্থগিত ছিল। সংরক্ষণমূলক শুল্ক-ব্যবস্থার ব্যাপকতার অভাব , ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থাগুলির রক্ষণশীলতা এবং কাগজ শিল্পের প্রয়োজনীয় উপকরণের দেশীয় যোগানের সমস্যা আমদানি-পরিবর্ত উৎপাদনের ক্ষেত্রে তখন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রধান শ্রেণীর কাগজ ও কাগজের মণ্ডের আমদানির উপর সংরক্ষণমূলক শুল্ক আরোপের সাথে সাথে ঐ বাধাগুলির অপসারণ ঘটতে থাকল। বাঁশ থেকে মণ্ড তৈরির তাত্ত্বিক ধারণা যথেষ্ট প্রাচীন হলেও সংরক্ষণের সুযোগ পাওয়ার আগে এই প্রক্রিয়ার প্রয়োগ ঘটেনি। সংরক্ষণোত্তরকালে বাঁশমণ্ড থেকে কাগজ প্রস্তুত হতে থাকে। এই নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার প্রধানত নতুন কাগজ কলগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু ঘাস বা অন্যান্য মণ্ড উৎপাদনের ব্যয় বেড়ে যাওয়ার সঙ্গেই সঙ্গেই পুরনো কলগুলিতেও বাঁশ-মণ্ডের ব্যবহার হতে থাকে। ইংরেজ উদ্যোক্তারা ভারতীয় বাজারের সংরক্ষিত ও অসংরক্ষিত কিছু অংশে যোগান দিতে প্রস্তুত ছিল না। বাজারের সেই সব অংশে ভাবতীয় উৎপাদকরা কাগজ সরবরাহ করতে থাকে। অর্থাৎ, কাগজ-শিল্পে মূলধনের দীর্ঘকালীন বিকাশের জন্যে দায়ী ছিল কাগজের ভারতীয় চাহিদা। চাহিদা খুব দ্রুত বাড়েনি এবং তার কারণ নিহিত ছিল ভারতের সামগ্রিক অর্থনীতি ও সমাজের নিশ্চল প্রকৃতির মধ্যে।

অনুবাদক : মনোজ কুমার সান্যাল।

টীকা

১। শ্রীরামপুরে কাগজ উৎপাদনে যন্ত্রপাতির ব্যবহার হতো কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। দ্রষ্টব্য : M.J. Cogswell, 'Paper making in India', *Industrial Handbook, 1919,* পৃ. ২৪৭। Cogswell-এর মতে ইয়োরোপীয় ধাঁচের কাগজকল প্রথম স্থাপিত হয়েছিল তাঞ্জোর জেলার ডেনমার্ক অধিকৃত ত্রাঙ্কোবার অঞ্চলে। Robert ও Fourdrinier-এর মৌলিক আবিষ্কারের প্রায় একশো বছর আগের এই মিল প্রতিষ্ঠিত হয়।

২। W.W.Hunter, *The Indian Empire : its Peoples, Hiotory and Products* (লন্ডন, ১৮৯৩), পৃ. ৭২১; G.C Eddison, *A Case Study in Industrial Development—The Growth of the Paper and Pulp Industry in India* (Centre for International Studies, M.I.T., Cambridge, Mass., 1955), পৃ. ২১৬; S.K. Sen, 'Government Purchase of Stores for India (1858-1914)' *Bengal Past and Present* , জানুয়ারি-জুন ; ১৯৬১, পৃ. ৪৭-৬৪

৩। দ্রষ্টব্য: *IIYB*, 1913, পৃ. ৪৪০

৪। দ্রষ্টব্য: Chatterjee [IPG প্রকাশনা]: *Notes*, পৃ. ৮২

৫। দ্রষ্টব্য: ITB, *Evidence (Report on paper and paper pulp)*, (কলকাতা, ১৯২৫), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪-৫৯৩; ITB, *Evidence (Report on paper and pulp)*, (দিল্লী, ১৯৩৯), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭, ২৯৫, ৩৫১-৪১৯ [বাংলার তিনটি কোম্পানির (টিটাগড়, বেঙ্গল পেপার এবং ইন্ডিয়া পেপার পাল্‌প) ও উত্তর ভারতের কুপার পেপার মিলের তুলনামূলক ইতিহাস এগুলি থেকে জানা যাবে]।

৬। দ্রষ্টব্য : ITB, *Evidence (Report on paper and paper pulp)*, (কলকাতা, ১৯২৫), ১ম খণ্ড, বিশেষ করে, পৃ. ৯০-৯১; এবং ITB,(*Report on paper and paper pulp*), (কলকাতা , ১৯২৫), পৃ. ২২।

৭। ITB, (*Report on paper and paper pulp*), (কলকাতা , ১৯২৫), পৃ. ১০৭।

৮। *Evidence (Report of IIC)*, ৩য় খণ্ড (PP 1919, XIX), পৃ. ১৪৭-এ মাদ্রাজের শিল্প অধিকর্তা C.A Innes-এর লিখিত সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য।

৯। Gov. India, CISD : *Statistical abstract for British India* (সপ্তম সংখ্যা), ১ম খণ্ড (কলকাতা, ১৯১৫)।

১০। এই প্রসঙ্গে বেঙ্গল পেপার মিল কোম্পানি লিমিটেডের ম্যানেজিং এজেন্ট, বামার লরী অ্যান্ড কোম্পানির প্রতিনিধি II. W. Carr-এ লিখিত সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য: *Evidence(Report of IIC)*, ২য় খণ্ড (PP 1919, XVIII),পৃ. ১৪০-৪১।

১১। মূল্যনীতির মধ্যে সমন্বয়ের প্রমাণ পেতে হলে দ্রষ্টব্য : ITB, *(Report on paper and paper pulp)*, (কলকাতা , ১৯২৫), পৃ. ২১; তাছাড়াও দ্রষ্টব্য Eddison, *Growth of the pulp and paper Industry in India*, পৃ. ১২৭।

১২। *Evidence (Report of Indian Fiscal Commission)* (কলকাতা, ১৯২৩), ২য় খণ্ডে দেরাদুনের Forest Research Institute-এর Forest Economist, R.S Pearson-এর মৌলিক সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য। ফিসক্যাল কমিশনের কাছে পিয়ারসন জানিয়েছিলেন যে, সাবাই ঘাসের যোগান আর বাড়ানো সম্ভব নয়। তারপরও অবশ্য কাগজ উৎপাদকরা সাবাই ঘাসের যোগানের জন্যে পাঞ্জাবের পার্বত্য এলাকাতেও গিয়েছিলেন এবং তার ফলে যোগান বেড়েওছিল।

১৩। V. Podder, *Paper Industry in India 1959* (দিল্লী, ১৯৫৯), পৃ.১৫

১৪। R.S. Pearson, 'Note on the utilization of bamboo for the manufacture of paper-pulp' । দ্রষ্টব্য: *Indian Forest Records*, ৪র্থ খণ্ড, অংশ ৫ (কলকাতা, ১৯১৩),

১৫। দ্রষ্টব্য: Podder, *Paper Industry in India*, পৃ. ১৫; এ ছাড়াও ITB, *Report on paper and paper pulp* (কলকাতা, ১৯২৫), খণ্ড, পৃ. ৪৩৭-৮এ Forest Research Institute, Dehra Dun-এর লিখিত সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য।

১৬। *Evidence* (*Report of Indian Fiscal Commission*) (কলকাতা, ১৯২৩,) ২য় খণ্ড পৃ. ৪০১-২, ৫৫২-৪-এ R.S. Pearson-এর মৌখিক সাক্ষ্য, Indian Paper Pulp Company Ltd-এর লিখিত বিবৃতি এবং Mr. Courtenay-র মৌখিক সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য। এ ছাড়াও দ্রষ্টব্য: Indian Paper Pulp Company Ltd-র লিখিত সাক্ষ্য: ITB ; *Evidence (Report on paper and paper pulp)*, (কলকাতা, ১৯২৫), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৮,৪৮০-২, ৫০৪।

১৭। দ্রষ্টব্য : ITB, *Report on paper and paper pulp* (কলকাতা, ১৯২৫), ষষ্ঠ অধ্যায়; ITB, (*Report on paper and paper pulp*), (কলকাতা, ১৯৩১), ১ম অধ্যায়।

১৮। ITB, *Report on paper and paper pulp* (কলকাতা, ১৯২৫), পৃ. ১০৪।

১৯। *ঐ*, পৃ. ১০৬।

২০। ITB, (*Report on paper and paper pulp*), (কলকাতা, ১৯৩১), পৃ. ৩০

২১। *ঐ*, পৃ. ৪।

২২। *ঐ*, পৃ. ৬-২৮।

২৩। *ঐ*, পৃ. ৬-৭।

২৪। চারটি কাগজকল, যথা টিটাগড়, বেঙ্গল, ইন্ডিয়া পেপার পাল্প এবং আপার ইন্ডিয়া কুপার-এ মোট যা কাগজ তৈরি হতো, তার মধ্যে দেশীয় কাঁচামালের সাহায্যে উৎপাদনের পরিমাণ ১৯২৪-৫-এ ছিল ১৭,১৬৯ টন এবং ১৯৩০-১-এ ছিল ১৯,৮৪৩ টন। ঐ দুই বৎসরে আমদানিকৃত কাঁচামালের সাহায্যে উৎপন্ন কাগজের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭,৯৭৬ টন ও ১৭,৫২৯ টন। অতএব ১৯২৪-৫ থেকে ১৯৩০-১- এর মধ্যে কাগজ উৎপাদনের জন্যে দেশীয় ও আমদানিকৃত উভয় ধরনের কাঁচামালের ব্যবহার সামগ্রিকভাবে বেড়ে গিয়েছিল যদিও দেশীয় ও আমদানিকৃত কাঁচামালের ব্যবহারের অনুপাত অনেক হ্রাস পেয়েছিল। দেশজ কাঁচামালের তুলনায় আমদানিকৃত কাঁচামালের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ার পেছনে আমদানির উপর শুল্ক ছাড় দেওয়া ছাড়াও আরও একটি কারণ ছিল—তা হলো: একই পরিমাণ কাগজ উৎপাদন করতে আমদানিকৃত কাঁচামালের তুলনায় দেশজ কাঁচামালের পরিমাণ প্রয়োজন হতো অনেক বেশি। ভারতীয় কাগজকলগুলিতে দেশজ কাঁচামাল বহন করে আনতে হতো অনেক দূরত্ব অতিক্রম করে; ফলে জাহাজ কাঁচামাল আমদানি করা পরিবহণ ব্যয়ের দিক থেকে তাদের পক্ষে অনেক বেশি সুবিধাজনক ছিল। দ্রষ্টব্য: ITB, *(Report on paper and paper pulp)*, (কলকাতা, ১৯৩১), সারণি ৬ ও ৭, পৃ. ১৪-১৫ ।

২৫। এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না যেহেতু ১৯৩২-এ শৈশবস্থায় সংরক্ষণের সুযোগ বাঁশমণ্ড শিল্পের দ্রুত উন্নতি ঘটায়। ঐ শিল্পের ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ফলাফল আরো অনুকূল হতে পারত যদি তা উন্নয়নের আগের পর্যায় বর্তাত। কিন্তু ১৯২৫-

এ এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সম্ভবত জোরালো আপত্তি উঠত অধিকাংশ কাগজ-উৎপাদকদের পক্ষ থেকে।

২৬। ১৯২৩-২৪-এ ইন্ডিয়া পেপার পাল্প, টিটাগর পেপার এবং বেঙ্গল পেপার মিলে (বেঙ্গল পেপার-এর ক্ষেত্রে ধরতে হবে ১৯২৩-এ) টন পিছু কাগজ তৈরির খরচ পড়ত যথাক্রমে ৪৫৭.১২ টাকা, ৫৪০.৪৮ টাকা ও ৫১৯.০৯ টাকা। ভবিষ্যতে পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতায় চললে আশা করা হয়েছিল ইন্ডিয়া পেপার পাল্পের খরচ সবচেয়ে কম হবে এবং বেঙ্গল পেপারের খরচ সবচেয়ে বেশি হবে ; যদিও ১৯২৩-৪-এব তুলনায় সব মিলগুলির ক্ষেত্রেই খরচ কমে যাবে। দ্রষ্টব্য : ITB, *Report on paper and paper pulp* (কলকাতা, ১৯৩১), পৃ. ১০৮।

২৭। যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে দুটি কাগজ কলের যন্ত্রপাতির ক্রমবর্ধমান অপচয়েব বিষয়ে Cogswell মন্তব্য করেছিলেন। দ্রষ্টব্য: Cogswell. 'Paper Making in India', পৃ. ২৪৮।

২৮। ITB, *Evidence (Report on paper and paper pulp)*, (কলকাতা, ১৯২৫), ১ম খন্ড, পৃ. ৬৮৮-৬৯২।

২৯। *ঐ*, পৃ. ৬৭২-৭৩।

৩০। ITB, *Evidence* (*Report on paper and paper pulp*) (কলকাতা, ১৯৩২), ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩১-৪ ও ৫৫৩-তে বোম্বাইয়ের Deccan Paper Mills Company Ltd-এর লিখিত সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য।

৩১। *ঐ*, পৃ. ৫৩৫।

৩২। ITB. *Evidence (Report on paper and paper pulp)*, (দিল্লী, ১৯৩৯), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬১-৪৬৪।

৩৩। ITB, *Evidence (Report on paper and paper pulp)*, (কলকাতা, ১৯২৫), ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০ ও ৭৮-৯৩। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, ১৯২৪ সালে কোম্পানিটি বৈদেশিক প্রতিযোগিতা প্রতিরোধ করতে পেরেছিল এবং বিহার ও উড়িষ্যা সরকারের বরাত ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। তবে এটা টিটাগড় এবং বেঙ্গল পেপার মিল্‌সের সঙ্গে বাজার ভাগ করে নেওয়ার ফলে সম্ভব হয়েছিল কিনা, নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। দ্রষ্টব্য : ঐ, পৃ. ১৯১ (বেঙ্গল পেপার মিলসের প্রতিনিধি, H.W. Carr-এর সাক্ষ্য)।

৩৪। ITB, *Evidence (Report on paper and paper pulp)*, (কলকাতা, ১৯৩২), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮১-৮২। প্রকৃতপক্ষে, উৎপাদনের খরচ কমে গিয়েছিল ১৯২৪ থেকে ১৯২৫-এর মধ্যে যে সময়ে উৎপাদনের পরিমাণ ১,৬৯৪ টন থেকে বেড়ে ২,৪৬৯ টন হয়েছিল।

৩৫। *ঐ*, পৃ. ৪৬৯ এবং ৪৮১।

৩৬। ITB, *Report on paper and paper-pulp* (দিল্লী, ১৯৩৮), পৃ. ১-৭।

৩৭। ইন্ডিয়া পেপার পাল্প কোম্পানির সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য : 'বাঁশের মণ্ড প্রস্তুত করার নতুন পদ্ধতির ক্ষেত্রে আমরা যে অগ্রগতি লাভ করেছি তা মূলত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলে গণ্য করতে হবে'। (ITB, *Evidence (Report on paper*

and paper pulp), (কলকাতা, ১৯৩২) ১ম খণ্ড, পৃ ২২; এছাড়াও টিটাগড় পেপার মিলসের সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য, *ঐ*, পৃ. ১৭১। ১৯৩১ সালের রাজস্ব পর্ষদ যখন অনুসন্ধান চালায় তখন বেঙ্গল পেপার মিল বাঁশের মণ্ড প্রস্তুত ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে। (*ঐ*, পৃ. ৩৯৫)। অন্যান্য মিলগুলি প্রধানত সাবাই ঘাস, র‍্যাগ, ইত্যাদি ব্যবহার করত।

৩৮। ITB, *Evidence (Report on paper and paper pulp)* (কলকাতা, ১৯৩৯), খণ্ড ১, পৃ. ১২০ ও ২৪৭-৮।

৩৯। *ঐ*, পৃ. ৩২৩ ও ৩৪৬-৭।

৪০। দ্রষ্টব্য : রোটাস ইনডাসট্রিজ-এর প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য : *ঐ*, পৃ ৩২৫।

৪১। ১৯৫৩-র ডিসেম্বরে মিলগুলির উৎপাদন ক্ষমতা কি পরিমাণ ছিল তা জানার জন্যে দেখুন : Hazari, *The Corporate Private Sector in India* এবং Eddison. *Growth of the Pulp and Paper Industry in India*, পৃ. ১১।

৪২। বনবিভাগের অফিসার ও কাগজ প্রস্তুতকারকদের মধ্যে প্রচলিত আঞ্চলিক বিভাজনের একটি ধারণা।

৪৩। শ্রী গোপাল মিল্‌সের পক্ষ থেকে দেওয়া লিখিত ও মৌখিক সাক্ষ্যের জন্যে দেখুন : ITB, *Evidence (Report on paper and paper pulp)* (দিল্লী, ১৯৩৯) খণ্ড ১, পৃ. ৪৩১-৬০। আরো দেখুন : Eddison, *Growth of the Pulp and Paper Industry in India*, পৃ. ২২৬-৮।

৪৪। ITB, *Evidence (Report on paper and paper and pulp)* (দিল্লী, ১৯৩৯), খণ্ড ১, পৃ. ৫২৭-৫৩।

৪৫। R. Balakrishna, *Industrial Development of Mysore* (ব্যাঙ্গালোর সিটি, ১৯৪০), পৃ. ২১০।

৪৬। ITB, *Evidence (Report on paper and paper pulp)* (দিল্লী, ১৯৩৯), খণ্ড ১, পৃ. ৫৮৪।

৪৭। Balakrishna, *Industrial Development of Mysore* পৃ. ৯২।

৪৮। ITB, *Evidence (Report on paper and paper pulp)* (দিল্লী, ১৯৩৯), খণ্ড ১, পৃ. ৪৬৩ ও ১২০ যথাক্রমে।

৪৯। অন্ধ্র পেপার মিল্‌স্‌, আপার ইন্ডিয়া কুপার মিল্‌স্‌, ডেকান পেপার মিল্‌স্‌ এবং গুজরাট পেপার মিল্‌স্‌ ১৯৩৮ ও ১৯৫৩ সালের মধ্যে সম্প্রসারণে সক্ষম হয়নি। দ্রষ্টব্য : Eddison, *Growth of the Pulp and paper Industry in India*, পৃ. ১১।

৫০। Cogswell, 'Paper Making in India', পৃ. ২৪৬-৫৩।

৫১। ITB, *Evidence (Report on paper and paper pulp)* (দিল্লী, ১৯৩৯), খণ্ড ১, পৃ. ৪২০। স্টার পেপার মিলস ইলেক্ট্রোলাইটিক ব্লিচিং প্ল্যান্ট গঠনের প্রকল্প নিয়েছিল, কিন্তু আই সি আই-র পরিকল্পনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার পর থেকে প্রকল্পটি বর্জন করা হয়। আই সি আই-র অধীনস্থ সংস্থা অ্যালক্যালি অ্যান্ড কেমিকেল করপোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেড (এই সংস্থার কারখানা ছিল

কলকাতাব কাছে বিষডায) উৎপাদন আবম্ভ কবে এপ্রিল ১৯৪০ থেকে। দ্রষ্টব্য ITB, *Report on the Caustic Soda and Bleaching Powder Industry* (বোম্বাই, ১৯৪৬), পৃ ৪।

৫২। ITB, *Evidence (Report on paper and paper pulp)* (কলকাতা, ১৯৩৯), খণ্ড ১, পৃ ৫৮৮ , আবো দেখুন Baldwin, *Industrial Growth in South India*, পৃ ৮৭-৯৩, বিশেষত মহীশূব কেমিক্যাল্‌স্ অ্যান্ড ফর্টিলাইজাব্‌স্-এব বাজাব এবং তাব সঙ্গে সবকাবেব সম্পর্ক অনুধাবনেব জন্যে।

৫৩। ITB, *Report on the Caustic Soda and Bleaching Powder Industry* (বোম্বাই, ১৯৪৬), পৃ ৪।

৫৪। ITB, *Report on paper and paper pulp* (দিল্লী, ১৯৩৮), Adarkar [IPG pub], *The History of the Indian Tariff*, পৃ ৫৩-৫, Gov India, CISD *Review of the trade of India in 1938 39* (দিল্লী, ১৯৩৯), ৫২-৫, এবং *Review of the trade of India in 1939-40* (দিল্লী, ১৯৪০), পৃ ৭১-৪।

৫৫। উদাহবণেব জন্যে দেখুন ITB, *Report on paper and paper pulp* (কলকাতা, ১৯৩১), পৃ ৬-৭।

৫৬। ITB, *Report on paper and paper pulp* (দিল্লী, ১৯৩৮), পৃ ৭-৯।

৫৭। দৃষ্টান্ত হিসাবে ওবিযেন্ট পেপাব মিল্‌স্-এব পবিকল্পনা উল্লেখ্য *ঐ*, পৃ ৫৮। ঐ কাগজ-কল এমনভাবে পবিকল্পিত ছিল যে ক্রাফ্‌ট কাগজেব উৎপাদনেব চেষ্টা ব্যর্থ হলে সাধাবণ কাগজ তাব পবিবর্তে প্রস্তুত কবা যাবে।

৫৮। Gov India, CISD *Annual Statements of the seaborne trade of British India* (প্রযোজনীয বৎসবগুলিব জন্যে)। কলকাতা।

৫৯। ITB *Report on paper and paper pulp* (কলকাতা, ১৯২৫), পৃ ১৫।

৬০। *ঐ*, পৃ ১০১

৬১। ITB *Report on paper and paper pulp* (কলকাতা, ১৯৩১), পৃ ৭-৮।

৬২। ১৯৩১-২ থেকে ১৯৩৬-৭ পর্যন্ত কাগজ উৎপাদনে দেশীয উপকবণ ও আমদানিজাত উপকবণ ব্যবহাবেব অনুপাতে পবিবর্তনেব জন্যে দেখুন সাবণি ১৩৩। দেশীয মণ্ডেব মোট ব্যবহাবে বাঁশেব মণ্ডেব অনুপাত ১৯২৪-৫ থেকে ১৯৩০-৩১ পর্যন্ত গডে ১৩ শতাংশ, ১৯৩১-২ এবং ১৯৩৬-৭ সালে তা দাঁডিয়েছিল যথাক্রমে ৩০ শতাংশ এবং ৫৫ শতাংশ। দ্রষ্টব্য ITB, *Report on paper and paper pulp* (কলকাতা, ১৯৩১), পৃ ১৪ এবং এই গ্রন্থেব সাবণি ১৩৪

৬৩। ITB, *Report on paper and paper pulp* (কলকাতা, ১৯৩১), পৃ ২২-৩।

৬৪। *ঐ*, পৃ ৯-১০।

৬৫। ITB, *Evidence (Report on paper and paper pulp)* (দিল্লী, ১৯৩৯), খণ্ড ১, পৃ ৩৪২।

৬৬। ITB, *Report on paper and paper pulp* (দিল্লী, ১৯৩৮), পৃ ৫৮-৯।

অনুবাদক · জয়ন্ত আচার্য ও মনোজ কুমাব সান্যাল।

১৪

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক নীতি এবং ভারতে আধুনিক শিল্পের বিস্তার

১৪.১ সাম্রাজ্যিক ব্যবস্থার অগ্রাধিকার

উপনিবেশবাদের যুগে সাম্রাজ্যবাদীদের সব চাইতে লোভনীয় পুরস্কার ছিল ভারত। সাম্রাজ্যবাদের যুগ এসে যাওয়ার পরে বিশ্ব ধনতন্ত্রের নেতৃত্ব ব্রিটেন যখন হারিয়েছে তখনও ভারতকে আঁকড়ে রেখেছে। ব্রিটেনের সাম্রাজ্যিক ব্যবস্থায় ভারতের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। এই গ্রন্থে আলোচিত যুগে, ব্রিটেনের দীর্ঘকালীন নীতির অধিকাংশই, সেই ভূমিকায় ভারতকে রেখে দেবার চেষ্টা বলে ব্যাখ্যা করা যায়। ১৯১৪ সাল পর্যন্ত পুরনো ধাঁচের ব্রিটিশ রপ্তানির—বিশেষ করে তুলোজাত কাপড় এবং কিছুটা কম হলেও ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যের বৃহত্তম বাজার ছিল ভারত। যেসব দেশের মুদ্রা বিদেশী বাজারে হার্ড কারেন্সীর মর্যাদা পেত বা রূপান্তরযোগ্য ছিল সেসব এলাকায় ভারতের রপ্তানি, বিশ্বের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এবং বিশেষ করে ব্রিটেনের আমদানি রপ্তানির এবং তজ্জনিত লেনদেনের ভারসাম্য বজায় রাখায়, গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল।[১] ভারত থেকে ব্রিটেনে উদ্বৃত্ত পাঠানোর মাধ্যম ছিল তথাকথিত 'হোম চার্জেস', অর্থাৎ ভারতে ব্রিটিশ শাসন বজায় রাখার জন্য ব্রিটেনে যে টাকা খরচ হতো তার ভার, ব্রিটিশ নাগরিকদের অর্জিত ও অধিকৃত মূলধনের মুনাফা এবং ভারতে আমদানি-রপ্তানিতে ও তার পরিবহণে লগ্নী টাকার উপর ব্রিটিশদের লাভ। ব্রিটিশ নাগরিকরা ভারতকে তাদের মুনাফার পূর্ণ বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে দেখত না। ভারতের ভূমিকা ছিল ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত স্বর্ণমান ব্যবস্থা এবং ব্রিটিশাশ্রিত শান্তিরাজ্যের (Pax Britannica) রাজনীতিক কাঠামো-যন্ত্রটাকে বজায় রাখার জন্যে প্রয়োজনীয় উদ্বৃত্তের যোগানদারের।

ভারতে ব্রিটেন প্রবর্তিত মুক্ত বাণিজ্যের নীতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ আর্থনীতিক ঐতিহাসিকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খেয়াল করেন নি যে, ভারতের এই বিশেষ অবস্থানকে বজায় রাখা হয়েছিল ভারতীয়দের অধিকাংশকে বঞ্চনা করার নীতির সাহায্যে। মরিস ডব লক্ষ্য করেছেন, 'পতাকার পেছনে যায় বাণিজ্য' প্রবচনটির অন্তর্নিহিত সত্যটি হলো নামে খোলা বাজার নীতি থাকলেও জাতীয় শাসক গোষ্ঠীর একান্ত আপন বাজার হিসাবে মূলতঃ কাজ করাটাই আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে উপনিবেশের আসল ভূমিকা।'[২] ব্রিটেনের প্রতিযোগী দেশ থেকে ভারতে উৎপাদন সামগ্রী রপ্তানি করাতে সরকারি নীতি বাধা দিত। সরকার পৃষ্ঠপোষকতা করত কেবলমাত্র ব্রিটিশ উৎপাদকদের। অব্রিটিশ উৎপাদকদের কাছ থেকে

আমদানি সম্ভবত কার্যকবীভাবে বাধা পেয়েছিল প্রচলিত মূল্যবোধের কারণে। অধিকাংশ ব্রিটিশ বাজকর্মচাবী, ব্যাঙ্কাব এবং ব্যবসায়ীদের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে অন্যদের তুলনায় ব্রিটিশ পণ্যসামগ্রী অনেক ভালো।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্যে দুর্লভ বৈদেশিক মুদ্রাব যোগানদার হিসাবে ভারতের উপযোগিতাকে বজায় বাখতে এবং ঘোষিত মুক্ত বাণিজ্যেব নীতি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে ব্রিটেনের বৃহৎ উপনিবেশগুলিব মধ্যে (অবশ্য কালো আফ্রিকা বাদে) একমাত্র ভারতকেই বাধা দেওযা হযেছিল (আমদানির উপরে বহিঃশুল্কসহ) শিল্পায়নে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার নীতি গ্রহণে। এই নীতিই কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার শিল্পায়নে মদত জুগিযেছিল।[১] এই নীতিব একটি ফল হলো ব্রিটেনের সঙ্গে বাণিজ্যে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো তথাকথিত নতুন উপনিবেশগুলির যখন সাধারণত আমদানি উদ্বৃত্ত থাকত, ভাবতেব সর্বদাই থাকত রপ্তানি উদ্বৃত্ত।[৪] এই নীতির আরও দুঃখজনক কুফল হলো আর্থিক সমৃদ্ধিব সাথে সাথে এই নতুন উপনিবেশগুলি বিদেশ থেকে ব্রিটিশ মূলধন আকর্ষণ করতে পারল কিন্তু (রেলওযেতে লগ্নীব সম্ভাব্য ব্যতিক্রম বাদে) ভারতে বিদেশী লগ্নীব প্রায় সবটাই ছিল ভাবতে ইয়োরোপীদেব অর্জিত বেতন ও মুনাফার কিয়দংশের পুনর্বিনিয়োগ।[৫]

ভারতে এই 'খোলা দরজার' নীতিকে শক্তিশালী করেছিল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বর্ণবিদ্বেষী মতাদর্শ। যাতে ব্রিটেনের বাইরে ব্রিটিশদের 'মুক্ত এবং লাভজনক কাজ পাবার' শেষ বড় জায়গাটায 'নেটিভ' ভারতীয়রা ঢুকতে না পারে তার জন্যে কাজ করত 'লাভজনক অবস্থানে' ভাবতীয়দের বাদ দেবার সরকারি নীতি, ব্যক্তিগত ব্যবসার অসাম্যধৃত কর্মপদ্ধতি এক সরকারি বেসরকারি সমস্ত সংস্থায় লিখিত নির্দেশের চেয়ে প্রভাবশালী অকথিত বর্ণবৈষম্য।[৬]

স্বভাবতই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই ১৯০৯ থেকে ১৯৩৯ ভারত সবকাবের আর্থনীতিক নীতি কাজ করেছে। সবচাইতে গুরুত্ব পেয়েছিল সাম্রাজ্যিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব রক্ষা। গ্রেট ব্রিটেনের বিশেষ কোনো শিল্পের স্বার্থ বা ভারতে ব্রিটিশ শিল্পপতিদের স্বার্থ এই সার্বিক সাম্রাজ্যিক স্থায়িত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে পরে বিবেচিত হযেছে। কীভাবে এই অগ্রাধিকার কাজ করত তার বাস্তব উদাহরণ হিসাবে উনিশ শতকের শেষে ভারতে রেলের সম্প্রসারণ আমরা আলোচনা করতে পারি। ব্রিটেনে বিশ্বাস করা হতো রেল ব্যবস্থার সম্প্রসারণের সক্রিয় নীতি শেষ পর্যন্ত ভারতে ব্রিটিশ পণ্যের বাজার বাড়াবে ; প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশদের তৈরি রেলপথের জিনিষপত্রের চাহিদা বাড়াবে এবং শেষে ভারত থেকে রপ্তানির ধারা বাড়বে এবং এইভাবে সবদিক থেকে ব্রিটিশ শিল্প ও বাণিজ্যের উপকার হবে। ফলে, বহু ব্রিটিশ রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী এই নীতির ওকালতি করেছেন। কিন্তু ভারত সরকার (বা বলতে পারা যায় ভারত সচিব) এই নীতি অনুমোদন করতে রাজি ছিলেন না, কারণ ভারত সরকারের আর্থিক ভারসাম্যের বিপদ দেখা দিলে ভারত থেকে গ্রেট ব্রিটেনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পদ পাঠানো শক্ত হতে পারে এবং সাম্রাজ্যিক বাণিজ্যিক ভারসাম্য রক্ষার (ও স্বর্ণমান বজায় রাখার) দিক থেকে এই ব্যাপারটি বিশেষভাবে জরুরি মনে করা হতো। সাধারণভাবে ১৯১৪-র আগে পর্যন্ত সাম্রাজ্যিক নীতির প্রয়োজনের সঙ্গে বড় ব্রিটিশ শিল্প যেমন তুলোজাত কাপড়, জাহাজী এবং ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প এবং ব্রিটিশ

ব্যাঙ্কগুলির স্বার্থ মিলে যেত এবং তাই ধরে নেওয়া হতো ল্যাঙ্কাশায়ারের স্বার্থ ও ব্রিটিশ স্বার্থ এক।

সাম্রাজ্যিক ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশীদারদের মধ্যে স্বার্থের এই অভিন্নতা সব সময়ে থাকে নি এবং ক্রমপরিবর্তমান আর্থনীতিক অবস্থায় তা প্রত্যাশা করাটাও ঠিক নয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক নীতির সঙ্গে ভারতে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের স্বল্পমেয়াদী স্বার্থের সংঘাত বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে। তুলোর আমদানির ওপর শুল্ক ব্রিটিশ শিল্পপতিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ভারতের তুলো কলগুলির উপকারে আসতে পারত। আমরা দেখতে পাই বিদেশ (মূলতঃ ব্রিটেন) থেকে আমদানি করা তুলোজাত পদার্থের ওপর বসানো শুল্কের প্রত্যাশিত ফলকে রোধ করার উদ্দেশ্যে ১৮৯৬ সালে ভারতীয় কারখানায় তৈরি তুলোজাত পদার্থের উপর যে অতিরিক্ত উৎপাদন শুল্ক বসলো তার প্রতিবাদে ভারতীয় কারখানা মালিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল অধিকাংশ ব্রিটিশ ব্যবসায়ী।[৭] আবার ব্রিটিশ ইঞ্জিনীয়ারিং উদ্যোগগুলো উপকৃত হতে পারত ভারত সরকারের সরকারি সামগ্রী ক্রয়নীতি আর একটু উদার হলে।[৮] ভারতের ব্রিটিশ শিল্পপতিরা বুঝতে পেরেছিল যে, রাজস্ব বিষয়ে স্বাধিকার অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতির কাজে লাগাবে, অন্তত প্রাথমিক পর্যায়ে। আমরা বার্ড এ্যান্ড কোম্পানি এবং বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স এর আর্নেস্ট কেবল (পরবর্তীকালে লর্ড কেবল) কে দেখতে পাই যে, ১৯০৪-এ ভারতের জন্যে তিনি রাজস্বিক স্বাধিকার দাবি করছেন।[৯] প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে এবং যুদ্ধচলাকালীন সময়ে ভারতীয় চিনি এবং কাগজ শিল্প প্রধানত ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং ব্রিটিশ ব্যবসায়ী ও তাদের প্রতিনিধিরা এই শিল্পগুলির জন্যে অসম শুল্কের সাহায্যে বিদেশী প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সংরক্ষণ চেয়েছিলেন।[১০]

ভারতে ইয়োরোপীয় (ব্রিটিশ) ব্যবসায়ীরা আরও ভয় পেতেন যে, ব্রিটেনভিত্তিক ব্রিটিশ বাণিজ্যপুঁজি স্থানীয় শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করবে। ন্যাশান্যাল ব্যাঙ্ক অধিগ্রহণ করার জন্যে লয়েডস্ ব্যাঙ্কের উদ্যমকে ১৯১৮ সালে ভারত সচিব নাকচ করেন এবং ভারতে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থ ভারত সচিবকে সমর্থন জানায়।[১১] কিন্তু সামগ্রিকভাবে ব্রিটিশ বণিকেরা প্রচলিত ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট ছিল, কারণ, বৈদেশিক বাণিজ্য, সংগঠিত ব্যাঙ্ক ও মূলধন যোগান, বৈদেশিক রপ্তানির প্রয়োজন মেটানো শিল্প এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাভোগী শিল্পের মোটা অংশের অংশীদার ছিল তারাই। তাদের ভয় ছিল যে সংরক্ষণের নীতি শেষ পর্যন্ত ভারতীয় উদ্যোগকে মদত দিয়ে এদেশের বাজারে ইয়োরোপীয়দের বাধ্য করতে পারে ভারতীয়দের সঙ্গে সমান জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রতিযোগিতা করতে। সাম্রাজিক ব্যবস্থায় ভারতীয় বাণিজ্যের বা আর্থিক উন্নয়নের স্বার্থ স্বভাবতই বেশি অগ্রাধিকারের দাবীদার হতে পারত না এবং সেই ব্যবস্থাকে রক্ষার ও সুষ্ঠভাবে চালানোর জন্যে ভারতীয় স্বার্থকে বলি দেওয়া যেতে পারত।

ওপরে যে কারণগুলি বিবৃত হয়েছে ১৯১৮-র আগে ভারতের শিল্প অনগ্রসরতার ব্যাখ্যার জন্যে সেগুলিই যথেষ্ট। অন্য যে ব্যাখ্যাগুলি প্রচলিত আছে তাতে ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের শোষণমূলক সম্পর্ক এবং ব্রিটিশ শাসকদের লালিত ইয়োরোপীয়দের (বিশেষ করে ব্রিটিশ জাতিসম্ভূত লোকেদের) জাত্যাভিমানজনিত ভারতীয়দের ওপর আধিপত্যকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে অধ্যাপক হাবাক্কাকের (Habakkuk) বক্তব্য উদ্ধার করা যায়:

জাপানের সঙ্গে ভারতের পার্থক্যের একটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। কেননা ভারতে শিল্পায়নের মূল শর্তগুলির অনেকটাই বর্তমান ছিল যেমন, একটি ব্যবসায়ী শ্রেণী, ব্যাঙ্ক ও পরিবহণ ব্যবস্থা এবং বাজার সামগ্রী দ্রব্যের যথেষ্ট উৎপাদন। হয়ত দেশীয় শিল্পদ্যোগীদের চরিত্র ও যোগ্যতার পার্থক্যই ছিল দুই দেশের পার্থক্যের কারণ।[১২]

আমরা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দেখেছি যে, ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসকের রাজনীতি, শাসনতান্ত্রিক ও আর্থনীতিক বিধিব্যবস্থায় ভারতীয় উদ্যোগের বিকাশ ব্যাহত করা হয়েছে এবং ১৯১৪-র আগে যে অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে দেশী উদ্যোগ বিকশিত হয়েছে, সেখানে ভারতে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের তুলনায় ভারতীয়দের শিল্পায়নে আগ্রহ বা উদ্যোগের কমতি ছিল তা বলা যায় না। বরং বলা যায় জন্মসূত্রে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের মতো বিশেষ সুবিধা তারা পায় নি, তাই ভারতীয়দের সাহস অনেক বেশি ছিল।

ভারতে শিল্পে অনগ্রসরতার হেতু হিসেবে যাঁরা সাম্রাজ্যিক আধিপত্যকে এড়িয়ে যেতে চান তাদের আরেকটি পছন্দসই ব্যাখ্যা হলো মূলধনের অভাব। এই ব্যাখ্যাও টেঁকে না কারণ মূলধনের বিকাশ শেষ পর্যন্ত বিনিয়োগের মাত্রার ওপর নির্ভর করে। আমাদের যুক্তি অনুসারে ভারতের ভূমিকা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য উদ্বৃত্ত এবং ব্রিটিশ পণ্যের জন্যে বাজার যোগানের। সুতরাং সঞ্চিত মুনাফা ও স্ফীত বেতন থেকে সম্ভাব্য বিনিয়োগ ভারতে ঘটতে পারে নি। কাজেই জনসংখ্যার তুলনায় মূলধন যোগান যদি কম হয়ে থাকে তাহলে অন্তত অংশত তা ঘটেছে সাম্রাজ্যিক ব্যবস্থার কলকাঠিতে।

বস্তুত ১৯১৪ সালের আগে দেশে তৈরি শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার বিকাশ যেভাবে রুদ্ধ হয়েছিল তার প্রেক্ষিতে চাহিদার তুলনায় মূলধনের যোগানের স্বল্পতার কোনো সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। অন্য সমস্ত অনুন্নত বা অর্ধোন্নত দেশগুলোর মতোই মূলধনের বাজার ভারতে ছিল ত্রুটিপূর্ণ এবং স্বাভাবিকভাবেই ছোট শিল্পপতিরা 'শিল্পপুঁজির' অভাবের নালিশ জানাত। কিন্তু ইয়োরোপীয় ম্যানেজিং এজেন্সি প্রতিষ্ঠান বা বড় বড় ভারতীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কেউই এই স্বল্পতার অভিযোগ করে নি।[১৩] যদিও কোনো ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ওপর প্রত্যাশিত লাভ কম হয় অবশ্যই সেক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্যে মূলধন পাওয়া যাবে না। কিন্তু উপযুক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভবের অভাবেই শিল্প-বিকাশ আটকে গিয়েছিল ব্যাপারটা তেমন নয়।[১৪] আয়ের প্রচণ্ড অসম বন্টন এবং সাধারণ মানুষের দারিদ্রের কারণে শিল্পজাত জিনিষের আভ্যন্তরীণ চাহিদা কম ছিল। শ্রমিকদের শিক্ষার মান কম থাকার দরুন, অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় উচ্চ কুশলতা-নির্ভর জিনিসপত্র তৈরি ও স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে প্রযুক্তিকে মানিয়ে নেবার খরচ অনেক বেশি হতো।[১৫] সাধারণ ক্রেতাদের জন্যে তৈরি পণ্যের বাজারের শ্লথ বিকাশ এবং দেশে তৈরি উৎপাদনযন্ত্রের জন্যে সরকারি অর্ডারের অভাব উৎপাদনসামগ্রী তৈরির শিল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনাকে বাতিল করে দিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলার বা ঠিক তার পরের সময়ে পশ্চিমী দেশগুলিতে উৎপাদন সামগ্রীর যোগান যখন কম ছিল, স্বভাবতই উৎপাদন সামগ্রীর দুর্লতার জন্যে ভারতে শিল্পোৎপাদন ব্যাহত হয়েছিল। কিন্তু দেশী বা বিদেশী উৎপাদন সামগ্রী বা কুশলতার অভাব শিল্পায়নের নিশ্চলতার যতটা না কারণ তার চাইতে বেশি তার ফলশ্রুতি বলা যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ভারতের আধুনিক কলকারখানাগুলি ছিল 'ঘেরাটোপের' অর্থকাঠামোয়। শিল্পজাত উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র ছিল মাত্র দুটি— কলকাতা এবং বোম্বাই। অধিকাংশ ব্রিটিশ ও ইয়োরোপীয় উদ্যোগ পূর্ব ভারতে নিষ্কাষী শিল্পে নিযুক্ত ছিল। সিংগাব, পার্কস ও বল্ডউইন[১৬] আলোচিত কারণে বাগিচা ও নিষ্কাষী শিল্পে নিযুক্ত বিদেশী বিনিয়োগের ফল দেশীয় জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে নি। পাট শিল্পের ক্ষেত্রে দেশী উৎপাদন বাঙলাব— মূলত আজকের পূর্ব পাকিস্থানের (অধুনাতন বাঙলাদেশের)— কৃষকদের মধ্যে কিছুটা বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্য এনেছিল ঠিকই। কিন্তু ষষ্ঠ ও অষ্টম পরিচ্ছেদে বিশদভাবে আলোচিত কারণগুলির জন্যে ইয়োরোপীয়দের হাতে বাজনীতিক ও আর্থনীতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত থাকার ফলে কোনো বড় ধরনের ভারতীয় ব্যবসাযী শ্রেণী গড়ে উঠতে পারে নি। কেবলমাত্র বম্বে ও আমেদাবাদে ভারতীয় ব্যবসায়ীবা ব্রিটিশ রাজনীতিক আধিপত্যের যুগে টিকে থাকতে পেরেছে। কিন্তু তাদেরকেও এমন কি পশ্চিম ভারতের প্রধান ব্যবসাযী গোষ্ঠী হয়ে ওঠার জন্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হযেছে।

এই একপেশে বিকাশের একটি অনুসারী ফল হলো এই যে, দেশের মধ্যে শিল্পে অগ্রসব ও অনগ্রসর অঞ্চলের একটা স্পষ্ট বিভাজন প্রকট হয়ে ওঠে। আমরা এই অধ্যায়ের পরেব অংশে দেখব যে, ১৯৩০-এর দশকে শিল্পবিকাশ স্বল্পাহারে ত্বরান্বিত হলে এই পার্থক্য খুব সামান্য পরিমাণে কমেছিল। পশ্চাদ্দৃষ্টি ব্যবহার করে বলতে লোভ হয় যে, আপাতদৃষ্টিতে ধর্মীয় কারণে ভারত বিভাগের বীজ বপন হয়েছিল ১৯১৪ সালের আগেই। কিন্তু সেই উপ্ত বীজ থেকে চারা গজাত না যদি না যেসব নেতা ভারতভাগের বিরোধী ছিলেন তাঁরা পরবর্তীকালে রাজনীতিক ও বৈষয়িক উভয়ক্ষেত্রেই ভুল নীতি অনুসরণ কবতেন।

১৪.২ প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে বৈষয়িক নীতি প্রসঙ্গে ভারতীয় মতামত

আমরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেখিয়েছি যে, আমাদের বিবেচিত সময়সীমার মধ্যে ভারতসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ব্রিটেনের সম্পর্ক এবং ভারত সরকারের বৈষয়িক নীতি দুইয়ের মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে।[১৭] ভারতের স্বার্থ সামাজিক স্বার্থের তুলনায় সব সময়েই নিম্নাধিকার পেত কিন্তু সাম্রাজ্যের অর্থব্যবস্থার সঙ্গে ভারতের বৈষয়িক কাঠামোর যোগসূত্র ক্রমশ শিথিল হয়ে গিয়েছিল। ভারতে রপ্তানির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যগুচ্ছ ছিল তুলোজাত সামগ্রী—সেই বিশেষ ক্ষেত্রে জাপান ব্রিটেনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল।[১৮] একই সময়ে ভারতীয় কারখানাগুলিও আগের তুলনায় দেশের বাজারের অধিকতর অংশের যোগান দিতে আরম্ভ করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে এবং বিশের দশকের টালমাটাল অবস্থার দরুন আন্তর্জাতিক লেনদেন ব্যবস্থার ওপর ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণের মুঠি আলগা হয়ে যায় এবং বিশ্ব ধনতন্ত্রের নেতা হিসাবে আমেরিকার উত্থান ঘটে। এই দেশীয় ও বিশ্বব্যাপী আর্থনীতিক পরিবর্তনের মাঝে ভারতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে মৌলিক রাজনীতিক পরিবর্তনের জন্যে আন্দোলন বেগবান হয়। এই অবস্থার চাপে ব্রিটিশ শাসকের উচ্চকোটির ভারতীয়দের এবং বিশেষ করে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কিছু সুযোগ দিতে বাধ্য হয়। ব্রিটেন

যেহেতু বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে ভারতের পাঁচিল দেওয়া বাজার হারাতে বাধ্য হচ্ছিল সেই জন্যে নতুন মিত্র জোগাড়ের আসল দামটা কমে আসছিল। এই নতুন মিত্রশ্রেণীর সঙ্গসুখ দীর্ঘস্থায়ী না হলেও শাসককুলকে তাদের ওপরই নির্ভর করতে হচ্ছিল।

আশ্চর্যের কথা এই যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বৈষয়িক নীতির বিষয়ে শিক্ষিত ভারতীয়ের মতো ভাবতে অনুসৃত ব্রিটিশ আর্থনীতিক নীতির তুলনায় খুব একটা এগিয়ে ছিল না। রাণাডের পর কোনো ভারতীয় লেখকই শিল্পের জন্যে আরও বেশি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের আওতায় শিল্পায়নের দাবি তাঁর চেয়ে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে খাড়া করেন নি। ব্রিটেনের মূল প্রতিদ্বন্দ্বীরা— প্রাশিয়া, ফ্রান্স, আমেরিকা ও জাপান শিল্পায়নের রাস্তায় যখন যাত্রা শুরু করেছিল তখন যেসব প্রশাসনিক বা আর্থনীতিক ব্যবস্থা শিল্পায়নের পক্ষে যথেষ্ট হতে পারত তা অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলি অনেকটা এগিয়ে যাবার পর যথেষ্ট ছিল না। তাছাড়া বিশের দশকের মন্দার সময়টা ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিল্পায়নের জন্যে শুভ মুহূর্ত ছিল না। ভারতের অনগ্রসর এলাকাও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের সমস্যা কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে, অনেক বেশি সুষমভাবে আয়ের পুনর্বণ্টন করলে এবং সমাজের সকল শ্রেণীর জন্যে বিকাশের রাস্তা খুলে দিলেই সমাধান করা যেত। কিন্তু ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ইতিমধ্যেই চীনের সঙ্গে সুতো ও আফিম ব্যবসায়ে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্রয়সামগ্রীর যোগানের আকালের সময়ে মুনাফার স্বাদ পেয়েছিল এবং তারা মুক্ত উদ্যোগের নিরাপদ জায়গাটি ছাড়তে অনিচ্ছুক ছিল। আর্থনীতিক ও সামাজিক নীতির প্রশ্নে, ব্যবসায়ীদের নেতৃত্বকে বলিষ্ঠভাবে চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্যে সমাজের কোনো অংশই উঠে আসে নি। ফলে বৈষয়িক নীতির প্রশ্নে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মত এবং মুখর জনমত প্রায়শই সাবধান হয়ে চলার পক্ষে ছিল।

ব্রিটিশ শাসকেব কাছে তখন সাবধানতাব অর্থ ছিল আর্থনীতিক রক্ষণশীলতা এবং ভাবতীয ব্যবসাযীবা তা মেনে নিযেছিল। ভাবতীয ছাঁটাই কমিটিতে অনেক ভারতীয় সদস্য ছিল এবং ভযাবহভাবে ছাঁটাইয়েব প্রস্তাবে ব্রিটিশ সহযোগীদের তুলনায় তাদের উৎসাহ কিছু কম ছিল না। বিশের দশকে বহিঃশুল্কেব নীতির হোঁচট খাওয়া, ধীরগতি ভারতীয় ব্যবসায়ীদেব সমালোচনাপ্রবণ করে তুলেছিল, টাকাব বাহ্যিক মূল্য ১ শিলিং ৬ পেনীতে বেঁধে রাখার জন্যে যে ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হযেছিল এবং তার ফলে যে মুদ্রাসংকোচ ঘটেছিল ব্যবসায়ীবা সেই নীতিরও সমালোচনা করতেন। কিন্তু তাদের মতামত এই বাণিজ্যিকতন্ত্রের (mercantilism) সবলীকরণেব ওপরে উঠতে পারে নি। ১৯২৫-এর দশকে ভারতে শিল্পায়নের মূল বাধাগুলি দূর করার জন্যে প্রয়োজন ছিল সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার কাঠামো। ভারত সরকার কোনো অবস্থাতেই এই বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে উৎসাহ দিতে পারত না এবং ভারতীয় পুঁজিপতিরাও গোটা সমাজ মণ্ডলীকে জাগ্রত করে তোলার ঝুঁকি নিতে পারত না। কাজেই তারা বহিঃশুল্ক সুরক্ষার দাবির মধ্যে নিজেদের গুটিয়ে রেখেছিল, কারণ, স্বল্পকালীন হিসাবে এটাই তাদের পক্ষে লাভজনক ছিল এবং তদানীন্তন ভারত সরকারকে চাপ দিয়ে তা আদায় করা সম্ভাব্যও ছিল। বিশের দশকের শুরুতে চালু হওয়া এই রীতি ত্রিশের দশকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, অন্যান্য সমস্ত সরকারি কর্মকাণ্ড বাদ দিয়ে বহিঃশুল্কদত্ত সুরক্ষার কাঠামোর মধ্যে অনুমোদিত বিষয়েই শিল্পের বিকাশ সীমাবদ্ধ হয়ে উঠল।[১৯] ত্রিশের

দশকের মন্দাবস্থায় এই নীতির ফলে সীমিত শিল্পায়ন ঘটল তুলনামূলকভাবে কিন্তু শিল্পোন্নতি ছিটমহলের সঙ্গে পশ্চাৎপদ বিশাল অঞ্চলের এবং সম্পন্ন কারবারী গোষ্ঠীগুলির বৈষম্য আরও বেড়ে গেল।

বহিঃশুল্কের বাজাররক্ষা নীতির বিরোধিতা করেছিলেন পিছিয়ে থাকা প্রদেশগুলির অনেক প্রতিনিধি এবং অনেক ভূস্বামী। চমনলাল বা এন.এম. যোশীর মতো যাঁরা শিল্পশ্রমিকদের প্রতিনিধি হিসাবে আইনসভায় এসেছিলেন তাঁরাও দাবি জানিয়েছিলেন যে, বহিঃশুল্কদত্ত সুরক্ষার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হবে। কিন্তু বৃহত্তর অর্থে বৈষয়িক নীতিকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা শ্রমিক প্রতিনিধিদের প্রায় ছিলই না। শিল্পে শুল্ক সুরক্ষার বিরুদ্ধে ভূস্বামী বা কৃষিপ্রধান প্রদেশগুলোর আপত্তি থাকবে তা সহজেই বোঝাই যায় কারণ এর ফলে কৃষিকর্ম থেকে শিল্পপতিদের এবং শিল্পায়িত শহরাঞ্চলের দিকে (এবং কৃষিতে নিযুক্ত মালিক ও শ্রমিক বিপক্ষে) আয়ের পুর্নবন্টন হয়েছিল। কিন্তু ষষ্ঠ এবং দ্বাদশ পরিচ্ছেদে আমরা শুল্ক সুরক্ষার বিরুদ্ধে ভূস্বামী ও পুঁজিবাদী কৃষকদের বিরোধিতা চূড়ান্ত রূপ নেয় নি কারণ তারা প্রয়শঃই শিল্পে টাকা বিনিয়োগ করত এবং মন্দার সময়ে কৃষিজাত কাঁচামাল-নির্ভর শিল্পে শুল্ক সুরক্ষা ঐ কাঁচামাল উৎপাদক (বা তার সঙ্গে জড়িত স্বার্থগুলির) উপকারে আসত।

১৯৩০-এর বৈভবিক মন্দার সময়ে বেশি করে রাজনীতিকরা ও লেখকেরা আর্থনীতিক পরিকল্পনা সম্পর্কে বলতে ও লিখতে আরম্ভ করলেন। সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে একটা জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি পর্যন্ত তৈরি করে ফেলল। কিন্তু পরিকল্পনা সম্পর্কে অধিকাংশ আলোচনাতেই মূলতঃ ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এবং ব্রিটিশ বা অন্য বিদেশী পুঁজিপতিদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করার কথা ধরে নেওয়া হতো।[১] পরিকল্পনা কথাটা শিথিল অর্থে ব্যবহার হতো এবং আধুনিক তুরস্ক বা বিসমার্কের প্রাশিয়াব এটাটিসমে (etatisme) বা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত উৎপাদনের সঙ্গে এক করে দেখা হতো, সমাজতান্ত্রিক নীতির ওপর ভিত্তি করে গোটা উৎপাদন ব্যবস্থার যুক্তিসঙ্গত পুনর্গঠন হিসেবে নয়। জাতীয়তাবাদী দল কংগ্রেসের উচ্চতম আকাঙ্ক্ষার প্রয়াস জাতীয় পরিকল্পনা কমিটিতে সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট ঘেঁষা লোকেদের সঙ্গে বৃহৎ পুঁজির প্রতিনিধিরাও ছিলেন। এই প্রয়াসের সবচাইতে উৎসাহী এবং প্রভাবশালী সংগঠক জওহরলাল নেহেরুর ভাষায় কমিটির আলোচনাগুলিতে 'অবাস্তবতার হাওয়া' বইত।[১১]

কাজেই বাস্তবিকপক্ষে সমস্ত দিক থেকেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক ব্যবস্থার মূল অনুমিতিগুলি—পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা, সব দেশের পুঁজিপতিদের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, আমূল সমাজ পরিবর্তনকে এড়িয়ে যাওয়া এবং সম্পত্তির মৌলিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা—এগুলির মধ্যেই ভারতীয় অর্থশাস্ত্রবিদ ও রাজনীতিকরা বন্দী ছিলেন। এই মূল অনুমিতিগুলিকে কার্যকরীভাবে চ্যালেঞ্জ জানানোর কোনো শক্তিশালী সামাজিক শক্তি গড়ে ওঠে নি। প্রধান ভারতীয় পুঁজিপতি গোষ্ঠীগুলি যে ক্ষুদ্রকায় ধনতন্ত্র গড়ে তুলেছিল তার বিরুদ্ধে কিছুটা একমাত্র জোরালো চ্যালেঞ্জ ছিল বিচ্ছিন্নতাবাদের—ভারতের মুসলমানদের নামে পৃথক রাষ্ট্রের দাবি জানিয়েছিল মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগ যে শেষ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী নেতাদের ওপর দেশবিভাগ চাপিয়ে দিতে পেরেছিল তার থেকে বোঝা

যায় যে, নবজাত পরনির্ভর পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে কত অর্ন্তদ্বন্দ্ব ছিল। আর অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী ও মুসলিম লীগ নেতার মূল্যবোধ কত সংকীর্ণ ছিল তারও সাক্ষ্য মেলে এর থেকে।

১৪.৩ আলাদা পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবির পেছনে কার্যকরী কয়েকটি উপাদান

যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পরিণতি ভারতবিভাগে তার শেকড়গুলি বিচিত্র ও সর্পিল। ধার্মিক হিন্দু এবং ধার্মিক মুসলমানদের মধ্যে জগৎ সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গির বিরাট পার্থক্য ছিল। হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথার নিরন্তর দলনের ফলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য আরও বেড়ে গিয়েছিল। বিশের শতকের শুরু থেকে বিরাটাকারে জাতীয় আন্দোলনের বিকাশে ভারতে তাদের নিজেদের অবস্থানটা বদলে গেছে মনে করে ব্রিটিশ শাসকেরা সচেতনভাবে বিভেদ ও শাসনের নীতি প্রয়োগ করেছিল। প্রথম যুগের অনেক জাতীয়তাবাদী নেতাদের—যাঁদের মধ্যে অনেক বিপ্লবীও ছিলেন, মুসলমানদ্বেষী মনোভাবের মধ্যেই বিভেদজনক প্রবণতা ছিল (এই মুসলমানদ্বেষ অংশত ছিল ব্রিটিশ প্ররোচনায় অনেক মুসলমান নেতার রাজতোষণের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া)।[২২] বিভেদকামী কৌশল এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী মতাদর্শ ফুলে ফেঁপে উঠতে পেরেছিল কতকগুলি বৈষয়িক অসাম্যকে অবলম্বন করে। এই অসাম্য ছিল (ক) অপেক্ষাকৃত অগ্রসর ও অনগ্রসর জেলার মধ্যে (বিশেষ করে পূর্ব বাংলা এবং পাঞ্জাবের অনগ্রসর জেলা মুসলমানপ্রধান ছিল), (খ) অসাম্য ছিল হিন্দু ব্যবসায়ী ও বৃত্তিবান গোষ্ঠী—যারা শিল্প, বাণিজ্য এবং পেশাগুলির কর্তৃত্বে ছিল, তাদের আর উচ্চকোটির মুসলমানদের মধ্যে। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিষ্ঠিত হিন্দু উচ্চ ও মধ্যবিত্তশ্রেণী নতুন গোষ্ঠীর প্রবেশের পথে যে প্রতিবন্ধকগুলি খাড়া করেছিল, সেগুলিকে আক্রমণ করার জন্যে সম্ভ্রান্ত মুসলমানরা স্বতন্ত্র ভিত্তি তৈরি করার চেষ্টা করছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি যে, ভারতে ভিন্ন ভিন্ন জমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থা বিভিন্ন অঞ্চলে চালু থাকলেও সবারই প্রবণতা হচ্ছে এক বিন্দুতে যাওয়ার, যেখানে প্রকৃত চাষীদের জমির উপরে কোনো আইনসংগত দাবিদাওয়া থাকে না। পূর্ব বাংলার অধিকাংশ কৃষক মুসলিম এবং অধিকাংশ ভূস্বামী ছিলেন হিন্দু। সুতরাং সেখানে সাম্প্রদায়িক বিরোধ হবার বীজ সুপ্ত ছিল। তিরিশের দশকে কৃষিজগতের মন্দাবস্থায় পূর্ব বাংলার পাট ও চালের অর্থব্যবস্থা বিশেষভাবে ধাক্কা খায়। যতগুলি প্রাদেশিক সরকার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ক্ষমতাসীন হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে ১৯৩৫-এর ভারতশাসন আইন অনুযায়ী অধিষ্ঠিত 'জনপ্রতিনিধি' সরকারও পড়ে, তারা কেউই চাষীদের অবস্থার উন্নতি করতে পারে নি। অতএব কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল।[২৩] ১৯৩৮ সালে বাংলায় এক ভূমি রাজস্ব কমিশন গঠন করা হয়েছিল। তারা সুপারিশ করেছিল যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাতিল করে ভাগচাষীসহ সাধারণ কৃষকদের কিছু অধিকার দেওয়া হোক। সেই সুপারিশ কাজে পরিণত করা হয় নি।[২৪] পাঞ্জাব এবং উত্তর পশ্চিম ভারতে বেনিয়াদের অধিকাংশ হিন্দু হলেও জনসংখ্যার গুরু অংশ ছিল মুসলমান। এর ফলে একদিকে মুসলমান কৃষক

এবং অন্যদিকে হিন্দু মহাজন ও বেনিয়াদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। সাধারণ কৃষকদের অবস্থা ভালো করবাব জন্যে একাধিক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হলেও অবস্থার কোনো স্থায়ী উন্নতি ঘটেনি।[২৫] ফলে, যে বাংলায় যে ক্ষুদ্র মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেণী মনে কবত ঃ হিন্দুদের আধিপত্যের কারণে ভাল চাকরি থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। তাদের অসন্তোষের সঙ্গে বিশাল কৃষকগোষ্ঠীর জনবিক্ষোভ জুড়ে গিয়েছিল।

ভারতের অন্য অংশগুলিতে শিল্পায়নের গতি যদি দ্রুত হতো তাহলে হয়ত বাজার প্রসারের আকর্ষণের জোরেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ও কৃষকদের উন্নতি ঘটতে পারত। কিন্তু উন্নয়নের গতি ছিল শ্লথ। কলকাতা এবং বোম্বাইয়ের কেন্দ্রদুটিতে যে শিল্প গড়ে উঠেছিল সেইগুলি গড়ে তোলার বৈষয়িক ভিত্তি স্পষ্টতই পূর্ববঙ্গ ও পাঞ্জাবেও ছিল। ভারতে তুলোকল শিল্পের প্রসারণ এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে পাঞ্জাব ক্রমাগতভাবে উচ্চমানের তুলো বেশি বেশি করে উৎপাদন করছিল এবং ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী যে পাট তার বস্তুত একমাত্র উৎস ছিল পূর্ববঙ্গ। তাছাড়া পাঞ্জাব এবং বাংলার আঞ্চলিক বাজারকেও সংকীর্ণ বলা চলে না। বারপত্তের মধ্যাঞ্চলের একজন সাধারণ কৃষকের তুলনায় স্বাভাবিক অবস্থায় পূর্ব বাংলার ভাগচাষীসহ একজন সাধারণ কৃষকের অবস্থা অনেক স্বচ্ছল ছিল।[২৬] সাধারণ পাঞ্জাবি কৃষকও মহাজন বেনিয়াদের অত্যাচার সত্ত্বেও ভারতের যে কোনো প্রদেশের কৃষকদের চাইতে সম্পন্ন ছিল।

ভারতের রাজনীতিক অঙ্কে মুসলমান সংখ্যাগুরু জেলাগুলির গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল বিংশ শতাব্দীর জনসংখ্যাগত পরিবর্তন। ১৮৮১ সাল থেকে ভারতের মোট জন-সংখ্যার মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যার অনুপাত বেড়ে গিয়েছে।[২৭] একমাত্র বাংলা এবং আসাম এই দুই প্রদেশে ১৯০১ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত জনসংখ্যা নিরবিচ্ছিন্নভাবে বেড়েছে। আসাম ছাড়া সমস্ত প্রদেশের মধ্যে বাংলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারই সবচাইতে বেশি। আসামের জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা বড় কারণ আবার পূর্ব বাংলা থেকে আসা প্রধানত মুসলমান কৃষকদের অনুপ্রবেশ। সারা ভারতের মধ্যে সর্বাধিক জনবহুল প্রদেশ ছিল বাংলা, ১৯০১-এ তার লোকসংখ্য ছিল চার কোটি কুড়ি লক্ষ এবং ১৯৪১-এ ছ কোটি। কাজেই বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত যদি একই থেকে থাকে তাহলেও সারা ভারতের হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানরা সংখ্যানুপাতে বেড়ে গিয়েছিল। বস্তুত লব্ধ তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, গাঙ্গেয় অঞ্চলে এ শতাব্দীর শুরুতে সংখ্যাগুরু মুসলমানদের মধ্যে জনসংখ্যাবৃদ্ধির স্বাভাবিক হার হিন্দুদের চাইতে বেশি ছিল।[২৮] সবশেষে বলা যায় যে, বিশের দশকে পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে জনসংখ্য দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেয়েছিল।[২৯] কাজেই বলা যায় যে, দেশের অন্য অংশের তুলনায় মুসলমান সংখ্যাগুরু জেলা সমন্বিত প্রদেশগুলির জন-সংখ্যা বেশি হারে বেড়েছে।

ফলে বিশের শতক এগিয়ে যাবার সাথে সাথে মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের বৈষয়িক সামাজিক এবং জনসংখ্যাগত ভিত্তি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এই আন্দোলনকে যদি আমরা আধুনিকতার বিরুদ্ধে সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতন্ত্র-বিরোধী প্রতিক্রিয়া আখ্যা দিই তাহলে এর উৎস এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হবে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে অধিকতর সংবেদনশীল অংশ বুঝেছিলেন যে, কোনো

রাজনীতিক সমাধানের গোড়াতেই হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক ও রাজনীতিক সম্পর্কের গভীর পরিবর্তন করতে হবে। তাই স্বরাজ্য দলের নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ ঘোষণা করেছিলেন : কংগ্রেস বাংলার ক্ষমতায় এলে হিন্দুর সাথে সমতা না আসা পর্যন্ত সমস্ত নতুন চাকরির শতকরা ৬০ ভাগ মুসলমানদের জন্যে সংরক্ষিত থাকবে। একই উদ্দেশ্যে কলকাতা কর্পোরেশনের চাকরিরও ৮০ শতাংশ তিনি মুসলমানদের জন্যে সংরক্ষিত রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর অসময়ে মৃত্যুর ফলে প্রস্তাবগুলি ধামাচাপা পড়ে গেল, কখনই আর সেগুলিকে সম্যকভাবে বিবেচনা করা হলো না।[৩০]

বস্তুত, জওহরলাল নেহেরুর সব বইতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পায়নের পার্থক্য মুসলমান চাষীদের উপর হিন্দু মহাজন বেনিয়াদের আর্থনীতিক আধিপত্য, তুলনামূলকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মুসলমান বুর্জোয়া শ্রেণীর এগনোর দুরূহতা ইত্যাদি প্রসঙ্গ বারংবার উত্থাপিত হয়েছে। তাঁর বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গে *(Glimpses of World Hiostory)* এমন কথাও তিনি বলেছেন যে, বাংলায় এবং সামগ্রিকভাবে ভারতে ভূস্বামী ও বেনিয়াদের দ্বারা মুসলমান তাঁতী বা রায়তদের শোষণই 'হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দুঃসম্পর্কের কারণ।'[৩১] তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি দেখাচ্ছেন যে (১৯২০ এবং ৩০-এর দশকে), সাম্প্রদায়িকতাপন্থী রাজনীতিকেরা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের কাজের জন্যে খেয়োখেয়ি করছে। তাঁর মতে এই কোন্দলের পেছনে কাজ করছিল পাঞ্জাব ও বাংলার হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে আর্থনীতিক বা শ্রেণীগত পার্থক্য কেননা হিন্দুরা ছিল অনেক বেশি ধনী, শহুরে এবং শোষকশ্রেণীর লোক। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, হিন্দু মহাসভা (একটি সাম্প্রদায়িকতাপন্থী দল) সর্বদাই বিভিন্ন প্রদেশে গ্রামীণ ঋণের বোঝা কমানোর প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এসেছে কাবণ শাহুকার ও বেনিয়ারা প্রায় সবাই ছিল হিন্দু।[৩২] ১৯৪৫-এ লিখিত ভারত সন্ধানে *(Discovery of India)* বইতে নেহেরু আলাদা করে প্রদেশগুলির মধ্যে শিল্পের বিকাশে অসামঞ্জস্য এবং এই প্রাদেশিক বিকাশের অসাম্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সাধারণ লোকের ও শিক্ষিতদের ব্যক্তিত্বের পার্থক্য আলোচনা করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, একজন বাঙালি মুসলমান পাঞ্জাবি মুসলমানের চাইতে একজন বাঙালি হিন্দুর অনেক বেশি কাছের লোক।[৩৩] তিনি এও লক্ষ্য করেছেন যে, যদিও বোম্বাই ভারতীয় মালিকানাধীন শিল্প, বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক এবং বীমা সংস্থার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল, কলকাতাতে মাড়োয়ারী ও গুজরাতিরা ব্রিটিশদের ধরব ধরব করলেও কলকাতা ছিল 'ব্রিটিশ পুঁজি ও শিল্পের প্রধান কেন্দ্র।'[৩৪]

এইসব পর্যবেক্ষণ থেকে নেহেরু কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন নি। বাজার নিয়ন্ত্রিত আর্থিক কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী, আর্থনীতিক শ্রেণী এবং বিকাশের ভিন্ন স্তরে বিরাজমান বিভিন্ন প্রদেশগুলির মধ্যে সুযোগ-সুবিধা ফারাক শুধু সংখ্যালঘুদের প্রতি সুবিচারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বা সব অঞ্চলের সুষম অগ্রগতির কথা বলে দূর করা যায় না। যে সম্প্রদায় সামাজিক এবং বৈষয়িক অসুবিধাগ্রস্ত তার এগনোর পথে কেবলমাত্র আপাতদৃশ্য আইনগত বা সামাজিক পক্ষপাতগুলিকে দূর করলেই সে সম্প্রদায় এগিয়ে যেতে পারে না। প্রতিকূল প্রাথমিক অবস্থাকে অতিক্রম করার জন্যে সামাজিক ও আর্থনীতিক সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে জোরালো পক্ষপাত এদের দিতে হবে। মুক্ত উদ্যোগের অর্থনীতিকে

সরকারি বিনিয়োগের 'যথোপযুক্ত' (fair)-র চাইতে বেশি অংশ বৈষয়িকভাবে অনগ্রসর এলাকা বা প্রদেশগুলিকে দিতে হবে কেননা ব্যক্তিগত বিনিয়োগের মধ্যে নিহিত থাকে উন্নততর অঞ্চলে সরে যাওয়ার প্রবল প্রবণতা।[৩৫]

যাইহোক, অধিকাংশ কংগ্রেস নেতাদের চিন্তায় মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের সামাজিক ও আর্থিক শিকড়গুলির স্বীকৃতি নেই। কাংগ্রেস দলের কার্যক্রম নির্ধারণ করত সুবিধাভোগী পেশাদার ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এবং মুসলমানদের বা অনগ্রসর প্রদেশগুলোর সামাজিক ও আর্থনীতিক উন্নতির জন্যে যে ধরনের ত্যাগের প্রয়োজন ছিল তার কোনো জায়গা সেই কার্যক্রমে ছিল না। অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের মতাদর্শে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও অঞ্চলগুলির অসম বিকাশের সমস্যার সুরাহার জন্যে সমাজতান্ত্রিক সমাধান অবশ্যই অচিন্ত্যনীয় ছিল। এর ফলে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে যে তথাকথিত 'সামন্ততান্ত্রিক' (আসলে বড় ভূস্বামী) শক্তিগুলি এবং আইনজীবীরা ছিল তারা আলাদা পাকিস্তান রাষ্ট্র তৈরির জন্যে লড়াইয়ের রসদ পেয়ে গেল। তাদের লড়াইয়ের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু প্রাক-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন বা সেই অর্থব্যবস্থাভিত্তিক শ্রেণীগুলি অবলুপ্ত করে মুসলমানদের অবস্থার এক সুষম উন্নতিসাধন ছিল না। আসল উদ্দেশ্য ছিল প্রতিষ্ঠিত হিন্দু ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এবং পেশাদার শ্রেণীগুলির প্রতিযোগিতার আওতা থেকে ভারতের একটা অংশকে কেটে নেওয়া যাতে মুসলমান ব্যবসায়ী শ্রেণী ফেঁপে উঠতে পারে এবং সদ্যোজায়মান মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা চাকরি পায়।[৩৬] এই প্রক্রিয়ায় অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানের কিছু মুসলিম রায়ত তাদের চাষের জমি থেকে আরেকটু স্বাচ্ছন্দের মুখ দেখেছিল কিন্তু সব চাষী এই লাভের ভাগী হতে পারে নি এবং সে লাভ স্থায়ী হয় নি। একটু খতিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে, স্বাধীনতাপূর্ব ভারতে কায়েমী ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদী বিকাশের রাস্তার বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ জেগে ওঠে তার অনেকটাই ক্ষরিত হয় দুটি পৃথক জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের লড়াইতে এবং এই উপমহাদেশে সমাজতান্ত্রিক আদলে সমাজ কাঠামোর মৌল পরিবর্তনের সংগ্রাম পিছিয়ে যায়।

আমরা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দেখেছি যে, অবিভক্ত ভারতে শিল্পদ্যোগ বৃত ব্যবসায়ীরা পশ্চিমী শিক্ষায় প্রভাবিত পেশাদার শ্রেণী থেকে আসে নি। তারা এসেছিল মহাজন ও বেনিয়া গোষ্ঠী থেকে। পাকিস্তানেও শিল্পায়নে রাষ্ট্রের মদতের সুযোগ নিয়েছিল এইসব 'বেনিয়া বংশোদ্ভূত' গোষ্ঠী যদিও তারা সবাই মুসলমান।[৩৭] ভারতের মতোই পাকিস্তানেও আর্থিক বিকাশ পুঁজিবাদী ধারাতেই হয়েছে। সেই বিকাশ যদি সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে তা হয়েছে দুরতিক্রম্য প্রাকৃতিক রসদের অভাবে নয়, সামাজিক ও রাজনীতিক উপাদানই সেই সীমা বেঁধে দিয়েছে।[৩৮] যে অর্থনীতিজ্ঞরা বৈষয়িক বিকাশে রাজনীতিক ব্যবস্থার প্রভাবকে কম গুরুত্ব দেন তাঁরা পাকিস্তানে ব্যক্তিগত বিনিয়োগের 'বিস্ফোরণ' দেখে অবাক হয়ে গেছেন। তাঁদের জন্যে আরও বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে : আন্তর্জাতিক রাজনীতিক বিবর্তন এবং আভ্যন্তরীণ সামাজিক রাজনীতিক প্রতিবন্ধকতা পাকিস্তানের পুঁজিবাদী বিকাশের পথে হয়ত আরও কাঁটা বিছিয়ে দিতে পারে।

এই পরিচ্ছদের বাকি ভাগে আমরা ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ভারতে যে সীমিত শিল্পায়ন ঘটেছিল তার কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করব।

১৪.৪ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আধুনিক শিল্পের প্রসার

১৯০০ থেকে ১৯৩৯ এর মধ্যে ভারতে মোটামুটিভাবে 'তন্তু বিপ্লব' ঘটে গিয়েছিল। তুলোজাত সামগ্রী উৎপাদনে ভারত প্রায় স্বনির্ভর হয়ে ওঠে[৩৯] এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তুলোজাত দ্রব্যের প্রধান রপ্তানিকাবকদের মধ্যে তার স্থান হয়। এই সময়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনেক নতুন শিল্প গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে ইস্পাত ও সিমেন্ট মোদ্দাকথায় উৎপাদক পণ্য শিল্প হিসেবে দেখা যায়। যদিও ১৯০০ সালের আগেই আধুনিক পরিস্রবণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে বৃহদাকার কারখানায় চিনির উৎপাদন শুরু হয়ে গিয়েছিল, তবুও বলা যায় আমাদের আলোচিত সময়সীমার দ্বিতীয় পর্যায়ের আগে এই উৎপাদন নগণ্য ছিল। আলোচিত কালসীমা যখন শেষ হয়ে আসছে তখন কিন্তু চিনির বড় কারখানাগুলি ভারতে পরিস্রুত চিনির আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাবার মতো বেড়ে উঠেছে।[৪০] বৃহৎ কারখানা হিসাবে চিহ্নিত অন্য উল্লেখযোগ্য শিল্প ছিল কাগজ ও দেশলাই তৈরির কারবার।

বৃহদায়তন কারখানার আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন সীমাবদ্ধ থাকে ভোগ্যপণ্য শিল্পে এবং মোটা দাগের উৎপাদক পণ্য শিল্পে। ১৯৩৯ সালে ভারত যন্ত্রপাতি ও মেশিন টুল (যন্ত্রাংশ) এবং রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োজনের প্রায় সবটা আমদানি করে মেটাত। ১৯৩৯ সালের মধ্যে কস্টিক সোডা এবং সালফিউরিক এ্যাসিডের মতো কিছু ভারি বাসায়নিক উৎপাদন শুরু হয়। কিন্তু সুতোকলের জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরির শিল্পের প্রকৃত সূচনা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর।[৪১] প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কিছু মোটা দাগের যন্ত্রপাতি ও মেশিন টুল তৈরি আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু কোনো রকমের সরকারি সাহায্য না পাওয়ায় এবং চাহিদার অভাবে যুদ্ধের পরেই সেসব ব্যবসা লাটে ওঠে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে শিল্পে বিনিয়োগ প্রায় একমাত্র দুটি 'গ্রন্থি'—অর্থাৎ বোম্বাই ও কলকাতায় সীমাবদ্ধ ছিল। তবে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির আমেদাবাদ তুলো কারখানার কেন্দ্র হিসেবে দ্রুত গড়ে উঠেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছুদিন পর পর্যন্ত সর্বমোট শিল্প বিনিয়োগের সিংহভাগ যেত বোম্বাই ও আমেদাবাদের তুলোর কল হুগলির পাটকলগুলিতে। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে সিমেন্ট শিল্পের উত্থান, ১৯২৩ থেকে বোম্বাইয়েব সুতো কল শিল্পে এবং ১৯২৮ থেকে বাংলার পাটশিল্পে মন্দা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশে চিনি শিল্পের উত্থান—এই সবের ফলে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও কিছু শিল্পের প্রসার ঘটে। শিল্পের এই আঞ্চলিক প্রসারে প্রধান ভূমিকা ছিল সুতি কাপড়ের কলের। ভারতে সমস্ত তুলো কারখানাতে (যান্ত্রিক) মাকু এবং তাঁতের সংখ্যা ১৯১৪ সালে ছ লক্ষ বাষট্টি হাজার ও ছিয়ানব্বই হাজার সাতশ থেকে বেড়ে ১৯৩৯ সালে যথাক্রমে এক কোটি ছ হাজার এবং দু লক্ষ দু হাজার চারশতে পৌঁছয়। বোম্বাই শহর এবং আমেদাবাদের মাকু এবং তাঁত একসঙ্গে ধরলে ১৯১৪ সালে তাদের সংখ্যা যথাক্রমে চল্লিশ লক্ষ এক হাজার এবং ছেষট্টি হাজার একশ থেকে বেড়ে ১৯৩৯ সালে চল্লিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার এবং এক লক্ষ চোদ্দ হাজার একশতে পৌঁছয়।[৪২] সুতরাং দেখা যায় তুলোকল শিল্প, বিশেষ করে তার সুতো বয়ন অংশটি বোম্বাই আমেদাবাদ কেন্দ্রের বাইরে বেশি দ্রুত প্রসারিত

হয়। এই প্রসার বিশেষ করে বেগবান হয় দিল্লী ; যুক্তপ্রদেশ (মূলত কানপুরে) এবং মাদ্রাজে (মূলত কোয়েম্বাটুর, মাদুরা এবং মাদ্রাজে)।

এই শিল্পের প্রসারে বিশেষ করে সহায়তা করেছিল নতুন কেন্দ্রগুলিতে তুলনামূলকভাবে সস্তা শ্রম এবং সস্তা জলবিদ্যুৎ-এর যোগান। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে জলবিদ্যুৎ সস্তায় পাওয়া যেত। কিন্তু সারা ভারতে বহিঃশুল্কদত্ত সুরক্ষা নীতির ফলে সৃষ্ট স্থানীয় বাজারেব উন্নয়নও এই প্রসারে সাহায্য করেছিল।[৪৩] নতুন শিল্পগুলিতে এবং নতুন উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে উদ্যোগ সম্পূর্ণভাবে না হলেও অনেকখানি এসেছিল স্থানীয় উৎস থেকে। দক্ষিণ ভারতে সাধারণ কারবারে জড়িত থাকা অনেক সম্প্রদায়ই শিল্পে চলে এসেছিল। বেনিয়াদের মধ্যে চেট্টিয়াররা সবচাইতে বিখ্যাত হলেও শিল্পদ্যোগ তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি বা তাদের নেতৃত্বেও ঘটেনি।[৪৪] গোয়ালিয়র, ভূপাল এবং ইন্দোরের মতো মধ্য ভারতের অধিকাংশ রাজ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে মাড়োয়ারী ও জৈনরাই প্রধান বেনিয়া সম্প্রদায় ছিল।[৪৫] স্বভাবতই এইসব রাজ্যের কাপড় কলগুলিতে তারা গভীরভাবে লিপ্ত ছিল। বোম্বাইয়ের তুলনায় আমেদাবাদ দ্রুততর গতিতে বেড়ে যেতে থাকল এবং ত্রিশের দশকের শেষে সেখানে (কলের) তাঁত এবং মাকুর সংখ্যা হয়ে দাঁড়াল বোম্বাইয়ের মিলগুলির দুই তৃতীয়াংশের ওপর। আমেদাবাদের পুঁজিপতিরা মূলত তুলোকলের বিকাশেই তাদের প্রধান শক্তি নিয়োজিত রাখলেও পরে তারা সিমেন্ট, চিনি, রাসায়নিক পদার্থও তাদের উদ্যোগ ছড়িয়ে দেয়। আমেদাবাদের পাশে বরোদায় তুলো কলের বিকাশে আমেদাবাদ থেকে উদ্যোগ আসতে আরম্ভ করে। তুলোজাত দ্রব্যের উৎপাদনের কেন্দ্র হিসাবে অন্যান্য প্রধান শিল্পনগরী যেমন, কোয়েম্বাটুর, কানপুর বা আমেদাবাদের তুলনায় বোম্বাই পিছিয়ে পড়লেও টাটা গোষ্ঠীর নেতৃত্বে বোম্বাইয়ের পুঁজিপতিরা লোহা ও ইস্পাত ; রাসায়নিক ও জাহাজী শিল্পের মতো অন্যান্য ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে।

উত্তর ভারতে চিনি শিল্পই সম্ভবতঃ মূলধন বিনিয়োগের প্রধানতম ক্ষেত্র ছিল। প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী গোষ্ঠী যেমন বেগ, সাদারল্যান্ড এ্যান্ড কোম্পানি এবং জুগ্গিলাল কমলাপত এবং নতুন ব্যবসায়ী গোষ্ঠী যেমন নারাঙ, ডালমিয়া, শাহু, জৈন এবং বিড়লা ব্রাদার্স-এর কাছে এই শিল্প নতুন বিনিয়োগের সুযোগ খুলে দেয়। শিল্পের এই বিস্তারে ভারতের একটি বড় অংশ প্রায় কোনো ভাগ পায় নি। এই অংশটি হলো পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—যে অংশ পরবর্তীকালে পশ্চিম পাকিস্তান নামে পরিচিত হলো।[৪৬] শিল্পায়নের বিকাশের এই অভাবের কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া মুস্কিল। প্রাকৃতিক উর্জ বা শক্তির অভাব একটি কারণে হতে পারে। এই অঞ্চলে কয়লা প্রায় ছিলই না এবং দক্ষিণ ভারতের মতো জলবিদ্যুতের বিকাশও এখানে ঘটেনি। তাছাড়া পাঞ্জাবে ও সিন্ধুপ্রদেশে সেচ ব্যবস্থা বিকাশের কল্যাণে বিশের দশকে কৃষকদের অবস্থার উন্নতি ঘটলেও তিরিশের দশকের মন্দায় (সম্ভবত বাংলার কৃষককুল ব্যতিরেকে) ভারতের অন্য অঞ্চলের কৃষকদের তুলনায় তারা অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ছিল—কেননা ভারতের অন্য অঞ্চলের তুলনায় পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের কৃষি উৎপাদনের বৃহত্তর অংশ রপ্তানি করা হতো। কৃষিতে মন্দার ফলে এই অঞ্চলের শিল্পের বাজার সংকুচিত হয়েছিল। শিল্পায়নের পথে তৃতীয় অন্তরায় ছিল, এই অঞ্চলে পশ্চিম, দক্ষিণ এবং এমন কি পূর্ব ভারতের ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলির তুলনায়

নিবিড় ও বিস্তৃত যোগাযোগ এবং মূলধন ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আঞ্চলিক উদ্যোগী গোষ্ঠীর অভাব।[৪৭] পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের শিল্পোন্নয়নের অভাব থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোনো অঞ্চলে কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধি হলেই সেখানে আপনা-আপনি শিল্প বিকাশ ঘটে না।

অবিভক্ত ভারতের দুটি বৃহত্তম শিল্পের কাঁচামাল যোগানকারী—লম্বা আঁশের প্রধান উৎপাদক পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ এবং পাটের উৎস পূর্ব বাংলার শিল্পায়নের বিকাশের অভাব, ভারতের মুসলমানদের জন্যে যারা আলাদা রাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছিল তাদের দাবির একটা বড় সোপান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাছাড়া খাল বসতি অঞ্চলের পাঞ্জাবি কৃষকের সমৃদ্ধি এবং পাঞ্জাবে ক্ষুদ্রশিল্পকে গতিশীলতা—এই দুই দিক থেকে সেখানে শিল্পোন্নয়নে রাজনীতিক হস্তক্ষেপের দাবি জোরদার হয়েছিল। বিশ এবং তিরিশের দশকে চাষীদের চাহিদা মেটানোর জন্যে পাঞ্জাবে অনেক ঢালাই কারখানা ও কামারশালা গড়ে উঠেছিল।[৪৮] এই ছোট শিল্পপতিরা অবশ্য ভারতের অন্যান্য অংশের বড় বড় পুঁজিপতিদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারত না। পাকিস্তান আলাদা রাষ্ট্র হয়ে গেলে সেখানকার শিল্পপতিরা ভারতের অন্য অঞ্চলের প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা পেল এবং স্থানীয় বাজারের সুযোগ নিয়ে তারা এগিয়ে যেতে পারল।

১৪.৫ ভারতীয় উদ্যোগ এবং শিল্পের বিকাশের দুটি পর্যায়

ভারতীয় শিল্পে ভারতীয় উদ্যোগের গুরুত্ব এবং ব্রিটিশ অর্থনীতির সঙ্গে ভারতীয় অর্থনীতির সম্পর্কের দিক থেকে বিচার করলে আমরা দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়কে দুটি পর্যাযে ভাগ করতে পারি। ১৯২৯ বা তার কাছাকাছি সময় পর্যন্ত কিছু নতুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং সিমেন্ট ও লোহা এবং ইস্পাত শিল্পের মতো নতুন শিল্প গড়ে উঠলেও ভারতীয় শিল্পে বিনিয়োগ পুরনো উদ্যোগী গোষ্ঠী এবং কেন্দ্রগুলিই নিয়ন্ত্রণ করত। ১৯১৯-২০ থেকে ১৯২১-২২ পর্যন্ত তন্তুশিল্প সম্পৃক্ত যন্ত্রপাতির মোট আমদানির তিনভাগের একভাগেব উপরই ছিল পাটশিল্পের যন্ত্রপাতির আমদানি এবং ১৯১৯-২০ থেকে ১৯২৩-২৪ সাল পর্যন্ত এই আমদানি ছিল মোট তন্তুশিল্পঘটিত যন্ত্রপাতি আমদানির এক চতুর্থাংশ ও এক তৃতীয়াংশের মাঝামাঝি। বস্তুতঃ ১৯৩০-৩১ সাল পর্যন্ত ভারতে তন্তুশিল্পঘটিত যন্ত্রপাতি আমদানির মধ্যে পাটশিল্পের যন্ত্রপাতির আমদানি সিকিভাগের নিচে কম ক্ষেত্রেই নেমেছে। কিন্তু তিরিশের দশকে এই হার $^{১}/_{৫}$ থেকে $^{১}/_{৮}$ এর মধ্যে নেমে গেছে। ১৯১৯-২০ থেকে ১৯২৩-২৪-এ আমদানি মোট শিল্পগত যন্ত্রপাতির মূল্যের একের তিন থেকে অর্ধভাগ ছিল আমদানিকৃত তন্তুশিল্পঘটিত যন্ত্রপাতি মূল্য।[৪৯]

তন্তুশিল্পঘটিত কারখানাগুলিতে বয়লার ইঞ্জিন ইত্যাদি আরও অনেক যন্ত্রপাতি ছিল যেগুলোকে তন্তুশিল্পঘটিত যন্ত্রপাতির মধ্যে ধরা হতো না। আমরা যদি সেই যন্ত্রপাতিগুলিকে যোগ করি তাহলে দেখব যে, মোট আমদানি করা যন্ত্রপাতির মধ্যে তন্তুশিল্পঘটিত যন্ত্রপাতির আমদানি ভাগ আরও বেড়ে যাবে। বিশের দশকের শেষ ভাগে এবং তিরিশের দশকে অবশ্য আমদানি করা মোট যন্ত্রপাতির তন্তুশিল্পঘটিত যন্ত্রপাতি আমদানির হার সিকিভাগের নিচেই ছিল। যদি আমরা বিভিন্ন যন্ত্রপাতির দামের হেরফের বাদ দিয়ে তন্তুশিল্পসম্পৃক্ত

যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির আমদানির 'প্রকৃত' অনুপাত দেখি তাহলে দেখব যে, তন্তুশিল্পঘটিত যন্ত্রের আমদানির অনুপাত আরও কমে গিয়েছিল কারণ সেই প্রকারের যন্ত্রপাতির দাম যত কমেছিল তার চেয়ে আরও বেশি কমেছিল চিনি শিল্প ও কাগজশিল্পের যন্ত্রপাতির দাম।[৫০]

বিশের শতকের শুরুতে তন্তুশিল্পের বিনিয়োগের অধিকতর গুরুত্বের তাৎপর্য ছিল পাটশিল্পে অধিষ্ঠিত ইয়োরোপীয় পুঁজিপতিরা এবং বোম্বাই ও আমেদাবাদে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় (ও ইয়োরোপীয়) পুঁজিপতিরা শিল্প বিনিয়োগে বড় ভূমিকা পালন করছিল। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আমরা দেখিয়েছি যে, তাব মধ্যেই নতুন ভারতীয় শিল্পগোষ্ঠী উঠতে শুরু কবেছিল। ১৯১৯ থেকে ১৯২১-এর মধ্যে বিড়লা ব্রাদার্স একটি পাটকল এবং অন্ততঃ দুটি তুলোকল প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং ১৯২৫-এর মধ্যে আরেকটি (১৯১৯-এ রেজিস্ট্রীকৃত কেশোরাম কটন মিলস্) তুলোকলের মালিক হয়েছিল। উত্তর ভারতে লালা শ্রীবাম দিল্লী ক্লথ এবং জেনারেল মিলস্‌কে কেন্দ্র করে তাঁর গোষ্ঠী গড়ে তুলেছিলেন এবং জুগ্গিলাল কমলাপত গোষ্ঠী তুলো, চিনি এবং ভেষজ তৈল শিল্পে বড়ভাবে প্রবেশ করছিল। কিন্তু তখনও স্থানীয় উদ্যোগের বিস্ফোরণ ঘটে নি; সেটা ঘটেছিল ১৯৩০-এর দশকে।

বহু দিক থেকেই বিশের দশক ছিল ভারতীয় শিল্প ধনতন্ত্রের বিকাশের জন্যে প্রতীক্ষার দশক।[৫১] প্রথমতঃ লৌহ ও ইস্পাত এবং কাগজশিল্পের জন্যে পক্ষপাতমূলক সংরক্ষণ অনুমোদিত হলেও সমস্ত ভোগ্যপণ্যশিল্পের জন্যে বহিঃশুল্ক সুরক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে ভারত সরকার বাধ্য হয়নি। দ্বিতীয়তঃ ১৯১৪ থেকে ব্রিটেন এবং ভারতের আর্থনীতিক সম্পর্কের বেশ বড় পরিবর্তন হলেও ভারত তখনও পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক ব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষার অভ্যস্ত ভূমিকা পালন করে চলছিল। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, ১৯২৯ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যে ভারতের এক কোটি নব্বই লক্ষ পাউন্ডের উদ্বৃত্ত ছিল। সেই উদ্বৃত্ত ব্যবহৃত হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যে ব্রিটেনের বিরাট ঘাটতি মেটাতে।[৫২] ভারত থেকে ব্রিটেনে বিশাল সম্পদ পাচার করার একটি পথ ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্য দেশগুলো, যেমন শ্রীলঙ্কা, মালয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যে যে উদ্বৃত্ত প্রাপ্য হতো তার হস্তান্তর।[৫৩] মূলত তুলোজাত শিল্পসামগ্রীর আমদানি কমে যাওয়ায় ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের তদানীন্তন আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ভারতের দৃশ্যমান ঘাটতির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কমে গিয়েছিল। কিন্তু টাকার অঙ্কে এই ঘাটতির পরিমাণ তখনও ছিল বিশাল। বাৎসরিক খাতে ব্রিটেনের সঙ্গে বাণিজ্যে এই প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বিশের দশকের প্রথম চার পাঁচ বছর ব্রিটেন থেকে মূলধনের আমদানি ঘটেছিল।[৫৪] ফলে বিশের দশকে কৃষিতে মন্দাবস্থা, ব্রিটেন থেকে ভারতে আমদানির উল্লেখযোগ্য হ্রাস এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক ব্যবস্থায় ভারতের উপার্জিত দৃঢ় বিদেশী মুদ্রার ভূমিকার অবনয়ন—এইসব পরিবর্তন সত্ত্বেও যুদ্ধপূর্ব বাণিজ্যে ও মূলধন আগম নির্গমের ধারা বিশেষ বদলায় নি। ভারতীয় উদ্যোগীরা আমদানির পরিবর্তের (সীমিত) সুযোগ নিয়ে এবং ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের পরিবর্তিত রাজনীতিক সম্পর্ককে ব্যবহার করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তিরিশের মন্দা না আসা পর্যন্ত অপ্রতিরোধ্য কোনো অগ্রগতি ঘটেনি।

১৯৩০-এর মন্দা ভারত এবং ব্রিটেনের মধ্যেকার বাণিজ্যের চেহারা আমূল বদলিয়ে দিয়েছিল। ভারত ব্রিটেনের সঙ্গে বাণিজ্যের দ্বিপাক্ষিক ভারসাম্যের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহির্বাণিজ্যে সংরক্ষণশীল নীতি গ্রহণ করলেও ব্রিটেনের সঙ্গে সে দেশের বাণিজ্যিক সাম্যের উন্নতি ঘটেছিল। উল্টোদিকে ভারতে ব্রিটিশ রপ্তানি দারুণভাবে কমে যায় কিন্তু ভারতের রপ্তানিতে ব্রিটেনের অংশ বেড়ে যায়। এর কারণ ছিল একদিকে সাম্রাজ্যিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং অন্যদিকে অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে ব্রিটেনের অপেক্ষাকৃতভাবে কম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে ব্রিটেনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়। যদিও ১৯২৯ থেকে১৯৩৯-এর মধ্যে ভারতের আমদানিতে ব্রিটেনের অংশ কমে এবং ব্রিটিশ রপ্তানিতেও সমগ্রভাবে সাম্রাজ্যের দেশগুলির অংশ ১৯২৯ সালে শতকরা ৩৫ ভাগ থেকে বেড়ে ১৯৩৮ সালে হয় শতকরা ৪৫.৬ ভাগ।[২২] এই ঘটনার ব্যাখ্যা খোঁজা হয়েছে সাম্রাজ্যিক সংরক্ষণ নীতি এবং সাম্রাজ্যের অন্য দেশগুলির তুলনায় ভারতের আয়বৃদ্ধির অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে।

ভারত এবং ব্রিটেনের মধ্যে দৃশ্য ও তৎকালীন বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই যে অধিকতর দ্বিপাক্ষিক ভারসাম্য এসেছিল তাই নয়, ১৯৩১ থেকে ১৯৩৫-এর সময়সীমার মধ্যে ভারত সরকার লন্ডনে আহৃত মূলধনের বিরাট অংশ শোধ দিয়ে দেয় এবং দীর্ঘকালীন মূলধন জোগাড়ের প্রশ্নে লন্ডনের অর্থবাজারের উপর তার নির্ভরশীলতার সমাপ্তি ঘটে।[২৬]

ব্রিটেন এবং ভারতের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের একটা কারণ ছিল সরকার কর্তৃক গৃহীত বহিঃশুল্কদত্ত শিল্প সুরক্ষার নীতি। এই নীতি পরিবর্তনের হেতু ছিল আবার কৃষিজাত দ্রব্যের বাজারে মন্দার ফলে ভারত সরকারের চিরাচরিত রাজস্বভাণ্ডার শুকিয়ে যাওয়া।[২৭] দেশী উপকরণধন্য আভ্যন্তরীণ বাজারের প্রসারের ফলে ছোট ছোট কেন্দ্রে বয়নশিল্পের এবং চিনি ও কাগজ শিল্পের দ্রুত বিকাশ ঘটে। রাজনীতিক বাতায়নের পরিবর্তনও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের তুলনায় ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীদের অবস্থানে পরিবর্তন ঘটায়। এরকম যুক্তি হাজির করা যেতে পারে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেকার রাজনীতিক, শাসনবিভাগীয় ও আর্থিক কাঠামোর মধ্যে গড়ে তোলা ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীদের অগ্রাধিকার ব্যবস্থার নীতির[২৮] ফলে বিনিয়োগ ও উৎপাদনের একটা (অলিখিত) কোটা ব্যবস্থা ছিল। সেই ব্যবস্থায় সেই সময়ে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের জন্যে নির্দ্ধারিত কোটা ছিল শূন্য। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা সেসব ক্ষেত্রেই ঢুকতে পারত যেখানে ভারতীয় উৎপাদনের সম্পূর্ণ অংশ শাসনবিভাগীয় ও রাজনীতিক অগ্রাধিকারের বলে পুরোপুরিভাবে ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীদের জন্যে তুলে রাখা হয় নি। যে সব অর্থশাস্ত্রবিদ আনুষ্ঠানিক মুক্ত বাণিজ্যের ব্যবস্থায় সমস্ত উদ্যোগীদের সমান সুযোগ থাকে বলে ধরে নেন, তাঁরা উদ্যোগী গোষ্ঠীদের মধ্যে ধারানুক্রমিক পক্ষপাতিত্বের এই প্রাধান্য উপেক্ষা করে গেছেন।

১৯২০-র দশকে, বিশেষ করে ১৯৩০-র দশকে সামরিক ও অসামরিক প্রশাসন কাঠামোর ভারতীয়করণ এবং রাজনীতিক ব্যবস্থায় (মূলতঃ সম্পন্ন ও শিক্ষিত) ভারতীয়দের অধিকতর অংশগ্রহণের ফলে ধীরে ধীরে এই পক্ষপাতিত্ব কমে আসে। প্রশাসনে অংশগ্রহণে যে সুবিধা আছে তা বুঝতে ভারতীয় উদ্যোগীদের দেরী হয়নি। মাদ্রাজে চেট্টিনাড়ের কুমার রাজা (এম. এ. মুথিয়া চেট্টিয়ার), যুক্তপ্রদেশে স্যার জ্বালা প্রসাদ শ্রীবাস্তব, পাঞ্জাবে স্যার

গোকুল চাঁদ নারাঙ এবং বাংলায় সার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় ১৯৩৭ পর্যন্ত তদীয় প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছেন।[৫৯] ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনের আওতায় প্রদেশগুলোতে জনপ্রতিনিধিত্বভিত্তিক সরকার আসতে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা প্রাদেশিক সরকারগুলির নীতি নির্দ্ধারণ ও বাস্তবায়নকে প্রভাবিত করার আরও সুযোগ পেয়ে যায়।

এই অংশ শেষ করার আগে আমাদের একথা বলা দরকার যে, জাতপাতের সম্পর্ক ধরে বা দেখে যদি আমরা বিশেষ অঞ্চল ও ব্যবসায়ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ সুবিধা কীভাবে সৃষ্টি হচ্ছে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখি তাহলেই নতুন ব্যবসায়ীদের উদ্ভব বোঝা সোজা হয়। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি যে, আধুনিক শিল্পের বহিঃশুল্ক সুরক্ষার ফলে শুধু কেনা-বেচার বদলে দেশী বাজারের জন্যে উৎপাদন অন্ততঃ কিছুটা পরিমাণ লাভজনক হয়ে উঠেছিল। ১৯৩০-এর দশকে কৃষিতে মন্দাবস্থার ফলে যেহেতু চাষীরা প্রচণ্ড মার খেয়েছিল সেইজন্যে মহাজনী ব্যবসারও আকর্ষণ কমে গিয়েছিল। এর ফলে অনেক পুঁজিপতির হাতেই অলস টাকা জমে যায় এবং সেই পুঁজি তারা শিল্পে বিনিয়োগ করে। একথা ঠিক যে, উদ্যোগীদের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল মাড়োয়ারীরা এবং তারা বেনিয়া জাতপাত থেকে উদ্ভূত বলে দাবি করে। কিন্তু তাদের অনেকেই জৈন, অর্থাৎ সঠিকভাবে বললে স্বীকৃত হিন্দুধর্মের কাঠামোর বাইরে পাঞ্জাব এবং উত্তরপশ্চিম ভারতে সাধারণভাবে উদ্যোগীরা মূলতঃ অরোরা ও ক্ষত্রি এবং তারা ক্ষত্রিয় (সামরিক বৃত্তির) মর্যাদা দাবি করে। পরিশেষে বলা যায় যে, স্বাধীনতার পরে পাকিস্তানে যেসব উল্লেখযোগ্য শিল্পপতি গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল তারা সাধারণতঃ মুসলিম কারবারী জাতের লোক।[৬০] এসময়ের মধ্যে সাধারণ যোগসূত্র একটাই তা হলো শিল্পে প্রবেশের আগে সবাই ব্যবসা বা বাড়ি রাস্তা ইত্যাদি বানানোর কাজে যুক্ত ছিল।[৬১]

১৪.৬ প্রাক্ স্বাধীনতাকালে ভারতে পঙ্গু শিল্পায়নের উপসংহার

১৯৩৯ সালে সুতি কাপড়, চিনি এবং দেশলাই-র মতো ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে ভারতীয় শিল্পগুলি, মোটামুটিভাবে স্বনির্ভর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু উৎপাদন সামগ্রী শিল্পেব বিকাশ তখনও পর্যন্ত অল্পই ঘটেছিল এবং মোট জাতীয় আয়ে আধুনিক শিল্পের অবদান ছিল স্বল্প। আধুনিক শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত লোকসংখ্যা বড়ই কম ছিল। দেশীয় রাজ্যসহ ব্রিটিশ ভারতে কারখানাগুলিতে মোট লোক নিয়োগের সংখ্যা ছিল ১৯৩৭ সালে ১,৪২১,৩৭৭; ১৯৩৮ সালে ১,৫২১,২১৯ এবং ১৯৩৯ সালে ১,৫২৮,৫২৮। যেসব কাবখানা বছরের শুধু বিশেষ সময়ে চালু থাকত তাদের ধরলে লোক নিয়োগের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৯৩৭ সালে ১,৯৫৮,৮৭৯; ১৯৩৮ সালে ২,০৩৬,৭৫৮ এবং ১৯৩৯ সালে ২,০৫০,২৩১।[৬২]

১৯২৯-৩০ সালের পর ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে আর্থনীতিক সম্পর্কের যে পরিবর্তন ঘটেছিল তার প্রভাব শিল্প বিনিয়োগেও কিছুটা লক্ষিত হয়েছিল। তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি তিরিশের দশকের মন্দার বছরগুলিতে মোট শিল্পগত বিনিয়োগ বাস্তব অর্থে আশ্চর্যভাবে ঋজু ছিল। তাছাড়া ১৯৩১ থেকে ১৯৪১-এর অর্থনীতির জীবিকাভিত্তিক কাঠামোতেও কিছু পরিবর্তন ঘটে। এ্যালিস এবং ডানিয়েল থর্নারের হিসেব অনুসারে

এখনকার ভারতের ভৌগলিক সীমার মধ্যে শিল্প, খনি এবং নির্মাণে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা সমগ্র শ্রমিকসংখ্যার অনুপাত হিসেবে ১৯১১ থেকে ১৯৩১ এর মধ্যে ১০ থেকে ৯ শতাংশ নেমে যায় এবং ১৯৫১-তে আবার বেড়ে ১০ শতাংশ হয়। ১৯৩১ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত সমগ্র ভারতে কী পরিবর্তন ঘটেছিল তা তাঁরা প্রকাশ করেন নি। কিন্তু বরোদা, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ এবং পশ্চিম বাঙলার আলাদা করে তথ্য তাঁরা প্রকাশ করেছেন। সবক্ষেত্রেই দেখা যায যে, শিল্প, খনি এবং নির্মাণে নিযুক্ত শ্রমশক্তির হার ১৯০১ থেকে ১৯৩১ এর মধ্যে কিছুটা কমেছে এবং ১৯৩১ থেকে ১৯৪১-এর মধ্যে কিছুটা বেড়েছে।[৬০] কাজেই বিশের এবং তিরিশের দশকে যদিও শিল্প ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসারিত হয়েছিল, বিনিয়োগে যে অপেক্ষাকৃত তেজীভাব এসেছিল তার ফলে পশ্চিমবঙ্গও—যাকে তুলনামূলকভাবে শিল্পায়িত অঞ্চল বলা চলে—কিছুটা সুবিধা ভোগ করেছিল।

এই বিকাশের পিছনে ব্যক্তিগত উদ্যোগের ভিত্তি কিন্তু ছিল ছোট। উদ্যোগের সরবারহ প্রসঙ্গে আমাদেব আলোচনায় আমরা বড় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলির দিকেই মনোযোগ দিয়েছি। তার কারণ এ নয় যে, অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন ক্ষেত্রের বিকাশে বা সমগ্রভাবে অর্থনীতির বিকাশে তারা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু আমাদের নির্বাচিত শিল্পগুলির বিকাশে তারাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সারা দেশে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই ছোট ব্যবসায়ীরা নিযুক্ত ছিল তুলোবীজ ছাড়ানো এবং তুলোর গাঁট বাঁধার যন্ত্রকলে ধান কল ও তেল কলে, পাট গাঁট বাঁধার কলে খাণ্ডসারী শিল্প এবং হস্তচালিত বা যন্ত্রচালিত তাঁত শিল্পে। কখনও কখনও তাদের উদ্যোগের বিকাশের জন্যে যৌথ মালিকানার (Joint stock) ব্যাঙ্কগুলিও সাহায্য কবেছে, যেমন গুন্টুর জেলায় চালকলগুলিকে সাহায্য করেছে ব্যাঙ্ক অব মাদ্রাজ।[৬১] কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইসব ক্ষুদ্রশিল্পেব বিকাশ ঘটেছে স্থানীয় মূলধনের সাহায্যে।[৬২]

কিন্তু এইসব ছোট পুঁজিপতিদের উদ্যোগে কোনো, শিল্পবিপ্লব ঘটে নি। উৎপাদনের কোনো নতুন পদ্ধতি ব্যবহারে বা কোনো নতুন শিল্প স্থাপনে তারা অগ্রণী হয় নি। বহিঃশুল্ক সুরক্ষার ছাতাব তলায় বেড়ে ওঠা মিলগুলিকে সাধারণত নিয়ন্ত্রণ করত বৃহৎ পুঁজির মালিকেরা। কিন্তু উৎপাদন পদ্ধতির জন্যে তারা সম্পূর্ণভাবে পশ্চিমী দেশগুলির উপর নির্ভরশীল ছিল। লোহা ও ইস্পাত, চিনি এবং কাগজ শিল্প সংক্রান্ত পরিচ্ছেদগুলিতে আমরা দেখেছি বহিঃশুল্ক সুরক্ষার জন্যে গুরুমশাইয়ের পাঠ অনুযায়ী যে দক্ষতার অভাব ঘটা উচিত ছিল তা ঘটে নি। বরং এই সুরক্ষা কলকারখানা বাড়াতে এবং উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতিতে সাহায্য করেছে। কিন্তু এই উন্নতি ঘটেছিল ধার করা কৃৎকৌশল এবং একটি অত্যন্ত ছোট যন্ত্রকুশলী ব্যক্তি গোষ্ঠীর ওপর ভর দিয়ে। ভারতে কোনো বড় আকারের কৃৎকৌশলের উন্নতি বা শিল্পগত সমস্যার সমাধানে তার প্রয়োগ ঘটে নি।

ফলে ১৯৩৯ সালে ভারতের অর্থনীতি মূলত ঔপনিবেশিক কৃষিনির্ভর এবং দরিদ্র ছিল। সামাজিক সংগঠন, ধনতান্ত্রিক অগ্রগতির জন্যে যেভাবে পরিবর্তিত হওয়া দরকার ছিল, সেভাবে বদলায় নি। ভারতের অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূমিরায়তী ব্যবস্থা ছিল অস্বাভাবিক জটিল। রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যে অজস্র স্তরের মধ্যস্বত্বভোগী ছিল। প্রকৃত অর্থে ধনতন্ত্রী কৃষির বিকাশ

খুব কমই ঘটেছিল। শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল ঔপনিবেশিক। প্রধানত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাটা ছিল তার উদ্দেশ্য।

শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল খুবই অল্প; বস্তুত সমস্ত বিকাশই ঘটেছিল ভোগ্যপণ্য শিল্পের ক্ষেত্রে।[৬৬] প্রাক্-১৯১৪ যুগের তুলনায় দেশী পুঁজিপতিরা আধুনিক শিল্পে বৃহত্তরভাবে প্রবেশ করতে পেরেছিল। কিন্তু বিদেশী শিল্পপতিরা মূল শিল্পগুলিকে অনেকখানিই নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল। তাছাড়া বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রিত বিদেশী পুঁজিপতিদের বিদেশী ধনতন্ত্রী প্রতিষ্ঠানের ভারতীয় অর্থনীতিতে যে অনুপ্রবেশ পরবর্তীকালে লক্ষিত হয় তার ছায়া এই সময়েই দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। ইউনিলিভার, আই সি আই, ডানলপ, জেনারেল মোটরস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতে তাদের শাখা বা নির্ভরশীল কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছিল।[৬৭] ফলে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা বা এ্যাংলো-ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির হাত থেকে অর্থনীতিকে নিজেদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারার আগেই ভারতীয় পুঁজিপতিদেব দেখতে হলো আন্তর্জাতিক কার্টেলগুলির নতুন শিল্প ক্ষেত্রগুলিতে দখলদারী। তাছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলের পুঁজিপতি গোষ্ঠীগুলির অবস্থান ছিল বিকাশের বিভিন্ন স্তরে—কেউ কেউ ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি হয়ে গিয়েছে আবার কেউ কেউ কারবারের মাধ্যমে 'প্রাথমিক জমার' ধাপ অতিক্রম করতে পারে নি। এই অবস্থায় বাজার এবং প্রাকৃতিক ও অন্য সম্পদের নিয়ন্ত্রণের জন্যে স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে সংঘর্ষ ছিল। এই সংঘর্ষ অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে মিলে ভারত বিভাগের বারুদ হিসেবে কাজ করেছে। এরই মধ্যে অবশ্য ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের লড়াই চলেছে। স্বাধীনতা আসার পর, ভারত এবং পাকিস্তানের পুঁজিপতি শ্রেণীর লোকেরা সংখ্যায় যতই কম এবং আর্থিক দিক থেকে যতই দুর্বল হোক না কেন, অন্য শ্রেণীর লোকের তুলনায় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে স্বাধীন রাষ্ট্রের ব্যবহারেব প্রশ্নে অনেক বেশি এগিয়ে ছিল।

অনুবাদক : অভিজিৎ ভট্ট

টীকা

১। এই গ্রন্থের ২য় ও ১৪শ অধ্যায়ের শেষাংশে A.E. Kahn-এর পুস্তকের উল্লেখ দ্রষ্টব্য।

২। Maurice Dobb, *Political Economy and Capitalism : Some Essays in Economic Tradition* (লন্ডন, ১৯৪০) ৭ম পরিচ্ছেদ, পৃ. ২৪০।

৩। অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডার আর্থনীতিক বিকাশে রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে H.G.J. Aitken (ed.). *The State And Economic Growth* (সোশ্যাল সায়ান্স রিসার্চ কাউন্সিল, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৯) ২য় ও ৩য় পরিচ্ছেদ উদাহরণ হিসাবে দ্রষ্টব্য।

৪। এই ঘটনা সম্পর্কে সচেতনতার সাক্ষ্য হিসাবে দ্রষ্টব্য Sir Charles H. Armstrong (বোম্বাই চেম্বার অব কমার্সের প্রাক্তন চেয়্যারম্যান) ; 'Indian Trade and the War', *JRSA*, LXIII, নং ৩২৬৩, ২৮ শে মে, ১৯১৫, পৃ. ৬৪৫-৭; এবং D.T. Chadwick, 'The Trade of India with Russia, France and Italy', *JRSA*, LXVI, নং ৩৩৯৭, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯১৭, পৃ. ৯৬-১০৭।

৫। নাতিশীতোষ্ণ দেশগুলিতে ব্রিটিশ বিনিয়োগ আকর্ষিত হবার বিষটি ইতিমধ্যেই অধ্যাপক Nurkse আলোচনা করেছেন তাঁর প্রবন্ধে 'The Problem of International Investment Today in the Light of Nineteenth Century Experience', *Economic Journal*, LXIV (ডিসেম্বর, ১৯৫৪) পৃ. ৭৫০ এই আন্দাজ-অনুমানের সাপেক্ষে বিস্তৃত সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করেছেন Mathew Simon, 'The Pattern of New British Portfolio Investment 1865-1914'. J.H. Adler(ed), *Capital Movments and Economic Development*, (লন্ডন, ১৯৬৭) পৃ. ৩৩-৬৬।

৬। তুলনীয় J.M. Maclean, 'India's Place in an Imperial Federation' *FSA*, LII, নং ২৬৬৫, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯০৩, পৃ. ৮১-৯০। যন্ত্রকুশলতায় শিক্ষিত ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বেষী সংস্কার সম্পর্কে এই গ্রন্থের ৫ম ও ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৭। এই গ্রন্থের ৭ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৮। এই গ্রন্থের ১০ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৯। *Indian financial and proceedings* (PP, 1904, LXIII) পৃ. ২৫৫-তে বক্তৃতা দ্রষ্টব্য।

১০। এই গ্রন্থেব ২য়, ১২শ ও ১৩শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১১। দ্রষ্টব্য : 'India's Banking Machinery' নামে প্রবন্ধাবলী। এগুলি প্রকাশিত হয়েছে *Capital* (কলকাতা) ২রা অগাস্ট, ১৯১৮, পৃ. ২৩১-৯; ৯ই অগাস্ট, ১৯১৮, পৃ. ২৯১-৩ এবং ১৬ই অগাস্ট, ১৯১৮, পৃ. ৩৫১-২। এই প্রবন্ধগুলি তিনটি প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কের প্রস্তাবিত একীকরণ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের সন্দেহ এবং ব্যাঙ্ক অব বোম্বাই ও ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল এর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতিফলনও করে। ব্যাঙ্ক অব বোম্বাইএর কাজকর্মে ভারতীয়দের অধিকতর নিয়ন্ত্রণ ছিল। ইম্পিরিয়্যাল অব ব্যাঙ্ক ইন্ডিয়ার কাজকর্ম নিযন্ত্রণের প্রধান অংশ ভারতীয়দের হাতে চলে যাবে বলে আশঙ্কা করা হতো। পরে এই আশঙ্কা অমূলক বলে প্রমাণিত হয়।

১২। H.J. Habakkuk, 'The Historical Experience on the Basic Conditions of Economic Progress'. এটি আছে Leon H. Dupriez(ed), *Economic Progress*, আন্তর্জাতিক অর্থনীতি সংস্থা আয়োজিত গোল টেবিল আলোচনার কার্যবিবরণী ও প্রবন্ধাবলী (ল্যুভেঁ : ইনস্টিটিউট দ্য রিসার্চেজ একোনমিক্স এট সোশ্যালস, ১৯৫৫) পৃ. ১৪৯-৬৯।

১৩। এই গ্রন্থের ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৪। তুলনীয়, ২য় পরিচ্ছেদের উপসংহার অংশে উল্লিখিত স্বল্পস্থায়ী টাটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের অভিজ্ঞতা। তাছাড়া ৯ম ও ১৩শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৫। এই গ্রন্থের ৭ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৬। R.E. Baldwin, 'Patterns of development in Newly Settled Regions', *Manchester School of Economic and Social Studies*, মে ১৯৫৬; R. Nurkse, 'Some International Aspects of the Problem of Economic Development', *American Economic Review*, মে ১৯৫২; H.W. Singer, 'The Distribution of Gains between Insvesting and Borrowing Countries', *American Economic Review*, মে ১৯৫০।

১৭। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ও পরে ব্রিটিশ সাম্রাজিক ব্যবস্থার লেনদেন পদ্ধতির কাজ করা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য S.B. Saul, *Studies in British Overseas Trade* এবং A.E. Kahn, *Great Britain in the World Economy* (কলাম্বিয়া ইউনিভারসিটি প্রেস, নিউ ইর্য়ক, ১৯৪৬)।

১৮। এই গ্রন্থের ৭ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৯। এইভাবে ভারতে ধনতন্ত্রের বিকাশ হয়েছিল পঙ্গু এবং এই ধনতন্ত্র আরও অগ্রসর দেশগুলির পুঁজির অধীন ছিল। ভারতে সামাজিক রূপান্তর না ঘটায় এবং আর্থনীতিক বিকাশের হার খুব কম হওয়ায় কৃৎকৌশলগত গতির শর্ত অনুপস্থিত ছিল এবং উন্নত ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ঘটা পরিবর্তনের কাছে ভারতীয় অর্থনীতি ছিল অসহায়। আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল এবং মেক্সিকোর মতো লাটিন আমেরিকার দেশগুলির মতোই ভারত এই 'পরভৃত্তিক ধনতন্ত্রের' অংশীদার ছিল।

২০। উদাহরণ হিসাবে দ্রষ্টব্য M. Visvesvaraya, *Planned Economy for India* (বাঙ্গালোর, ১৯৩৪) পৃ. ৮ ও ২৩০-২ এবং N.R. Sarkar, 'Economic Planning in India', এটি আছে Mukherjee and Dey (eds.), *Economic Problems of Modern India*, ভলিউম ২, পৃ. ১৯১-২১৩। বিশ্বেশ্বরাইয়া (পৃ. ৮) পরিষ্কারভাবে বলছেন, 'ভারতীয় পরিকল্পনার উচিত *সাম্যবাদী* প্রবণতা বাদ দেওয়া; এর মূল নীতি হওয়া উচিত ব্যক্তিগত উদ্যোগে হস্তক্ষেপ না করে সামগ্রিক প্রয়াসকে উৎসাহ দেওয়া। বিকাশ হওয়া উচিত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং তুরস্কের ধারায়। (মূলের ইটালিক)

২১। দ্রষ্টব্য : J. Nehru ; *The Discovery of India* (তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৪৭) পৃঃ ৩৩১-৭।

২২। দ্রষ্টব্য : Maulana Abul Kalam Azad, *India Wins Freedom* (বোম্বাই, ১৯৫৯), পৃ. ৪। ১৯০৫ এর বাংলাভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *ঘরে বাইরে* (১৯১৬ তে বাংলা সামরিকপত্র *সবুজপত্র*-এ প্রকাশিত) উপন্যাস লেখেন। এই উপন্যাসে উগ্র জাতীয়তাবাদীরা হয় জমিদার নয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অল্প বয়েসী যুবকেরা এবং বিদেশী পণ্য (দেশে তৈরি জিনিসের চাইতে কম দামি) বয়কটের বিরুদ্ধে বাধাদানকারীরা ছিল দরিদ্র শ্রেণীর ও ধর্মের দিক থেকে মুসলমান। কিছুদিন আগেই (বাংলা ১৩২১ সন, ১৯১৪-১৫ তে) রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধে ('লোকহিত') দেখিয়েছেন যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের খোলাখুলিভাবে পক্ষপাতমূলক আচরণের জন্যে (১৯০৫-এ শুরু

হওয়া) স্বদেশী আন্দোলনে ভাইএর মতো সম্পর্ক স্থাপনের ও ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান কিছুটা মিথ্যার উপর দাঁড়িয়েছিল।

২৩। এই গ্রন্থের ৮ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২৪। দ্রষ্টব্য Sir Federick A. Sachse, 'The Work of Bengal Land Revenue Commission'. *JRSA* LXXXIX, নং ৪৫৯৬, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪১, পৃ. ৬৬৬-৭৭।

২৫। কোনো কোনো দিক থেকে পাঞ্জাবে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার শ্লেষাত্মকভাবে সেইসব লোকেদের কাজকর্মের ধারাবিবরণী দেয়, যারা, ব্রিটিশ রাজস্ব আদায় এবং উদ্বৃত্ত নিঙড়ে নেবার ব্যবস্থায় সুদখোর মহাজনদের কার্যকরী ভূমিকা না বুঝে বা বুঝতে না পেরে, পিছিয়ে পড়াদের—শিখ ও মুসলিম কৃষকদের—প্রকৃত বন্ধু হিসাবে হিন্দু মহাজন ও ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই থরবার্নের নাম মনে আসে। কিন্তু থরবার্ন একা নন। সমবায়ী সংস্থা চালু করবার জন্য আইনের খসড়ার রচনাকার স্যার ডেনজিন ইবেটসন এবং এফ এল বেয়নী, ম্যালকম ডারলিং ও জালিয়ানওয়ালাবাগ খ্যাতির স্যার মাইকেল ও' ডায়ার এই ধারারই লোক।

দ্রষ্টব্য : S.S. Thorburn, *Musalmans and Money-lenders in the Punjab* (এডিনবার্গ এবং লন্ডন, ১৮৮৬); M.L. Darling, *The Punjab Peasant in Prosperity and debt* (লন্ডন, ১৯২৮) ৯ম-১২শ পরিচ্ছেদ; H.K. Trevaskis, *The Land of the Five Rivers* (লন্ডন, ১৯২৮) পৃ. ৩০৭-৪৪ ('The Economic Dictatorship of the Money-lender'); F.L. Brayne, *The Remaking of Village India* (লন্ডন এবং বোম্বাই, ১৯২৯); এবং H.Calvert, *The Wealth and Welfare of Punjab* (দ্বিতীয় সংস্করণ, লাহোর, ১৯৩৬) ১৩শ এবং ১৪শ পরিচ্ছেদ। আরও দ্রষ্টব্য Philip Woodruff, *The Men who Ruled India*, ভলিউম ২, *The Guardians* (লন্ডন, ১৯৬৩) পৃ. ১৫৯-৬৩, ১৮৭-৯, ২৩৫-৪৩।

২৬। এই গ্রন্থের ৫ম ও ৮ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২৭। *Census of India, 1931*, ভলিউম ১, *India*, পার্ট ৩, *Report*, J.H. Hutton কৃত (দিল্লী, ১৯৩৩) পৃ. ৩৮৭; *Census of India, 1941*, ভলিউম ১, পার্ট ১, M.W.M Yeatts কৃত *Tables* (দিল্লী, ১৯৪৩) পৃ. ১০২-৩। ভারতে প্রতি ১০,০০০ লোকের মধ্যে মুসলিমদের সংখ্যা ১৮৮১ তে ১,৯৪৭ থেকে ১৯০১ এ ২,১২২ এবং ১৯৪১ এ ২,৩৮৪ 'তে বেড়ে যায়।

২৮। বাংলার বদ্বীপ অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলিমদের সংখ্যাবৃদ্ধির আলাদা হারের ব্যাখ্যার একটি প্রয়াসের জন্যে দ্রষ্টব্য S.G. Panandikar, *The Death and Welfare of the Bengal Delta* (ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি প্রেস, কলকাতা, ১৯২৬) পৃ. ২৩১-৩।

২৯। ১৯০১ থেকে ১৯৪১ এ ব্রিটিশ ভারতে বিভিন্ন প্রদেশে জনসংখ্যার তারতম্যের জন্য আগে লেখা ৪.৯ সারণি দ্রষ্টব্য।

৩০। Maulana Abul Kalam Azad, *India Wins Freedom*, পৃ. ২০-১।

৩১। J. Nehru, *Glimpses of World History* (বোম্বাই, ১৯৬৭; প্রথম প্রকাশ কিতাবস্তান, এলাহাবাদ, ১৯৩৪) পৃ. ৪৫২।

৩২। Nehru, *An Autobiography* পৃ. ৪৬৬.৭।

৩৩। Nehru, *The Discovery of India* পৃ. ২৭৫-৮।

৩৪। ঐ, পৃ. ২৭৭

৩৫। মুক্ত উদ্যোগের শর্তের মধ্যে পিছিয়ে পড়া সুবিধাহীন সম্প্রদায়গুলির বিরুদ্ধে কাজ করা 'ক্রমবৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভারসাম্যহীনতার' পদ্ধতি প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য G. Myrdal. *Economic Theory and Underdeveloped Regions* (লন্ডন, ১৯৫৭) এবং *Value in Social Theory* (লন্ডন, ১৯৫৮)।

৩৬। দ্রষ্টব্য : P. Moon, *Divide and Quit* (লন্ডন, ১৯৬১) XIV পরিচ্ছেদ, বিশেষ করে পৃ. ২৮৮।

৩৭। দ্রষ্টব্য : G.F. Papanek, 'The Development of Enterprenuership', *The American Economic Review*, LII, ২রা মে, ১৯৬২, পৃ. ৪৬-৫৮ এবং *Pakistan's Development : Social Goals and Private Incentives* (কেমব্রিজ, ম্যাসাচুসেটস, ১৯৬৭), পরিচ্ছেদ II

৩৮। অনেক অর্থনীতিবিদের মতোই কিংসলে ডেভিড মনে করেছেন খনিজ সম্পদের অভাবের কারণে পাকিস্তানের শিল্পায়নের বিকাশের সম্ভাবনা কম। দ্রষ্টব্য Davis, *Population of India and Pakistan* ২০ পরিসংখ্যান।

৩৯। এই গ্রন্থের ৭ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৪০। এই গ্রন্থের ১২শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৪১। ১৯৪১-এ বিড়লা ব্রাদার্সের পরিচালনায় দি টেক্সটাইল মেশিনারি কর্পোরেশন বাজারে ছাড়া হয়; *ITJ*, ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১ পৃ. ১১৫।

৪২। ১৯১৪-এর সংখ্যা দেওয়া আছে আগের ৭.৪ সারণিতে; ১৯৩৯-এর সংখ্যা নেওয়া হয়েছে Sir Ness Wadia, 'The Industry in Retrospect', *ITJ*, 1890-1940, Jubilee Souvenir (বোম্বাই, ১৯৪১) পৃ. ১৮ থেকে।

৪৩। বহিঃশুল্কদত্ত সুরক্ষা বিদেশ থেকে আমদানি আটকিয়ে দেবার সময়ে, প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রগুলি ভারতের সমস্ত আঞ্চলিক বাজারে সরবারহ করার মতো সামর্থ গড়ে তুলতে না পারায়, তাদের প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও স্থানীয় উদ্যোগীরা নতুন সক্ষমতা অর্জন করতে সমর্থ হয়।

৪৪। বিশেষ বহিঃশুল্ক বোর্ডের দক্ষিণ ভারত মিল মালিক সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করেন জে ডোক ; সি. এস. রত্নসভাপতি মুদালিয়র, আর ভেঙ্কটস্বামী নাইডু এবং জি. এন শ্রীরঙ্গ—এঁদের কেউই চেট্টিয়ার ছিলেন না। তাছাড়া কোয়েম্বাটুরের অত্যন্ত লাভজনক আটটি সুতোকলের মধ্যে ম্যানেজিং এজেন্ট হিসাবে আমরা কেবল দুজন চেট্টিয়ারের নাম পাচ্ছি। দ্রষ্টব্য : ITB, Special Tariff Board : *Oral Evidence*, ভলিউম III, পৃ. ৭১ এবং *Written Evidence*, ভলিউম II (দিল্লী, ১৯৩৭) পৃ. ৯২।

৪৫। মধ্যভারত রাজ্য গেজেটিয়ার ক্রম হলো *Gwalior State Gazetteer*, পৃ. ৭৭, *Indore State Gazetteer*, পৃ. ১২৭, *Bhopal State Gazetteer*, পৃ. ৫৫, আরও দ্রষ্টব্য এই গ্রন্থের ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

৪৬। শিল্পায়নের বিকাশের তুলনামূলক অভাব বলতে আমরা আধুনিক বৃহদায়তন উৎপাদন কেন্দ্রের বিকাশের কথা বোঝাচ্ছি। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসহ সমস্ত শিল্পে নিযুক্ত ১৯৩১-এর শ্রমশক্তি হার লক্ষ্য করলে দেখতে পাব যে, দিল্লী আর অন্য সব বড় প্রদেশগুলির মধ্যে পাঞ্জাব, তুলনামূলকভাবে এগিয়ে রয়েছে। দ্রষ্টব্য *Census of India*, 1931, ভলিউম II, পার্ট I, *Report* (দিল্লী, ১৯৩৩) পৃ. ৩০৭। কিন্তু ১৯৩০-এ পাঞ্জাবে কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৪৪,৭২৪; অথচ ঐ সংখ্যা বোম্বাইতে ছিল ৩,৮১,৩৪৯ এবং বাংলায় ৪,৮০,৩৪৯। পাঞ্জাব, বোম্বাই (এডেন সহ) এবং বাংলার জনসংখ্যা ১৯৩১এ ছিল যথাক্রমে ২,৩৫,৮১,০০০; ২,১৯,৬১,০০০ এবং ৫,০১,১৪,০০০। দ্রষ্টব্য : Gov. of India, CISD . *Statistical abstract for British India from 1922-3 to 1931-2* (কলকাতা, ১৯৩৩) পৃ. ৮১২-৩, এবং *Census of India 1931*, ভলিউম I, পার্ট I, *Report* (দিল্লী, ১৯৩৩) পৃ. ৩৫। প্রতি ১০০ জন পুরুষ শ্রমিকের মধ্যে, জিনিস তৈরিতে নিযুক্ত শ্রমিকেরা সারা ভারতে ৮.৪ ও পশ্চিম বাংলায় ১০.৪ এর জায়গায় পূর্ব বাংলায় ছিল ৪.১। দ্রষ্টব্য Alice and Daniel Thorner, 'The twentieth century trend in employment in manufacture in India- as illustrated by the case of West Bengal. এটি আছে C.R. Rao *et al* (eds.) . *Essays on Econometrics and Planning* (কলকাতা, ১৯৬৪) পৃ. ৩০৬ এ।

৪৭। স্বাধীনতার পরবর্তী পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা নাটকীয়ভাবে দেখিয়ে দেয় শিল্পায়নে বিনিয়োগে বানিয়া গোষ্ঠীদের সুপ্ত উদ্যোগ-সম্ভাবনার প্রকাশে রাজনীতিক উপাদানের গুরুত্বকে।

৪৮। দ্রষ্টব্য : *Census of India, 1921*, ভলিউম XV, *Punjab and Delhi*, পার্ট I, *Report* (লাহোর, ১৯২৩) পৃ. ৭৮, ৩৫২-৫; *Census of India, 1931*, ভলিউম XVII, *Punjab*, পার্ট I, *Report* (লাহোর, ১৯৩৩) পৃ. ৪১-২।

৪৯। সমস্ত তুলনার সংখ্যাগত ভিত্তি Gov. of India, CSID : *Annual statement of the seaborne trade of British India* (কলকাত, বার্ষিক) শিল্পগত যন্ত্রপাতির আমদানির সংখ্যাগত তথ্য আগের ৩য় পরিচ্ছেদে (৩.২ সারণি) আছে।

৫০। কাপড় এবং চিনি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির মূল্য সূচকের জন্য ৩.২ ও ১২.২ সারণি দ্রষ্টব্য।

৫১। আরও দ্রষ্টব্য এই গ্রন্থের ৩য় পরিচ্ছেদ।

৫২। Kahn, *Great Britain in the World Economy*, পৃ. ২৩৩। ১৯২৯-এ আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যে মালয়ের চার কোটি ষাট লক্ষ পাউন্ডের অনুকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ছিল। ফলে আমেরিকার সঙ্গে বর্তমান বাণিজ্যের ঘাটতি মেটাতে ডলারের উৎস হিসাবে ভারতকে সরিয়ে জায়গা নেয় মালয়।

৫৩। Kahn. *Great Britain in the World Economy*, পৃ. ২৩২।

৫৪। আন্তর্জাতিক মূলধন চলাচলের বিষয়ে আলোচনা প্রথাগত পাঠ্যপুস্তকগুলিব অধিকাংশতেই বলা হয় যে, মহাজনী দেশগুলির সঙ্গে লেনদেনে ক্রমাগত বিরূপ ভাবসাম্যের সাথে সাথেই মহাজনী দেশ থেকে দেনদার দেশে সমপরিমাণে মূলধন যায়। এই বক্তব্য কিন্তু বিশ্ব বাণিজ্যের বহুমুখী চরিত্র এবং বিশেষ করে সাম্রাজ্যিক লেনদেন ব্যবস্থায় ভারতের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্য করে না। তখনই ভারত ভারসাম্যপ্রদায়ী ভূমিকা পালন করতে পারত যখন বাণিজ্যে যুক্তরাজ্যের বিরুদ্ধে ভালো অবস্থায় থাকা দেশগুলির সঙ্গে ভারতের অবস্থা অনুকূল থাকত। এ প্রসঙ্গে আরও দ্রষ্টব্য Saul, *Studies in British Overseas Trade*.

৫৫। Kahn. *Great Britain in the Economy*, পৃ. ২৪৪ এবং ২১১ (পাদটীকা সহ)

৫৬। Banerjee, *India's Balance of Payments* পৃ. ১৮৬-৯৬।

৫৭। এই গ্রন্থের ২য় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৫৮। এই গ্রন্থের ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৫৯। তথ্যাবলী *Indian Year Book* এর বিভিন্ন সংখ্যা এবং *Devrett's Peerage, Baronetage etc* থেকে সংগৃহীত।

৬০। Papanek, 'The Development of Enterprenuership' এবং *Pakistan's Development*, ২য় পরিচ্ছেদ।

৬১। সোলাপুরেব ওয়ালচাঁদ হিরাচাঁদ পরিবার ব্যবসা ও টাকা ধাব দেবাব ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ছিল। নির্মাণশিল্পে তারা আসে পরবর্তীকালে। বাংলায় স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি প্রথমে সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ নাম করেন ও টাকা রোজগার করেন এবং তারপরে আসেন লোহা ও ইস্পাত শিল্পে। জাতপাতের দিক থেকে মুখার্জি ছিলেন ব্রাহ্মণ। কির্লোস্কার প্রতিষ্ঠানের স্থপয়িতা লক্ষণরাও কির্লোস্কারও ছিলেন ব্রাহ্মণ।

৬২। *Staistical abstracts for British India* (১৯৩৪-এর কারখানা আইন অনুসারে তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল।) ১৯৪১-এ ভারত ও পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যা ছিল ৩৮,৮৯,৯৮,০০০।

৬৩। Alice Thorner, 'The Secular Trend in the Indian Economy, 1881-1951',*The Economic Weekly*, বিশেষ সংখ্যা, জুলাই, ১৯৬২ এবং Thorner, 'Twentieth century trend in employment in manufacture in India'

৬৪। দ্রষ্টব্য : Sir W.B. Hunter এর লিখিত সাক্ষ্য, পরিশিষ্ট II (কৃষ্ণা ও গোদাবরীর বদ্বীপ অঞ্চলের জেলাগুলির চালকলের দায়িত্বে থাকা ব্যাঙ্ক অব মাদ্রাজের বিভিন্ন শাখার পরিদর্শক ডাবলিউ আর টি ম্যাকের তৈরি), *Evidence (Report of IIC)*, ভলিউম II, (PP 1919 XIX) পৃ. ২৭৭-৯।

৬৫। দ্রষ্টব্য Rao Bahadur R.N. Mudhoalkar এর সাক্ষ্য। এটি আছে *Evidence (Report of IIC)*, ভলিউম II, (PP 1919, XVIII). পৃ. ৪৬৭, ৪৭৫-৬

৬৬। রাষ্ট্রসংঘের হিসাবানুসারে ১৯৩৬-এ ভারতে কারখানায় নিযুক্তদের ৬৭% ছিল ভোগ্যপণ্যশিল্পে, ১৮% ছিল (কাঠ, কাগজ, রাসায়নিক পদার্থ জাতীয়) মাধ্যমিক স্তরের দ্রব্য উৎপাদন শিল্পে এবং ১৫% ছিল অন্য, পূর্ণভাবে উৎপাদিত, দ্রব্যের শিল্প (মূলত মূলধনী দ্রব্যের শিল্পে)। দ্রষ্টব্য UN. *Processes and Problems of Industrialization in Underdeveloping Countries* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৫) পৃ. ১৩৮।

৬৭। D.R. Gadgil, 'Indian Economic Organization' আছে Simon Kuznets *et al* (eds.), *Economic Growth, Brazil, India, Japan* (ডারহ্যাম, এন, সি, ১৯৫৫) পৃ. ৪৪৮-৬৩

অনুবাদক : অভিজিৎ ভট্ট

গ্রন্থসূচি

PRIMARY SOURCES:
ARCHIVES AND OFFICIAL PUBLICATIONS

1. ARCHIVES

A. National Archives of India, New Delhi

Government of India, Department of Revenue and Agriculture: Emigration, 'A' Proceedings, 1899-1902.

Government of India Proceedings, Department of Industries and Labour: Inter-provincial migration files 1924-6.

B. Office of the Regional Director, Company Law Board, Eastern Region, and Registrar of Companies, West Bengal, Calcutta

Memoranda of association of jute companies registered in India

Copies of agreements of mortgage (for cash, credit and overdraft facilities) between jute and sugar companies and the Bank of Bengal.

Lists of shareholders of the Ryam Sugar Company at various dates between 1914 and 1949.

C. Office of the Registrar of Companies, Scotland, Edinburgh

Balance-sheets of the Anglo-India Jute Mills Company Limited, the Champdany Jute Company Limited, the India Jute Company Limited, the Samnuggur Jute Factory Company Limited, the Titaghur Jute Factory Company Limited, and the Victoria Jute Company Limited, from 1908 to 1920.

D. Office of the Shareholders' Association, Bombay

Balance-sheets and directors' reports of the Ahmedabad Advance Mills Limited, and the Central India Spinning,

Weaving and Manufacturing Company Limited, 1904-10 (broken series).

2. OFFICIAL PUBLICATIONS : UK

A. UK Parliamentary Papers

Indian financial statements and the proceedings of the Legislative Council of the Governor-General thereon, from 1900-1 to 1909-10 : PP 1900 LVII; PP 1901 XLIX; PP 1902 LXX; PP 1903 XLVI; PP 1904 LXIII; PP 1905 LVII; PP 1906 LXXXI; PP 1907 LVIII; PP 1908 LXXIV; PP 1909 LXII.

(Return of the) Indian financial statement and budget of the Governor-General in Council, from 1929-30 to 1935-6: PP 1929-30 XXIII; PP 1930-1 XXIII; PP 1931-2 XIX; PP 1932-3 XX; PP 1933-4 XX; PP 1934-5 XVI.

Indian tariff and the cotton duties: papers relating to the Indian Tariff Act and the Cotton Duties Act 1894; and *Representations made to the Government of India, in March 1894, against the exclusion of cotton manufactures from import duties*...PP 1894 LXXII.

(Papers relating to the) Indian Tariff Act 1896, and the Cotton Duties Act 1896: PP 1896 LX.

Progress of education in India, 1902-7, Vol. I, Fifth quinquennial review; and Vol. II, Maps and statistical tables: PP 1909 LXIII.

Report of a Committee appointed by the Secretary of State for India to inquire into the system of state technical scholarships established by the Government of India in 1904: PP 1913 XLVII.

Report of the Committee on Indian Railways finance and administration : PP 1908 LXXV.

Report of the Committee appointed by the Secretary of State for India to enquire into the administration and working of Indian Railways : PP 1921 X.

Report of the Indian Industrial Commission, 1916-18 : PP 1919 XVII.

Minutes of Evidence, Vols. I-V: PP 1919 XVII; PP 1919 XVIII; PP 1919 XIX; PP 1919 XX. [Vol. VI, *Confidential Evidence* (Calcutta, 1918) is not included in PP.]

Report of the Indian Irrigation Commission 1901-3, Part I General; Part II Provincial; Part III Maps; and Part IV Appendix: PP 1904 LXVI.

Report of the Textile Factories Labour Committee appointed by the Government of India Dec. 1906 ... : PP 1907 LIX.

Report and correspondence relating to the expediency of maintaining the Royal Indian Engineering College ; and Evidence taken before the Committee : PP 1904 LXIV.

Robertson, Thomas (Special Commissioner for Indian Railways): *Report on the administration and working of Indian Railways* : PP 1903 XLVII.

Royal Commission on Indian finance and currency:

Appendices to the interim report of the Commissioners, Vols. I and II; *Final report of the Commissioners; Evidence taken before the Royal Commission,* Vol. II; and *Appendices to the final report of the Commissioners* : PP 1914 XX.

Royal Commission on Opium : *Minutes of Evidence taken between 18 November and 29 December 1893,* Vol. II : PP 1894 LXI.

Minutes of Evidence taken from 29 January to 22 February 1894, Vol. IV : PP 1894 LXII.

Royal Commission on Public Services in India : *Report* : PP 1916 VII.

(*Statements exhibiting the*) *moral and material Progress and condition of India* (later called *India 1922-23,* etc.) from 1898-9 to 1933-4: PP 1900 LVII; PP 1901 XLIX; PP 1902 LXXIII; PP 1903 XLVI; PP 1904 LXIII; PP 1905 LVIII; PP 1906 LXXXII; PP 1907 LIX; PP 1908 LXXV PP 1909 LXII; PP 1910 LXVII; PP 1911 LV; PP 1912-13 LXI; PP 1913 XLVI; PP 1914 LXIII; PP 1914-16 XLIX; PP 1916 XXI; PP 1917-18 XXIV; PP 1918 XVIII; PP 1919 XXXVIII; PP 1920 XXXIV; PP 1921 XXVI; PP 1922 XVI; PP 1923 XVIII; PP 1924-5 XI; PP 1927 XVIII; PP 1928 XVIII; PP 1928-9 XV; PP 1929-30 XXIII; PP 1930-1 XXIV; PP 1931-2 XIX; PP 1933-4 XX; PP 1934-5 XVII; PP 1935-6 XX.

Statistical abstracts relating to British India

from 1911-12 to 1920-1 : PP 1924 XXV.

from 1917-18 to 1926-7 : PP 1928-9 XXII.

Statistical abstracts for British India and certain Indian States

from 1918-19 to 1927-8 : PP 1929-30 XXIX.

from 1921-2 to 1930-1: PP 1932-3 XXVI.

from 1929-30 to 1938-9 : PP 1941-2 VIII.

from 1930-1 to 1939-40 : PP 1942-3 X.

(Annual statements of the) trade of the United Kingdom with foreign countries and British Possessions, Vols. I and II, from 1902 to 1920 : PP 1903 LXIX, LXX; PP 1904 XC, XCI; PP 1905 LXXIX, LXXX; PP 1906 CXVI, CXVII; PP 1907 LXXXII, LXXXIII; PP 1908 CII, CIII; PP 1909 LXXXIII; PP 1910 LXXXVII, LXXXVIII; PP 1911 LXXIX, LXXX; PP 1912-13 LXXXV; PP 1913 LX; PP 1914 LXXXII, LXXXIII; PP 1914-16 LXIV, LXV; PP 1916 XXV, XXVI; PP 1917-18 XXVIII, XXIX; PP 1918 XXI, XXII; PP 1919 XLIII, XLIV; PP 1920 XLI, XLII; PP 1921 XXXII, XXXIII.

Annual statements of the foreign trade of the United Kingdom, in 3-4 vols., were published separately—not as part of the Parliamentary Papers—with effect from 1920 onwards.

B. Other official UK publications

Royal Commission on Indian currency and finance:

Vol. I, *Report*; and Vols. II-IV, *Appendices and evidence* (Cd. 1687, London, 1926).

Royal Commission on Labour in India: *Report*; and *Evidence,* Vols. I-VIII, X (Parts 1 and 2 each), and Vols. IX, XI (London, 1931).

3. OFFICIAL PUBLICATIONS : GOVERNMENT OF INDIA

A. Listed under collective authors

Census of India, 1911, Vol. I, Part I: *Report* by E.A. Gait (Calcutta, 1913).

Vol. V, *Bengal, Bihar and Orissa, and Sikkim,* Part I, *Report* (Calcutta, 1913)-Vol. VII, *Bombay,* Part I, *Report* by P.J. Mead and G.L. Macgregor (Bombay, 1912).

Vol. VII, *Bombay,* Part II, *Imperial tables* by Mead and Macgregor (Bombay, 1912).

Census of India, 1921, Vol. I, *India,* Part I, *Report by* J.T. Marten (Calcutta, 1924).

Vol. V, *Bengal* , Part I, *Report* and Part II, *Tables* (Calcutta, 1923).

Vol. VII, *Bihar* and *Orissa,* Part II, *Tables* (Patna, 1923).

Vol. XIII, *Madras*, Part I, *Report* (Madras, 1922).

Vol. XV, *Punjab and Delhi*, Part I, *Report* (Lahore,1923)

Census of India, 1931, Vol. I, *India,* Part I, *Report* by J.H. Hutton (Delhi, 1933).

Vol. VI, *Calcutta,* Parts I and II (Calcutta, 1933).

Vol. XVII, *Punjab,* Part I, *Report* (Lahore,1933).

Census of India, 1941, Vol. I, *India,* Part I, *Tables* by M.W.M. Yeatts (Delhi, 1943).

Departments of the Governments of India

Commercial Intelligence and Statistics Department [CISD] (Department of Statistics up to 1902-3): *Annual statements of the (seaborne) trade (and navigation) of British India with the British Empire and foreign countries* (with foreign countries), Vols. I and II (Calcutta, annual).

Estimates of area and yield of principal crops in India (Calcutta, annual).

Financial and commercial statistics of British India (Calcutta, annual);

afterwards *Statistics of British India* (in several volumes, Calcutta, annual);

afterwards *Statistical abstract for British India* (Calcutta, annual).

Index numbers of Indian prices, 1861-1931 and annual supplements through 1939(Calcutta).

Joint-stock companies in British India and in the Indian States of Hyderabad, Mysore, Baroda, Gwalior, Indore and Travancore (Calcutta, annual).

Prices and wages in India (Calcutta, annual).

Review of the sugar industry of India (annual supplement to the *Indian Trade Journal,* Calcutta).

Review of the trade of India (Calcutta, annual).

Finance Department: *Report(s) upon the operations of the (Paper) Currency Department during the year(s)* 1910-11, and 1911-12 (Calcutta, 1911 and 1912).

Home Department (Education): *Review of education in India in 1886, with special reference to the report of the Education Commission,* by Sir A. Croft (Calcutta, 1888).

Mines Department: *Report of the inspection of mines in India* (annual, Calcutta); from 1901 onwards, *Report of the Chief Inspector of Mines in India* (Calcutta, annual).

Public Works Department: *Review of irrigation in India*, 1911-12, and 1913-14 (Simla, 1914 and 1915).

Railway Department (Railway Board): *Administration Report*, Vols.I and II (annual, Simla, up to 1923; Calcutta, from 1924 onwards)

History of Indian Railways constructed and in progress, corrected up to 31 *March* 1945 (Delhi, 1947).

Statistics Department: see under Commercial Intelligence and Statistics Department.

Directorate of Marketing and Inspection, Agricultural Marketing Series: No.I: *Report on the marketing of wheat in India* (Delhi, 1937). No.8: *Report on the marketing of linseed in India* (Delhi, 1938).

Imperial Council of Agricultural Research: *Report on the cost of production of crops in the principal sugar-cane and cotton tracts in India*, Vols. I-V (Delhi, 1938-9).

Imperial Gazetteer of India : *The Indian Empire*, Vol.III, *Economic* (Oxford, 1907).

India Office, London: *India Office List* (London, annual).

Indian Central Cotton Committee: *Annual report(s)*, 1937-41 (Bombay).

Indian Central Jute Committee: *Report on the marketing and transport of jute in India* (Calcutta, 1940).

Indian Factory Labour Commission 1980: Vol.I, *Report and appendices*; and Vol.II, *Evidence* (Simla, 1908; also PP 1908, LXXIV)

Indian Munitions Board: *Industrial Handbook* 1919 (Calcutta, 1919

India's Contribution to the Great War (Calcutta, 1923).

Indian Tariff Board: Reports and Minutes of Evidence

***Report on the caustic soda and bleaching powder industry* (Bombay, 1946).**

***Report regarding the grant of protection to the cement industry* (Calcutta, 1925).**

***Cotton Textile Industry Enquiry*, 1927: Vol.I, *Report*; and Vols. II-IV, *Evidence* (Calcutta, 1927).**

***Report regarding the grant of protection to the cotton textile industry* (Calcutta, 1932).**

***Cotton Textile Industry*, Vols. I-IV, *Evidence* (Delhi, 1934).**

[Special Tariff Board] *Report and Evidence on the enquiry regarding the level of duties necessary to afford adequate protection to the Indian cotton textile industry against imports from the United Kingdom of cotton piecegoods adn yarn etc.*, Vol.I, *Report*; and Vols. II-III, *Evidence* (Delhi, 1936-7).

Report regarding the grant of protection to the paper and paper pulp industries; and Evidence, Vols. I-II (Calcutta, 1925).

Report regarding changes in the tariff entries relating to printing paper, 1927 (Calcutta, 1929).

Report on the grant of protection to the paper and paper pulp industries (Calcutta, 1931); and *Evidence*, Vols, I-II (Calcutta, 1932).

Report on the grant of protection to the paper and paper pulp industries (Delhi, 1938); and *Evidence*, Vols. I-II (Delhi,1939).

Report on the removal of the revenue duty on pig iron including the evidence recorded during the enquiry (Calcutta, 1930).

Report regarding the grant of supplementary protection to the steel industry (Calcutta, 1925).

Report regarding the grant of protection to the steel industry; and Evidence, Vols. I-III (Calcutta, 1924).

Report regarding the grant of supplementary protection to the steel industry (Calcutta, 1925)

Statutory enquiry 1926: steel industry, Vol, I : *Report regarding the continuance of protection to the steel industry ; and Evidence*, Vols. II-VII, (Calcutta, 1927).

Statutory enquiry 1926: steel industry, Vol, VIII : *Report regarding the grant of protection to the manufacture of wagons and underframes, component parts thereof, and wire and wire nails, including supplementary evidence recorded in 1927* (Calcutta, 1927).

Statutory enquiry 1933: *steel industry*, Vols. I-IV, *Evidence* (Delhi, 1934-5).

Report on the iron and steel industry (Delhi, 1934).

Report on the continuance of protection to the iron and steel industry (Bombay, 1947).

Report on the sugar industry (Calcutta, 1931); and *Evidence*, Vols. I-II (Calcutta, 1932).

Report on the sugar industry (Delhi, 1938); and Evidence Vols. I, II, III A, IIIB and IV (Delhi, 1938-9).

Report on the continuance of protection to the sugar industry, Vol.I (Bombay, 1950)

Labour Investigation Committee: *Report(s) on an enquiry into conditions of labour in (a) the cotton mill industry of India and (b) the jute-mill industry of India by* S.R. Deshpande (Delhi, 1946).

Legislative Assembly proceedings, 1924-34.

Proceedings of the Inter-provincial Jute Conference held at Calcutta from the 2nd to 4th August, 1915, with Appendices (Calcutta, 1915).

Reports of miscellaneous committees, commissions etc.

Reports of Currency Committees (Calcutta, 1931).

Reports of the Fact-finding Committee (Handloom and Mills) (Delhi, 1942).

Report of the Fiscal Commission, 1949-50 (Delhi, 1950); and *Evidence*, Vol. III (Delhi, 1952).

Report of the Indian Cotton Committee (Calcutta, 1919).

Report of the Indian Fiscal Commission 1921-22 (Simla, 1922); and *Evidence*, Vols. I-III (Calcutta, 1923).

Report of the Indian Retrenchment Committee (Delhi, 1923).

Report of the Indian Sugar Committee (Simla, 1920).

Report of the Jute Enquiry Commission (Delhi, 1954).

Report of the Monopolies Inquiry Commission 1965, Vols. I and II (combined) (Delhi, 1965).

Report of the Railway Industries Committee (Delhi, 1923).

Report of the Textile Enquiry Committee (Delhi, 1958).

Report of the Working Party for the cotton textile industry (Delhi, 1953).

Reserve Bank of India: Banking and monetary statistics of India (Bombay, 1954).

Report on currency and finance for the years 1935-6 and 1936-7 (Bombay, 1937).

Royal Commission on Agriculture in India: Report (London, 1928); and *Evidence*, Vol. I (Parts 1, 2, 3), Vol II (Parts 1, 2), and Vols. III - XIII (London, 1927-8).

B. Listed under individual authors [Gov. India pub.]

Adarkar, B.N. *The history of the Indian tariff* (Studies in Indian Economics issued by the Office of the Economic Adviser, First Series, No. 2) (Delhi, 1940).

Clow, A.G. *The State and Industry* (Calcutta, 1928).

Datta, K.L. *Report on the enquiry into the rise of prices in India,* Vols. I-V (Calcutta, 1914).

Gorrie, R. Maclagan. *Forestry development and soil conservation in the Upper Damodar Valley* (Damodar Valley Corporation, Alipore n.d.; *c.* 1952).

Hardy, G.S. *Report on the import tariff on cotton piece goods trade* (Calcutta, 1929).

MacKenna, J. *Agriculture in India* (Calcutta, 1915).

Noel-Paton, F. *Notes on sugar in India* (Third edition, Calcutta, 1911).

Pearson, R.S. 'Note on the utilization of bamboos for the manufacture of paper pulp', *Indian Forest Records,* Vol. 4, Part 5 (Calcutta, 1913).

Sahni, J.N. *Indian Railways, One hundred years,* 1853 to 1953 (New Delhi, 1953).

Sethi, B.L.'History of cotton' in B.L. Sethi and others: *Cotton in India,* Vol 2 (Indian Central Cotton Committee, Bombay, 1960), PP.I-39.

4. OFFICIAL PUBLICATIONS: INDIAN PROVINCIAL GOVERNMENTS

A. Listed under collected authors

Assam

Report on immigrant labour in the Province of Assam (Shillong, annual)

Resolution on immigrant labour in Assam (Shillong, annual).

Bengal

Report on the Administration of Bengal (Calcutta, annual).

Bengal District Gazetteers: *Champaran* by L.S.S. O'Malley (Calcutta, 1907). *Dacca* (in the Eastern Bengal District Gazetteers series) by B.C. Allen (Allahabad, 1912).

Hooghly by L.S.S. O'Malley and Monmohon Chakravarti (Calcutta, 1912).

Howrah by L.S.S. O'Malley and Monmohon Chakravarti (Calcutta, 1909).

Mymensingh by F.A. Sachse (Calcutta, 1917).

Pabna by L.S.S. O'Malley (Calcutta, 1923).

Santal-Parganas by L.S.S. O'Malley (Calcutta, 1910); second edition, in the Bihar District Gazetteers series, by S.C. Mukherjee (Patna, 1938).

24-Parganas by L.S.S. O'Malley (Calcutta, 1914).

Report of the Bengal Jute Enquiry Committee 1933 (Finlow Committee), Vol. I (Alipore, 1934).

Report of the Bengal Jute Enquiry Committee (Fawcus Committee) (Alipore, 1940).

Report of the Labour Enquiry Commission 1895 (Calcutta, 1896).

Bombay

Report on (Bombay, a review of) the administration of the (Bombay) Presidency (Bombay, annual).

Report of the Bombay Development Committee 1914 (Bombay, 1914).

Gazetteers of the Bombay Presidency : *Bombay City and Island* (see below under Secondary Sources, Edwardes, S.M.).

Vol. II, *Gujarat: Broach and Surat* (Bombay, 1877).

Vol. IV, *Gujarat: Ahmedabad* (Bombay, 1879).

Vol. VII, *Baroda* (Bombay, 1880).

Department of Industries, Bombay: *Annual report, 1917-18* (Bombay, 1919) and subsequent issues up to 1922-3.

Labour Office, Bombay: *Wages and unemployment in the Bombay cotton textile industry: Report of the Departmental Enquiry* (Bombay,1934).

Labour Office, Bombay: *General wage census*, Part I, *Perennial factories, Third Report* (Bombay, 1937).

Report of the Textile Labour Enquiry Committee, Vol. II, *Final Report* (Bombay, 1940).

Central Indian States

The Central Indian State Gazetteer Series: Vol. I, *Gwalior State Gazetteer*, Text and Tables (Calcutta, 1908).

Vol. II, *Indore State Gazetteer*, Text and Tables (Calcutta, 1908).

Vol. III, *Bhopal State Gazetteer*, Text and Tables (Calcutta, 1908).

Madras

Madras, a review of the administration of the Presidency (Madras, annual).

The Madras Provincial Banking Enquiry Committee, Vol. I, *Report;* and Vols II-IV, *Written and Oral Evidence* (Madras, 1930).

Report of the Department of Industries, madras, for the year ended 31st March 1920 (Madras, 1921), and subsequent annual issues up to 1939.

Punjab

Punjab District Gazetteers: Vol. v A, *Delhi District with Maps* (Lahore, 1913).

The United Provinces

The UP Provincial Banking Enquiry Committee, 1929-30, Vol. I, *Report* (Allahabad, 1930); and Vols. II-IV *Evidence* (Allahabad, 1930-1).

District Gazetteers of the United Provinces of Agra and Oudh (compiled and edited by H.R. Nevill, ICS): Vol IV, *Meerut* (Allahabad, 1904).

Vol. XIII. *Bareilly* (Allahabad, 1911).

Vol. XVIII, *Shahjahanpur* (Allahabad, 1910).

Vol. XIX, *Cawnpore* (Allahabad, 1910).

Vol. XXXVIII, *Lucknow* (Allahabad, 1904).

Report of the Cawnpore Textile Labour Inquiry Committee appointed by the Government of the United Provinces (Allahabad, 1938).

The administration report of the Department of Industries, United Provinces, for the year ending 31 March 1937 (Allahabad, 1937), and subsequent annual issues.

B. Listed under individual authors [IPG pub.]

Chatterjee, A.C. *Notes on the Industries of the United Provinces* (Allahabad. 1908).

Chatterton, A. *Note on Industrial Work in India* (Madras, 1905).

Collin, E. W. *Report on the Arts and Industries of Bengal* (Calcutta, 1890).

Cumming, J. G. *Review of the industrial position and prospects in Bengal in 1908 with special reference to the industrial survey of 1890, Part II of special report* (Calcutta 1908).

Finlow, R. S. *General Report on Jute in Bengal for 1904-5* (Calcutta, 1906).

Latifi, A. *The Industrial Punjab: A Survey of Facts, Conditions and Possibilities* (published for the Punjab Government by Longmans, Green & Co., Bombay and Calcutta, 1911).

Mitra, A. *An Account of Land Management in West Bengal 1970-1950, Census 1951, West Bengal* (Alipore, 1953).

Moreland, W.H. *Notes on the Agricultural Conditions and Problems of the United Provinces, revised up to 1911* (Allahabad, 1913).

Raghavaiyangar, S. Srinivasa. *Memorandum on the Progress of the Madras Presidency during the Last Forty Years of British Administration* (Madras, 1893).

Watson, E.R. *A Monograph on Iron and Steel Work in the Province of Bengal* (Calcutta, 1907).

5. OFFICIAL PUBLICATIONS: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND OTHER GOVERNMENTS

ILO Studies and Reports Series B, No. 29, Butler, Harold: *Problems of Industry in the East with Special Reference to India, French India, Ceylon, Malaya, and the Netherlands India* (Geneva, 1938).

ILO Studies and Reports Series B, No. 27: *The world textile industry, economic and social problems*, Vol. I (Geneva, 1937).

League of Nations: *The Causes and Phases of the World Economic Depression* (Geneva, 1931).

(Nurkse, R. and Brown, W.A., Jr.) *International Currency Experience* (League of Nations, 1944).

United Nations: *Processes and Problems of Industrialization in Underdeveloped Countries* (New York, 1955).

U.S. Bureau of the Census: *Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1957* (Washington, D.C., 1960).

6. PUBLICATIONS OF UNOFFICIAL (OR SEMI-OFFICIAL) ORGANIZATIONS, AND PERIODICALS

The Bankers' Magazine (London, monthly).

Bengal National Chamber of Commerce and Industry: *Report of the Committee for the year 1932* (Calcutta, 1933).

Bengal National Chamber of Commerce and Industry 1887-1962 (Souvenir Volume) (Calcutta, 1962).

The Bombay Investor's Year-Book 1940 (First edition, Bombay, 1940).

Calcutta Jute Dealers Association: *Report of the Committee from 1st January to 31st December 1927* (Calcutta, 1928).

Capital (Calcutta, Weekly).

Debrett's Peerage, Baronetage, Companionage, etc. (London, annual).

East India Jute Association Limited, Calcutta: *Annual Report for the year ended 30th June 1928* (Calcutta, 1928) and subsequent annual reports.

Handbook and Guide to Dundee and District published for the Dundee meeting of the British Association 1912 (Dundee, 1912).

Imperial Institute: *Indian Trade Enquiry reports on jute and silk* (London, 1921).

Indian Chamber of Commerce: *Annual Report of the Committee for the years 1928* (Calcutta, 1928) and subsequent annual reports.

Indian Finance Year-Book 1931 (Calcutta, 1931) and subsequent annual issues.

Indian Jute Mills Association (up to 1901, Indian Jute Manufacturers' Association): *Report of the Committee for the year ended 31st December 1901* (Calcutta, 1902) and subsequent annual reports.

The Indian Textile Journal [*ITJ*] (Bombay, Monthly).

The Indian Textile Journal 1890-1940, Jubilee Souvenir (Bombay, 1941).

Indian Year-Book (Bombay, annual).

Investor's India Year-Book [*IIYB*] (Calcutta, annual; first edition, 1911).

Issues advertised in the Times (London, 1894-8).

Millowners' Associations, Bombay: *Annual Report* (Bombay) From 1895 onwards.

Murray's Handbook for Travelling in India, Burma and Ceylon (London, annual; fifteen edition, 1938).

The Stock Exchange: Burdett's Official Intelligence (later, *The Stock Exchange: Official Intelligence*) (London, annual).

Tea Producing Companies 1914, and Tea Producing Companies 1923-4, compiled by the Mincing Lane Tea and Rubber Share

Brokers' Association Limited and the Indian Tea Share Exchange Limited (London, 1914 and 1924).

SECONDARY SOURCES: BOOKS AND ARTICLES

Adarkar, B.N. 'The Ottawa Pact' in Radhakamal Mukerjee (ed.): *Economic Problems of Modern India*, Vol. I, pp. 378-95.

Adler, J.H. (ed.). *Capital Movements and Economic Development* (London, 1967).

Aitken, H.G.J. (ed.) *The State and Economic Growth* (New York, 1959).

Aldcroft, D.H. (ed.). *The Development of British Industry and Foreign Competition 1875-1914* (London, 1968).

Allen, G.C. *Japanese Industry: Its Recent Development and Present Condition* (New York, 1931).

'The Industrialization of the Far East' in H.J. Habakkuk and M.P. Postan (eds.): *Cambridge Economic History of Europe*, Vol. VI, Part II, pp. 873-923.

Allen, G.C. and Donnithorne, A.G. *Western Enterprise in Indonesia and Malaya* (London, 1957).

Alva, J. *Men and Supermen of Hindustan* (Bombay, 1943).

Andrew Yule and Co. *Andrew Yule and Co. Ltd.* (Printed in Great Britain for private circulation. 1963).

Anstey, V. 'Economic Development' in O'Malley (ed.): *Modern India and the West*, pp. 258-304.

The Economic Development of India (London, 1957).

Antrobus, H.A. *The Jorehaut Tea Company Ltd* (London, 1949).

A History of the Assam Company 1839-1953 (Edinburgh, 1957).

Armstrong, Sir Charles H. 'Indian Trade and the War', *JRSA* LXIII, No. 3, 262, 28 May 1915, pp. 645-57.

Atkinson, F.J. 'A statistical review of the Income and Wealth of British India', *Journal of the Royal Statistical Society*, Vol LXV, Part II, June 1902, pp. 209-72; discussion on the above paper by W. Digby, pp. 272-5.

Arrow, K.J. 'Towards a Theory of Price Adjustment' in Moses Abramovitz *et al.* (eds): *The Allocation of Economic Resources* (Standford, California, 1959).

Azad, Maulana Abul Kalam. *India Wins Freedom* (Bombay, 1959).

Bagchi, K. *The Ganges Delta* (Calcutta, 1944).

Bain, J.S. *Barriers to New Competition* (Cambridge, Mass., 1956)

Balakrishna, R. *Industrial Development of Mysore* (Bangalore City, India, 1940).

Baldwin, G.B. *Industrial Growth in South India* (Glencoe, Illinois, 1959).

Baldwin, R.E. 'Patterns of Development in Newly Settled Areas', *Manchester School*, Vol. 24, May 1956, pp. 161-79.

Banerjee, A.K. *India's Balance of Payments: Estimates of Current and Capital Accounts from 1921-22 to 1938-39* (Bombay, 1963).

Barker, *S.G. Report on the Scientific and Technical Development of the Jute Manufacturing Industry in Bengal* (Indian Jute Mills Association, Calcutta, 1935).

Barna, T. 'On Measuring Capital' in D.C. Hague and F.A. Lutz (eds): *The Theory of Capital* (London, 1961), pp. 75-94.

Batten, G.H.M. 'The Opium Question', *JSA*, XL, No. 2054 (1 April 1892), p.444-67; discussion on the paper, pp. 467-94.

Bensusan-Butt, D. *On Economic Growth* (Oxford, 1960).

Bergstrom, A.R. *The Construction and Use of Economic Models* (London, 1967).

Bhattacharya, S. 'Laissez Faire in India', *The Indian Economic and Social History Review*, II(I), January 1965.

Bickerdike, C.F. 'The Theory of Incipient Taxes', *Economic Journal* XVI (4), December 1906, pp. 529-35.

Binani, G.D. and Rama Rao, T.V. *India at a Glance: A Comprehensive Reference Book on India* (Calcutta, 1954).

Bird and Company of Calcutta. *A History produced to mark the firm's centenary 1864-1964* by G. Harrison (Bird and Company, Calcutta, 1964).

Blackett, Sir Basil P. 'The Economic Progress of India', *JRSA*, LXXVIII, No. 4028 (31 January 1930), pp. 313-27; discussions on the paper, pp. 328-336.

Blake, George, *B.I. Centenary* (London, 1956).

Blyn, G. *Agricultural Trends in India 1891-1947: Output Availability and Productivity* (University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1966).

Bompas, C.H. 'The Work of the Calcutta Improvement Trust', *JRSA*, LXXV, No. 3868, 7 January 1927, pp. 200-13; discussion on the paper, pp. 213-19.

Bose, A 'Foreign Capital' in W.B. Singh (ed.): *Economic History of India*, 1857-1956 (Bombay, 1965), pp. 484-527.

Bose, S.K. *Capital and Labour in the Indian Tea Industry* (Bombay, 1954).

Brayne, F.L. *The Remaking of Village India* (Bombay and London, 1929).

Broughton, G.M. *Labour in Indian Industries* (London, 1924).

Brown, Hilton. *The Sahibs* (London, 1948)

Parry's of Madras: A Story of British Enterprise in India (Madras, 1954).

Buchanan, D.H. *The Development of Capitalistic Enterprise in India* (New York, 1934; reprinted, London, 1966).

Buckland, C.E. 'The City of Calcutta', *JSA*, LIV, No. 2776, 2 February 1906, pp. 275-94.

Bull, H.M. and Haksar, K.N. *Madhay Rao Scindia of Gwalior 1876-1925* (Gwalior, 1926).

Burkhead, Jesse. 'The Balanced Budget', *Quarterly Journal of Economics,* May 1954, reprinted in A. Smithies and J.K. Butters (eds.): *Readings in Fiscal Policy* (London, 1955), pp. 3-27.

Burn & Co. Ltd, Howrah (published by Martin Burn Ltd., Calcutta, 1961).

Burn, Duncan L. *The Economic History of Steel-Making 1867-1939* (Cambridge, U.K., 1940).

Burnett-Hurst, A.R. *Labour and Housing in Bombay* (London, 1925).

Burt, B.C. (later Sir Bryce Burt). 'The Indian Sugar Industry', *JRSA*, LXXXIII, No. 4317, 16 August 1935, pp. 919-40; discussion on the paper, pp. 940-943.

'Agricultural Progress in India during the Decade 1929-39', *JRSA*, XC, No. 4602, 20 February, 1942.

Calvert, H.C. *The Wealth and Welfare of the Punjab* (London, 1936).

Chadwick, D.T. 'Agricultural Progress' in S. Playne (compiler) and A. Wright (ed.): *Southern India* (London, 1915), pp. 745-54.

The Trade of India with Russia, France and Italy', *JRSA*, LXVI, No.3397, 28 December 1917, pp.96-107.

'The Work of the Indian Tariff Board', *JRSA*, LXXVI, No.3921, 13 January 1928, pp. 195-205.

Chandra, Bipan. *The Rise and Growth of Economic Nationalism in India* (new Delhi,1966).

Chatterjee, T.P. and Sinha, A.R. 'A Statistical Study of the Foreign Demand for Raw Jute', *Sankhya*, Vol. 5 (1940-1), pp.433-8.

Chatterjee, R.*Indian Economics* (Calcutta, 1959).

Chatterton, Sir Alfred. 'Weaving in India', *The Hindustan Review* (Allahabad), xv, No.91, March 1907, pp.235-49.

'The Weaving Competitions in Madras', *The Indian Trade Journal*. Vol.IX, No.106, 9 April 1908, pp.54-7.

'The Industrial Progress of the Mysore State', *JRSA*, LXXIII, 26 June 1925, pp. 714-37; discussion on the paper, pp.737-47.

Chaudhuri, K.C. *The History and Economics of the Land System in Bengal* (Calcutta, 1927).

Chaudhury, N.C. Jute in Bengal (Calcutta, 1908).

Jute and Substitutes (Calcutta, 1933).

Choudhry, N.K. 'An Econometric Analysis of the Import Demand Function for Burlap (Hessian) in the U.S.A. 1919-53', *Econometrica,* Vol.26, July 1958, pp. 416-28

Chowdhury, B.*Growth of Commercial Agriculture in Bengal* (1757-1900), Vol. I (Calcutta, 1964)

Cooke, C.N. *The Rise, Progress and Present Condition of Banking in India* (Calcutta, 1863)

Cooper, A.T. 'Recent Electrical Progress in India', *JRSA*, LXXVII, No.3994, 7 June 1929, pp.739-58.

Coupland, Sir Reginald, *India: A Restatement* (London, 1945).

Coyajee, Sir J.C. 'Money reconstruction in India (1925-7)', *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 145, Part II, 1929, pp. 101-14.

Crane, R.I. 'Technical Education and Economic Development in India before World War I' in C.A. Anderson and M.J. Bowman (eds.) : *Education and Economic Development* (London, 1966), pp. 167-201.

Creighton, Charies, M.D. 'Plague in India', JSA, LIII, No. 2743, 16 June 1905, pp. 810-26.

Cumming, Sir John (ed): Modern India (London, 1931).

Cunningham, J.R. 'Education' in L.S.S. O'Malley (ed): *Modern India and the West*, pp. 138-87.

Dantwala, M.L. *Marketing of Raw Cotton in India* (Bombay, 1937). A Hundred Years of Indian Cotton (Bombay, 1948).

Darley, Sir Bernard. 'Irrigation and Its Possibilities' in Radhakamal Mukerjee(ed.): *Economic Problems of Modern India*, Vol.I (London, 1939), pp. 148-67.

Darling, M.L. *The Punjab-Peasant in Prosperity and Debt* (London, 1928).

Das, N. *Industrial Enterprise in India* (London, 1938).

Das, R.K. *Factory Labour in India* (Berlin, 1923).

Plantation Labour in India (Calcutta, 1931).

Dasgupta, A. 'The Jute Textile Industry' in V. B. Singh (ed.): *Economic History of India*, 1857-1956, pp. 260-80.

Davis, Kingsley. *The Population of India and Pakistan* (Princeton, N.J., 1951).

Dayal, Hari Har. 'Agricultural Labourers: An Inquiry into their Condition in the Unao District' in Radhakamal Mukerjee (ed): *Fields and Farms in Oudh* (Calcutta, 1929).

Deane, P. and Cole, W.A. *British Economic Growth 1688-1959: Trends and Structure* (2nd ed. Cambridge, U.K., 1967).

Deerr, N.*The History of Sugar*, Vol. I (London, 1949).

Desai, Ashok V. 'Origins of Parsi Enterprise', *Indian Economic and Social History Review*, Vol. v.(4), December 1968.

Desai, R.C. *Standard of Living in India and Pakistan* 1931-2 to 1940-1 (Bombay, 1953).

Dey, H.L. *The Indian Tariff Problem in Relation to Industry and Taxation* (London, 1933).

Dey, H.L. and Mukerjee, Radhakamal(eds.). *The Economic Problems of Modern India*, Vol. II (London, 1941).

Dickinson, A. 'Water Power in India', *JRSA*, LXVI, No. 3-417, 17 May 1918, pp. 417-22; discussion on the paper, pp.422-6.

Digby, W. 'Prosperous' *British India* (London, 1901).

Dobb, M. *Political Economy and Capitalism: Some Essays in Economic Tradition* (London, 1940).

Doraiswamy, S. V. *Indian Finance, Currency and Banking* (Madras, 1915).

The Duncan Group. *Being a Short History of Duncan Brothers & Co. Ltd, Calcutta and Walter Duncan and Goodricke Ltd, London*, 1859-1959 (London, 1959).

Dunn, G.O. W. 'The Housing Question in Bombay', JRSA, LVIII, No. 2989, 4 March 1910, pp. 393-405; discussion on the paper, pp. 405-13.

Dupriez, L.H. (ed). *Economic Progress, Papers and Proceedings of a Round Table held by the International Econimic Association* (Louvain, 1955), pp. 149-69.

Dutt, R.C. *The Economic History of India in the Victorian Age* (London, 1904; reprinted, Delhi, 1960).

Dutt, R.P. *India Today* (Bombay, 1949).

Eddison, J. C.A. *Case Study in Industrial Development—the Growth of the Pulp and Paper Industry in India* (Centre for International studies, M.I.T., Cambridge, Mass, 1955).

Edwardes, S.M. *The Gazetteer of Bombay City and Island,* Vol. I (Bombay,1909).

Memoir of Rao Bahadur Ranchhodlal Chhotalal, CLE (Exeter, U.K., 1920).

Elwin, V. *The Story of Tata Steel* (Bombay, 1958).

Feldman, H. *Karachi through a Hundred Years, the Centenary History of Karachi Chamber of Commerce and Industry* 1860-1960 (Karachi, 1960).

Ferber, R.'The Anatomy and Structure of Industry Expectations in relation to those of Individual Firms', *Journal of the American Statistical Association*, June 1958, pp. 317-35.

Forrest, L.R. Windham. 'The Town and the Island of Bombay—Past and Present', *JSA* XLIX, 14 June 1901, pp. 569-84; discussion on the paper, pp. 584-8.

Fraser, Lovat, *India Under Curzon and After* (London,1911).

Iron and Steel in India (Bombay, 1919).

Fremantle, S.H. 'The Problem of Indian Labour Supply', *JRSA*, No. 2947, 14 May 1909, pp. 510-19; discussion on the paper, pp. 519-24.

Fuhrer, A. 'Parsees or Parsis', *Encyclopaedia Britannica*, 9th ed. (Edinburgh, 1885), Vol. XVIII, p.327.

Furnivall, J. S. *An Introduction to the Political Economy of Burma* (Rangoon, 1931).

Gadgil, D.R. *The Industrial Evolution of India in Recent Times* (Bombay, 1944).

'Indian Economic Organization' in S.Kuznets and others (eds.): *Economic Growth Brazil, India, Japan* (Durham, N.C., U.S.A., 1955), pp. 448-463.

Ganguli, B. N. *Reconstruction of India's Foreign Trade* (New Delhi, 1946).

Gerschenkron, A. *Economic Backwardness in Historical Perspective* (New York, 1962).

Ghosh, H.H. *The Advancement of Industry* (Calcutta, 1910).

Ginwala, Sir Padamji P. 'India and the Ottawa Conference', *JRSA*, LXXI, No.4,175, 25 November 1932.

Glass, D.V. 'World Population 1800-1950' in H.J. Habakkuk and M.Postan (eds.): *Cambridge Economic History of Europe*, Vol. VI, Part I (Cambridge, U.K., 1965), pp. 56-138.

Goodwin, R.M. 'Secular and Cyclical Aspects of the Multiplier and the Accelerator' in *Income, Employment and Public Policy* (Essays in Honour of Alvin H. Hansen (New York, 1948).

'The Nonlinear Accelerator and the Persistence of Business Cycles', *Econometrica*, 19, 1951, pp. 1-17.

Gordon, L. A. 'Social and Economic Conditions of the Bombay Workers on the Eve of the 1908 Strike' in I.M. Reisner and N.M. Goldberg (eds.): *Tilak and the Struggle for Indian Freedom* (New Delhi, 1966), pp. 471-544.

Greenberg, M. *British Trade and the Opening of China* (Cambridge, U.K., 1951).

Grimston, F. S. 'The Indian Ordnance Factories and their Influence on Industry', *JRSA*, LXXIX, No. 4, 103, 10 July 1931, pp. 777-89; discussion on the paper, pp. 789-92.

Growth and Perspective (published for the Indian Iron & Steel Co. Ltd. by Martin Burn, Calcutta, 1968).

Gurtoo, D. N. *India's Balance of Payments (1920-1960)* (Delhi, 1961).

Habakkuk, H. J. 'The Historical Experience on the Basic Conditions of Economic Progress' in L. H. Dupriez(ed.): *Economic Progress*, Papers and Proceedings of a Round Table held by the International Economic Association (Louvain, 1955), pp. 149-69.

Habakkuk, H. J. and Postan, M.(eds.): *The Cambridge Economic History of Europe*, Vol. VI, Parts I and II (Cambridge, U.K., 1965).

Haji, S. N. *State Aid to Indian Shipping* (Indian Shipping Series, Pamphlet No.I, Bombay, 1922).

Harris, F.R *Jamsetji Nusserwanji Tata: A Chronicle of His Life* (Bombay,1958).

Harrison, G. *Bird and Company of Calcutta, A History produced to mark the firm's centenary* 1864-1964 (Calcutta, 1964).

Havell, E. B. 'Art Administration in India', *JRSA*, LVIII, No.2985, 4 February 1910, pp. 274-84.

Hazari, R.K. *The Structure of the Corporate Private Sector: A study of Concentration, Ownership and Control* (Bombay and London, 1966).

Heady, Earl O, and Kaldor, Donald R. 'Expectations and Errors in Forecasting Agricultural Prices', *Journal of Political Economy*, Vol. 62, February 1954, pp. 34-47.

Heaton, H. 'Industrial Revolution', *Encyclopaedia of the Social Sciences*, Vol.VIII New York, 1935), pp. 3-13.

Helm, Elijah. 'An International Survey of the Cotton Industry', Quarterly Journal of Economics, 1903, pp. 417-37.

Hirachand, Lalchad.'Indian Sugar Industry' in *Bombay Investor's Year Book 1940* (Bombay, 1940), 71-2.

Hirachand, Ratanchand. 'Constructional Engineering in India' in ibid., pp.75-7.

Hirachand, Walchand. 'Why Indian Shipping Does Not Grow' in ibid., pp. 58-66.

Hirsch, Leon V. *Marketing in an Underdeveloped Economy: the North Indian Sugar Industry* (Englewood Cliffs, N.J., 1961).

Hope, G.D. 'The Tea Industry of Bengal and Assam' in S. Playne (Compiler and A. Wright(ed.): *Bengal and Assam, Behar and Orissa* (London, 1917).

Howard, A. 'The Improvement of Crop Production in India', *JRSA*, LXVIII, Nos. 3,530 and 3,531, 16 July and 29 July 1920.

Howard, Louise, *Sir Albert Howard in India* (London, 1953).

Hubbard, G. E. *Eastern Industrialization and Its Effect on the West* (London, 1938).

Hunt, N.G. 'Banks and the Indian Cotton Textile Industry' in *The Indian Textile Journal, Jubilee Souvenir* 1890-1940 (Bombay, 1941).

Hunter, W.W. *The Indian Empire, Its Peoples, History and Products* (London,1893).

Huque, M.Azizul. *The Man Behind the Plough* (Calcutta, 1939).

Husain, S.A. *Agricultural Marketing in Northern India* (London, 1937).

Imlah, A. H. *Economic Elements in the Pax Britannica* (Cambridge, Mass.,1958).

'The Indian Mill Hands: A Movement on their Behalf', *ITF*, October 1913, p.32.

Islam, N. *Foreign Capital and Economic Development: Japan, India and Canada* (Rutland, Vermont, U.S.A. and Tokyo, 1962).

Ito, Shoji,'A Note on the "Business Combine" in India—with special reference to the Nattukottai Chettiars', *The Developing Economics* (Tokyo)iv(3), 1966, pp. 367-80.

Jack, J. C. *The Economic Life of a Bengal District* (Oxford, U.K., 1916).

James, Sir Frederick. 'The House of Tata—Sixty Years of Industrial Development in India', *JRSA*, xcvi, No.4, 776, 27 August 1948, pp. 612-20.

James, R.C. 'Labour Mobility, Unemployment, and Economic Change, An Indian Case', *The Journal of Political Economy*, LXVIII (6), December 1959, pp.545-59.

James Finlay and Company Limited: Manufacturers and East India Merchants, 1750-1950 (published privately by Jackson Son and Company, Glasgow, 1951).

Jenks, L. H. *The Migration of British Capital to* 1875 (first Published New York, 1927; reprinted, London,1963).

Johnson, W.A. *The Steel Industry of India* (Cambridge, Mass., 1966).

Jones, Gavin. 'The Rise and Progress of Cawnpore', in S. Playne (compiler) and A. Wright (ed.) *The Bombay Presidency, United Provinces, Punjab, etc.* (London, 1920), pp.497-99.

Joshi, L.A. *The Control of Industry in India* (Bombay, 1965).

Kahn, A.E. *Great Britain in the World Economy* (New York, 1946).

Kanitkar, N.V. and Mann, H.H. *Land and Labour in a Deccan Village*, Study No.2 (London and Bombay,1921).

Kannappan, S. 'The Tata Steel Strike: Some Dilemmas of Industrial Relations in a Developing Economy', *The Journal of Political Economy*, LXVII, October 1959, pp. 489-507.

Karaka, D.F. *History of the Parsis*, Vol.2 (London,1884).

Keatinge, G.F. 'Agricultural Progress in Western India', *JRSA*, LXI, No. 3,141, 13 January 1913, pp. 267-73.

Agricultural Progress in Western India (London,1921).

Keenan, J.L.A *Steel Man in India* (New York, 1943; London, 1945).

Kennedy, R.E. 'The Protestant Ethic and the Parsis', *The American Journal of Sociology*, 68 (1962-3), pp. 11-20; reprinted in N.J. Smelser(ed.): *Readings in Economic Sociology* (Englewood Cliffs. N. J., 1965), pp.16-26.

Keynes, J.M. Review of T.Morison: *The Economic Transition in India* (London,1911) in *Economic Journal*, XXI, September 1911, pp. 426-31.

Indian Currency and Finance (London, 1913).

The General Theory of Employment, Interest and Money (London, 1936; reprinted 1949).

Kidron, M. *Foreign Investments in India* (London, 1965).

Kindleberger, C.P. *Economic Development* (2nd edition, New York, 1965).

Kling, B. 'The Origin of The Managing Agency System in India', *The Journal of Asian Studies*, XXVI(I), November 1966, pp. 37-48.

Knowles, L.C.A. *Economic Development of the British Overseas Empire* (London, 1924).

Kosambi, D.D. 'The Bourgeoisie Comes of Age in India', *Science and Society*, Vol. X, 1946, pp. 392-8.

Krishna, Raj. 'Farm Supply Response in India—Pakistan', *Economic Journal*, LXXIII, September 1963.

Kuczynski, J.'Condition of Workers' in V.B. Singh(ed.): *Economic History of India* 1857-1956(Bombay, 1965), pp 609-37.

Kuznets, S. and others(eds.): *Economic Growth: Brazil, India, Japan* (Durham, N.C., 1955), pp 448-63.

Lall, S. 'Industrial Development in the Indian Provinces', *JRSA*, LXXXIX, No.4,579, 24 January 1941, pp. 134-45; discussion, pp. 145-7.

Landes, D.S. *Bankers and Pashas: International Finance and Economic Imperialism in Egypt* (London, 1958).

Leacock, S. and Mandelbaum, D.G. 'A Nineteenth Century Development Project in India: the Cotton Improvement Program', *Economic Development and Cultural Change* (Chicago), III(4), July 1955, pp. 334-51.

Leake, H. Martin. *The Foundation of Indian Agriculture* (Cambridge, U.K. 1923).

Lehmann, F. 'Great Britain and the Supply of Railway Locomotives of India: A Case Study fo "Economic Imperialism" ', *The*

Indian Economic and Social History Review, II(4), October 1965.

Lewis, W.A. *Economic Survey 1919-1939* (London, 1949).

'Economic Development with Unlimited Supplies of Labour', *The Manchester School of Economic and Social Studies*, XXII, 1954, pp. 139-91.

The Theory of Economic Growth (London, 1955).

Lindsay, H.A.F. 'World Tendencies Reflected in India's Trade', *JRSA*, LXXV, No. 3,876, 4 March 1927, pp. 384-94; discussion on the paper, pp. 394-399.

Lockwood, W.W. *The Economic Development of Japan* (Princeton, N.J., 1954).

Lokanathan, P.S. *Industrial Organization in India* (London, 1935).

Lovett, Pat. *The Mirror of Investment* 1927 (Calcutta, 1927).

Macbean, A.I. 'Problems of Stabilization Policy in Underdeveloped Countries', *Oxford Economic Papers*, N.S. Vol. 14, 1962, pp. 251-66.

Mackenna, J. (later Sir James Mackenna). 'Scientific Agriculture in India', *JRSA*, No.3,316, LXIV, 9 June 1916, pp. 537-46.

'The Indian Sugar Industry', *JRSA*, LXXVII, No. 3,970, 21 December 1928, pp. 140-52; discussion on the paper, pp. 152-8.

Mackenzie, Sir Compton. *Realms of Silver: One Hundred Years of Banking in the East* (London, 1954).

Maclean, J.M. 'India's Place in an Imperial Federation', *JSA*, LII, No.2,665, 18 December 1903, pp 81-90; discussion on the paper, pp. 90-5.

McLeod, C.C. 'The Indian Jute Industry', *JRSA*, LXIV, No. 3,292, 24 December 1915, pp. 105-18; discussion on the paper, pp 113-20.

Mahindra, K.C. Sir *Rajendra Nath Mookerjee* (Calcutta, 1933; reprinted, Calcutta, 1962).

Majumdar, S.C. Rivers of the Bengal Delta (Calcutta, 1941).

Mann, H.H. 'The Progress of Agriculture' in S. Playne (compiler) and A. Wright (ed.): *The Bombay Presidency, United Provinces, Punjab etc.* (London, 1920), pp. 540-7.

'The Agriculture of India', *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 145, Part II, 1929, pp. 72-81.

'The Economic Results and Possibilities of Irrigation', *Indian Journal of Agricultural Economics*, 13(2), 1958, pp. 1-6.

Mann, H.H. and Kanitkar, N.V. *Land and Labour in a Deccan Village*, Study No. 2 (London and Bombay, 1921).

Marx, Karl. Capital: *A Critical Analysis of Capitalist Production*, Vol. I (translated by Edward Aveling and Samuel Moore and edited by Frederick Engels) (London, 1957).

Masani, R.P.*N.M. Wadia and His Foundation* (Bombay, 1961).

Mather, R. 'The Iron and Steel Industry in India', *JRSA*, LXXV, No. 3,886, 13 May 1927, pp. 600-16; discussion on the paper, pp. 616-24.

Meek, D.B. (later Sir David B. Meek). 'Indian External Trade', *JRSA*, LXXXIV, No. 4,362, 26 June 1936, pp. 835-69.

'World Economic Controls and India's Part in These', *JRSA*, LXXXVII, No. 4,508, 14 April 1939, pp. 554-69.

Mehta, M.M. *Structure of Indian Industries* (Bombay, 1955).

Mehta, S.D. *The Indian Cotton Textile Industry: An Economic Analysis* (Bombay, 1935).

The Cotton Mills of India 1854-1954 (Bombay, 1954).

Meston, Lord. 'Public Finance' in Sir John Cummings (ed.) *Modern India* (London, 1931).

'The Mill Industry in Bombay', *ITJ* April 1914, p.222.

Misra, S. and Singh, B. *A Study of Land Reforms in Uttar Pradesh* (Calcutta, 1964).

Misra, B. B. *The Indian Middle Classes* (London, 1961).

Mitra, Kishori Chand, *Dwarakanath Tagore* (in Bengali) (Calcutta, 1962).

Modigliani, F. 'New Developments on the Oligopoly Front', *Journal of Political Economy*, LXVI, June 1958, pp. 215-32; discussion on the above paper by F.M. Fisher, D.E. Farrar and C.F. Phillips, Jr., and reply by F.Modigliani, *Journal of Political Economy*, LXVII, August, 1959, pp. 410-419.

Mody, Jehangir R. P. *Jamsetjee Jejeebhoy- the First Indian Knight and Baronet* (Bombay, 1959).

Moon, P. *Divide and Quit* (London, 1961).

Moore, Barrington, Jr. *Social Origins of Dictatorship and Democracy* (London, 1967).

Moraes, *Frank. Sir Purshatamdas Thakurdas* (Bombay, 1957).

Morarjee, Seth Narottam.'Indian Mercantile Marine', *Annals of*

the American Academy of Political and Social Science, Vol 145, Part II, 1929, pp. 68-71.

Moreland, W H. *The Agriculture of the United Provinces: An Introduction for the Use of Landowners and Officials* (Allahabad, 1904).

The Revenue Administration of the United Provinces (Allahabad, 1911).

'The Indian Peasant in History· An Introduction to the Linlithgow Report', *JRSA* , LXXVII, No. 3,988, 26 April 1929, pp. 605-13; discussion on the paper, pp. 613-19.

Morison, Sir Theodore. *Economic Transition in India* (London, 1911).

The Industrial Organization of an Indian Province (London, 1911).

Morris, M.D. *The Emergence of an Industrial Labour Force in India* (University of California Press, Berkeley, 1965).

Mukherjee, Haridas and Uma. *The Origins of the National Education Movement* (Jadavpur University, Calcutta, 1957).

Mukerji, K. 'Trend in Real Wages in Cotton Textile Mills in Bombay City and Island, from 1900 to 1951', *Artha Vijnana* (Poona), I(I), March 1959.

'Trend in Real Wages in the Jute Textile Industry from 1900 to 1951', *Artha Vijnana,* 2(I), March 1960.

'Trend in Real Wages in Cotton Textile Industry in Ahmedabad from 1900 to 1951', *Artha Vijnana*, 3(2) June 1961.

'Trend in Textile Mill Wages in Western India· 1900 to 1951', *Artha Vijnana*, 4(2), June 1962.

Mukerjee, Radhakamal. *The Indian Working Class* (Bombay, 1945).

Mukerjee, Radhakamal (ed.) Fields and Farms in Oudh (Calcutta, 1929).

Economic Problems of Modern India, Vol. I (London, 1939), particularly *idem*: 'Land Tenures and Legislaton', pp. 218-45.

Mukerjee, Radhakamal and Dey, H.L. (eds.) : ***Economic Problems of Modern India***, Vol.2 (London, 1941).

Munshi, M. C. (assisted by K.P. Karnik). ***Industrial Profits in India*** (1936-1944) : ***An Inductive Study*** (New Delhi, 1948).

Muranjan , S.K. ***Modern Banking in India*** (Bombay, 1940).

Murray, Sir Alexander R, 'The Jute Industry', *JRSA*, LXXXII, No. 4,263, 3 August 1934. pp. 977-92; discussion on the paper, pp. 992-5.

Myers, C. A. *Labour Problems in the Industrialization of India* (Cambridge, Mass., 1958).

Myrdal, G. Economic *Theory and Underdeveloped Regions* (London, 1957). *Value in Social Theory* (London, 1958).

Naigamwalla, N.K.D. *Stars of the Dawn: A Historical Memoir* (Bombay, 1946).

Nanavati, M.B. and Anjaria, J.J. *The Indian Rural Problem* (Bombay, 1945).

Narain, D.*The Impact of Price Movements on Areas under Selected Crops in India*, 1900-39.(Cambridge, U.K. 1965).

'Agricultural Change in India' (review of Blyn: *Agricultural Trends in India), Economic and Political Weekly* (Bombay), II(6), 11 January 1967, pp. 359-60.

Nayer, P.N. and Pillai, P.S.B. 'An Analysis of Sugar and Gur Prices in India in the Post-protection Period', *Sankhya*, Vol. 4, 1938-40, pp. 473-8.

Neale, W.C. *Economic Change in Rural India: Land Tenure and Reform in Uttar Pradesh* 1850-1955 (New Haven, Conn., 1962).

Nehru, J. *Glimpses of World History* (Bombay, 1967; originally published by Kitabistan, Allahabad, 1934).

An Autobiography (London, 1936; reprinted Calcutta, 1962).

The Discovery of India (3rd edition, Calcutta, 1947).

Nerlove, M. Time Series Analysis of the Supply of Agricultural Products' in Earl O. Heady *et al.* (eds.): *Agricultural Supply Functions—Estimating Techniques and Interpretation* (Iowa State University Press, Ames, Iowa, 1961).

Nurkse, R. 'Some International Aspects of the Problem of Economic Development', *American Economic Review*, May 1952.

'The Problem of International Investment in the Light of Nineteenth Century Experience', '*Economic Journal*, LXIV, December 1954, pp. 744-58.

O'Conor, J. E. 'The Economic and Industrial Progress and Condition of India', *JSA*, LII, No. 2,691, 17 June 1994.

O'Malley, L.S.S.(ed.) *Modern India and the West* (London, 1941).

Pointon, A. C. The Bombay Burmah Trading Corporation Limited, 1863-1963 (London, 1964).

Panandikar, S.G. *Some Aspects of the Economic Consequences of the War for India* (Bombay, 1921).

The Wealth and Welfare of the Bengal Delta (Calcutta, 1926).

Panckridge, H.R. *A Short History of the Bengal Club* (1827-1927) Calcutta,1927).

Pandit, Y. S. *India's Balance of Indebtendness* 1898-1913 (London, 1937).

Papanek, G.F. 'The Development of Entrepreneurship', *The American Economic Review*, LII(2), May 1962, pp.46-58.

Pakistan's Development: Social Goals and Private Incentives (Cambridge, Mass, 1967).

Pasinetti, L.L. 'On Concepts and Measures of Changes in Productivity', *Review of Economics and Statistics*, Vol. 4, August 1959, pp. 270-286.

Patel, S.J. 'Long-term Changes in Output and Income in India : 1896-1900' in *Essays on Economic Transition* (London, 1965).

Patwardhan, R.P. and Ambekar, D.V. (eds.). *Speeches and Writings of Gopal Krishna Gokhale* (Poona and London, 1962).

Pavlov, V. I. *The Indian Capitalist Class* (New Delhi, 1964).

Pearse, A. S. *The Cotton Industry of Japan and China* (Manchester. 1929).

The Cotton Industry of India, being the report of the journey to India (Manchester, 1930).

Phillips, A.W. 'Stabilisation Policy in a Closed Economy', *Economic Journal*, LXIV, June 1954, pp. 290-323.

'Stabilisation Policy and the Time-form of Lagged Responses', *Economic Journal* LXVII, June 1957, pp. 265-77.

'A Simple Model of Empoloyment, Money and Prices in a Growing Economy', *Economica*, N. S. Vol. 28, November 1961.

Pigou, A. C. *Aspects of British Economic History 1918-1925* (London, 1947).

Pillai, P.P. *Economic Conditions in India* (London, 1925).

Playne, S. (compiler) and Wright, A. (ed.) Southern India (London, 1915).

Bengal and Assam, Behar and Orissa (London, 1917).

The Bombay Presidency, United Provinces. Punjab, etc. (London 1920).

Podder, V. *Paper Industry in India 1959* (Delhi, 1959).

Pointon, A. C. *The Bombay Burmah Trading Corporation Limited* 1863-1963(London, 1964).

Power, Beryl M. le. 'Indian Labour Conditions', *JRSA*, LXXX, No. 4153, 24 June 1932, pp. 763-76; discussion on the paper, pp. 776-82.

Rabbani, A.K. M. Ghulam, 'Economic Determinants of Jute Production in India and Pakistan', *Pakistan Development Review*, Vol. 5, 1965, pp. 191-228.

Ranade, M. G. *Essays on Indian Economics* (2nd ed., Madras, 1906).

Rangnekar, D.K. *Poverty and Capital Development in India* (London, 1958).

Rao, B. Shiva, *The Industrial Worker in India* (London, 1939).

Rao, B. *Srinivasa, Surveys of Indian Industries*, Vols. 1 and 2 (Oxford University Press, Indian Branch, 1957 and 1958).

Rao, Shama. *M. Modern Mysore (From the Coronation of Chamaraja Wodeyar x in 1868 to the Present Time)*(Bangalore, 1936).

Rao, V. K. R. V. 'Handloom vs. Powerloom', *ITJ*, 1890-1940, *Jubilee Souvenir* (Bombay, 1941).

Rao, V. K. R. V. et. al. (eds.). *Papers on National Income and Allied Topics* Vol.I (London, 1960).

Rao, C. Ranganatha Sahib. 'The Recent Industrial Progress of Mysore'*JRSA*, LXXXIII, No. 4,294, 8 March 1935, pp. 372-89; discussion on the paper, pp. 390-94.

Ray, P.K. *India's Foreign Trade since 1870* (London, 1934).

Redford, A. *Manchester Merchants and Foreign Trade*, Vol. II,1850-1939 (Manchester, 1956).

Reid, D. J. 'Indigo in Behar' in S. Playne (compiler) and A. Wright (ed.), *Bangal and Assam, Behar and Orissa* (London, 1917).

Rippy, J.F. *British Investments in Latin America*, 1822-1949 (Hamden, Conn., 1966).

Robinson, E.A.G. *The Structure of Competitive Industry* (London, 1931).

Rosen, G. *Industrial Change in India* (Glencoe, Illinois, 1958).

Rosenberg. N. 'Capital Goods, Technology and Economic Growth', *Oxford Economic Papers*, N.S. Vol. 15, 1963, pp. 216-27.

'Technological Change in the Machine Tool Industry , 1840-1910', *Journal of Economic History*, XXIII, 1963, pp. 414-43.

Roth, Cecil. *The Sassoon Dynasty* (London, 1941).

Rutnagur, S.M. *Bombay Industries: The Cotton Mills* (Bombay, 1927).

Sachse, Sir Frederick A. 'The Work of the Bengal Land Revenue Commission', *JRSA*, LXXXIX, No.4,596, 19 September 1941, pp. 666-77.

Sanyal, N. *Development of Indian Railways* (Calcutta, 1930).

Sarkar, J.N. *The Economics of British India* (Calcutta, 1911).

Sarkar, N.R. 'Economic Planning in India' in Radhakamal Mukerjee and H.L. Dey (eds.): *Economic Problems of Modern India*, Vol.2, pp. 191-213.

Sarkar, Sumit 'Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908' (thesis approved by the University of Calcutta in 1969 for the degree of D.Phil.).

Sastry, N.S.R. *A Statistical Study of India's Industrial Development* (Bombay,1949).

Saul, S.B. *Studies in British Overseas Trade 1870-1914* (Liverpool, 1960).

'The Engineering Industry' in D.H. Aldcroft (ed.). *The Development of British Industry and Foreign Competition 1875-1914.*

Schumpeter, J.A. *The Theory of Economic Development* (Cambridge Mass., 1934).

'The Decade of the Twenties', *American Economic Review,* Supplement, May 1946.

Schuster, Sir George. 'Indian Economic Life: Past Trends and Future Prospects', *JRSA*, LXXXIII, No. 4,306, 31 May 1935, pp. 641-69.

Schwartzberg, J.T. 'Agricultural Labour in India: A Regional Analysis with Particular Reference to Population Growth',

Economic Development and Cultural Change (Chicago), Vol. II, July 1963.

Sen, A.K. 'The Commodity Pattern of British Enterprise in Early Indian Industrialization, 1854-1914', in *Deuxieme Conference Internationale D'Historie Economique, Aix-en-Provence* 1962 (Paris, 1965), pp.780-828.

'Surplus Labour in India: A Critique of Schultz's Statistical Test', *Economic Journal,* Vol.LXXVII, March 1967, pp.154-61.

Sen. S.K. 'Government Purchase of Stores for India (1893-1914)', *Bengal Past and Present,* January-June 1961, pp. 47-64.

Studies in Economic Policy and Development of India, 1848-1926 (Calcutta, 1966).

Shah, K.T. *Sixty Years of Indian Finance* (London, 1927).

Sharma, T.R. *Location of Industries in India* (Bombay, 1946).

Shirras, G.F. *India's Finance and Banking* (London, 1920).

'Public Finance in India', *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol.145, Part II, 1929, pp 115-23.

Simon, M. 'The Pattern of New British Portfolia Investment 1865-1914' in Adler(ed.). *Capital Movements and Economic Development*, pp. 33-66.

Singer, H.W. 'The Distribution of Gains between Investing and Borrowing Countries', *American Economic Review*, XI.(2), May 1950.

Singh, V.B. (ed.) *Economic History of India* 1857-1956 (Bombay, 1965).

Sinha, A.R. 'Interrelation between Supply and Price of Raw Jute', *Sankhya*, Vol.4 (1938-40), pp.397-400.

'A Preliminary Note on the Effect of Price on the Future Supply of Raw Jute', *Sankhya*, Vol.5 (1944-1), pp. 413-16.

Sinha, A.R., Sinha, H.C. and Thakurata, J. R. Guha. 'Indian Cultivators' Response to Price', *Sankhya*, Vol.I, Parts 2 and 3, May 1934.

Sinha, H. *Early European Banking in India* (London, 1927).

'Marketing of Jute in Calcutta', *Indian Journal of Economics, Conference Number*, January, 1929, pp. 513-47.

Sinha, N.K. *The Economic History of Bengal*, Vol.I (Calcutta, 1961) and Vol.II (Calcutta, 1962).

'Indian Business Enterprises: Its Failure in Calcutta (1800-1848)', *Bengal Past and Present*, Diamond Jubilee Number July-Dec. 1967, pp. 112-23.

Sivasubramonian, S. 'Estimates of Gross Value of Output of Agriculture for Undivided India, 1900-1 to 1946-7', in V.K.R.V. Rao *et. al.* (eds.): *Papers on National Income and Allied Topics*, Vol.I, pp. 231-44.

National Income of India, 1900-01 to 1946-47 (mimeographed, Delhi School of Economics, Delhi, 1965).

Slater, G. *Southern India* (London, 1936).

Slater, G. (editor). *Some South Indian Villages* (London, 1918).

Soni. H. R. *Indian Industry and Its Problems*, Vol.I (London, 1932).

Spodek, H. 'The "Manchesterisation" of Ahmedabad', *Economic Weekly* (Bombay), XVII(II), 13 March 1965, pp. 483-90.

Stuart-Williams, S.C. 'The Port of Calcutta and Its Postwar Development', *JRSA*, LXXVI, No. 3,948, 20 July, 1928,pp. 891-900; discussion on the paper, pp. 900-6.

Sulivan, R.J.F. *One Hundred Years of Bombay* (Bombay, 1937).

Tagore, Rabindranath, 'Lokahit', first published in B.S.. 1321 (1914 or 1915 A.D..) and reprinted in *Kalantar* (first published, B.S. 1344; 1937 A.D.).

Gharey Bairey (first published in B.S. 1322, in *Sabujpatra*).

My Reminiscences (London, 1917).

The Tata Iron and Steel Company Limited: *Annual Reports*.

Temin, Peter. *Iron and Steel in the Nineteenth Century America* (Cambridge, Mass., 1964).

Thavaraj, M. J. K. 'Capital Formation in the Public Sector in India: A Historical Study 1898-1938' in V.K.R.V. Rao *et. al.* (eds): Papers on *National Income and Allied Topics*, Vol.I, pp. 215-30.

'The Textile Industry in Japan' (anonymous), *ITJ*, January 1941, p. 127.

Thomas, P. J. *The Growth of Federal Finance in India* (Oxford University Press, Indian Branch, 1939).

Thompson, E. and Garratt, G.T. *Rise and Fulfilment of British Rule in India* (London, 1934).

Thorburn, S.S. *Musalmans and Moneylenders in the Punjab* (Edinburgh and London, 1886).

Thorner, Alice. 'The Secular Trend in the Indian Economy, 1881-1951', *The Economic Weekly* (Bombay), XIV, *Special Number*, July 1962.

Thorner, Daniel. 'Great Britain and the Development of India's Railways'. *The Journal of Economic History*, XI (4), Fall 1951, pp. 389-402.

'The Pattern of Railway Development in India', *The Far Eastern Quarterly*, XIV(2), February 1955, pp. 201-16.

Thorner, Daniel and Alice *Land and Labour in India* (Bombay and London, 1962).

'The Twentieth Century Trend in Employment in Manufacture in India— as illustrated by the case of West Bengal' in C.R. Rao *et al.* (eds.): *Essays on Econometrics and Planning* (Calcutta, 1964).

Tiwari, S. G. *Economic Prosperity of the United Provinces* (Bombay and Calcutta, 1951).

Townend, Sir Harry (compiler). *A History of Shaw Wallace & Co., and Shaw Wallace* & Co., Ltd. (Calcutta, 1965).

Tozer. H. J. The Manufacturers of Greater Britain — II India; *JSA*, LIII, No. 2,741, 2 June 1905, pp. 333-54.

Tressler, K. 'Industries' in S. Playne (compiler) and A.Wright (ed.). *Southern India* (London, 1915).

Trevaskis, H. K. *The Land of the Five Rivers* (London, 1928).

Tripathi, A. *Trade and Finance in the Bengal Presidency* (Bombay and Calcutta, 1956).

Tripathi, S.D. *The Kanpur Money Market* (Delhi, 1966).

Tuckwell, H. M. Surtees. 'The Tata Iron and Steel Works: Their Origin and Development', *JRSA*, LXVI, No. 3402, 1 February 1918, pp. 190-202; discussion on the paper, pp. 202-5.

Tyson, Geoffrey, *The Bengal Chamber of Commerce and Industry* 1853-1953. *A Centenary Survey* (Calcutta, 1953).

100 *Years of Banking in Asia and Africa: A History of National and Grindlays Bank Limited* 1953-1963 (London, 1963).

Vakil, C.N. and Maluste, D.N. *Commercial Relations between India and Japan* (Calcutta, 1937).

Venkatasubbiah, H. *The Foreign Trade of India* 1900-1940. *A statistical Analysis* (New Delhi, 1946).

Visvesvaraya, M. *Planned Economy for India* (Bangalore, 1934).

Wadia, Sir Ness. 'The Industry in Retrospect', *Indian Textile Journal 1890-1940, Jubilee Souvenir* (Bombay, 1941).

Wallace, D. R. *The Romance of Jute* (London, 1928).

Weston, A.T. 'Technical and Vocational Education', *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 145, Part II, 1929, pp. 151-160.

Wigglesworth, A. 'India's Commercial Fibres', *JRSA*, LXXIX, 26 December 1930,pp. 134-52; discussion on the paper, pp. 152-8.

Williamson, A.V. 'Irrigation in the Indo-Gangetic Plain', *Geographical Journal*, Vol. 65, 1925, pp. 141-53.

'Indigenous Irrigaiton Works in Peninsular India', *Geographical Review*, Vol. 21, October 1931, pp. 613-26.

Woodruff P. *The Men Who Ruled in India*, Vol.II, *The Guardians* (London, 1963).

Woodruff, W. *Impact of Western Man* (London, 1966).

Young, Brigadier-General H.A. 'The Indian Ordnance Factories and Indian Industries', *JRSA*, LXXII, No. 3715, 1 February 1924, pp. 175-85; discussion on the paper, pp. 185-8.

Zachariah, K.C. *A Historical Study of Internal Migration in the Indian Subcontinent*, 1901-1931 (London, 1964).

নির্দেশিকা